# বঙ্গদর্পণ

বাংলা ও বাঙালির সহস্রাব্দ সন্ধান

# বঙ্গদর্পণ

প্রথম খণ্ড

প্রধান সম্পাদক
পবিত্র সরকার

সম্পাদকমণ্ডলী

অমলেন্দু দে সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় রাধারমণ চক্রবর্তী
অশোকনাথ বসু মালিনী ভট্টাচার্য অজিত দত্ত

আহ্বায়ক-সম্পাদক

বিশ্বজীবন মজুমদার

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০০০

BANGADARPAN
A look at Bengal and Bengalis
Across a Millennium

মুদ্রক
অধীর ঘোষ
কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
২৫, ডি. এল রায় স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

অলংকরণ
প্রণবেশ মাইতি

সমাজ-রূপান্তর সন্ধানী তৃতীয় সহস্রাব্দ সমিতি
থার্ড মিলেনিয়াম কমিটি ফর সোশ্যাল ট্রানজিশন

সমিতি-সভাপতি
হাসিম আবদুল হালিম

সাধারণ সম্পাদক
ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়

# সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| বাঙ্গালির ইতিবৃত্ত : জাতি গঠনে | সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় | ২১ |
| বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী ও আর্যবিজয় | রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৫ |
| বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় | অতুল সুর | ৩১ |
| বাংলার আদিবাসী | সুবোধ ঘোষ | ৪৩ |
| ভারতীয় জনতত্ত্বে বাঙালির স্থান | নীহাররঞ্জন রায় | ৫০ |
| বাংলাদেশে বৈদিক সভ্যতা | প্রবোধচন্দ্র বাগচি | ৬০ |
| গৌড়বঙ্গ | সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় | ৬৬ |
| বঙ্গভাষী জনপদের নাম | সুকুমার সেন | ৭১ |
| পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল ও সংস্কৃতি | বিনয় ঘোষ | ৮১ |
| বাংলা দেশের নদ-নদী সম্বন্ধে সাধারণ কথা | কপিল ভট্টাচার্য | ৯৪ |
| গৌড়বাসীর সমুদ্রযাত্রা | ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার | ১১১ |
| বাংলায় বৌদ্ধধর্ম | অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ১১৬ |
| বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধন-তত্ত্ব | শশিভূষণ দাশগুপ্ত | ১২৩ |
| বাঙ্গালির বিশিষ্টতা | পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৩৮ |
| বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি | হিতেশরঞ্জন সান্যাল | ১৪৭ |
| বাংলার সামাজিক ইতিহাসের মূল সূত্র | হরপ্রসাদ শাস্ত্রী | ১৬৮ |
| কৌলীন্যপ্রথার উৎপত্তি | রমেশচন্দ্র মজুমদার | ১৭২ |
| কৌলীন্যমর্যাদার প্রথম ব্যবস্থা ও বর্তমান অবস্থা | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | ১৭৮ |
| বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ১৮৪ |
| বাংলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে | আহমদ শরীফ | ২১২ |
| সংস্কৃতির কথা | কাজী আবদুল ওদুদ | ২২৪ |
| বারোমাসে তেরো পার্বণ | যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি | ২৩০ |
| জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য | সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় | ২৪৪ |
| বাংলাব মুসলমানের কথা | কাজী আবদুল ওদুদ | ২৬৫ |
| মুসলিম সংস্কৃতির হেরফের | সৈয়দ মুজতবা আলী | ২৮০ |
| ভারতীয় মুসলমানের উপর হিন্দু প্রভাব | রেজাউল করীম | ২৯৬ |
| তুহ্ ফত্-উল্-মুওয়াহিদ্দিন্ | রামমোহন রায় | ৩০৬ |
| হিন্দু-মুসলমান বিরোধের গোড়ার কথা | নীরদচন্দ্র চৌধুরী | ৩২১ |
| হিন্দুমুসলমান | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ৩৩৫ |

| | | |
|---|---|---|
| ভেদ-বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা : অতীত ও বর্তমান | সৈয়দ শাহেদুল্লাহ | ৩৪৩ |
| বাঙালি মুসলমান ও মুসলিম কালচার | গোপাল হালদার | ৩৫৩ |
| সে কাল আর এ কাল | রাজনারায়ণ বসু | ৩৭২ |
| ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান | শিবনাথ শাস্ত্রী | ৩৮৫ |
| বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক আন্দোলন | নির্মলকুমার বসু | ৩৯৫ |
| এদেশের ভিখারি সম্প্রদায় | অদ্বৈত মল্লবর্মন | ৪০৪ |
| মানবতন্ত্র | আবুল ফজল | ৪১০ |
| রামমোহনের আমলে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাবিষয়ক বিতর্ক | প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় | ৪১৯ |
| স্ত্রী-শিক্ষা | স্বামী বিবেকানন্দ | ৪২৬ |
| স্ত্রীশিক্ষায় বিদ্যাসাগর | চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪৩৭ |
| সামাজিক আন্দোলন ও বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন | শিবনাথ শাস্ত্রী | ৪৫৪ |
| ইংরাজি শিক্ষার পরিণাম | রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | ৪৬১ |
| মাতৃভাষা এবং সাহিত্য | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ৪৭০ |
| সম্ভাষণ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ৪৭৬ |
| গণ-বিদ্রোহ | ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত | ৪৮০ |
| বঙ্গ-সমাজের রূপান্তর ও নিরক্ষরের অধিকার | বিনয় সরকার | ৪৯১ |
| যোগাযোগ-ব্যবস্থা : জলপথ | রাধারমণ মিত্র | ৫০৭ |
| জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি | আশুতোষ মুখোপাধ্যায় | ৫২২ |
| লেখক পরিচিতি | | |
| আমাদের কাজের কথা : কৃতজ্ঞতা | | |

# বঙ্গদর্পণ

# বাঙ্গালির ইতিবৃত্ত : জাতি গঠনে

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজির caste, tribe, race, people, nation প্রভৃতি শব্দের মতো বিশিষ্ট অর্থে এখনও আমরা বিভিন্ন শব্দ আমাদের ভারতীয় ভাষাগুলিতে ব্যবহার করি না—এক 'জাতি' শব্দ দিয়ে আমরা এতগুলি বিভিন্ন অর্থের শব্দের কাজ বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে চালাবার চেষ্টা করি। Nation অর্থে 'রাষ্ট্র' শব্দ চলতে পারে। People-এর জন্য 'জনগণ' বা 'জন'। Caste-এর জন্য 'বর্ণ' শব্দ তো আছেই। Race-এর জন্য 'জাতি', Tribe-এর জন্য 'উপজাতি'। আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে—Indian Nation-এর মধ্যে, কতকগুলি বিশিষ্ট people বা 'জন'-এর স্থান আছে। এক ভাষা ব্যবহার করা সমগ্র ভারতীয় রাষ্ট্রের বিশিষ্ট লক্ষণ নয়, যদিও ইংরেজি সংস্কৃত হিন্দি প্রভৃতির যোগে আমাদের একভাষিতার অভাবকে আমরা কার্যত পূরণ করে নিয়েছি। ভারতবর্ষে যে-বিভিন্ন people বা জনগণ বা জনসমূহ আছে, তাদের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ হচ্ছে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা; আর সঙ্গে সঙ্গে, সেই ভাষাকে আশ্রয় করে, তাদের মানসিক Culture বা সংস্কৃতি, সেই ভাষা যার প্রকাশভূমি এমন তাদের জীবনযাত্রা রীতিনীতি সামাজিক পদ্ধতি। এক কথায়, ভারত-রাষ্ট্রের সঙ্গে কতকগুলি Language Culture Group অর্থাৎ বিশিষ্ট ভাষা ও সংস্কৃতি-যুক্ত কতকগুলি দল বা জনকে ধরতে হয়। এই সমস্ত দল বা জন হচ্ছে এক বৃহৎ বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত কতকগুলি ছোটো ছোটো বৃত্ত। ভারতরাষ্ট্রের ভিতরে যে-সব people বা Language-Culture Group অথবা ভিন্ন ভিন্ন ভাষাবলম্বী জনসমূহ আছে, বাঙ্গালি জন—'গৌড়-জন' বলে মধুসূদন তাঁর মেঘনাদ বধ কাব্যে যার উল্লেখ করেছেন সেই 'বাঙ্গালি' বা 'গৌড়জন' একটি অন্যতম প্রধান দল বা শ্রেণি বা জন। বাঙ্গালির পাশে এইরূপ 'অসমিয়া জন' আছে, 'ওড়িয়া জন' আছে, 'মৈথিল', 'মগহি', 'ভোজপুরিয়া', 'কোসলি', 'পছাঁহি', 'পূর্বী-পাঞ্জাবি', 'রাজস্থানি', 'গোরখালি', 'গাড়োয়ালি', 'কুমাউনি', 'গুজরাটি', 'সিন্ধি', 'কাশ্মীরি', 'মারাঠি', 'তেলেগু', 'তামিল', 'কানাড়ি', 'মালয়ালম', 'গোঁড়', 'ওরাওঁ', 'মুণ্ডা', 'সাঁওতালি', 'গারো', 'মণিপুরি', 'খাসিয়া' প্রভৃতি নানা জনগণ আছে। পাঁচ ফুলের সাজির মতো এই-সব বিভিন্ন-ভাষাশ্রয়ী জন নিয়েই মিলিতভাবে ভারতীয় রাষ্ট্র। প্রথম 'বাঙ্গালি জনগণ' (বা সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে বাঙ্গালি 'জাতি') বলতে এমন এক শ্রেণির লোককে বুঝি, যারা রক্তে নানা জাতির মিশ্রণ হতে পারে, কিন্তু ভাষায় এক—যেহেতু তারা বাঙ্গালা

ভাষা বলে। বাঙ্গালির মধ্যে—অর্থাৎ বঙ্গভাষী জনগণের মধ্যে বামুন, কায়েত, বদ্যি আছে, রাজপুত, ছত্রী, বৈশ্য আছে, যারা নিজেদের খাঁটি বা মিশ্র আর্য বলে মনে করে থাকে; আছে নানা অন্য জাতীয় ব্যক্তি যাদের উৎপত্তি হয়েছে দ্রাবিড় বা কোল অর্থাৎ নিষাদ থেকে, মোঙ্গোল অর্থাৎ কিরাত থেকে। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, বাউরি, পশ্চিমি ছত্রী, চট্টগ্রামের চাকমা, উত্তর বাঙ্গালার রাজবংশী, পশ্চিম বাঙ্গালার মাহিষ্য, হিন্দুস্থান থেকে আগত পশ্চিমা মুসলমান, কত বিভিন্ন বর্ণ বা সম্প্রদায়ের মানুষ, যাদের মূল বংশগত উৎপত্তি পৃথক, তারা সকলেই বাঙ্গালি বা বঙ্গভাষী জাতির সামিল হয়ে গিয়েছে। বাঙ্গালা ভাষা নিয়েই বাঙ্গালি জাতি বা জনগণ। যত দিন না বাঙ্গালা ভাষা মিলছে তত দিন বাঙ্গালি জনের বা জাতির পাত্তাই নেই। "একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়"—বিজয়সিংহ বাঙ্গালা দেশ থেকে গিয়ে সিংহল জয় করেছিলেন, সেই বিজয়সিংহকে বাঙ্গালি জাতির মানুষ ভেবে আমরা আজ-কালকার বাঙ্গালিরা গর্ব করি। বিজয়সিংহ হয়তো 'বঙ্গবাসী' ছিলেন (এ-সম্বন্ধেও কিন্তু মতভেদ আছে), কিন্তু তাঁকে 'বাঙ্গালি' বলতে পারি না, কারণ তিনি 'বঙ্গভাষী' ছিলেন না, বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব বিজয়সিংহের সময়ে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ বছরের দিকে হয়-ইনি। মোটামুটি এইভাবে কথাটা বলা যায়। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির আগে বাঙ্গালা দেশে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন মানব বংশের বা মূল জাতির লোক এসে বাস আরম্ভ করে দেয়। তাঁদের বংশগত উৎপত্তি ছিল আলাদা, মূল ভাষা ছিল আলাদা, ধর্ম সভ্যতা সংস্কৃতি রীতিনীতি রহন-সহন চাল-চলন সব আলাদা আলাদা ছিল। খ্রিস্টজন্মের কাছাকাছি সময়ে এদের নিজ নিজ পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু খ্রিস্টজন্মের পরে, প্রায় হাজার বছরের মধ্যে সব উলট-পালট হয়ে গেল। আর্যভাষা মাগধী প্রাকৃত আর মাগধী অপভ্রংশ, পশ্চিমের বিহার অঞ্চল থেকে বাঙ্গালা দেশে গড়িয়ে-গড়িয়ে আসে—খ্রিস্টজন্মের পূর্বেকার কয়েকশত বৎসর ধরে এই আর্য ভাষার প্রসার বাঙ্গালা দেশে হতে থাকে। পরে এই মাগধী প্রাকৃত আর তার পরেকার রূপ মাগধী অপভ্রংশ, বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষার রূপ নেয় খ্রিস্টজন্মের পরে ৮০০-১০০০ বৎসরের মধ্যে। দেশের প্রায় তাবৎ বিভিন্ন জাতির আর ভাষার লোকেরা এই নবজাত বাঙ্গালা ভাষাই গ্রহণ করে, ভাষায় ভাবে এক ধরনের হয়ে যেতে থাকে; পরে তারা সকলে বঙ্গভাষী 'গৌড় জন' বা বাঙ্গালি জাতিতে পরিণত হয়। বর্ণভেদ, বৃত্তিভেদ, উচ্চ-নীচ স্তর-ভেদের জন্য বঙ্গভাষী জনগণের বিভিন্ন স্তরের বা দলের মধ্যে সব ক্ষেত্রে বৈবাহিক আদান-প্রদান চলত না, কিন্তু তাতে এক-জাতীয়তার--এক-জনতার—অভাব হয়নি। ভাষা-ই হল এক্ষেত্রে প্রধান বাঁধন। আর ভাষার পিছনে যে কতকগুলি বড়ো-বড়ো জিনিস আছে—যেমন একটি বিশেষ মনোবৃত্তি, এক ধরনের চিন্তা আর কল্পনা, আর এক ধরনের economic life বা অর্থনৈতিক জীবন। বাঙ্গালি জনের মানুষেরা ভাষায় এক; সঙ্গে-সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ায় এক (মাছ-ভাত-তেলের ভক্ত এই জাতি বা জন, উত্তর ভারতের মতো দাল-রুটি-ঘি-এর নয়)। পোশাক-পরিচ্ছদে এক (ধুতি-চাদর-গামছা বা মাথা বাঁধবার কাপড় বা রুমাল—আজকাল ধুতির বদলে বর্মা থেকে নেওয়া লুঙ্গি), বাস করবার ঘরেও এক (মাটির বা ছেঁচা বা বোনা বাঁশের দেয়াল, গোলপাতার বা খড়ের চাল, বাঁশের খুঁটি, ভিটার

মধ্যে অনেকগুলি পৃথক বা একেনে ঘরের সমাবেশ)। তাদের ঘর-গৃহস্থালির যন্ত্রপাতিও এক ধরনের, চাষবাসের জিনিসপত্র গঠনের পদ্ধতিও এক ধরনের, তাদের সাহিত্য-শিল্প-সংগীতও এক ধরনের। অবশ্য এ-সবের পিছনে একটা সাধারণ ভারতীয়তার ছাপ আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা রংও তার আছে। বাঙ্গালি মুসলমানের সঙ্গে মানসিক-প্রবৃত্তিগত প্রকৃতিগত মিল পাওয়া যাবে বাঙ্গালি হিন্দু বা বৌদ্ধ বা খ্রিস্টানের সঙ্গে, পাঠান বা তুর্কি বা আরব মুসলমানের সঙ্গে নয়। ধর্মজগতেও সেই একভাব বিদ্যমান, তার বাইরের পোশাকটাকে যতই বদলাবার চেষ্টা হোক না কেন। বাঙ্গালির পূর্বপুরুষ যখন বৌদ্ধ হিন্দু বা মুসলমান-এর একটাও ছিল না, দ্রাবিড় নিষাদ আর কিরাতের আদিম ধর্ম যখন সে পালন করত, তখন সে অলৌকিক-শক্তিশালী ধর্মগুরুতে বিশ্বাস করত। এই প্রকার গুরুর মৃত্যুর পরে তার দেহ মাটিতে পুঁতে তার উপরে মাটি বা পাথরের ঢিবি সাজিয়ে দিত। সমাজের মঙ্গলের জন্য সপ্তাহে এক দিন ঢিবি পরিষ্কার করত, তাতে ফুল দিত, সুগন্ধি দিত, প্রদীপ জ্বালাত। এই ঢিবিকে বলত 'এড়ুক'। পরে এই 'এড়ুক' হল বৌদ্ধের হাতে 'স্তূপ' বা 'চৈত্য', হিন্দু ধর্মাবলম্বীর হাতে সাধু সন্তের "সমাধি" আর ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমানের হাতে তার রূপ হল বা নামকরণ হল 'পীরের কবর' বা 'দরগা' বা 'আস্তানা'।

সংক্ষেপে পূর্বাপর বাঙ্গালি জাতি বা জনের গঠনের ইতিহাসের ধারাটা এখন বলা যাক। ভারতে তথা বাঙ্গালায় মানুষের বাস প্রথমটায় ছিলই না। বাইরে থেকে ভারতের অধিবাসীদের পূর্ব-পুরুষরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশ থেকে আসতে আরম্ভ করে, স্মরণাতীত কাল থেকে—প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। প্রথম আসে আফ্রিকা থেকে নিগ্রোজাতীয় মানুষ। আফ্রিকার পরে আরবদেশ আর ইরানের সাগরকূল ধরে এরা দক্ষিণ বেলুচিস্থান হয়ে ভারতে আসে। বাঙ্গালা দেশেও এদের আগমন হয়, কিন্তু পরবর্তী কালের মানুষ, যারা আসে তাদের হাতে এরা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বাঙ্গালা হয়ে আসাম, তার পরে বর্মা, বর্মা থেকে ডাঙার রাস্তায় মালয়দেশ, আর ডোঙা করে সাগর পেরিয়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ—এই সব দেশে নিগ্রোজাতীয় মানুষের প্রসার হয়, কিন্তু বাঙ্গালায় এদের আর অস্তিত্ব নেই। তারপরে আসে নিষাদজাতীয় মানুষ, যাদের ইউরোপীয় পণ্ডিতদের পরিভাষায় Austric বা Austro-Asiatic বলে। এদের ভাষা এখন পরিবর্তিত আকারে কোল খাসিয়া আর নিকোবরিদের ভাষা বলে বিদ্যমান—মুণ্ডারি, সাঁওতালি, হো, কুরকুঁ, গদব, শবর প্রভৃতি ভাষা যারা বলে তারা এদের সাক্ষাৎ বংশধর। সারা বাঙ্গালা জুড়ে এদের বাস ছিল। এখন যারা এদের মধ্যে বনে-পাহাড়ে গিয়ে আছে তারা-ই নিজেদের পৃথক সত্তা বজায় রেখেছে, আর বাকি সব বাঙ্গালা দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে মিলে গিয়েছে—ভাষা নিজেদের যা ছিল, তা ত্যাগ করে বাঙ্গালা নিয়ে ক্রমে বাঙ্গালি হয়ে গিয়েছে। এরা চাষবাস করত, কাপড় বুনত, ভারতের সভ্যতার বুনিয়াদ পত্তন হয় এদেরই হাতে। তারপর আসে দ্রাবিড়ভাষী জাতি। এরা নিষাদদের চেয়ে বেশি উন্নত ছিল, নাগরিক সভ্যতার পত্তন এরাই করে। এরাও নিষাদদের পাশে সারা বাঙ্গালায় ছড়িয়ে পড়ে। তারপরে নাম করতে হয় পূর্বদেশ থেকে আগত কিরাতদের। নাক চ্যাপ্টা, হলদে রং, বেঁটে-খাটো মানুষ ছিল এরা। এদের বসবাস

হয় হিমালয়ের দক্ষিণ অঞ্চলে, উত্তর বিহার আর উত্তর বাঙ্গালায়, পূর্ব বাঙ্গালায়, আর সারা আসাম জুড়ে। সভ্যতায় এরা তেমন অগ্রসর ছিল না, কিন্তু বাঙ্গালি জনগণের গঠনে উপাদান স্বরূপ এরাও এসেছে—বিশেষ করে উত্তর আর পূর্ব বঙ্গে। শেষে আসে আর্যভাষী জাতি। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার সর্বত্র এই আর্যভাষী জাতি স্থানীয় নিষাদ কিরাত দ্রাবিড়দের সঙ্গে অনুলোম আর প্রতিলোম বিবাহে বদ্ধ হতে থাকে, এদের ভাষা একটি প্রবর্ধমান মিশ্রজাতির সভ্যতার বাহন হয়ে দাঁড়ায়। সংস্কৃত আর প্রাকৃত রূপে এই ভাষা সর্বত্র প্রসারিত হয়, আর শেষে মগধ হয়ে এই আর্যভাষা বাঙ্গালা দেশে এসে বাঙ্গালা ভাষার রূপ নিয়ে বাঙ্গালার মিশ্র নিষাদ কিরাত দ্রাবিড় আর্যজাতির মানুষদের 'বাঙ্গালি' বা বঙ্গভাষী জাতি বা জন রূপে গঠন করে তোলে।

উৎস : বেতার জগৎ, বর্ষ ২২, সংখ্যা ১৬

# বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী ও আর্যবিজয়

## রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন মিশর, বাবিরুষ (Babylon) ও আসুর (Assyria) দেশের প্রাচীনকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে তাম্রনির্মিত অস্ত্রের প্রচলন ছিল। প্রত্নবিদ্যাবিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, মিশরদেশে সাম্রাজ্যের যুগের পূর্বে (Predynastic Age) তাম্রের ব্যবহার আরব্ধ হইয়াছিল[১]। খ্রিস্টের জন্মের চারি সহস্র বৎসর পূর্বে মিশরদেশে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, ইহার পূর্ব হইতে মিশরে তাম্রনির্মিত অস্ত্রের ব্যবহার ছিল। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, খ্রিস্টের জন্মের চারি সহস্র বৎসর পূর্বে প্রাচীন বাবিরুষে তাম্রের ব্যবহার ছিল। মিশর, বাবিরুষ* প্রভৃতি প্রাচীনরাজ্যে ২০০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত তাম্রের ব্যবহার অপ্রতিহত ছিল। খ্রিস্টের জন্মের সার্ধ সহস্র বা দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্বে প্রাচীন আর্য জাতি এশিয়াখণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত মরুময় পুরাতন আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। আর্যগণের আক্রমণে, খ্রিস্টের জন্মের পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্বে বাবিরুষ ও মিশর দেশের প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে আর্যবংশজাত কাশীয়জাতি (Kassites, Cossites, Kaso-shu) বাবিরুষ অধিকার করিয়া নূতন রাজ্যস্থাপন করেন। কাশীয়গণ যে আর্যজাতীয় সে বিষয়ে এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের সর্বপ্রধান দেবতার নাম সূর্যস্‌ এবং তাঁহাদিগের ভাষা আর্যজাতিসমূহের ভাষার অনুরূপ। কাশীয়গণের পবন দেবতার নাম মরুত্তস্‌ (সংস্কৃত মরুৎ)। ইঁহারা তাঁহাদিগের খোদিত লিপি সমূহে আপনাদিগকে খারি অর্থাৎ আর্য নামে অভিহিত করিতেন। বাবিরুষের উত্তর-পশ্চিমে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদদ্বয়ের মধ্যে আর্যবংশসম্ভূত পরাক্রান্ত মিতান্নিজাতি একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত হিউগো উইঙ্কলার (Hugo Winckler) তুরস্করাজ্যে যোগাজকোই নামক স্থানে কীলকাক্ষরে (Cuneiform) লিখিত প্রাচীন মিতান্নিরাজগণের কতকগুলি মৃন্ময়

(১) Copper came gradually into use among the Pre-historic Southern Egyptians towards the end of the Pre-dynastic Age. And they must have obtained their knowledge of it from the Northerners.—H. R. Hall, The Ancient History of the Near East. p. 90.Â

*পরবর্তী ব্যাবিলন (সম্পাদক)।

অরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যদ্বয় অর্থাৎ অশ্বিন্‌গণের নামগ্রহণ করিয়া সন্ধিপত্র আরম্ভ করিয়াছেন[২]। মিশরদেশের প্রাচীন ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে মিশরের প্রাচীন রাজবংশ এশিয়াবাসী যাযাবরজাতিসমূহ কর্তৃক অধিকারচ্যুত হইয়াছিলেন। এই সকল যাযাবরজাতি আর্যজাতির আক্রমণে পুরাতন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই সময়ে আর্যগণও মিশরদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

আর্যবিজয়ের পরবর্তীকাল হইতে মিশর, বাবিরুষ প্রভৃতি প্রাচীন দেশসমূহে লৌহের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। আসুরদেশে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে লৌহনির্মিত অস্ত্রব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না[৩]। চিনদেশে খ্রিস্টপূর্ব ঊনবিংশ শতাব্দীতে লৌহের ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[৪]। এই সকল কারণ দর্শনে অনুমান হয় যে, প্রাচীন আর্যজাতি লৌহনির্মিত অস্ত্রের বলে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিসহস্র হইতে সার্ধ সহস্র বৎসর মধ্যে প্রাচীন বাবিরুষ ও আসুররাজ্য জয় করিয়াছিলেন।

বাবিরুষে এবং টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগে প্রাচীন আর্যাধিকার চারিশত বর্ষের কিঞ্চিৎ অধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল। মিশরের অষ্টাদশ সংখ্যক রাজবংশের তৃতীয় থুতমসিস্ (Thutmosis III) এশিয়াখণ্ডে যুদ্ধযাত্রাকালে মিতান্নিরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মিশরে কর্নাকের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত তৃতীয় থুতমসিসের
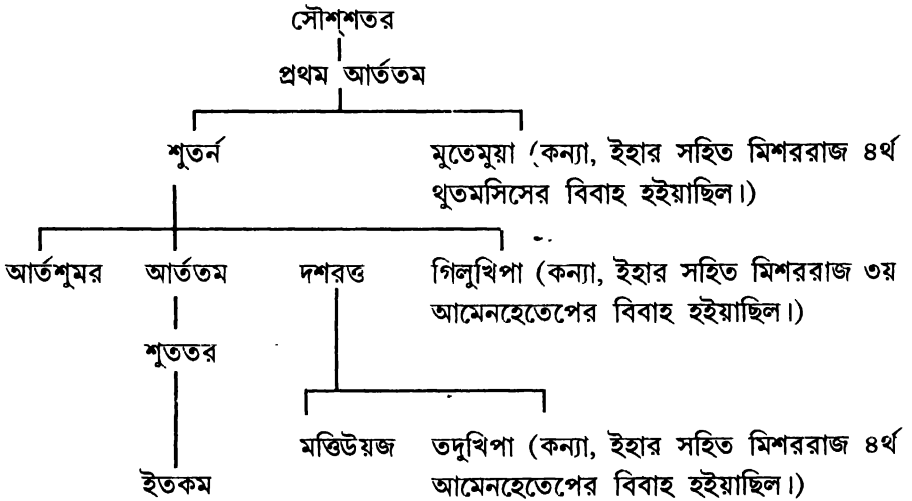
প্রশস্তিতে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[৫]। অদ্যাবধি মিশরে ও এশিয়ায় যে সমস্ত খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হল আর্যবংশজাত মিতান্নিরাজগণের নিম্নলিখিত বংশপত্রিকা সংগ্রহ করিয়াছেন ঃ—

(২) Mitteilungender Deutschen Orientgeselschaft—No. 35; Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, pp. 722-23.

(৩) The earliest evidence of Iron in Assyria is an incription of Tiglath-Pileser (1120 B.C.) who says : "In the Desert of Mitani near Araziki, which is in front of the land of Hatii, I slew four mighty buffaloes with my great bow and from arrows"—*Pre-historic Times* p.8.

(৪) *British Museum Catalogue of Chinese Coins*, p.9.

(৫) Maspero, *The Struggle of the Nations*, p. 268.

দশরত্ত বা দশরথের সময় হইতে মিতান্নিরাজ্যের অবনতি আরম্ভ হয় এবং তাঁহার পুত্র মত্তিউয়জ ১৩৬৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে খাতি (Khati বা Kittite) রাজ সুব্বিলুলিউমা কর্তৃক পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন[৬]। এই ঘটনার অল্পদিন পরে মিতান্নিরাজ্য খাতিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন বাবিরুষে সেমিটিকজাতির সহিত সংমিশ্রণে, আর্যবংশসম্ভূত কাশীয়রাজগণ ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাবিরুষের আর্যরাজগণের অধিকার লুপ্ত হয় এবং আর্যজাতির শেষ রাজা কাস্টিলিয়াসু, আসুররাজ তুকুল্‌তিনিনিব কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমসীমান্তে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে আর্যাধিকার বিলুপ্ত হইলেও প্রাচীন ঐরানে (বর্ত্তমান পারস্যদেশে), আর্যগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐরানবাসী পারসিক নামধারী আর্যগণই পরবর্তীকালে প্রাচীন প্রাচ্যজগতে আসুর ধ্বংস করিয়াছিলেন।

এই আর্যজাতির এক শাখা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পর্বতশ্রেণি অতিক্রম করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহারা ক্রমশ পূর্বদিকে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন এবং দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে উত্তরাপথের অধিকাংশ হস্তগত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মগধের দক্ষিণ অংশের প্রাচীন নাম কীকট। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ঋগ্বেদের তৃতীয়াষ্টক রচনাকালে পঞ্চনদ ও মধ্যদেশবাসী আর্যগণ মগধদেশের অস্তিত্বের কথা অবগত ছিলেন[৭]। অথর্ববেদ-সংহিতার ৫ম কাণ্ডে অঙ্গ ও মগধদেশের নাম আছে; সুতরাং ইহা স্থির যে এই সময়ে অঙ্গ ও মগধদেশ আর্যগণের নিকট পরিচিত হইয়াছিল[৮]। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[৯] ও মানবধর্মশাস্ত্রে[১০] পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ আছে। পুণ্ড্রবর্ধন যদি পুণ্ড্রগণের তৎকালীন বাসস্থান হয়, তাহা হইলে উত্তরবঙ্গ তখন আর্যগণের পরিচিত হইয়াছিল। ঐতরেয় আরণ্যকে[১১] বঙ্গ শব্দের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যক রচনাকালে বঙ্গ, মগধ ও চেরদেশবাসিগণকে আর্যগণ পক্ষিবৎ জ্ঞান করিতেন। বঙ্গ বঙ্গদেশের নাম, বগধ হয় মগধের প্রাচীন নাম অথবা লিপিকর প্রমাদের ফল; এবং চের, জাতি অথবা দেশবিশেষের নাম। মধ্যপ্রদেশের পার্বত্য বর্বরজাতিগণ আপনাদিগকে চেরজাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। চের দক্ষিণাপথের একটি প্রাচীন রাজ্যের নাম; ইহার অপর নাম কেরল। অশোকের দ্বিতীয় গিরিশাসনে কেরলদেশের নাম আছে। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে চেরদেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[১২]।

যে সময়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অথবা আরণ্যকে আমরা বঙ্গ অথবা পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ দেখিতে পাই, সে সময়ে অঙ্গে, বঙ্গে, অথবা মগধে আর্যজাতির বাস ছিল না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐন্দ্রমহাভিষেকের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুষ্মন্তের পুত্র ভরত একশত

(৬) H. R. Hall : *Ancient History of the Near East*, p. 263.

(৭) কিম্। তে। কৃণ্বন্তি। কীকটেষু গাবঃ। ন। আশিরম্।--ঋক্ সংহিতা ৩।৫৩।১৪

(৮) গন্ধারিভ্যো মুজবদ্ভ্যোহঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ।—অথর্বসংহিতা ৫।২২।১৪।

(৯) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, (সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী ৩৪), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ (পৃঃ ৫৯৭)।

(১০) মানবধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের অদর্শনে যে সকল ক্ষত্রিয়জাতির বৃষলত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহাদিগের নামের মধ্যে পৌণ্ড্রগণের নাম আছে। মানবধর্মশাস্ত্র; ১০।৪৩-৪৪

(১১) ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চের-পাদান্যন্যা অর্কমভিতো বিমিশ্র ইতি। —ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১।

(১২) V. A. Smith's *Early History of India*, pp. 456-57.

তেত্রিশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে আটাত্তরটি যমুনার নিকটে ও পঞ্চান্নটি গঙ্গাতীরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল[১৩]। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অগ্নি সরস্বতী-তীর হইতে সরযু, গণ্ডকী ও কুশী নদী পার হইয়া সদানীরা-তীরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণে মগধে বা বঙ্গদেশে গমন করেন নাই। রাহুগণ মিথিলাদেশে আগমন করিলে উহা আর্যগণের বাসযোগ্য বলিয়া গণ্য হয়। বৈদিক-সাহিত্যে এ সকল উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে, সেই সময়ে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মিথিলা প্রভৃতি উত্তরাপথের পূর্বসীমান্তস্থিত প্রদেশসমূহ নবাগত আর্যজাতির নিকট পরিচিত ছিল কিন্তু তাহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণে মিথিলার উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয় যে, সেই সময়ে মিথিলায় আর্য উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল অথবা মিথিলা আর্যগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল[১৪]।

আর্যাবর্তের পূর্বসীমান্ত যখন আর্যোপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তখন এই সকল দেশ কোন্ জাতির বাসস্থান ছিল? ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও মগধবাসীগণের সহিত চেরদেশবাসীগণের অথবা চেরজাতির উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয় যে, আর্যগণ যাহাদিগকে পক্ষিজাতীয় মনুষ্য মনে করিতেন, তাহারা একই বংশসম্ভূত জাতি। মধ্যপ্রদেশের পার্বত্য উপত্যকা সমূহে যে সমস্ত বর্বরজাতির অদ্যাবধি আপনাদিগকে চেরো বা চেরুবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, তাহারা আর্য বংশজাত নহে। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, তাহারা দ্রাবিড়জাতীয়।

দ্রাবিড়জাতি বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ভাষা অনার্য, বর্তমান সময়ে তাঁহারা মধ্যভারতে ও দাক্ষিণাত্যে বাস করিয়া থাকেন। দ্রাবিড় বা ডামিলভাষা এক্ষণে তামিল, তেলেগু, কানাড়া ও মলায়লম এই চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত মধ্য ভারতের পার্বত্য উপত্যকাসমূহে ও বালুচিস্থানে, দ্রাবিড়ভাষার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে বালুচিস্থানের ব্রহুই জাতিও দ্রাবিড়জাতীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে; ইহা হইতে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, আর্যোপনিবেশের পূর্বে দ্রাবিড়গণ আর্যগণের ন্যায় উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের পার্বত্যপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি প্রত্নবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত হল্ স্থির করিয়াছেন যে, এই দ্রাবিড়গণ অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে বাস করিয়া আসিতেছেন এবং ইঁহারাই খ্রিস্টের জন্মের তিন সহস্র বর্ষ পূর্বে বাবিরুষ অধিকার করিয়া বাবিরুষ ও আসুরের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। বাবিরুষ ও আসুরের প্রাচীন অধিবাসীগণ সেমিটিকজাতীয়। ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভিন্ন বংশজ সুমেরীয় জাতি এই আদিম অধিবাসীগণকে পরাজিত করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সুমেরীয়গণ প্রাচীন কীলকাক্ষরের (Cuneiform Script) সৃষ্টিকর্তা। বাবিরুষের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষমধ্যে প্রাচীন সুমেরীয় জাতির যে সকল প্রতিমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, তাঁহারা সেমিটিক অথবা আর্যবংশসম্ভূত নহেন। হল্ অনুমান করেন যে এই প্রাচীন সুমেরীয়জাতির অবয়ব ও মুখ বর্তমান কালের দাক্ষিণাত্যবাসী অর্থাৎ দ্রাবিড়জাতীয় হিন্দুগণের ন্যায়। তিনি অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষই দ্রাবিড়জাতির প্রাচীন আবাসভূমি; এবং এই ভারতবর্ষ হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে দ্রাবিড়জাতি উত্তর-পশ্চিম

---

(১৩) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ, পৃঃ ৬৬৩।

(১৪) শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।১।

সীমান্তের গিরিসংকটসমূহ অবলম্বনে প্রাচীন ঐরান ও বাবিরুষ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বাবিরুষ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তদ্দেশীয় আদিম অধিবাসীগণ অপেক্ষা সভ্যতর, তাঁহারা তখন ধাতব-অস্ত্রের ব্যবহারে অভ্যস্ত, অঙ্কিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন এবং নানাবিধ শিল্প তাঁহাদিগের আয়ত্ত হইয়াছে[১৫]।

প্রাচীন বাবিরুষবাসীগণের সহিত ভারতবাসী দ্রবিড় বা ডমিল জাতির অতি নিকট-সম্পর্ক ছিল এবং উত্তরাপথের পশ্চিমপ্রান্তে বালুচিস্থানে ব্রহুই জাতির অস্তিত্ব ও ভাষা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এক সময়ে সম্ভবত আর্যজাতির আক্রমণের পূর্বে আর্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে দ্রবিড়জাতির বিস্তৃত অধিকার ছিল। অধ্যাপক হল্ অনুমান করেন যে ভারতবর্ষই দ্রবিড়জাতির প্রাচীন বাসস্থান এবং তাঁহারা আর্যাবর্ত হইতে পশ্চিমে প্রয়াণকালে বালুচিস্থানে যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, আধুনিক ব্রহুই জাতি সেই ঔপনিবেশিকগণের বংশধর। দ্রবিড়জাতির সহিত প্রাচীন বাবিরুষবাসী সুমেরীয় জাতির যে নিকট সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই; তবে ইহাও সম্ভব যে দ্রবিড়গণ বাবিরুষ অধিকার করিয়া পরে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন আর্যগণের ন্যায় মধ্য এশিয়া অথবা উত্তর-এশিয়া তাঁহাদিগের প্রাচীন বাসস্থান ছিল।

আর্যোপনিবেশের পূর্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তাহারাই বোধ হয় ঋগ্বেদের দস্যু এবং তাহারাই ঐতরেয় আরণ্যকে বিজেতৃগণ কর্তৃক পক্ষী নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রাচীন দ্রবিড়জাতিই বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ আধুনিক বঙ্গবাসীগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাঁহারা দ্রবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মগধে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিগণকে আর্য জাতীয় অথবা আর্যসংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বঙ্গবাসীগণকে জাতিনির্বিশেষে দ্রবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা যাইতে পারে।

উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ আর্যগণ কর্তৃক বিজিত হইবার বহুকাল পরেও মগধ ও বঙ্গ স্বাধীন ছিল। যে সময়ে শতপথ ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে মিথিলায় আর্যোপনিবেশ স্থাপিত হইলেও, মগধ ও বঙ্গ আর্যজাতির নিকট মস্তক অবনত করে নাই। তখনও পর্যন্ত এই দেশদ্বয় আর্যাবর্তের সীমাভুক্ত ছিল না। প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ দেশে তীর্থযাত্রা বিনা অন্য কারণে গমন করিলে পাতিত্যদোষ জন্মিত ও পুনঃসংস্কার আবশ্যক হইত[১৬]। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌবীর প্রভৃতি দেশে গমন করিলে শুদ্ধিলাভার্থ যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিতে হইত[১৭]। পূর্বোক্ত নিষেধবাক্য দেখিয়া বোধ হয় যে, বৌধায়ন স্মৃতির রচনাকালেও বঙ্গ-মগধের প্রাচীন অধিবাসীগণ পিতৃপুরুষের পূজার্চনারীতির ও প্রাচীন দেবসমূহের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জন্যই গর্বিত আর্যগণ উক্ত দেশসমূহে গমন সম্বন্ধে নিষেধবাক্য প্রচার করিয়াছিলেন।

(১৫) H. R. Hall's *The Ancient History of the Near East*, *pp*. 171-174.

(১৬) অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ, ১ম খণ্ডে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ইহা মনুর বাক্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১ম অংশ পৃঃ ৫০, পাদটীকা ১)। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহা মানবধর্মশাস্ত্রের শ্লোক নহে—যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯।

(১৭) বৌধায়ন ধর্মসূত্র। ১।১।২।

প্রাচীন সাহিত্যে আর্যগণ কর্তৃক মগধ ও বঙ্গ অধিকারের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না সুতরাং কোন সময়ে আর্যজাতি বঙ্গ ও মগধ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সিংহলের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজয়সিংহ নামক বঙ্গদেশীয় কোনো রাজপুত্র সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার মূলে সত্য আছে কি না তাহা বলিতে পারা যায় না, তবে ইহা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে মগধে ও বঙ্গে আর্যসভ্যতা প্রচারিত হইয়াছিল। বিজয়সিংহ নাম অনার্য নাম নহে সুতরাং তাহার জন্মের পূর্বেই বঙ্গ-মগধের প্রাচীন অধিবাসিগণ পুরাতন ভাষা ও রীতিনীতি পরিত্যাগ করিয়া আর্যজাতীয় আচার ব্যবহার ও ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উৎস : বাঙ্গালার ইতিহাস

# বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

## অতুল সুর

বাঙালি বলতে আমরা মাত্র তাদেরই বুঝি যাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং যারা বাংলা দেশে এক বিশেষ সংস্কৃতির বাহক। তার মানে, বাংলার এক স্বকীয় ভাষা ও এক বিশেষ সংস্কৃতি আছে।

বাংলার স্বকীয় ভাষা হচ্ছে বাংলা। অন্যান্য রাজ্যের ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। এ ভাষার ভিত্তি স্থাপন করেছিল বাংলার আদিম অধিবাসীরা। তারা যে প্রাক্-দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোক ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেননা, বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্ত এই গোষ্ঠীর লোকদের ভাষার শব্দসমূহের প্রাচুর্য তার সাক্ষ্য বহন করছে। এই নরগোষ্ঠীর ভিত্তির ওপরই পরবর্তীকালে অন্যান্য নরগোষ্ঠীসমূহ স্তরীভূত হয়েছিল। এই অন্যান্য নরগোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত ছিল দ্রাবিড়-ভাষাভাষী, আর্য-ভাষাভাষী জাতিসমূহ ইত্যাদি। এদের সকলেরই ভাষা বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে।

[ দুই ]

প্রাক্-দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোকরাই বাংলার প্রকৃত আদিবাসী। তারা যে ভাষায় কথা বলে তাকে 'অস্ট্রিক' ভাষা বলা হয়। 'অস্ট্রিক' বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এই ভাষার বিস্তৃতি ছিল পঞ্জাব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত। ভারতে এই ভাষার বর্তমান প্রতিভূ হচ্ছে 'মুণ্ডারি' ভাষা—যে ভাষায় সাঁওতাল, ভীল, কুরুখ, কোরওয়া, জুয়াঙ, কোরফু প্রভৃতি উপজাতিরা কথা বলে। যদিও 'অস্ট্রিক' ভাষার শব্দ ভারতের সব ভাষার মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, তবুও বাংলা ভাষায় এর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তবে বাংলাভাষাও এদের ভাষার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

'অস্ট্রিক'-ভাষাভাষী লোকদের পরে এদেশে এসেছিল, দ্রাবিড়-ভাষাভাষী লোকরা। তারা ক্রমশ মিশে গিয়েছিল আদিম 'অস্ট্রিক'-ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে। দ্রাবিড়-ভাষাভাষী লোকদের পর এসেছিল আর্য-ভাষাভাষী এক নরগোষ্ঠী। এরা ইউরোপের 'আলপাইন' নরগোষ্ঠীর সমতুল। ভারতের বর্তমান জনতার মধ্যে এদের অস্তিত্ব প্রকাশ পায় পশ্চিমে বারাণসী থেকে পূর্বে বাংলা দেশ পর্যন্ত। তবে বাংলা দেশেই এই নরগোষ্ঠীর বংশধরদের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সেজন্য মনে হয় তারা সমুদ্রপথেই বাংলা দেশে এসেছিল এবং পরে এখানে বসতি স্থাপনের পর ক্রমশ পশ্চিমদিকে উত্তরপ্রদেশের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত

এগিয়ে গিয়েছিল। এরপর ভারতে এসেছিল আর্য-ভাষাভাষী আর এক নরগোষ্ঠী। তারা উত্তর-পশ্চিমের সীমান্তপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে পঞ্চনদের উপত্যকায় বসবাস শুরু করেছিল। এরাই রচনা করেছিল ঋগ্‌বেদ। এরা ক্রমশ পূর্বদিকে নিজেদের বিস্তৃত করেছিল বিদেহ বা মিথিলা পর্যন্ত। এখানে এসেই তারা প্রতিহত হয়েছিল প্রাচ্যদেশের লোকদের কাছে। প্রাচ্যদেশের লোকরা ছিল এক পৃথক সংস্কৃতির বাহক এবং শৌর্যবীর্যে তারা ছিল বৈদিক আর্যদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।

[ তিন ]

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রাচ্যদেশের আদিম অধিবাসীরা ছিল 'অস্ট্রিক'-ভাষাভাষী গোষ্ঠীর লোক। নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের প্রাক্-দ্রাবিড় বা আদি-অস্ত্রাল বলা হয়। এদের আদি-অস্ত্রাল বলবার কারণ হচ্ছে এই যে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙেগ এদের মিল আছে। দৈহিক গঠনের মিল ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এদের রক্তের মিলও আছে। মানুষের রক্ত সাধারণত চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়—'ও', 'এ', 'বি' এবং 'এ-বি'। ভারতের প্রাক্-দ্রাবিড় ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী এই উভয়ের রক্তেই 'এ' অ্যাগ্লুটিনোজেনের ('A' Agglutinogen) শতকরা হার খুব বেশি। তা থেকেই উভয়ের রক্তের সাদৃশ্য বোঝা যায়। এদের দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা খর্বাকার ও এদের মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারি। নাক চওড়া, ও চ্যাপটা, গায়ের রঙ কালো, মাথার চুল ঢেউ-খেলানো। তিনেভেলি জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সকল মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে এই শ্রেণির খুলিও আছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা 'নিষাদ' জাতির উল্লেখ পাই। সেখানে বলা হয়েছে যে এরা অনাস, এদের গায়ের রঙ কালো ও এদের আচার-ব্যবহার ও ভাষা অদ্ভুত। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের 'নিষাদ'রাই যে আদি-অস্ত্রালগোষ্ঠীর কোনও উপজাতি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মনে হয় এই মূলজাতির এক শাখা দক্ষিণভারত ত্যাগ করে সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও মেলেনেশিয়ায় যায় এবং সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হয়। যাহোক, বর্তমানে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের উপজাতিদের অধিকাংশই আদি-অস্ত্রালগোষ্ঠীর লোক। বাংলার আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, লোধা, ভূমিজ, মহালি, মুন্ডা, খেড়িয়া প্রভৃতি উপজাতিসমূহও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া হিন্দুসমাজের তথাকথিত 'অন্ত্যজ' জাতিসমূহও এই গোষ্ঠীর লোক।

[ চার ]

দ্রাবিড়-ভাষাভাষী লোকদের সঙেগ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাতিসমূহের মিল আছে বলে তাদের 'ভূমধ্যীয়' বা 'মেডিটেরেনিয়ান' নরগোষ্ঠীর লোক বলা হয়। এদের আকৃতি মধ্যমাকার এবং এদের মাথা লম্বা, গড়ন পাতলা, নাক ছোটো ও রঙ ময়লা। আদি-মিশরীয়দের সঙেগ এ জাতির বেশি মিল আছে। আদিতান্নালুর অঞ্চলে প্রাপ্ত সমাধিপাত্রে ও দক্ষিণভারতের সমাধিস্তূপগুলিতে যে সকল নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, তাদের অধিকাংশই 'ভূমধ্যীয়' নরগোষ্ঠীর লোক। বর্তমানে এই গোষ্ঠীর লোকদের দক্ষিণভারতেই প্রাধান্য দেখা যায়, যদিও এরূপ অনুমান করবার সপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে যে, একসময় এদের

বিস্তৃতি উত্তরভারত পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। বলা বাহুল্য, এরা ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলঅঞ্চলসমূহ থেকেই এদেশে এসেছিল। খুব সম্ভবত বৈদিক সাহিত্যে উক্ত 'পণি'রা এই গোষ্ঠীরই লোক ছিল।

[ পাঁচ ]

ভারতের আর্য-ভাষাভাষী লোকেরা দুই বিভিন্ন নরগোষ্ঠীতে বিভক্ত—(১) আল্‌পীয় (Alpine) ও (২) নর্ডিক (Nordic)। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমূলক প্রভেদ হচ্ছে মাথার আকার। আল্‌পীয়রা হ্রস্ব-কপাল জাতি, আর নর্ডিকরা দীর্ঘ-কপাল জাতি। মালভূমিতে বাস করলে যে সকল দৈহিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, হ্রস্ব-কপাল গোষ্ঠীর লোকরা সেইসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। অনুমান করা হয়েছে, যে মধ্য-এশিয়ায় যে পর্বতমালা আছে তারই নিকটবর্তী কোনো স্থানে হ্রস্ব-কপাল গোষ্ঠীর প্রথম জন্ম হয়েছিল। হ্রস্ব-কপাল গোষ্ঠীর লোকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা মধ্যমাকার, মাথার খুলি অপেক্ষাকৃত ছোটো ও চওড়া, খুলির পিছনের অংশ গোল, নাক লম্বা, মুখ গোল ও গায়ের রঙ ফরসা। মনে হয় এদের একদল এশিয়া-মাইনর বা বালুচিস্তান থেকে পশ্চিমসাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাদ ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌঁছায় এবং তাদের আর একদল পূর্ব-উপকূল ধরে বাংলা ও ওড়িশায় আসে। আরও মনে হয় তারা দ্রাবিড়দের অনুসরণে এসেছিল।

আর্য-ভাষাভাষী নর্ডিকরা ছিল উত্তর এশিয়ার তৃণভূমির অধিবাসী। খ্রিস্ট-পূর্ব দুহাজার থেকে এক হাজার বছরের অন্তর্বর্তী কোনও এক সময় এদের এক বড়ো ধারা স্থলপথে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তখন এদের সঙ্গে কাস্‌সুরা (Kassites) ছিল। এদেরই অন্য এক শাখা ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ ভারতের দিকে এগিয়ে আসে ও পঞ্চনদের উপত্যকায় পৌঁছে সেখানে বসতি স্থাপন করে। পঞ্জাব, কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশের উচ্চতর জাতিসমূহের মধ্যে এদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তবে উত্তরভারতে ভূমধ্যীয় জাতির সঙ্গে এদের সংমিশ্রণ সর্বত্রই স্পষ্ট। এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকার, মাথা বেশি লম্বা, নাক খুব সরু ও লম্বা এবং দৈহিক ওজন বেশ ভারী। ভারতের জনসমাজের মধ্যে নর্ডিক উপাদান পূর্বদিকে বারাণসী পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। তার পূর্বদিকে আল্‌পীয় উপাদানই বেশি।

[ ছয় ]

যদিও বাঙালি মিশ্র জাতি, তা হলেও উচ্চশ্রেণির বাঙালিরা হচ্ছে আর্য-ভাষাভাষী আল্‌পীয় নরগোষ্ঠীর লোক ও তারা উত্তরপ্রদেশের আর্য-ভাষাভাষী নর্ডিক নরগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক একখানি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে (অষ্টম শতাব্দীতে রচিত) বলা হয়েছে যে বাংলা দেশের আর্য-ভাষাভাষী লোকরা অসুরজাতিভুক্ত। এখন কথা হচ্ছে, এই অসুরজাতির লোকরা কারা এবং তারা কোথা থেকেই বা বাংলা দেশে এসেছিল? বৈদিক ও বেদোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যে 'অসুর' শব্দটির খুব ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় দেবগণের বিরোধী হিসাবে। অনেকে মনে করেন যে 'অসুর' বলতে আর্যপূর্ব যুগের দেশজ অধিবাসীদের বোঝায়। যদি অসুররা বৈদিক আর্যগণের আগমনের পূর্বে ভারতে এসে

থাকে, তাহলে তারা যে দেশজ, এই মতবাদ গ্রহণে কোনও আপত্তি নেই। বৈদিক সাহিত্যে আমরা 'দাস', 'দস্যু', 'নিষাদ', ইত্যাদি আরও অনেক দেশজ জাতির নাম পাই। সুতরাং বৈদিক আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বে এদেশে যে একাধিক জাতি বাস করত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এদের অনেককেই অনার্য ভাষাভাষী বলা হয়েছে। কিন্তু সকলেই যে অনার্য ভাষাভাষী ছিল তার সপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। বরং বৈদিক আর্যগণের ভারতে আগমনের পূর্বে আগত অ্যাল্পীয় নরগোষ্ঠীর লোকরা যে আর্য-ভাষাভাষী ছিল তার সপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে। যদি বৈদিক আর্য ও অসুররা উভয়েই আর্য-ভাষাভাষী হয় তাহলে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, ভারতে আগমনের পূর্বে উভয়ে একই সাধারণ বাসস্থানে বাস করত। এইস্থানে বাসকালে অসুরদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট জীবনচর্যা ও ধর্ম গড়ে উঠেছিল। এই জীবনচর্যা ও ধর্ম বৈদিক আর্যগণের জীবনচর্যা ও ধর্ম থেকে বহুলাংশে পৃথক ছিল। বৈদিক আর্যগণ ভারতে আগমনের পূর্বে অনেকগুলি নূতন দেবতার আরাধনার পত্তন করেছিল। এই নূতন দেবতাগণকে তারা 'দেইবো' (প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয়) বা 'দইব' (ইন্দো-ইরানীয়) বা 'দেব' (সংস্কৃত) নামে অভিহিত করত। আর আর্য-ভাষাভাষী অপর গোষ্ঠী তাদের আরাধ্যমণ্ডলীকে 'অসুর' নামে অভিহিত করত। এই পরম্পরা থাকার দরুন প্রাচীন পারসিকরা ও বৈদিক আর্যগণও তাদের অনেক দেবতাকে কখনও কখনও 'অসুর' নামে অভিহিত করত। বস্তুত প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে অসুরগণের যেমন নিন্দাবাদ ও কটাক্ষ প্রকাশ করা হয়েছে, তেমনই আবার দেব উপাসকগণের প্রধান আরাধ্য দেবতা ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণকে 'অসুর' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে দেব উপাসকগণ ও অসুর-উপাসকগণ উভয়েই কোনও সময় একই সাধারণ অঞ্চলে বাস করত।

প্রাচীন অস্‌সুর বা আসিরীয় রাষ্ট্রের প্রধান উপাস্য দেবতার নামও অসুর ছিল। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, আসিরীয়রাও আর্য-ভাষাভাষী লোক ছিল। এদের একাধিক রাজার নাম, যথা—অসুর-বানিপাল, অসুর-নসিরপাল, শলমেনেশ্বর, শ্যামশ্যাম-উকিন, অসুর-উবলিত, তাদের আর্যত্ব সূচিত করে।

আর্যরা যখন দেব-উপাসক ও অসুর-উপাসক এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল, তখন অসুর-উপাসকমণ্ডলীর প্রধান আরাধ্য হল বরুণ ও দেব-উপাসকগণের আরাধ্য হল ইন্দ্র। ক্রিস্টেনসেনের মতে যারা অপেক্ষাকৃত মার্জিত-রুচিসম্পন্ন ও চিন্তাশীল ছিল এবং যাদের জীবিকা ছিল মুখ্যত কৃষি ও গোপালন তারাই হয়েছিল অসুরপন্থী। আর যারা সভ্যতার মানদণ্ডে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধার দল ছিল তারা হয়েছিল দেবপন্থী। উত্তরকালে এই অসুরপন্থীরা এশিয়া মাইনর, ইরান ও ভারতে বসতি স্থাপন করে। আর দেবপন্থীরা উত্তর পশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে পঞ্চনদের উপত্যকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। দিলীপকুমার বিশ্বাস বলেছেন—বস্তুত বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশে 'অসুর' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশংসাসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অসুরপন্থীগণ যে উন্নত সভ্যতার অধিকারী, এরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিতও বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। মায়া বা ইন্দ্রজাল শক্তি বিশেষভাবে অসুরপন্থীগণের আয়ত্ত, এই ধারণা বৈদিক যুগেও ছিল। পরবর্তী মহাকাব্য-পুরাণাদিতে এটা আরও স্পষ্ট হয়েছে। স্থাপত্যবিদ্যাতে এদের অসাধারণ পারদর্শিতার কাহিনী সুবিদিত ও এই প্রসঙ্গে ময়াসুর বা ময়দানবের নাম উল্লেখযোগ্য।

[ সাত ]

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি নিরূপণ করতে গিয়ে স্যার হারবার্ট রিজলি বাংলার অধিবাসীবৃন্দকে মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বাঙালি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, চট্টগ্রামের রাজবংশী মগ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের মাল এবং জলপাইগুড়ি ও রংপুরের কোচ জাতিগণকে একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিয়েছিলেন, এবং যেহেতু বিস্তৃত-শিরস্কতা ও বিস্তৃতনাসিকা যথাক্রমে মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য এবং এই দুই লক্ষণ উচ্চশ্রেণির বাঙালি ব্যতীত উপরি-উক্ত অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়, সেই হেতু তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, তাদের এই দুই নৃতাত্ত্বিক লক্ষণ মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের নিকট হতে প্রাপ্ত। কিন্তু রিজলি বাংলার যে-সকল জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের সমষ্টিগত ফলের ওপর ভিত্তি করে উপরি-উক্ত মত প্রকাশ করেছিলেন, সেই সকল জাতি যদিও বাংলার রাষ্ট্রীয় গণ্ডির মধ্যে বাঙালির সঙ্গে বাস করত, তথাপি তারা সকলে বাঙালি বলতে যা বোঝায়, তা নয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলার উচ্চশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতিসমূহ চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের পার্বত্য উপজাতিগণের সঙ্গে এক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের রাজবংশী মগগণ (যাদের পরিমাপ রিজলি নিজের মত পোষণের জন্য বাঙালি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি জাতিগণের পরিমাপের সঙ্গে সংমিশ্রিত করেছিলেন), মোটেই বাংলা দেশের মৌলিক অধিবাসী নয়। তারা ইন্দোচীন নামক মঙ্গোলীয় পর্যায়ের অন্তর্গত এবং মাত্র কয়েক শত বর্ষ পূর্বে আরাকান দেশ থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছে। তাদের বিচিত্র সামাজিক সংগঠন, ও আহং, সেপোটাং, পাংডুং, থাফাসু, থিয়াংগা, প্রভৃতি অবাঙালি নাম থেকে সেটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। ঠিক এইভাবে, রংপুর ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের কোচগণ ঐতিহাসিককালে উত্তরবঙ্গবিজেতা মঙ্গোলীয় পর্যায়সম্ভূত কোচজাতির বংশধর মাত্র। পাইয়া, লেথবু, লবু, অলিঙ্গ, এন্না, তানডু, লোবাই প্রভৃতি এদের নামগুলিও সম্পূর্ণ অবাঙালির নাম। বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মালজাতিগণ রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চল হতে বাংলা দেশে এসে বসবাস করেছে এবং তারা সাঁওতাল পরগনার মালপাহাড়িয়া, মাল প্রভৃতি জাতি থেকে অভিন্ন। বাংলার সীমান্তাংশবাসী এই সমস্ত অবাঙালি উপজাতিসমূহের নৃতাত্ত্বিক লক্ষণগুলির ওপর ভিত্তি করে সমগ্র বাংলা দেশের জনগণের নৃতাত্ত্বিক পর্যায় নিরূপণ করা যে সম্পূর্ণ অসমীচীন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

[ আট ]

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় প্রথম প্রমাণ করতে প্রয়াস পান যে বাঙালি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে রিজলির মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পরে ডঃ বিরজাশঙ্কর গুহ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপ চন্দের মতবাদকে যে সমর্থন করে মাত্র তা নয়, বাংলা দেশের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতির ওপর নূতন আলোকপাত করে।

গুহ মহাশয় বাংলার রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ এবং চব্বিশ পরগনার পোদজাতির যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ নিয়েছিলেন, তা থেকে প্রকাশ পায় যে বাঙালি ব্রাহ্মণদের

মাথা গোলাকার (শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ৭৮.৯৩), নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত এবং দেহ-দৈর্ঘ্যের গড় ১৬৮০ মিলিমিটার। কায়স্থদের মাথা ব্রাহ্মণদের চেয়ে কিছু বেশি গোল (শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ৮০.৮৪), নাসিকা প্রায় সমানভাবেই উন্নত ও দীর্ঘ এবং দেহ-দৈর্ঘ্য সামান্য পরিমাণে কম (১৬৭০ মিঃ মিঃ)। পোদদের দেহ-দৈর্ঘ্য সর্বাপেক্ষা কম (১৬২৮ মিঃ মিঃ), মাথা কম গোল (শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ৭৭.১৬), মুখ ছোটো ও কম উন্নত। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের গায়ের রঙ বাদামি, কিন্তু পোদদের গায়ের রঙ গভীর বাদামি। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে গরিষ্ঠসংখ্যকের চোখ ঘোর বাদামি, কিন্তু পোদদের চোখ অধিক পরিমাণে কালো। চুলের রঙ সকলেরই কালো।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাঙালি জাতির বিস্তৃত কপাল ও প্রসারিত-নাসিকা দেখেই তারা দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয় জাতিসম্ভূত বলে রিজলি সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কিন্তু রিজলির এই মতবাদের সপক্ষে কোনো বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই। মঙ্গোলীয় জাতির আদিম অধিবাস ভারতবর্ষ নয়—ভারতবর্ষে তারা আগন্তুক মাত্র। সুতরাং পূর্বভারতের জাতিসমূহের বিস্তৃত-শিরস্কতা যদি মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে ঘটেছে বলে ধরে নিতে হয়, তা হলে এটা নিশ্চিত যে, মঙ্গোলীয় জাতি কর্তৃক বাংলা দেশে কোনো বৃহৎ আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু এরূপ কোনো আক্রমণ সম্বন্ধে ইতিহাস কোনো সাক্ষ্য দেয় না। অধিকন্তু বাঙালি জাতির আকৃতির মধ্যে এমন কোনো নৃতাত্ত্বিক লক্ষণ বা তাদের মধ্যে প্রচলিত এমন কোনো জনশ্রুতি বা কাহিনি নেই, যা দ্বারা তাদের মঙ্গোলীয় উৎপত্তি সমর্থিত হয়। পরন্তু, নেপাল ও আসামে এরূপ অনেক জনশ্রুতি আছে, এবং এটাও আমরা জানি যে, এসকল দেশের অধিবাসীবৃন্দ মঙ্গোলীয় নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

বাঙালি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে হরিবংশে (১১ অধ্যায়ে) যে কাহিনি আছে, সেই কাহিনি থেকে আমরা জানতে পারি যে পুরু (যযাতিপুত্র) বংশে বলি নামে এক রাজা ছিলেন। উক্ত রাজার পাঁচ পুত্র ছিল, তাদের নাম যথাক্রমে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, ও পুণ্ড্র। মহাভারতের আদিপর্বেও অসুর-রাজ বলির এই পাঁচ পুত্রের উল্লেখ আছে। বলিরাজের এই পাঁচ সন্তান যে পাঁচটি রাজ্য শাসন করতেন, তাঁদের নাম থেকেই সেই পাঁচটি রাজ্যের নামকরণ হয়েছিল। বলিরাজার এই পাঁচটি পুত্র 'বালেয় ক্ষত্রিয়' নামে অভিহিত হয়েছেন, ও তারাই চারি বর্ণের সৃষ্টি করেছেন। মৎস্য (৪৮।২৪।২৮) ও বায়ু পুরাণেও (৯৯।২৭) বলিরাজার এই পঞ্চপুত্রের উল্লেখ আছে। এখন কথা হচ্ছে এই যে, এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও রিজলি কেন বাঙালি জাতিকে মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলেন? আগেই বলা হয়েছে—তার প্রধান কারণ বাঙালি জাতির বিস্তৃত শিরস্কতা। কিন্তু এটা একমাত্র মঙ্গোলীয় জাতির বৈশিষ্ট্য নয়। বস্তুত বিস্তৃত শিরস্কতা ব্যতীত মঙ্গোলীয় জাতির নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা মঙ্গোলীয় জাতি ছাড়া অন্য জাতিসমূহের মধ্যে কখনও দেখা যায় না। যেমন, তাদের ঋজু সরল চুল, চোখের খাঁজ (epicanthic fold), গণ্ডাস্থির প্রাধান্য, পীতাভ গায়ের রং ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এই সমস্ত মঙ্গোলীয় লক্ষণ বাঙালিদের মধ্যে নেই। উপরন্তু, দীর্ঘশিরস্ক মঙ্গোলীয় জাতিও যথেষ্ট পরিমাণে ভারতের পূর্ব সীমান্তপ্রদেশে দেখতে পাওয়া যায়।

এটা সত্য যে বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দ মঙ্গোলীয় জাতিসম্ভূত। কিন্তু এ সম্পর্কে বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যদিও বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের

ভুটিয়া, লেপচা প্রভৃতি জাতিসমূহ বিস্তৃত-শিরস্ক, তথাপি উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে দীর্ঘশিরস্কতারই প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক তদ্রূপ, যদিও পূর্ব সীমান্তের মঙ্গোলীয় জাতিসমূহ দীর্ঘশিরস্ক, কিন্তু পূর্ব-বাংলার বাঙালিরা বিস্তৃত-শিরস্ক। কগিন ব্রাউন ও এস. ডব্লিউ. কেম্প পূর্ব সীমান্তের আরবজাতির যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে শতকরা গড়ে ৩২ জন দীর্ঘশিরস্ক ও মাত্র ৬ জন বিস্তৃত-শিরস্ক। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে পরস্পর সান্নিধ্য হেতু বাংলার অধিবাসী-বৃন্দের সঙ্গে যদি সীমান্ত প্রদেশস্থ মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের সংমিশ্রণ ঘটে থাকত, তা হলে উত্তরবিভাগে এটা বাঙালির বিস্তৃত-শিরস্কতায় ও পূর্ববিভাগে দীর্ঘ-শিরস্কতায় প্রতিফলিত হত। কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রকৃত নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি এর বিপরীত সাক্ষ্য বহন করে।

## [ দশ ]

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে পশ্চিম ও প্রাচ্য ভারতের বিস্তৃত-শিরস্ক জাতি-সমূহ একই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্গত এবং তারা উত্তরভারতের দীর্ঘশিরস্ক নৃতাত্ত্বিক পর্যায় থেকে পৃথক। পশ্চিম ও প্রাচ্য ভারতের এবং উত্তরপ্রদেশের জাতিসমূহের যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ নীচে দেওয়া হচ্ছে, তা থেকে এটা স্পষ্টই প্রকাশ পায়—

| জাতি | শির-সূচক সংখ্যা | নাসিকা-সূচক সংখ্যা | দেহদৈর্ঘ্য মিঃ মিঃ |
|---|---|---|---|
| নগর ব্রাহ্মণ | ৭৯·৭ | ৭৩·১ | ১৬৪৩ |
| গুজরাটি বেনিয়া | ৭৯·৩ | ৭৫·৭ | ১৬১২ |
| প্রভু কায়স্থ | ৭৯·৯ | ৭৫ ৮ | ১৬২৭ |
| *বাঙালি ব্রাহ্মণ | ৭৮·৮ | ৭০·৮ | ১৬৭৬ |
| *বাঙালি কায়স্থ | ৭৮·৪ | ৭০ ৭ | ১৬৩৬ |
| উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ | ৭৩·১ | ৭৪ ৬ | ১৬৫৯ |
| উত্তরপ্রদেশের কায়স্থ | ৭২ ৬ | ৭৪ ৮ | ১৬৪৮ |
| বিহারী ব্রাহ্মণ | ৭৪·৯ | ৭৩·২ | ১৬৬১ |

পশ্চিম ও প্রাচ্য-ভারতের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত সাদৃশ্য থাকা হেতু এরূপ সিদ্ধান্ত করা ব্যতীত উপায় নেই যে, অতি প্রাচীনকালে কোনো বিস্তৃত-শিরস্ক জাতির লোকেরা বহু সংখ্যায় গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের ন্যায় বাংলা দেশেও এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এরা কারা? এর জবাব দেওয়া খুবই সহজ।

---

* ড. বিরজাশঙ্কর গুহ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপ হচ্ছে—

| | | | |
|---|---|---|---|
| বাঙালি ব্রাহ্মণ | ৭৮৯ | ৬৭৯ | ১৬৮০ |
| বাঙালি কায়স্থ | ৮০৮ | ৬৮৯ | ১৬৭০ |

## [ এগারো ]

এই বিস্তৃত-শিরস্ক জাতির আদিম অধিবাস সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ চন্দ প্রথম সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পঞ্চনদের পশ্চিমে বালুচিস্তান ও আফগানিস্তানের বালুচ ও পাঠান জাতীয় লোকগণ আর্যভাষাভাষী এবং নাতিদীর্ঘশিরস্ক (measaticephalic); এদের মধ্যে দীর্ঘশিরস্কতা যথাক্রমে ইরানীয় ও তুরানীয় জাতিসমূহ হতে প্রাপ্ত, এই সিদ্ধান্ত করে স্যার হারবার্ট রিজলি এদের 'তুর্ক-ইরানি' পর্যায়ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু মধ্য-এশিয়ার পামির ও চৈনিক তুর্কিস্থানের জাতিসমূহের সম্পর্কে উজফালভি (Ujfalvy) ও স্যার অরেল স্টাইন (Sir Aurel Stein) যে নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করেছিলেন তার ফলে আমরা জানতে পারি যে, বালুচ ও পাঠান, গুজরাটি, মারাঠি, কুর্গ এবং বাঙালি ও ওড়িশার জাতিসমূহের বিস্তৃত-শিরস্কতার জন্য আমাদের তুর্ক, শক, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতিসমূহকে টেনে আনবার কোনো প্রয়োজন নেই। আগেই বলা হয়েছে যে তুর্ক, শক ও মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের নিজেদের যেসকল নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে, তা এসকল জাতিগণের মধ্যে মোটেই নেই। পরন্তু, পামির ও চৈনিক তুর্কিস্থানের জাতিসমূহের সঙ্গে এদের নৃতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়।

পামির ও চৈনিক তুর্কিস্থানের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে টি. এ. জয়েস (T. A. Joyce) যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করেছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাকলামাকান মরুদেশের চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশসমূহের জাতিগণের মধ্যে একটা মোটামুটি নৃতাত্ত্বিক ঐক্য আছে। এই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়টি আমরা বিশুদ্ধ অবস্থায় লক্ষ করি ওয়াখিগণের (Wakhis) মধ্যে। এই অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছে তার জটিলতার মধ্য দিয়ে লক্ষ করবার মতো বস্তু এই যে, পামির ও তাকলামাকান মরুদেশের আদিম অধিবাসীরা আলপাইন (Alpine) পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, কেবলমাত্র পশ্চিমে ইন্দো-আফগান পর্যায়ের সঙ্গে এদের কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে এই সকল অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসিবৃন্দের ওপর মঙ্গোলীয় জাতির প্রভাব নেই বললেই হয়। এই অঞ্চলের পর্যায়গুলির নৃতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি এরূপ—

প্রথম পর্যায় ঃ বিস্তৃত-শিরস্ক, গোলাপি আভাবিশিষ্ট গৌরবর্ণ ত্বক, দেহ-দৈর্ঘ্য গড়ের ওপর, পাতলা উন্নত দীর্ঘনাসিকা—তা সরল থেকে কুব্জ, লম্বা ডিম্বাকৃতি মুখ, বাদামি রঙের চুল—সাধারণত খুব ঘোর এবং তা প্রচুর ও ঢেউখেলানো; চোখ প্রধানত মধ্যম শ্রেণির। এরা লা পুজের (La Pouge) 'আলপাইন' পর্যায়ভুক্ত।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ বিস্তৃত-শিরস্ক, গায়ের রঙ ফরসা, কিন্তু সামান্য বাদামি আভাবিশিষ্ট; দেহ-দৈর্ঘ্য গড়ের ঊর্ধ্বে; নাক সরল, কিন্তু প্রথম পর্যায় অপেক্ষা বিস্তৃত; গণ্ডাস্থি চওড়া; চুল প্রথম পর্যায় অপেক্ষা সরল—তা ঘোর বর্ণ ও অপ্রচুর, চোখ কালো। এরা 'তুর্কি' পযায়ভুক্ত।

তৃতীয় পর্যায় ঃ নাতিদীর্ঘ-শিরস্ক, দীর্ঘ দেহ, পাতলা উন্নত কুব্জ নাসিকা, লম্বা ডিম্বাকৃতি মুখ, কালো ঢেউখেলানো চুল এবং কালো চোখ। এরা 'ইন্দো-আফগান' পর্যায়ভুক্ত।

## [ বারো ]

পামির ও চৈনিক তুর্কিস্থানের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি থেকে এটা স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে যে,

প্রাগৈতিহাসিক যুগে পামির ও তাকলামাকান মরু অঞ্চলে বিস্তৃত-শিরস্ক এক জাতি বাস করত। এরা পাশ্চাত্য ইউরোপে প্রচলিত ইটালো-সেলটিক ভাষার অনুরূপ এক আর্যভাষাভাষী ছিল এবং পশ্চিম ইউরোপের অধিবাসীবৃন্দ ওই একই বিস্তৃত-শিরস্ক পর্যায়-সম্ভূত বলে এদের নামকরণ করা হয়েছে 'আলপাইন' পর্যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে এবং বালুচিস্তানে এই পর্যায় বৈদিক আর্য ও দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে, তথায় নাতিদীর্ঘ শিরস্ক 'ইন্দো-আফগান' পর্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এই একই পর্যায় ভারতের অন্যত্রও আদিম অধিবাসীগণ (Proto-Australoid), বৈদিক আর্য এবং দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে নাতিদীর্ঘ পর্যায়ের সৃষ্টি করেছে। অনেকে মনে করেন যে 'আলপাইন' পর্যায়ভুক্ত বিস্তৃত-শিরস্ক জাতিসমূহ বৈদিক আর্যদের অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে এসে আর্যাবর্তের দেশসমূহ বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক অধিকৃত দেখে পশ্চিম উপকূল ধরে নেমে এসে মধ্যভারতের মালভূমির ভিতর দিয়ে গঙ্গানদীর নিম্ন উপত্যকায় গিয়ে বসবাস করে। তাদেরই অপর এক শাখা কাথিয়াবাড়, গুজরাট ও পশ্চিম ভারতে বসবাস শুরু করে। কিন্তু অপরপক্ষে, এরূপ সিদ্ধান্ত করবার সপক্ষেও যথেষ্ট কারণ আছে যে, আলপাইন পর্যায়ভুক্ত একদল এশিয়া মাইনর বা বালুচিস্তান থেকে পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাদ ও তামিলনাডু প্রদেশে পৌঁছায় এবং তাদের আর একদল পূর্ব-উপকূল ধরে বাংলা ও ওড়িশায় আসে। আরও মনে হয়, তারা দ্রাবিড়দের অনুসরণে সমুদ্র পথে আর্যদের পূর্বে ভারতে এসে পৌঁছেছিল।

[ তেরো ]

বাঙালি যে মঙ্গোলীয় জাতিসম্ভূত নয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা দিয়েছি। দ্রাবিড় জাতির সঙ্গেও তাদের খুব বেশি রক্ত-সম্বন্ধ নেই। রিজলির সময়ে দ্রাবিড় জাতিগণকেই ভারতের আদিম অধিবাসী বলে মনে করা হত। এবং সেজন্যই তিনি বাঙালির নৃতাত্ত্বিক গঠনে দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণ আছে, এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়েছে যে আর্যভাষীগণের ন্যায় দ্রাবিড় জাতিগণও ভারতে আগন্তুক মাত্র। তাদের পূর্বে ভারতে প্রাক্-দ্রাবিড় (Pre-Dravidians) বা আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) জাতিসমূহ বাস করত এবং তারাই ভারতের আদিম অধিবাসী। এদেরই আমি এই বইয়ে 'অস্ট্রিক' ভাষাভাষী জাতি বলে অভিহিত করেছি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এদের 'কোল' জাতি বলে অভিহিত করেছেন। তাদের বংশধরগণকেই আজ আমরা ভারতের বনে, জঙ্গলে ও পার্বত্য অঞ্চলসমূহে দেখতে পাই। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, নিম্ন সম্প্রদায়ের বাঙালির মধ্যে বেশকিছু পরিমাণ প্রাক্-দ্রাবিড় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

তবে উচ্চশ্রেণির বাঙালি যে আলপাইন পর্যায়ভুক্ত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জগতের সমস্ত নৃতত্ত্ববিদ এটা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছেন। একথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আজ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণির বাঙালির মধ্যে যে সকল পদবি প্রচলিত আছে (যেমন ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, দেব, কর, গুপ্ত, নাগ, পাল, সেন, চন্দ্র, প্রভৃতি) এক সময় ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। ডঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম ভারতে ওই একই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্গত নগর ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও ঠিক অনুরূপ পদবির প্রচলন আছে। বোধ হয় এক সময়ে এগুলি আলপাইন পর্যায়ের উপশ্রেণির

(tribes) নাম বিশেষ ছিল, এবং পরে বর্ণসৃষ্টির সময়ে সেগুলি জাতিবাচক পদবি হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। সে যাই হোক, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কিত এই আলোচনার ফলে এটা পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে যে, বাঙালি রিজলির তথাকথিত মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড়-গোষ্ঠী সম্ভূত নয়।

[ চৌদ্দ ]

এযাবৎ আমরা 'নৃতাত্ত্বিক পর্যায়'-এর কথা বলছিলাম। কিন্তু 'নৃতাত্ত্বিক পর্যায়' বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি, তার একটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। 'নৃতাত্ত্বিক পর্যায়' বলতে আমরা এমন এক জনসমষ্টিকে বুঝি যাদের সকলের মধ্যেই জীনকণা (genes) ও 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' ভিত্তিক কতকগুলি বিশিষ্ট অবয়বগত সাদৃশ্য আছে। অবয়বগত কোন্ কোন্ সাদৃশ্য থাকলে, আমরা কোনো এক বিশেষ শ্রেণির জনসমষ্টিকে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত করব, সে সম্বন্ধে সুধীজনের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যে সকল লক্ষণ সুধীজন একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, সেগুলি হচ্ছে—

১. মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও রং।
২. গায়ের রং।
৩. চোখের রং ও বৈশিষ্ট্য।
৪. দেহের দীর্ঘতা।
৫. মাথার আকার।
৬. মুখের গঠন।
৭. নাকের আকার।
৮. শোণিত বর্গ বা blood groups।

এই লক্ষণগুলির মধ্যে মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য প্রধানতম। চুলের বিশিষ্টতার দিক দিয়ে মানুষের চুলগুলিকে সাধারণত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। প্রথম, ঋজু বা সোজা চুল (straight hair)। এটা মঙ্গোলিয়ান জাতিসমূহের লক্ষণ। দ্বিতীয়, কুঞ্চিত বা কোঁকড়া চুল (woolly hair)। এটা নিগ্রোজাতির লক্ষণ। তৃতীয়, তরঙ্গায়িত বা ঢেউখেলানো চুল (smooth, wavy or curly hair)। এটা জগতের অবশিষ্ট জাতিসমূহের লক্ষণ। অনেকসময় অনেক পুরুষের (generations) রক্তের সংমিশ্রণে চুলের এই বাহ্যবৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু খণ্ডিত চুলকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে, তার মৌলিক নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত বৈশিষ্ট্য পুনরায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। খণ্ডিত চুলকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কিভাবে পরীক্ষা করা হয়, এবং তার কী কী লক্ষণ পেলে তাকে কোনো বিশেষ নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত করা হয়, সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা এ স্থলে সম্ভবপর নয়। তবে যারা উৎসাহী তারা এ সম্বন্ধে সাঁ-মার্তাঁর (St. Martin) বই পড়ে নিতে পারেন।

চুলের এবং চোখের রং অপেক্ষা নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ গায়ের রঙের উপর বেশি জোর দিয়ে থাকেন। যদিও এটা দেখা গিয়েছে যে কালো রঙের সঙ্গে কালো চুলের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু কালো চুলের সঙ্গে কালো চোখের এরূপ কোনো পারস্পরিক সাহচর্য সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় না। সাধারণত গায়ের রং অনুযায়ী মানুষকে তিন শ্রেণিতে

বিভক্ত করা হয় ঃ ফরসা সাদা রং, ময়লা বা কালো রং ও পীত রং। অবশ্য এই তিন শ্রেণির আবার বহু উপবিভাগ আছে।

দেহের দীর্ঘতা অনুযায়ী মানুষকে পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথা—

১. বামন (pygmy)—উচ্চতা ১৪৮০ মিলিমিটারের কম।

২. খর্বাকৃতি বা বেঁটে (short)—উচ্চতা ১৪৮০ মিলিমিটার থেকে ১৫৮১ মিলিমিটার।

৩. ম্যধমাকৃতি বা মাঝারি (medium)—উচ্চতা ১৫৮২ মিলিমিটার থেকে ১৬৭৬ মিলিমিটার।

৪. দীর্ঘ (tall)—১৬৭৭ মিলিমিটার হতে ১৭২০ মিলিমিটার।

৫. অতিদীর্ঘ (very tall)—১৭২১ মিলিমিটারের উপর।

নৃতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য মানুষের মাথার আকার এক সূচক-সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই সূচক-সংখ্যাকে cephalic index বা শির-সূচকসংখ্যা বলা হয়। মাথার দীর্ঘতার (সম্মুখভাগ nasion হতে পশ্চাদ্‌ভাগ occiput পর্যন্ত) তুলনায় মাথার চওড়ার দিকের মাপের শততমাংশিক অনুপাতকেই cephalic index বলা হয়। এই অনুপাত অনুযায়ী মানুষের মাথাকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা—

১. লম্বা মাথা বা দীর্ঘশিরস্ক (dolicho-cephalic)—অনুপাত ৭৫ শতাংশের কম।

২. মাঝারি মাথা বা নাতিদীর্ঘশিরস্ক (mesaticephalic)—অনুপাত ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশের কম।

৩. গোল মাথা বা বিস্তৃতশিরস্ক (brachy-cephalic) অনুপাত ৮০ শতাংশ বা ততোধিক।

নাকের আকারের পরিমাপও ঠিক মাথার আকারের পরিমাপ-প্রথার অনুরূপ। নাকের দীর্ঘতার (নাকের মাথা থেকে তলা পর্যন্ত) তুলনায় নাকের চওড়ার (তলদেশ) দিকের মাপের শততমাংশিক অনুপাতকে nasal index বা নাসিকা-সূচক সংখ্যা বলা হয়। এই অনুপাত অনযায়ী মানুষের নাককে তিন শ্রেণিতে পর্যায়ভুক্ত করা হয়। যথা—

১. লম্বা সরু নাক (leptorrhine)—অনুপাত ৫৫ শতাংশ হতে ৭৭ শতাংশ।

২. মাঝারি নাক (mesorrhine)—অনুপাত ৭৮ শতাংশ হতে ৮৫ শতাংশ।

৩. চওড়া নাক (Platyrrhine)—অনুপাত ৮৬ শতাংশ হতে ১০০ শতাংশ।

নৃতাত্ত্বিক পর্যায় নির্ণয়ের জন্য রক্তের চারিত্রিক গুণও পরীক্ষা করা হয়। দানা বাঁধা (agglutination) গুণের দিক থেকে রক্তকে 'O', 'A', 'B', 'AB', 'M', 'N', Rh possitive ও negative, ও জীবাণু-প্রতিরোধক শক্তি উৎপাদনের দিক থেকে 'A'-বর্গের রক্তকে $A_1$ ও $A_2$ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যখন দুই নরগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তের চারিত্রিক মিল থাকে, তখন তাদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক জ্ঞাতিত্ব আছে বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ডি. এন. মজুমদার যে সমীক্ষা করেছিলেন, তা থেকে জানা গিয়েছিল যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও নমশূদ্রদের মধ্যে 'O'-বর্গের রক্তই প্রধান। কায়স্থদের মধ্যে 'B'-বর্গের রক্ত প্রধান। বণিকদের মধ্যে 'O', ও 'B' এই উভয়বর্গের রক্ত সমানভাবে ব্যাপ্ত। শঙ্খবণিক

ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে 'A'-বর্গের রক্ত প্রধান। এবং মুসলমানদের মধ্যে 'O', 'A', ও 'B' এই তিন বর্গের রক্তই সমানভাবে বিদ্যমান। পরে ডি. কে. সেন এ সম্বন্ধে যে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন, তা থেকেও জানা গিয়েছিল যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'O'-বর্গের রক্তই প্রধান। কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যেও তাই। কিন্তু অন্যান্যদের মধ্যে 'B'-বর্গের রক্তই প্রধান।

বর্তমানে, আঙগুলের রেখাবিন্যাসের মিল দ্বারাও নৃতাত্ত্বিক সম্পর্কের নৈকট্য নির্দেশ করা হচ্ছে।

তবে একথা এখানে বলা আবশ্যক যে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ভুক্ত করবার জন্য অবয়বের কোনো এক বিশেষ লক্ষণের উপর নির্ভর করেন না। উপরি-উক্ত সমস্ত অবয়ব-লক্ষণের সমষ্টিগত ফলের উপর নির্ভর করেই তাঁরা নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ভুক্ত করবার জন্য কোনো এক বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য তাঁরা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বহুসংখ্যক লোকের পরিমাপ গ্রহণ করেন।

*বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন*, সাহিত্যলোক, ১৯৯৪

# বাংলার আদিবাসী

## সুবোধ ঘোষ

১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে বাংলার আদিবাসী ও উপজাতীয় সমাজের জনসংখ্যা হল :

বাংলার সমস্ত জিলায় : ১৬৫৫৯৯৭ কুচবিহার রাজ্য : ২৪৩৫
পার্বত্য চট্টগ্রাম : ২৩৩৩৯২ ত্রিপুরা রাজ্য : ৩৩৬৩৩
সিকিম : ৬৩২০৬

র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার ফলে বাংলা প্রদেশ দুভাগ হয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ প্রদেশের আদিবাসী ও উপজাতীয়ের জনসংখ্যা যথাক্রমে দাঁড়িয়েছে :

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ : ১৩৬৮৭৮০ পূর্ববঙ্গ প্রদেশ : ২৮৭২১৭

সমগ্র ভৌগোলিক পূর্ববঙ্গ ধরলে উক্ত প্রাদেশিক হিসাবের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীর জনসংখ্যা এবং শ্রীহট্ট জেলার একাংশের আদিবাসী জনসংখ্যাও যুক্ত হবে। এই হিসাব ধরলে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ববঙ্গের সমগ্র আদিবাসী ও উপজাতীয়ের জনসংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষের কিছু অধিক। আর মাত্র কুচবিহার রাজ্য নিয়ে সমগ্র ভৌগোলিক পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী ও উপজাতীয়ের জনসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১৪ লক্ষ।

১৯৪১ সালের সেন্সাস অর্থাৎ আদমসুমারির রিপোর্টে যেসব আদিবাসী বা উপজাতি গোষ্ঠীর নাম ও জনসংখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেটাই কিন্তু সব নয়। ১৯৪১ সালের এই হিসাব বস্তুত 'উপজাতীয় ভাষী' জনসংখ্যার হিসাব। উপজাতীয় ভাষায় যত সংখ্যক লোক কথা বলে, এটা তারই হিসাব।

কিন্তু আর একটা কথা আছে। ভারতের অন্যান্য অংশের মতো বাংলাদেশেও* এমন অনেক গোষ্ঠী আছে যারা বংশের দিক দিয়ে উপজাতীয় আদিবাসী, কিন্তু তাদের মাতৃভাষা বর্তমানে প্রাদেশিক ভাষা হয়ে গেছে। সুতরাং বাংলাদেশের প্রকৃত আদিবাসী সমাজের জনসংখ্যার হিসেব নিতে হলে শুধু ভাষাগত বিচার করলেই চলবে না। ভাষা যা-ই হোক সামাজিক ভাবে যারা উপজাতীয় গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন করছে, তাদের আদিবাসী বা উপজাতীয়

*এখানে বাংলাদেশ বলতে অবিভুক্ত পূর্বাংশে বোঝানো হয়েছে, বর্তমানেব বাংলাদেশ রাষ্ট্র নয়।

বলেই গ্রহণ করা উচিত। কারণ, সাধারণ নিম্নশ্রেণির হিন্দুসমাজ এবং আদিবাসী সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্য খুব বেশি নয়। এমনকি ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়েও উভয়ের মধ্যে খুব বেশি উৎকর্ষ বা অপকর্ষের তারতম্য দেখা যায় না। পার্থক্য হল উভয়ের সামাজিক গঠনের পার্থক্যের মধ্যে। আদিবাসীরা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করে, আর নিম্নশ্রেণির হিন্দুর মধ্যে প্রকৃত গোষ্ঠীবদ্ধতা নেই।

বাংলা দেশে আবার এমন কয়েকটি সমাজ আছে, যারা কোনো কালে গোষ্ঠীবদ্ধ আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজই ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাদের মধ্যে উপজাতীয়ত্ব এবং গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের কোনো নিদর্শন নেই এবং ধর্মে ভাষায় ও সামাজিক আচারে এরা আজ হিন্দু। নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে তারা আদিবাসী হলেও সামাজিক দিক দিয়ে তারা হিন্দু।

দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন উপজাতীয় আদিবাসী সমাজ এবং বৃহত্তর হিন্দুসমাজ—উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রণের যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বহুকাল হল চলে আসছে, তার বিভিন্ন অপরিণত অর্ধপরিণত ও পরিণত রূপ হল বাংলার বিভিন্ন আদিবাসী সমাজ। সুতরাং বাংলার আদিবাসী সমাজের কুলজি বিচার করে তিনটি পর্যায় দাঁড় করানো যেতে পারে :

(১) বংশ হিসাবে আদিবাসী, যাদের ভাষা উপজাতীয়, সমাজও উপজাতীয় অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধ।

(২) বংশ হিসাবে আদিবাসী, যাদের ভাষা প্রাদেশিক অথচ সমাজ উপজাতীয় গোষ্ঠীবদ্ধ স্তরেই আছে।

(৩) বংশ হিসাবে আদিবাসী, যারা প্রাদেশিক হিন্দুর ভাষা এবং হিন্দুর সমাজ গ্রহণ করে একটা 'জাত' হয়ে গেছে। অর্থাৎ আদিবাসী হয়েও যাদের ভাষা উপজাতীয় নয়, সমাজও উপজাতীয় গোষ্ঠীবদ্ধতার মধ্যে আর নেই।

হিন্দু সমাজভুক্তির এই প্রক্রিয়ার মধ্যে 'ধর্মে'র স্থানও অবশ্যই আছে। কিন্তু ধর্ম দ্বারা ঠিক উপজাতীয়ত্ব বা আদিবাসিত্ব নির্ণয় করা যায় না। এর কারণ, পূর্ব অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে।* বস্তুত আদিবাসীর ধর্মকে হিন্দু ধর্মেরই একটি রূপ বলতে কোনো বাধা নেই। এবং খাঁটি উপজাতীয় আদিবাসীরাও নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে আপত্তি করে না। বিভিন্ন আদমসুমারির রিপোর্টের দিকে তাকালেই এই বিশেষ সত্যটি উপলব্ধি করা যায়। বহু আদিবাসী আছে, যাদের ভাষা এবং সমাজ দুইটি খাঁটি উপজাতীয় স্বরূপে রয়েছে, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে তারা নিজেকে হিন্দু বলতে দ্বিধা করে না।

আদিবাসীর উপজাতীয় ধর্ম ও হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিক ঐক্য সম্বন্ধে ডাঃ হাটনের সমাজ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মিঃ এলুইনও জোর করেই বলেছেন যে, ভারতের সমস্ত আদিবাসীর ধর্মকে হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত বলেই গণ্য করা উচিত। শুধু আসামের আদিবাসী ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কোনো অভিমত দেননি। ভারতের আদিবাসীকে ধর্মের দিক দিয়ে (Theologically) তিনি হিন্দু বলে মনে করেন, এবং রাজনীতির দিক দিয়েও আদিবাসীকে হিন্দু বলে গণ্য করতে তিনি রাজি আছেন। এ সত্ত্বেও ঠিক ডাঃ হাটনের মতোই কে জানে কীসের জন্য অখুশি হয়ে মিঃ এলুইনও আদিবাসীর ধর্মকে

*এখানে লেখকের 'ভারতের আদিবাসী' গ্রন্থের পূর্ব অধ্যায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

হিন্দুধর্ম থেকে একটা বিশিষ্ট ও পৃথক ব্যাপার (A distinct and apart) বলেছেন। কেন পৃথক? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি আদিবাসীদের বিশিষ্ট কতগুলি ধর্মসংস্কারের নাম করেছেন যেগুলি ঠিক হিন্দুত্বের সঙ্গে খাপ খায় না। যথা—গোরু বলি, অপদেবতার পূজা, ধর্মানুষ্ঠানে রক্ত ও মদ্যের ব্যবহার ইত্যাদি।

মিঃ এলুইনের মন্তব্যের মধ্যে আমরা দুটি সত্যের প্রমাণ পাই। প্রথম, আদিবাসীদের ধর্মনীতি সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে, এবং দ্বিতীয়, হিন্দুধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও ধারণা নেই। হিন্দুধর্ম যদি একটা খারাপ ধর্ম বলেও তিনি মনে করেন, তবুও তাঁর জানা উচিত যে, এই ধর্মের নীতি ও সংস্কারের একটা গণ্ডিবদ্ধ রূপ নেই। যদি হিন্দুধর্মকে খারাপ বলেই ধরা হবে, তবে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ কবিতার বর্ণনার মতোই মাত্রাহীন ব্যাপকতার দ্বারাই এই হিন্দু ধর্ম খারাপ—'কী না আছে হিন্দুধর্মে কী না আছে ভাই।' আদিবাসীদের যেসব বিশিষ্ট ও পৃথক (distinct apart) সংস্কারের কথা তিনি উল্লেখ করছেন, খোঁজ করলে দেখবেন সেসবই হিন্দু সমাজের বিভিন্ন জাত পাত গোষ্ঠী পন্থীর কোনো না কোনো সমাজে ধর্ম সংস্কাররূপেই চলছে। হিন্দুসমাজের মধ্যেই যে শত শত সম্প্রদায়, শ্রেণি, আশ্রম ও জাত রয়েছে—এত বিভিন্ন ও বিচিত্র শাক্ত, সৌর গাণপত্য, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক ও তান্ত্রিক রয়েছে—যারা পরস্পর থেকে বিশিষ্ট এবং পৃথক, কি তারাই আবার অন্যদিক দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এবং তারা হিন্দুই।

আদিবাসীকে এত ঘনিষ্ঠরূপে হিন্দু বলে বুঝতে পেরেও মিঃ এলুইন কেন যে তাদের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যগুলির ওপর এত জোর দিয়েছেন, তার কারণ ঠিক বোঝা যায় না, আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা? হিন্দুসমাজের কুপ্রথাগুলি যাতে তারা গ্রহণ না করে তার জন্যে সাবধানতা? এই যদি মিঃ এলুইনের উদ্দেশ্য হয়, তবে ভালোই। কিন্তু তার জন্যে আদিবাসীকে পৃথক করে ধরবার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ সমস্ত সমস্যাটাই মোটামুটিভাবে 'হিন্দুর সামাজিক সমস্যা', আদিবাসী সমস্যা তারই একটি অংশ মাত্র। হিন্দু সমাজের সব সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এক নয়, এবং হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট্য হল বহু সংস্কৃতির সমাবেশ। নিজের সংস্কৃতি বিসর্জন না দিয়েই আদিবাসীরা হিন্দুসমাজে আসতে পারে এবং এসেছেও। হিন্দুর সামাজিকতা আর খ্রিষ্টীয় সামাজিকতার মধ্যে এইখানে একটা বড়ো পার্থক্য। হিন্দুসমাজের সংস্কৃতি প্রযোজিত শিল্পের (Directorial Art) মতো—একই দেহে বিভিন্ন অলংকারের পরিসজ্জার মতো একই সময়ে বিভিন্ন বৈচিত্র্যপ্রবণ সংস্কৃতির সমাবেশ। অপরের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করে অথবা অপরের সংস্কৃতিকে সর্বদা রূপান্তর করিয়ে দিলেই যে জাতিগত সংমিশ্রণ সহজ হয়, হিন্দু সমাজ এই সাংস্কৃতিক ফ্যাসিজমের পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। হিন্দুসমাজ আদিবাসীর সংস্কৃতিকে 'গ্রাস' করতে চাইলে অবশ্য পরিণাম খারাপ হবে, এবং যেখানে যতটুকু গ্রাসের ব্যাপার হয়েছে সেটাও খ্রিস্টীয় মিশনারি সংঘের মতো হিন্দু সমাজের টাকার জোরে বা গায়ের জোরে হয়নি। আদিবাসী বাধ্য হয়েই এই ভুল করেছে। মিঃ এলুইনের সিদ্ধান্ত যদি সত্য বলেও মেনে নেওয়া হয়, তবুও সমস্যাটা ঠিক মিঃ এলুইনের কথিত সাংস্কৃতিক সমস্যা নয়, হিন্দুসংস্পর্শঘটিত অধঃপতনের সমস্যাও নয়। মূলত অর্থনৈতিক সমস্যা। আদিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নতি যদি সম্ভব করা যেতে পারে তবে নিজেদেব সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ভালমন্দ বিচার করা তাদের কাছে সহজ হয়ে

উঠবে। মিঃ এলুইনের আরও জানা উচিত, আদিবাসীর অর্থনৈতিক সমস্যার কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকলেও বিষয়টা বৃহত্তর এবং সমগ্র হিন্দু জনসাধারণের অর্থনৈতিক সমস্যার একটা অংশ।

আদিবাসীদের সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাসে আর একটি ব্যাপার বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য। দেখা গেছে যে, হিন্দুসমাজের পক্ষে থেকে মিশনারি প্রথায় ধর্মান্তরিত করার কোনো উদ্যোগ না থাকলেও বহুকাল থেকে আপনা হতেই আদিবাসীরা হিন্দুর ধর্ম ও সমাজে চলে আসছে। আর, খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে কিছু কিছু আদিবাসী খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। কিন্তু ইসলাম আদিবাসী মনের ওপর কোনো আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। নিম্নশ্রেণির লক্ষ লক্ষ হিন্দুর ওপর ইস্‌লামের প্রতিক্রিয়া খুবই সফল হয়েছে, বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ করার বিষয় হল আদিবাসীরা কখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। ভারতে যখন মুসলমান রাজশক্তি ছিল, তখনও মোল্লা সমাজের দ্বারা চালিত ধর্মান্তরকরণের উদ্যোগ আদিবাসীদের কাছে এসে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

বাংলা দেশে বাস করে যেসব বিভিন্ন আদিবাসীগোষ্ঠী, তারা নৃতত্ত্ব ভাষা ও সামাজিকতায় পরস্পর থেকে বিভিন্ন। এদের মধ্যে অধিকাংশকেই বাংলা দেশের বাইরের লোক বলা যেতে পারে। বহু অতীত থেকে বাংলায় বসতি করে আসছে, এমন আদিবাসী গোষ্ঠীর সংখ্যা কম এবং এ ধরনের যারা আছে তারা আজ ভাষা, ধর্ম ও সমাজে একরকম হিন্দু হয়েই গেছে। বাংলা দেশে 'আগন্তুক' এই আদিবাসী সমাজকে তাদের মূল ভৌগোলিক অধিষ্ঠান হিসাবে চার শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) সাঁওতাল ওঁরাও মুণ্ডা প্রভৃতি যারা ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যা অঞ্চল থেকে এসে বাংলায় বসতি করেছে।

(২) উত্তর পূর্ব সীমান্তের চিন-মঙ্গোলীয় বংশের-উপজাতীয় গোষ্ঠী, যারা আসামের দিক থেকে এসে বাংলায় বসতি করেছে। উদাহরণ—গারো, কাছাড়ি, হদি প্রভৃতি।

(৩) উত্তরের হিমালয় অঞ্চলের তিব্বতি মঙ্গোলীয় বিভিন্ন উপজাতির গোষ্ঠী যারা দার্জিলিং জলপাইগুড়ি অঞ্চলে এসে বসতি করেছে। উদাহরণ—ভোটিয়া, গুরুং, লেপ্‌চা, নেওয়ার প্রভৃতি।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা প্রভৃতি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের কুকি প্রভৃতি সমাজ যারা আরাকান ও বর্মার চিন-পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চল হতে এসে বসতি করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে যদিও এরা 'আগন্তুক', কিন্তু সেটা বহু অতীতের ঘটনা, আজ তারাই প্রকৃত স্থানীয় অধিবাসী এবং তারাই উক্ত অঞ্চলের বৃহত্তম সমাজ।

## বাঙলার বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সামাজিক পরিচয়

১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে বাংলা দেশে (সিকিম, কোচবিহার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা রাজ্য সমেত) মোট ২০টি গোষ্ঠীর নাম ও জনসংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু মাত্র ভাষার ভিত্তিতেই এই কটি আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজ ধরা হয়েছে। প্রকৃত আদিবাসী সমাজের সংখ্যা আরও বেশি। এ বিষয়ে বরং ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে আরও বিশদ এবং বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, যারা সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ।

উপজাতীয় বিভিন্ন ভাষা অনুসারে ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বাংলা দেশে আদিবাসীদের যে বিশটি সমাজের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তারা হল ঃ

ভোটিয়া, চাকমা, দামাই, গুরুং, হদি, কামি, খাস, কুকি, লেপচা, লিম্বু, মংগর, মেচ, ম্রু, মুণ্ডা, নেওয়ার, ওরাওঁ, সাঁওতাল, সারকি, সুনুওয়ার, টিপ্‌রা।

কিন্তু ভাষা অনুসারেই এই তালিকা নির্ভুল নয়। ভাষা অনুসারে সমাজ বিভাগ করলে আরও কয়েকটি বিশেষ আদিবাসী সমাজের নাম উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। যথা খন্দ, লুসাই ইত্যাদি। খন্দ গোষ্ঠীর আদিবাসী বাংলা দেশে আছে এবং তাদের নিজস্ব ভাষাও আছে—খন্দি বা কন্ধি বা কুই। লুসাইও একটি বিশিষ্ট ভাষা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লুসাই ভাষাকে ছাত্র ও পরীক্ষার্থীর 'মাতৃভাষা' রূপে স্বীকারও করেছে।

অথচ ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের এই তালিকায় চাকমা সমাজের নাম স্থান পেয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা সমাজও মূলত বাংলাভাষী, সে ভাষাটি, বাংলারই একটি উপভাষা।

আরও প্রশ্ন উঠবে উপজাতীয় ভাষী হদি সমাজের নাম যদি উল্লেখ করা হল, তবে ময়মনসিংয়ের গারো হাজং কাছাড়ি প্রভৃতি বিশিষ্ট উপজাতীয় ভাষী সমাজের নাম কেন উল্লেখ করা হল না?

যদিও হদি হাজং ও গারো কাছাড়ি এদের প্রত্যেকের উপভাষা (Dialect) একই বোড়ো (কাছাড়ী) ভাষা গ্রুপের অন্তর্গত, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জনসংখ্যার হিসাব। বাংলার গারো ও হাজং-এর সমগ্র জনসংখ্যা কি হদি জনসংখ্যার মধ্যেই এক করে ধরা হয়েছে? তা ধরা হয়নি।

ভোটিয়া, দামাই, গুরুং, খাস, কামি, লেপ্‌চা, লিমবু, মংগর, মেচ, নেওয়ার, সারকি, সুনুওয়ার—এই কয়টি গোষ্ঠীর ভাষা উপভাষা মাত্র, মূল তিব্বতি-চিন ভাষাবর্গের হিমালয় গ্রুপের অন্তর্গত। কিন্তু এদের নাম ভিন্ন ভিন্ন করে দেখানো হয়েছে এবং সেটাই ঠিক। কারণ মূল ভাষাবর্গ এক হলেও এদের প্রত্যেকের উপভাষা পরস্পর থেকে বিশিষ্ট এবং তারা এক একটি ভিন্ন ভিন্ন উপসমাজ। একটি উপসমাজ আর একটি উপসমাজ থেকে বিশিষ্ট। এই রীতি অনুসারে হদি গারো ও হাজং ভিন্ন ভিন্ন উপ-সমাজের নাম ও জনসংখ্যা ভিন্ন করে দেখান উচিত ছিল।

আদমসুমারির রিপোর্টের প্রধান ভ্রান্তি হল আদিবাসীগোষ্ঠীর নাম ও জনসংখ্যা গণনার সুনির্দিষ্ট একটা মান (Standard) অনুসরণ করা হয়নি। কখনো ধর্ম, কখনো ভাষা গ্রুপ এবং কখনো বা উপভাষা হিসাবে শ্রেণিবিভাগ এবং জনসংখ্যা গণনা করা হয়েছে।

বাংলার আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজ হিসাবে মাত্র ২০টি গোষ্ঠীর নাম ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উক্ত রিপোর্টেরও অন্য অধ্যায়ে (সমগ্র ভারতের আদিবাসী সমাজের তালিকা) বিস্তৃতভাবে সমগ্র ভারতে যে ১৭৫টি উপজাতীয় গোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায় যারা বাংলা দেশে অল্পবিস্তর আছে, অথচ প্রাদেশিক তালিকায় তাদের নাম উল্লিখিত হয়নি। যথা :

বেদিয়া, বাহেলিয়া, ভূঁইয়া (ভুঁইহার?), ঝিঝিয়া, পান, পাসি, দোসাদ, রাভা, নাট, ঘাসি, কাছাড়ি, নাগেসিয়া, ভূমিজ কোরা, থারু, মালপাহাড়িয়া, গারো হাজং, খন্দ, লুসাই, হো, মাহলি, তুরি।

১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে সর্বভারতের—উপজাতীয় গোষ্ঠীর বিস্তৃত তালিকায় উল্লিখিত কয়েকটি গোষ্ঠীরও নাম আছে। এই সব গোষ্ঠী বাংলা দেশেও কিছু না কিছু আছে, কিন্তু দেখা যাছে যে, ওই সালেরই বাংলার উপজাতীয় গোষ্ঠীর প্রাদেশিক তালিকায় এই কয়টি গোষ্ঠীর কোনো উল্লেখ নেই। একটি রিপোর্টে উপজাতীয় শ্রেণি বিভাগের ব্যাপারে দু জায়গায় দু রকমের হিসাব কেন?

১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বাংলার উপজাতীয় গোষ্ঠীর নাম ও সংখ্যা সম্বন্ধে যে প্রাদেশিক হিসাব ও তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে উপরে উদ্ধৃত দুটি তালিকার সব নামই পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ১৯৩১ সালের রিপোর্টে বাংলার উপাজাতীয় গোষ্ঠীর নামের তালিকায় আরও কয়েকটি নাম পাওয়া যায়, যার উল্লেখ ১৯৪১ সালের সর্বভারতীয় তালিকায় বা বাংলার প্রাদেশিক তালিকায় কোথাও নেই।

বেরুয়া, বিন্দ, দোয়াই, জিমদার; থামবু, খামি, খিয়াং, কুর্মি কওর (কাওয়ার?), মাল (মালার?), মুরমি, রায়, টোটো।

'শবর' নামে উপজাতীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ বাংলা দেশে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলে আছে। ১৯৪১ ও ১৯৩১ সালের বাংলা দেশের সেন্সাস রিপোর্টে এই গোষ্ঠীর কোনো উল্লেখ নেই। বাংলা দেশের শবর সমাজ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুত্ব গ্রহণ করেছে এবং একটা জাত হিসাবে হিন্দু সমাজভুক্তও হয়ে গেছে, সম্ভবত এই কারণে শবর সমাজের কোনো উল্লেখ নেই। বাংলা দেশে আদিবাসী গোষ্ঠীর এই রকম হিন্দু সমাজভুক্তির ইতিহাস বিচার করলে আরও কয়েকটি গোষ্ঠীর নাম স্বভাবত মনে পড়ে। সম্পূর্ণ হিন্দুত্ব লাভ হয়েছে, অর্থাৎ একটা 'জাত' হিসাবে হিন্দু সমাজভুক্ত হয়ে গেছে, যদি এই কারণে শবর সমাজের নাম ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে উল্লেখ না করা হয়ে থাকে, তবে আরও কয়েকটি সমাজের নাম উল্লেখ না করা উচিত ছিল। যথা, ভূমিজ, ভুঁইয়া ও কুর্মি সমাজের নাম। বাংলা দেশে বসতি করেছে, এইসব সমাজের মানুষ ধর্মে ও সমাজে হিন্দুই হয়ে গেছে, উপজাতীয়ত্বের আর কিছু নেই। বাংলা দেশে এই রকম সম্পূর্ণ হিন্দুত্ব প্রাপ্ত এবং হিন্দু সমাজভুক্ত উপজাতীয় সমাজের নাম ধরলে আর একটি তালিকা হতে পারে।যথা :

ভূঁইয়া, ভূমিজ, কুর্মি, শবর, কোচ, পলিয়া, রাজবংশী।

নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে এবং নিকট অতীতের ইতিহাস ধরলে বাংলার উল্লিখিত সমাজগুলি উপজাতীয় সমাজ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাঁরা হিন্দু সমাজভুক্ত। ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপারে তাঁরা বাংলার হিন্দু সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। এঁদের উপজাতীয় অবস্থা থেকে সাধারণ হিন্দু সমাজে পরিণত হবার ইতিহাস বেশি অতীতের ঘটনা নয় বলেই এখনো এঁদের সমাজে বিশিষ্ট কতগুলি প্রাচীন উপজাতীয় সংস্কার বর্তমান আছে।

ভারতের অন্যান্য অংশের মতো বাংলা দেশেও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাযাবর সমাজ আছে, যাদের মধ্যে বর্তমানে উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু আছে। এদের উপজাতীয় না বলে উপ-সমাজই বলা ভালো। এই যাযাবর উপ-সমাজগুলির ইতিহাস ভিন্ন। এরা আদিবাসী সমাজ নয়। শিক্ষা, দীক্ষা ও সামাজিকতায় এই সব উপসমাজ খুবই অবনত। এদের এক একটা জীবিকা অবশ্য আছে। যেমন কারও পেশা পাখি-ধরা, কারও শেয়াল মারা, কারও

গো-সাপ শিকার করা ইত্যাদি। কোনো কোনো উপসমাজ বন্য ওষধি বিক্রি করে, কেউ-বা বাঁশ বা বেতের ডালা ঝুড়ি তৈরি করে বিক্রি করে। এই সব উপসমাজের অনেকে আবার একেবারেই জীবিকাহীন। জীবিকাহীন হলে স্বাভাবিকভাবে নৈতিক অবনতি যেমন হয়ে থাকে, অনেক উপসমাজের মধ্যে সেটা খুবই হয়েছে। বৃটিশ শাসন-নীতি অনুসারে এই সব জীবিকাহীন উপসমাজকে 'অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠী' (Criminal Tribes) নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এদের সম্পর্কে 'গোষ্ঠী' 'ট্রাইব' (Tribe) কথাটা ব্যবহৃত হলেও এদের উপজাতি না বলে উপসমাজই বলা উচিত। ভারতের অন্যান্য আদিবাসী সমাজের সঙ্গেও এদের কোনো সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য দেখা যায় না। এরা আদিবাসীও নয়, উপজাতীয়ও নয়। অনেক 'জাত'কেও (Caste) অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন বাংলার অঞ্চল বিশেষের বাগ্দি।

১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ভারতের উপজাতীয় গোষ্ঠীর (Tribe) তালিকায় যে ১৭৫টি নাম দেখা যায়, তার মধ্যে ভুলক্রমে তথাকথিত 'অপরাধপ্রবণ' অনেক উপসমাজের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সব অপরাধপ্রবণ উপসমাজের অনেকে বাংলা দেশেও আছে। যথা :

নাট, বেদিয়া, দুসাদ, ঘাসি, পাসি, বাহেলিয়া।

উৎস : ভারতের আদিবাসী গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

# ভারতীয় জনতত্ত্বে বাঙালির স্থান

## নীহাররঞ্জন রায়

নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন ভারতীয় জনসৌধের প্রথম স্তর নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জন। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এবং মালয় উপদ্বীপে যে নেগ্রিটো জনের বসবাস ছিল এ তথ্য বহু পুরাতন। কিছুদিন আগে হাটন, লাপিক ও বিরজাশংকর গুহ মহাশয় দেখাইয়াছিলেন যে, আসামের অংগামি নাগাদের মধ্যে এবং দক্ষিণ ভারতের পেরাম্বকুলম এবং আন্নামালাই পাহাড়ের কাদার ও পুলায়নদের ভিতর নিগ্রোবটু রক্তপ্রবাহ স্পষ্ট। ভারতীয় নিগ্রোবটুদের দেহবৈশিষ্ট্য কীরূপ ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় কম, কারণ বহুযুগ পূর্বেই ভারতবর্ষের মাটিতে তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তবে বিহারের রাজমহল পাহাড়ের আদিম অধিবাসীদের কাহারও কাহারও মধ্যে কখনও কখনও যে ধরনের ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণাভ ঘনশ্যাম, ঊর্ণাবৎ কেশযুক্ত, দীর্ঘমুণ্ডাকৃতির দেহবৈশিষ্ট্য দেখা যায়, কাদারদের মধ্যে যে মধ্যমাকৃতি নরমুণ্ডের দর্শন মেলে, তাহা হইতে এই অনুমান করা যায় যে, ভারত ও বাংলার নিগ্রোবটুরা দেহগঠনে কতকটা তাহাদের প্রতিবাসী নিগ্রোবটুদের মতনই ছিল; বিশেষভাবে মালয় উপদ্বীপে সেমাং জাতির দেহগঠনের সঙ্গে তাহাদের সাদৃশ্য ছিল বলিয়া গুহ মহাশয় অনুমান করেন। বাংলার পশ্চিম প্রান্তে রাজমহল পাহাড়ের বাগদিদের মধ্যে, সুন্দরবনের মৎস্যশিকারি নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে, মৈমনসিংহ ও নিম্নবঙ্গের কোনও কোনও স্থানে ক্বচিৎ কখনও, বিশেষভাবে সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকদের ভিতর, যশোহর জেলার বাঁশফোঁড়দের মধ্যে মাঝে মাঝে যে কৃষ্ণাভ ঘনশ্যামবর্ণ, প্রায় ঊর্ণাবৎ কেশ, পুরু উলটানো ঠোঁট, খর্বকায়, অতি চ্যাপটা নাকের লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তো নিগ্রোবটু রক্তেরই ফল বলিয়া মনে হয়। নিগ্রোবটুদের এই বিস্তৃতি হইতে অনুমান করা চলে যে, এখন তাহাদের অবশেষ প্রমাণসাপেক্ষ হইলেও এক সময়ে এই জাতি ভারতবর্ষে এবং বাংলার স্থানে স্থানে সুবিস্তৃত ছিল। কিন্তু বিচিত্র জনসংঘর্ষের আবর্তে তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। জার্মান পণ্ডিত ফন্ আইক্স্টেড্ট্ কিন্তু ভারতবর্ষে নিগ্রোবটুদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, এ দেশে সন্ধানসম্ভাব্য আদিমতম স্তরে নিগ্রোবটুসম অর্থাৎ কতকটা ওই ধরনের দেহলক্ষণবিশিষ্ট একটি নরগোষ্ঠীর বিস্তার ছিল, কিন্তু তাহারা যে নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু নরগোষ্ঠীরই লোক, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

নিম্নবর্ণের বাঙালির এবং বাংলার আদিম অধিবাসীদের ভিতর যে জনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, নরতত্ত্ববিদেরা তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন আদি-অস্ট্রেলীয় (proto-Austroloid)। তাঁহারা মনে করেন যে, এই জন এক সময় মধ্য-ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-ভারত, সিংহল হইতে একেবারে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোটামুটিভাবে ইহাদের দেহ-বৈশিষ্ট্যের স্তরগুলি ধরা পড়ে ভারতবর্ষে, বিশেষভাবে মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে, সিংহলের ভেড্ডাদের মধ্যে এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে। এই তথ্যই বোধ হয় আদি-অস্ট্রেলীয় নামকরণের হেতু। যাহা হউক, মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতের আদিম অধিবাসীরা যে খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাস, তাম্রকেশ এই আদি-অস্ট্রেলীয়দের বংশধর এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। পশ্চিম-ভারতে এবং উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশে যে সব লোকের স্থান হিন্দু সমাজবিন্যাসের প্রান্ততম সীমায় তাহারা, মধ্য-ভারতের কোল, ভিল, করোয়া, খারওয়ার, মুণ্ডা, ভূমিজ, মালপাহাড়ি প্রভৃতি লোকেরা, দক্ষিণ-ভারতের চেঞ্চু, কুরুব, য়েরুব প্রভৃতি লোকেরা, সকলেই সেই আদি অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর লোক। বেদে যে নিষাদদের উল্লেখ আছে, বিষ্ণু-পুরাণে যে নিষাদদের বর্ণনা করা হইয়াছে অঙ্গার-কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায়, চ্যাপটামুখ বলিয়া, ভাগবত-পুরাণ যাহাদের বর্ণনা করিয়াছে কাককৃষ্ণ, অতি খর্বকায়, খর্ববাহু, প্রশস্তনাস, রক্তচক্ষু এবং তাম্রকেশ বলিয়া, সেই নিষাদরাও আদি-অস্ট্রেলীয়দেরই বংশধর বলিয়া অনুমান করিলে অন্যায় হয় না। পুরাণোক্ত ভীল্ল-কোল্লরাও তাহাই। বর্তমান বাংলা দেশের, বিশেষভাবে রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, বাঁশফোঁড়, মালপাহাড়ি প্রভৃতিরা যে আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে সম্পৃক্ত, এ অনুমান নরতত্ত্ববিরোধী নয়। এই আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে পূর্বতন নিগ্রোবটুদের কোথায় কোথায় কতখানি রক্তমিশ্রণ ঘটিয়াছিল তাহা বলা কঠিন, তবে কোথাও কোথাও কিছু কিছু যে ঘটিয়াছিল তাহা অনস্বীকার্য। তাহা না হইলে মধ্য-ভারতের, দক্ষিণ-ভারতের এবং বাংলা দেশের আদি অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে দেহ-বৈশিষ্ট্যের যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহার যথেষ্ট ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে বলা উচিত, ফন্ আইক্স্টেডট্ মোটামুটি এই আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর যে অংশ মধ্য ও পূর্বভারতবর্ষের অধিবাসী তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন 'কোলিড্' এবং সিংহলীয় অংশের 'ভেড্ডিড্'। 'কোলিড্' বা 'কোলসম' নামকরণ ভারতীয় ঐতিহ্যের সমর্থক; সেই কারণে আইকস্টেড্টের এই নামকরণ গ্রহণযোগ্য।

ভারতবর্ষের জনবহুল সমতল স্থানগুলিতে যে জনের বাস তাহাদের মধ্য হইতে পূর্বোক্ত আদিম অধিবাসীদের দেহলক্ষণগুলি বাদ দিলে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। এই জনের লোকেরা দেহদৈর্ঘ্যে মধ্যমাকৃতি, ইহাদের মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ ও উন্নত, কপাল সংকীর্ণ, মুখ খর্ব এবং গণ্ডাস্থি উন্নত, নাসিকা লম্বা ও উন্নত কিন্তু নাসামুখ প্রশস্ত, ঠোঁট পুরু এবং মুখগহ্বর বড়ো, চোখ কালো এবং গায়ের চামড়া সাধারণত পাতলা হইতে ঘন বাদামি। দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ লোক এবং উত্তর ভারতের নিম্নতর শ্রেণির প্রায় সকলেই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দীর্ঘমুণ্ড জনের বংশধর, এবং এই দীর্ঘমুণ্ড জনেরাই ভারতীয় জনপ্রবাহে যে দীর্ঘমুণ্ডধারা বহমান তাহার উৎস। বাংলা দেশেও উত্তম ও মধ্যম সংকর এবং অন্ত্যজ পর্যায়ে যে দীর্ঘমুণ্ডের ধারাচিহ্ন দেখা যায়, তাহাও মূলত এই নরগোষ্ঠীরই দান। এই গোষ্ঠীর আদি বাসস্থান কোথায় এবং বিস্তৃতি কোথায় ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া

বলিবার উপায় নাই, তবে বিরজাশংকর গুহ মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এক সময় এই দীর্ঘমুণ্ডগোষ্ঠী উত্তর-আফ্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম দেশগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; পরে নব্যপ্রস্তর যুগে ইহারা ক্রমশ মধ্য, দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃতি লাভ করে এবং এইসব দেশে আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙেগ ইহাদের কিছু রক্তসংমিশ্রণ ঘটে।

এই সদ্যকথিত জন ছাড়া আরও দুইটি দীর্ঘমুণ্ড জন কিছু পরবর্তীকালেই ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই দুই জনের কিছু কিছু কঙকালাবশেষ পাওয়া গিয়াছে সিন্ধু নদীর উপত্যকায়। মাক্রান, হরপ্পা ও মহেন্-জো-দড়োর নিম্নস্তরে প্রাপ্ত কঙকালগুলি হইতে মনে হয় ইহাদের মধ্যে একটির দেহগঠন ছিল সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ, মগজ বড়ো, ভ্রূ-অস্থি স্পষ্ট, কানের পিছনের অস্থি বৃহৎ। এইসব দেহলক্ষণ পাঞ্জাবের সমরকুশল, দৃঢ় ও বলিষ্ঠ কোনও কোনও শ্রেণি ও বর্ণের ভিতর এখনও দেখা যায়। কিন্তু এই জন পাঞ্জাব অতিক্রম করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে আর অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয় দীর্ঘমুণ্ড জনের পরিচয়ও মহেন্-জো-দড়োর কোনও কোনও কঙকালাবশেষ হইতেই পাওয়া যায়। এই জনের লোকদের দেহগঠন তত সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ নয়, বরং ইহারা দৈর্ঘ্যেও একটু খর্ব, কিন্তু মুখাবয়ব তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট, নাসিকা তীক্ষ্ণ ও উন্নত, কপাল ধনুকের মতো বঙিকম। ইহাদের মধ্যে ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর দেহলক্ষণের সাদৃশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট, এবং অনুমান করা যায়, সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার যে পরিচয় হরপ্পা ও মহেন্-জো-দড়োতে আমরা পাইযাছি তাহা ইহাদেরই সৃষ্টি। উত্তর-ভারতে সর্বত্র সকল বর্ণের মধ্যেই, বিশেষভাবে উচ্চবর্ণের লোকদের ভিতর, এই দীর্ঘমুণ্ড নরবংশের রক্তধারা প্রবহমান এবং এই রক্তপ্রবাহের তারতম্যের ফলেই উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের লোকদের মধ্যে এ ধারার কিছুটা অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাংলা দেশে এই দীর্ঘমুণ্ড জনের বক্তপ্রবাহের ধারা কতখানি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহা নিশ্চয়ই করিয়া বলা যায় না; কতকটা স্রোতস্পর্শ যে লাগিয়াছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ কী?

উপরোক্ত দীর্ঘমুণ্ড জনেরা যে জনস্তর গড়িয়া তুলিয়াছিল, উত্তর-পশ্চিম হইতে তাহার উপর এক গোলমুণ্ড জন আসিয়া নিজেদের রক্তপ্রবাহ সঞ্চারিত করিল। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইহাদের সঙেগ গোলমুণ্ড মোঙেগালীয় নরগোষ্ঠীর কোনো সম্বন্ধ নাই। এই জনের সর্বপ্রাচীন সাক্ষ্য সংগৃহীত হইয়াছে হরপ্পা ও মহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত মুণ্ডকঙকাল হইতে। ইহাদের সঙেগ পূর্ব-ইউরোপের দিনারীয় এবং কতকাংশে আর্মানীয় জাতির সম্বন্ধ সুস্পষ্ট। এই জাতিই লাপোং, রিজলি, লুস্‌সান্ ও রমাপ্রসাদ চন্দ-কথিত অ্যালপাইন (Homo Alpinus) নরগোষ্ঠী, বিরজাশংকর গুহ-কথিত অ্যাল্‌পো-দিনারীয় নরগোষ্ঠী, ফন্ আইক্‌স্টেড্‌ট্ কথিত পশ্চিম ও পূর্ব 'ব্র্যাকিড' বা গোলমুণ্ড নরগোষ্ঠী। বাংলাদেশের উচ্চবর্ণের ও উত্তম সংকর বর্ণের জনসাধারণের মধ্যে যে গোল ও মধ্যম মুণ্ডাকৃতি, তীক্ষ্ণ ও উন্নত এবং মধ্যম নাসাকৃতি ও মাধ্যমিক দেহ-দৈর্ঘ্যের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনেকাংশে এই নরগোষ্ঠীরই দান। বস্তুত, বাংলাদেশের যে জন ও সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রায় সমগ্র মূল রূপায়ণই প্রধানত অ্যালপাইন ও আদি-অস্ট্রেলীয়, এই দুই জনের লোকদের কীর্তি। পরবর্তী কালে আগত আর্যভাষাভাষী আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ ও সংস্কৃতি তাহার উপরের স্তরের একটি ক্ষীণ প্রবাহ মাত্র,

এবং এই প্রবাহ বাঙালির জীবন ও সমাজবিন্যাসের উচ্চতর স্তরেই আবদ্ধ; ইহার ধারা বাঙালির জীবন ও সমাজের গভীর মূলে বিস্তৃত হইতে পারে নাই। যাহাই হোক, পামির মালভূমি, তাকলামাকান মরুভূমি, আল্পস পর্বত, দক্ষিণ আরব ও ইউরোপের পূর্বদেশবাসী এই অ্যালপাইন জনের বংশধরেরা বর্তমান ভারতবর্ষে ছড়াইয়া আছে নানা স্থানে—গুজরাটে, কর্ণাটে, মহারাষ্ট্রে, কুর্গে, মধ্যভারতে, বিহারে 'নাগর' ব্রাহ্মণদের মধ্যে, বাংলায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং উপরের বর্ণস্তরের সকল লোকদের মধ্যে। সর্বত্র সমানভাবে একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নাই, এ কথা সত্য; কিন্তু ভারতবর্ষে গোলমুণ্ড, উন্নতনাস মানুষের রক্তধারা যেখানে যে পরিমাণে আছে তাহার মূলে এই গোলমুণ্ড, উন্নতনাস অ্যালপাইন নরগোষ্ঠী উপস্থিত। ফন্ আইক্স্টেড্টের মতে এই নরগোষ্ঠীর তিন শাখা : পশ্চিম ব্র্যাকিড, যাহাদের বংশধর বর্তমান মহারাষ্ট্র ও কুর্গের অধিবাসীরা, গাঙ্গেয় উপত্যকার দীর্ঘদেহ ব্র্যাকিডরা এবং বাংলা ও উড়িষ্যার পূর্ব ব্র্যাকিডরা। এই তিন শাখাই, তাঁহার মতে, আর্যভাষী 'ইণ্ডিড' নামক বৃহত্তর নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু যে জন বিশিষ্ট ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্মদাতা এবং যাহারা পূর্বতন ভারতীয় সংস্কৃতির আমূল রূপান্তর সাধন করিয়া তাহাকে নবকলেবর নবরূপ দান করিয়াছিল, তাহারা এই অ্যালপাইন নরগোষ্ঠী হইতে পৃথক। এই নূতন জনের নরতত্ত্ববিদ্দত্ত নাম হইতেছে আদি-নর্ডিক (proto-Nordic)। আদি-নর্ডিক জনই বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টিকর্তা। ভারতবর্ষে ইহাদের সুপ্রাচীন কোনও কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কৃত হয় নাই; তবে, তক্ষশীলার ধর্মরাজিকা বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে কয়টি নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে অনুমান হয়, ইহাদের মুখাবয়ব দীর্ঘ সুদৃঢ় ও সুগঠিত নাসিকা সংকীর্ণ ও সুউন্নত, মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ হইলেও গোলের দিকে ঝোঁক সুস্পষ্ট এবং নীচের দিকে চোয়াল দৃঢ়। মাথার খুলি এবং মুখাবয়ব হইতে মনে হয়, ইহাদের দেহ ছিল খুব বলিষ্ঠ ও দৃঢ়সংবদ্ধ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান, হিন্দুকুশ পর্বতের কাফির প্রভৃতি কোমের লোকেরা, পঞ্জাব ও রাজপুতনার উচ্চশ্রেণির ও বর্ণের লোকেরা ইহাদেরই বংশধর, যদিও শেষোক্ত দুই স্থানে পূর্বতন দীর্ঘমুণ্ড জাতির সঙ্গে ইহাদের সংমিশ্রণ একটু বেশি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে সর্বত্রই ইহাদের ধারাচিহ্ন পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সর্বত্র খুব বলিষ্ঠ ও বেগবান নয়। উত্তর-য়ুরোপের নর্ডিক জাতির সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তবে পার্থক্যও আছে, বিশেষভাবে চুল ও গায়ের রঙে। ভারতীয় নর্ডিক জাতির চুলের রং সাধারণত ঘন বাদামি হইতে ঘনকৃষ্ণ এবং চামড়া বাদামি হইতে রক্তিম গৌর। উত্তর-য়ুরোপের নর্ডিকদের চামড়া রক্তিম শ্বেত এবং কেশ পাতলা বাদামি হইতে শ্বেতোপম। এই পার্থক্য কতকটা জলবায়ু-নির্ভর সন্দেহ নাই, কিন্তু মূলত কতকটা পূর্বাপর ইতিহাসগত তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সম্ভবত, বৈদিক আর্যসভ্যতার নির্মাতা নর্ডিকেরাই আদি-নর্ডিক, এবং ইহারাই পরবর্তীকালে উত্তরে য়ুরোপখণ্ডে গিয়া ক্রমশ নূতন দেহলক্ষণ উদ্ভব করিয়াছিল। ফন্ আইক্স্টেড্ট্ এই বলিষ্ঠ ও দুর্জয় নরগোষ্ঠীর নামকরণ করিয়াছেন 'ইন্ডিড'। যাহাই হউক, ইহাদেরই আর্যভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঐতিহাসিককালে বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে বাংলা দেশে সঞ্চারিত হইয়া পূর্বতন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করিয়া নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙালির রক্ত ও দেহগঠনে এই আদি-নর্ডিক জনের রক্ত ও দেহগঠন

বৈশিষ্ট্যের দান অত্যন্ত অল্প; সে ধারা শীর্ণ ও ক্ষীণ, এত শীর্ণ ও ক্ষীণ যে বাংলা দেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তাহা খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সত্ত্বেও সহসা ধরা পড়ে না। বর্তমান যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতনা বা পঞ্জাবের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নরতত্ত্বের দিক হইতে বাঙালি ব্রাহ্মণের কোনও সম্বন্ধই যে প্রায় নাই তাহার কারণ এই তথ্যের মধ্যে নিহিত। ওইসব দেশের ব্রাহ্মণেরা যে সামাজিক ক্ষেত্রে বাঙালি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের দাবি সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না তাহার অন্যতম কারণ এই জনপার্থক্য নয় কি?

ইহা ছাড়াও আর একটি খর্বদেহ দীর্ঘমুন্ড জাতির অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন নরতত্ত্ববিদ্ ফিশার সাহেব, এবং ইহাদের নামকরণ করিয়াছেন প্রাচ্য বা Oriental বলিয়া। ইহারা পাতলা গৌর, কিন্তু ইহাদের চুল ও চোখ কৃষ্ণবর্ণ এবং নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত। উত্তর আফগানিস্তানের বাদক্ষীরা, দীর্ হইতে খাইবার গিরিবর্ত্ম পর্যন্ত যে সব লোক বাস করে, চিত্রল হইতে হিমালয়ের সানুদেশ ধরিয়া নেপালের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত যে সব পার্বত্য জনের বাস, ইহারা সকলেই কমবেশি সেই প্রাচ্য জনের বংশধর। পঞ্জাবের হিন্দুসমাজের কোনও কোনও শ্রেণিতে এবং মুসলমানদের উচ্চশ্রেণিতে এই জনের শীর্ণ প্রবাহ কিছুটা ধরা পড়ে, কিন্তু বাংলা দেশে ইহাদের রক্তধারা আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই, এমন-কি পর্বতশায়ী উত্তরাংশেও নয়। ফন্ আইক্স্টেডট্ এই নরগোষ্ঠীর নামকরণ করিয়াছেন 'উত্তর-ইন্ডিড' বলিয়া; এবং ডেনিকার ও জিউফ্রিডা-রাগ্গেরি ইহাদেরই বোধ হয় বলিয়াছেন 'ইন্দো-আফগানীয়'।

মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পরবর্তী ঐতিহাসিক কালে। এইসব মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতবর্ষের জনপ্রবাহে ইহাদের স্পর্শ গভীরভাবে কোথাও লাগে নাই, একমাত্র আসাম, উত্তরে হিমালয়শায়ী নেপাল-ভোটান এবং পূর্ব প্রান্তে ব্রহ্মদেশশায়ী প্রত্যন্ত জনপদ ও অরণ্যবাসী লোকদের মধ্যে ছাড়া। চৈনিক তুর্কিস্থানের তুর্কি-ভাষাভাষী অথবা খিরগিজ, উজবেক প্রভৃতি লোকদের মতো যথার্থ মোঙ্গোলীয় জন বা কোম আজ পর্যন্ত ভারতীয় নরতত্ত্বের বহির্ভূত। তবে উত্তরে হিমালয়সানুদেশবাসী লিম্বু, লেপচা, রংপা প্রভৃতি কোমের লোকদের মধ্যে তিব্বতী রক্তধারা সুস্পষ্ট। ইহাদের দেহাকৃতি মধ্যম হইতে দীর্ঘ, মুণ্ডাকৃতি গোল। গণ্ডাস্থি উন্নত এবং নাসিকাকৃতি দীর্ঘ ও চ্যাপটা। নেপালেও এই রক্তধারার প্রভাব ধরা পড়ে, তবে উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে ক্রমশ ক্ষীয়মাণ।

আসামের উত্তর-পূর্বপ্রান্তশায়ী পার্বত্য দেশগুলিতে আবার একটি পৃথক মোঙ্গোলীয় রক্তধারার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের মুণ্ডাকৃতি ঠিক গোল নয়, গোলের ঠিক উলটা অর্থাৎ দীর্ঘ, এবং অক্ষিপুট সম্মুখীন। ইহারা যে মোঙ্গোলীয় তাহার প্রমাণ ইহাদের চ্যাপটা নাক, উন্নত গণ্ডাস্থি, বঙ্কিম চক্ষু, উদ্দণ্ড কেশ, কেশবিহীন দেহ ও মুখমণ্ডল। দক্ষিণ-পশ্চিম চিন হইতে ইহারা ক্রমশ ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী দেশ ও দ্বীপগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; পথে উত্তর-পূর্ব আসামে এবং উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিরি, নাগা, বোডো বা মেচ প্রভৃতি লোকদের ভিতর, কোচ, পালিয়া. রাজবংশী প্রভৃতি লোকদের ভিতর ইহাদের একটি ধারাপ্রবাহ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। আসামে এই ধারা সর্বত্রই, সমাজের সকল স্তরেই প্রবহমান, তবে উচ্চবর্ণগুলির ভিতর গোলমুণ্ড অ্যালপাইন এবং কিছু পরিমাণে দীর্ঘমুণ্ড আদি-নর্ডিক ধারাও সুস্পষ্ট; এই শেষোক্ত দুই ধারাই আসামের

হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাধৃত ধারাটির একটি প্রবাহ ঐতিহাসিক কালে বাংলা দেশে আসিয়া ঢুকিয়া পড়ে, এবং রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে এইভাবেই খানিকটা মোঙেগালীয় প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু তাহা সাধারণত সমাজের নিম্নস্তরে।

ব্রহ্মদেশে যে মোঙেগালীয় জনের সঙেগ আমাদের পরিচয় ঘটে, তাহারা খর্বদেহ, তাহাদের মুণ্ডাকৃতি গোল,—দীর্ঘ নয়, এবং চামড়ার রং আরও ঘোর। দীর্ঘমুণ্ড অহোমীয় মোঙেগালীয়দের সঙেগ ইহাদের আত্মীয়তা থাকিলেও ইহারা একগোত্রীয় নয়; বরং ব্রহ্মদেশীয় গোলমুণ্ড মোঙেগালীয়দের সঙেগ সমগোত্রীয়তা আছে ত্রিপুরা জেলার চাক্‌মাদের, টিপ্‌রাইদের এবং আরাকানের এবং চট্টগ্রামাঞ্চলের মগদের। বাংলা দেশের অন্যত্র কোথাও এই ব্রহ্ম-মোঙেগালীয় প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না এবং বাংলার জনগণের রক্তপ্রবাহে ইহারা বিশেষ কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই।

ভারতবর্ষের নরগোষ্ঠীপ্রবাহ সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, পাশ্চাত্য ও ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকেরা মোটামুটি তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে লাইপ্‌ত্‌সিগ স্যাক্সন ইনস্টিটিউটের ভারতীয় নৃতত্ত্বাভিযানের নেতা ব্যারন ফন আইকস্টেড্‌ট সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া যে সুবিস্তৃত শারীর-পরিমিতি গণনা করিয়াছেন, তাহার ফলে ভারতীয় নরগোষ্ঠীপ্রবাহে কিছু নতুন আলোকপাত হইয়াছে। ফন্ আইক্‌স্টেড্‌টের বিশ্লেষণ ও মতামত আমাদের দেশে বহুলপ্রচারিত নয়; অথচ নানা কারণে তাঁহার মতামত আলোচিত হইবার দাবি রাখে। প্রথমত, ভারতীয় নরতত্ত্ব জিজ্ঞাসায় তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার গণনা ও বিশ্লেষণের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তিনিই সকলের চেয়ে বেশি সংখ্যায় পরিমিতি লইয়াছেন। তৃতীয়ত, সমস্ত পরিমিতি একই মানদণ্ডানুযায়ী গৃহীত হইয়াছে; এবং চতুর্থত, যে বিচার পদ্ধতি অনুযায়ী পরিমিতি বিশ্লেষিত হইয়াছে তাহা একান্ত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। পূর্বতন সকল মতামত বিচার করিয়া এবং সুবিস্তৃত ও সুগভীর গবেষণার ফলে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় লওয়া এ প্রসঙেগ অবান্তর নয়। তিনি বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর যে নামকরণ করিয়াছেন, তাহা অনন্যপূর্ব না হইলেও একটু অসাধারণ। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, নামকরণ যাহাই হোক, বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর যে যে বিশিষ্ট দেহলক্ষণের উপর এই নামকরণের নির্ভর সেই দেহলক্ষণ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা খুব বেশি নাই। শ্রেণিনির্ধারণ সম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা অবশ্যই লক্ষণীয়।

ফন আইক্‌স্টেড্‌টের মতে ভারতবর্ষে মোটামুটি তিনটি নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ উপস্থিত। প্রত্যেক গোষ্ঠীতেই কয়েকটি শাখাগোষ্ঠী সংলগ্ন।

১. ভেড্ডিড্ বা ভেড্ডীয় নরগোষ্ঠী—উত্তর দাক্ষিণাত্যের পাতলা রং ও বলিষ্ঠ গড়নের উত্তর-গোণ্ডীয় লোকেরা এবং দক্ষিণ ভারতের ঘোরকৃষ্ণ 'মেলিড্' ও সিংহলের ভেড্ডারা এই ভেড্ডিড্ বা ভেড্ডীয় নরগোষ্ঠীর শাখা। লক্ষণীয় যে, কোল-মুণ্ডা নরগোষ্ঠীকে ফন আইক্‌স্টেড্‌ট্ এই বৃহত্তর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুত করিতেছেন না।

২. 'মেলানিড্' বা ভারতীয় 'মেলানিড্'—এই নরগোষ্ঠীর প্রধান বাসস্থান দক্ষিণ ভারতের সমতল প্রদেশ, এবং বর্তমান তামিলভাষী লোকেরা ইহাদের বংশধর। উত্তরে হো'দের মধ্যে এই 'মেলানিড্' রক্তস্পর্শ সুস্পষ্ট এবং আরও উত্তর গাঙেগয় উপত্যকায়

ইহাদের কোনও কোনও ক্ষুদ্রতর শাখার দর্শন দুর্লভ নয়, বিশেষত, তথাকথিত নিম্নজাতদের ভিতর। কোলীয়রাও ইহাদেরই একটি সুবৃহৎ শাখা। এই হিসাবে ফন আইক্‌স্টেড্‌ট্‌ কোল-মুণ্ডা নরগোষ্ঠীকে বর্তমান দ্রাবিড়ভাষী 'মেলানিড্‌' নরগোষ্ঠীর আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেছেন; কোল-মুণ্ডা খাসিয়ারা যে অন্য পৃথক নরগোষ্ঠীর লোক তাহা বলিতেছেন না। তাহা ছাড়া, অন্যান্য নৃতাত্ত্বিকেরা বর্তমান দ্রাবিড়ভাষী লোকদের যে সব দেহলক্ষণসমূহের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের সঙ্গে ভারতবর্হির্ভূত মিশর-এশীয় বা ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর আত্মীয়তার সন্ধান পাইতেছেন, মোটামুটি সেই দীর্ঘমুণ্ড উন্নতনাস নরগোষ্ঠীর লোকদেরই তিনি বলিতেছেন ভারতীয় 'মেলানিড্‌'।

৩. 'ইন্ডিড্‌' বা ভারতীয় নরগোষ্ঠী—ইহাদের প্রধানত তিন শাখা : ক. যথার্থ 'ইন্ডিড্‌'; ইহারাই মোটামুটি যাহাদের আগে বলা হইয়াছে আদি-নর্ডিক; খ. উত্তর 'ইন্ডিড্‌'; অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ফিশার যাহাদের বলিয়াছেন প্রাচ্য বা 'ওরিয়েন্টাল'; এবং গ. 'ব্র্যাকিড'; ইহারা আর-একটি গোলমুণ্ড নরগোষ্ঠী অর্থাৎ মোটামুটিভাবে আগে যাহাদের বলা হইয়াছে অ্যালপাইন বা আল্‌পো-দিনারীয়। এই 'ব্র্যাকিড'দের আবার তিন উপধারা; অ. মহারাষ্ট্র দেশের 'পশ্চিম ব্র্যাকিড'; আ. বাংলা ও উড়িষ্যার 'পূর্ব-ব্র্যাকিড', এবং ই. গাঙ্গেয় উপত্যকার 'দীর্ঘদেহ ব্র্যাকিড'। যথার্থ 'ইন্ডিড'দের বিস্তার বিনশন-প্রয়াগধৃত আর্যাবর্তে বা মধ্যদেশে, দক্ষিণ-ভারতের কেরল ভূমিতে এবং মিশ্রিতরূপে সিংহল দ্বীপেও।

ফন আইক্‌স্টেড্‌ট্‌ আরও বলেন যে, দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাংশের কোনও কোনও অধিবাসীদের ভিতর আদি মোঙ্গোলীয় রক্তপ্রভাব সুস্পষ্ট, এবং তাহা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক কোলভাষী লোকদের রক্তধারা দ্বারা স্পৃষ্ট। এই আদি-মোঙ্গোলীয় প্রভাব ভারতবর্ষের সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত নয়, তবে এখানে-ওখানে আকীর্ণ চিহ্ন পৃথক পৃথক ভাবে নানা স্থানে ধরা পড়ে। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষে এই মোঙ্গোলীয় প্রভাব খুব সুপ্রাচীন নয়।

দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসীরা, তাঁহার মতে, নৃতত্ত্বের দিক হইতে অধিকতর সমন্বিত এবং সমন্বয়ের মূল ভিত হইতেছে সুবিস্তৃত আদিমতম নেগ্রিড রক্তপ্রবাহ। এই সমন্বিত নরগোষ্ঠীই ফন আইক্‌স্টেড্‌ট্‌-কথিত 'মেলানিড্‌' নরগোষ্ঠী এবং তাহাদেরই বংশধর বর্তমান মধ্যস্তরের তামিল। উচ্চ ও নিম্নস্তরে এই সমন্বয়ের সমগ্র ও সুস্পষ্ট রূপটি ধরা পড়ে না, কারণ উভয় স্তরেই অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক বা প্রাচীনতর কালের অন্য নরগোষ্ঠীর রক্তস্পর্শ লাগিয়াছে; উচ্চস্তরে বোধ হয় 'ইন্ডিড'দের এবং নিম্নস্তরে 'মালিড'দের। এই 'মালিড'রা পর্বতবাসী ভেড্ডিড নরগোষ্ঠীর সঙ্গে কমবেশি আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। ইহাদের কাহারও মধ্যেই অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের নিগ্রোবটু রক্তস্পর্শের চিহ্নমাত্র নাই, যদিও আদিমতম নিগ্রোবটু রক্তস্পর্শের কমবেশি প্রভাব সকলের মধ্যেই আছে, তবে সে প্রভাবও বহুদিন আগেই শুকাইয়া উবিয়া গিয়াছে।

সংখ্যায় ও বিস্তৃতিতে ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ নরগোষ্ঠী হইতেছে 'ইন্ডিড্‌'রা। ফন আইক্‌স্টেড্‌টের মতে ইহারাই প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার উত্তরাধিকারী এবং দ্রাবিড় ও বিশিষ্ট "ভারতীয়" আত্মিক সাধনার যথার্থ প্রতিনিধি। 'ইন্ডিড' নরগোষ্ঠীর উত্তর-পশ্চিমাংশ বারবার মধ্য এশিয়ার নানা জন ও কোম দ্বারা আক্রান্ত ও পর্যুদস্ত হইয়াছে; আর্যভাষা কিন্তু তাহাতে কখনও শিথিলমূল হয় নাই, বরং তাহার প্রতাপ বরাবরই

অম্লান ও অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু আর্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ও মানস-সংস্কৃতি বারবার রূপান্তর ও সমন্বয় লাভ করিয়াছে। আর্যভাষাকে আশ্রয় করিয়া কিছু নর্ডিক রক্তপ্রবাহ, পরবর্তীকালে কিছু শক ও হূন রক্তপ্রবাহ এবং আরও পরবর্তীকালে মুসলমান অভিযান আশ্রয় করিয়া কিছু 'ওরিয়েন্টাল' বা প্রাচ্য নরগোষ্ঠীর রক্তধারা 'ইন্ডিড্' প্রবাহে সঞ্চারিত হইয়াছে। মূলে এই 'ইন্ডিড্' নরগোষ্ঠী আদিমতম ভেড্ডীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই উত্তর হইতে 'ইন্ডিড্'দের দক্ষিণমুখী চাপে ক্রমশ 'মেলানিড্' নরবংশের সৃষ্টি এবং ভেড্ডিডদের চাপে ক্রমশ 'মালিড'দের।

'ইন্ডিড্' ও 'মেলানিড' নরগোষ্ঠী বা তাহাদের ভাষা সম্বন্ধে ফন আইক্স্টেড্টের উক্তি উদ্ধারযোগ্য। আমার মনে হয়, দ্রাবিড়ভাষীদের নরতত্ত্ব সম্বন্ধে একান্ত সাম্প্রতিক কালেও নরতাত্ত্বিকদের মধ্যে যে জিজ্ঞাসা বর্তমান তাহার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা এই উক্তির মধ্যে পাওয়া যায় ঃ

> The originally Dravidian Indids, whose descendants adopted the Aryan language, pushed over the Melanids, who in their turn adopted Dravidian idioms for which they are now the typical representatives. So, race and language do no more in India in anyway coincide. Races remained, but languages were shoven southward...The disturbing results of the idea of a Dravidian "race" are therefore easy to understand. The Dravida speakers of today are no more the same as four millenniums ago. At that time they were of Indid race, today they are prevailingly of Melanid race.

এই সুদীর্ঘ জাতিপ্রবাহের ইতিহাস আলোচনার একটি তথ্য সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। সেটি এই : নরতত্ত্বের দিক হইতে বাংলার জনসমষ্টি মোটামুটি দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাস আদি-অস্ট্রেলীয় বা 'কোলিড্', দীর্ঘমুণ্ড, দীর্ঘ ও মধ্যোন্নতনাস মিশর-এশীয় বা 'মেলানিড্', এবং বিশেষভাবে গোলমুণ্ড, উন্নতনাস অ্যালপাইন বা 'পূর্ব ব্র্যাকিড', এই তিন জনের সমন্বয়ে গঠিত। নিগ্রোবটু রক্তেরও স্বল্প প্রভাব উপস্থিত, কিন্তু তাহা সমাজের খুব নিম্নস্তরে এবং সংকীর্ণ স্থানগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। মোঙ্গোলীয় রক্তের কিছুটা প্রভাবও আছে, কিন্তু তাহাও উত্তর ও পূর্ব দিকে সংকীর্ণ স্থানগণ্ডির সীমা অতিক্রম করে নাই। আদি-নর্ডিক বা খাঁটি 'ইন্ডিড্' রক্তপ্রবাহও অনস্বীকার্য, কিন্তু সে ধারা অত্যন্ত শীর্ণ ও ক্ষীণ। মোটামুটিভাবে ইহাই বাংলাভাষাভাষী জন-সৌধের চেহারা এবং এই জন-সৌধের উপরই বাঙালির ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিচিত্র সংকর জন লইয়াই বাংলার ও বাঙালির ইতিহাসের সূত্রপাত।

বাঙালির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ এবং উত্তর-ভারতে বিভিন্ন বর্ণের এবং জনের উপরোক্ত নরতাত্ত্বিক বিবরণের তুলনামূলক আলোচনা হইতে বাঙালির বিভিন্ন বর্ণ বা জাত সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে এখন কতকগুলি ইঙ্গিত ধরিতে পারা যায়। খুব সংক্ষেপে প্রধান ও অপ্রধান কয়েকটি বর্ণ সম্বন্ধে সে ইঙ্গিত বিবৃত করিলেই সমগ্র চেহারাটি পরিষ্কার হইবে।

ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের সম্বন্ধেই আগে বলা যাইতে পারে। বাংলা দেশে ব্রাহ্মণরাই একমাত্র জাত যাহাদের সঙ্গে পঞ্জাবের ব্রাহ্মণদের এবং উত্তর-ভারতের অন্যান্য উচ্চবর্ণের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বাঙালি ব্রাহ্মণদের বেশি নরতাত্ত্বিক আত্মীয়তা দেখা যায় বাঙালি বৈদ্য ও কায়স্থদের সঙ্গে। বস্তুত, বাঙালি ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ জনতত্ত্বের দিক হইতে একই গোষ্ঠীর লোক বলিলে কিছু অবৈজ্ঞানিক কথা বলা হয় না। জনতত্ত্বের দিক হইতে বলিতে পারা যায়, যে সব জাত (অর্থাৎ বৈদ্য-কায়স্থ, বৃহদ্ধর্মপুরাণের করণ ও অম্বষ্ঠ) দেহবৈশিষ্ট্যে ব্রাহ্মণদের যত সন্নিকটে, বাংলা দেশে সেই সব জাত-এর সামাজিক কৌলীন্য তত বেশি। বাঙালি ব্রাহ্মণদের (এবং কায়স্থ-বৈদ্যদের) সঙ্গে পূর্ব-ভারতীয় আদিমতম অধিবাসীদের (যেমন, ছোটনাগপুর অঞ্চলের সাঁওতালদের, উত্তরাঞ্চলের গারো-খাসিয়াদের, নিম্নবঙ্গের রাজবংশী-বুনা ইত্যাদিদের), কিংবা নিম্নতম বর্ণ ও শ্রেণির লোকদের (পোদ-বাগদি প্রভৃতি) রক্তসংমিশ্রণ বেশি ঘটিয়াছে, এমন প্রমাণ নাই। ঘটে যে নাই তাহার খানিকটা প্রমাণ পাওয়া যায় বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে এবং ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের, বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের, সামাজিক আচার-ব্যবহারে। নির্বিচার আন্তর্বিবাহ ও আন্তর্ভোজনে একটি আপত্তি বরাবরই তাহাদের ছিল, যদিও সেই আপত্তি সুপ্রাচীন কালে সর্বত্র সব সময় খুব কার্যকরী হয় নাই। আর এইসব আপত্তি ও সংস্কার তো খুবই ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল, একদিনেই তাহা কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। সেই হেতুই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৈদ্য-কায়স্থদের একটা জনতাত্ত্বিক আত্মীয়তা সহজেই লক্ষ করা যায়। বাংলার অন্য কোনও বর্ণ বা জাত-এর সঙ্গে সেই আত্মীয়তার প্রমাণ নাই। আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নাই, বাঙালি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে গাঙ্গেয় ভারতের ব্রাহ্মণদের জনতাত্ত্বিক আত্মীয়তা বাঙালি ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের জনতাত্ত্বিক আত্মীয়তা অপেক্ষা কম; বরং বাঙালি ব্রাহ্মণদের আত্মীয়তা মধ্যভারতীয় অব্রাহ্মণদের সঙ্গে বেশি। উচ্চতম বর্ণের বিহারীদের সঙ্গে বাংলার উচ্চতম বর্ণের লোকদের কিছুটা আত্মীয়তা আছে। বাংলা-বিহারের ভৌগোলিক নৈকট্যে এবং ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে সে মিল থাকা তো খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু সে মিলও বাঙালি বৈদ্য-কায়স্থদের সঙ্গে মিলের চেয়ে অনেক কম। এইসব কারণে মনে হয়, বাঙালি ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ বর্ণের লোকেরা একটি বিশেষ ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, এবং জনতত্ত্বের দিক হইতে তাহারা একই গোষ্ঠীবদ্ধ। বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত উত্তম সংকর বর্ণের অনেক বর্ণই এই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ, এই অনুমানও বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে করা চলে। অন্তত, বাঙালি কায়স্থরা যে বাঙালি সদ্‌গোপ ও কৈবর্তদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ, ইহা তো নরতাত্ত্বিক পরিমিতি-গণনা হইতেই ধরা পড়ে; সদ্‌গোপদের সঙ্গে কায়স্থদের তো কোনোই পার্থক্য নাই। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তো বলেন, কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্তরাই যথার্থই বঙ্গজন-প্রতিনিধি। বস্তুত, বাংলা দেশের সমস্ত বর্ণের (বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত উত্তম ও মধ্যম সংকর বর্ণের) সঙ্গে কায়স্থদের আত্মীয়তাই সবচেয়ে বেশি। বাংলার বাহিরে এক বিহারে কিছুটা ছাড়া অন্যত্র কোনও বর্ণের সঙ্গেই ইহাদের বিশেষ কোনও মিল নেই, এবং এই তথ্য সদ্‌গোপ ও কৈবর্তদের সম্বন্ধেও সত্য। কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্তদের সঙ্গে (সদ্‌গোপ ও কৈবর্তরা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-কথিত সৎশূদ্র) সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া বা বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত অন্ত্যজ বর্ণের লোকদের কোনই রক্তসংমিশ্রণ ঘটে নাই, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়; তেমনই নিঃসংশয়ে বলা

চলে যে, ছোটনাগপুর অঞ্চলের সাঁওতাল প্রভৃতিদের সঙ্গে বাংলার পোদ্, বাগদি, বাউড়ি প্রভৃতি উপবর্ণের লোকদের সুপ্রচুর রক্তসংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

নমঃশূদ্রদের সম্বন্ধে নরতাত্ত্বিক পরিমিত-গণনার ফলাফল একটু চাঞ্চল্যকর। এ তথ্য অন্যত্রও উল্লেখ করিয়াছি যে, দেহবৈশিষ্ট্যের দিক হইতে ইহারা উত্তর-ভারতের বর্ণব্রাহ্মণদের সমগোত্রীয়; বস্তুত, উত্তর-ভারতের বর্ণ-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাঙালি ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের চেয়েও বাঙালি নমঃশূদ্রদের আত্মীয়তা বেশি। অথচ এই নমঃশূদ্রেরা আজ সমাজের একেবারে নিম্নতম স্তরে! আমরা তাহাদের চণ্ডাল বা চাঁড়াল বলিয়া জানি, এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণ রচনার কালেই ইহারা অন্ত্যজশ্রেণিভুক্ত। এই সামাজিক তথ্যের সঙ্গে নরতত্ত্বপ্রমাণগত তথ্যের যুক্তির ও ইতিহাস-সম্মত ব্যাখ্যার কোনও সম্বন্ধ এখনও কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

যাহাই হউক উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি বাংলার বিভিন্ন জেলার বিচিত্র বর্ণসমূহের ভিতর আপেক্ষিক সূক্ষ্ম ও স্থূল পার্থক্য, একই বর্ণের মধ্যে দেহপরিমিতির ভেদবৈচিত্র্য ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিচার করিলে বলিতেই হয়, এ সমস্তই বিচিত্র জন-সাংকর্যের দ্যোতক। জন-সাংকর্যের নরতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যের জৈব মিশ্রণের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত আর কী হইতে পারে! বস্তুত, স্মরণাতীত কাল হইতে এই ধরনের জন-সাংকর্যের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের অন্যত্র খুব সুলভ নয়। এই মিশ্রণ এত গভীর ও ব্যাপক যে, নরতত্ত্বের দিক হইতে কোনও বিশিষ্ট বর্ণ, যত উচ্চ বা নিম্নই হউক না কেন, কোনও বিশিষ্ট স্থানে অধিবাসীদের একান্তভাবে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার উপায় নাই।

উৎস : বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, ১৪০০

# বাংলাদেশে বৈদিক সভ্যতা

প্রবোধচন্দ্র বাগচি

১

বাংলা দেশ, বাঙালি জাতি যে বৈদিক সভ্যতার বহির্ভূত সে সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ করেন না। এ সন্দেহ পোষণ করবার প্রধান কারণ হচ্ছে যে অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা বাঙালি ব্রাহ্মণকে পতিত মনে করেন। উপরন্তু বৈদিক সাহিত্যে বাংলা দেশ বা বাঙালি জাতির কোনো উল্লেখ নাই। ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রে যে উল্লেখ আছে তাতেও বাংলা দেশের আচারকে ভ্রষ্টাচার মনে করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে বেদ ও ধর্মশাস্ত্রের প্রমাণগুলিকে অকাট্য বলে মেনে নেওয়া যুক্তিসংগত নয়।

বৈদিক পণ্ডিতদের মতে ভারতবর্ষে বৈদিক সভ্যতা পূর্বগামী হলেও তা মিথিলা অতিক্রম করেনি। বৈদিক সভ্যতার প্রথম লীলাভূমি হচ্ছে পাঞ্জাব প্রদেশ। সে প্রদেশে পশ্চিম প্রান্ত হতে পূর্ব প্রান্ত সরস্বতী নদী পর্যন্ত তা প্রসার লাভ করে। শাস্ত্রকারদের মতে এই সরস্বতী নদী ও তার নিকটবর্তী দেশ হচ্ছে বৈদিক সভ্যতার প্রকৃত কেন্দ্র।

সরস্বতীদৃষদ্বত্যো র্দেব নদ্যো র্যদন্তরম্।
তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে।

অর্থাৎ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর অন্তবর্তী দেশই হচ্ছে দেবতাদের নির্মিত ব্রহ্মাবর্ত দেশ। আর এই ব্রহ্মাবর্তের আচারই ছিল একমাত্র সদাচার। এই ব্রহ্মাবর্তের চারিদিকে যে সব দেশ, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেন বা মথুরা তার প্রাচীন নাম ছিল ব্রহ্মর্ষি দেশ। এই ব্রহ্মর্ষিদেশের আচার উত্তম আচার হলেও তা ব্রহ্মাবর্তের আচার হতে ছিল হীন।

এই প্রদেশ হতে বৈদিক সভ্যতা কালক্রমে পূর্বদিকে প্রসার লাভ করে। ঋগ্বেদে গঙ্গা এবং যমুনা নদীর উল্লেখ একবার কি দুবার মাত্র করা হয়েছে। আর সে দুই নদীর যে বর্ণনা রয়েছে তা থেকে মনে হয় যে সে দুই নদী যে প্রয়াগে মিলিত হয়েছে তা ঋগ্বেদের ঋষিরা জানতেন না। পরবর্তীকালে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিদেহ-দেশে বৈদিক সভ্যতার প্রচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ প্রচারের অগ্রদূত ছিলেন বিদেঘ মাঠব নামক একজন ঋষি। তিনি প্রথম সদানীরা নদী অতিক্রম করেন ও উপনিবেশ বিস্তার করেন। অনেকে অনুমান করেন যে এই বিদেঘ নাম হতেই বিদেহ নামের উৎপত্তি। এছাড়া বৈদিক সাহিত্যে কীকট বা

মগধের উল্লেখ আছে, কিন্তু সে দেশ ছিল সম্পূর্ণ অনার্য ও বৈদিক সভ্যতার বহির্ভূত। আরণ্যকগ্রন্থে অঙ্গ ও বঙ্গের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তার অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

এই সব কারণেই অনুমান করা হয়েছে যে বৈদিক সদাচার পূর্বদিকে বিদেহ পর্যন্ত এসেই থেমে গিয়েছিল; আর তার পূর্বে ও দক্ষিণে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ প্রদেশে বৈদিক সভ্যতা কোনো দিনই প্রসার লাভ করেনি, বৈদিক সদাচারও প্রতিষ্ঠালাভ করেনি। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই সূত্রকারেরা যে সমস্ত উক্তি করেছেন তার মধ্যে যথেষ্ট অসংগতি আছে।

বৌধায়ন তাঁর ধর্মসূত্রে বলেছেন—

অবন্তোহ'ঙ্গমগধাঃ সুরাষ্ট্রাঃ দক্ষিণাপথাঃ।
উপাবৃৎ সিন্ধুসৌবীরা এতে সঙ্কীর্ণযোনয়ঃ।।

অর্থাৎ অঙ্গ মগধ সুরাষ্ট্র দক্ষিণাপথ উপাবৃৎ সিন্ধু ও সৌবীর দেশের লোকেরা সঙ্কীর্ণযোনি বা মিশ্রজাতি।

সেই সব দেশে গেলে ব্রাহ্মণের যে পাতক হয় আর সে পাতক হতে মুক্তি লাভ করবার যে উপায় তা বৌধায়ন তাঁর ধর্মসূত্রে নির্দেশ করেছেন—

আরট্টান্ কারস্করান্ পুণ্ড্রান্ সৌবীরান্ বঙ্গকলিঙ্গান্।
প্রনূনাং ইতি চ গত্বা যজেত সর্বপৃষ্ঠয়া বা।।

অর্থাৎ আরট্ট, কারস্কর, পুণ্ড্র, সৌবীর, বঙ্গ, কলিঙ্গ, প্রনূন প্রভৃতি দেশে যাবার জন্য যে পাতক হয় তা পুনস্তোম বা সর্বপৃষ্ঠা ইষ্টির দ্বারা দূরীভূত হয়।

বৌধায়ন এবং হিরণ্যকেশী তাঁদের শ্রৌতসূত্রে ওই কথারই পুনরুক্তি করেছেন মাত্র। কিন্তু অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রকারেরা এ সম্বন্ধে অন্যরূপ কথা বলেছেন। দেবল তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে বলেছেন যে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র ও মগধ প্রভৃতি দেশে তীর্থযাত্রার জন্য যাওয়া চলে, প্রত্যাবর্তনের পর প্রায়শ্চিত্ত করলেই দোষ কেটে যায়।

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র-মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।।

বশিষ্ঠ তাঁর ধর্মসূত্রে এ কথা আরও স্পষ্ট করে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে আর্যাবর্তের অধিবাসীরাই হচ্ছে শিষ্টাচার-সম্পন্ন এবং সেই দেশের ধর্মই সর্বত্র অনুসরণ যোগ্য। এই আর্যাবর্ত কোন্ দেশ?

বশিষ্ঠের মতে আর্যাবর্তের সীমানা হচ্ছে পশ্চিমে অদর্শন অর্থাৎ সরস্বতী নদী যেখানে মরুভূমির মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে, পূর্বে কালকবন, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্য। বশিষ্ঠ আরও বলেছেন যে অনেকের মতে গঙ্গা যমুনার অন্তর্বর্তী দেশই হচ্ছে আর্যাবর্ত। কিন্তু ভাল্লবিরা বলেন—

পশ্চাৎ সিন্ধু বিধারণী সূর্যস্যোদয়নং পুরঃ।
যাবৎ কৃষ্ণোভিধাবতি তাবদ্বৈ ব্রহ্মবর্চসম্।।

অর্থাৎ পশ্চিমে সিন্ধু নদী হতে পূর্বে যেখানে সূর্যোদয় হয় সে দেশে যতদূর কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে সেই দেশই বেদালোচনার দেশ।

মনুসংহিতায়ও এ কথার স্পষ্ট উল্লখ আছে—

আ সমুদ্রা বৈ পূর্বাদাত্তু সমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্যোরার্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ।।

কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।

স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ।।

এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।

অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিমে সমুদ্র এবং উত্তর-দক্ষিণে হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বত। এই সীমানার মধ্যবর্তী দেশকে পণ্ডিতেরা আর্যাবর্ত বলেন। এই দেশের মধ্যে যেখানে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবত বিচরণ করে তাকে যজ্ঞিয় দেশ বলে, তার বাইরে সমস্ত ম্লেচ্ছ দেশ। এই সমস্ত পবিত্র দেশকে সযত্নে আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য।

কৃষ্ণসার মৃগ পাঞ্জাব হতে আসাম পর্যন্ত সমস্ত দেশেই পাওয়া যায়। সুতরাং শাস্ত্রকারদের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে বলতে হবে যে এই সমগ্র দেশেই এক সময়ে বেদমার্গ প্রবর্তিত হয়েছিল, উত্তর ভারতের কোনো একটি বিশিষ্ট প্রদেশে তা নিবদ্ধ ছিল না।

২

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক হতে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত গৌড় ও কামরূপ প্রদেশে যে বেদালোচনা ও বৈদিক ক্রিয়াক্ষম ব্রাহ্মণদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সেই সময়ের তাম্রপট্ট ও শিলালিপি হতেই পাওয়া যায়। পাল বংশের রাজা দেবপালদেবের মুঙ্গের লিপি হতে আমরা "বেদার্থবিদ্ যাজ্ঞিক" ভট্ট বিশ্বরাতের পৌত্র আশ্বলায়ন শাখার ব্রহ্মচারী বীহেকরাত মিশ্রের পরিচয় পাই। দেবপালদেব বৌদ্ধ হলেও এই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে গ্রামদান করেছিলেন। দিনাজপুর জেলায় বাণগড় নামক স্থানে প্রাপ্ত মহীপালদেবের তাম্রশাসনে যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী শাখার অধ্যয়নে নিযুক্ত মীমাংসা ব্যাকরণ তর্ক বিশারদ্ ব্রাহ্মণদের উল্লেখ আছে। নয়লপাদেবের রাজ্যকালীন একখানি তাম্রশাসনে বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক ক্রিয়ার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা প্রণিধান-যোগ্য—

বেদাভ্যাস-পরায়ণঃ দ্বিজগণোদ্গীর্ণোগ্র-পাঠক্রমা-

দুচ্চৈ রুচ্চরিত ধ্বনিব্যতিকরৈ-র্যত্নাবধার্যা গিরঃ।

কিঞ্চাজস্রিতহোমধূমপটলধ্বান্তাবৃতৌ সাম্প্রতং।

ধর্মো যত্র মহাভয়াদিব কলেঃ কালস্য সংতিষ্ঠতে।।

"তথায় বেদাভ্যাস-পরায়ণ দ্বিজগণের কণ্ঠনিঃসৃত (শিক্ষাস্বর সমাজুষ্ট) পাঠপদ্ধতিক্রমে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চরিত পাঠধ্বনির সংমিশ্রণে (অন্য) বাক্যালাপ সযত্নে বোধগম্য হইয়া থাকে। সেখানে নিরন্তর যে হোমধূমরাশি উদ্গত হইতেছে তাহার তিমিরাবরণের মধ্যই ধর্ম কলিকালের মহাভয়ে সম্প্রতি (আত্মগোপন করিয়া) অবস্থিতি করিতেছেন।"

দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদাল নামক স্থানে প্রাপ্ত গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে এক ব্রাহ্মণবংশের বিস্তৃত পরিচয় রয়েছে। সেই বংশের কেদারমিশ্রের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

আসন্নাজিহ্মরাজদ্বহলশিখিশিখাচুম্বিদিক্চক্রবালো

দুর্বারস্ফারশক্তিঃ স্বরসপরিণতাশেষবিদ্যাপ্রতিষ্ঠঃ।

"তাঁহার (হোমোকুণ্ডোত্থিত) অবক্রভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নিশিখাকে চুম্বন করিয়া দিক্চক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত। তাঁহার বিস্ফারিত শক্তি দুর্দমনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল। আত্মানুরাগ-পরিণত অশেষ বিদ্যা তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল।"

কামরূপের প্রাচীন রাজাদের শিলালিপি যে সব স্থানে পাওয়া গিয়েছে তা বেশির ভাগই বাংলা দেশের অন্তর্গত। ভাস্করবর্মা ছিলেন কামরূপের রাজা, হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক অর্থাৎ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগের লোক। শ্রীহট্ট জেলায় নিধনপুর নামক স্থানে তাঁর এক তাম্রপট্ট পাওয়া যায়। এই নিধনপুর লিপিতে ২০৫ জন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এদের প্রত্যেককেই ভূমিদান করা হয়েছিল। এই ব্রাহ্মণেরা বেদের যে যে শাখার প্রতিনিধি ছিলেন সে সব শাখার নাম উল্লেখ করা হয়েছে—

১। যজুর্বেদ—বাজসনেয়ী, চারক্য, তৈত্তিরীয়, ১৩১

২। সামবেদ বা ছান্দোস, ১৪

৩। ঋগ্বেদ বা বহ্বৃচ্য, ৬০

সুতরাং এ অঞ্চলে যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণদেরই বেশি প্রতিপত্তি ছিল, এবং সে বেদের বাজসনেয়ী শাখার উল্লেখই বেশি পাওয়া যায়, তৈত্তিরীয় ও চারক্য শাখার উল্লেখ খুব কম। চরক বা চারক্য যজুর্বেদের শাখা বলেই অনেকেই অনুমান করেছেন, কিন্তু সে শাখা ছিল অপ্রচলিত।

এ ছাড়া, বনমাল, বলবর্মা, রত্নপাল, ইন্দ্রপাল প্রভৃতি রাজাদের তাম্রশাসনে বেদাধ্যায়ন, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং সে বিষয়ে পারদর্শী ব্রাহ্মণের বহু উল্লেখ রয়েছে।

বৈদিক যাগ যজ্ঞ ও বিভিন্ন বৈদিক শাখার প্রচলন যে সেনরাজাদের সময়েও ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ ওই যুগের তাম্রশাসন হতে পাওয়া যায়। একাদশ শতকে চন্দ্ররাজবংশ চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেছিলেন। এ চন্দ্রদ্বীপ ঠিক কোথায় তা নির্ধারিত হয়নি, তবে সে প্রদেশ দক্ষিণ বঙ্গের কোথাও অবস্থিত ছিল বলেই অনুমান হয়। এই চন্দ্র রাজাদের এক তাম্রশাসনে 'কোটিহোম' করবার উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতকে বিক্রমপুরের রাজা ভোজবর্মার এক শাসনে উত্তররাঢ় প্রদেশে যজুর্বেদের কাণ্বশাখার অধ্যয়ন নিরত এক ব্রাহ্মণবংশকে ভূমিদানের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই তাম্রশাসনেই ত্রয়ী অর্থাৎ ঋগ্‌ যজুস্‌ সাম এই তিন বেদের প্রচলনের উল্লেখ রয়েছে—'পুংসামাবরণং ত্রয়ী ন চ তয়া হীনা না নগ্না ইতি' অর্থাৎ পুরুষের আবরণই হচ্ছে ত্রয়ী, আর আমাদের সে আবরণের অভাব নেই। উত্তর রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামের শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভট্টভবদেবের এক শিলালিপি ভুবনেশ্বরে পাওয়া গিয়েছে। এই শিলালিপি একাদশ শতকের। সেই যুগে বাঙালি ব্রাহ্মণের কী কী শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন তার প্রমাণ এই শিলালিপিতে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে বেদাধ্যয়নের উল্লেখ রয়েছে—"সাবর্ণস্য মুনের্মহীয়সি কুলে যে যজ্ঞিরে শোত্রিয়া স্তেষাং শাসনভূময়োজনি গৃহং গ্রামাঃ শতং সন্তুতে"—অর্থাৎ সেই উত্তর রাঢ়ে অন্তত একশত গ্রাম ছিল যেখানে শোত্রিয় বেদাধ্যায়ন নিরত সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের শাসন-ভূমি ছিল।

সেন রাজাদের প্রথম রাজা বিজয়সেন খুব সম্ভব একাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। তিনি যে শেষ বয়সে গঙ্গাতীরে বাস করতেন তার উল্লেখ তাঁর নিজের তাম্রশাসনেই আছে। গঙ্গাতীরের সেই আশ্রম ছিল 'উদ্‌গন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্মগ- শিশুরসিতা খিন্ন বৈখানসস্ত্রী-স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপরায়ণানি"—অর্থাৎ সে স্থান ছিল হোমধূমে সুগন্ধি, সেখানে মৃগশিশু সহৃদয় বৈখানসস্ত্রীদের স্তন্যক্ষীর পান করত এবং শুক পাখিদের সমস্ত বেদ ছিল কণ্ঠস্থ। অন্যান্য সেন রাজাদের তাম্রশাসনে যে সব বেদ ও বৈদিক শাখার উল্লেখ আছে সেগুলির নাম করলেই বোঝা যাবে যে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণদের সে সময়ে বৈদিক সভ্যতার

সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল। সে নামগুলি হচ্ছে এই—সামবেদ— কৌথুমী শাখা, ঋগ্বেদ—আশ্বলায়ন শাখা, অথর্ববেদ—পৈপ্পলাদ শাখা, যজুর্বেদ—কাণ্ব শাখা। ত্রয়োদশ শতক হতে সেন রাজাদের যে সব তাম্রশাসন পাওয়া যায় তাতে আর আমরা বেদ অথবা বৈদিক ক্রিয়াপদ্ধতির বিশেষ উল্লেখ পাই না।

সুতরাং খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক হতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা দেশে যে বৈদিক সভ্যতার প্রচলন ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নাই। হয়ত এ প্রচলন হয়েছিল মধ্যদেশ হতে আগত ব্রাহ্মণদের হাতে। মধ্যদেশ হতে যে ব্রাহ্মণেরা বাংলা দেশে এসেছিলেন তার প্রমাণ আদিশূরের গল্প ছেড়ে দিলে এই যুগের শিলালিপি বা তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। ভোজবর্মা এবং বিজয়সেনের তাম্রশাসনে "মধ্যদেশবিনির্গত" ব্রাহ্মণদের উত্তর রাঢ় এবং পুণ্ড্রবর্ধন বা বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূমিদানের কথা স্পষ্ট করেই উল্লিখিত হয়েছে। তা ছাড়া উত্তরবঙ্গে শ্রাবস্তী কৌশাম্বী প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সব জনপদ যে মধ্যদেশ হতে আগত ব্রাহ্মণেরা স্থাপিত করেছিলেন সে অনুমান করা হয়তো অসংগত নয়।

৩

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে বাংলা দেশ হতে বেদানুশীলন এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড লোপ পেল কী করে। আমার মনে হয় যে তা কোনো দিনই লোপ পায়নি, রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র। তন্ত্রশাস্ত্রের এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিষ্ঠা ও বেদানুশীলনের লোপ এক সময়ে ঘটে এবং এই দুই ঘটনার মধ্যে যে যোগ রয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। বেদানুশীলন শুধু তন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। বেদ ও তন্ত্র উভয়েই হচ্ছে আগম অর্থাৎ অপৌরুষেয়। তন্ত্রশাস্ত্র প্রাচীন হলেও প্রাচ্যভারতে তার বহুল প্রচার হয় খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের পরে এবং বাংলা দেশে সেই সময় হতেই বা তার কিছু পূর্বে থেকেই সে শাস্ত্র বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলা দেশের হিন্দু সভ্যতা যে বর্তমানে বহু পরিমাণে তান্ত্রিক তা তার দেবদেবী, পূজাপদ্ধতি ও সামাজিক আচার ব্যবহার অনুশীলন করলে সহজেই বোঝা যায়।

তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতি কী পরিমাণে বেদের মধ্যে আছে তা এখনো নির্ধারিত হয়নি। তার কারণ বৈদিক মন্ত্রের অর্থ এখনো সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের চেষ্টায় বৈদিক মন্ত্রের বহু পরিমাণে শব্দগত অর্থ নির্ধারিত হয়েছে—কিন্তু মর্মার্থ যে এখনও ধরা যায়নি তা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। শব্দগত অর্থ নির্ধারণ করবার জন্য যথেষ্ট বৈদিক উপাদান ছিল, কিন্তু মর্মার্থ উদ্ধার করবার উপাদানের অভাববশতই তা সম্ভব হয়নি। সায়নভাষ্যের মধ্যে মর্মার্থ গ্রহণের উপাদান কিছু যে নাই তা বলা যায় না, তবে তা এত অসংলগ্ন ভাবে রয়েছে যে তার প্রামাণ্য স্বীকার করা অসম্ভব।

বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে যোগসূত্রের অভাব নেই। উভয়েই 'মন্ত্র' এবং সে মন্ত্রশক্তিতে আমাদের বহুদিন ধরেই অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। তা ছাড়া বৈদিক মন্ত্রের মর্মার্থ যে তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে তাহা প্রমাণ করাও অসম্ভব নয়। ঋক্ মন্ত্রে ঊর্ধ্বমূল ও অধঃশাখ বৃক্ষের উল্লেখ আছে। এ বৃক্ষকে বর্তমানযুগের অনেক বেদজ্ঞ পণ্ডিত অশ্বত্থ গাছ মনে করেছেন। বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতেরা বলেছেন যে সে মন্ত্রে সত্যকার কোনো গাছের উল্লেখ নাই এবং সে মন্ত্রের অর্থও স্পষ্ট উপলব্ধি করা অসম্ভব। অথচ এই গাছের উল্লেখ উপনিষদেও নানাস্থানে পাওয়া যায়। যথা মুণ্ডকে—

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।'

অর্থাৎ সহবর্তী ও সমান-স্বভাব দুটি সুপর্ণ একই বৃক্ষে সংসক্ত রয়েছে।

সুপর্ণ দুটি যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা তা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু বৃক্ষটি কী? শংকর তাঁর ভাষ্যে বলেছেন—অয়ং হি বৃক্ষ উর্ধ্বমূলোহবাক্‌শাখোহ শ্বথোহ'ব্যক্তমূলপ্রভবঃ ক্ষেত্রসংজ্ঞকঃ সর্বপ্রাণিফলাশ্রয়ঃ—অর্থাৎ ক্ষেত্রসংজ্ঞক এই অশ্বত্থ বৃক্ষটির মূল উর্ধ্বদিকে, শাখাসমূহ অধোদিকে, অব্যক্ত প্রকৃতিরূপ মূল হতে এর উৎপত্তি এবং সমস্ত প্রাণীর কর্মফলের এ বৃক্ষ হচ্ছে আশ্রয়।

তন্ত্রশাস্ত্রে এ বৃক্ষের বহু উল্লেখ আছে। একটি উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে—

ওঁকার পূজনা বাক্যং একবৃক্ষাদিরগ্রতঃ।<br>
কোষাভ্যন্তরতঃ স্থানে অন্যবৃক্ষে বিবর্জিতঃ।।<br>
একবৃক্ষেতি সর্বেষাং কথ্যতে ন চ জ্ঞায়তে।<br>
শরীরং বৃক্ষমিত্যুক্তং করশাখাদিযোজিতং।।<br>
বেদান্তেষু চ পঠ্যন্তে তন্ত্র-তন্ত্রান্তরেষু চ।<br>
উর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ঃ।।<br>
ফলপুষ্পসমন্বিত-বৃক্ষনামেন চোচ্যতে।<br>
গুপ্তবৃক্ষমজানীয়াদেহমধ্যে ব্যবস্থিতম্।।

সুতরাং তন্ত্রমতে বেদ-উপনিষদে উল্লিখিত সে উর্ধ্বমূল অধঃশাখ বৃক্ষ হচ্ছে দেহমধ্যস্থ গুপ্তবৃক্ষ এবং সে গুপ্তবৃক্ষ যে কী তা যাঁরা তন্ত্রালোচনা করেছেন তাঁরা সকলেই জানেন।

তন্ত্রে বেদের এই যে মর্মার্থের খোঁজ পাওয়া যায় তা কতটা যথার্থ তা বিচার-সাপেক্ষ। কিন্তু তার ভিতর যে এ মর্মার্থ নির্ধারণের ধারাবাহিক চেষ্টা আছে তা স্বীকার করতেই হবে।

উৎস : পরিচয়, আষাঢ় ১৩৪৫

# গৌড় বঙ্গ

## সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

'গৌড়', বাঙ্গালা দেশের অন্যতম নাম—একথা আমরা সকলেই জানি। এই নাম, আর 'বাঙ্গালাদেশ' বা 'বঙ্গদেশ'—এই দুইটি নামের পিছনে যে ইতিহাস আছে, তাহা কৌতূহলোদ্দীপক।

ভারত-বিভাগের পরে যখন পাকিস্তান সৃষ্ট হইল, এখন হইতে প্রায় বিশ বৎসর হইতে চলিল, 'বঙ্গদেশ' বা 'বাঙ্গালাদেশ', যাহা সমগ্র বাঙ্গালা-ভাষী জনগণের অবিভক্ত মাতৃভূমি ছিল, তাহার নামেও ভাঙন ধরিল। ভাষার ভিত্তিতে, বঙ্গভাষী সমগ্র বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত এক-মাত্র ভাষা বাঙ্গালাভাষার কতকগুলি লক্ষণীয় কিন্তু অপ্রধান (অর্থাৎ যাহা বোধগম্যতার হানি করে না এমন) প্রান্তিক ভেদ বা পার্থক্য ধরিয়া, মোটামুটিভাবে, "পশ্চিম বঙ্গ" ও "পূর্ব বঙ্গ" এই দুইটি ভাগে সমগ্র বঙ্গদেশকে বিভাগ করিয়া দেখিতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। ইংরেজ আমলের বাঙ্গালা দেশের প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান ডিভিশনের অন্তর্গত জেলাগুলির কথ্য ভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ধরিয়া, ওই দুই ডিভিশনকে "পশ্চিম বঙ্গ" বলিয়া ধরা হইত এবং তদ্রূপ রাজশাহি ঢাকা ও চট্টগ্রাম ডিভিশনের অধীন জেলাগুলিকে তেমনি "পূর্ব বঙ্গ" পর্যায়ে ফেলা হইত—উত্তর বঙ্গের স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকৃত হয় নাই, ভাষা-ভিত্তিক বিচারে কতকগুলি বাঙ্গালা ধ্বনির উচ্চারণ ধরিয়া উত্তর বঙ্গের কথ্য ভাষাগুলিকে পূর্ব বঙ্গের কথ্য ভাষার সামিল বা তাহার সহিত সম্পৃক্ত করিয়া ধরা হইত। ভাষা-বিষয়ক "কচ্চায়ন" বা কচকচির মধ্যে যাইব না। তবে চ-বর্গের বর্ণগুলির উচ্চারণ, হ্-কার ও মহাপ্রাণ ঘোষবদ্ ধ্বনি "ঘ ঝ ঢ ধ ভ" এই বর্ণগুলির উচ্চারণ, সাধারণত স্বরধ্বনির উচ্চারণে অপিনিহিতির সংরক্ষণ ও অভিশ্রুতির অভাব—এইগুলিকে আশ্রয় করিয়াই বিদ্যমান ছিল পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গের কথ্য ভাষার মুখ্য প্রভেদ। পূর্ব বঙ্গের ভাষা, পূর্ব বঙ্গের প্রাচীন নাম ধরিয়া 'বাঙ্গাল' বা 'বাঙাল' ভাষা বলিয়া পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিল। দেশ-বিভাগের পূর্বে, এবং বিশেষ করিয়া দেশ-বিভাগের পরে, পূর্ব বঙ্গের মানুষ প্রচুর পরিমাণে পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করায়, এখন পশ্চিম বঙ্গের ভাষার উপরে পূর্ব বঙ্গের প্রভাব খুব অধিক পরিমাণে আসিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে; যেমন পশ্চিম বঙ্গের ভাষার প্রভাব বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টির সময় হইতেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে পূর্ব বঙ্গের ভাষাকেও গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। "পূর্ব বঙ্গ" ও "পশ্চিম বঙ্গ"—সমগ্র বঙ্গদেশের এই দুই বিভাগ যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারিভাবে

গৃহীত হয় নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার দ্বারা বঙ্গভাষী জনগণের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক একতাবোধে কোনো দাগ পড়ে নাই। লর্ড কার্জনের কুখ্যাত বঙ্গ-ভঙ্গের উদ্দেশ্য ছিল, অখণ্ড বঙ্গদেশকে দুই খণ্ড করিয়া দুইটি পৃথক্‌ভাবে শাসিত প্রদেশে পরিণত করিয়া, বাঙ্গালা দেশ ও বঙ্গভাষী জনগণকে আর একতাবদ্ধ ও সুসংহত না রাখিয়া, খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া। সমগ্র বঙ্গভাষী জাতির, বিশেষত হিন্দু বাঙ্গালির-প্রতিরোধের ফলে, এই অপচেষ্টা কার্যকর হইল না—১৯১১ সালে বঙ্গভাষী জাতি এক প্রদেশের মধ্যে পুনরায় সংগ্রথিত হইল।

পাকিস্তানের স্থাপনের পরে, ''পশ্চিম বঙ্গ'' ও ''পূর্ব বঙ্গ'', এই দুইটি খণ্ডদেশরূপে অবিভক্ত বঙ্গদেশ আবার দেখা দিল। যত দিন 'পশ্চিম বঙ্গ' বা 'পশ্চিম বাঙ্গালা' এবং 'পূর্ব বঙ্গ' বা 'পূর্ব বাঙ্গালা' এই দুইটি নাম থাকিবে, তত দিন একটি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী বঙ্গভাষী জাতির পূর্বস্মৃতি এবং ভবিষ্যৎ আশাও হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গালির মন হইতে একেবারে মুছিয়া যাইতে পারিবে না। 'পশ্চিম বঙ্গ' ('ওয়েস্ট্ বেঙ্গল') বলিলেই সঙ্গে-সঙ্গে তাহার জবাব-রূপে 'পূর্ব বঙ্গ' (বা 'ইস্ট্ বেঙ্গল') নামটিও আপনা হইতেই আসিবে। সমগ্র বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এই ঐক্যবোধকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রতিবাদ করা হইয়াছিল—মাঝে যে প্রস্তাব উঠিয়াছিল যে 'পশ্চিম বঙ্গ' ('ওয়েস্ট্ বেঙ্গল') নামটিকে বর্জন করিয়া তাহার স্থানে কেবল 'বঙ্গদেশ' বা 'বাঙ্গালা দেশ' (বেঙ্গল) বলা হউক, ভারত-সরকারও এই নাম গ্রহণ করুক,—তাহা অনুচিত, অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক, এবং দেশাত্মবোধের পরিপন্থী; অতএব এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হউক। সুখের বিষয়, 'পশ্চিম বঙ্গ' নামটি বিতাড়িত করিবার প্রস্তাবটি সম্বন্ধে এই আপত্তি উঠায়, ইহা গৃহীত হয় নাই। বঙ্গ-ভাষী মুসলমানগণের মন হইতে তাঁহাদের ভাষা ও জাতি-বিষয়ক গৌরব-বোধকে (যাহা ধর্ম-বিষয়ক গৌরব-বোধ হইতে পৃথক তাহাকে) অবলুপ্ত করিয়া দিবার সাধন-হিসাবে, পাকিস্তান সরকার 'পূর্ব বঙ্গ' ('ইস্ট্ বেঙ্গল') নামটির পরিবর্তে কেবল 'পূর্ব পাকিস্তান'-ই ব্যবহার করিতেছেন।* কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইতেছে, তাহা বলা যায় না—পূর্ব বঙ্গের বাঙ্গালি মুসলমান আরও আগ্রহের সহিত, এমন-কি প্রাণ দিয়াও, তাঁহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালার মর্যাদা বজায় রাখিতেছেন।

''বঙ্গ-দেশ'' বলিলে প্রাচীনকালে সাধারণভাবে মাত্র পূর্ব বঙ্গেরই কতকগুলি অঞ্চল বুঝাইত, সারা বাঙ্গালা দেশ নহে। বাঙ্গালা ভাষা গড়িয়া উঠিবার কালে, এবং তাহার পরে কয়েক শত বৎসর ধরিয়া, বঙ্গভাষী জনগণের নিবাস-ভূমি দুইটি প্রধান নামে অভিহিত হইত—'গৌড়' ও 'বঙ্গ' (বা 'বঙ্গাল')। উত্তর বঙ্গ (বরিন্দ বা বরেন্দ্র-ভমি—রাজশাহি, মালদহ, বগুড়া, পাবনা) ও রাঢ় এবং সুহ্ম (পশ্চিম বঙ্গ—বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর)—এই অঞ্চলগুলি লইয়া 'গৌড়দেশ', আর বড়ো-নদী পদ্মার অপর পারে ও পদ্মা নদীর দক্ষিণের দেশে, তথা সুদূর প্রাচ্য বাঙ্গালায় ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, কুমিল্লা (পট্টিকেরা) ও চট্টল অঞ্চল—এই সমস্ত ধরিয়া 'বঙ্গদেশ'। সমগ্র গৌড়-বঙ্গ প্রদেশের আর কতকগুলি বিভাগ জন সমাজে প্রচলিত ছিল—রাঢ়, সুহ্ম, ঝাড়খণ্ড (মানভূম, পুরুলিয়া, সিংহভূম), কর্ণসুবর্ণ বা কানসোনা, বরেন্দ্র, সমতট, বাগড়ি (সুন্দরবন

* এই প্রবন্ধ লেখা হয় ইংরেজি ১৯৬৭ সালে, তখনও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়নি।

অঞ্চল), বঙ্গ, কোচবিহার, কামতাবিহার, ময়মনসিংহ, চট্টল, ত্রিপুরা প্রভৃতি। বঙ্গভাষী জনের প্রভাবে ইহার কতকগুলি অঞ্চল আসিলেও সেদিন পর্যন্ত সেগুলি মুখ্যত ভোট-চিন শ্রেণির মানুষেরই বাসভূমি ছিল—যেমন কোচবিহার, পূর্ব ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ, এবং ওদিকে ত্রিপুরা।

"গৌড়" ও "বঙ্গ"—প্রধানত এই দুই বিশিষ্ট প্রদেশ লইয়া আজকার অখিল বঙ্গ, বঙ্গদেশ, বাঙ্গালা বা বাঙ্গলা। এই দুইটি নাম-ই বিশেষ প্রাচীন, এ দুটি খ্রিস্টপূর্ব যুগে গিয়া পৌঁছায়। মহাভারতে আমরা 'গৌড়' 'বঙ্গ' দুইটি নাম-ই পাই। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে প্রাচ্য দেশের নগর রূপে 'গৌড়পুর' পাওয়া যায় ['পুরে প্রাচাম্। অরিষ্ট-গৌড়-পূর্বে চ।'—৬।২।৯৯-১০০], যদিও বঙ্গের উল্লেখ নাই। "অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ"—এই তিনটি নাম একত্র পাই, তিনটি বিভিন্ন অনার্য (সম্ভবত কোল-ভাষী) উপজাতির নাম; এই তিনটি উপজাতি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ ছিল, ইহাদের উৎপত্তি এক-ই ছিল। 'গৌড়' নামটির কোনোও সর্ব-জন-মান্য ব্যাখ্যা নাই। গুড়ের দেশ বলিয়া 'গৌড়' নাম, এইরূপ একটি মত আছে; 'পুণ্ড্র বর্ধন' (আধুনিক 'পাড়ুয়া'—'পেঁড়ো') বরেন্দ্রভূমির একটি বিশিষ্ট স্থানের নাম, পুঁড়'—আখের জায়গা। সুতরাং এই হিসাবে 'গুড়' হইতে 'গৌড়' হইতে বাধা নাই। কিন্তু 'গৌড়' নামটি বহুশ বরেন্দ্র-ভূমের মালদহ রাজশাহি প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও, ইহার একটি ব্যাপক প্রয়োগ আছে। এক হিসাবে সমগ্র উত্তরাপথের এক ব্যাপক নাম ছিল 'গৌড়'—বাঙ্গালা দেশও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তরপ্রদেশের 'গোণ্ডা' বা 'গোঁড়া' জেলা 'গৌড়' নামেরই রূপভেদ—এবং কাহারও কাহারও মতে, 'গোণ্ড' নামে পরিচিত একটি প্রাচীন অনার্য (দ্রাবিড়-ভাষী) জাতির নাম-ই হইতেছে "গোণ্ডা, গোঁড়া, গৌড়" নামের পূর্বরূপ। (কিন্তু মধ্য ভারতে, অন্ধ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে যে আদিবাসী দ্রাবিড়-ভাষী 'গোণ্ড' জাতি এখন বাস করে, উত্তরাপথের এই আদি 'গোণ্ড'কে ইহাদের হইতে পৃথক্ বলিয়াই ধরিতে হয়, যদিও তাহাদের মধ্যে মৌলিক সংযোগ বা সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে।) সমগ্র আর্য ভারতকে কোনো এক সময়ে কাহারও কাহারও দ্বারা 'গৌড়' বলা হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় 'পঞ্চ গৌড়' এই নামের প্রয়োগে। একটি বহুল-প্রচলিত লোকমত অনুসারে ভারতের ব্রাহ্মণগণ দশটি শাখা বা শ্রেণি বা উপজাতিতে বিভক্ত—'পঞ্চ গৌড়' ও 'পঞ্চ দ্রাবিড়'। 'পঞ্চ গৌড়' ব্রাহ্মণ হইতেছেন—'গৌড়, সারস্বত, কান্য-কুব্জ, উৎকল ও কাশ্মীর'*; এবং 'পঞ্চ দ্রাবিড়'—'গুর্জর, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, অন্ধ্র, দ্রাবিড়'। এই শ্রেণিবিভাগ কতকটা ভৌগোলিক—'গৌড়' অর্থাৎ উত্তরদেশীয়, এবং 'দ্রাবিড়' অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের ও দক্ষিণ-ভারতের। ইঁহাদের মধ্যে সারস্বত ব্রাহ্মণেরা কোঙ্কণ প্রদেশে ও পাঞ্জাবে উভয়ত্র বাস করেন; আবার গুর্জর ও মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণগণ, 'নাগর, দেশস্থ, কহ্লাড়, কোঙ্কণস্থ' প্রমুখ নানা বিভাগে বিভক্ত, এবং সকলেই আর্য-ভাষী—গুজরাটি ও মারাঠি। 'গৌড়' ব্রাহ্মণ পর্যায়ে গৌড়-বঙ্গের রাঢ়ী, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য বৈদিক, দাক্ষিণাত্য বৈদিক, মধ্যশ্রেণির—সবই

---

* The expression Panch-Gauda which in some texts is taken to embrace beside Gauda proper, the countries known as Sarasvata (Eastern Panjab) Kanyakubja (Gangetic Doab), Mithila (North Bihar) and Utkala (Northern Orissa). This is reminiscent of the Gauda empire of Dharmapala, But there is no early warrant for the use of the term Gauda in this wide sense. History of Bengal, Vol I, ed. R. C. Majumdar, Ch I (Physical and Historical Geography by Prof. H. C. Roychoudhuri, University of Dacca, 1943, p. 14.)

আসে। একমাত্র 'গৌড়' শব্দের ব্যাপক এবং অখিল-উত্তরাপথ-দ্যোতক অর্থ ছাড়া, এখানে 'গৌড়' শব্দের আর কোনো সার্থকতা নাই। ভারতের আধুনিক আর্য-ভাষার আলোচনায় প্রথম যুগের বিখ্যাত ইউরোপীয় গবেষক, জর্‌মান পণ্ডিত A. F. Rudolf Hoernle হ্যর্‌ন্‌লে সাহেব এই ব্যাপক অর্থ ধরিয়াই তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তকের নাম-করণ করিয়াছিলেন—A Comparative Grammar of the Gaudian Languages, with, special reference to Eastern Hindi, অর্থাৎ 'গৌড়ীয় ভাষা-সমূহের তুলনাত্মক ব্যাকরণ, পূর্বী হিন্দির আধারে' (প্রকাশিত হয় লন্ডনে, ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে)। উত্তর ভারতের সমস্ত আর্য-ভাষা এইভাবে প্রসারিত অর্থে 'গৌড়ীয় ভাষা' নামে ইংরেজিতেও অভিহিত হইল। অবশ্য রামমোহন রায় যখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ লেখেন, তাহার নাম দিয়াছিলেন "গৌড়ীয় ব্যাকরণ"—বাঙ্গালা ভাষা অর্থে এই শব্দের সংকুচিত অর্থে তিনি শব্দটি ব্যবহার করেন।

'গৌড়' ছিল প্রধানত পশ্চিম বাঙ্গালা, উত্তর মধ্য-বাঙ্গালা ইহার অন্তর্গত ছিল, এবং 'বঙ্গ' (দেশ-অর্থে, অধিবাসী অর্থে 'বঙ্গাল') ছিল ব্যাপকভাবে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ। এইজন্য প্রাচীন ও মধ্য যুগে হিন্দু আমলে সমগ্র দেশের জন্য 'গৌড়-বঙ্গ' (অথবা 'গৌড়-বঙ্গাল') এই সমস্ত-পদ ব্যবহৃত হইত। ফেরিশ্‌তা [ ১৫৭০-১৬১২ খ্রিঃ অঃ ] তাঁহার ফারসি ভাষায় রচিত ইতিহাসে [ তারিখ্‌-ই-ফেরিশ্‌তা ] এক স্থলে লিখিয়াছেন—

"ধর্মপালের বিজয় গৌরবই উত্তরভারত-বোধক পঞ্চগৌড় নামটির উৎপত্তির কারণ বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে উত্তরভারতের ব্রাহ্মণসমাজ যে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়, সেগুলি পঞ্চগৌড় নামে প্রসিদ্ধ। সে পাঁচটি হচ্ছে—সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল এবং উৎকল। 'পঞ্চগৌড়' নামের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের চিঞ্চান তাম্র শাসনে (৯২৬ খ্রি) দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত 'পঞ্চগৌড়' উল্লিখিত আছে। পরবর্তীকালের মিথিলাধিপতি শিবসিংহ 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।" ('ধর্মপাল সম্পর্কে নূতন তথ্য', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৯ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩১০, পৃ ১)

"পূরব ও বঙ্গ-এর জনগণ"—এখানে খালি 'বঙ্গ' শব্দ-ই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভ হইতে, পশ্চিম হইতে আগত বিদেশি তুর্কি মুসলমান বিজেতাদের দ্বারা পশ্চিম বঙ্গ বিজয়ের পরে, ও ক্রমে মুসলমান শক্তি কর্তৃক পূর্ব বঙ্গ বিজয় ঘটিয়া গেলে, সারা দেশের জন্য একটি নাম মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক গৃহীত হয়,—'বঙ্গাল' শব্দের আধারে। 'বঙ্গালহ্‌'—এই 'বিস্তৃত' রূপ, মিলিতভাবে গৌড়-বঙ্গ উভয় অঞ্চলের জন্য গৃহীত হইয়া যায়; এবং 'বঙ্গালহ্‌' (উচ্চারণে 'বঙ্গালা') শব্দের উত্তর বিশেষণার্থে 'ঈ' প্রত্যয় যোগ করিয়া 'বঙ্গালি'—সারা বাঙ্গালার অধিবাসী। কিন্তু কেবল পূর্ব বঙ্গের অধিবাসী অর্থে 'বঙ্গাল' শব্দ প্রচলিত থাকে—আধুনিক কালে বাঙ্গালির মুখে ইহার উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে 'বাঙ্গাল' (পূর্ব বঙ্গে), ও 'বাঙাল' (পশ্চিম বঙ্গে)। বাঙ্গালির মুখে আর কয়েকটি সংক্ষিপ্ততর রূপ শোনা যায়—'বাঙ্গালা' হইতে 'বাঙ্গ্‌লা' 'বাঙলা' ('বাংলা')—প্রথম অক্ষরের উপরে প্রবল বলাঘাতের ফলে, দ্বিতীয় অক্ষরের 'আ' স্বরধ্বনির লোপ ঘটে। এই 'বাঙ্গ্‌লা' শব্দকেই আবার হিন্দিতে লেখা হয় 'বংগলা, বঁগলা, বঙ্গ্‌লা' রূপে। ফারসির 'বঙ্গালহ্‌' হইতে খ্রিস্টীয় ১৫০০-র পর হইতে নানা ইউরোপীয় ভাষায় Bengala, Bengalla, Bengall, Bengal প্রভৃতি, এবং দেশের লোক জানাইতে Bengalese, Bengalee, Bengali প্রভৃতি রূপ প্রযুক্ত হইতে থাকে।

'বঙ্গ' প্রথমটায় কেবল পূর্ব বঙ্গ সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল বলিয়া, সারা দেশের জন্য ফারসি ভাষার কল্যাণে 'বাঙ্গালা (বাঙ্‌লা), বাঙ্গালি (বাঙালি)' দাঁড়াইয়া গেলেও, পূর্ব-বঙ্গ-বর্জ্য কেবল পশ্চিম বঙ্গের জন্য 'বঙ্গদেশ' শব্দের ব্যবহার সমীচীন ও সংগত হইবে না, ঐতিহাসিক ও ব্যাবহারিক উভয় দৃষ্টিতেই। সেইজন্য পুরাতন নাম, 'গৌড়-বঙ্গ' এই যুগ্ম-নাম, ব্যবহার করিলে—অন্তত আনুষ্ঠানিক ব্যাপার উপলক্ষ্যে—দুইটি পুরাতন নামেরই স্মৃতি ও মর্যাদা উভয়-ই রক্ষিত হয়।

মধ্য যুগের বাঙ্গালায়, বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের মানুষের জন্য 'গৌড়িয়া' শব্দ ব্যবহৃত হইত। শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালে, নবদ্বীপ বা পশ্চিম বঙ্গের কোনো স্থান হইতে কেহ পুরীধামে উপস্থিত হইলে, 'গৌড়িয়া' বলিয়া অভিহিত হইতেন, 'বাঙ্গালি' বলিয়া নহে। 'গৌড়িয়া' শব্দের এই প্রয়োগ অন্যত্রও পাওয়া যায়। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণকে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বলিয়া গিয়াছেন। মধুসূদন তাঁহার 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে লিখিয়া গিয়াছেন—"কবির চিত্ত-ফুলবন মধু/লয়ে, রচ, মধুচক্র, গৌড়জন যাহে/আনন্দে করিবে পান সুধানিরবধি।" যশোহর জেলায় তাঁহার জন্মস্থান ছিল, কিন্তু সমগ্র বঙ্গভাষী (বা গৌড়ীয়-ভাষী) জনের জন্য "গৌড়-জন" শব্দ-ই তিনি প্রশস্ত মনে করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পোর্তুগিস পাদ্রি মানোএল-দা আস্‌সুম্প সাওঁ বঙ্গ ভাষার জন্য Bengalla শব্দ-ই লিখিয়াছেন (১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিস্‌বন-নগরীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত)। তদ্রূপ ইংরেজ নাথানিএল্‌ ব্রাসি হাল্‌হেড্‌ তাঁহার Grammar of the Bengal Language প্রকাশিত করেন (১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে, হুগলি হইতে প্রকাশিত)। ইংরেজ বাপ্‌টিস্ট পাদ্রিরা যখন শ্রীরামপুর হইতে কৃত্তিবাসের বাঙ্গালা রামায়ণ প্রথম প্রকাশিত করেন, তখন পুস্তকের নামপত্রে এইরূপ মুদ্রিত হয়—"কৃত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল।"

ইহা-ই হইল 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' নাম দুইটির মোটামুটি ইতিহাস। এই দুইটি নাম-ই গৌড়-বঙ্গ-বাসী সমস্ত বঙ্গ-ভাষীর প্রিয়। ঐতিহাসিকবোধমণ্ডিত নাম; এবং এই সংযুক্ত নামের অনুরূপ অন্য নানা দেশের-ও নাম আছে। যেমন Czechoslovakia—চেখ্‌ ও স্লোভাক, এক-ই বোহেমীয় স্লাভ্‌ জাতির অতিঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত দুইটি উপজাতির নাম মিলাইয়া রাষ্ট্রের নাম; যেমন চিনা জাতির Han 'হান্‌' নাম এখন প্রায় সর্বক্ষেত্রে সমগ্র চিনা জাতি ও ভাষার জন্য ব্যবহৃত হইলেও কখনও কখনও চিনা জাতির উল্লেখ করা হয় Han 'হান্‌' বা উত্তর-চিনা ও Thang 'থাঙ্‌' বা দক্ষিণ-চিনা, এই দুইটি নামের সাহায্যে; যেমন দোর্দণ্ড-প্রতাপ ইংরেজ জাতিও, তাহার দুইটি প্রধান ও প্রাচীন শাখার নাম Engle বা Angle (যাহা হইতে English, England) এবং Seaxe, এই দুইটিকে সমাসযুক্ত করিয়া, বহু স্থলে Anglo-Saxon এই মিলিত নামে এখনও অভিহিত হইয়া থাকে।

উৎস : *গৌড়দেশ*, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৭৩

# বঙ্গভাষী জনপদের নাম

## সুকুমার সেন

ভাষা নিয়ে জাতি, জাতি নিয়ে দেশ। বাংলা ভাষার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জাতির ইতিহাস শুরু। কিন্তু বাংলা ভাষার পূর্ব-ইতিহাস আছে। এ ভাষা পূর্ববর্তী একটু অন্যরকম ভাষা থেকে উৎপন্ন, এবং সে ভাষাও প্রাচীনতর ভাষা থেকে উদ্‌গত হয়েছিল। এইভাবে বাংলা ভাষার সূত্র ধরে পিছিয়ে গেলে আমরা পৌঁছোই সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃত ভাষার সূত্র অনুসরণে পিছু হটলে আমরা পেরিয়ে যাই ভারতবর্ষের সীমানা। তার সঙ্গে বঙ্গভূমির ইতিহাসের সম্পর্ক নেই, বলাই ভালো। সংস্কৃত বাংলা দেশের আদিম ভাষা নয়। (আদিম ভাষা নিশ্চয়ই একটা অথবা অনেকগুলি ছিল কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নই।) মাতৃভাষা সংস্কৃত নিয়ে (—এখানে 'সংস্কৃত' নামটি সংকীর্ণ অর্থাৎ পাণিনি-নিয়ন্ত্রিত ভাষা বুঝলেই চলবে না, বৈদিক এবং বৈদিকেতর প্রাচীন রূপও বুঝতে হবে—) যাঁরা এদেশে প্রথম উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন তাঁরাই বাঙালিদের সাক্ষাৎ পূর্বতন পুরুষ। তার আগে এদেশে যদি কোনো জাতি থেকে থাকেন (—থাকার সম্ভাবনাই সমধিক—) তাঁরা উপনিবিষ্ট দলের মধ্যে মিশে গেছেন। তাঁরাও আমাদের পূর্বপুরুষ, তবে অজ্ঞাতকুলশীল। এঁদের সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদেরা আলোচনা করেছেন। সে আলোচনা আমাদের এই ইতিহাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে কোনো কোনো স্থানে মাটির ভিতর থেকে খুব প্রাচীন জনবসতির সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখানে যে প্রত্নবস্তু মিলেছে তার থেকে অনুমান করা যায়, এঁরা ধান চাষ করতেন এবং মৃৎপাত্র গড়তেন। এঁরা কতদিন আগে বর্তমান ছিলেন তা এখনও বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্ধারিত হয়নি। সুতরাং এই প্রাচীন জনবসতি উপনিবিষ্ট দলের কি না তা আপাতত নির্ণয় করা যায় না।

সংস্কৃত-ভাষী জনদল এদেশে কবে প্রথম উপনিবিষ্ট হয়েছিল তা বলা যায় না। তবে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর অনেক কাল আগেই সে ঘটনা ঘটেছিল। এদেশ নদীবহুল, এদেশের অনেক ভূভাগ বর্ষায় জলপ্লাবিত থাকে। আগে আরও নদীবহুল ছিল, জলপ্লাবন আরও বেশি স্থানে ঘটত। তবে এখনকার তুলনায় উঁচু স্থান তখন আরও উঁচু ছিল এবং নিচু স্থানগুলি আরও নিচু ছিল। সমুদ্রও আরও ভিতর পর্যন্ত ছিল। মোট কথা ইতিহাস আরম্ভ হবার পরেও বঙ্গভূমিব আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি আগেকার মতোই চলে এসেছিল, এবং বালি ও পলিবহনের ফলে বঙ্গভূমির উপকূলভাগ ক্রমশ দক্ষিণে সরে যেতে থাকে।

একাজ এখনও চলছে তবে ধীরে, এদেশের উপকূলভাগের বিবর্ধনক্রিয়া এখনও স্তব্ধ হয়নি।

প্রথমে জনসংখ্যা কম ছিল। তার কারণ শুধু যে তখন পৃথিবীর সর্বত্র জনসংখ্যা কম ছিল তাই নয়। এদেশে বনজঙ্গল অনেক বেশি ছিল এবং ভালো নদীর অদূরে বসতিযোগ্য স্থলও কম ছিল। জনপদগুলি সংখ্যায় অল্প এবং পরস্পর থেকে দূরবিচ্ছিন্ন ছিল। তবে নদীগুলির বেশির ভাগ বারো মাস নাব্য ছিল, সে কারণে যাতায়াতের পক্ষে দুর্গমতা খুব ছিল না।

এখনকার তুলনায় সেকালের অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর এবং তার আগেকার "বঙ্গভূমি"-র—অর্থাৎ বাংলা-ভাষীর পূর্বপুরুষের নিবাসভূখণ্ডের—আয়তন অনেক বড়ো ছিল। এখনকার দিনের বিহারের বেশ খানিকটা এবং কামরূপ পর্যন্ত পূর্বভারতের কতকটা আর উত্তরে হিমালয়ের পাদপর্যন্ত তখনকার বঙ্গভূমি প্রসারিত ছিল। (তবে এই ভূখণ্ডের মধ্যে স্থানে স্থানে, বিশেষ করে জঙ্গল ও অনূপ স্থানে, অন্য ভাষাভাষী ছোটো বড়ো দলেরও জনপদ ছিল এখনকার মতোই, তবে অনেক বেশি পরিমাণে।) মোটকথা হল এই যে, জ্ঞাত ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠাতে 'বঙ্গভূমি' ও 'বাঙালি' বলতে গেলে বুঝব—স্থানীয় অবস্থা-ভেদে—'পূর্বভারত' ও 'পূর্বভারতীয়' শব্দের সঙ্গে অভিন্ন। একই ভাষার অল্পস্বল্প স্থানীয় রূপান্তর স্বীকার করে নিয়ে বলা যায় যে তখন বাংলা বিহার উড়িষ্যা মোটামুটি একই দেশ ছিল। এই দেশের আচারব্যবহার আহারবিহার ব্যবসায়বাণিজ্য ও কৃষি-গোপালন বস্ত্রবয়ন গৃহনির্মাণ ইত্যাদি সাংসারিক ব্যাপারে কিছু ভিন্নতা ছিল না। বিহারের সঙ্গে বাংলার প্রত্যক্ষ এবং প্রবল যোগ ছিল গঙ্গা ধরে। গঙ্গা বঙ্গভূমির মেরুদণ্ড, কী সেকালে, কী একালে। তখনকার উড়িষ্যা আর এখনকার উড়িষ্যা এক ছিল না। কটকের দক্ষিণ থেকে গঞ্জাম পর্যন্ত অংশ সেকালে এক স্বতন্ত্র দেশ কলিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই কলিঙ্গ খণ্ডকে সেকালের বঙ্গভূমির অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। কাঁসাই নদীর ওপারে পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন উত্তর উড়িষ্যার অংশ সেকালে উৎকল নামে খ্যাত ছিল। এই অঞ্চল বৃহৎ বঙ্গভূমির অন্তর্গত ছিল বলা যায়।

কোনো জাতির অধ্যুষিত দেশ ('বিষয়') সেকালে সেই জাতিনামে পরিচিত হত। এই সূত্রে সেকালের অনেক দেশনাম একাল পর্যন্ত চলে এসেছে। পূর্বভারতের জাতি-দেশগুলির মধ্যে সব চেয়ে আগে উল্লিখিত দেখা যায় 'বঙ্গ'। ঋগ্‌বেদের এক শ্লোকে আছে (৮.১০১.১২) যে, তিন বংশধর (বা জীব) নিরুদ্দেশ হয়েছিল ("প্রজা হ তিস্রঃ অত্যায়মীয়ুঃ")। এই বাক্যটির ব্যাখ্যা রূপে ঐতরেয়-আরণ্যকে বলা হয়েছে (২.১.১) যে তারা হল এই সব পাখি—"বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ"। পাখি ("বয়াংসি") শব্দটিকে রূপক ধরা যায় যাযাবর অর্থে। নাম তিনটি হয় বঙ্গ, বগধ (অথবা অবগধ) ও চেরপাদ,—সব বহুবচনে। বগধকে কোনো কোনো পণ্ডিত 'মগধ' ধরতে চান। চেরপাদকে অবিকৃত রাখলে দাক্ষিণাত্যের চের দেশের সঙ্গে মেলানো যায় আর 'চ ইরপাদ'—এইভাবে সন্ধিচ্ছেদ করলে থই মেলে না। তবে 'বঙ্গ' অবিকৃত ও অসন্দিগ্ধ রয়ে যায়।

বঙ্গভূমির পূর্বদিকের ভূখণ্ড সেকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে পরিচিত ছিল। কামরূপ প্রাগ্‌জ্যোতিষের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বতন্ত্র 'বিষয়' বলে গণ্য হয়েছিল পরবর্তী কালে। প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামটি প্রথমে কোনো সুনির্দিষ্ট ভূভাগ বোঝাত না। বোঝাত পূর্বদিগন্তভূমি। তার সঙ্গে

অন্য একটু ব্যঞ্জনারও স্পর্শ ছিল। জ্যোতিষ্ (জ্যোতিঃ) শব্দটির একটি অর্থ অগ্নি। (অসমিয়া ভাষায় 'জুই' মানে অগ্নি।) নামটির পিছনে একটি প্রাচীন (বৈদিক) গল্প আছে। পৃথিবীর অধিকার নিয়ে অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের একদা যুদ্ধ হয়েছিল। অসুরেরা ছিল মানসিক বলে বলীয়ান্ আর দেবতারা ছিল অগ্নিযজ্ঞ বলে শক্তিমত্তর। যজ্ঞের অগ্নি সামনে রেখে যুদ্ধ করতে করতে দেবতারা অসুরদের পূর্বদিকে হটিয়ে দিতে থাকে। অবশেষে তারা "সদানীরা" নদীর ওপারে চলে যায়। যজ্ঞাগ্নিকে কিন্তু সদানীরার ওপারে নিয়ে যাওয়া গেল না। অতএব সদানীরা নদীর এপার পর্যন্ত ভূমি যজ্ঞাগ্নিপূত আর্যনিবাস বলে গণ্য হল। নদীর ওপার রইল যজ্ঞক্রিয়াবিহীন অসুরদের নিবাসভূমি। "সদানীরা"র এই ওপারই 'প্রাগ্জ্যোতিষ' অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নির সীমান্তভূমির পূর্বদিগ্‌বিভাগ। "সদানীরা" বলতে কোন্ নদী তা নিয়ে পণ্ডিতেরা কিছু মাথা ঘামিয়েছেন। অনেকে মনে করেন এই নদী গণ্ডক। কিন্তু ঘটনাটি নিছক গল্প, আর সদানীরা বলতে এমন যে কোনো নদী বোঝায় যাতে বারো মাস জল থাকে। পূর্বভারতের পক্ষে এ নাম গঙ্গার ও ব্রহ্মপুত্রের পক্ষেই সব চেয়ে বেশি খাটে। কালিদাসের সময়েও এদিকে প্রাগ্জ্যোতিষের সীমা ছিল ব্রহ্মপুত্র। রঘু ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে তবে প্রাগ্জ্যোতিষের অধিপতিকে আক্রমণ করেছিলেন। কালিদাসের বর্ণনা থেকে (রঘুবংশ ৪.৮১-৮৩) জানা যায় যে প্রাগ্জ্যোতিষ ও কামরূপ একই দেশ, তবে কামরূপ ছিল আসলে জাতিবাচক ("তম্ ঈশঃ কামরূপাণাং")।

বৈদিক গল্পটির রেশ বহু কাল পরেও লুপ্ত হয়নি। পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর বরাহঅবতারের কাহিনী বৈদিক গল্পটিরই জের টানার মতো। বেদের কবিরা আদিত্যকে বরাহরূপেও কল্পনা করতেন ("দিবো বরাহম্ অরুষং বৃহন্তং")। সেই অনুসারে বিষ্ণু তাঁর এক রূপে বরাহ। পূর্বদিগন্তে সূর্য ওঠে এবং পৃথিবীকে অন্ধকারসমুদ্র থেকে যেন আলোকের ভূমিতে তুলে আনে। এই কল্পনাছবি বরাহ-অবতার কথাবস্তুর বীজ। (প্রাগ্জ্যোতিষের বিশিষ্ট বলশালী জন্তু হল গণ্ডার। গণ্ডার প্রাচীনকালে তার বিশিষ্ট নামটি পায়নি। বরাহ নামেই পরিচিত ছিল। সুতরাং বিষ্ণুর বরাহ-অবতার আসলে তাঁর গণ্ডার-অবতার বলেই মনে হয়। বরাহের দাঁতে চড়ে পৃথিবীর সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে আসা কল্পনার চেয়ে গণ্ডারের শিঙে চড়ে সে কাজ করা সহজসাধ্য ও সংগত।) বেদবাহ্য হওয়ার দরুন প্রাগ্জ্যোতিষীয়েরা বিষ্ণুকে বরাহ-গণ্ডার রূপে টেনে এনেছিলেন তাঁদের দেশকে আর্যনিবাসের উপকণ্ঠভূমি রূপে মর্যাদা দেবার জন্যে। বরাহ-গণ্ডাররূপী বিষ্ণু ভূমিকে ভার্যারূপে গ্রহণ করে এদেশের 'ভৌম' রাজবংশের পত্তন করেছিলেন। "বরাহ" বা "নরক" কোনো নামটিই রুচিকর নয়। সেইজন্যই হয়তো মাতৃনাম নেওয়া হয়েছিল। হয়তো বা ওদেশে তখন পরিবার পরিচালিত হত মাতৃতন্ত্রে।

পরবর্তী কালে লোকভাবনা বাস্তবমুখী হওয়ায় প্রাগ্জ্যোতিষ-কামরূপের রাজবংশ লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদকে বরাহ-গণ্ডারের প্রতিভূ দাঁড় করিয়েছেন। লৌহিত্যও বরাহরূপী আদিত্যের মতো রক্তবর্ণ বৃহৎ ও দুর্ধর্ষ।

যে সব দেশনাম জাতিনাম থেকে এসেছে সেগুলি সংস্কৃতে বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। পাণিনির ব্যাকরণের ভাষ্যকার পতঞ্জলি (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) বলেছেন, "অঙ্গানাং বিষয়ো হঙ্গাঃ" অর্থাৎ অঙ্গদের দেশ (—বিষয় মানে যে দেশ তা পাণিনি বলে গেছেন একটি সূত্রে—) হল 'অঙ্গাঃ'। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেন্দ্রস্থানীয় বঙ্গভূমির

অধিবাসী তিনটি মুখ্য জাতি ও তাদের বিষয়ের নামও করেছেন, "বঙ্গাঃ সুহ্মাঃ পুণ্ড্রাঃ", অর্থাৎ বঙ্গ জাতি ও তাদের বিষয়, সুহ্ম জাতি ও তাদের বিষয়, পুণ্ড্র জাতি ও তাদের বিষয়। এই তিন বিষয় বা দেশ হল যথাক্রমে ভাটি গাঙ্গেয় বঙ্গভূমি, গঙ্গার পশ্চিমে সুহ্মভূমি, এবং উজান গাঙ্গেয় পুণ্ড্রভূমি। পতঞ্জলি অঙ্গ ও মগধেরও উল্লেখ করেছেন। অঙ্গদের বিষয় ছিল গঙ্গার বাম তীরভূমি, এখন যা ত্রিহুত (গুপ্ত আমলের দেওয়া নাম 'তীরভুক্তি' থেকে), আর মগধদের বিষয় ছিল গঙ্গার দক্ষিণতীর ভূমি যা তুর্কি আক্রমণের সময়ে—বৌদ্ধতীর্থ ও বিহার-মঠে আকীর্ণ ছিল বলে—'বিহার (ভূমি)' নামে পরিচিত ছিল। (এখন এই নাম ওপারকেও গ্রাস করেছে।) বঙ্গ বিষয়ের মেরুদণ্ড ছিল গঙ্গা। বঙ্গ জাতি প্রথম থেকে সর্বাধিক বিশিষ্ট ছিল, তাই সমগ্র দেশ পাণিনি-পতঞ্জলির সময় পর্যন্ত উত্তরাপথে বঙ্গ বলেই পরিচিত ছিল। সুহ্ম নামটি অপরিচয়ের আবর্তে পড়ে পরে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, শুধু সাহিত্যে মাঝে মাঝে চমকের দেখা দেয়। তবে কালিদাসের কালে (খ্রিস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দী?) সুহ্ম জাতি ও দেশ প্রবল প্রতাপে বিরাজ করছিল বলে অনুমান হয়। পুণ্ড্র বিষয়ের অস্তিত্ব কালিদাসের জানা ছিল কি না জানি না, তিনি এ জাতির বা বিষয়ের কোনো নামই করেননি। তবে পুণ্ড্রদের 'বিষয়' না থাকলেও নগর ছিল। পুণ্ড্রনগরের অস্তিত্ব খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রত্নলেখে মিলেছে। এই পুণ্ড্রনগর পরে পুণ্ড্রবর্ধন নামে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিখ্যাত হয়। পুণ্ড্রবর্ধন নগরের নাম। দেশের নাম 'পৌণ্ড্রবর্ধন' অর্থাৎ পুণ্ড্রভূমি। পরবর্তীকালে 'পৌণ্ড্রবর্ধন' নগর ও দেশ দুই বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। গুপ্তদের আমল থেকে মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত ভাগীরথীর বামতীরস্থ সমগ্র ভূভাগ শাসনকার্যে পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি নাম পেয়েছিল।

'বঙ্গ' নামটি সেকালে সর্বত্র বহুজনবিদিত হবার কারণ মনে হয় কাপাস ও কাপাস-শিল্পের সঙ্গে এই নামটির সম্পর্ক। কাপাস গাছ এদেশের যে স্বাভাবিক উদ্ভিদ, একথা বিজ্ঞানসম্মত। 'বঙ্গ' শব্দের এক মানে কাপাস-তুলা। এ অর্থ সংস্কৃত অভিধানে স্বীকৃত এবং এ অর্থ অর্বাচীন নয়! বাংলা ভাষায় রেশ না থাকলেও সম্পর্কিত অন্য কোনো কোনো ভাষায় আছে।[১] নীচে 'বঙ্গাল' নামের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গ জাতি যেমন কাপাস চাষের ও বস্ত্র-শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল পুণ্ড্রজাতি তেমনি আখ চাষের ও গুড় শিল্পের এবং রেশমি বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। 'পুণ্ড্র' শব্দের অর্থ এক জাতের আখ। এখনও দেশি আখের নাম 'পুঁড়ি' (<পৌণ্ড্রিক)। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন 'গৌড়' দেশনামটি 'গুড' থেকে উদ্ভূত সুতরাং পুণ্ড্র (পৌণ্ড্র) নামের সঙ্গে সম্পর্কিত। তার বিরুদ্ধে বলা যায় 'গৌড়' শব্দ 'গোণ্ড' এই বহুবিস্তৃত জাতিনামের সঙ্গে সম্পর্কিত অনুমান করতেও বাধা নেই। পাণিনি যে গৌড়পুরের নাম করেছেন, তা প্রত্নলিপির পুণ্ড্রনগরের (পরবর্তী কালের পুণ্ড্রবর্ধনের) অপর নাম হতে পারে। কিন্তু 'গুড়' থেকে আগত সংস্কৃতে কোনো 'গৌড়' শব্দ থাকলে পাণিনির কোনো না কোনো সূত্রে তা নিশ্চয়ই গাঁথা পড়ত। পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[১] ভোজপুরীতে 'বাঁগ' মানে কাপাস গাছ; মৈথিলীতে 'বাঁগো, বাঁগা' হিন্দিতে 'বাঁগা' মানে কোষস্থ অপরিষ্কৃত তুলা; ভোজপুরীতে 'বাঁগোর' (<*বঙ্গপুট) মানে কাপাস কোশ। Turner-এর *A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages* ১১১৯৬, ১১১৯৮ দ্রষ্টব্য।

অনুমান করি 'সুহ্ম' নামটি প্রাকৃত ভাষার, বৈদিক সংস্কৃত 'শুষ্ম' (মানে বলবান্, দুর্ধর্ষ) থেকে আগত। খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী থেকে সুহ্ম নামটি আর সাহিত্যের বাইরে দেখা যায় না, সাহিত্যেও তার সন্ধান কচিৎ মেলে। তার স্থানে দেখা দিলে 'রাঢ়া' (রাঢ়)। এ শব্দটির অর্থ পরে দাঁড়িয়েছিল দুর্ধর্ষ, নিষ্ঠুর। জৈনদের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ আয়রঙ্গসুত্তে (—সংস্কৃতে বইটির নাম হবে আচারাঙ্গসূত্র; রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী—) বর্ণিত আছে যে মহাবীরকে "দুচ্চর" (অর্থাৎ দুশ্চর) "লাল" (লাট অথবা রাঢ়া) দেশ ভ্রমণকালে "সুব্‌ভভূমি" (<শ্বভ্রভূমি, খানাখন্দের দেশ) ও "বজ্জভূমি" (<বজ্রভূমি, শক্তমাটির পাথুরে দেশ) বিচরণ করতে হয়েছিল। যেসব পণ্ডিত "লাল" নামটিকে 'রাঢ়' ধরেন তাঁরা "সুব্‌ভভূমি" কে ধরেন সুহ্মদেশ। এই অনুমানের বিরুদ্ধে বলতে হয় যে সংস্কৃত 'সুহ্ম' প্রাকৃতে 'সুম্‌ভ' হতে পারে, 'সুব্‌ভ' হতে পারে না। কেননা এমন ধ্বনিপরিবর্তনের কোনো দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। আরও একটি বিরুদ্ধ যুক্তি আছে। রাঢ়-সুহ্ম মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা "বজ্জভূমি"র কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। "রাঢ়" হোক বা "লাট" হোক, মহাবীর যে দুর্গম উঁচু নিচু দেশের মধ্য দিয়ে পর্যটন করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গে এবং গুজরাটে এমন ভূখণ্ডের অভাব নেই।

পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলি অঙ্গ বঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্র মগধ ও কলিঙ্গ এই প্রাচ্য বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। পাণিনির সূত্রে শুধু মগধের ও কলিঙ্গের স্পষ্ট উল্লেখ আছে ("দ্ব্যঞ্‌মগধকলিঙ্গসূরমসাদ্ অন্" ৪.১.১৬৮)। সূত্রের প্রথম শব্দ "দ্ব্যচ্" থেকেই পতঞ্জলি অঙ্গ বঙ্গ সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামগুলি যে অনুমান করেছিলেন এমন নয়, এই নামগুলি তখন সুপ্রচলিত ছিল। পতঞ্জলি আর্যাবর্তকে তিন অংশে ভাগ করেছিলেন প্রাচ্য, উদীচ্য ও মধ্যম; এবং প্রত্যেক ভাগের তিন বিভাগ ধরেছিলেন, "ত্রয়ঃ প্রাচ্যাঃ ত্রয় উদীচ্যাঃ ত্রয়ো মধ্যমাঃ।" কিন্তু তিনি বিভাগগুলির নাম করেননি। প্রাচ্যের তিন বিভাগ তাঁর মতে হয়তো ছিল অঙ্গ বঙ্গ ও মগধ। পাণিনি অনেকগুলি সূত্রে "প্রাচাম্" পদটি ব্যবহার করেছেন। পদটির সোজা মানে হল পূর্বদেশীয়দের। পূর্বদেশীয় বলতে পাণিনি পূর্বদেশীয় (প্রাচ্য) বৈয়াকরণ ধরেছেন বলেই মনে হয়।[১] পাণিনির সূত্রে প্রাচ্যভূমির কোনো স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও একটি প্রাচ্য নগরের উল্লেখ আছে বলে অনেকে মনে করেন। স্বরপ্রক্রিয়ার একটি সূত্রে ("পুরে প্রাচাম্" ৬.২.৯৯) বলা হয়েছে যে প্রাচ্য-(বৈয়াকরণ-) দের মতে 'পুর' শব্দ পরে থাকলে নির্দিষ্ট অক্ষরে স্বরসংস্থান হয়। পরের সূত্রে বলা হয়েছে যে 'অরিষ্ট' ও 'গৌড়' শব্দ পূর্বপদ হলেও অনুরূপ স্বরসংস্থান হয় ("অরিষ্ট-গৌড় পূর্বে চ")। এই দুই সূত্র থেকে দুটি বিভিন্ন অনুমান করা যায় : ১. উদ্দিষ্ট স্বরসংস্থানের শুধু এই দুটি উদাহরণ—অরিষ্টপুর এবং গৌড়পুর—পাণিনির জানা ছিল, তাই অন্য উদাহরণের জন্যে তিনি প্রাচ্য বৈয়াকরণদের দোহাই দিয়েছেন; অথবা ২. 'অরিষ্টপুর' ও 'গৌড়পুর' প্রাচ্যদের জানা নগর নয়, সুতরাং পূর্ব সূত্রটির অধিকারের বাইরে ছিল এই নাম দুটি।

সাহিত্য এবং লোকব্যবহারে নগর ও দেশ বাচক 'গৌড়' নামটি সেদিন (অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ) পর্যন্ত চলিত ছিল। চৈতন্যের সময়ে 'গৌড়ীয়া' বললে বাঙালি

[১] যেমন "আচার্যাণাম্" অর্থাৎ গুরুদেবের মতে।

বোঝাত। কিন্তু ঐতিহাসিক দলিলে অর্থাৎ প্রত্নলিপিতে এ নামের ব্যবহার সপ্তম শতাব্দীর আগে দেখা যায় না। পালরাজাদের আগেকার কোনো শাসনপট্টে "গৌড়েশ্বর" বা "গৌড়পতি" এই বিরুদ নেই। নামটি বহিরাগত এবং সাহিত্যে ব্যবহৃত। গৌড় নামে নগর মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনায় প্রথম দেখা গেল। লক্ষ্মণসেনের রাজধানী যে এ নামেও অভিহিত ছিল তার প্রমাণ রয়েছে পুবানো বাংলা সাহিত্যে।

পতঞ্জলির কালে (এবং তারও আগে) বঙ্গ বিষয় বলতে যে গাঙ্গেয়ভূমি বোঝাত তার অন্যদিক থেকেও সমর্থন পাওয়া যায়। মেগাসথিনিস্ প্রমুখ গ্রিক পর্যটক-ঐতিহাসিকদের উক্তি অনুসারে আলেক্জাণ্ডারের সময়ে ভারতবর্ষের পূর্বভাগে দুটি মাত্র উল্লেখযোগ্য জাতি ছিল, 'প্রাসিওই' ও 'গঙ্গারিদই' বা 'গঙ্গরিদই'। সংস্কৃতে আক্ষরিক অনুবাদ করলে প্রাসিওই (Prasioi) হয় 'প্রাচ্যাঃ' আর 'গঙ্গারিদই' (Gangaridai) হয় 'গাঙ্গেয়াঃ'। বিদেশী পর্যটক-নাবিক-ঐতিহাসিকদের উল্লিখিত 'প্রাসিঅই' (বা 'প্রাসিই') এবং 'প্রাসিআ' যথাক্রমে পুরবিয়া ও পূর্বদেশ দ্যোতনা করে। গঙ্গারিদই ছিল তাদেরই এক দল যাদের বিষয় ছিল গঙ্গা (ভূমি) অর্থাৎ গাঙ্গেয় উপত্যকা।[১] পুরোনো লাটিন কবি ওবিদ (Ovid; খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী) এই পুরবিয়াদেরই বুঝিয়েছেন 'গাঙ্গেগটিকুস্', 'গাঙ্গেগটিআ' (অর্থাৎ গাঙ্গেয়) বলে। বিখ্যাত জ্যৌতিষিক গাণিতিক ও ভূবিদ্যাবিদ টলেমি (খ্রিস্টপর দ্বিতীয় শতাব্দী) নিম্ন গাঙ্গেয় দেশকে বলেছেন 'গাঙ্গে' আর সেই নামে এই দেশের বন্দরকেও শনাক্ত করেছেন। নামটি সাক্ষাৎ 'গাঙ্গেয়' থেকে এসেছে। একদা এইস্থান পরবর্তী কালের কর্ণসুবর্ণ হওয়া অসম্ভব নয়।

বঙ্গভূমির ও তার অধিবাসীদের সম্বন্ধে খাঁটি, যদিও খুব ক্ষীণ, খবর প্রথম পাওয়া গেল কালিদাসের কাছে। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে তিনি সুহ্ম ও বঙ্গ জাতির যে সামান্য পরিচয়টুকু দিয়েছেন তা যথার্থ। যারা কালিদাসকে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি বা সমসাময়িক বলে মনে করেন তাঁরা রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনায় সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয়ের প্রতিচ্ছবি দেখেন। সে কল্পনাদৃষ্টি যে কতটা ব্যর্থ তা বঙ্গভূমির প্রসঙ্গে কালিদাসের উক্তি আর হরিষেণের প্রশস্তি মেলাতে গেলেই ধরা পড়ে। কালিদাস সুহ্মের উল্লেখ করেছেন সমতটের নাম পর্যন্ত করেননি। সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিকার হরিষেণ সমতটের নাম করেছেন বঙ্গ-সুহ্মের কোনো উল্লেখ করেননি।

এখন কালিদাসের উক্তি আলোচনা করি। দিগ্‌বিজয় প্রয়াণে বার হয়ে রঘু প্রথমেই

[১] প্রাচীন বৈয়াকরণদের উদাহরণ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" থেকে গাঙ্গেয় ভূমি অর্থে গঙ্গা শব্দের প্রয়োগ অনুমান করা যায়। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'গঙ্গারিদই' নামটিকে বঙ্গাল শব্দের সাদৃশ্যে আনুমানিক গঙ্গাল শব্দ থেকে বিদেশীর তৈরি নাম বলে অনুমান করেন (*Studies in Indian Linguistics*, এমেনো(Emeneau) সংবর্ধনা খণ্ড, পৃ ৭০-৭৪ দ্রষ্টব্য)। এর পক্ষে বলা যেতে পারে এই যে 'বঙ্গাল' শব্দের সঙ্গে 'বঙ্গ' শব্দের অর্থঘটিত যে যোগ আছে, আনুমানিক 'গঙ্গাল' শব্দের সঙ্গে 'গঙ্গা' শব্দের যোগও কতকটা সেইমতো। 'বঙ্গাল' মানে 'বঙ্গ-ঋদ্ধ' অর্থাৎ প্রচুর কার্পাসপুষ্ট দেশ হলে, 'গঙ্গাল' মানে 'গঙ্গা-ঋদ্ধ' অর্থাৎ গঙ্গাপুষ্ট দেশ হতে বাধা নেই। পণ্ডিতেরা ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষায় একটি ধাতুর অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন 'রেইদ' (reid), অর্থ "অবলম্বন করা, পোষণ করা" (Indo-Germanisches Etymologisches Woerterbuch, Pokorny. ৪61)। এই ধাতু-উৎপন্ন শব্দ গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় আছে, এবং সেই শব্দের সাদৃশ্যে Gangaridai (Gangaridi—লাটিনে) পদটি গ্রীক (ও রোমান) পর্যটকদের—কল্পিত নয়—নির্মিত শব্দ বলে স্বচ্ছন্দে নিতে পারি।

পূর্ব দেশ জয় করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। (এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তের প্রথম ভৌগোলিক চিত্র পাওয়া গেল।)

পৌরস্ত্যান্ এবম্ আক্রামংস্ তাংস্ তান্ জনপদান্ জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামম্ উপকণ্ঠং মহোদধেঃ।।

'এইভাবে পুরবিয়াদের সেই সেই দেশ আক্রমণ করে জয়ী হয়ে রঘু সমুদ্রের তালীবনশ্যামল উপকণ্ঠে পৌঁছলেন।।'

অনম্রাণাং সমুদ্ধর্তুস্ তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদ্ ইব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্ বৃত্তির্ আশ্রিত্য বৈতসীম্।।

'অবিনীতদের উৎপাটনকর্তা রঘুর থেকে, যেমন সমুদ্রের ঢেউয়ের থেকে, সুহ্মেরা আত্মরক্ষা করলে বেতগাছের ব্যবহার অনুকরণ করে।।'

বঙ্গান্ উৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু চ।।

'নেতা তিনি, নৌবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে উদ্যত বঙ্গদের সবলে উৎখাত করে গঙ্গাস্রোতের ফাঁকে ফাঁকে জয়স্তম্ভ স্থাপন করলেন।।'

আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্ধয়াম্ আসুর্ উৎখাতপ্রতিরোপিতাঃ।।

'প্রথমে উৎপাটিত তার পরে আবার রোপিত, আমন ধানের মতো, তারা (রঘুর) পা পর্যন্ত মাথা নুইয়ে রঘুকে ফল দিয়ে অভ্যর্থনা করলে।।'

স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্ বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখং যযৌ।।

'হাতির পুল বেঁধে তিনি সৈন্যসমেত কপিশা পার হয়ে উৎকলের দাঁড়া পথ ধরে তিনি কলিঙ্গের অভিমুখে গেলেন।।'

গ্রিক ঐতিহাসিকদের উল্লেখ এবং কালিদাসের উক্তি মিলিয়ে দেখলে সন্দেহ থাকে না যে বঙ্গজাতির বিষয় একদা ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী ভূভাগ নিয়ে বিস্তৃত ছিল। পুণ্ড্রজাতি গঙ্গার পূর্বতীরে অধিক সংখ্যায় বসতি করেছিল এবং তারা উত্তরাপথ-আগত সংস্কৃতিপ্রবাহ সর্বাগ্রে অনুভব করেছিল। (এর একটা প্রধান কারণ অঙ্গ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লেষ এবং সেইহেতু উত্তরাপথের সঙ্গে স্থলবর্ত্মেও সরাসরি যোগাযোগ।) সেইজন্যে ইতিহাসে পুণ্ড্রনগর-পৌণ্ড্রবর্ধন অত আগে এবং বারবার উল্লিখিত দেখা যায়।

গুপ্তরাজাদের অধিকার কাল থেকে সমগ্র দেশ-অর্থে বঙ্গ নামটির অপ্রচলন ঘটতে থাকে। তার একটা কারণ হল শাসনকার্যের জন্যে দেশকে দুটি ''ভুক্তি'' বা ভোগপ্রদেশে বিভাগ করা। ভাগীরথী হল এই বিভাগের সীমা-রেখা। গঙ্গার বাম দিকের নাম হল 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি', দক্ষিণ দিকের নাম হল 'বর্ধমান ভুক্তি'। অতঃপর সমস্ত প্রত্নলেখে এই দুটি বঙ্গভূমির দ্বৈধ নাম হয়েছে। বঙ্গনামের অর্থসংকীর্ণতার আর একটা কারণ—বর্ধমান ভুক্তিতে যেসব নদী ছিল তাতে ক্রমশ নাব্যতার হ্রাস হওয়ার ফলে নৌ-ব্যবহারে দক্ষ বঙ্গ জাতির হয়তো অসুবিধা ঘটছিল। তার উপর গাঙ্গেয় ভূমিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি

এবং কৃষিবৃত্তির প্রসার হতে থাকে। এর ফলে বর্ধমান ভুক্তির জনগণ জলচর বৃত্তিতে পরাঙ্মুখ হয়ে যায়। এই সব কারণে, অনুমান করি যে, বঙ্গেরা ক্রমশ গাঙ্গেয় ভূমি থেকে দূরে দূরে নদীবহুল পূর্ব ও পূর্বদক্ষিণ ভূভাগে সরে যেতে থাকে। এই ভূভাগের কোনো কোনো অঞ্চল তুলা ও বস্ত্র উৎপাদনের প্রশস্ত কেন্দ্র ছিল। তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে 'বঙ্গ' নামটি এই গঙ্গাপসৃত ভূভাগের পক্ষে নূতন করে রূঢ় হয়।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তাঁর অধিকারের প্রান্তীয় বিজিত ও আংশিক-অধিকৃত দেশের তালিকা আছে। সে তালিকায় পূর্বাঞ্চলের প্রসঙ্গে সুহ্ম ও বঙ্গ নেই, পুণ্ড্র নেই, আছে 'সমতট', 'ডবাক' এবং 'কামরূপ'। সমতট বিষয়নামটি এই প্রথম পাওয়া গেল। নামটির অর্থ, যে ভূভাগে নদীতট সমভূমি, উঁচুনিচু নয়। নিম্ন গাঙ্গেয় ভূমি এবং পূর্ব ও পূর্বদক্ষিণ বঙ্গভূমি সম্পর্কে এই নামটি সম্পূর্ণ খাটে। 'ডবাক' নামটির এখনো কিনারা হয়নি। কামরূপ সমতটের প্রান্তে।

বঙ্গভূমির বিভিন্ন বিভাগের উপযুক্ত কিছু বর্ণনা প্রথম পাওয়া গেল সপ্তম শতাব্দীতে চিনীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের গ্রন্থে। তিনি তাঁর পর্যটনক্রমে এদেশের বিভাগ লক্ষ করেছেন এই কয় অঞ্চলে,—কজঙ্গল (রাজমহলের পার্বত্য ভূমি সংলগ্ন আরণ্য অঞ্চল), পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ ও উড্ড (ঔড্র)। পুণ্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণ এ তিনটি দেশনাম নয় স্থাননাম, যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব বঙ্গভূমি, সুহ্ম, ও দক্ষিণ গাঙ্গেয় প্রদেশের নির্দেশক। সমতট নিম্ন বাম গাঙ্গেয় প্রদেশ, পুণ্ড্রবর্ধনের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল। ময়নামতীতে প্রাপ্ত লডহচন্দ্রের তাম্রশাসনে সমতট পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত একটি মণ্ডল বলে উল্লিখিত হয়েছে।[১] সমতটের উত্তরপূর্বে কামরূপ। উড্ড (জাতি-নাম 'উড্র' অথবা 'ঔড্র' হতে) হল কালিদাস উল্লিখিত উৎকল, সুহ্মের সীমান্ত পেরিয়ে। সমতটের রাজধানীর নাম জানা নেই, রাজ্য ও রাজধানী দুইই হিউয়েন-সাঙ সমতট বলেছেন। সমতটের সংলগ্ন 'বঙ্গাল' (মানে প্রচুর 'বঙ্গ' অর্থাৎ তুলা উৎপাদনকারী ভূমি)। এই নাম থেকে পরে 'বাঙ্গালা', 'বাঙ্গালি' শব্দ এসেছে। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের শাসনপট্টে বঙ্গাল-বাহিনীর দ্বারা সোমপুর বিহার বিধ্বংসের উল্লেখ আছে। সিলেটের পশ্চিমভাগ গ্রামে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে বঙ্গাল নামটির ব্যাপক (অর্থাৎ 'বঙ্গভূমির বিশেষত্বযুক্ত'') অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীচন্দ্র পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত শ্রীহট্ট মণ্ডলে আটটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তার মধ্যে চারটি ''দেশান্তরীয় মঠ'' আর চারটি ''বঙ্গাল মঠ''।[২] বঙ্গাল নামে অথবা ছদ্মনামে এক কবির লেখা শ্লোক দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আল্‌বেরুনি (একাদশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগ) ''বঙ্গাল'' প্রণীত শকুনবিদ্যা গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

'হরিকাল' বা 'হরিকেল' দেশ-নামটির উল্লেখ হিউয়েন্‌-সাঙের গ্রন্থে নেই, ই-সিঙের গ্রন্থে আছে। ইনি বলেছেন এদেশ ভারতের প্রান্তভূমি। দেশনামটির সাহিত্যে ব্যবহার যত

[১] শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত গুপ্ত প্রণীত *Copper-plates of Sylhet* সিলেট ১৯৬৭, পৃ ১১১-১১২ দ্রষ্টব্য। লডহচন্দ্র শ্রীচন্দ্রের নাতি ছিলেন।

[২] ওই পৃ ৯৮ দ্রষ্টব্য।

আছে তত প্রত্নলিপিতে নেই।[১] শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের তাম্রশাসনে রাজা হরিকেল-রাজচ্ছত্রের অধিকারী বর্ণিত হয়েছেন। "শ্রীহরিকাল-দেব" রণবঙ্কমল্লের তাম্রশাসন (১২২১ খ্রিস্টাব্দ) থেকে জানা যায় যে তাঁর রাজধানী ছিল পট্টিকের (আধুনিক শ্রীহট্টের অন্তর্গত)। এই হরিকাল বা হরিকেল দেশেরই নামান্তর ছিল শ্রীহট্ট। 'হরিকাল' বা 'হরিকেল' নামটি 'হরিত', 'হরিক', (মানে শষ্পশ্যাম) শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত। মনে হয় নামটি এসেছে 'হরিক', (অর্থ সবুজ উদ্ভিদ) এবং 'কদলক' (কলা) থেকে। এদেশ শস্যশ্যাম এবং প্রচুর কলা ফলায়। মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনীতে, এ দেশ কদলীর রাজ্য বলেই উল্লিখিত। এই সূত্রে শ্রীহট্ট নামের সঙ্গেও মিল পাওয়া যায়। "শ্রীহট্ট" মানে লক্ষ্মীর বাগান-হাট।[২] 'হরিকেল' নামের আরও একটি মানে হয়। বিষ্ণুর বরাহ-গণ্ডার অবতার প্রাগ্জ্যোতিষের রাজবংশের জন্মদাতা। হরিকেলের সীমান্তে ব্রহ্মপুত্র নদ। সেই সূত্রে এদেশ হরির ক্রীড়াস্থলী। দেশনামটি 'হরিকোল' রূপেও পাওয়া গেছে। ('কোল' মানে বরাহ।)[৩] এখানে প্রথম অর্থের উপর দ্বিতীয় অর্থের আরোপ লক্ষণীয়।

শ্রীহট্ট ভূমির উর্বরতার জন্য এবং কার্পাস-উৎপাদন ও বস্ত্রশিল্পের প্রকর্ষের জন্য বিখ্যাত ছিল। তীরভুক্তির কবিপণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর (চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) তার বর্ণরত্নাকর গ্রন্থে "সিলহটি" বস্ত্রের প্রশংসা করেছেন। পট্টবস্ত্র উৎপাদনকারী বিশিষ্ট ভূখণ্ড, অখণ্ড হরিকেলের অঞ্চল বিশেষ 'পট্টিকের' বা 'পাটিকা' নাম পেয়েছিল।

অষ্টম-নবম শতাব্দীতে পাল-সিংহাসন উত্তর গাঙ্গেয় ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে পর গঙ্গার বাম তীরভূমি সমৃদ্ধির প্রাচুর্যে 'বরেন্দ্র ভূমি' বা 'বরেন্দ্রী' নামে প্রসিদ্ধ হয়। নামটির অর্থ—শ্রেষ্ঠ সরসভূমি (উৎকৃষ্ট ইন্দ্রপুরী)। সেই সঙ্গে বাম তীরভূমির সহিত বৈপরীত্য জ্ঞাপন করে দক্ষিণ তীরভূমির নাম হয় 'রাঢ় ভূমি' বা 'রাঢ়া'। (আচারাঙ্গসূত্রে বর্ণিত মহাবীরের পরিভ্রমণ যদি রাঢ়ে ঘটে থাকে তবে অবশ্য এ নামটি বরেন্দ্রীর তুলনায় প্রাচীন, এবং তখন বলতে হবে যে রাঢ়ার বৈপরীত্যেই বরেন্দ্রী নামটি গঠিত। সংস্কৃত অভিধানে 'রাঢ়া' শব্দের অর্থ সৌন্দর্য, বৈভব। সম্ভবত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটি 'রাজ্' ধাতু থেকে উদ্ভূত : রাজ্ + ত > *রাষ্ট অথবা রাজ্ + ত্র > রাষ্ট্র।) নবম-দশম শতাব্দী থেকে রাঢ় দেশের দুটি বিভাগ স্বীকৃত হয়ে এসেছে। লক্ষ্মণসেনের সময়ে উত্তররাঢ়া একটি "মণ্ডল" অর্থাৎ ভুক্তির বিভাগ ছিল। দক্ষিণরাঢ়া সদাচারী ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠ বলে সেকালে পরিচিত ছিল। মনে হয় একদা রাঢ় দেশ বলতে গঙ্গার ওপারেও কিছু অংশ এবং এপারে দামোদরের প্রাচীন খাত বাঁকা-বল্লুকা (বেহুলা) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে এই অংশই রাঢ় দেশ বলে প্রশংসিত হয়েছে ("ধন্য রাঢ় দেশ")। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের অধিকাংশ মূলস্থান ("গাঁঞিও") এই ভূভাগে—দক্ষিণপূর্ব বীরভূমে ও উত্তর ও উত্তরপূর্ব বর্ধমানে—অবস্থিত। 'দক্ষিণরাঢ়া' আসলে রাঢ়া ভূমির দক্ষিণে দেশ বোঝাত, রাঢ়ার দক্ষিণ অংশ নয়। রাঢ়ার (অর্থাৎ উত্তররাঢ়ের) প্রধান নগর ছিল কর্ণসুবর্ণ। দক্ষিণ রাঢ়া ছিল আগেকার সুহ্মের মধ্যে। তার প্রধান নগর ছিল ভূরিশ্রেষ্ঠী এবং বন্দর তাম্রলিপ্তি।

[১] প্রত্নলিপ্তিতে হরিকেল মণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া যায় কান্তিদেবের খসড়া তাম্রশাসনে (আনুমানিক নবম শতাব্দী)।

[২] 'হট্ট' শব্দের আদিম অর্থ ছিল ফলফুলুরির শাকসব্জির নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা বাগান। সংস্কৃতে শব্দটির আনুমানিক মূল রূপ ছিল 'হর্ত'। সংস্কৃত হর্ত শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত হল ল্যাটিন হর্টুস (hortus) ও ইংরেজি গার্ডেন(garden)।

[৩] Dacca, *History of Bengal* প্রথম খণ্ড পৃ ১৯।

খ্রিস্টপূর্ব কালে গঙ্গার ভাটি অংশ ("গাঙ্গ অনূপ") কোথাও কোথাও "উন্মত্তগঙ্গ" এবং "লোহিতগঙ্গ" নামে পরিচিত ছিল। যেখানে গঙ্গা বিস্তীর্ণ ও প্রচণ্ড—বিশেষ করে বর্ষায় ও শরতে—সে অঞ্চল 'উন্মত্তগঙ্গ', অনুমান করতে পারি। এখনকার দিনের নদীনাম 'মাতলা' এই নামেরই যেন প্রতিধ্বনি। বারাণসীর নীচে থেকে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত সমগ্র গাঙ্গেয় ভূমিকে পতঞ্জলির সময়ে লোকভাষায় 'উন্মত্তগঙ্গ' বলা অযথার্থ ছিল না। শোণ বরাকর অজয় ও দামোদর—প্রধানত এই চার নদীই সেকালের বঙ্গভূমিতে প্রচুর লাল জল ঢেলে এসেছে। সুতরাং উন্মত্তগঙ্গের নিম্নার্ধকে যথার্থই 'লোহিতগঙ্গ' বলা যায়।

সেকালে পাটলীপুত্র ছিল পূর্বভারতের প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ নগর (গুপ্ত তাম্রশাসনে "শ্রীনগর")। পতঞ্জলির সময়ে পাটলীপুত্র নগর ছিল শোণের ধার বরাবর ("অনুশোণং পাটলীপুত্রম্")। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত পাটলীপুত্র ছিল প্রাচ্যভূমির শাসনকেন্দ্র। আর বারাণসী, যেখানে লোকবসতি ছিল গঙ্গার ধার ধরে ("অনুগঙ্গং বারাণসী") এবং যেখানে মগধ অঙ্গ বঙ্গ পুণ্ড্র সুহ্ম প্রভৃতি জাতির বিশিষ্ট জনপদগুলিতে এক সাধুভাষা ও মোটামুটি এক সংস্কৃতি ও জীবনচর্চা নিয়ে বাস ছিল, সেখানে ছিল এই প্রাচ্যভূমির পশ্চিম সীমান্তের ঘাঁটি। পূর্ব সীমান্তের বাণিজ্যবন্দর ছিল—তাম্রলিপ্তি, এবং তারও আগে—এক 'পুরঃস্থল' (বা 'পূর্বস্থল')। এই বাণিজ্যবন্দরটির নাম পাওয়া গেছে রোমক ঐতিহাসিক প্লিনির বর্ণনায় Portalis (পোর্তলিস্) রূপে। প্লিনির সময় থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় দু হাজার বছর কেটে গেছে। প্রধান বন্দর রূপে "পোর্তলিস্" স্থানচ্যুত হয়েছে বারবার। বন্দরের নাম পাল্‌টেছে, কখনো 'তাম্রলিপ্তি' কখনো 'সাতগাঁ'। কিন্তু আগেকার নামটি এখনো বিলুপ্ত ও স্থানচ্যুত হয়নি। নবদ্বীপের উজানে 'পুরথল' বা 'পুরস্থল' মুকুন্দরামের বর্ণনায়ও নৌবন্দর বলে উল্লিখিত আছে। এখন নাম পূর্বস্থলী। এই স্থানই হয়তো বা টলেমির 'গাঙ্গে'।

সুহ্ম খুব প্রাচীন দেশ। এই দেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চল ছিল দামোদর প্রভৃতি দুটি একটি পূর্ববিন্ধ্য পার্বত্য নদীর পূর্বপ্রান্তীয় উপত্যকা। এখন যেখানে ভাগীরথী বহমান সেখানে আড়াই হাজার তিন হাজার বছর আগেও সমুদ্রের খাড়ি ছিল। বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়ার কাছে জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দামোদরের ধারে স্থানে স্থানে (যেমন নড়িহায়) পুরানো মনুষ্যবাসের প্রত্নচিহ্ন মিলেছে। ইতিহাসের মঞ্চে যবনিকা যখন থেকে উঠেছে তখন সুহ্মের সীমানা গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন দামোদর এবং গঙ্গা ত্রিবেণীর অদূরে মিলিত হত, সেইখান থেকে দু-নদীর মিলিত অংশ ছিল যেন সমুদ্রের খাড়ি। মনসামঙ্গল-কাহিনিতে বেহুলার নৌযাত্রার যে বর্ণনা আছে তার থেকে বোঝা যায় যে কাহিনিটি প্রথম কল্পনার কালে সুহ্মের প্রধান জলপথ ছিল দামোদর এবং তা ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে মিলত। চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনিতে ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা-পথের যে বর্ণনা আছে তা পরবর্তী কালের স্মৃতি দিয়ে গড়া। তখন ভাগীরথীর প্রাধান্য বেড়েছে। দামোদরের প্রধান ও প্রাচীন গতিপথ যা উপরে উল্লিখিত হল তার চিহ্ন রয়ে গেছে বাঁকা বল্লুকা (ভাল্‌কো) বেহুলা খড়ি প্রভৃতি নদী ও খালগুলিতে। পাণ্ডুয়া-ত্রিবেণীর মধ্যবর্তী ভূভাগে এখন যে প্রচুর বালি উঠানো হয় সেগুলি পূর্বতন দামোদর-খাতেরই, ভাগীরথী-খাতের নয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে দামোদরে যে বন্যা এসেছিল তাতে নদী যেন হঠাৎ তার বহু পুরাতন খাতেরই অনুসরণ করেছিল।

উৎস : কালের সোপানে

# পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল ও সংস্কৃতি

## বিনয় ঘোষ

**মানচিত্র কেবল ভূচিত্র নয়, সামাজিক জীবনেরও চিত্র।** মানচিত্র সমাজের প্রতীক (The map is a social symbol)।[১] সমাজের মতো মানচিত্রেরও পরিবর্তন হয়। এরকম পরিবর্তন বাংলা দেশে হয়েছে, হিন্দুযুগে মুসলমানযুগে ব্রিটিশযুগে এবং বর্তমান ব্রিটিশোত্তর যুগে। প্রশাসনিক কারণে, ভাষাগত ও অন্যান্য কারণে এই পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু মানচিত্রই ভূগোলের সবটুকু নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের কারণ ও ধারা অনুসন্ধান করা ভৌগোলিকের অন্যতম লক্ষ্য। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানবসভ্যতার সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য ভূবিজ্ঞানীরা কৌতূহলী হয়েছেন। পরবর্তীকালে অনুসন্ধানের পদ্ধতি ক্রমেই বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে এবং বহু বিজ্ঞানীর অনুশীলনের ফলে পরিবেশবিদ্যা ও মানবিক ভূগোল (Human Geography) নামে ভূগোলের একটি পৃথক শাখার বিকাশ হয়েছে।[২] পাহাড়-পর্বত সমুদ্র-নদ-নদী বন-উপবন-উপত্যকা মরুভূমি-জনপদ ইত্যাদির পরিবর্তন ও রূপান্তরের ধারাই সভ্যতার ইতিহাসের ধারা। কিন্তু কেবল প্রাকৃতিক কারণে এগুলি বদলায়নি বা বদলায় না। বন-উপবন কেটে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে মানুষের প্রচেষ্টায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন করেছে মানুষ নিজের স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ জীবনযাত্রার জন্য। কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) বলেছেন, প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ইতিহাস যেমন সত্য, তেমনি সেই পরিবর্তনকালীন মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস এবং সংগ্রামের ফলে মানুষের নিজের পরিবর্তনের ইতিহাসও সত্য। প্রকৃতি ও মানুষ, উভয়েরই সংগ্রাম ও পরিবর্তনের ধারা মিলিত হয়েছে সভ্যতার ইতিহাসের ধারায়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আগে, নদ-নদীর ধারা নিয়ন্ত্রণ, বন্যা-প্রতিরোধ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা মানুষের অনায়ত্ত ছিল। তার জন্য মানুষের সংগ্রামের বিরতি হয়নি বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবর্তনের কাছে মানুষ অনেক সময়

১ J. Mogey : *The Study of Geography* (London. 1950); Introduction

২ এবিষয়ে উল্লেখ্য কয়েকখানি বই : E. C. Semple : *Influence of the Geographical Environment* (1911)—বইখানি বিখ্যাত বিজ্ঞানী F. Ratzel-এর *Anthropogeographie* (1882-91) গ্রন্থের ইংরেজি ভাবানুবাদ। T. Griffith Taylor : *Environment and Nation* (1936); E. Huntingdon : *The Pulse of Asia* (1909); P. V. Blache : *Principles of Human Geography* (1926); J. Brunhes : *Human Geography* (1920). C. D. Forde : *Habitat, Economy and Society* (1934).

আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কারণে, উপেক্ষা ও অদূরদর্শিতার জন্যও অনেক সময় ভৌগোলিক পরিবর্তন (যেমন নদ-নদীর খাত মজা বা খাত-বদল) অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সেই পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির ইতিহাসও এই ভৌগোলিক প্রভাবমুক্ত নয়।

ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের ও সংস্কৃতির যে মৌল সম্পর্ক আছে, সেদিক থেকে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক বিশিষ্টতার কথা উল্লেখ করা উচিত। বাংলা দেশ বলতে আমরা সাধারণত মনে করি যে নদনদীর পলিমাটি দিয়ে তৈরি একটি দেশ। কিন্তু সমগ্র বাংলার ভূভাগ নদনদী-বাহিত পলিমাটি দিয়ে তৈরি নয়। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলার প্রধান অংশ, বাঁকুড়া বীরভূম ও বর্ধমান জেলার অনেকটা ভূভাগ বৃষ্টিবায়ু ও হিমবাহ-বাহিত মাটি দিয়ে তৈরি। পলিমাটির দান যা আছে, তাও হিমালয়-দুহিতা নদীর প্রাথমিক দান নয়। হিমালয়-নির্গত নদীধারার আগে দক্ষিণের বিন্ধ্যপর্বত ও ছোটনাগপুরের পার্বত্য উপত্যকায় উৎপন্ন প্রাচীন নদনদীর পলি দিয়ে তৈরি হয়েছিল প্রাচীন আর্যাবর্তের (উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের) ও পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ। পশ্চিমবঙ্গ বয়সে অনেক প্রবীণ. ভূতাত্ত্বিক দিগন্ত পর্যন্ত তার জীবনের লীলাক্ষেত্রের সীমানা। দক্ষিণভারতের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক সংযোগ আদিপ্রস্তরযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত।

## বাংলার নদ-নদী

ভাগীরথী-হুগলির পশ্চিমতীরে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রত্যেক নদ-নদীর উৎস হল ছোটোনাগপুরের মালভূমি, কেবল **সরস্বতী নদী** ছাড়া। সরস্বতীর মজা খাতের চেহারা দেখলে আজ মনেই হয় না যে, একদা এই নদী বেশ বড়ো সুনাব্য ঐতিহাসিক নদী ছিল। এমন কি, ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতেও হুগলি নদীর চেয়ে সরস্বতীর খাতই ছিল গভীরতর প্রশস্ততর। ডাচ পর্তুগিজ ফরাসি ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যপোত এই সরস্বতী দিয়ে ত্রিবেণী ঘুরে কাশিমবাজার ব্যান্ডেল হুগলি চন্দননগর শ্রীরামপুর যাতায়াত করত। তারপর সরস্বতীর উপরের অংশ ক্রমে মজে আসতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে সরস্বতীর নিম্নাংশের সঙ্গে কলকাতার ভাগীরথী-হুগলির সংযোগের উন্নতিসাধন করা হয়, মজা খাতে খাল কেটে। ক্রমে সরস্বতীর নাব্যতা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। প্রাচীনকালে ভাগীরথীর এইটাই ছিল আদিপথ, নতুন আদিগঙ্গার পথে তার প্রবাহের আগে।

ছোটোনাগপুরের মালভূমিতে উৎপন্ন নদ-নদীর মধ্যে প্রধান হল ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, কংসাবতী বা কাঁসাই হলদি ও সুবর্ণরেখা। **ময়ূরাক্ষী** ছোটোনাগপুরের রাজমহল পাহাড়ের পশ্চিমাংশের উৎস থেকে নেমে হাসদিয়া পর্যন্ত গিয়েছে, তারপর দক্ষিণপ্রবাহে দুমকায় পৌঁছেছে। সেখান থেকে আবার দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে বিহার-পশ্চিমবঙ্গের সীমানা অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি শহরের কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে। সাঁওতাল পরগনায়, মেসাঞ্জোরে উঁচু বাঁধ এবং বীরভূম জেলায় সিউড়ির কাছে তিলপাড়া ব্যারাজ, এই দুটিই হল ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার অন্যতম পৌর্তিক কাজ। **অজয়** নদের উৎসও রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে, ময়ূরাক্ষীর উৎসের প্রায় পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে। অজয় বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দক্ষিণকূলে কুনুর হল এর প্রধান উপনদী। গতি আঁকাবাঁকা হলেও, অনেকটা সমতলভূমিতে

এর মধ্য ও নিম্নাংশ প্রবাহিত বলে অনেককাল পর্যন্ত অজয়ের নাব্যতা অক্ষুণ্ণ ছিল। বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমানা এই অজয় নদের দ্বারা নির্দিষ্ট। অজয়ের তীরে কবি জয়দেবের জন্ম ও সাধনস্থান কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি গ্রাম। পৌষসংক্রান্তিতে এই কেঁদুলিতে যে মেলা হয় তা খুবই প্রাচীন ও ঐতিহাসিক এবং মেলার অন্যতম বিশেষত্ব হল বিরাট বাউল সমাবেশ।

মানভূমের উচ্চভূমিতে উৎপন্ন হয়ে **দ্বারকেশ্বর** (ঢলকিশোর) শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছ দিয়ে বাঁকুড়ায় প্রবেশ করেছে এবং পূর্বগতিতে বাঁকুড়া শহরে পৌঁছে দক্ষিণপূর্ব গতি নিয়েছে। তারপর হুগলি জেলায় আরামবাগ মহকুমার ভিতর দিয়ে দ্বারকেশ্বর ক্রমে দক্ষিণমুখী হয়ে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করেছে এবং ঘাটালের কাছে নাম নিয়েছে **রূপনারায়ণ**। মানভূম পুরুলিয়ার মালভূমিতে উৎপন্ন **শিলাবতী** বা শিলাই নদী এই ঘাটালের কাছেই রূপনারায়ণের সঙ্গে মিশেছে। ছোটো ছোটো অনেক উপনদী আছে শিলাবতীর। রূপনারায়ণের উপরেই বাংলার প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্তের ঐতিহাসিক স্মৃতি বহন করছে বর্তমান তমলুক শহর। নদীতে চর পড়ার ফলে রূপনারায়ণ থেকে তমলুকের দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে গিয়েছে। মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার সীমানা নির্দেশ করে নিচের দিকে রূপনারায়ণ দামোদরের মূলপ্রবাহ গ্রহণ করেছে এবং পরে মহিষাদলের কাছে হুগলি নদীর নিম্নাংশে পরিণত হয়েছে। **কংসাবতী** বা কাঁসাইয়ের উৎপত্তি মানভূম পুরুলিয়ার উপত্যকায়। পুরুলিয়া শহরের কাছে কাঁসাই খুব লোকপ্রিয় নদী। কাঁসাইয়ের কূলে পুরুলিয়ার অনেক লোকোৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তার মধ্যে টুসু উৎসব অন্যতম। কাঁসাইয়ের নিম্নাংশের নাম হলদি।

পশ্চিমবঙ্গের বাকি দুটি প্রধান নদী হল দামোদর ও সুবর্ণরেখা, এবং এই দুটি নদীরই উৎপত্তি হয়েছে পালামৌ জেলা থেকে। পালামৌ জেলায় টোরির কাছে **সুবর্ণরেখা** নদীর উৎপত্তি। এর উচ্চাংশের অববাহিকা বেশ বিস্তীর্ণ, সমগ্র দক্ষিণ ছোটোনাগপুর ও উড়িষ্যার উচ্চভূমি। প্রধানত বিহার ও উড়িষ্যার নদী সুর্বণরেখা এবং উড়িষ্যার সমুদ্রেই এর মোহানা। কিন্তু সুবর্ণরেখার খানিকটা অংশ মেদিনীপুর জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, ঝাড়গ্রাম মহকুমায়। ঝাড়গ্রাম থেকে গোপীবল্লভপুর নয়াগ্রাম অঞ্চলে পৌঁছতে হলে সুবর্ণরেখা পার হয়ে যেতে হয়। এখানে সুবর্ণরেখা বেশ প্রশস্ত। পালামৌ জেলার টোরির কাছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫০০ ফুট উঁচু খামারপৎ পাহাড়ের শৃঙ্গে যে বৃষ্টি পড়ে, সেই বৃষ্টি থেকে **দামোদরের** উৎপত্তি। ছোটোনাগপুরের পার্বত্য উপত্যকায় দামোদরের রূপ ঝরনার মতো। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে ঝরনা-প্রস্রবণগুলি ২০০০ ফুট উঁচু উপত্যকায় পড়ে ক্রমে নদীর আকার নিয়েছে। যে মূল ঝরনা থেকে দামোদরের উৎপত্তি তার স্থানীয় নাম 'সোনাসাথি'। প্রথম নদীর রূপধারণ করার পর দামোদরের স্থানীয় নাম 'দেউনদ'। কতকগুলি গিরিখাতের মধ্যের উপনদী এসে দেউনদে মিশেছে। অনেক জলপ্রপাতও আছে। উত্তরেও অনেক উপনদী মিশেছে এবং তারা আয়তনে বড়ো। এদের মধ্যে বরকাগাঁও-এর কাছে ১১০ ফুট জলপ্রপাত উল্লেখ্য। হাজারিবাগ জেলায় ১০০০ ফুট উঁচু উপত্যকা থেকে দামোদর নামের প্রচলন হয়েছে। রামগড় পাহাড়ের সীমানার মধ্যে তার প্রবাহ। মুরি জংশন-স্টেশন থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে (এখন অবশ্য তেমন গভীর নয়) নদীগর্ভস্থ পর্বতশিলার উপরে **রাজরপ্পার** যে বিখ্যাত **ছিন্নমস্তার মন্দির** আছে, তার কাছে ভেরা নদীর সঙ্গে দামোদরের সঙ্গম হয়েছে। তারপরে কিছুদূর পর্যন্ত দামোদরের প্রবাহ উত্তরমুখী। বোরমোর কাছে বোকারো ও কোনার নদী দামোদরে মিশেছে। বোকারোতেও বেশ উঁচু জলপ্রপাত আছে। দামোদর নদের উত্তরে হাজারিবাগ উপত্যকা

ক্রমে প্রায় ২০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়েছে এবং তার জন্য এদিকের উপনদী অনেক জল অতিদ্রুত দামোদরে বয়ে নিয়ে আসে। আরও নিচু উপত্যকা মানভূমে পৌঁছলে দামোদরের প্রধান উপনদী বরাকর দিশেরগড়ের কাছে দামোদরের সঙ্গে মিশেছে। তারপরেই দামোদর পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে পূর্বমুখী গতিতে প্রবাহিত হয়ে বর্ধমান শহরের কাছাকাছি পর্যন্ত এসেছে। এই প্রবাহপথটিকে দামোদরের মধ্যপ্রবাহ বলা যায়। এখানে বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার সীমানা নির্দিষ্ট করেছে দামোদর। বর্ধমানের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পূর্বে দামোদর সহসা সমকোণ বাঁক নিয়ে দক্ষিণমুখী হয়েছে। এখান থেকেই তার শাখাবিস্তার ও খাত পরিবর্তন আরম্ভ। খাড়ি, বাঁকা, বেহুলা নদী দামোদরেরই প্রাচীন পরিত্যক্ত খাত বলে নদীবিদরা মনে করেন। নদীগুলি পশ্চিম থেকে পুবে প্রবাহিত। মূল দামোদরের পূর্বাঞ্চলের শাখাগুলিও উত্তর থেকে দক্ষিণে অথবা পূর্ব-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। ঘেয়া, কানানদী, কানা দামোদর, রানাবাঁধ খাল, কানা খাল, দুটি মিলে মাদারিয়া খাল, কেদোখাল প্রভৃতি হয় দামোদরের বর্জিত খাত অথবা কাটা খাল। নিম্নপ্রবাহে মূল দামোদরের পশ্চিমাঞ্চলে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত শাখাগুলির মধ্যে **মুণ্ডেশ্বরীর** পথে দামোদর বর্তমানে রূপনারায়ণে এসে মিলিত হয়। এখানে একটি কানা নদী ও কানা দ্বারকেশ্বর মুণ্ডেশ্বরীর উপশাখার মতো। মুণ্ডেশ্বরীর পথ সবচেয়ে আধুনিক পথ, বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় স্থাপিত, কিন্তু প্রবল হয়েছে ১৯১৪-১৫ সাল থেকে।

পশ্চিমবঙ্গের নদনদীর এই উৎস ও প্রবাহ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিধারার চিত্রটি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। নদীপথ ধরেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হয়। তাই একথা বলার প্রয়োজন হয় না যে, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সংযোগ ছোটোনাগপুরের নিষাদসংস্কৃতির সঙ্গে কত প্রত্যক্ষ ও গভীর। কেউ কেউ বলেন 'দামোদর' নাম মুন্ডাদের। 'দা-মুন্ডা' (Dah-Moondah) থেকে 'দা-মুদা' (Damuda), 'দামোদর' নাম হয়েছে। দা-মুন্ডা কথার অর্থ হল, মুণ্ডাদের জল।[৩] এই দামোদরের তীরে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির আঞ্চলিক উত্থান-পতন হয়েছে সবচেয়ে বেশি। দামোদরের প্রবাহের পরিবর্তনে গ্রাম্যসমাজের বিকাশ ও বিলোপ হয়েছে। দামোদরের পরিত্যক্ত প্রাচীন প্রবাহপথে অনেক একদা-সমৃদ্ধ জনপদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, যেমন দেখা যায় সরস্বতীর প্রাচীন তীরবর্তী অঞ্চলে। ছোটোনাগপুরে উৎপন্ন নদনদীর প্রবাহ দেখে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে যেমন নিষাদসংস্কৃতির প্রভাবের ও দানের কথা মনে হয়, তেমনি তাদের গঙ্গার প্রবাহে মিলনের কথা ভেবে আর্যসংস্কৃতির মিলনের ও সমন্বয়ের কথাও মনে পড়ে। কেবল সুবর্ণরেখা পশ্চিমবঙ্গে এবং কর্ণফুলি পূর্ববঙ্গে স্বাধীনভাবে সমুদ্রে মিশেছে। তা ছাড়া বাংলার অন্য সব নদ-নদীর মিলন হয়েছে গঙ্গা-ভাগীরথী-পদ্মার প্রবাহে। ছোটনাগপুর-জাত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নদ-নদীও গঙ্গার শাখা ভাগীরথী-হুগলিতে এসে মিশেছে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সম্পূর্ণ সমন্বয়ের চিত্রটি প্রতিফলিত হয়েছে তার নদ-নদীর এই উৎস থেকে সঙ্গমের ধারা মধ্যে।

(৩) Dalton : The Kols of Chotanagpore, *J. A. S* (L) XXXV, 1866, Part II, pp. 153-200.

# বাংলার প্রাচীন জনপদ

বাংলা দেশের প্রাচীন জনবিভাগ ও জনপদ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণের ধারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। প্রাচীন সুহ্ম বা **রাঢ়দেশই পশ্চিমবঙ্গ**। জৈন 'আচারাঙ্গ সূত্রে' (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) লাড়-রাঢ় দেশের নাম পাওয়া যায়। মহাভারতে (সভাপর্বে) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য অর্জুন ভীম সহদেব নকুল উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক জয় করেছিলেন। ভীম পূর্বদিকে বহু রাজ্য জয় করে 'বৈদেহক ও জগতীপতি জনককে পরাজিত করেন। বিদেহ রাজ্যের নিকটে শক ও বর্বর এবং দূরে কিরাতরা বাস করত। তাদের বশ করে, স্বপক্ষে সুহ্ম ও প্রসুহ্মদের নিয়ে, মগধ-গিরিব্রজে জরাসন্ধপুত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে, তিনি কর্ণকে ও পর্বতবাসীদের পরাজিত করেন। সেখান থেকে মোদাগিরি, তারপর মহাবল পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব, কৌশিকীকচ্ছবাসী রাজা মনৌজা, বঙ্গরাজ, সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্বট ও মহাসাগরতীরবাসী ম্লেচ্ছদের জয় করেন।

মহাভারতের এই বিবরণের মধ্যে একটি প্রাচীন ভৌগোলিক চিত্র পরিস্ফুট। **বিদেহ** রাজ্যের উত্তরসীমা হিমালয়, পূর্বসীমা কৌশিকী, দক্ষিণসীমা গঙ্গা ও পশ্চিমসীমা গণ্ডকী। এখনকার দ্বারভাঙা (দ্বার-বঙ্গ) জেলা। বিদেহ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে শকেরা বাস করত। এই শক, আর বিদেশী শকজাতি অভিন্ন নয়। যে-শকজাতি বিদেহ রাজ্যের উত্তরে বাস করত, গৌতমবুদ্ধ সেই শকজাতীয়। দূরে বাস করত কিরাতরা। কিরাতরা 'ইন্দো-মঙ্গোলীয়' (Indo-Mongloid), শকরা তাদেরই শাখা। সুহ্মদেশের আগে যে দেশ, তার নাম প্রসুহ্ম। ভাগীরথীর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ ও প্রাচীন রাঢ়ের উত্তর-পূর্বাংশ **সুহ্মদেশ**। তার আগে বা দক্ষিণে **প্রসুহ্ম**, **মগধ** গঙ্গার দক্ষিণে, তার উত্তরে ও পুবে ভাগলপুর, কর্ণের **অঙ্গরাজ্য**। মোদাগিরি মুঙ্গেরের গিরি, তার উত্তরে ও পুবে পূর্ণিয়া জেলা, **পুণ্ড্রদেশের** আরম্ভ এখান থেকে। পুণ্ড্রদেশের রাজা বাসুদেব, কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ও জরাসন্ধের অনুগত। পুণ্ড্রের দক্ষিণে **বঙ্গ**। সমুদ্রসেন সমদ্রপতি, পরে সমুদ্রের নাম **সমতট** বা সমুদ্রের তট-অঞ্চল হয়েছে। তাম্রলিপ্ত তমলুক। কর্বট দেশ কোথায়? বঙ্গের দক্ষিণে বোধহয়। 'ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল' (অর্থাৎ যে সমুদ্রতটে বাঘ বাস করে) **সুন্দরবন** অঞ্চল মনে হয়।

বায়ুপুরাণে ও মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে, গঙ্গানদী অন্যান্য দেশ ছাড়াও 'মগধ অঙ্গ ব্রহ্মোত্তর বঙ্গ তাম্রলিপ্ত' এই সব আর্যজনপদ পবিত্র করে, বিন্ধ্যাচলে প্রতিহত হয়ে, দক্ষিণ-সাগরে মিলিত হয়েছে। এখানে ব্রহ্মোত্তর দেশ কৌশিকী দেশ, তাম্রলিপ্ত সুহ্ম। রাজমহল পাহাড়কে বিন্ধ্যাচলের পূর্বসীমা ধরা হয়েছে। যখন যবন ও হূনেরা ভারতের পশ্চিমোত্তর পার্বত্য দেশে বাস করত, তখন পূবদিকে ছিল মগধ বিদেহ ব্রহ্মোত্তর পৌণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), প্রাগ্‌জ্যোতিষ (আসাম), প্রবঙ্গ বঙ্গেয় (দক্ষিণবঙ্গ), মালদ (মালদহ)। মার্কণ্ডেয়পুরাণে আছে বৈতরণী নদী বিন্ধ্যপাদ থেকে প্রসৃত। **উৎকল** এই নদীর দেশ, **কলিঙ্গ** দক্ষিণ দেশে। অর্থাৎ প্রাচীনকালে ছোটোনাগপুরের দক্ষিণের দেশকে বলত কলিঙ্গ, পরে কলিঙ্গের উত্তর-পূর্বভাগের নাম হয় উৎকল। উত্তর-কলিঙ্গ থেকে উৎকল। কালিদাসের 'রঘুবংশে' রঘু দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে সুহ্ম দিয়ে, কপিশা পার হয়ে উৎকলে গিয়েছিলেন। কপিশা নদীকে কংসাবতী বা কাঁসাই বলা হয়েছে, কিন্তু সুবর্ণরেখাও হতে পারে। কালিদাসের বর্ণনা থেকে মনে হয়, রঘু বঙ্গ থেকে সুহ্মে ফিরে এসে পশ্চিমে সুবর্ণরেখা পার হয়ে উৎকলে গিয়েছিলেন।

গ্রিক লেখকরা পূর্বভারতের দুটি দেশের নাম করেছেন—**গঙ্গারিডি** (Gangaridae) ও **প্রাসী** (Prasi)। 'প্রাসী' হল 'প্রাচী' বা প্রাচ্যদেশ। 'গঙ্গারিডি' নাম মনে হয় সংস্কৃত 'গঙ্গারাষ্ট্র', 'গঙ্গারাঢ়া' বা 'গঙ্গাহৃদয়' নামের গ্রিক বিকৃতি। গঙ্গারিডি ও প্রাচী স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ, তাদের রাষ্ট্রিক ও জনপদ-স্বাতন্ত্র্য তখন অস্বীকার্য ছিল না। মগধের মৌর্য রাজারা গঙ্গারিডি ও প্রাচী উভয় রাজ্যের রাজা ছিলেন। গ্রিক ভৌগোলিক টলেমি (Ptolemy) বলেছেন যে গঙ্গার মুখের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে গঙ্গারিডিদের বাস ছিল এবং তাদের রাজধানীর নাম ছিল **গাঙ্গী** (Gange)। **গঙ্গানগর** বলে কোনো নগর ছিল বোঝা যায়। দক্ষিণবঙ্গের ব-দ্বীপাঞ্চল জুড়ে গঙ্গারিডিদের বাস ছিল। দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দেই তাদের নিজেদের রাজধানী ছিল গঙ্গা নামে। টলেমি এই গঙ্গানগরের অক্ষাংশ (Latitude) দ্রাঘিমার (Longitude) যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাতে তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। মনে হয়, বর্তমান **গঙ্গাসাগর** বা গঙ্গাসাগরসঙ্গমের কাছে এই গঙ্গানগর ছিল।[৪] চতুর্থ খ্রিস্টাব্দে গুপ্তযুগের আগেই গঙ্গাসাগর-তীর্থের প্রসিদ্ধি ছিল। মহাভারতের (বনপর্বে) তীর্থযাত্রা বিবরণে গঙ্গাসাগরকে বিখ্যাত তীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রিক ও ভৌগোলিক অবনতির ফলে গঙ্গাসাগরযাত্রা ক্রমে বিঘ্নবহুল হয়ে ওঠে এবং সমুদ্রের ভাঙাগড়ায় গঙ্গানগরও ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮৪১-৪২ সাল পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে যে প্রাচীন দু-একটি দেবালয় ও অন্যান্য নিদর্শন ছিল, তাও পরে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।[৫]

## পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ভুক্তি

**দণ্ডভুক্তি**। রাঢ়দেশ ও সুহ্মদেশ পরে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়ে বিভক্ত হয় এবং তার অন্তর্গত বিভিন্ন ভুক্তি ও মণ্ডলেরও সীমানা-বদল হয়। সব ভুক্তি ও মণ্ডলের বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক। এখানে কয়েকটি ভুক্তি সম্বন্ধে কিছু বলব। বর্ধমানভুক্তির উত্তরসীমা অজয়, পূর্ব ও দক্ষিণসীমা ভাগীরথী। কিন্তু বর্ধমানভুক্তির পশ্চিমসীমা কী ছিল? অটবি বা অরণ্য। এই অরণ্যের খানিকটা ছিল রাঢ়ে, খানিকটা কলিঙ্গে। রাঢ়দেশ থেকে কলিঙ্গে যাবার পথও অবশ্য ছিল। সেই পথকে বলা হত 'দণ্ড'। বৃক্ষের দণ্ড বা কাণ্ড থেকে যেমন শাখা হয়, তেমনি বড়ো পথের (দণ্ডের) পাশ দিয়ে শাখা-পথ বেরোয়। ওড়িয়া ভাষায় এই অর্থে 'দাণ্ড' বা দণ্ড শব্দ বহুপ্রচলিত। দাঁতন-মেদিনীপুর গড়বেতার পথ মেদিনীপুর জেলাকে 'দণ্ড'-রূপে পূর্ব-পশ্চিম দুইভাগে ভাগ করেছে। মেদিনীপুর শহরের ছয় মাইল উত্তরে কর্ণগড়ে দণ্ডেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত। এই শিব দণ্ডপথের দেবতা বা ঈশ্বর। গড়বেতার উত্তরে বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া হয়ে পথটি উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে। কিন্তু এই পথ বা এর পশ্চিমের চাইবাসা-পুরুলিয়ার পথ দিয়ে রাঢ়ে যাওয়া যেত না। উত্তররাঢ় থেকে দণ্ডভুক্তি যাবার চারটি পথ ছিল—রানীগঞ্জ-গঙ্গাজলঘাটি-বাঁকুড়া, কাঁকসা-সোনামুখী-বিষ্ণুপুর, বর্ধমান-উচালন-শ্যামবাজার-গড়বেতা, বর্ধমান-উচালন-শ্যামবাজার-ক্ষীরপাই-মেদিনীপুর। এই

৪ Dr. Dinesh Chandra Sircar : "The City of Ganga', *The Proceedings of the Indian History Congress,* 1947.

৫ ১৮৪১ সালে "Friend of India" পত্রিকায় (Vol. VII) গঙ্গাসাগর মেলার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাতে এই ধ্বংসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

চারটি পথের একটি ছিল আসল 'দণ্ডে'র অংশ এবং প্রাচীন দণ্ডভুক্তির মধ্য দিয়ে 'দণ্ড' বিসর্পিত ছিল। তার পশ্চিমে ছিল কলিঙ্গদেশ। দণ্ডভুক্তির পূর্বসীমা বোধহয় দ্বারকেশ্বর এবং দক্ষিণ সীমা সুবর্ণরেখা ও সাগর ছিল।[৬] বর্ধমান শহরের দক্ষিণে দামোদর পার হয়ে এক 'উড়ের গড়' ছিল, কবি ঘনরাম লিখে গিয়েছেন। উড়ের গড় হল উড়িয়া রাজার গড়। এই রাজা মনে হয় রাজেন্দ্র চোড়গঙ্গ। একাদশ শতাব্দীর গোড়ায় উত্তর-দক্ষিণরাঢ় জয় করে তিনি বর্ধমান থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত ট্যাক্স আদায় করেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কালকেতু যে 'গুজরাট' নগর পত্তন করেছিলেন, এখন সেটি একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের পশ্চিমে দ্বারকেশ্বরের তীরে অবস্থিত। ধর্মমঙ্গলে লাউসেন এক কলিঙ্গরাজকন্যা বিবাহ করেছিলেন। বোধহয় বাঁকুড়া জেলার বর্তমান সিমলাপালের রাজবংশের কন্যা (যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি)। এই বংশ উড়িয়া। তাতে মনে হয়, বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম এবং মেদিনীপুরের উত্তর একদা 'কলিঙ্গ' বলে বিবেচিত হত। অর্থাৎ দণ্ডভুক্তির দণ্ডের পশ্চিম থেকে কলিঙ্গ, অথবা এই দণ্ডের পশ্চিমে মগধ থেকে কলিঙ্গে যাবার প্রাচীনপথের পশ্চিম থেকে কলিঙ্গ। পশ্চিমে খাড়ি-মণ্ডল বিস্তৃত ছিল। পূর্ব-খাড়ি ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় এবং পশ্চিম-খাড়ি হাওড়া জেলায়। এই হাওড়া জেলায় 'বেতড্ড' বা বেতড় গ্রাম। কলকাতা শহরের পত্তনের আগে বেতড় একটি বিখ্যাত গঞ্জ ছিল। বেতড় ও বালুটিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান থেকে বোঝা যায়, ভাগীরথী ছিল বর্ধমানভুক্তির পূর্বসীমা। উত্তরে ও দক্ষিণে এই ভুক্তির সীমানা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত শাসন থেকে একটা ধারণা হয়। বোঝা যায় যে বর্ধমানভুক্তিই ছিল প্রকৃত প্রাচীন রাঢ় দেশ। কিন্তু উত্তর-দক্ষিণ রাঢ়ের সম্পূর্ণ ভূভাগ বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল না।

**কঙ্কগ্রামভুক্তি**। লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর-শাসনে কঙ্কগ্রামভুক্তি নামে একটি নতুন ভুক্তির নাম পাওয়া যায়—'কঙ্কগ্রামভুক্ত্যন্তঃপাতিদক্ষিণবীথ্যাং উত্তররাঢ়ায়াং'। দক্ষিণবীথি দক্ষিণমার্গ, দক্ষিণ দিকে যাবার পথ। নৈহাটি-শাসনে পেয়েছি, উত্তররাঢ়-মণ্ডলে দক্ষিণগামী বীথির স্বল্পান্তরে অবস্থিত গ্রামের কথা। দুই বীথি এক না হতে পারে, তবে আরম্ভে এক হবার কথা। লোকচলাচলের পথ ধরে গ্রামনির্ণয়ের রীতি আজও প্রচলিত। উত্তর থেকে মঙ্গলকোট, বর্ধমান আসবার পথ আছে। এটা দ্বিতীয় বীথি। কঙ্কগ্রাম থেকে কাঁকগ্রাম, কাঁকগ্রাম থেকে **কাগ্রাম**। মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ ও বর্ধমান জেলার উত্তর সীমায় অবস্থিত। কাগ্রামে নদী নেই, তার চারপাঁচ মাইল পুবে ভাগীরথী, আট-নয় মাইল দক্ষিণে অজয়। কান্দি মহকুমায় কান্দড় নদীর পথ মনে হয় ভাগীরথীর লুপ্ত পথ। 'কান্দি' নামও মনে হয় এই কান্দড় থেকে হয়েছে। যাই হোক, কঙ্কগ্রাম যে ভাগীরথীর কূলে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তৎকালে কাটোয়া মহকুমায় কানুড় নদী ছিল অজয়। পরে ভাগীরথী ও অজয় দুই-ই অনেক সরে গিয়েছে। আগেকার ভূ-ভাগ পরে বর্ধমান জেলার ঈশান কোণে একটা খোঁচের মতো হয়ে রয়েছে। অনেককাল আগেকার কথা। দামোদর বর্ধমান শহর থেকে পূর্বগামী ছিল, এখন বেহুলা নদী নাম নিয়ে দুই শাখায় ভাগীরথীতে পড়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, এই বেহুলা নদীর উত্তরভাগ মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত প্রাচীন সুহ্ম, উত্তররাঢ়। এর দক্ষিণে গঙ্গা পর্যন্ত প্রাচীন প্রসুহ্ম, দক্ষিণরাঢ় (যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি)। নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন, পুবে

৬ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি : 'বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ'—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৪০।

ভাগীরথী, দক্ষিণে অজয়, পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা এবং উত্তরে বিহারের সীমানা হল উত্তররাঢ়ের চতুঃসীমা। আর পুবে ভাগীরথী, উত্তরে অজয়, পশ্চিমে পুরুলিয়া-মানভূম এবং দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর ও তার দক্ষিণাংশ রূপনারায়ণ হল দক্ষিণরাঢ়ের চতুঃসীমা। উত্তররাঢ়ের অধিকাংশ নিয়ে কঙ্কগ্রামভুক্তি, সমগ্র দক্ষিণরাঢ় ও উত্তররাঢ়ের কতকাংশ নিয়ে বর্ধমানভুক্তি। দ্বারকেশ্বর-রূপনারায়ণ দ্বারা বিভক্ত বর্ধমান-বিভাগের অবশিষ্ট ভূভাগ, অর্থাৎ বাঁকুড়ার দক্ষিণার্ধ, হুগলির পশ্চিমাংশ এবং সমগ্র মেদিনীপুর জেলা নিয়ে দণ্ডভুক্তি গঠিত ছিল।[৭]

**পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি**। গুপ্তসম্রাটদের আমলের পাঁচখানা তাম্রশাসনে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে কোটিবর্ষ-বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। শাসনগুলি দামোদরপুরে পাওয়া গিয়েছে। দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় আঠার মাইল দক্ষিণে 'বাণগড়' নামক স্থানই প্রাচীন কোটিবর্ষ। পৌণ্ড্রবর্ধন নগর বর্তমানে 'মহাস্থান' নামে পরিচিত এবং বগুড়া শহরের প্রায় আট মাইল উত্তরে করতোয়ার শীর্ণ খাতের উপর অবস্থিত। করতোয়ার উপরে পৌণ্ড্রবর্ধন নগরের অবস্থান দেখে মনে হয়, পুবে বোধহয় লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত এই ভুক্তির প্রসার ছিল। এই ভুক্তির উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্র। কিন্তু পশ্চিম সীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল? তীরভুক্তি (মিথিলা) ও পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে কৌশিকী বা কুশী নদী ছিল সীমানা। বল্লালসেনের নৈহাটি-শাসনদত্ত ভূমি ভাগীরথীতীরবর্তী কাটোয়া থেকে মাত্র ছয় মাইল পশ্চিমে এবং বর্ধমানভুক্তির মধ্যে ছিল। পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির পশ্চিম সীমা এই তথ্য থেকে অনুমান করা যায়। প্রথম সীমানা কুশী নদী, কুশী গঙ্গার সঙ্গমস্থল থেকে ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থল পর্যন্ত গঙ্গা নদী। ভাগীরথীর উৎপত্তি থেকে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির পশ্চিম সীমানা। বিজয়সেনের বারাকপুর-শাসনে ভূমিদান প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে—'পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্ত্যন্তঃ-পাতিখাড়ীবিষয়ে' 'ঘাসসম্ভোগভাট্টবড়া' গ্রাম। গ্রামের নাম বড়া, জলা জায়গা, প্রচুর ঘাস জন্মাত, সেই ঘাস যারা ভোগ করত তারা তার জন্য খাজনা দিত। এই গ্রামটি খাড়ি-বিষয়ের মধ্যে ছিল। চব্বিশ-পরগনা জেলার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত খাড়ি গ্রাম। লক্ষ্মণসেনের বকুলতলা শাসনেও (জয়নগর-মজিলপুর-শাসনও বলা যায়) খাড়ির উল্লেখ আছে—'পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্ত্যন্তঃসতি খাড়ী মণ্ডলে'। কাজেই খাড়ি-সুন্দরবন পর্যন্ত যে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানা বিস্তৃত ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

**বর্ধমানভুক্তি**। বল্লালসেনের নৈহাটি-শাসন থেকে বর্ধমানভুক্তির কথা প্রথম জানা যায়। তাতে 'বাল্লহিট্‌ঠা' গ্রাম প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে—'শ্রীবর্ধমান ভুক্ত্যন্তঃপাতিন্যুত্তররাঢ়ামণ্ডলে স্বল্পদক্ষিণবীথ্যাং'। বাল্লহিট্‌ঠা হল বালুটিয়া গ্রাম। বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানায় ভাগীরথী থেকে চার-পাঁচ মাইল পশ্চিমে বালুটিয়া গ্রাম। এই অঞ্চলটি উত্তররাঢ়ের 'স্বল্প-দক্ষিণ বীথিতে' অর্থাৎ প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। এই তথ্য থেকে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়ের সীমানার নির্দেশ পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর শাসনে (চব্বিশ-পরগনার দক্ষিণে বারুইপুরের কাছে গোবিন্দপুর গ্রাম) ভূমিদান প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে ঃ 'বর্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতিপশ্চিম-

৭ প্রাচীন ভুক্তি, মণ্ডল, বিষয় প্রভৃতি প্রসঙ্গে উল্লেখ্য আলোচনা ঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঃ লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ ঃ *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,* ১৩৩৯; যোগেশচন্দ্র রায় ঃ বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ ঃ *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,* ১৩৪০; ননীগোপাল মজুমদার ঃ *Inscriptions of Bengal* : বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি।

খাটিকায়াং বেতড্ড চতুরকে'। 'খাড়ি' কথা সংস্কৃতে 'খাটিকা'। বোঝা যায় যে গঙ্গা তখন দুইভাগে খাড়িমণ্ডলকে বিভক্ত করত। পূর্বতীরের নাম ছিল পূর্বখাড়ি। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় 'খাড়ি' গ্রাম আছে। পশ্চিমতীরে ছিল পশ্চিম-খাড়ি। 'খাড়ি' শব্দই সংস্কৃতে 'খাটিকা' হয়েছে।

জনপদ বিভাগের এই প্রাচীন ইতিহাস থেকে মনে হয়, প্রধানত শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য, হিন্দুযুগেও ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন করা হত। দশম শতাব্দীতে দেখা যায়, বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল দণ্ডভুক্তি (ইর্‌দা তাম্রশাসন)। পরে দণ্ডভুক্তি অধিকাংশই উৎকলভুক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গে উৎকলরাজাদের আধিপত্য বিস্তারকালে দণ্ডভুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বর্ধমানভুক্তি থেকে। লক্ষ্মণসেনের আমলে কঙ্কগ্রামভুক্তির নাম পাওয়া যায় এবং মনে হয় সেই সময় কোনো প্রশাসনিক কারণে এই নতুন ভুক্তি গঠিত হয়। হিন্দুযুগের ভুক্তি মণ্ডল বিষয় মুসলমানযুগে সরকার মহল পরগনা চাকলা প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত হয়। ইংরেজযুগে জেলা মহকুমা থানা ইত্যাদি বিভাগ হয় এবং জেলা-সীমানার একাধিকবার পরিবর্তন করা হয় প্রশাসনিক কারণে। কাজেই বর্তমানে জেলাগত ইতিহাস ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্ব প্রদর্শনের যে প্রবণতা কারও কারও মধ্যে দেখা যায়, তার কোনো ঐতিহাসিক যুক্তি নেই।

## ইংরেজযুগে জেলা সীমানার পরিবর্তন

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় (১৭৯৩) সমগ্র বঙ্গদেশ (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) ষোলটি জেলায় বিভক্ত ছিল, হিজলির নিমকমহল (Salt Agency) সহ। পরে কলকাতা নিয়ে আটাশটি জেলায় বিভক্ত হয়। জেলার 'ইউনিট' হয় 'থানা' এবং চারটি বা তার বেশি থানা নিয়ে এক-একটি 'মহকুমা' গঠিত হয়। দু-একটি জেলায়, যেমন দার্জিলিঙে, চারটির কম থানা নিয়ে মহকুমা গঠিত হয়। জেলা সীমানার পরিবর্তন করা হয় অনেকবার, প্রশাসনিক কারণে। এখানে সংক্ষেপে তালিকাকারে এই পরিবর্তনের বিবরণ দেওয়া হল, কোন্ সময় কোন্ অংশ যুক্ত অথবা বিযুক্ত হয়েছে তারও উল্লেখ করা হল। সংলগ্ন তিনটি মানচিত্রে অংশগুলিতে 'সংখ্যা' দেওয়া আছে এবং তালিকাতে + চিহ্ন দ্বারা যুক্ত এবং - চিহ্ন দ্বারা বিযুক্ত অংশগুলি সূচিত হয়েছে।[৮]

### বর্ধমান

১৭৬০ সালে মীরকাশিম বর্ধমান ইংরেজদের হস্তান্তর করেন। তখন বর্ধমান জমিদারির সীমানা ছিল, বর্তমান বর্ধমান (সাতসৈকা ছাড়া), হুগলি ও হাওড়া (সরস্বতীর পূর্বতীরাঞ্চল ছাড়া), মেদিনীপুর (ঘাটাল, সদরের গড়বেতা, শালবনি ও কেশপুর থানার উত্তরাংশ), বাঁকুড়া (রায়পুর থানা) এবং বীরভূম (অজয়ের উত্তরে খানিকটা অঞ্চল) পর্যন্ত বিস্তৃত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে, মাত্র একশো বছরের মধ্যে, বহুবার বর্ধমানের সীমানার পরিবর্তন হয়, মধ্যে পশ্চিম-বর্ধমান ও পূর্ব-বর্ধমান নামে দুটি জেলাও হয়। এই সমস্ত পরিবর্তনের

৮ Monmohan Chakrabatti : *A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal, 1757-1916* : Calcutta, The Bengal Secretariat Press, 1918. For Official Use only.

অন্যতম কারণ প্রশাসনিক, রাজস্ব আদায়, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি। পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখ্য হল ঃ

১৭৯৩ সালে ছয়টি জঙ্গলমহল (রায়পুর শ্যামসুন্দরপুর ফুলকুসুমা সিমলাপাল প্রভৃতি) বর্ধমান থেকে মেদিনীপুরে যুক্ত হয় (—১৮)। ১৭৯৪ সালে সাতসৈকা ও সরস্বতীর পূর্বতীরাঞ্চল নদীয়া থেকে বর্ধমানে যুক্ত হয় ( +২, +৫, +৬. +৭)। ১৭৯৫ সালে হাওড়া-সহ হুগলি পৃথক হয় এবং বগড়ি পরগনা মেদিনীপুরে যুক্ত হয় (-৪ অধিকাংশ, -৫ থেকে -৮, -১০ থেকে -১৪, -১৭)। ১৭৯৫-১৮০৭ সালের মধ্যে পাণ্ডুয়া পরগনা, অন্যান্য মহলসহ, হুগলিতে যুক্ত হয় (-৪ আংশিক)। ১৮০৫ সালে সেনপাহাড়ি শেরগড় বিষ্ণুপুর জঙ্গলমহলে যুক্ত হয় (-২১, -২২)। ১৮০৬ সালে অজয় নদ হয় বর্ধমানের উত্তর সীমানা (-১)। ১৮৩৩ সালে সেনপাহাড়ি শেরগড় ও বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ জঙ্গলমহল বর্ধমানে যুক্ত হয় (+১৬, + ২১, +২২)। ১৮৪৮ সালে আউসগাঁ ও ইন্দাস বাঁকুড়া থেকে বর্ধমানে যুক্ত হয় (+১৬, +৩ আংশিক) এবং ১৮৫১ সালে ইন্দাস থানা পুনরায় বাঁকুড়াতে যুক্ত হয় (-১৬)। ১৮৭২ সালে বাঁকুড়া থেকে সোনামুখী ও কোতলপুর থানা এবং হুগলি থেকে জাহানাবাদ ও গোঘাট বর্ধমানে যুক্ত হয় (+১৫, +১২)। ১৮৭৯ সালে বুদবুদের মহকুমার মর্যাদা লুপ্ত হয় এবং কোতলপুর ও সোনামুখী-সহ ইন্দাস থানা বর্ধমান থেকে পুনরায় বাঁকুড়ায় যুক্ত হয় (-১৫, -১৬)। ১৮৭৯ সালে গোঘাট ও জাহানাবাদ থানা বর্ধমান থেকে হুগলিতে যুক্ত হয় (-১২)।

## বীরভূম

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর বীরভূম ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়। তখন বীরভূম-জমিদারির সীমানা ছিল বর্তমান বীরভূম (সদর), সাঁওতাল পরগনা (দেওঘর, জামতাড়া ও সদরের দক্ষিণ-পূর্বাংশ)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে, ১৭৮৭ সালে যুক্ত বিষ্ণুপুর, বর্ধমানে স্থানান্তরিত হয়। তখন বীরভূমের এলাকা ছিল বর্তমান সদর মহকুমা এবং সাঁওতাল পরগনা (সদরের উত্তরভাগ ছাড়া)। পরবর্তী পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখ্য হল ঃ

১৭৯৩ সালে মুর্শিদাবাদের ২৫০ গ্রাম বীরভূমে যুক্ত হয় (+৪ আংশিক)। ১৭৯৯ সালে পঞ্চকোট ও ঝালদা (রামগড় জেলা) যুক্ত হয় বীরভূমে (+৫ আংশিক)। ১৮০৫ সালে ষোলোটি জঙ্গলমহল (পঞ্চকোট বাঘমুণ্ডি ঝালদা ঝরিয়া জয়পুর পাতকুম প্রভৃতি) নতুন জঙ্গলমহল জেলায় যুক্ত হয় (-৫ আংশিক)। ১৮০৬ সালে দক্ষিণের সীমানা হয় অজয় নদ, এবং ভাগীরথীর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ বীরভূমে যুক্ত হয় (+৮ আংশিক)। ১৮৫৪ সালে ভরতপুর থানা মুর্শিদাবাদে যুক্ত হয় (-৮ আংশিক)। ১৮৫৫ সালে নতুন সাঁওতাল পরগনা জেলা গঠিত হলে বীরভূমের আগেকার অনেকাংশ তার সঙ্গে যুক্ত হয় (-১)। ১৮৭২ সালে রামপুরহাট নলহাটি ও পলসা থানা মুর্শিদাবাদে যুক্ত হয় (-২), তারপর ১৮৭৯ সালে পুনরায় এই অংশ বীরভূমে যুক্ত হয় (+২)।

## বাঁকুড়া

প্রথমে বর্ধমান ও মেদিনীপুরের সঙ্গে আংশিকভাবে (১৭৬০) এবং বীরভূমের সঙ্গে আংশিকভাবে (১৭৬৫) ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়। সেই অবস্থা বজায় থাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত। ১৮০৫ থেকে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত জঙ্গলমহল জেলাভুক্ত হয় (রেগুলেশন ১৮, ১৮০৫)। ১৮৩৩ সালে বিষ্ণুপুর বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং জঙ্গলমহল হয়

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি (South-West Frontier Agency)। ১৮৩৭ সালে বাঁকুড়া পৃথক জেলা হয়। পরবর্তী পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখ্য হল ঃ

১৮৩৭ সালে কোতলপুর থানাসহ বিষ্ণুপুর একটি পৃথক জেলা হয়, 'পশ্চিম বর্ধমান' নামে (+২২, +১৫)। ১৮৪৭ সালে মানভূম থেকে ছাতনা থানা বাঁকুড়ায় যুক্ত হয় (+২০ অধিকাংশ)। ১৮৪৮ সালে আউসগাঁ ইন্দাস পোথনা থানা 'পূর্ব বর্ধমান' জেলায় যুক্ত হয় (-১৬ আংশিক, -৩ আংশিক)। ১৮৭২ সালে কোতলপুর সোনামুখী ও ইন্দাস থানা বর্ধমানে যুক্ত হয় (-১৫, -১৬), ১৮৭৯ সালে পুনরায় বাঁকুড়ায় যুক্ত হয় (+১৫, +১৬)।

## মেদিনীপুর

মিরকাশিমের আদেশে ১৭৬০ সালে বর্ধমানের সঙ্গে মেদিনীপুরও ইংরেজদের অধিকারে আসে। তখন মেদিনীপুরের আয়তন ছিল প্রায় ৬১০২ বর্গমাইলের মতো এবং তার সীমানার মধ্যে ছিল ঃ বর্তমান মেদিনীপুর (হুগলির অন্তর্গত হিজলি মহিষাদল ও তমলুক ছাড়া; মারাঠাদের শাসনাধীন কামারডিচর পটাশপুর ও ভোগরাই ছাড়া; বর্ধমানভুক্ত ঘাটাল মহকুমা, গড়বেতা থানা এবং শালবনি ও কেশপুর থানার কিয়দংশ ছাড়া), সুবর্ণরেখার উত্তরে বালাসোরের কিয়দংশ, সিংভূমের ধলভূম মহকুমা, বরাভূম মানভূম, মানভূমের জঙ্গলমহল এবং বাঁকুড়ার ছাতনা ও অম্বিকানগর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হিজলি মহিষাদল ও তমলুক স্বতন্ত্র নিমকমহলের অধীন ছিল এবং ঘাটাল মহকুমা ও সদরের উত্তরভাগ বর্ধমানভুক্ত ছিল। তার পরের পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখ্য হল ঃ

১৭৯৩ সালে ছয়টি জঙ্গলমহল বর্ধমান থেকে মেদিনীপুরে যুক্ত হয় (+৯)। ১৭৯৫ সালে বগড়ি বর্ধমান থেকে মেদিনীপুরভুক্ত হয় (+৮)। ব্রাহ্মণভূম পরগনা, বগড়ির খানিকটা অংশ, পরগনা চেতুয়া ও তরফ দাসপুর ১৮০০ সালে হুগলি থেকে মেদিনীপুরে যুক্ত হয় (+৭)। ১৮০৫ সালে সাতাটি জঙ্গলমহল (ছাতনা বরাভূম মানভূম শ্রীপুর সিমলাপাল প্রভৃতি) স্বতন্ত্র জঙ্গলমহলভুক্ত করা হয় (-৯, -১১)। ১৮৩৩ সালে ধলভূম দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সিভুক্ত হয় (-১০)। ১৮৩৪ সালে হিজলি মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত হয় (-১০)। ১৮৩৭ সালে পরগনা ভোগরাই কামারডিচর ও শাহবন্দর বালাসোরের সঙ্গে যুক্ত হয় (-২, -৪)। ১৮৭২ সালে ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানা হুগলি থেকে মেদিনীপুরে সঙ্গে যুক্ত হয় (+৭)।

## হুগলি

১৭৬০ সালে বর্ধমানের সঙ্গে হুগলি ইংরেজদের অধিকারে আসে। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর ইংরেজরা সরস্বতীর পূর্বতীরাঞ্চলের মালিক হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই পূর্বাঞ্চল নদিয়াভুক্ত ছিল এবং হুগলি প্রধানত ছিল বর্ধমানের মধ্যে। সরস্বতীর পূর্বতীরাঞ্চল ১৭৯৪ সালে বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হয়। তার পরবর্তী পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখ্য হল ঃ

১৭৯৫ সালে হুগলি জেলা পৃথক করা হয় বর্ধমান থেকে। ১৭৯৫-১৮০৭ সালের মধ্যে পরগনা পাণ্ডুয়া ও সংলগ্ন কয়েকটি অঞ্চল বর্ধমান থেকে হুগলিতে যুক্ত করা হয় (+ ৪ আংশিক)। ১৮০০ সালে ২৪ পরগনার সমস্ত মহল (কলকাতা ছাড়া) হুগলি জেলাতে যুক্ত হয়। এই সময় রূপনারায়ণের দক্ষিণে পরগনা ব্রাহ্মণভূম, চেতুয়া ও দাসপুর মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত হয় (-১৩, -১৪)। ১৮০৬ সালে ২৪ পরগনা জেলা পুনরায় স্থাপিত হয়

(কেবল দেওয়ানি আদালত)। ১৮১৯ সালে উলুবেড়িয়া থানা ও সংলগ্ন এলাকা কলকাতা থেকে হুগলিতে যুক্ত হয় (+৭, +৮ আংশিক)। ১৮২৪ সালে চুঁচুড়া ডাচদের কাছ থেকে দখল করা হয়। ১৮৪৩ সালে সালকিয়া আমতা বাগনান প্রভৃতি থানা নিয়ে হাওড়া পৃথক করা হয় (-৬, -৭, -৮)। ১৮৪৫ সালে শ্রীরামপুর দখল করা হয়। ১৮৭২ সালে জাহানাবাদ ও গোঘাট থানা বর্ধমানে, এবং ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা মেদিনীপুরে যুক্ত করা হয়। ১৮৭৯ সালে গোঘাট ও জাহানাবাদ পুনরায় বর্ধমান থেকে হুগলিতে যুক্ত হয়।

## হাওড়া

১৭৬০ সালে বর্ধমানের সঙ্গে এবং ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর হাওড়া ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়। ১৭৯৫ সালে যখন পৃথক হুগলি জেলা গঠিত তখন হাওড়া তার মধ্যেই ছিল। ১৯১৭-১৮ সালেও হুগলি থেকে হাওড়া পৃথক ছিল কেবল ফৌজদারি বিচারের ব্যাপারে, রাজস্ব ও দেওয়ানি বিচারের ব্যাপারে হুগলির অধীন ছিল।

## চব্বিশ-পরগনা

১৭৫৭ সালে মিরজাফর ক্লাইভকে ২৪ পরগনা জায়গীর হিসেবে দেন। সেই সময় তার আয়তন ছিল প্রায় ৮৮২ বর্গমাইল এবং সদর মহকুমা, বারাকপুর ও ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা তার মধ্যে ছিল। সুন্দরবন অঞ্চল ছিল হুগলির সঙ্গে যুক্ত এবং বারাসাত ও বসিরহাট মহকুমা ছিল নদিয়ারাজের অধীন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সুন্দরবন অঞ্চল ২৪ পরগনার সঙ্গে যুক্ত হয়, কিন্তু বারাসাত ও বসিরহাট তার বাইরেই থাকে। কলকাতার পুরাতন সীমানার বাইরের এলাকা বর্তমানে ২৪ পরগনার মধ্যেই আছে, এবং বারাসাত ও বসিরহাট অঞ্চলও এই জেলার সঙ্গে যুক্ত।

## নদিয়া

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর ইংরেজদের অধিকারে আসে। নদিয়ারাজের এলাকা ছিল তখন ৩১৫১ বর্গমাইল। বর্তমান নদিয়ার সদর ও রানাঘাট মহকুমা দক্ষিণ-মেহেরপুরের সামান্য অংশ, যশোহরের বনগাঁ ও সদরের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, খুলনার পশ্চিম-সাতক্ষীরা অঞ্চল নিয়ে ছিল নদিয়ারাজের সীমানা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সাতসৈকা পরগনা ও সরস্বতীর পূর্বতীরাঞ্চল নদিয়ারাজভুক্ত হয়। ১৭৯৬ সালে নদিয়া ও যশোহরের সীমানা নির্দিষ্ট হলেও, পরে একাধিকবার তার পরিবর্তন হয়েছে। যেমন ১৭৯৯ সালে মির্জানগর যশোহরে যুক্ত হয়েছে (-১২ আংশিক)। ১৮০২ সালে আনওয়ারপুর জমিদারি ২৪ পরগনায় যুক্ত হয় (-২১ অধিকাংশ)। ১৮১২ সালে টাকি ও সুখসাগর থানা যশোহর থেকে নদিয়ায় যুক্ত হয় (+২৩ আংশিক) এবং কোটচাঁদপুর থানা যশোহরে যুক্ত হয় (-১২ আংশিক)। ১৮৬৩ সালে পাবনা থেকে কুষ্টিয়া এবং ১৮৭১ সালে কুমারখালি নদিয়ায় যুক্ত হয় (+৯)। ১৮৮৩ সালে বনগাঁ মহাকুমা যশোহরের সঙ্গে যুক্ত হয় (-১১)। বর্তমানে বনগাঁর একাংশ ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত এবং নদিয়ার কিয়দংশ নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশভুক্ত।

## মুর্শিদাবাদ

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর মুর্শিদাবাদ ইংরেজদের অধিকারে আসে। তখন মুর্শিদাবাদ বলতে বোঝাত, রাজশাহি ও নদিয়ার জমিদারির কিয়দংশ এবং ফতেসিং ও চুনাখালির

জমিদারিসহ বেশ বড়ো একটা অঞ্চল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৯১৭-১৮ সাল পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলা বেশ বড়োই ছিল, বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমা ও সদরের খানিকটা অংশ মুর্শিদাবাদের মধ্যে ছিল। ১৮৭২ সালে রামপুরহাট, নলহাটি থানা ও সংলগ্ন অঞ্চল বীরভূম থেকে মুর্শিদাবাদে যুক্ত হয় (+২), ১৮৭৯ সালে এই থানাগুলি পুনরায় বীরভূমের সঙ্গে যুক্ত হয় (-২)।

ইংরেজযুগে বাংলার জেলা সীমানার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে (১৭৯৩) প্রায় একশো বছর ধরে, অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা নানা কারণে বিভিন্ন জেলার আয়তন ও সীমানা অদলবদল করেছেন। তার মধ্যে প্রধান কারণ হল প্রশাসনিক সুব্যবস্থা। তার জন্য তাঁরা যখনই মনে করছেন যে তাঁদের শাসনের, রাজস্ব আদায়ের অথবা বিচারব্যবস্থার সুবিধা হবে তখনই জেলাগুলিকে ভেঙেছেন গড়েছেন, এক জেলার কতকাংশ অন্য জেলার সঙ্গে জুড়েছেন, আবার সেই একই অংশ পুরাতন জেলার সঙ্গে পুনরায় যুক্ত করেছেন। বিংশ শতাব্দী থেকে মোটামুটি বলা চলে জেলাগুলির বর্তমান সীমানা অনেকটা স্থায়ী হয়েছে। কাজেই জেলাগত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বিচারকালে, একথা মনে রেখে, আমাদের বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। জেলাগত সংস্কৃতির অবশ্যই বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা অথবা স্বাতন্ত্র্যের প্রলেপ দেওয়া বৈজ্ঞানিক কারণেই সংগত নয়। একথা সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে সমগ্র বঙ্গসংস্কৃতির এক-একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হল বিভিন্ন জেলার সংস্কৃতি। জেলার মধ্যেও দেখা যায়, এক-একটি মহকুমার বেশ উল্লেখ্য সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, মেদিনীপুর জেলায় তমলুক ও ঘাটাল মহকুমার সঙ্গে সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার সাংস্কৃতিক উপাদানের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সেই রকম বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর ও সদর মহকুমার মধ্যে সাংস্কৃতিক বিশেষত্বের পার্থক্য বেশ লক্ষণীয়। বিভিন্ন অঞ্চলের, থানার মহকুমার এবং জেলার সংস্কৃতির উপাদানগত বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্যের মিলনমিশ্রণে সমগ্র বঙ্গসংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে পাপড়িমেলা পদ্মফুলের মতো।

উৎস : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ১ম খণ্ড/প্রকাশ ভবন/১৯৭৬

# বাংলা দেশের নদ-নদী সম্বন্ধে সাধারণ কথা

কপিল ভট্টাচার্য

নদ-নদীই বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্য। বাংলা দেশের কোনো অংশকেই নদ-নদী বাদ দিয়ে কল্পনাই করা যায় না। আর বাংলা দেশের মনের ছবি এখানকার কবিরা চিরদিনই নদ-নদীকে অবলম্বন করেই ফুটিয়ে তুলেছেন। ছড়ায়, গানে, কিংবদন্তিতে, কাব্যে, মহাকাব্যে বাংলা দেশের রূপ যে নানাভাবে নদ-নদীর ছবি দিয়ে আঁকা, তা কারও অবিদিত নেই। এখানকার সাধারণ মানুষের মনের জাগরণই রবীন্দ্রনাথের কাব্যানুভূতির প্রকাশ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' ফুটে উঠেছে। কবি জসিমুদ্দিনের পদ্মা মায়াময়ী। তাই রবীন্দ্রনাথই একদিন বলেছিলেন, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসিয়ে যে বাংলা দেশকে দেখেনি, সে এ দেশ দেখেনি। প্রাচীন কাব্যে মনসার ভাসান অথবা চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রা নদীপথের ছবিই তুলে ধরে বাঙালির মনে। সুতরাং বাংলা দেশকে চিনতে হলে এর নদ-নদীর সঙ্গে সম্যক পরিচয় একান্তই দরকার।

বাস্তবিক এ দেশের অধিকাংশ ভূভাগই নদ-নদীর দ্বারাই গঠিত। অর্থাৎ প্রবাহ-বাহিত পলিমাটির স্তরে স্তরে অবক্ষেপণই এই ভূভাগকে সমুদ্র থেকে গেঁথে তুলেছে। উত্তরে হিমালয়ের কোল থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুন্দরবন অঞ্চল পর্যন্ত নল পুঁতে দেখা গিয়েছে, দু-তিন হাজার ফুট গভীরতা পর্যন্ত শুধুই স্তরে স্তরে বালুকা আর নানাশ্রেণির মৃত্তিকা পর পর সাজানো রয়েছে নিচে আদিম প্রস্তরের ভিত্তির উপর। এই স্তরীভূত বালি আর মাটিগুলি যে নদ-নদী প্রবাহে বাহিত হয়েই এসেছে আর যুগ যুগ ধরে সমুদ্রগর্ভে জমা হয়ে ক্রমে বাংলা দেশের ব-দ্বীপ অঞ্চলকে সৃষ্টি করেছে, তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। সুন্দরবন অঞ্চলে আর তার ক্রোড়ে বঙ্গোপসাগরের গর্ভে আজও সেই গঠনক্রিয়া চলেছে। কোনো কোনো নদী ক্রমশ মজে আসছে আর নতুন ভূখণ্ড গঠিত হচ্ছে। এমনকী, স্তরগুলির বালি ও মৃত্তিকা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমীক্ষা করে বলা শক্ত নয়, কোন্ নদ অথবা নদী কোথা থেকে এই বালি আর মাটি এখানে এনেছে। এইভাবে আর অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে, আজকের দিনের নদী পূর্বকালে কোন্ পথে প্রবাহিত হত তাও বলা যায়। দামোদর নদ যে পূর্বকালে চব্বিশ পরগনা জেলার উত্তর-পূর্ব দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে মিশত, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ওই

পথে দামোদরবাহিত বিশিষ্ট লাল দানা দানা বালির নিদর্শন পেয়ে আর জরিপ ও অন্যান্য পর্যবেক্ষণের ফলে।

অবশ্য, সমগ্র বাংলা দেশের ভূভাগই নদ-নদী বাহিত পলির দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার প্রধান অংশ, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার আংশিক ভূভাগ বৃষ্টি, বায়ু ও হিমবাহ (glacier) দ্বারা বাহিত মাটি দিয়ে তৈরি। এই সমস্ত ভূভাগের মাটি আর নদীর পলিদ্বারা গঠিত উত্তরবঙ্গ, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর, নদিয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলার প্রাচীন মাটি আধুনিক কালে আবার প্রধানত বৃষ্টির জলে ক্ষয়িত হয়ে ওই অঞ্চলের নদ-নদী পথে পলিরূপে নিম্নাঞ্চলে চলে যাচ্ছে, সমুদ্রতটে নতুন ভূভাগ সৃষ্টি করবার জন্য।

সুতরাং এ কথা সহজেই বোঝা যায়, বাংলা দেশের নদ-নদীতেই তার প্রাণশক্তি নিহিত রয়েছে। নদ-নদীর অবস্থান ও অবস্থার উপরেই ঐতিহাসিক কালে এখানকার মানুষের ভালোমন্দ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। প্রত্যেক মননশীল বাঙালিরই বাংলার নদ-নদী সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা খুবই প্রয়োজনীয়; বিশেষত, আজকের দিনে, যখন সরকারি পরিকল্পনা বিভিন্ন নদ-নদীগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া আরম্ভ করেছে। আবার নদ-নদীর বন্যার প্রকোপ তাদের মারক-মূর্তির কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছে।

## গঙ্গা-পদ্মাই বাংলা দেশের মেরুদণ্ড

প্রথমেই বাংলা দেশের নদ-নদীর মানচিত্রখানি একটু ভালো করে দেখতে হবে। বাংলা দেশের মাঝখান দিয়ে উত্তর-পশ্চিম থেকে পূর্ব-দক্ষিণে এবং ক্রমশ দক্ষিণে গঙ্গা বা পদ্মা প্রবাহিত হচ্ছে, আর অন্য প্রায় সমস্ত নদীগুলি এই গঙ্গা বা পদ্মার হয় উপনদী অথবা শাখানদী। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের সুবর্ণরেখা ও পূর্ববঙ্গের কর্ণফুলী নদী স্বাধীনভাবে সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের ছোটনাগপুর উপত্যকার উৎস থেকে উৎপন্ন নদ-নদীগুলি গঙ্গার শাখা ভাগীরথী-হুগলি নদীতে এসে মিশেছে। এইরূপে, মোটের মাথায়, প্রধানত গঙ্গা নদীকেই অবলম্বন করে বাংলার সমস্ত নদ-নদী প্রবাহিত হচ্ছে।

## গঙ্গা ও গাঙ্গেয় উপত্যকার উৎপত্তি

ভূতাত্ত্বিকেরা জানেন, অতি প্রাচীন কালের পৃথিবীতে হিমালয় পর্বত সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠেছে। প্রায় ২০ (কুড়ি) কোটি বছর ধরে দক্ষিণের গণ্ডোয়ানা শিলাস্তূপ আর উত্তরের লরেশিয়া শিলাস্তূপ পৃথিবীর বিষুববৃত্তের দিকে চাপছে, তারই ফলে একদিন সমুদ্রগর্ভ থেকে হিমালয় পর্বতশ্রেণির কোঁকড়ানো বা কোঁচানো (folded) শিলা উঠেছে এবং আজও নড়ছে চড়ছে।

অনেকের মত এই যে, হিমালয় পর্বতের অভ্যুত্থানের বহুযুগ পর্যন্ত গঙ্গানদী হরিদ্বারের পথে 'আর্যাবর্তে' নামেনি। যুগ যুগ ধরে সময় লেগেছিল হিমালয়ের শৃঙ্গে বরফ জমে ওঠার, আর তার পরে ক্রমশ একদিন সে-তুষার গলতে আরম্ভ করেছিল। হিমালয়ের শৃঙ্গে এই সব ঘটনার পূর্বেও দক্ষিণের বিন্ধ্য পর্বতাঞ্চল থেকে অনেক নদী 'আর্যাবর্তে'র সমুদ্রে নামত। এখনও সেই সব নদীর উত্তর-পুরুষেরা 'আর্যাবর্তে'র দিকে নেমে এসে গঙ্গার সঙ্গে মিশছে।

পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন, এই অতি প্রাচীন আর্যাবর্তের (অর্থাৎ বর্তমান উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ), বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ প্রধানত বিন্ধ্য পর্বত ও ছোটনাগপুরের পার্বত্য উপত্যকায় উৎপন্ন প্রাচীন নদ-নদীগুলির পলি দিয়ে তৈরি হয়েছিল। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে আম্বালা, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, চন্দননগর, কলকাতা ও ক্যানিং-এ ১৩০০ ফুট গভীর পর্যন্ত নল বসিয়ে (boring) দেখা গিয়েছিল যে, উপরের স্তরের নীলাভ বালি ও পলিমাটির নিচে (যে মাটি হিমালয় পর্বত থেকে গঙ্গা, যমুনা, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কুশী প্রভৃতি নদী দিয়ে বাহিত হয়ে এসেছে) একটি হরিদ্রাভ লালচে বালি ও মাটির স্তর রয়েছে। এই শেষোক্ত বালি ও মাটির জন্মস্থান মধ্যভারত ও ছোটনাগপুরের পার্বত্য উপত্যকা। সেখান থেকেই প্রাচীন যুগের নদ-নদী এই হরিদ্রাভ লাল বালি ও মাটি পূর্বে গাঙ্গেয় উপত্যকার নিচের স্তরটি সৃষ্টি করেছে। কলকাতার দক্ষিণে কাউখালিতে, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে নল বসিয়ে দেখা গিয়েছিল, বর্তমান ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৬০ ফুট নিচেই এই হরিদ্রাভ লাল বালি ও মাটি রয়েছে। নদিয়া জেলার কুষ্ঠিয়ার কাছে, মালদহ জেলায়, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলায় কোনো কোনো স্থানে এই মাটি ভূপৃষ্ঠেই দেখতে পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গে এইরূপ ভূপৃষ্ঠের নাম 'বারিন্দ্' মাটি, এই বারিন্দ্ মাটি থেকেই 'বারেন্দ্র' নামটির উদ্ভব হয়েছে। পূর্ববঙ্গে মৈমনসিংহ জেলায় মধুপুরের বনাঞ্চলে যে লাল শক্ত মাটি দেখা যায়, সে মাটির জন্ম পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চল থেকে।

ভূতাত্ত্বিকদের উক্ত গবেষণা থেকে অনেকে মনে করতে পারেন, কৈলাসের মহাদেবের জটাজটে আশ্রিতা স্বর্গের মন্দাকিনী ভগীরথের আরাধনায় যে মর্ত্যে গঙ্গারূপে অবতীর্ণা—এই পৌরাণিক কাহিনীতে ঐতিহাসিক ও পৌর্তিক তথ্যেরই প্রকাশ। যমুনা, ঘর্ঘরা, কুশী প্রভৃতি হিমালয়জাত নদীর জলের আর্যাবর্তে একটি খাত ছিল, যে খাতে বিন্ধ্য ও ছোটনাগপুরের নদীর জলও এসে মিশত। সেই সময়ে বর্তমান হরিদ্বারের পথে যে গঙ্গা নেমেছে, হয়তো, সে গঙ্গা স্রোতস্বিনীর অস্তিত্ব ছিল না—ভগীরথের পৌর্তিক কাজ গঙ্গাকে বর্তমান রূপ দিয়েছে, এরূপ অনুমান খুব যুক্তিহীন নয়। কিন্তু মাত্র কয়েকস্থানে মাত্র ১৩০০ ফুট পর্যন্ত গভীর নল পুঁতে বালিমাটি সংগ্রহ করে শুধু সেই নিদর্শনগুলির উপর গবেষণা চালিয়ে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণার প্রশ্রয় দেওয়া সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসম্মত নয়। ভবিষ্যতের গবেষণাই এ সম্বন্ধে আরও তথ্য উদঘাটন করে প্রকৃত সত্য নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে অতি গভীর নলকূপ বসানোর প্রস্তাব উঠেছে,—পেট্রোলিয়ামের সন্ধানে। আশা করা যায় এই সূত্রে নিশ্চয়ই অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে।

তবে, পৃথিবীতে বড়ো বড়ো নদীর আবির্ভাব ও খাত পরিবর্তনের ইতিহাসের অভাব নেই। যে ব্রহ্মপুত্র নদকে আজ আমরা আসামে ও পূর্ববঙ্গে এক সুবিশাল প্রবাহরূপে দেখতে অভ্যস্ত, সেই ব্রহ্মপুত্র তার বর্তমান উৎস তিব্বতে শান্-পো নদের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। ভূতাত্ত্বিক ও ভূগোলতাত্ত্বিক যুক্তি দিয়ে পণ্ডিতেরা এই রকম সিদ্ধান্ত করেছেন। তখন ব্রহ্মপুত্র অনুপাতে ক্ষীণতোয়া নদীই ছিল, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে (ভূমিকম্পে?) শান্পোর প্রবাহ গতির পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, আর একদিন সে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে গিরিখাতের পথে এসে ব্রহ্মপুত্রের খাতে নেমেছে। ঐতিহাসিক ও আধুনিককালে উত্তরবঙ্গের তিস্তা, মহানন্দা, আত্রেয়ী প্রভৃতি নদীর প্রবাহখাত পরিবর্তিত হয়েছে। এমনকি, যে কুশী

নদী আজ হিমালয় থেকে নির্গত হয়ে উত্তর বিহারে লম্বভাবে এসে গঙ্গার সঙ্গে মিশছে কুর্শেলার কাছে, সেই কুশী নদীই প্রধানত পূর্ববাহিনী নদী ছিল, আর তার গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গম ছিল, পূর্ববঙ্গে পাবনা জেলার কাছাকাছি। উত্তর বিহার ও উত্তরবঙ্গের ভূভাগ এই সব নদ-নদীর জলে বাহিত পলি দিয়ে তৈরি হয়েছে। উত্তরবঙ্গে ঐতিহাসিক যুগে গঙ্গা-পদ্মাও খাত পরিবর্তন করেছে। কুশী, মহানন্দা, গঙ্গা প্রভৃতির খাত পরিবর্তনের ফলেই মালদহ জেলার ঐতিহাসিক গৌড় অঞ্চল আজ জলাভূমিতে পরিণত।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে গঙ্গা নদী ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হয়েছে রামায়ণে বর্ণিত রাজা ভগীরথের চেষ্টায়; সম্পূর্ণ অমূলক নাও হতে পারে এ কাহিনি। কাহিনিটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। গঙ্গার খাতের নাব্যতার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে হরিদ্বারের কাছে ভগীরথের পৌর্তিক কাজ থাকা অসম্ভব কিছু নয়। আজও হিমালয় অঞ্চলে গাড়োয়াল প্রদেশে গঙ্গার একটি প্রবাহের নাম ভাগীরথী। দেশ বিদেশে অভিযানের জন্যে নদীর নাব্যপথের প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন কালের ভারতবর্ষীয় রাজারা খুবই অনুভব করেছিলেন। শুধু হস্তী, অশ্ব, রথের সাহায্যে স্থলপথের ব্যবহার করেই তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকেননি। পরবর্তী যুগে জলপথ ও সমুদ্রপথ সৃষ্টির কাহিনিই ভগীরথের কপিল মুনির 'আশ্রমে' গঙ্গাজল আনয়নের ইতিহাসই সূচিত করে, আর অগস্ত্যের সমুদ্র-শাসন যে সমুদ্র যাত্রারই কথা, তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অগস্ত্য ঋষির স্মৃতির প্রাদুর্ভাব দেখলেই বোঝা যায়।

যাই হোক, গঙ্গা আর্যাবর্তে স্বয়ং অবতীর্ণা হয়েই থাকুন অথবা 'স্বর্গ' থেকে তাঁকে নামানো আর্যাবর্তের কীর্তিমান প্রাচীন অধিবাসীদের কৃতিত্বই হোক, এ কথা অবিসংবাদিত বৈজ্ঞানিক সত্য যে, বর্তমান গাঙ্গেয় উপত্যকা গঙ্গা ও তার উপশাখা বাহিত পলিমাটি দিয়ে গঠিত হয়েছে। এই গঙ্গার উপরই গাঙ্গেয় উপত্যকার মানুষের সমস্ত কল্যাণ যুগ যুগ ধরে নির্ভর করে এসেছে। এখানেই একটি প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে যার অবদান মহামূল্য বলেই গণিত হচ্ছে। গঙ্গা নদীর গুরুত্ব ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী এত বেশি অনুভব করে ছিলেন যে, সমস্ত নদীটিকে একটি পুণ্যপ্রবাহ বলে চিহ্নিত করে মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছিল। আজও ভারতীয় হিন্দুদের মনে গঙ্গা-মাহাত্ম্যের প্রভাব একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। আজও ধর্ম, কাব্য, সাহিত্য, দার্শনিক ও রাজনীতিক সজীব চিন্তাধারা গাঙ্গেয় উপত্যকায়, গঙ্গার জলের স্রোতের মতোই নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বইছে।

আর বাংলা দেশে,—'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমিতে' (টলেমি ও মেগাস্থিনিস ঐতিহাসিক সুপ্রাচীন যুগে বর্তমান খুলনা জেলার গঙ্গারিডি—Gangeridae-রাজ্যের উল্লেখ করেছেন।) —এখানকার অধিবাসীর সমস্ত ভালোমন্দ যে গঙ্গা-পদ্মা ধারাকে মেরুদণ্ডরূপে অবলম্বন করে রয়েছে, সুধী ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদগণ সকলেই এ কথা সমর্থন করবেন।

### বাংলা দেশের নদ-নদীর শ্রেণিবিভাগ

গঙ্গা-পদ্মাকে মেরুদণ্ড করে যে সব নদ-নদী বাংলা দেশে প্রবাহিত, বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের নানা শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

ভূগোলের ছাত্রেরা এইসব নদ-নদীকে প্রধানত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেই নিশ্চিন্ত থাকেন ঃ (১) উপনদী ও (২) শাখানদী। এই হিসাবে উত্তরবঙ্গের সমস্ত নদীই (এমনকী ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত) গঙ্গা-পদ্মার উপনদী। মানচিত্রে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পর পর সাজানো হিমালয়জাত এইসব প্রধান উপনদীর নাম—মহানন্দা-পুনর্ভবা, আত্রাই, যমুনা-নাগর সংযুক্ত হয়ে বরাল নদী, এবং করতোয়া। মহানন্দা-পুনর্ভবা ছাড়া অপর নদী কয়টি ব্রহ্মপুত্র নদে পড়ে গঙ্গাপ্রবাহে মিলিত হয়েছে। তেমনি দার্জিলিং-জলপাইগুড়ির খ্যাতনামা নদী তিস্তা বা ত্রিস্রোতাও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র তার বিশালতার জন্যে স্বতন্ত্র নদ হিসেবেই পরিচিত—কিন্তু তাকে গঙ্গা-পদ্মার উপনদীরূপে গণ্য করতেও দোষ নেই। ব্রহ্মপুত্র বর্তমানে যে খাতে প্রবাহিত হচ্ছে, তার স্থানীয় নাম যমুনা। এই যমুনা পূর্বোল্লিখিত দিনাজপুর জেলায় প্রবাহিত আত্রাই-এর সহযোগী যমুনা থেকে পৃথক নদী। ঢাকা জেলায় ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত লক্ষ্যা বা শীতলক্ষ্যা নামে পরিচিত। মেঘনা ও গোমতী নদী পূর্বাঞ্চলের পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে পদ্মায় মিশেছে। পূর্বাঞ্চলের পাহাড় থেকে আরও কয়েকটি ছোটো ছোটো উপনদী একেবারে পদ্মার মোহানার কাছে এসে মিশছে। শুধু চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদী সরাসরি সমুদ্রে পড়েছে।

উত্তর ও পূর্ববঙ্গে গঙ্গা-পদ্মার এইসব প্রধান উপনদীগুলির নিজেদেরও উপনদী আছে। তা ছাড়া তাদের শাখা-প্রশাখা আছে। এইসব শাখা-প্রশাখার বিভিন্ন স্থানীয় নামও প্রচলিত।

পশ্চিমবঙ্গের উপনদীগুলি গঙ্গার শাখা ভাগীরথী-হুগলি নদীতে মিশেছে; এদের উৎস ছোটনাগপুর-সাঁওতাল পরগনার পার্বত্য উপত্যকায়। উত্তর থেকে দক্ষিণে পর পর সাজানো এই নদীগুলির নাম যথাক্রমে, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ ও কাঁসাই। সুবর্ণরেখা নদী পশ্চিমবঙ্গে অংশত প্রবাহিত। এটি পূর্ববঙ্গের কর্ণফুলীর মতো, সরাসরি বঙ্গোপসাগরে পড়েছে উড়িষ্যার উপকূলে।

পশ্চিমবঙ্গের এই প্রধান উপনদীগুলিরও উপশাখা ও বহু শাখা-প্রশাখা আছে। স্থানীয় গুরুত্বের জন্যে, আমাদের আলোচনায় তাদের নামের উল্লেখ করতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে এবং দেশের সাধারণ মানুষের কাছে, আজ এই সমস্ত গঙ্গা-পদ্মার উপনদীগুলির সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ের আবশ্যক এইজন্যে যে, এরাই প্রধানত বর্ষাকালে কয়েকদিন প্রচুর জল বহন করে, যদিও বছরের অন্যান্য সময়ে এরা প্রায় শুষ্ক অথবা অত্যন্ত ক্ষীণতোয়া। হিমালয়ে উদ্ভূত নদীগুলি গলিত তুষারের জল পায় বলে, আর ভূগর্ভস্থ জলের সাহায্যে, তবু কিছুটা প্রবাহিত থাকে সারা বছরই। কিন্তু ছোটনাগপুরের পার্বত্য উপত্যকায় জাত নদীগুলির কোনোটি উপরাংশে কখনও কখনও প্রায় সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়, বর্ষাকাল ছাড়া। উত্তরবঙ্গের তিস্তা, মহানন্দা, আত্রেয়ী প্রভৃতি নদীর ভয়াবহ বন্যার কথা সর্বজনবিদিত। আর পশ্চিমবঙ্গের দামোদরের বন্যার কথা কে না শুনেছে? এইসব সাময়িক বন্যাকুপিত নদীই নিয়ন্ত্রিত করে নদী উপত্যকা পরিকল্পনায় কল্যাণমূলক কাজের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এদের গুরুত্ব।

গঙ্গা-পদ্মার শাখানদীগুলি সকলেই গঙ্গার ব-দ্বীপে প্রবাহিত। এদের মধ্যে প্রধান শাখা সরাসরি বঙ্গোপসাগরে পড়েছে, এরই নাম ভাগীরথী-হুগলি এবং এরই ধারে কলকাতা বন্দর ও শহর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাগীরথী-হুগলিকেই অবলম্বন করে বাংলা দেশের ঐতিহ্য

গড়ে উঠেছে। প্রাচীন গৌড় এই ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত ছিল, গঙ্গা-পদ্মার খাত পরিবর্তনে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ আজ মালদহ জেলায় পড়েছে। মহাভারতের যুগেও এই ভাগীরথীর উল্লেখ আছে। মুসলমান আমলের মুর্শিদাবাদ শহর, সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী ভাগীরথী তীরেই অবস্থিত। ইউরোপীয় বণিকেরা হুগলি, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, কলকাতা প্রভৃতি ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপন করেছিল এই ভাগীরথী-হুগলির কূলেই। আজ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চল এই ভাগীরথী হুগলির তীরেই প্রধানত কেন্দ্রীভূত।

গঙ্গা-পদ্মার অপর শাখাগুলি গঙ্গার ব-দ্বীপে যেন একটি মাকড়সার জাল সৃষ্টি করেছে প্রশাখায় পরস্পরকে অবলম্বন করে তাদের বঙ্গোপসাগরের পথযাত্রায়। এদের মধ্যে ভৈরব-জলঙ্গী এবং মাথাভাঙা-চূর্ণী ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। তা ছাড়া মাথাভাঙার প্রধান প্রবাহ ইছামতী নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরে নেমেছে। মধ্যবঙ্গের আর-একটি প্রধান নদীর নাম ভৈরব। গঙ্গা-পদ্মা থেকে নির্গত গড়াই, কুমার, বারাসিয়া, নবগঙ্গা, মধুমতী প্রভৃতি বহু নদী পূর্ববঙ্গে প্রবাহিত।

গঙ্গার এই শাখা নদীগুলির প্রধান সমস্যা, নিম্নতর অঞ্চলে, গঙ্গার ব-দ্বীপে আজও যেখানে নিত্য নতুন ভূভাগ গঠনের কাজ চলেছে (active delta), সেখানে তাদের মজে যাওয়ার প্রবণতা এবং তার ফলে আঞ্চলিক দীর্ঘস্থায়ী জলাভূমির সৃষ্টি। প্রধানত সমুদ্রের জোয়ারের প্রতিকূল গতি এই নদীগুলিতে 'জলের বাঁধ' সৃষ্টি করে নিম্নাভিমুখী প্রবাহের বাধা সৃষ্টি করে। ফলে, প্রবাহে বাহিত পলি নদীর গর্ভমধ্যে পতিত হয়, উৎসের কাছে চর সৃষ্টি করে মূল নদী থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে আর শেষ পর্যন্ত নদীগুলি 'মজে' যায়। নদী মজে যাওয়ার ফলে আবার তাদের জল নিষ্কাশনের শক্তি হ্রাস পায়। কাজেই পাশের ভূমির বৃষ্টির জল আর তাদের খাত দিয়ে সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত হতে পারে না। পাড়েও পলি পাতিত হয়ে (বিশেষত..বর্ষার বন্যায়) স্বাভাবিক সমান্তরাল বাঁধ সৃষ্টি হয় (levee), তারাও জমির জল নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাং আঞ্চলিক দীর্ঘস্থায়ী জলাভূমির আবির্ভাব হয়। মানুষের স্বার্থে ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে এই শ্রেণির নদীর প্রধান সমস্যা তাদের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করা আর জলাভূমি থেকে নতুন জমি উঠিত করানো। কিন্তু সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার জন্যে, নিম্নাংশে এই নদীগুলি নাব্য।

## নদ-নদীর অন্যান্য শ্রেণিবিভাগ

নাব্যতার মাপকাঠিতেও বাংলা দেশের নদীর শ্রেণিবিভাগ করা যায়। হুগলি নদী কলকাতা বন্দর পর্যন্ত ১০/১২ হাজার টন সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষেও নাব্য। ভাগীরথী বড়ো বড়ো হাজার-মণি নৌকার পক্ষে নবদ্বীপ পর্যন্ত নাব্য। পূর্বে (অর্থাৎ ৩০/৪০ বৎসর আগে) ভাগীরথী পথে গঙ্গা দিয়ে ভাগলপুর, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর পর্যন্ত কলকাতা থেকে নৌকাপথেই এবং স্টিমারে যাওয়া যেত। আজকাল তা আর সম্ভব নয় বর্ষার মাসখানেক সময় ছাড়া। কারণ, ভাগীরথীতে গঙ্গার উৎপত্তিস্থানের নিকটে উঁচু চরের সৃষ্টি হয়েছে, গঙ্গার সঙ্গে ভাগীরথীর বর্ষার একমাস ছাড়া সংযোগ নেই বললেই হয়।

৫০ বছর আগে পদ্মা-গঙ্গা উত্তর প্রদেশের কানপুর পর্যন্ত সহজ নাব্য ছিল—এর অনেকখানি পর্যন্ত বড়ো বড়ো মালবাহী ও যাত্রীবাহী স্টিমার যায়। গঙ্গার ব-দ্বীপের নিম্নাংশে অধিকাংশ নদীই নাব্য। ব্রহ্মপুত্র নদ উচ্চ আসামের ডিব্রুগড় পর্যন্ত নাব্য।

কিন্তু উত্তরবঙ্গের তিস্তা, মহানন্দা প্রভৃতি নদী বছরের সকল সময়ে নাব্য নয়, এবং তারা সকল অংশেও নাব্য নয়। পূর্বে পদ্মা-গঙ্গার স্টিমার মহানন্দাপথে মালদহ (ইংরেজ বাজার) পর্যন্ত যেত। বিলাতি স্টিমার কোম্পানির স্বার্থে মালদহের রেলপথ তাই শহর থেকে বহুদূরে নদীর অপর পারে পত্তন করা হয়েছিল। আজ কিন্তু মহানন্দার নাব্যতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের নদীও নিম্নাংশে মাত্র নাব্য। হিমালয়ের পর্বতে তিস্তা, মহানন্দা প্রভৃতি যে সকল নদীর উৎপত্তি, গলিত তুষারের জলের আর তরাই-এর বনভূমির ভূগর্ভস্থ সঞ্চিত জলের সরবরাহে তাদের নাব্য অংশে সম্বৎসরই কিছু জল থাকে। কিন্তু দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই-হলদি প্রভৃতি নদী, ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে যাদের উৎস, মাত্র জোয়ার-ভাটা খেলার অংশেই সম্বৎসরব্যাপী নাব্য। বর্ষাকালে উপর অংশের কিছুটা নাব্যতা পায়। সে সময়ে বৃষ্টির জল তাদের প্রবাহে জল সরবরাহের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

নদীর জলের গভীরতার উপরেই তার নাব্যতা নির্ভর করে। ছোটো বড়ো হিসাবে নৌকা এক থেকে ছয় ফুট গভীর জলে চলে। স্টিমার-লঞ্চ প্রভৃতি ছয় ফুট থেকে বারো ফুট গভীর জল চায়। সমুদ্রগামী জাহাজগুলির জন্যে অন্তত ২০/৩০ ফুট গভীরতা চাই।

হিমালয়ের গলিত তুষার সম্বৎসরই কিছু কিছু জল সরবরাহ করে বলে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী সারা বছরই নাব্য। বর্ষাকালে পার্বত্য ও সমভূমির বিশাল অববাহিকার জল এদের গভীরতা বৃদ্ধি করে। পাটনার পশ্চিমে গঙ্গার অববাহিকার আয়তন প্রায় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার বর্গমাইল। সুতরাং এই সুবিশাল অববাহিকার জলের সাহায্যে গঙ্গা যে সারা বছরই বহুদূর পর্যন্ত নাব্য থাকবে তা বোঝা যায়। (কিন্তু গঙ্গার সেচ পরিকল্পনার জন্যে গঙ্গার নাব্যতা গত ৫০ বছরে অনেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে)। তেমনি ব্রহ্মপুত্র ডিব্রুগড় পর্যন্ত তিব্বত অববাহিকার জলে পুষ্ট বলে সহজনাব্য। ছোটনাগপুরে এবং চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও আসামের পাহাড়ে উৎপন্ন নদীগুলি প্রধানত বর্ষাকালে বৃষ্টির জলের দ্বারাই পূর্ণ হয়। তাদের অববাহিকাও আয়তনে অনেক ছোটো। অপরসময়ে, বর্ষার যে জল এই স্বল্পায়তন অববাহিকার ভূগর্ভে প্রবেশ করে, সেই জলের কিয়দংশ ওই সব নদীপথে নামে। ব-দ্বীপের নিম্নাংশের নদীগুলি সমুদ্রের জোয়ারের জলেই সর্বদা সজীব—কাজেই নাব্যতার হিসাবে এরাই শ্রেষ্ঠ। বিশেষত জোয়ার ও ভাটা বিপরীতগামী প্রবাহ সৃষ্টি করে একটা সুবিধা দেয় এই যে, কোনো কৃত্রিমশক্তি ব্যবহার না করেই নৌকা প্রভৃতি জলযান দুই দিকেই যাতায়াত করতে পারে জোয়ার ও ভাটার বিভিন্ন সময়ে। তাই এই শেষোক্ত নদীগুলিতে যাতায়াত সহজ এবং সুলভ।

## সেচের কাজে নদ-নদীর জল ব্যবহার

নদীবহুল ও বৃষ্টিবহুল বাংলা দেশে সেচের জন্যে ব্যবহারের চেয়ে নদীর নাব্যতাই ইঞ্জিনিয়ার ও অর্থনীতিকদের মনোযোগ বেশি আকৃষ্ট করা উচিত। যে সব দেশে বৃষ্টি কম হয়, (যেমন পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ) অথচ গলিত তুষারের জলে নদী পুষ্ট থাকে, সেখানে নদীর জল কৃষিকার্যে সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজন মেটায়। বৃষ্টিবিরল মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের উচ্চভূমিতেও নদীর জলে সেচ-ব্যবস্থা সমীচীন। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতর মালভূমিতে আদিম অধিবাসীরা ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, কাঁসাই প্রভৃতি নদীগুলির জল নদীর পার্শ্ববর্তী

অল্প জমিতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সেচের প্রয়োজনে ব্যবহার করে এসেছে প্রধানত রবিশস্যের চাষে। দামোদরের বন্যার সময়ে প্রচুর পলি বাহিত হয়ে আসে, এই পলি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে খুবই শক্তিশালী সার। দামোদরের বন্যার মারফত ধানের চাষে এই পলির ব্যবহার করতে নিম্ন-দামোদর এলাকার মানুষেরা অভ্যস্ত ছিল বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে। কিন্তু বাংলা দেশের উচ্চতর মালভূমি এলাকাতেও বিকল্প সেচ-ব্যবস্থা আধুনিক যুগে খুবই সহজ পন্থায় করা যায়। সুতরাং সেচের জন্যে নদীর জল ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই বাংলা দেশে। এ কথাটা যত শীঘ্র ও ভালোভাবে বাংলা দেশের ইঞ্জিনিয়ারেরা হৃদয়ঙ্গম করবেন, ততই মঙ্গল হবে।

## বাংলা দেশের নদ-নদীর বৈজ্ঞানিক শ্রেণিবিভাগ

সাম্প্রতিক কালের নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার পটভূমিতে, বাংলা দেশের নদীগুলির বৈজ্ঞানিক শ্রেণিবিভাগের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নদীর জলশক্তির যে অংশকে কার্যত বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করা যায় ও নদীকে বহুমুখী কল্যাণ কার্যে নিয়োগের উপযোগী করবার জন্যে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তারই উপর নির্ভর করে এই শ্রেণিবিভাগ। ব্যবহারোপযোগিতার মাপকাঠিতে দামোদর, কাঁসাই, মহানন্দা, তিস্তা, কর্ণফুলী, মেঘনা, বরাক প্রভৃতি নদী যদিও গঙ্গা অথবা পূর্ববঙ্গে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রের মতো বিপুল জলধারা বহন করে না, তথাপি ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিকের কাছে তাদের গুরুত্ব ঢের বেশি। কারণ তাদের অবস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমরা অতি সহজে তাদের প্রবাহের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জল-বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি, তাদের নাব্যতা নিয়ন্ত্রিত করে স্থায়ী জলপথের সৃষ্টি করতে পারি, প্রয়োজন হলে তাদের জল অংশত সেচের কাজেও ব্যবহার করতে পারি।

সারার পুলের কাছে গঙ্গা-পদ্মার সর্বোচ্চ বন্যা মেপে দেখা গিয়েছে, সেখানে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২৫ লক্ষ ঘনফুট জল (২৫ লক্ষ কিউসেক জল) প্রবাহিত হয়। আর দামোদরে অ্যাণ্ডারসন বাঁধে (Weir—হেবর্) রণ্ডিয়ার কাছে সর্বোচ্চ বন্যায় মাত্র প্রতি সেকেণ্ডে ৬$\frac{১}{২}$ লক্ষ ঘনফুট জল প্রবাহিত হয় (৬$\frac{১}{২}$ লক্ষ কিউসেক)। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিকের কাছে পদ্মার চেয়ে দামোদরের মূল্য বেশি, কারণ পদ্মার বিপুল জলশক্তিকে সারাপুলের কাছে অথবা বাংলা দেশের কোনো অংশে জল-বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করবার সহজ এবং বাস্তব উপায় জানা নেই।

## যুগে যুগে বাংলা দেশের নদীর খাত পরিবর্তন

পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি, বাংলার নদীগুলির খাত ও প্রবাহ চিরকাল একই ভাবে থাকে নি—নানারূপে পরিবর্তিত হয়েছে। নদীর একটা প্রধান কাজ ভূভাগের নৈসর্গিক পরিবর্তনে সহায়তা করা, পার্বত্য ও পুরাতন উচ্চ পলিপড়া ভূভাগের ক্ষয় সাধন করে বৃষ্টির জল নদীতে এনে দেয় আর নদীপ্রবাহের সঙ্গে সেই মৃত্তিকা বহন করে এনে আবার নতুন জায়গায় নতুন ভূভাগ সৃষ্টি করে। কোথাও গর্ভের চর ও পাড় ভেঙে নদী মৃত্তিকা টেনে নিয়ে নতুন চর সৃষ্টি করে, অথবা মোহানার কাছে নতুন ভূমি গঠিত করে। গঙ্গা-পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মতো বড়ো বড়ো নদ-নদীতে কয়েক বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা

যায়, কোথাও পাড় ও চর ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে, আবার নতুন চর সৃষ্টি করছে অপর স্থানে। নিম্ন ব-দ্বীপ অঞ্চলের নদীগুলি সাধারণত নিম্নভূমিগুলিকে ক্রমশ উঁচু হতে সাহায্য করছে। সেখানে মানুষ বাঁধ বা ভেড়ি বেঁধে এই কাজ ব্যাহত করেছে, সেখানে নদী নিজের মোহানার কাছে নিজের গর্ভই পূর্ণ করে অন্য সমস্যার সৃষ্টি করেছে, নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। আর আজ যে অঞ্চল নদীর মোহানায় সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত, হাজার হাজার বছরে সেই অঞ্চল এই প্রক্রিয়ায় ক্রমশ নতুন ভূভাগে পরিণত হতে পারে।

পুরাতন খাতের গর্ভে পলি জমা হয়ে উঁচু হয়ে প্রবাহপথে বাধা সৃষ্টি করলে, নদী নতুন খাতে বইতে পারে; আমরা বাংলা দেশের নদীগুলির যুগে যুগে খাত পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করছি এই পরিচ্ছেদে। বহু ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিত, সুধী ঐতিহাসিক ও ইঞ্জিনিয়ার ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা ও আলোচনা করেছেন। তাঁদের গবেষণা ও আলোচনা বহু গ্রন্থে, সমিতির বিবরণী ও সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সহজেই এইসব তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

### গঙ্গা-পদ্মার খাত পরিবর্তন

স্পষ্ট কারণেই প্রথমে গঙ্গা-পদ্মা নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। পূর্বোক্ত তথ্যগুলি পাঠ করে দেখা যায়—গঙ্গা নদী হরিদ্বার থেকে রাজমহল পর্যন্ত তার খাতে বহু শতাব্দী ধরে প্রায় একই ভাবে রয়েছে। এই খাত কোনো কোনো স্থলে ১০/১২ মাইল প্রশস্ত। উত্তর-পশ্চিম রাজ্যে ও বিহারে এই প্রশস্ত খাতের স্থানীয় নাম 'খাদির'। খাদিরের মধ্যে গঙ্গা অবশ্য অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণতর খাত বা প্রণালী অবলম্বন করে প্রবাহিত হয়। কোনো কোনো স্থানে 'দিয়াড়া'র দ্বীপ পরিবেষ্টন করে দুইটি খাতেও গঙ্গা প্রবাহিত হয় মূল খাদিরের মধ্যে। তবে, সাধারণত দেখা যায় একটি খাত সমধিক গভীরতর এবং বহু বর্ষ ধরে এই গভীরতর খাতে প্রবাহিত হবার পরে গঙ্গাপ্রবাহ সেটিকে পরিত্যাগ করে এবং অপর খাতে চলতে শুরু করে। ভাগলপুরের কাছে প্রতি ২০/২৫ বছর অন্তর (যে পর্যন্ত সংবাদ ও তথ্য সংগৃহীত হয়েছে) গঙ্গা এই রকম দুইটি খাত অবলম্বন করছে তার প্রশস্ত খাদিরের মধ্যে। বর্তমানে ভাগলপুর শহরের পার্শ্ববর্তী খাতটিতে শুধু বর্ষাকালেই গঙ্গাজল প্রবেশ করে, প্রধানত দিয়াড়ার ও-পারের খাতেই গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে এখানে। আমার অনুমান, ভাগলপুরের উত্তর-পূর্বে কুর্শেলার কাছে হিমালয়-নির্গত কুশীর মূল প্রবাহ এসে গঙ্গায় মিশেছে। বিভিন্ন বর্ষে বন্যা কুশীর বিভিন্ন খাতে তার বন্যাপ্রবাহ শক্তি দিয়ে গঙ্গাপ্রবাহে ধাক্কা দেয়, এই সংঘাতের তারতম্যের ফলেই, ভাগলপুরের কাছে গঙ্গার দুইটি খাতে পর পর পরিবর্তিত প্রবাহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে প্রায় প্রতি বিশ বছর অন্তর হিমালয়ের সানুদেশে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয় এবং কুশীতে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

রাজমহলের নিচে গঙ্গা বাংলা দেশে প্রবেশ করে ঐতিহাসিক কালে তার মূলখাত পরিবর্তন করেছে। অর্থাৎ নতুন 'খাদিরে' বইছে। অনেকের মত, বাংলা দেশে প্রবেশ করে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ অথবা একমাত্র প্রবাহ প্রথমে ভাগীরথীর খাতেই ছিল। বিখ্যাত সেচ-ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম উইল্‌কক্‌স (Wilcox) সাহেব বলেন, ভাগীরথী গঙ্গা-পদ্মা থেকে কেটে আনা খাল ছাড়া আর কিছু নয়। গঙ্গার ব-দ্বীপের ভৈরব, জলঙ্গী, মাথাভাঙা

প্রভৃতি মধ্যবঙ্গের সমস্ত নদীগুলিকেই তিনি সেচের কাজের জন্যে কাটা খাল ছাড়া আর কিছুই নয় বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। বৃষ্টিবহুল বাংলা দেশে এরকম সেচ-ব্যবস্থার জন্যে খাল কাটার প্রয়োজন কেন হল, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি overflow irrigation অর্থাৎ 'উপচানো সেচ-ব্যবস্থা' কথাটি আমদানি করেছেন। মহাভারতে বর্ণিত ভগীরথ-গঙ্গা-পদ্মাবতীর পৌরাণিক কাহিনীটির তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ভগীরথকে সেচ-বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররূপে ধরে নিয়ে ভাগীরথীর খাল কাটার ইতিহাস হিসেবে।

বাংলা দেশের মানুষের মনের সংস্কার কিন্তু ভাগীরথীকেই গঙ্গার প্রধান প্রবাহখাত বলেই মনে করে। হিন্দু সভ্যতায় গঙ্গা মাহাত্ম্যের প্রচারণা এই ভাগীরথীকেই গঙ্গা বলে প্রচার করেছে। উইল্‌কক্‌স সাহেবের পরবর্তী বহু ঐতিহাসিকও ইঞ্জিনিয়াররাও ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের পর বলতে চেয়েছেন, ভাগীরথীই গঙ্গার প্রথম মুখ্যখাত।

কিন্তু ভূতাত্ত্বিকদের গবেষণা ভাগীরথীই গঙ্গার প্রধান খাত হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ আনে। তাঁরা বলেন ভাগীরথী-হুগলির নিম্নাংশ প্রথম থেকেই সমুদ্রের খাঁড়ি ছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও বিহারের গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক গাঙ্গেয় পলিস্তরের নিচে যে হরিদ্রাভ লাল কংকর প্রস্তর মিশ্রিত মৃত্তিকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয়, হিমালয় পর্বত থেকে আজকের এই বিপুলায়তন গঙ্গা সম্পূর্ণ অবতরণ করবার আগে এখানকার সাগরগর্ভ মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুরের পার্বত্য উপত্যকায় উৎপন্ন প্রাচীন বিশালায়তন নদীর জলধারায় বাহিত পলির দ্বারাই পূর্ণ হয়েছিল। দামোদর প্রভৃতি নদের প্রাচীন সংস্করণ নদ-নদীর পলি দিয়েই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভাগীরথী উপত্যকার ভূভাগের নিম্নতর স্তর গঠিত। সুতরাং গঙ্গা অবতীর্ণ হয়ে প্রথমেই বর্তমান পদ্মার প্রবাহপথে প্রবাহিত হত, অথবা ভাগীরথীর পথে প্রবাহিত হত, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে গেলে, সমস্ত গঙ্গা-পদ্মা ও ভাগীরথীর খাতে গভীর নল পুঁতে ওই হরিদ্রাভ লাল মাটির ঢাল (slope) সমীক্ষা করতে হবে।

ভগীরথের কাহিনিটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ধরে নিলে পদ্মাকেই গঙ্গার প্রধান খাত বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বাস্তবিক কাহিনিটির মধ্যে অলৌকিক কিছুই নেই, শুধু কাব্যসুলভ ভাষার আশ্রয়ে হিমালয় থেকে সাগর অবধি একটা পৌর্তিক ও ভৌগোলিক ঘটনার পূর্ণাবয়ব বর্ণনাই কাহিনিটির মধ্যে পাওয়া যায়। এর বিপক্ষে আধুনিক কালে যেসব 'ঐতিহাসিক' প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়েছে, বিশেষত, বাংলা দেশের লোকসাহিত্য থেকে, সেগুলির বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ সুদৃঢ় কোনো ভিত্তি নেই বলেই মনে হয়। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক যুগ মোটামুটি খ্রি. পূ. ৩০০ অব্দে মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে আরম্ভ হলেও রামায়ণ-মহাভারতকেও অনেকে ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ ধরেন। রামায়ণের যুগ খ্রি. পূ. ২/৩ হাজার বছর ধরা হয়। আর ভূতাত্ত্বিক যুগ লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে আরম্ভ হয়েছে। বস্তুত উইল্‌কক্‌স সাহেবের সেচ থিওরিরও কোনো প্রয়োজন নেই। সগর রাজার ষাট হাজার সন্তানের কপিল মুনির কোপে ভস্মীভূত হওয়ার এবং ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের বিবরণ মূল সংস্কৃত কাব্যে পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায়, কৈলাস পর্বত থেকে হরিদ্বারের পথে গঙ্গাবতরণ, জহ্নুমুনির আশ্রমে গঙ্গার অবরোধ ও মুক্তি এবং ভাগীরথীর খাতে গঙ্গার সাগর-সঙ্গম নদী উন্নয়নের পৌর্তিক কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। কৈলাসের গঙ্গোত্রীর হিমবাহের কথাই মহাদেবের জটাজুটে গঙ্গার

অবস্থিতির কথা, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু চমৎকার একটি প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন। গঙ্গার উৎস আবিষ্কার করে হরিদ্বারের কাছে গাড়োয়ালে কয়েকটি খাত ভগীরথের দ্বারা উন্নীত হয়েছিল। হয়তো, তার আগে গঙ্গার উৎসের গলিত তুষারের জল অপর খাতে মানস সরোবরের হ্রদের দিকে যেত। সেই খাত ঘুরিয়ে হরিদ্বারের পথে নতুন খাত সৃষ্টিই স্বর্গের মন্দাকিনীকে মর্তে আনয়নের ইতিহাস। বর্তমান সুলতানগঞ্জের কাছে জহ্নুমুনির আশ্রম বলে বর্ণিত গঙ্গাগর্ভে পাহাড়টি দেখলেও বেশ বোঝা যায়, এখানে গঙ্গা- খাতের উন্নয়নের জন্যে পৌর্তিক কাজের প্রয়োজন হয়েছিল। রামায়ণ-মহাভারতে কৃষি-কার্যের প্রয়োজনে বৃষ্টির জন্যে যজ্ঞাদির উল্লেখ আছে, কিন্তু সেচ-কার্যের জন্যে খালের উল্লেখ কোথাও নেই। বাস্তবিক নিম্ন-গাঙ্গেয় উপত্যকায় সে যুগে কৃষিকার্যের জন্যে খালের জল ব্যবহারের কোনো প্রয়োজনই অনুভূত হবার কথা নয়। আলি, বাঁধ প্রভৃতির উল্লেখ আছে আকাশের বৃষ্টির জল কৃষিভূমিতে ব্যবহার উপলক্ষ্যে। বরং সম্রাটগণের সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিগ্বিজয় যাত্রা, অগস্ত্যের বিন্ধ্যলঙ্ঘন ও সমুদ্র-শাসন প্রভৃতি কাহিনি আছে। যাতায়াতের সুগমতার সমস্যাই বোধ করি তাঁদের প্রধান সমস্যা ছিল। এইজন্যে গঙ্গা নদীর নাব্যতার উৎকর্ষ বিধানই ঈক্ষ্বাকু বংশের রাজাদের প্রধান কাজ বলে মনে হয়। ভগীরথ ভাগীরথী খালটি গঙ্গার ধারা থেকে কেটে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ছোটনাগপুর উপত্যকায় উৎপন্ন নদীর মজাখাতগুলি অবলম্বন করে সমুদ্রের খাঁড়ির সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন, সমুদ্র যাত্রাপথের দীর্ঘতা হ্রাস করবার জন্য। পূর্ববঙ্গের সমতটভূমি দুর্ধর্ষ অনার্যদের বাসভূমি ছিল, আর্য রাজারা ওই দেশ পরিহার করেই চলতেন। বর্তমান চব্বিশ পরগনা, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলা কপিলের রাজ্য ছিল, ভগীরথ তাঁকে সন্তুষ্ট করে তাঁর বন্ধুতার সাহায্যে পৌর্তিক কাজ শেষ করতে পেরেছিলেন। এত বড়ো পৌর্তিক কাজের যে মাহাত্ম্য কীর্তিত হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

বস্তুত পদ্মাকে গঙ্গার প্রধান খাত হিসাবে মেনে নিতে বৈজ্ঞানিক কোনো অসুবিধাই হয় না। ভগীরথের কাটাখাল ভাগীরথীর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বেড়েছিল, তার প্রাচীনতার জন্যে নয়। প্রাচীন বিন্ধ্য পর্বত অথবা সিন্ধু-শতদ্রু নদেরও এত বেশি পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য দেখা যায় না। আর্য পৌর্তিক কীর্তির প্রোপাগাণ্ডার গুণে গঙ্গা-ভাগীরথীর মাহাত্ম্য। এই প্রোপাগাণ্ডার জোরেই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, সে যুগের হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্র কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতির স্থান মাহাত্ম্যও বেড়েছে। পরবর্তী বৈষ্ণব যুগে বাংলা দেশে নবদ্বীপ তীর্থ হয়ে উঠেছে, তার প্রাচীনতার জন্যে নয়। সুতরাং ভাগীরথী হিন্দুর কাছে পবিত্র তীর্থ বলেই তার প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয় না, অথবা প্রাচীন খাত বলেই তাতে পবিত্রতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তাও নয়। ভগীরথের পৌর্তিক কীর্তির নিদর্শন হিসেবেই, ভাগীরথীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছিল। আজও বাংলা দেশের হিন্দুদের মনের সংস্কার ভাগীরথীর মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী, এঁদের সুধী ঐতিহাসিকও এ সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেন নি, এবং ভাগীরথীর প্রাধান্য প্রমাণ করবার জন্যে তাঁরা সকলে খুবই ব্যগ্র। কিন্তু পদ্মাকেই গঙ্গার প্রধান খাত বলে মেনে নিতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদীর কোনো অসুবিধা হয় না।

বাংলা দেশের গঙ্গার ব-দ্বীপের উচ্চাবচতা নিদর্শক মানচিত্র (Relief Map) দেখলে বোঝা যায়, গঙ্গা থেকে ভাগীরথীর উৎপত্তি স্থানটিই সর্বোচ্চ, এবং ভাগীরথী অপেক্ষাকৃত

উচ্চভূমি দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে, এর পূর্বদিকস্থ নিম্নাঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়নি। ভগবানগোলা থেকে সুন্দরবনের বিদ্যাধরী নদীর মোহানা পর্যন্ত যদি একটি সরল রেখা টানা যায়, তা হলে এই সরল রেখার পশ্চিমের ভূভাগ ক্রমশ পশ্চিম দিকে উঁচু হয়ে ছোটনাগপুরের মালভূমিতে মিশেছে। আর ওই সরল রেখা থেকে পূর্বে ভূভাগ ক্রমশ ঢালু হয়ে গিয়েছে মধ্যবঙেগ। ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি জেলা নিম্নতম ভূমিতে অধিষ্ঠিত, তারপরে ভূমি আবার পদ্মা-মেঘনার পূর্বপারে ক্রমশ উঁচু হয়ে ত্রিপুরা-চট্টগ্রামের পর্বতে উঠেছে। গঙগা পদ্মার স্বাভাবিক প্রবাহ যে নিম্নের দিকেই, বর্তমান খাতের কাছাকাছি পথ অবলম্বন করে গিয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ কী? ভাগীথীর প্রাচীনতর খাত যেখানে নির্দিষ্ট হয়, সেখান দিয়ে কাটাখাল ছাড়া স্বাভাবিক নদীর পথ সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। এ বিষয়ে আরও আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

কিন্তু পদ্মা তার খাত, বর্তমান খাতের কাছাকাছি দিয়ে যে বারবার পরিবর্তন করেছে, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলা দেশের উপর নদী-নালা এবং জলা, বিলের ছাপে। ইতিহাসেও অকাট্য প্রমাণ আছে, পদ্মার আধুনিক কালের খাত পরিবর্তনের। স্বাধীন বাংলার রাজধানী মালদহ জেলার গৌড় গঙগার পশ্চিম পারে প্রতিষ্ঠিত ছিল, খাত পরিবর্তনের ফলে অপর পারে চলে গিয়েছে। মালদহ জেলার কালিন্দী-মহানন্দাই গঙগার প্রাচীন প্রবাহ-পথ। ঢাকার কাছে ধলেশ্বরী-বুড়িগঙগার খাতে যে গঙগা-পদ্মার প্রধান ধারা কোনো কালে বইত, তাতেও সন্দেহের কারণ নেই। বিশেষত ব্রহ্মপুত্র বর্তমান যমুনার খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করার আগে পদ্মার ধলেশ্বরী-বুড়িগঙগার খাতে প্রবাহের কোনো ভৌগোলিক ও জলের গতিতাত্ত্বিক বাধা ছিল না। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিস্তা বা ত্রিস্রোতা নদী অকস্মাৎ তার পূর্বতন খাত পরিত্যাগ করে (যে খাতে নদীটি পদ্মায় এসে পড়ত) ব্রহ্মপুত্রের খাতে পড়তে শুরু করে এবং তার বিপুল বন্যার বারিরাশি ব্রহ্মপুত্রের বন্যার জলের সঙেগ মিশে যমুনার খাতে বইতে শুরু করে দেয় গোয়ালন্দের অপর পারে। এই জলরাশির সংঘাত পদ্মাকে ক্রমশ আড়িয়লখাঁ বা ভুবনেশ্বর খাত সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। মহারাজা রাজবল্লভের মন্দির-প্রাসাদ প্রভৃতি কীর্তি ধ্বংস করে পদ্মা ‘কীর্তিনাশা’ নাম গ্রহণ করে। নিম্নাংশে পদ্মা আজও পরিবর্তনশীল। গত পঞ্চাশ বছরেই ১০০ ফুট পরিসরের আঙ্গারিয়া খাল অর্ধ মাইল প্রশস্ত পালং-নালায় পর্যবসিত হয়ে আবার সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

পদ্মার ভাঙনের ভয় থেকে সারার পুলেরও (হার্ডিঞ্জ ব্রিজ) নিস্তার নেই। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে এই সেতু উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কলিকাতার রেলপথে সংযোগ স্থাপন করেছিল। ১৮ বছর পরে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে পদ্মার দক্ষিণ তীরের প্রস্তর স্তূপের নদী-শাসন বাঁধ (যা নদীর জলকে শুধু সেতুর মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে নির্মিত হয়েছিল) বন্যার তোড়ে ধসে পড়তে থাকে। কয়েক কোটি টাকা খরচ করতে হয় তার মেরামতের জন্যে। তা ছাড়া সেতুর পোস্তাগুলির সংরক্ষণের জন্যে অনেক পাথর ফেলা হয়েছে নদীগর্ভে। ১৯৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত গভর্নমেণ্টের সিনিয়র রেলওয়ে ইন্‌সপেক্টার লক্ষ করেছেন, মাত্র ২নং থেকে ৬নং পোস্তার মাঝেই নদীর গভীর খাত আশ্রয় নিয়েছে। অন্যান্য পোস্তার কাছে অগভীর জল অথবা চর পড়ে গিয়েছে। নদী-বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারেরা মনে করেন—পদ্মার সেতু ক্রমশ একটি ছোটোখাটো ব্যারেজ-এ (barrage-বাঁধে) পরিণত হয়ে যাচ্ছে। তার

ফলে পদ্মার প্রবাহ মাথাভাঙা, ভৈরব প্রভৃতি নদী পুনরুজ্জীবিত করে মধ্যবঙ্গের পথে সমুদ্রে নামবে (এই পথই পদ্মার প্রাচীনতম খাত বলে আমার বিশ্বাস)। অথবা বাম তীরে কোনোও স্থানে পাড় ভেঙে উত্তরবঙ্গের চলন বিলের পথে পদ্মার নতুন প্রবাহপথ সৃষ্ট হবে আবার ধলেশ্বরী-বুড়িগঙ্গার খাত দিয়ে।

কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, যে ইঞ্জিনিয়ারেরা উক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিযুক্ত অভিমত ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রচার করেছেন, এমনকি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে উইল্কক্স প্রস্তাবিত গঙ্গায় 'নদিয়া ব্যারেজ'-এর বিরোধিতা করেছেন পদ্মার চলনবিলের খাতগ্রহণের ভয়ে, তাঁরাই আজ ফরাক্কায় গঙ্গা-ব্যারেজের প্রস্তাবের গুণগান করছেন পঞ্চমুখে। বস্তুত, উইল্কক্সের প্রস্তাবিত 'নদিয়া ব্যারেজ'-এর অবস্থান তুলনায় অনেক ভালো জায়গাতেই নির্দিষ্ট হয়েছিল, রাজশাহীর পূর্ব-দক্ষিণে প্রায় ২০ মাইল দূরে, মাথাভাঙার উৎপত্তিস্থানের নীচে। আর বর্তমানের প্রস্তাবিত ফরাক্কা ব্যারেজ পদ্মার খুব দুর্বল স্থানেই নির্দিষ্ট হয়েছে। সারাপুলের কাছে, যেখানে পদ্মার সর্বোচ্চ বন্যার জলপ্রবাহ প্রতি সেকেণ্ডে ২৫ লক্ষ ঘনফুট (২৫ লক্ষ কিউসেক), সেখানে প্রস্তাবিত ফরাক্কা ব্যারেজের অবিস্থিতি স্থানের কিছু উপরেই, রাজমহলের নিচে গঙ্গার সর্বোচ্চ বন্যা প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে ৩৫ লক্ষ ঘনফুট জল নিষ্কাশিত করে। সারাপুলের উপরের দিকে উইল্কক্সের নদিয়া ব্যারেজ প্রস্তাবিত হয়েছিল।

## ভাগীরথী-হুগলীর খাত পরিবর্তন

ভগীরথের দ্বারা সংস্কৃত খালটির প্রাচীন পথেই আজও যে বর্তমান ভাগীরথী-হুগলি প্রবাহিত হচ্ছে, তা নয়। মনে রাখা ভালো, ইংরেজ আমলে ভাগীরথীরই নিম্নাংশ, সমুদ্র থেকে জলঙ্গী নদীর সঙ্গম পর্যন্ত, হুগলি নদী নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বণিকদের কাছে হুগলি শহরের গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। কারণ, সরস্বতীর তীরবর্তী সপ্তগ্রাম এলাকার হুগলি শহর থেকেই মুসলমান রাজত্বের ফৌজদার তাঁর শাসন পরিচালনা করতেন। মহারাজা নন্দকুমার এই হুগলিরই ফৌজদার ছিলেন।

গঙ্গা থেকে ভাগীরথী নদী পূর্বকালে বাংলার রাজধানী গৌড় নগরকে পশ্চিমে (দক্ষিণ পারে) রেখে তার প্রবাহ শুরু করেছিল। পুর্নিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত থেকে আরম্ভ করে রাজমহল-সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুরের মানভূম, ধলভূমের নিম্নতর সমভূমি ঘেঁসে দক্ষিণে প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত ঝিল আর নিম্ন জলাভূমিময় একটি রেখা আজও দেখা যায়। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, এই পথেই উত্তরভাগে ভাগীরথী আর দক্ষিণভাগে সরস্বতী-দামোদর-রূপনারায়ণের প্রাচীন প্রবাহের খাত ছিল। এ অনুমান যদি ঠিক হয়, তা হলে ভাগীরথী নদী ভগীরথ কর্তৃক কাটা খাল বলে ধরে নিতে আপত্তি থাকতেই পারে না। পূর্বের এই ভাগীরথী তাম্রলিপ্ত বা তাম্বোলি বন্দরের পার্শ্বেই প্রবাহিত হতো। টলেমি, মেগাস্থিনিস প্রভৃতি এর মোহানার উল্লেখ করেছেন। পরে ভাগীরথীর পরিত্যক্ত নিম্ন পথটি সরস্বতী নামে পরিচিত হয় ত্রিবেণী গ্রামের কাছ থেকে। এই গ্রাম থেকেই অধুনা বিলুপ্ত যমুনার খাত পূর্বে-দক্ষিণে প্রবাহিত হত। তাম্রলিপ্ত বন্দর বহু যুগ পর্যন্ত সরস্বতীর খাত-পথে ও উত্তরে ভাগীরথীর খাত-পথে উত্তর ভারতের বহির্বাণিজ্যের দ্বাররূপে কাজ করে এসেছে। ইতিহাস, পুরাণ ও লোককাব্যের পাঠকগণের কাছে এ কথা খুবই সুবিদিত।

সমৃদ্ধিশালী উত্তর ও দক্ষিণরাঢ় ও তাম্বোলি রাজ্যের সে যুগে উন্নতির প্রধান কারণ এই তাম্রলিপ্ত বন্দর। আজকের দিনের পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা বন্দরের মতো।

ত্রিবেণীর কাছ থেকে আর একটি নদী চব্বিশ পরগনা জেলার পূর্ব অংশ দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্রে মিশত—তার নাম ছিল যমুনা। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও এই 'যমুনা বিশাল অতি'। এই ত্রিবেণী তাই মুক্তবেণী—গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীকে তিন দিকে মুক্ত করে দিয়েছিল। ছোটনাগপুরের উপত্যকার প্রাচীনতর নদীর খাত ধরেই যে এই যমুনার ধারা বইত, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়। 'গঙ্গা' অর্থাৎ পরিবর্তিত খাতের ভাগীরথী তখন কলিকাতার পথে চলতে শুরু করেছে এবং কালীঘাটের আদি গঙ্গার (Tolly's Nulla) পথে সোনারপুর-বারুইপুর দিয়ে সাগরে মিশছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই আদিগঙ্গার পথে দক্ষিণে গিয়ে রূপনারায়ণের মোহানা ধরে তমলুকের গড়মন্দিরে পূজা করে উড়িষ্যার সড়ক ধরে পুরীর তীর্থে পৌঁছেছিলেন। ক্রমশ আদিগঙ্গা মজে আসে। ওদিকে সরস্বতীর উত্তর অংশও মজে আসে। ইউরোপীয় বণিকদের সুবিধার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে (নবাব আলিবর্দির আমলে) বর্তমান বটানিকাল গার্ডেনের কাছে (হাওড়ার বেতড়ের পাশে) হুগলি নদী আর সরস্বতীর সংযোগপথটি আবার কেটে সুসংস্কৃত করা হয়। আজও হুগলি এই পথে প্রবাহিত।

### ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, মহানন্দা, কুশী প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের নদীর খাত পরিবর্তন

'ব্রহ্মপুত্র মহাভাগো শান্তনু কুলনন্দন'—মন্ত্রটির মধ্যেই ব্রহ্মপুত্র নদীর ইতিহাস রয়েছে,—তার 'শান্তনু-পুত্র' অর্থাৎ তিব্বতের 'শান্-পো'র সঙ্গে সংযোগের ইতিহাস।

ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, এই শান্-পোর সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের সংযোগ ভূতাত্ত্বিক বর্ষ হিসেবে মোটেই প্রাচীন নয়। কারণ শান্-পো-ব্রহ্মপুত্রের সংযুক্ত বিপুল জলরাশি যদি বহু প্রাচীনকাল থেকে বয়ে আসত, তা হলে আসাম রাজ্যকে আমরা বর্তমান ভৌগোলিক উচ্চতায় পেতাম না।

পূর্বেকার ব্রহ্মপুত্র মাত্র আসাম অঞ্চলের অববাহিকার জল নিয়েই প্রবাহিত হত, আর তখন তার খাত ধুবড়ির কাছে দক্ষিণাভিমুখী বাঁক নেয়নি, অনেক পশ্চিমে এসে প্রায় দিনাজপুর-মালদহ জেলায় পৌঁছেছিল। শান্-পোর সঙ্গে সংযোগের পরবর্তী যুগেই ব্রহ্মপুত্র খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পর্বতমালাকে পশ্চিমে দক্ষিণে বেষ্টন করে শীতললক্ষ্যার খাতে গঙ্গা-পদ্মার সঙ্গে মিশত। নিকটেই সমুদ্র ছিল তখন এবং চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থিতি বর্তমান অবস্থিতি থেকে অনেক উত্তরে ছিল বলেই ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, বরিশাল, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট 'সমতট'-ভূমি নামে প্রসিদ্ধ। এখানকার ভূপৃষ্ঠ সমুদ্রজলপৃষ্ঠ থেকে বিশেষ উঁচু ছিল না। হালে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উঠেছে, আজও এ অঞ্চলের উচ্চতা অতি সামান্যই এবং বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের বন্যা ও ঘূর্ণাবর্তের প্রকোপে এ অঞ্চল আজও জর্জরিত হয় মাঝে মাঝে।

বিহারের কুশী নদী পূর্বকালে আরও পূর্ববাহিনী ছিল এবং উত্তরবঙ্গের আত্রেয়ী নদীর সঙ্গে এককালে মিশত। সে সময়ে তিস্তা নদীও তাদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এই কুশী-আত্রেয়ী-তিস্তার সংযুক্ত প্রবাহ একসঙ্গে পদ্মায় পড়ত। মাত্র ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিস্তা অনেক উত্তরে, খাসিয়া পর্বতের পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রে এসে মিশেছে। আর তারপর থেকেই

ব্রহ্মপুত্র 'যমুনা'র খাতটি গ্রহণ করে গোয়ালন্দের অপর পারে পদ্মায় তার বিপুল জলরাশি ঢালতে শুরু করেছে।

মহানন্দা ও কুশী ক্রমশ পশ্চিমে সরে গিয়েছে, আর ছেড়ে গিয়েছে সমস্ত উত্তরবঙ্গ ও বিহারে অসংখ্য 'ধার' বা খাত। প্রবল বন্যায় এইসব খাত পুনরুজ্জীবিত হয়ে প্রলয় সৃষ্টি করে প্রায়ই।

## গঙ্গার ব-দ্বীপের নদী

পশ্চিমে ভাগীরথী-হুগলি, উত্তরে আর পূর্বে পদ্মা-মেঘনা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, এই ত্রিভুজাকৃতি ভূখণ্ডই গঙ্গার ব-দ্বীপ। আয়তনে এত বড়ো এবং এত সমতল ব-দ্বীপ গঙ্গা ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো নদীরই নেই।

গঙ্গার ব-দ্বীপের নদীগুলির খাত পরিবর্তন প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বর্তমানে এদের অধিকাংশেরই গঙ্গা-পদ্মার সঙ্গে সংযোগ প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মাথাভাঙা নদীর পদ্মার নিকটে মাথাভাঙা, তাই বুঝি এই নামকরণ হয়েছে। অতি আধুনিক কালেই কলকাতার কাছে বিদ্যাধরী ক্রমশ মজে আসছে। এই সেদিনও মাতলা অতি বিশাল নদী ছিল, তার খাতও ভরাট হয়ে আসছে। ইছামতীর উপর অংশেরও সেই অবস্থা। সুন্দরবন অঞ্চলে, সমুদ্রের জোয়ারের জলে নিম্নাংশে এদের জীবন রক্ষা পেয়েছে। এইসব নদীর জীবনরক্ষা আজ ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে মহা সমস্যা। ভাগীরথী-হুগলি নদী এদিক দিয়ে এদেরই স্বগোত্র।

মুর্শিদাবাদ-নদিয়া জেলার জলঙ্গী, ভৈরব, মাথাভাঙা, চূর্ণী প্রভৃতি নদী ভাগীরথীতে মিশেছে। একদিন এই ভৈরব তার স্বনামের গৌরব রক্ষা করত, মহাপরাক্রান্ত নদ হিসেবে, আজ সামান্য একটি প্রণালী মাত্র। বছরের মধ্যে প্রায় ১০/১১ মাস এদের পদ্মার সঙ্গে সংযোগ না থাকায় এরা প্রায় মজে এসেছে। এদের ক্ষীণ খাতে আজ আর এ অঞ্চলের বৃষ্টির জলও এরা ভালো করে বহন করে নিষ্কাশন করতে পারছে না। কাজেই এ অঞ্চলে নদীতে জলাভাব আর জমিগুলি জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের যশোহর জেলারও এই একই অবস্থা। নদীর এই বৈজ্ঞানিক দিকগুলো আমরা ক্রমশ আলোচনা করব। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পঞ্চদশ শতাব্দীতেও ত্রিবেণীর নিকট থেকে বহির্গত যে 'যমুনা বিশাল অতি' নদী ছিল, আজ তার খাতের চিহ্ন খুঁজে বার করাও জরিপ-ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে শক্ত। ওদিকে পূর্ববঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীতেও আজকের সুবিশাল গড়াই নদের অস্তিত্বই ছিল না।

## ভাগীরথী-হুগলির পশ্চিম পারের নদ-নদীর খাত পরিবর্তন

সরস্বতী ছাড়া, ভাগীরথী-হুগলির পশ্চিম পারের সব নদ-নদীই পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমিতে জন্ম নিয়েছে। মজা সরস্বতীর ক্ষীণ খাতই শুধু আজ হুগলি শহরের উত্তরে, ভাগীরথী-হুগলি থেকে বেরিয়ে আবার হুগলি নদীতেই এসে মিশেছে, কলিকাতার কিছু দক্ষিণে। অথচ পূর্বে, এমনকি ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতেই হুগলি নদীর চেয়ে এই সরস্বতীর খাতই প্রশস্ততর ও গভীরতর ছিল। ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, ফরাসি ও ইংরেজ বণিকদের জাহাজ এই সরস্বতী বেয়েই ত্রিবেণী ঘুরে কাশিমবাজার, ব্যাণ্ডেল, হুগলি, চন্দননগর, শ্রীরামপুরে পৌঁছেছিল ষোড়শ শতাব্দীতে। তারপরে সম্ভবত সরস্বতীর উপরের অংশ

বিশেষভাবে মজে আসতে থাকে, কাজেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে, মোটামুটি ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সরস্বতীর নিম্নাংশের সঙ্গে কলিকাতার নদীটির (ভাগীরথী-হুগলি) সংযোগের উন্নতি সাধন করা হয়, পূর্বেকার মজা খাতে খাল কেটে। (এই 'খাল কাটা'র ঘটনা থেকেই ইংরেজরা 'ক্যাল কাট্টা'—Calcutta—নাম দিয়ে সমসাময়িক সময়ে কলিকাতাব পত্তন করেছে কিনা কে জানে)? ইতিপূর্বেই এ পথে ইউরোপীয় বণিকের জাহাজ যাতায়াত শুরু করেছিল। এর পর থেকেই সরস্বতীর পথ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় এবং ক্রমে তার বর্তমান দুরবস্থা হয়ে যায়। তার নিম্নাংশ আজ (কলকাতার দক্ষিণ থেকে সাগর অবধি) ভাগীরথী-হুগলির নামে বেঁচে রয়েছে, প্রধানত সমুদ্রের জোয়ারের আর দামোদরের বন্যার সহায়তায়। অবশ্য, পূর্বেই বলেছি, এই পথেই পূর্বতনকালে ভাগীরথীর আদি পথ ছিল, তার আদিগঙ্গার পথ ধরবার আগে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভগীরথের যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলায় সাগরগামী এই নাব্য পথটি সমস্যাসঙ্কুল হয়েই রয়েছে। আজ আবার দামোদরের উচ্চ এলাকার বন্যা নিরোধের ফলে এই নাব্যপথ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে অদূর ভবিষ্যতে।

ছোটনাগপুরের মালভূমিতে উৎপন্ন নদ-নদীর প্রধানগুলির নাম মৌর বা ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর-রূপনারায়ণ, কাঁসাই-হলদি ও সুবর্ণরেখা। অপর নদীগুলি হয় এই সব প্রধান নদীর উপনদী নতুবা তাদের শাখা অথবা পরিত্যক্ত খাত। এক দামোদরেরই অনেকগুলি পরিত্যক্ত খাত রয়েছে। এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই দামোদর নিম্নাংশে প্রধানত রূপনারায়ণের খাতের নিম্নাংশ ধরেই প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। দামোদরের পরিত্যক্ত খাত 'কানা' নদীগুলি স্থানীয় জনস্বাস্থ্যের উপর এক দুর্বিষহ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

পূর্বেই বলেছি, ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গের এই নদীগুলি এবং মহানন্দা ও তিস্তা প্রভৃতি 'প্রথম শ্রেণি'র নদী। কারণ, এদের জলশক্তিকে সহজেই জল-বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করা সম্ভব।

এক দামোদর ছাড়া, ময়ূরাক্ষী, অজয় প্রভৃতি ছোটনাগপুরের নদী বিশেষ খাত পরিবর্তন করে না অথবা বড়ো প্লাবনও সৃষ্টি করে না। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে রাস্তা, রেলপথের বাঁধের প্রাচুর্যে অজয় প্রভৃতির অববাহিকায় প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। তাই এরা এবং দামোদরের কয়েকটি পরিত্যক্ত খাত অত্যন্ত ক্ষীণকায় হয়ে গিয়ে অত্যন্ত সর্পিল পথ নিয়েছে। ময়ূরাক্ষী, অজয় ও পূর্বেকার বেহুলার পথের দামোদর তাদের বন্যার জলের সংঘাত দিয়ে ভাগীরথী নদীকে ক্রমশ পূর্ব দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে। পূর্বেই বলেছি, ভগীরথের ভাগীরথী পত্তনের পূর্বে এই সব নদী বাংলা দেশে আরও পূর্ব দিকে প্রবাহিত হত।

ছোটনাগপুর উপত্যকায় উৎপন্ন নদীগুলির মধ্যে দামোদর বহুদিন ধরে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করে আসছে। এই সব নদীগুলি সকলেই কম বেশি দুর্দান্ত প্রকৃতির। অর্থাৎ বর্ষায় অববাহিকার জলে স্ফীত হয়ে নিম্নাংশে এরা কমবেশি কূল প্লাবিত করে। দামোদরের নিম্নাংশ হুগলি, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ সমভূমি, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতাও বেশি নয়, উপরের উচ্চ পার্বত্য থেকে তাই বর্ষায় স্ফীত দামোদর হুড় হুড় করে নেমে দুকূল ভাসিয়ে দিত। পাড়ে সমান্তরাল বাঁধ (embankment) দিয়ে বন্যার

কবল থেকে জনপদ রক্ষা করবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সে বাঁধও মাঝে মাঝে ভেঙে যেত। সম্প্রতি 'দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা' রূপ পরিগ্রহ করছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনাও রূপ গ্রহণ করছে। কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা পরিকল্পনারও জল্পনা-কল্পনা শোনা যাচ্ছে। ঠিক এমনি উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদীরও মাপজোক হচ্ছে এবং জলঢাকা নদীর মাপজোকের কাজ শেষ হয়েছে।

আমার মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের সমস্ত নদীগুলির মধ্যে দামোদরের প্লাবনের প্রধান কারণ তার উচ্চ উপত্যকার আয়তন অপেক্ষাকৃত বড়ো। আর এই অববাহিকা অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের জল এ অঞ্চলকে ভীষণ ভাবে ক্ষয় করে আর শিলা, বালি, মাটি বহন করে নামায়। এই বাহিত শিলা, বালি, পলি দামোদরের মধ্য ও নিম্ন প্রবাহে, তার ঢালের বিশিষ্টতার জন্যে, সহজেই অবক্ষেপিত হয়ে এই অংশে দামোদরের গর্ভকে ক্রমশ এত উঁচু করেছে। প্রত্যেক প্লাবনের পরে, এই পলি অবক্ষিপ্ত হয়ে দুই পাড়ে স্বাভাবিক সমান্তরাল বাঁধ (levee) সৃষ্টি করেছে (পরে মানুষ সে বাঁধ আরও দৃঢ় করেছে, দামোদরের গর্ভ উচ্চতর ও বন্যার উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে)। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দামোদরের দক্ষিণ তীরের বাঁধ (embankment) ভেঙে দেওয়ার পরে আবার স্বাভাবিক উপায়ে বাম তীরের বাঁধের সমান উঁচু বাঁধ গড়ে উঠেছে সেখানে। ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করে বেশ বোঝা যায়, মানুষে বাঁধ না দিলেও, দামোদরের ঢালের ও উচ্চ অববাহিকার ক্ষয়প্রবণতার জন্যে, মধ্য ও নিম্নপ্রবাহে দামোদর স্বাভাবিক ভাবেই তার গর্ভ উঁচু করত। 'মানুষে বাঁধ দেওয়ার ফলে দামোদরের গর্ভ উঁচু হয়েছে'—এ ধারণা ভুল। এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় ছিল দামোদরের উচ্চ উপত্যকায় অববাহিকা অঞ্চলে বৃষ্টির জল দ্বারা ভূমির ক্ষয় নিবারণ করা।

প্রবন্ধটি লেখকের বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থটির রচনাকাল নভেম্বর ১৯৫৯, ফলে সাম্প্রতিক অবস্থানের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই কিছু অমিল ঘটতে পারে।

# গৌড়বাসীর সমুদ্রযাত্রা

## ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার

আধুনিককালে কেউ কেউ সমগ্র বাংলা অর্থে গৌড় নাম ব্যবহার করেন। কবিবর মধুসূদন লিখেছেন, "কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু/লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে/আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" এস্থলে বাঙালিদের দেশকেই গৌড় বলা হয়েছে। কিন্তু প্রথমে গৌড় অবশ্যই একটি নগর ও ক্ষুদ্র জনপদের নাম ছিল। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির তৎকৃত 'বৃহৎসংহিতা'য় (১৪।৫-৮) পূর্ব ও পূর্বদক্ষিণ ভারতস্থিত বিভিন্ন জনপদের মধ্যে সমতট, সুহ্ম, কলিঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, উড্র, লৌহিত্য, গৌড়ক, পৌণ্ড্র, উৎকল, তাম্রলিপ্তিক এবং বর্ধমানের উল্লেখ করেছেন। 'তন্ত্রসার', 'জ্যোতিস্তত্ত্ব' প্রভৃতি অনেক আধুনিক গ্রন্থেও পূর্বভারতে মগধ, শোণ, বরেন্দ্রী, গৌড়, রাঢ়ক, বর্ধমান, তমোলিপ্ত, প্রাগ্‌জ্যোতিষ এবং উদয়াদ্রির উদ্ধৃত নির্দেশ করা হয়েছে।

সাধারণ পাঠকেরাও সহজেই বুঝতে পারবেন যে, এই গ্রন্থসমূহে গৌড়কে বাংলা দেশেরই বহু জনপদ হতে স্বতন্ত্র করা হয়েছে, যেমন সুহ্ম (রাঢ়), বর্ধমান, তাম্রলিপ্ত (মেদিনীপুর), বঙ্গ, উপবঙ্গ (যশোর অঞ্চল), সমতট (কুমিল্লা অঞ্চল), লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্রতীর), পৌণ্ড্র (বরেন্দ্রী) ইত্যাদি। যা হোক, রাজনীতিক এবং অপরাপর কারণে অনেক সময়ে ভৌগোলিক সংজ্ঞার অর্থ-বিস্তার ঘটে থাকে। পাল এবং সেন রাজগণ অনেক ক্ষেত্রে রাজধানীর নাম থেকে আপনাদের 'গৌড়েশ্বর' বলতেন এবং তাঁদের সাম্রাজ্যকেও অনেক সময় গৌড় বলে উল্লেখ করা হত। এমনকি কখনও কখনও সমগ্র উত্তরভারত বোঝাতে গৌড় নামটি ব্যবহৃত হত। রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের একখানি তাম্রশাসনে (৯২৬ খ্রি) 'পঞ্চগৌড়' নাম দেখতে পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতকে রচিত কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিণী'তেও পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণে উত্তর-ভারতের পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর নাম বলা হয়েছে—

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ।।

হয়তো এর কারণ এই যে, অষ্টম-নবম শতাব্দীর বাঙালি রাজা ধর্মপাল আর্যাবতে কিছুকালের জন্য গৌড়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একাদশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত গুজরাতি

কবি সোড্ঢলের 'উদয়সুন্দরীকথা'য় ধর্মপালকে 'উত্তরাপথ-স্বামী' বলা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে আবার কেউ কেউ রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ি, বঙ্গ এবং মিথিলাকে পঞ্চগৌড় বলেছেন; কারণ কিংবদন্তি অনুসারে এই বিস্তৃত অঞ্চল সেনবংশীয় রাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল। 'বাগড়ি' এখনকার 'বাঘড়ি' (প্রাচীন 'ব্যাঘ্রতটী')। এই জনপদ ভাগীরথী, ভৈরবী ও পদ্মার জলে ধৌত এবং ভাগীরথীর পূর্বে ও পদ্মার দক্ষিণে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ইত্যাদি স্থান।

বর্তমানে মালদহ জেলার দক্ষিণাংশে মুসলমানযুগের গৌড়নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সেনরাজগণের লক্ষ্মণাবতী এবং পালরাজাদের রামাবতী নামক নগরীদ্বয় এই গৌড়ের সন্নিকটে বা অল্পদূরে অবস্থিত ছিল। পাল-সেন যুগে পদ্মা নদী গৌড়-অঞ্চলের উত্তর দিয়ে প্রবাহিত হত। অবশ্য পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে (৬।২।৯৯-১০০) গৌড় নামক একটা নগরের উল্লেখ আছে; কিন্তু এই নগর পূর্বভারতে অবস্থিত ছিল না। 'অর্থশাস্ত্র' এবং 'কামসূত্র'-এ আমরা পূর্ব ভারতীয় গৌড়ের নাম দেখতে পাই। ভবিষ্যপুরাণের 'ব্রহ্মখণ্ড' অংশের অনেক পাণ্ডুলিপিতে যে ভৌগোলিক বিবরণ আছে, তাতে দেখি—

পদ্মা-নদ্যা দক্ষভাগে বর্ধমানস্য চোত্তরে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতো গৌড়েশী যত্র তিষ্ঠতি।।

অর্থাৎ পদ্মানদীর দক্ষিণে এবং বর্ধমান অঞ্চলের উত্তরে প্রাচীন গৌড়দেশ অবস্থিত ছিল। মালদহের অন্তর্গত গৌড় অঞ্চল অবশ্যই গৌড়দেশের অন্তর্গত ছিল, এবং পদ্মানদী প্রাচীন কালে ওই অঞ্চলের উত্তর দিয়ে প্রবাহিতা হত, একথা আগেই বলেছি। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা গৌড়কে লখ্নৌতী (লক্ষ্মণাবতী) বলেছেন এবং রামৌতী বা রামাবতীকে সরকার লখ্নৌতীর অন্তর্গতরূপে উল্লেখ করেছেন। সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' (৩য় সর্গ) হতে মনে হয় যে, রামাবতী বরেন্দ্রীদেশে গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল। তবে নগরীটি গৌড়নগর থেকে বহুদূরে ছিল বলে মনে হয় না।

সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়দেশে শশাঙ্ক নামক একজন রাজা ছিলেন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'-এ তাঁকে গৌড়েশ্বর বলা হয়েছে; কিন্তু চিনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএন-চাঙ্ তাঁর রাজ্য এবং রাজধানীকে কর্ণসুবর্ণ বলেছেন।

এই কর্ণসুবর্ণনগর মুর্শিদাবাদশহরের দক্ষিণে বহরমপুরের কাছাকাছি রাঙামাটি নামক স্থানের নিকটে অবস্থিত ছিল বলে স্থির হয়েছে। কর্ণসুবর্ণ নগরের প্রান্তে রক্তমৃত্তিকা (রাঙামাটি)-বিহার অবস্থিত ছিল। উৎখননের ফলে ওই বিহারবাসী বৌদ্ধভিক্ষুদের সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে। চিনা পরিব্রাজকের বিবরণ থেকে মনে হয় যে, শশাঙ্কের রাজ্য তাঁর রাজধানীর নামে কর্ণসুবর্ণ রূপে পরিচিত হয়েছিল। 'হর্ষচরিত' থেকে বোঝা যায়, প্রকৃতপক্ষে রাজ্যটির নাম ছিল 'গৌড়'। আর আমরা দেখেছি, এই সময়ে গৌড়রাজ্য পদ্মানদীর বর্তমান খাতের উত্তরদিকেও কিয়দ্দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং আধুনিক মালদহ জেলার দক্ষিণাঞ্চল তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কীরূপে ভৌগোলিক সংজ্ঞা হিসাবে গৌড় নামটির ক্রমিক অর্থবিস্তার ঘটেছিল, তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে। মধ্যযুগে আমরা দেখতে পাই, মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বাংলাকে 'গৌড়-বঙ্গাল' নামে উল্লেখ করেছেন। পরে অবশ্য তাঁরা কেবলমাত্র 'বঙ্গাল' নামেই সমগ্র বাংলা বুঝতেন। কিন্তু 'গৌড়-বঙ্গাল' নাম হতে বোঝা যায় যে, একসময়ে তাঁরা পশ্চিমবাংলা অর্থে 'গৌড়' এবং পূর্ববাংলা

অর্থে 'বঙ্গাল' নাম ব্যবহার করতেন। 'শক্তিসঙ্গমতন্ত্র'-এও এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে—

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্বসিদ্ধি-প্রদায়কঃ।।.....
বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগঃ শিবে।
গৌড়দেশো সমাখ্যাতঃ সর্ববিদ্যা-বিশারদঃ।।

অর্থাৎ বঙ্গদেশ বঙ্গোপসাগর হতে উত্তরদিকে ব্রহ্মপুত্রনদ পর্যন্ত (সম্ভবত যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম পর্যন্ত) বিস্তৃত ছিল এবং গৌড়দেশের বিস্তার ছিল তার পশ্চিমদিকে বর্তমান উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বর পর্যন্ত। যা হোক, প্রাচীন গৌড়ের অবস্থান সম্পর্কে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। দেখা গেল যে, মোটামুটি বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় এবং মালদহের দক্ষিণাংশে আদিম গৌড়রাজ্য অবস্থিত ছিল। সম্ভবত পালরাজগণের পূর্বেই গৌড়নামের ভৌগোলিক বিস্তৃতি ঘটতে দেখা যায় এবং মধ্যযুগের শেষদিকে 'গৌড়-বঙ্গাল' নামের স্থলে 'বঙ্গাল' জনপ্রিয় হতে থাকে। প্রায় এই সময় থেকেই বঙ্গাল, গৌড় ও বঙ্গ—এই তিন নামেই সমগ্র বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল বোঝানো হচ্ছে।

প্রাচীন ভারতবাসীগণ যে সামুদ্রিক বাণিজ্যে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন, তার প্রমাণ আছে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর অনেক পূর্বেই মালয়, ব্রহ্মদেশ, তাই দেশ (শ্যাম), কমপুচিয়া (কম্বোডিয়া), ভিয়েৎনাম (আনাম), লাওস্, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি জনপদে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল। দক্ষিণ-আনাম অর্থাৎ প্রাচীন চম্পাদেশের বোকাঞ্ নামক স্থানে যে সংস্কৃত অভিলেখ পাওয়া গিয়েছে তা খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর বলে মনে করা যেতে পারে। ওই অভিলেখটিতে সেখানকার তৎকালীন রাজবংশের আদিপুরুষকে বলা হয়েছে 'শ্রীমার'। এই শ্রীমার অবশ্যই ভারতীয় অথবা ভারতীয় সভ্যতায় উদ্বুদ্ধ আনামবাসী ছিলেন। চিনা লেখকগণের বিবরণ হতে জানা যায়, আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কৌণ্ডিন্য নামক একজন ভারতীয় ব্রাহ্মণ কম্বোডিয়াতে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এই সুদূর পূর্বদেশে ভারতীয় সভ্যতার ধ্বজাবাহী ছিলেন ভারতের বণিকেরা। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রিক ভৌগোলিক Ptolemy যবদ্বীপের নাম লিখেছেন Iabadiu। নামটি যে সংস্কৃত 'যবদ্বীপ' নামের গ্রিক উচ্চারণ, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। সুতরাং Ptolemy-র পূর্বেই যবদ্বীপে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল। এই নামটিতেও আমরা বাণিজ্যের গন্ধ পাই। কারণ 'যব' নামক পণ্যশস্যের সঙ্গে দ্বীপটির নাম সম্পর্কিত করা হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে চিনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যবদ্বীপে হিন্দু ধর্মের প্রবল প্রতিপত্তি লক্ষ করেছিলেন।

ভারতের সমুদ্রোপকূলস্থিত দেশের বণিকেরা নানা বন্দর থেকে পূর্বদেশে যাত্রা করতেন। সে যুগে বাংলা দেশের সর্বপ্রধান বন্দরের নাম ছিল তাম্রলিপ্তি। আধুনিক তমলুক প্রাচীন তাম্রলিপ্তির স্মৃতি বহন করে আসছে; কিন্তু তাম্রলিপ্তি ভাগীরথীর তৎকালীন মোহনার অনেকটা নিকটে অবস্থিত ছিল বলে মনে হয়। এই তাম্রলিপ্তি যে কেবল বাঙালির বন্দর ছিল, তা নয়। উত্তরভারতের বিভিন্ন জনপদবাসী বণিকেরা এই স্থান হতে বাণিজ্যার্থ পূর্বদেশে গমন করতেন। চিনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এই বন্দর হতে সমুদ্রপথে প্রথমত

সিংহলে এবং সেখান থেকে যবদ্বীপে গিয়েছিলেন। প্রাচীন গৌড়বাসীরাও অবশ্যই তাম্রলিপ্তি বন্দর হতে পূর্বদেশে যাত্রা করতেন।

সেকালের গৌড়বাসীগণের সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে যে কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে দুটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

অবশ্য রাজপুত্র বিজয়ের সিংহলজয়ের কথা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু আমরা এস্থলে তার উপর বিশেষ জোর দিলাম না। কারণ, 'মহাবংস'-এর বিবরণ হতে বিজয় রাঢ়দেশ কিংবা লাটদেশ (গুজরাতের অন্তর্গত নৌসারিভরোচ অঞ্চল) থেকে সিংহলে গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে বির্তক উপস্থিত হয়েছে, যদিও রাঢ়দেশের পক্ষেই পাল্লা ভারী বলে আমরা মনে করি। কিন্তু অত প্রাচীনকালে রাঢ়দেশ এবং গৌড়দেশ অভিন্ন ছিল না। অবশ্য সিংহলীয় কাহিনিসমূহ হতে মনে হয় যে, সে যুগে রাঢ় এবং লাট উভয়দেশের সঙ্গেই সিংহলের সর্ম্পক ছিল এবং হয়তো এই দুই দেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন কয়েকটি কিংবদন্তি মিলেমিশে বিজয়ের কাহিনির সৃষ্টি হয়েছে। যা হোক, বিজয়ের কাহিনি বাদ দিলেও আমাদের অন্য প্রমাণের অভাব নেই।

প্রথমত মালয়দেশের ওয়েল্‌জ্‌লি জেলায় খ্রিস্টীয় পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি সংস্কৃত অভিলেখ পাওয়া গিয়েছে। তা থেকে বুদ্ধগুপ্ত নামক একজন বৌদ্ধ 'মহানাবিক'-এর নাম জানা যায়। তিনি রক্তমৃত্তিকার অধিবাসী ছিলেন। আমরা উপরে দেখেছি, গৌড়ের প্রাচীন রাজধানী কর্ণসুবর্ণের উপান্তে হিউ এন-চাঙ্ 'রক্তমৃত্তিকা-বিহার' দেখতে পেয়েছিলেন। এ কথাও বলা হয়েছে যে, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুর শহরের নিকটে উল্লিখিত রক্তমৃত্তিকার অবস্থান প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত বাঙালি এবং গৌড়দেশের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবত যে অর্থে ইংরেজি ভাষার Captain শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেই অর্থেই পূর্বোক্ত অভিলেখে 'মহানাবিক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রমাণটি পাওয়া যায় মৌখরিরাজ ঈশানবর্মার একখানি শিলালেখে। এই অভিলেখ যুক্তপ্রদেশের বড়াবঙ্কী জেলার অন্তর্গত হরাহাগ্রামে পাওয়া গিয়েছে; এর তারিখ ৫৫৪ খ্রিস্টাব্দ। অভিলেখটির একটি শ্লোকে মৌখরিরাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে—'কৃত্বা চায়তি-মোচিত-স্থলভুবো গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ান্'; অর্থাৎ ঈশানবর্মার পরাক্রমে গৌড়বাসীগণ স্থল পরিত্যাগ করে সমুদ্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য এস্থলে 'গৌড়' প্রাচীন সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'গৌড়' নামের ভৌগোলিক অর্থবিস্তার ঘটেনি।

সাধারণত হরাহা শিলালেখের পূর্বোল্লিখিত ওই শ্লোকটির যে ব্যাখ্যা করা হয়, তা অসংগত বলে মনে হয়। অনেকেই স্থির করেছেন যে, ঈশানবর্মা গৌড়বাসীদিগকে পরাজিত করে সমুদ্রের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে বিতাড়িত করেছিলেন। এই সিদ্ধান্ত সত্য হলে গৌড়বাসীগণের সমুদ্রাশ্রয়ত্বের স্বরূপ কিছুই বোঝা যায় না। কারণ, সমুদ্রতীরে যারা বাস করে, সমুদ্রকে তাদের আশ্রয়রূপে বর্ণনা করা নিরর্থক। শ্লোকটিতে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, গৌড়বাসীরা ঈশানবর্মা কর্তৃক পরাজিত হয়ে দেশ ছেড়ে সমুদ্রবক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। অবশ্য এতে মৌখরিরাজের প্রশস্তি কীর্তন করতে গিয়ে তাঁর সভাকবি অনেকটাই অত্যুক্তি করেছেন। কিন্তু খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়বাসীগণ সমুদ্রযাত্রার জন্য সুবিখ্যাত না থাকলে, কবির পক্ষে পূর্বোক্ত বর্ণনা কিছুতেই সম্ভব হত না। নেপোলিয়ন যেমন

প্রতিপক্ষ ইংরেজদিগকে 'বণিকের জাতি' বলে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিলেন, মৌখরিরাজের সভাকবিও তেমনই প্রতিপক্ষ গৌড়রাজকে হীন করবার অভিপ্রায়ে গৌড়বাসীগণকে, 'যুদ্ধে অক্ষম সমুদ্রচর বণিক্ জাতি' রূপে চিত্রিত করে অবজ্ঞাসূচক ইঙ্গিত করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ বর্ণনার অসংখ্য উদাহরণ দেখা যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে কল্হণ তাঁর 'রাজতরঙ্গিণী'তে (৪।১৭৮-৮০) অষ্টম শতাব্দীর কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য সম্পর্কে বলেছেন "সেই প্রতাপশালী রাজা পরাজিত রাজগণকে যে সকল পরাজয়চিহ্ন ধারণ করিয়েছিলেন, অদ্যাপিও তাঁদের বংশধরেরা অবনতভাবে সেই সকল চিহ্ন ধারণ করছেন। তাঁরই আদেশে তুরুষ্কদেশীয়েরা পরাজয়চিহ্ন স্পষ্টভাবে দেখাবার জন্য হস্তদ্বয় পৃষ্ঠদেশে রাখে এবং মস্তকের অর্ধভাগ মুণ্ডিত করে। সেই রাজাই পশু (বানর) জাতির ন্যায় লঘুতা প্রকাশের জন্য দাক্ষিণাত্যদের পরিধেয় বস্ত্রের ভূতলস্পর্শী লম্ববান কচ্ছে পুচ্ছ করিয়েছিলেন।"

অবশ্য শত্রুপক্ষের ওই ইঙ্গিতে প্রাচীন গৌড়বাসীর বীরত্বের উপর ততটা কলঙ্ক স্পর্শ করে না, কারণ নিঃসন্দেহেই বর্ণনাটি অত্যুক্তিমূলক। কিন্তু সে যুগে গৌড়ের অধিবাসীগণ যে প্রধানত সমুদ্রযাত্রা অর্থাৎ সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, হরাহা অভিলেখের পূর্বোল্লিখিত বিবরণ পাঠ করলে তাতে কোনোই সন্দেহ থাকে না।

উৎস : সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ

# বাংলায় বৌদ্ধধর্ম*

অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ ও বৌদ্ধ সাহিত্য হতে জানা যায় বৌদ্ধধর্ম এক কালে ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার ঢেউ বাংলা দেশে কবে এসে পৌঁছেছিল এর কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পালি গ্রন্থে বা সমসাময়িক কালে রচিত অন্য কোনো গ্রন্থে মেলে না। সংযুক্তনিকায়ে ভগবান বুদ্ধের বাংলা দেশের অন্তর্গত শেতক নামক নগরে কিছুদিনের জন্য অবস্থান ও বাঙালি বৌদ্ধাচার্য বঙ্গীশের উল্লেখ আছে। অঙ্গুত্তরনিকায়েও বঙ্গান্তপুত্ত নামক এক জন বাঙালি বৌদ্ধ ভিক্ষুর কথা জানা যায়। এ ছাড়া দিব্যাবদান গ্রন্থে বর্ণিত আছে বুদ্ধভক্ত শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ তাঁর কন্যা সুমাগধাকে বিয়ে দেন বাংলা দেশের অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধনের জনৈক যুবকের সঙ্গে। কথিত আছে সুমাগধার শ্বশুরালয়ের সকলেই ছিলেন নির্গ্রন্থ (জৈন ভক্ত)। তাদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেওয়ার জন্য সুমাগধা ভগবান বুদ্ধকে পুণ্ড্রবর্ধনে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। বুদ্ধ নিজেই এখানে আসেন। কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্রর বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতায়ও এরূপ সুমাগধার উপাখ্যান আছে। সুমপা রচিত পাক-সম-জোন-জং নামক তিব্বতি গ্রন্থে উল্লেখ আছে মগধভদ্র নামক জনৈক লোক বুদ্ধকে পুণ্ড্রবর্ধনে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙও তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে পুণ্ড্রবর্ধনে বুদ্ধের আগমনের কথা উল্লেখ করেছেন। তদুপরি মগধ ও বঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান এত কাছাকাছি যে, বুদ্ধের সময়ে বাংলা দেশে তাঁর ধর্মের প্রসার হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেরূপ কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে না। প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে বুদ্ধের বাংলায় আগমনের কথা যা আছে তার ঐতিহাসিক সমর্থন মেলে না। অঙ্গুত্তরনিকায় ও নিদ্দেসে উল্লেখিত ষোড়শ মহাজনপদের তালিকার মধ্যে বাংলা দেশের নাম নেই। সম্রাট অশোকের অনুশাসন লিপির একটিও বাংলা দেশের মাটির তল হতে আজও বের হয়নি। অনুশাসনগুলি হতে যোন-কম্বোজ, সতিয়পুত্র, কেরলপুত্র, তাম্রপর্ণি প্রভৃতি অন্তরাজ্যে ধর্মমহামাত্র প্রেরণের কথা জানা যায়। সে সব অন্তরাজ্য সমুহের

* ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষে ভারত ও পাকিস্তান এ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। এই দেশ বিভাগের ফলে বাংলা পশ্চিম বঙ্গ এবং পূর্ব পাকিস্তান—এ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। বাংলার বৌদ্ধধর্মের ইতিকথা বস্তুত পূর্ব পাকিস্তানেরই বৌদ্ধধর্মের কাহিনী। এখন পর্যন্ত যে সব বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য ও সংঘারাম প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে তা প্রায় সবই এ এলাকায়।

মধ্যেও বাংলা দেশের নাম মেলে না। সিংহলি ইতিবৃত্ত হতে জানা যায় ভারতে সম্রাট অশোক ৮৪,০০০ স্তূপ তৈরি করান। এ সব স্তূপের কোনও নিদর্শন বাংলার মাটিতে মেলেনি। কিন্তু হিউয়েন-সাঙ বাংলা দেশে অশোক নির্মিত স্তূপ দেখেন বলে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের বগুড়া জেলার মহাস্থান নামক স্থানে ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত একটি শিলালেখ পাওয়া গেছে। এতে উল্লেখ আছে ছব্‌বগ্‌গীয় বা ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের কথা। এ শিলালেখের অক্ষর মৌর্যযুগের বলে মনে করা হয়। মৌর্যযুগের পর বাংলা দেশের পুণ্ড্রবর্ধন যে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হয়ে উঠে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার প্রচুর নিদর্শন সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে ও মৌর্যোত্তর যুগের শিলালেখ সমূহে যথেষ্ট মেলে। সম্ভবত খ্রিস্টীয় পূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে সাঁচীর তোরণ গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালেখ সমূহ হতে জানা যায় পুণ্ড্রবর্ধনবাসী ধর্মদত্তা(ধমতায়) নামক জনৈক নারী ও ঋষিনন্দন (ইসিনন্দন) নামক জনৈক পুরুষ সাঁচী স্তূপের তোরণ নির্মাণের কিছু ব্যয়ভার বহন করেন। খ্রিস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ নাগার্জুনীকোণ্ডা শিলালেখের মধ্যে বাংলা দেশের নাম পাওয়া যায়। তিব্বতি গ্রন্থ হতে জানা যায় আচার্য নাগার্জুন পুণ্ড্রবর্ধনে কিছু বিহার নির্মাণ করেন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রচিত মিলিন্দপঞ্‌হ্‌ নামক পালিগ্রন্থে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। তদুপরি ললিতবিস্তর (২য় শতক), মহাবস্তু (৩য় শতক) প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে বঙ্গ লিপির কথা আছে।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে চৈনিক পরিব্রাজকেরা বাংলা দেশে এসেছিলেন। গুপ্তযুগে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময় ফা-হিয়ান ভারতে আসেন বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য। তিনি পনেরো বছর ভারতে ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি বাংলা দেশের তাম্রলিপ্তিতে (তমলুক) এসে পৌছান। তিনি সেখানে বাইশটি বৌদ্ধ বিহার দেখতে পান বলে উল্লেখ করেন। ফা-হিয়ানের আগেও বাংলা দেশে চৈনিক পরিব্রাজকেরা এসেছিলেন। তাঁদের বসবাসের জন্য শ্রীগুপ্ত মৃগস্থাপন স্তূপের নিকটে বিহার নির্মাণ করান। এর সংরক্ষণের জন্য তিনি ছাব্বিশটি গ্রাম দান করেন। এটি উত্তর বঙ্গের কোনো স্থানে অবস্থিত। গুপ্তযুগে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধির নিদর্শন বেশ মেলে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহি জেলায় অবস্থিত বৈহারৈলে একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। এ মূর্তিটি গুপ্তযুগের প্রাচীনতম নিদর্শন। বগুড়া জেলার মহাস্থানের বলাইধাপ স্তূপের নিকট বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিটি ব্রঞ্জ-এ নির্মিত। পূর্ব পাকিস্তানে ত্রিপুরা জেলার গুনাইঘর গ্রামে মহারাজ বন্যগুপ্তের একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর একজন সামন্তের অনুরোধে তিনি ভিক্ষু শান্তিদেবের[১] জন্য নির্মিত বিহারের সংরক্ষণ ও শান্তিদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্তির পুজোপচারের জন্য জমি দান করেন। এ বিহারে বসবাসকারী ভিক্ষুদের আহারের ব্যবস্থাও করেন। এ তাম্রশাসনে রাজবিহার নামক একটি বিহারের উল্লেখ আছে। গুনাইঘর অনুশাসন হতে অনুমান করা যায় ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা দেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়।

১। এই শান্তিদেব এবং শিক্ষাসমুচ্চয় ও বোধিচর্যাবতার প্রভৃতির লেখক শান্তিদেব একই ব্যক্তি নন। উভয়ের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই।

গুপ্তযুগের পর হর্ষযুগ। রাজা হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে আবার কিছুদিনের জন্য প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। তাঁর রাজত্বের সময়ে হিউয়েন-সাঙ ভারত পর্যটনে এসেছিলেন। তা ছাড়া তাও-লিন্, সেঙ-চি, ইৎ-সিং প্রভৃতি আরও চিনা পর্যটনকারীরা ভারতে আসেন। তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বাংলার বৌদ্ধধর্মের প্রামাণিক খবর মেলে। হিউয়েন-সাঙ ও ইৎ-সিং বাংলা দেশে সম্মিতীয়, সর্বাস্তিবাদ, মহাসাংঘিক প্রভৃতি বৌদ্ধমতাবলম্বীদের দেখতে পান বলে তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন। হিউয়েন-সাঙ পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তি—বাংলার এ কয়টি জনপদ পর্যটন করেন। পুণ্ড্রবর্ধনে মহাযান ও হীনযান দলীয় বিশটি বিহার ও তিন হাজারের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখতে পান। পুণ্ড্রবর্ধনে পো-সি-পো নামক একটি বড়ো বৌদ্ধ বিহার দেখেন। কর্ণসুবর্ণেও দশ হাজার বিহার আর সম্মিতীয়পন্থী দুহাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং কর্ণসুবর্ণের রাজধানীর অনতিদূরে রক্তমৃত্তিকা নামক একটি বিহারের কথা তিনি বলেছেন। এই বিহারেও অনেক পণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষুর অবস্থানের কথা লিখে গেছেন। তাম্রলিপ্তে দশাধিক বিহার ও এক হাজারের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং সমতটে দুহাজার স্থবিরবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ত্রিশটি বিহার তিনি দেখতে পান। হিউয়েন-সাঙ-এর সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের আলো ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম কনৌজ ও মধ্যদেশে কিছু প্রসার লাভ করেছিল। অবশ্য হর্ষবর্ধনের পরে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব ভারতে বিশেষ করে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের পরমায়ু আরও চার পাঁচশো বছর বেড়ে গেল। হর্ষযুগেই বাংলা দেশে আবির্ভূত হন দুজন কৃতী সন্তান শীলভদ্র ও চন্দ্রগোমী। শীলভদ্র ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজবংশের সন্তান। তাঁর ভাইপো ছিলেন বোধিভদ্র। শীলভদ্র ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। হিউয়েন-সাঙ তার নিকট অধ্যয়ন করতেন। চন্দ্রগোমী ছিলেন উত্তর বঙ্গের বা বরেন্দ্রের অধিবাসী। তিনি একজন বৈয়াকরণ, কবি, নাট্যকার, নৈয়ায়িক এবং বৌদ্ধতন্ত্রের উপদেষ্টা ও লেখক। ইৎ-সিং-এর বিবরণী হতে জানা যায় চন্দ্রগোমী বরাহবিহার নামক একটি বিহারে বাস করতেন। রাজা হর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বাংলার অধিপতি শশাঙ্ক। শশাঙ্ক ছিলেন নাকি বৌদ্ধ-বিদ্বেষী। তিনি বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধনের ভূমিকা স্বহস্তে নিয়েছিলেন বলে বৌদ্ধ সাহিত্যে অনেক উপাখ্যান পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো কোনো ঐতিহাসিক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, রাজা শশাঙ্কের বিরাগ মনোভাব রাজা হর্ষবর্ধনের উপর যতটুকু বৌদ্ধধর্মের উপর ততটুকু নয়।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে ইতিহাসে খড়্গ বংশ নামে আর একটি বৌদ্ধ রাজবংশের খবর পাওয়া যায়। এ বংশের রাজারা প্রথমে বঙ্গে রাজত্ব করতেন। পরে সমতটে রাজত্ব বিস্তার করেন। বৌদ্ধধর্ম এ বংশের স্বকীয় সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। আস্রফপুর লিপি হতে জানা যায় কর্মন্তের (পূর্ব পাকিস্তানে কুমিল্লার বড়োকামতা) পার্শ্ববর্তী জায়গাগুলিতে বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রভাব ছিল। আস্রফপুর হতে কাঁসার চৈত্য ও ছোটো ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি পাওয়া গেছে। বড়োকামতায় শুভপুরের পুবে বিহারমণ্ডল বলে একটি গ্রাম আছে। সম্ভবত এটি বৌদ্ধ নাম। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দুরা এখনও সকালে ওই গ্রামটির নাম উচ্চারণ করে না। এতে বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিদ্বেষ এখনও সঞ্জীবিত রয়েছে বলে মনে হয়।

অষ্টম শতক ছিল বাংলার ইতিহাসে এক অরাজকতার ইতিহাস। দেশে আর কোনো রাজা থাকল না। থাকল না রাষ্ট্রের সামগ্রিক কোনো ঐক্য। দেশে চলতে লাগল মাৎস্যন্যায়[১]। দুর্বলের উপর চলতে লাগল ক্ষমতাশালীদের ঝুলুম। জোর যার মুলুক তার। মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তখন গোপালকে রাজা বলে বরণ করে নিল লোকেরা। দেশে ফিরে এল শান্তি ও শৃঙ্খলা। এই গোপাল হলেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পালবংশের প্রত্যেকে ছিলেন বৌদ্ধধর্মালম্বী। তাঁরা ছিলেন পরমসৌগত। তাঁদের শিলালেখসমূহ সুগত বন্দনা দিয়ে আরম্ভ। এ বংশের রাজারা চারশো বছর বাংলা দেশে রাজত্ব করেন। পালবংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাজা হলেন যথাক্রমে ধর্মপাল ও দেবপাল। মহারাজ দেবপালের পর বাংলা দেশে পালবংশের অন্যান্য রাজারা শাসন ব্যাপারে এত সুদক্ষ ছিলেন না। তাঁদের রাজত্বের সময় বাংলা দেশে কিছুদিনের জন্য বৌদ্ধধর্মের স্থিতি অবস্থা ছিল। মহীপাল ও নয়পালের রাজত্বের সময়ে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে নব যুগ দেখা দিল। তাঁদের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম পেল নতুন জীবনীশক্তি। মহারাজ ধর্মপালের খলিমপুর শিলালেখ ও দেবপালের নালন্দা ও মুংগের শিলালেখতে উৎকীর্ণ ছিল জোড়া মৃগমুর্তি ও ধর্মচক্র চিহ্ন। এগুলির প্রারম্ভে আছে সুগত বন্দনা। হর্ষবর্ধনের রাজত্বের পর বৌদ্ধধর্ম শেষ আশ্রয় লাভ করে বাংলা দেশে। পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর প্রভাবও ছড়িয়ে পড়ে বহির্ভারতে। পাল যুগেই বৌদ্ধধর্ম আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে। এক কথায় পালযুগই বাংলার বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণ যুগ। পাল রাজাদের প্রচেষ্টায় অনেকদিন ধরে দেশ বিদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ইতিহাস মানব সভ্যতায় উজ্জল হয়ে আছে।

কীর্তিমান সম্রাট ধর্মপালের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র নালন্দা মহাবিহার সমৃদ্ধি লাভ করে। সোমপুর মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁরই অর্থানুকূল্যে। ত্রৈকূট বিহার তাঁর অর্থে নির্মিত হয়। ধর্মপালের পুত্র দেবপালও পিতার মতো কীর্তিমান দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তাঁর রাজত্বের সময়ে জাভা ও সুমাত্রার সঙ্গে বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ হয়। জাভার কলসনের নিকটবর্তী কেলুরক নামক স্থানে প্রাপ্ত গৌড় শিলালিপি হতে জানা যায় যে, দ্বীপাচার্য কুমারঘোষ যবদ্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীসংগ্রাম ধনঞ্জয়ের গুরু ছিলেন। বাঙ্গালি কুমারঘোষ সেখানে একটি মঞ্জুশ্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বেই বলেছি দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসন হতে জানা যায় শৈলেন্দ্রবংশোদ্ভূত শ্রীবালপুত্রদেব আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দায় বিহার নির্মাণের উদ্দেশ্যে দূত পাঠান দেবপালের নিকট। রাজা এই অনুরোধ সানন্দে রক্ষা করে বিহার নির্মাণের অনুমতি দেন এবং ঐ বিহারগুলির সংরক্ষণের জন্য পাঁচটি গ্রামও দান করেন। নগরহাড়ের অধিবাসী পণ্ডিত বীরদেব বৌদ্ধধর্মানুরাগী হয়ে বুদ্ধগয়ায় গেলে দেবপাল তাঁকে নালন্দা মহাবিহারের আচার্য নিয়োগ করেন। বৌদ্ধ মহাবিহারগুলি ছিল বৌদ্ধ শিক্ষা ও ধ্যান ধারণার প্রধান কেন্দ্র। বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা ধর্মপাল। বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনাদি শেখার জন্য তিব্বত হতে বহু শিক্ষার্থী এখানে আসত। তা মগধের উত্তরে গঙ্গার তীরে

১। মাৎস্যন্যায়—অর্থ মাছের নীতি। বড়ো বড়ো মাছ ছোটো ছোটো মাছকে গিলে খায়। এ হল নীতি—দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার।

এক পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। এত বড়ো বিহার ভারতের আর কোথাও ছিল না। এ বিদ্যায়তনে একশো পনেরো জন আচার্য ছিলেন। তাঁরা এখানে নানা বিষয়ে অধ্যাপনা, গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করতেন। তিব্বতি গ্রন্থ হতে জানা যায় ওদন্তপুরী মহাবিহারও ধর্মপালের নির্মিত। তারানাথ মনে করেন এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেবপাল। এটি নালন্দা মহাবিহারের নিকটে। সোমপুর বিহার নির্মিত হয় পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত আধুনিক পাহাড়পুর নামক স্থানে। এর ধ্বংসাবশেষ এখনও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আচার্য বোধিভদ্র ও অতীশ দীপঙ্কর এ বিহারে অবস্থান করতেন। ভাববিবেকের মধ্যমকরত্নপ্রদীপ গ্রন্থটি এখানে তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। বিপুলশ্রীমিত্রের লেখা হতেও জানা যায়, বিপুলশ্রীমিত্রের গুরুর গুরু করুণাশ্রীমিত্র সোমপুর বিহারে বাস করতেন। বঙগাল সৈন্যরা সোমপুর বিহার অগ্নিদগ্ধ করে এবং সে আগুনে পুড়ে করুণাশ্রীমিত্র মারা যান। পরে বিপুলশ্রীমিত্র সোমপুর বিহার সংস্কার করেন এবং সেখানে একটি তারামূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

ঐতিহাসিক তারানাথের মতে মহারাজ ধর্মপাল পঞ্চাশটি বিহার নির্মাণ করেন। তিব্বতি গ্রন্থ হতে আরও কিছু বিহারের খবর মেলে। এদের মধ্যে অন্যতম হল ত্রৈকূট বিহার, দেবীকোট বিহার, পণ্ডিত বিহার, সন্নগড় বিহার, ফুল্লহরি বিহার, পট্টিকেরক বিহার, বিক্রমপুরী বিহার ও জগদ্দল মহাবিহার। ত্রৈকূট বিহার পশ্চিম বঙেগর রাঢ় দেশের ত্রৈকূট দেবায়তনের নিকটে। দেবীকোট অবস্থিত উত্তর বঙেগর দিনাজপুর জেলায় বানগড়ের অনতিদুরে। পণ্ডিত বিহার ছিল চট্টগ্রামে। পট্টিকেরক ও সন্নগড় মহাবিহার ছিল পূর্ব বঙেগর ত্রিপুরা জেলার ময়নামতী পাহাড়ের উপর। পট্টিকেরক বিহারের ধ্বংসাবশেষ এখন খনন করা হয়েছে। বিক্রমপুরী বিহার ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে। এ সকল উল্লেখযোগ্য বিহার ছাড়া আরও ছোটো ছোটো কয়েকটি বিহার বাংলা দেশে ছিল। এর নির্দশন মেলে তিব্বতি গ্রন্থে ও প্রত্নতাত্ত্বিক নথিপত্রে। পাহাড়পুর হতে আটাশ মাইল দূরে দীপগঞ্জে একটি বিহারের নির্দশন পাওয়া গেছে। এটি হলুদ বিহার নামে খ্যাত। প্রসঙগত বলা যেতে পারে বগুড়ার শীলবর্ষে এবং নদিয়া জেলার সুবর্ণবিহারও বৌদ্ধ সাধনার কেন্দ্র ছিল। মহীপালের রাজত্বের সময় বিক্রমশীল ও সোমপুরী বিহার ভারত তথা বহির্ভারতের শিক্ষা জগতে মর্যাদা লাভ করে। এসব মহাবিহারের জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তিরা তিব্বত ও অন্যান্য দূর দেশ হতে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন জানবার জন্য আসত। এখানে বৌদ্ধ গ্রন্থাদির রচনা, অনুবাদ ও অনুলিপি করা হত। রামপালের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয় জগদ্দল মহাবিহার। পাল রাজত্বের সময়েই বাংলায় বৌদ্ধধর্ম চরম উৎকর্ষতা লাভ করে এবং এ রাজাদের আমলেই আবার এ ধর্মে নানারূপ বিবর্তন আরম্ভ হয়।

চন্দ্র ও কাম্বোজ বংশীয় রাজারাও পাল রাজাদের মতো বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাঁরাও ছিলেন পরমসৌগত। তাঁদের লেখমালাতেও জোড়ামৃগমূর্তি চিহ্ন আছে। তাঁরাও বহু বছর ধরে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পাল ও চন্দ্রবংশের রাজত্বকালে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন হয়। এদের শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম বিকাশের নতুনত্ব দেখা দিল। অসংখ্য দেবদেবী, ধ্যান-ধারণা, তন্ত্র-মন্ত্রের প্রাধান্য দেখা যায় বৌদ্ধধর্ম ও দেবায়তনে। পালযুগের বৈশিষ্ট্য হল সমন্বয়। বৌদ্ধ পাল রাজারা ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করতেন ও ব্রাহ্মণদের জমি ও ধন প্রভৃতি দান করতেন। পালযুগে শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতি জটিল

বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের কথা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হল না। ধ্যান-ধারণা, তন্ত্র-মন্ত্র, মুদ্রা-ধারণী প্রভৃতির দিকেই আকৃষ্ট হল। তখন মন্ত্র, জপ ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপই প্রাধান্য লাভ করে এবং এটিই বুদ্ধত্ব লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলে বিবেচিত হয়। এরূপে উদ্ভব হল মন্ত্রযানের। ক্রমে ক্রমে এ মন্ত্রযান হতে সৃষ্টি হল বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান। বজ্রযানে বোধিচিত্তের বজ্রস্বভাব লাভই বোধিজ্ঞান। সহজযানে শূন্যতা প্রকৃতি ও করুণা পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে যে সুখ হয় তাই মহাসুখ। এটিই সহজ (সহজাত) সুখ। কালচক্রযানে নিয়ত পরিবর্তনশীল কালচক্র ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নিয়ে চক্রাকারে ঘুরছে। নিজেকে এ কালচক্রের ঊর্ধ্বে নেওয়াই—এ মতের প্রধান উদ্দেশ্য। বজ্রযান, সহযান ও কালচক্রযান ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নয়। এগুলির প্রত্যেকটি মন্ত্রযান ভাবধারার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দিক।

মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনে যে সকল বৌদ্ধাচার্যরা প্রধান ভূমিকা নেন তাঁদের বলা হয় সিদ্ধ বা সিদ্ধাচার্য। তিব্বতে সিদ্ধাচার্যের এখনও পূজা হয়। এখানে অনেক সিদ্ধাচার্যের প্রতিমা মেলে। লুইপাদ ছিলেন সিদ্ধাচার্যদের প্রথম আচার্য। জানা যায় মোট চুরাশি জন সিদ্ধাচার্য ছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ও শক্তি ধর্মের সহিত মিলে গেল। উৎপত্তি হল কৌলধর্ম। এ কৌলধর্মের প্রথম ও প্রধান গুরু হল মৎস্যেন্দ্রনাথ। কৌলধর্মীরা ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম মানতেন। এ সাধনবাদ হতে উদ্ভব হয় নাথ ধর্মের। এ ছাড়া একই গুহ্য সাধনবাদ হতে উদ্ভুত হয় অবধূত ও সহজিয়া ধর্ম। বৌদ্ধ সহজিয়ারা বর্ণাশ্রম মানতেন না। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের মতে এ সব সিদ্ধাচার্যদের ধ্যান ধারণা ও সাধনমার্গ বাংলার বাউলেরাই বেশি বাঁচিয়ে রেখেছেন। বৌদ্ধ জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রকাশ হয় বৌদ্ধাচার্যদের অধ্যবসায়ে ও বৌদ্ধ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা তা প্রকাশ করতেন সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলায় রচিত অসংখ্য গ্রন্থে। প্রাচীন বাংলায় রচিত চর্যাগীতি বা চর্যাপদ নামক একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এখনও পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ গ্রন্থটি আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হতে উদ্ধার করেন। এর মধ্যে সাড়ে ছেচল্লিশটি ছোটো ছোটো গান আছে। মূল গ্রন্থের একটি তিব্বতি অনুবাদও মেলে। বইটির সঙেগ সুবিস্তৃত সংস্কৃত টীকা আছে। এ সব সহজিয়াচার্যদের সাহিত্য হতে ধীরে ধীরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্কুরোদগম হয়। এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, চর্যাপদগুলি বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন।

বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি দেখা দিল সেন-বর্মণ রাজত্বকালে। তখন বৌদ্ধধর্মে দেবদেবীর প্রভাব কমে গেল। বিহারের সংখ্যাও কম ছিল। অভয়াগুপ্তের মতো দুচার জন বৌদ্ধাচার্যের কথা সেনরাজত্বকালে জানা গেলেও বৌদ্ধধর্মের সক্রিয় অবস্থা বিশেষ জানা যায় না। সেন-বর্মণ রাজাদের ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিরাগ। সেন রাজত্বের সময় বৌদ্ধদের বেদবাহ্য পাষণ্ড বলে মনে করা হত। লক্ষণসেন বৌদ্ধধর্মের প্রতি সম্ভবত বিরাগী ছিলেন না। তাঁর তর্পণদীঘি শাসনেও একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের খবর পাওয়া যায়। তা হলেও একদিকে যেমন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ছিল অন্যদিকে মিলন-সমন্বয়েরও কিছু পরিচয় মেলে। বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমন্বয়ের ভাবটাই কিছুটা সক্রিয় হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে বেদ ও যজ্ঞ-

১। কিন্তু খ্রিস্টীয় ৭ম শতকের কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতারচরিত গ্রন্থে বুদ্ধের অবতারের কথা জানা যায়।

বিরোধী ভগবান বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে নবম অবতার রূপে স্থান পেলেন।[১] লক্ষণসেনের সভা কবি জয়দেব গীতগোবিন্দের দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধকে স্মরণ করে এরূপ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন—

'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়-হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে'।

বৌদ্ধ তন্ত্রমার্গী সাধনা ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রের সঙ্গে মিশে গেল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনেও প্রভেদ কমে গেল। ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে মিশে গেল। বিহারে ও সংঘারামে হাজার হাজার ভিক্ষু আর দেখা গেল না। নালন্দা, বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী মহাবিহার তুর্কি আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেল। হাজার হাজার বৌদ্ধ পুথি আগুনে পুড়ে গেল। যাঁরা এ আক্রমণে হতে রেহাই পেলেন তাঁরা নিজেদের উপাস্য দেবদেবী ও পুথি সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন নেপাল, তিব্বত ও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলে।

সেনবংশের পরেও বাংলায় বৌদ্ধধর্ম একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। ১২২০ সালে মহারাজ রণবঙ্কমল্লহরিকালদেবের রাজত্বকালে তাঁর সহজপন্থী প্রধান মন্ত্রী দুর্গোত্তরার এক মন্দির নির্মাণ করান। শ্রুতি-স্মৃতি-আগম প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত রামচন্দ্র বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সিংহলে গিয়ে তাঁর বাকি জীবন কাটান। সিংহলরাজ পরাক্রমবাহু তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেন। গৌড়েশ্বর পরমরাজাধিরাজ মধুসেন পরমসৌগত বলে একটি পাণ্ডুলিপি হতে জানা যায়। ১৪৩৬ সালে জনৈক সৎ বৌদ্ধ করণকায়স্থ ঠাকুর শ্রীঅমিতাভ বেণুগ্রামে বসে বাংলা অক্ষরে শান্তিদেব রচিত বোধিচর্যাবতার পুঁথিটি নকল করেন। তারানাথ বলেন, এ শতকের শেষের দিকে চঙ্গলরাজ নামে জনৈক বাঙালি রাজা তাঁর রানির অনুরোধে বুদ্ধগয়ার মঠগুলির সংস্কার করেন। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম তার স্বরূপ নিয়ে বাংলায় আর বেঁচে রইল না। সেনবংশের পর পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ বৌদ্ধধর্ম ও সম্প্রদায়গুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রের সঙ্গে বাংলায় প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের তন্ত্রসমূহ মিশে গেল। নিজস্ব সত্তা বাংলায় আর থাকল না।

উৎস : বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ১৯৬৬

# বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধন-তত্ত্ব

## শশিভূষণ দাশগুপ্ত

১

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণের সাধনার একটা আভাস পাইতে হইলে আমাদিগকে মুখ্যভাবে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ রচিত চর্যাপদ গুলি এবং দোঁহাগুলিকে আশ্রয় করিতে হয়; কারণ সহজিয়া সাধকগণের মতবাদটি এখানে যেরূপ বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যায় অন্যত্র সেইরূপভাবে তাহা কোথাও পাওয়া যায় না। বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতেও সহজিয়াগণের সাধনার কথা ছড়ানো আছে বটে, কিন্তু সেখানে সহজিয়াদের বৈশিষ্ট্য কিছুই ফুটিয়া ওঠে নাই,—সেখানে নানা প্রকার পূজা-অর্চা, ক্রিয়া-কাণ্ড, তন্ত্র-মন্ত্র, যোগ-সাধনার সহিত সহজিয়াদের সাধনার কথা ছড়াইয়া রহিয়াছে।

সহজিয়াগণের সাধনার কথা বুঝিতে হইলে সহজযানের ইতিহাস সম্বন্ধেও একটা সাধারণ ধারণা থাকা উচিত। মহাযান বৌদ্ধধর্ম হইতেই এই সকল ধারার উদ্ভব। মহাযান তাহার 'মহা যান' লইয়া যখন উপস্থিত হইল তখন সমাজের সর্বস্তরের পারগামী লোকের জন্যই সেখানে স্থান করিতে হইল। বিভিন্ন ধরনের ধর্মবিশ্বাস এবং প্রচলিত সাধন-পদ্ধতি লইয়া নানা ধরনের লোক প্রবেশ লাভ করিল মহাযানের 'মহা যানে'; ফলে আস্তে আস্তে মহাযানও পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিল। মহাযানের মধ্যে ক্রমে দেখা দিল দুইটি মত; 'পারমিতা-নয়' এবং 'মন্ত্র-নয়'। যাঁহারা পারমিতার অনুশীলনের দ্বারা বৌদ্ধ দশভূমি অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বাবস্থা লাভ করিবার চেষ্টা করিতেন তাঁহাদের মত হইল 'পারমিতা-নয়'; কিন্তু অপর দল এত পারমিতার অনুশীলনের উপরে জোর দিলেন না, তাঁহারা জোর দিলেন বিবিধপ্রকারের মন্ত্রের উপরে। এই মন্ত্রের সহিত আসিয়া দেখা দিল 'মুদ্রা' ও 'মণ্ডল'; এই 'মন্ত্র', 'মুদ্রা' ও 'মণ্ডল' লইয়া পত্তন হইল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মই কিছুদিনের মধ্যে সাধারণ নাম গ্রহণ করিল 'বজ্র-যান'। এই বজ্রযানের মধ্যে মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল ব্যতীত নানা প্রকার দেবদেবীর পূজা-অর্চনা, ধ্যান-ধারণা, অন্যান্য তান্ত্রিক ক্রিয়া-বিধি এবং কতকগুলি গুহ্য যোগ-সাধনা প্রবর্তিত হইল। 'বজ্র' শব্দের অর্থ শূন্যতা; সুতরাং বজ্রযানের মূল অর্থ হইল শূন্যতা-যান। বজ্রযানের সবই 'বজ্র'; দেব-দেবী, পূজা-বিধি, উপকরণ সামগ্রী, সাধনাঙ্গ—সবই 'বজ্র' চিহ্নিত। নেপাল তিব্বতে বজ্রযানের আর একটি রূপ দেখা গেল 'কালচক্রযানে'; এই মতে শ্বাস-প্রশ্বাস-প্রবাহকেই ধরা হইয়াছে কাল-প্রবাহের বাহন বলিয়া; সেই শ্বাস-প্রশ্বাস-প্রবাহকে নানাভাবে নিরুদ্ধ

করিয়া কালচক্র (কালের চক্রকে) অতিক্রম করিতে হইবে। সাধনার এই দিকটার উপরে জোর দেওয়াই হইল কালচক্র-যানের বৈশিষ্ট্য।

বৌদ্ধ তন্ত্রাদিতে 'সহজযান' এই নামে বিশেষ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আমরা পাই না। বজ্রযান-পন্থী একদল সাধকের কতকগুলি মতবৈশিষ্ট্য এবং সাধন-বৈশিষ্ট্য লক্ষ করিয়াই এই নামটি পরবর্তী কালে গড়িয়া তোলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সম্প্রদায়ের সাধকগণকে সহজিয়া বলিবার দুইদিক হইতে সার্থকতা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমত ইহাদের 'সাধ্য'ও ছিল 'সহজ'—আবার 'সাধন'ও ছিল সহজ। প্রত্যেক জীবের—প্রত্যেক বস্তুরই একটি 'সহজ' স্বরূপ আছে—ইহাই সকল পরিবর্তনশীলতার ভিতরে অপরিবর্তিত স্বরূপ। এই সহজ-স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া মহাসুখে মগ্ন হইতে হইবে—ইহাই হইল এই পন্থী সাধকগণের মূল আদর্শ—এই জন্যই ইহারা হইলেন সহজিয়া। দ্বিতীয়ত তাঁহারা সাধনার জন্য কোনো বক্রপথ অবলম্বন করিতেন না—গ্রহণ করিতেন সরল সোজা পথ, এইজন্যও তাঁহারা সহজিয়া। এই জন্য সিদ্ধাচার্যরা বলিয়াছেন—

উজুরে উজু ছাড়ি মা জাহুরে বঙ্ক।
নিয়ড়ি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক॥

'ঋজু হইল এই পথ—ঋজুকে ছাড়িয়া কেহ যাইও না বাঁকা পথে; নিকটে আছে বোধি—যাইও না (দূর) লঙ্কায়।'

সিদ্ধাচার্যগণ সর্বত্রই তাঁহাদের দর্শিত পথকে 'উজুবাট' (ঋজুবর্ত্ম) বা সোজা পথ বলিয়াছেন। বাঁকা পথ কাহাকে বলে? শাস্ত্র-তর্ক-পাণ্ডিত্যের পথ, ধ্যান-ধারণা-সমাধির পথ—বিবিধ তন্ত্র-মন্ত্র---আচার-পদ্ধতির পথই হইল বাঁকা পথ সমস্ত লোকেরই হইল এই গর্ব যে 'আমিই হইলাম পরমার্থে প্রবীণ'; কিন্তু কাহ্নপাদ তাঁহার দোঁহায় বলিতেছেন যে 'পরমার্থে প্রবীণ' হইলে কি হইবে,—যাঁহারা পরমার্থ-প্রবীণ তাঁহাদের ভিতরে কোটির মধ্যে একজনও যে 'নিরঞ্জনে লীন' নহেন।

লোঅহ গব্ব সমুব্বহই হউ পরমত্থ পবীণ।
কোড়িহ মাহ এক্কু নহি হোই নিরঞ্জন লীণ॥

পণ্ডিতেরা মান বহন করেন কী লইয়া?—তাঁহাদের মান হইল আগম-বেদ-পুরাণের পাণ্ডিত্য লইয়া; কিন্তু এই যে সত্যের চারিপাশে পাণ্ডিত্যের গুঞ্জন ইহা হইল ঠিক একটি পাকা বেলের চারিপাশে অলির গুঞ্জন। অলি যেমন পাকা বেলের গন্ধ পায়, আর সেই গন্ধে মুগ্ধ হইয়া বেলের চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করিতে থাকে গুঞ্জন—কিন্তু বেলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আসল বস্তুর যথার্থ আস্বাদন করিতে পারে না—পণ্ডিত ব্যক্তি যাঁহারা তাঁহারাও তেমনই পরমাস্বাদ্য 'মহাসুখ' বা 'সহজানন্দে'র চারিপাশে পাণ্ডিত্যের মত্ততা লইয়াই ঘুরিয়া মরে—কিন্তু সত্যের ভিতরে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাকে আস্বাদন করিতে পারে না।

আগম বেঅ পুরাণে পংডিআ মাণ বহন্তি।
পক্ক সিরিফলে অলিঅ জিম বাহেরিঅ ভমন্তি॥

তিল্লোপাদ বলিয়াছেন, যাহা পরমার্থ-তত্ত্ব তাহা হইল সম্পূর্ণ স্ব-সংবেদ্য, নিজের ভিতরেই করিতে হয় তাহার অনুভব; যাঁহারা মন-ইন্দ্রিয়কে প্রধানভাবে অবলম্বন করেন—বুদ্ধি

দ্বারাই লাভ করিতে চান সত্যকে—তাঁহাদের ভিতরে যাহা প্রবেশ করে তাহা কখনই পরমার্থ নয়।—

সঅসংবেঅণ তত্তফল তীলপাঅ ভণন্তি।
জো মণগোঅর পইট্‌ঠই সো পরমত্থ ণ হোন্তি॥

আরও সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন সরহপাদ—

অক্‌খরবাঢ়া সঅল জগু ণাহি ণিরক্‌খর কোই।
তাব সে অক্‌খর ঘোলিআ জাব ণিরক্‌খর হোই॥

অক্ষরে বদ্ধ হইয়া আছে সকল জগৎ—নিরক্ষর নাই কেহই; কিন্তু এই সকল অক্ষর যাইবে ঘোলাইয়া যখন কেহ হইতে পারিবে 'নিরক্ষর'।

এই শাস্ত্র-তর্ক পাণ্ডিত্যের পথকে যেমন সহজিয়ারা বাঁকা পথ বলিয়াছেন, তেমনই বাঁকা পথ বলিয়াছেন সকল ক্রিয়া-কাণ্ডের বাহ্যাড়ম্বরকে—সকল প্রকার যোগের 'ভড়ং' এবং সিদ্ধাইকে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, 'সহজ'ই ছিল বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধ্য—অর্থাৎ—আমাদের রূপের মধ্যে যে একটি 'অরূপ' সত্তা রহিয়াছে—শরীরের মধ্যে যে এক অশরীর রহিয়াছে—তাহাকে উপলব্ধি করাই হইল চরম লক্ষ্য। চর্যাকার এবং দোহাকারগণ বার বার বলিয়াছেন,—এই 'সহজ' হইল বাক্য-মনের অগোচর—সুতরাং তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিবার কোনও উপায় নাই—শুধু কোনও রূপে তাহার অনুভূতির একটা আভাস-ইঙ্গিত দেওয়া যাইতে পারে মাত্র। সরহপাদ ভারী চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন, নিজের স্বভাব নিজেই জানা যায়—অন্যে তাহার কথা কী করিয়া বলিবে? শুধু গুরুর উপদেশই পারে তাহা দেখাইয়া দিতে—অন্য কিছুতে নয়।

ণিঅ-সহাব ণউ কহিঅউ অণ্ণেঁ।
দীসই গুরু উবএসেঁ ণ অণ্ণেঁ।।

যাঁহারা নিপুণ যোগী তাঁহাদের মন নিঃশেষে যায় বিলীন হইয়া সহজের মধ্যে—যেমন জল যায় নিঃশেষে বিলীন হইয়া জলের মধ্যে।

ণিঅ মণ মুণহু রে ণিউণে জোই।
জিম জল জলহি মিলন্তে সোই॥

বৌদ্ধতন্ত্রে দেখিতে পাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে সহজই হইল স্বরূপ—সমস্ত জগতেরই মূল-স্বরূপ—সুতরাং স্বরূপই নির্বাণ—অতএব সহজই হইল নির্বাণ।

তস্মাৎ সহজং জগৎ সর্বং সহজং স্বরূপমুচ্যতে
স্বরূপমেব নির্বাণং বিশুদ্ধাকার চেতসঃ॥ (হেবজ্র-তন্ত্র)

অন্যত্র বলা হইয়াছে 'স্বভাবং সহজমিত্যুক্তং' (ওই),—স্ব-ভাবই হইল সহজ। সেই সহজ একদিকে দেহস্থ—কারণ দেহের মধ্যে তাহার বাস,—কিন্তু দেহস্থ হইলেও সে দেহস্থ নয়,—'দেহস্থোহপি ন দেহজঃ, (ওই)। দোহাকারগণ বলিয়াছেন,—সহজ হইল আদি রহিত এবং অন্ত রহিত—এই যে আদি-অন্ত-রহিত শাশ্বত স্বরূপ ইহাকেই বজ্রগুরুগণ অভিহিত করেন অদ্বয় বলিয়া।

আই-রহিঅ এহু অন্ত রহিঅ।
বরগুরু-পাঅ অদ্দয় কহিঅ॥
এই সহজ— গুণ-দোস রহিঅ এহু পরমত্থ।
সঅসংবেঅণ কেবি ণত্থ॥
... ... ...
বণ্ণ বি বজ্জই আকিই বিহুণ্ণ।
সব্বাআরে সো সম্পুণ্ণ॥

ইহা হইল সর্বপ্রকারের গুণ-দোষ রহিত—ইহাই হইল পরমার্থ; ইহা হইল স্ব-সংবেদ্য তত্ত্ব—ইহা সর্বপ্রকারের বর্ণবিবর্জিত এবং আকৃতিবিহীন; সর্বাকারে এই সহজ আছে সম্পূর্ণ হইয়া।

সরহপাদ তাঁহার দোঁহাতে বলিয়াছেন,—

সঙ্কপাস তোড়হু গুরুবঅণেঁ।
ণ্ণ সুণই সোণউ দীসই নঅণেঁ॥
পবণ বহন্তে ণ্ণউ সো হল্লই।
জলণ জলন্তে ণ্ণউ সো উজ্ঝাই॥
ঘণ বরিসন্তে ণ্ণউ সো স্মই।
ণউ বজ্জই ণউ খঅহি পইস্‌সই॥
ণউ বট্টই ণ তণুন্তে ণ বজ্জই।
সমরস সহজাণন্দ জাণিজ্জই॥

শঙ্কাপাশ সব ছিঁড়িয়া ফেল গুরুর বচনে; এই শঙ্কা দূরীভূত হইয়া গেলে আভাস পাওয়া যাইবে সহজের, যাহাকে শ্রবণ কখনও শোনে না, চোখের দ্বারা যাহাকে যায় না দেখা। পবন বহিলে তাহা শব্দায়মান হয় না, জ্বলন (অগ্নি) জ্বলিলে তাহা পোড়ে না; ঘন বর্ষায় তাহা ভেজে না, তাহা বাড়েও না—তাহা ক্ষয়প্রাপ্তও হয় না। তাহা (একস্থানে) থাকে না, বিস্তৃতও হয় না—কোথাও যায়ও না,—সমরসই হইল সহজানন্দ।

*'সহজে'র এই বর্ণনা পাঠ করিলে আমরা লক্ষ করিতে পারিব, ইহা গীতা প্রভৃতি* জনপ্রিয় শাস্ত্রে দেহের ভিতরকার যে অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, স্থাণু, অচল এবং সনাতন দেহীর কথা বলা হইয়াছে সেই বর্ণনার সহিতই সমসূত্রে গ্রথিত। আমাদের এই ক্ষেত্রে লক্ষ করা প্রয়োজন কী করিয়া অনাত্মবাদী বৌদ্ধধর্ম হইতে উদ্ভূত তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বা সহজিয়াগণ এমন করিয়া স্পষ্ট আত্মবাদে না হোক, একটা স্বরূপ-বাদে আসিয়া পৌঁছিল। দীর্ঘকালের চিন্তার আবর্তনের ভিতর দিয়া এই পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে।

২

বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনার দিক হইতে আর একটি তথ্য এই প্রসঙ্গে লক্ষ করিতে হইবে, তাহা হইল এই যে, চরম 'সাধ্য' রূপে তাঁহারা যে সহজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেই সহজকে তাঁহারা 'সহজ' রূপেও উল্লেখ করিয়াছেন, আবার 'সহজানন্দ'রূপেও উল্লেখ

করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে 'সহজ'ই 'সহজানন্দ'। সে কথার তাৎপর্য কী? তাৎপর্য হইল এই যে সহজ-স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই নির্বিকল্প পরম আনন্দ হয়—সেই নির্বিকল্প পরম আনন্দই হইল সহজানন্দ। সেই সহজানন্দকেই সহজিয়া বৌদ্ধগণ বলিয়াছেন 'মহাসুখ'। বৌদ্ধতন্ত্রে এই 'মহাসুখে'র দীর্ঘ ইতিহাস রহিয়াছে।

প্রাচীন বৌদ্ধগণ যে চরম লক্ষ্য নির্বাণের কথা বলিয়াছেন সেই নির্বাণের স্বরূপ কী ইহা লইয়া অদ্যাবধি পণ্ডিতমহলে বিতর্কের অন্ত নাই। নির্বাণ কথাটি সাধারণত নির্+বা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হয়,—অর্থ হইল নিভিয়া যাওয়া—নিঃশেষ হইয়া যাওয়া,—যেমন দীপধারা স্নেহক্ষয়ে নিভিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। এই নিভিয়া যাওয়া বা জুড়াইয়া যাওয়ার অর্থটি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে পালি 'মহাভিনিক্খমণ' সূত্রে (নিদান-কথা)। সেখানে দেখি, যুবরাজ সিদ্ধার্থের অনিন্দ্যরূপে মুগ্ধ হইয়া 'কিসা-গোতমী' নামক একটি ক্ষত্রিয় কন্যা অলিন্দ্য হইতে একটি গান করিয়াছিল,—

নিব্বুতা নূন সা মাতা নিব্বুতো নূন সো পিতা।
নিব্বুতা নূন সা নারী যস্‌সা'য়ং ইদসো পতি॥

অর্থাৎ 'জুড়াইয়া গিয়াছে সেই মা (মায়ের হৃদয়) যাঁহার এমন ছেলে, জুড়াইয়া গিয়াছে সেই পিতা (পিতার হৃদয়) যাঁহার এমন ছেলে—জুড়াইয়া গিয়াছে সেই স্ত্রী (স্ত্রীর হৃদয়) যাঁহার এমন স্বামী।' এই কথাটির ভিতরকার 'নিব্বুত' (নির্বৃত) কথাটি যুবরাজ সিদ্ধার্থকে ভাবাইয়া তুলিল; তিনি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এই কন্যাটি তাহার গানে বলিল, মায়ের হৃদয় জুড়াইয়া যায়, পিতার হৃদয় জুড়াইয়া যায়—স্ত্রীর হৃদয় জুড়াইয়া যায়,—কিন্তু সত্য সত্যই কি জুড়াইয়া গেলে মায়ের হৃদয়, পিতার হৃদয়, স্ত্রীর হৃদয়—সকলের হৃদয়ই জুড়াইয়া যায়? তাহাই দেখা দিল কুমারের মনে একটা মহা জিজ্ঞাসার রূপে, কস্মিং নু খো নিব্বুতে হৃদয়ং নিব্বুতং নাম হোতি?

এই মহাজিজ্ঞাসার উত্তর কুমার সিদ্ধার্থ নিজের বিষয়বিরক্ত ধ্যানপরায়ণ মনের মধ্যেই লাভ করিলেন; তিনি বুঝিলেন,—'রাগগ্‌গিম্‌হি নিব্বুতে নিব্বুতং নাম হোতি, দোসগ্‌গিম্‌হি মোহগ্‌গিম্‌হি নিব্বুতে নিব্বুতং নাম হোতি'—হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছে যে রাগের আগুন, যে দ্বেষের আগুন, যে মোহের আগুন—সেই আগুন নির্বাপিত হইলেই আসে হৃদয়ের যথার্থ নির্বাণ। কুমার ভাবিলেন, এই কন্যাটি তো আমাকে বড়ই সুন্দর সংগীত শুনাইয়াছে,—আমি এই 'নির্বাণে'র সন্ধান করিয়াই বেড়াইব, 'অহং হি নিব্বাণং গবেসন্তো চরামি।'

এখানে দেখিতেছি হৃদয়ের আগুন নিভাইয়া ফেলাই হইল নির্বাণ। এই নির্বাণকে পালি শাস্ত্রে আরও অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাই। সেখানে সমগ্র জীবন-প্রবাহকেই একটি প্রদীপকে অবলম্বন করিয়া প্রজ্বলিত আলোশিখার প্রবাহের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; বাসনাই হইল এই জীবনদীপে 'স্নেহ'-স্বরূপ; স্নেহক্ষয়ে যেমন দীপের আলোশিখা-প্রবাহ একেবারে নিভিয়া যায়, সেইরূপ সর্ববাসনা ক্ষয় হইলে—ক্লেশাবরণ এবং জ্ঞেয়াবরণ নষ্ট হইলে সুখদুঃখময় জীবন-প্রবাহ নিঃশেষে থামিয়া যায়—ইহাই নির্বাণ।

কিন্তু ইহা তো নির্বাণের একটা নঙর্থক (negative) বর্ণনা মাত্র হইল; সব নিভিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবার অর্থ কী? কিছুই কি থাকে না? দার্শনিকগণ এ-বিষয়ে স্পষ্ট কোনও জবাব দেন নাই। যে জবাব দিয়াছেন তাহা হইতেও কেহ ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছি কিছুই থাকে না—কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছি কিছু থাকে। সেই দার্শনিক তর্কে এখানে প্রবেশ

করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গে এইটুকু লক্ষ করিতে পারি যে, দার্শনিকগণ নির্বাণকে যতই নেতিমার্গে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করুন না কেন পালি শাস্ত্রে ও সাহিত্যে—এবং পরবর্তী বৌদ্ধ-সাহিত্যে নির্বাণ একটা পরম 'নাস্তিত্ব' মাত্র নয়,—নির্বাণই সুখ, নির্বাণই শান্তি। অশ্বঘোষ তাঁহার 'সৌন্দরানন্দ কাব্যে' যেখানে নির্বাণের সঙ্গে দীপ-নির্বাণের তুলনা দিয়াছেন সেখানে তিনিও বলিয়াছেন যে দীপ যেমন 'স্নেহক্ষয়াৎ শান্তিমত্যন্তমেতি'—স্নেহক্ষয়বশত নির্বাপিত হইয়া অত্যন্ত শান্তি লাভ করে, জীবন-প্রদীপও 'ক্লেশক্ষয়াৎ শান্তিমত্যন্তমেতি'—ক্লেশক্ষয়ে অত্যন্ত শান্তি লাভ করে। এই যে অত্যন্ত শান্তি লাভ করার সত্যটি তাহা পালি 'মিলিন্দ-পঞ্‌হোর'র মধ্যে নির্বাণ সম্বন্ধে বহু আলোচনার প্রসঙ্গে অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে লক্ষ করিতে পারি। পালিশাস্ত্রে এই নির্বাণকে বলা হইয়াছে 'পরং', 'সন্ত' (শান্ত), 'বিসুদ্ধ' (বিশুদ্ধ), 'সন্তি' (শান্তি), 'অক্‌খর' (অক্ষর), 'ধ্রুব', 'সচ্চ' (সত্য), 'অনন্ত', 'অচ্যুত', 'সস্‌সত' (শাশ্বত). 'অমত' (অমৃত), 'অজাত', 'কেবল', 'সিব' (শিব)।[১] 'সুত্তনিপাতে' দেখিতে পাই নির্বাণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে— 'সন্তী'তি নিব্বাণং ঞত্বা অর্থাৎ নির্বাণকে শান্তি বলিয়া জানিয়া। ধম্মপদে একাধিক স্থানে বলা হইয়াছে, 'নিব্বাণং পরমং সুখং'। 'অঙ্গুত্তর-নিকায়ে' বলা হইয়াছে—

ওধুনিত্বা মলং সব্বং পত্বা নিব্বাণ সম্পদং।
মুচ্চেতি সব্বদুঃখেহি সা হোতি সব্ব সম্পদা॥[২]

'বিমান-বত্থু'তে নির্বাণকে বলা হইয়াছে অচল স্থান—যেখানে গিয়া আর শোক করিতে হয় না—'পত্তা তে অচলট্‌ঠানং যথা গত্বা ন সোচরে'। 'থেরীগাথা'য় সমজাতীয় উক্তি দেখিতে পাই,—'নিব্বাণ ট্‌ঠানে বিমুত্তা তে পত্তা তে অচলং সুখং'!

নির্বাণকে এই যে পরম সুখ বা পরম শান্তি বলিয়া বর্ণনা পরবর্তী কালের তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ এইখান হইতে তাঁহাদের সাধ্যবস্তুর ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টভাবেই বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করিলেন যে পরম সুখই হইল নির্বাণের স্বরূপ—তাঁহারা ইহার নাম দিলেন 'মহাসুখ'। কিন্তু তাঁহারা এইখানেই থামিলেন না; তাঁহারা বলিলেন নির্বাণ যে মহাসুখ তাহা নহে—মহাসুখই হইল নির্বাণ। একটি বিশেষ প্রকারের সাধনা দ্বারা চিত্তকে যদি এই মহাসুখের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দেওয়া যায় তবে যাহা বাকি থাকে—তাহাই স্বরূপ—তাহাই হইল সহজ; মহাসুখের মধ্যে সমস্ত সঙ্কল্প-বিকল্পের বিলয় ঘটিলেই এই সহজ-স্বরূপে অবস্থান ঘটে; সুতরাং মহাসুখই হইল সহজানন্দ। এই সহজানন্দ বা স্বরূপানুভূতির ক্ষেত্রে কোনও জ্ঞাতৃত্ব জ্ঞেয়ত্ব বা গ্রাহকত্ব গ্রাহ্যত্ব থাকে না; গ্রাহ্যত্ব-গ্রাহকত্ব-বর্জিত যে স্বরূপ তাহাই হইল অদ্বয় স্বরূপ, অদ্বয়ই হইল সহজ—সহজই হইল মহাসুখ। সুতরাং এই মহাসুখে স্থিতি লাভের দ্বারা যে অদ্বয়ে বা সহজে স্থিতি, ইহাই হইল বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধনার মূল লক্ষ্য। আবার দেখিতে পাইব, এই অদ্বয় মহাসুখে বা সহজে প্রতিষ্ঠা এবং বোধিচিত্ত লাভ সহজিয়াগণের নিকটে একই কথা—কারণ অদ্বয়ই হইল বোধিচিত্ত।

বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধনার কথা বুঝিতে হইলে এই বোধিচিত্তের ধারণাটাও ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে। বৌদ্ধশাস্ত্রে বোধিচিত্ত শব্দের অর্থ হইল বোধিলাভের জন্য এবং

---

১ এই প্রসঙ্গে রিস্ ডেভিড্‌স্ কৃত 'পালি ভাষার অভিধান' গ্রন্থে 'নির্বাণ' শব্দটি দ্রষ্টব্য।

২ উপরিউক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত।

সেই বোধিলাভের দ্বারা সর্বভূতের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত একটি 'চিত্ত'—অর্থাৎ দৃঢ় চেতনা বা সঙ্কল্প উৎপাদন করা। এই বোধিচিত্ত উৎপন্ন হইলেই চিত্তের ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়—দশটি ভূমি অতিক্রম করিয়া চিত্ত 'ধর্মমেঘ' রূপ দশভূমিতে স্থিতি লাভ করে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে এই বোধিচিত্ত একটি বিশেষ অর্থগ্রহণ করিল। শূন্যতা এবং করুণার অভিন্নাবস্থাকেই বলা হয় বোধিচিত্ত—'শূন্যতা-করুণা-ভিন্নং বোধিচিত্তং তদুচ্যতে'। এই শূন্যতা এবং করুণার অভিন্নত্বের তাৎপর্য কী? এই তাৎপর্য নানা দিক হইতে লক্ষ করা যাইতে পারে। ধর্মমতের দিক হইতে বলা যাইতে পারে, বৃহত্তর সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া শুধুমাত্র শূন্যতা-সাধনের দ্বারা নির্বাণ লাভের চেষ্টা না করিয়া করুণা অবলম্বনে বিশ্বজীবের মঙ্গলের জন্য কুশলকর্মের পথ গ্রহণ করাই হইল এই বোধিচিত্ত-সাধনার তাৎপর্য। এই শূন্যতাকে বলা হয় 'প্রজ্ঞা'—কারণ শূন্যতা-জ্ঞানই তো হইল প্রজ্ঞা; আর করুণাকে বলা হয় 'উপায়'—কারণ করুণাই বিশ্বজীবের মঙ্গলের উপায়। এই 'প্রজ্ঞোপায়ে'র মিলন হইতেই লাভ হয় বোধিচিত্ত। দর্শনের দিক হইতে শূন্যতাই হইল গ্রাহক—principle of subjectivity; আর করুণা হইল গ্রাহ্য—principle of objectivity; এই গ্রাহ্য-গ্রাহকত্বের দুইটি প্রবহমাণ ধারা নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায় যে অদ্বয়তত্ত্বে সেই অদ্বয়তত্ত্বই হইল বোধিচিত্ত—তাহাই সহজস্বরূপ। যোগ-সাধনার দিক হইতে দেখিতে পাইব, আমাদের দেহের মধ্যে তিনটি প্রধান নাড়ী আছে—একটি বামগা—শ্বাসবাহী নাড়ী বা প্রাণবাহীনাড়ী,—অপরটি হইল দক্ষিণগা—প্রশ্বাসবাহী নাড়ী বা অপানবাহী নাড়ী; এই দুই হইল দেহমধ্যে সর্বপ্রকার দ্বৈততত্ত্বের প্রতীক বা প্রতিনিধি; আর একটি নাড়ী আছে মধ্যগা নাড়ী—তাহাকে বৌদ্ধতন্ত্রে বলা হয় অবধূতি বা অবধূতিকা; উভয় নাড়ীর ক্রিয়া এবং ধারাকে অবলম্বন করিয়া চলে সংসারের গতি—ইহারাই একটি 'ভব' (অস্তিত্ব) অপরটি 'নির্বাণ' (অনস্তিত্ব)—একটি সৃষ্টি—অপরটি সংহার—একটি 'ইতি', অপরটি 'নেতি'; এই উভয়ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া *তাহাদের স্বাভাবিক নিম্নগা ধারাকে অবধূতিকা পথে ঊর্ধ্বগা করিতে পারিলে অদ্বয় বোধিচিত্ত* বা সহজানন্দ মহাসুখ লাভ হয়।

হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়বিধ তন্ত্রশাস্ত্রে আমরা লক্ষ করিতে পারি, একটি অদ্বয় তত্ত্বই হইল পরমতত্ত্ব। এই পরম অদ্বয় তত্ত্বের দুইটি ধারা—হিন্দুমতে একটি হইল শিব—অপরটি শক্তি। গুণাতীত নিষ্কল শিব হইলেন বিন্দু—তাহাই হইল নিবৃত্তিতত্ত্ব; আর ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি হইলেন নাদ—ইহাই হইল প্রবৃত্তিতত্ত্ব; এই বিন্দু-নাদ—নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি—ইহাদের মিলনের নিম্নগা ধারায় হইল সংসারপ্রবাহ,—আর তাহাদেরই মিলনের ঊর্ধ্বগা ধারায় হইল অদ্বয়ে প্রতিষ্ঠা—সহজানন্দ বা মহাসুখ-প্রাপ্তি। অদ্বয় বোধিচিত্তেরও তাই একটি সাংবৃতিক রূপ রহিয়াছে—আর একটি পরমার্থিক রূপ রহিয়াছে। শূন্যতা এবং করুণাই হইল বৌদ্ধমতে অদ্বয় বোধিচিত্তের দুইটি ধারা—একটি প্রজ্ঞা—অপরটি উপায়,—একটি বিন্দু—অপরটি নাদ; একটি নিবৃত্তি—অপরটি প্রবৃত্তি। এই প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলনের নিম্নধারায় হইল বহিঃসৃষ্টি—জরামরণ দুঃখ দৌর্মনস্যের জীবন-যাত্রা; তাহাদের মিলনের একটি ঊর্ধ্বধারা আছে—এই ঊর্ধ্বধারার পথই হইল অবধূতিকা মার্গ; সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া 'স্রোতে উজাইয়া' চলিতে পারিলেই হয় অদ্বয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ—সেই প্রতিষ্ঠাতেই হয় যে মহাসুখ লাভ তাহাই হইল সহজানন্দ—তাহাই হইল 'সামরস্য'। নিবৃত্তি-রূপিণী শূন্যতাকে

অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয় একটি রস—প্রবৃত্তি-রূপী করুণাকে অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয় সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্মের আর একটি রস;—এই উভয় রসের ধারাই স্বাভাবিকভাবে নিম্নগা। এই উভয় রস যদি মধ্যমার্গে আসিয়া মিশিয়া একেবারে এক হইয়া যায়—তবেই তাহা হয় 'সমরস'; এই 'সমরসে'র বিশুদ্ধি হইল ঊর্ধ্বস্রোতে; অবধূতিকামার্গকে অবলম্বন করিয়া এই সমরসের ধারা যখন সর্বোর্ধ্ব অবস্থিতি লাভ করে তখনই তাহা পরিশুদ্ধ 'সামরস্য' রূপ লাভ করিল। এই পরিশুদ্ধ সামরস্যের পূর্ণতম রূপই হইল সহজানন্দ—তাহাই অদ্বয় বোধিচিত্ত। এই মহাসুখ বা সহজানন্দ বা অদ্বয় বোধিচিত্ত লাভই হইল বৌদ্ধসহজিয়াগণের চরম লক্ষ্য। 'অশরীরী কেহ আছে শরীরে লুকাইয়া, যে তাহাকে জানে সে-ই হয় মুক্ত।'

৩

এই তো গেল মোটামুটি ভাবে বৌদ্ধ সহজিয়াদের চরম লক্ষ্যের কথা; এইবারে আসা যাক তাঁহাদের সাধনার কথায়। সাধনার দিক হইতে আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের সাধনা মূলত তান্ত্রিক সাধনা। এই তান্ত্রিক সাধনা বলিতে আমরা কী বুঝি? এ-বিষয়েও অনেক সংশয় এবং তর্ক রহিয়াছে—আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহি না। তন্ত্র-সাধনার বহু বহিরঙ্গ দিক রহিয়াছে; সহজিয়া সাধকগণ সর্বদাই বহিরঙ্গ-বিরোধী ছিলেন; তাই তাঁহারা তন্ত্রের বহিরঙ্গ সাধনা ছাড়িয়া মূল সাধনার উপরেই জোর দিয়াছেন। তন্ত্র-সাধনার মূল কথা হইল দেহ-সাধনা—অর্থাৎ দেহকেই যন্ত্র করিয়া তাহার ভিতর দিয়াই পরম সত্যকে উপলব্ধি করার সাধনা। তন্ত্রমতে দেহভাণ্ডটিই হইল ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্ররূপ—সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে যাহা কিছু সত্য নিহিত আছে, তাহার সবই নিহিত আছে এই দেহভাণ্ডের মধ্যে। সহজিয়ারা বলেন, আমাদের দেহের ভিতরে অবস্থান করিতেছে যে সহজ-স্বরূপ তাহাই হইল বুদ্ধস্বরূপ। বুদ্ধ তো তাহা হইলে অশরীরী রূপে এই শরীরের মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন—

অসরির কোই সরিরহি লুকো।
জো তহি জানই সো তহি মুক্কো॥

'অশরীরী কেহ আছে শরীরে লুকাইয়া, যে তাহাকে জানে সেই হয় মুক্ত।'

ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেক্খই পড়িবেসী পুচ্ছই॥

'ঘরে (দেহ ঘরে) আছে, বাহিরে জিজ্ঞাসা করিতেছে; (ঘরে) পতি দেখিতেছে, কিন্তু প্রতিবেশীকে (তাহার খোঁজ) জিজ্ঞাসা করিতেছে।'

আবার বলা হইয়াছে,—

পণ্ডিঅ সঅল সত্থ বক্খাণই।
দেহহিঁ বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই॥

'পণ্ডিত সকল করেন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান, জানেন না সেই বুদ্ধকে যিনি বাস করেন দেহের মধ্যেই।'

সরহপাদ আরও চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন—

এখু সে সুরসরি জমুণা
এখু সে গঙ্গাসাঅরু।
এখু পআগ বণারসি
এখু সে চন্দ দিবাঅরু॥
ক্খেত্তু পীঠ উপপীঠ এখ
মইঁ ভমই পরিট্ঠও।
দেহা সরিসঅ তিথ মইঁ
সুহ অণ্ণ ণ দীট্ঠও॥

'এখানেই (এই দেহেই) সেই সুরসরিৎ (গঙ্গা) ও যমুনা, এখানেই সেই গঙ্গাসাগর; এখানেই প্রয়াগ বারাণসী, এখানেই হইল চন্দ্র দিবাকর; ক্ষেত্র, পীঠ, উপপীঠ—সবই হইল এখানে, বহু ঘুরিয়া এই বুঝিয়াছি—দেহ সদৃশ তীর্থ এবং সুখ আর কোথাও দেখা গেল না।'

চর্যাপদগুলির মধ্যে আমরা বহু ভাবে দেখিতে পাই এই দেহকে অবলম্বন করিয়া সাধনার কথা। কোথাও দেখিতে পাই 'দেহ নঅরী'তে বিহারের কথা,—কোথাও দেখিতে পাই 'কায় নৌকা'কে ভব-সমুদ্রের ভিতরে বাহিয়া যাইবার কথা। চর্যাকারগণও বার বার বলিয়াছেন, অতি নিকটেই—এই দেহেই আছে বোধি—বোধিলাভের জন্য প্রয়োজন নাই লঙ্কায় যাইবার; 'নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক।' কোথাও বলা হইয়াছে কায়রূপ মায়াজাল বহিবার কথা—'বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল'; 'কোথাও দেহকে বলা হইয়াছে রথ (জো রথে চড়িলা বাহবা ন জাই ইত্যাদি), কোথাও দেহকে বীণা করিয়া বাজাইবার কথা হইয়াছে (বাজই আলো সহি হেরুঅ বীণা); দেহকে নৌকা করিয়া নৌকা বাহিবার রূপকই গ্রহণ করা হইয়াছে সব চেয়ে বেশি।

দেহকে যন্ত্ররূপে অবলম্বন করিয়া সহজানন্দরূপ পরম সত্যকে দেহের মধ্যেই অনুভব করিতে হয়, এই মতকেই সাধনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ—তথা বৌদ্ধ সহজিয়াগণ দেহের মধ্যে কতকগুলি চক্র বা পদ্মের কল্পনা করিয়াছেন, এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের ত্রিকায়ের সহিত একটি সহজকায়, বা স্বাভাবিককায় বা বজ্রকায়ের যোগ করিয়া এই চারি কায়কে এই চারি চক্রে বা চারি পদ্মে স্থাপন করিয়াছেন। হিন্দুতান্ত্রিক মতে আমরা ষট্চক্র বা ষট্পদ্মের পরিকল্পনা দেখিতে পাই, বৌদ্ধতন্ত্রে সেখানে পাই চারিচক্র বা পদ্ম। প্রথম চক্র হইল নাভিতে, দ্বিতীয় চক্র হৃদয়ে, তৃতীয় কণ্ঠে, চতুর্থ মস্তকের সর্বোচ্চ দেশে (তুলনীয় হিন্দুমতে সহস্রার)। নাভিতে হইল নির্মাণকায়তত্ত্বের অবস্থিতি, সুতরাং নাভিতে হইল নির্মাণ-চক্র; এইরূপ হৃদয়ে ধর্মচক্র, কণ্ঠে সম্ভোগ-চক্র, (মহাজান মতানুসারে অবশ্য হৃদয়ে সম্ভোগ-চক্র এবং কণ্ঠে ধর্মচক্র হওয়া উচিত ছিল, কারণ নির্মাণকায়ের পরে সম্ভোগকায়—তাহার পরে ধর্মকায়) এবং মস্তকস্থিত 'উষ্ণীষ চক্রে' হইল 'সহজ-চক্র' বা 'মহাসুখচক্র'; বোধিচিত্তের স্থিতি এই উষ্ণীষ কমলে।

আমরা দেখিয়াছি, বোধিচিত্তের দুইটি ধারা, প্রজ্ঞারূপিণী শূন্যতা—এবং উপায়রূপ করুণা। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, ইহারাই বিন্দু ও নাদ-তত্ত্ব, গ্রাহক ও গ্রাহ্য-তত্ত্ব, নিবৃত্তি

ও প্রবৃত্তি-তত্ত্ব। বাম নাসারন্ধ্র হইতে প্রবাহিত হয় যে বামগা নাড়ী (হিন্দুতন্ত্র মতে ইড়া) তাহাই হইল প্রজ্ঞারূপিণী, দক্ষিণ নাসারন্ধ্র হইতে প্রবাহিত হয় যে দক্ষিণগা নাড়ী তাহাই হইল উপায়রূপিণী (হিন্দুতন্ত্র মতে পিঙ্গলা); আর এই দুই নাড়ীর ঠিক মধ্যভাগ হইতে প্রবাহিত যে নাড়ী (হিন্দুতন্ত্র মতে সুষম্না) তাহাই হইল আমাদের পূর্বব্যাখ্যাত অবধূতী বা অবধূতিকা—ইহাই হইল অদ্বয় বোধিচিত্ত বা সহজানন্দ লাভের জন্য মধ্যমার্গ। আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, নানাভাবে এই মধ্যপথের কথা বলা হইয়াছে। সহজিয়াদের মধ্যপথের সাধনা হইল এই অবধূতিকা-মার্গকে অবলম্বন করিয়া। এই যে বামগা এবং দক্ষিণগা নাড়ী—ইহারাই হইল শূন্যতা-করুণা, প্রজ্ঞা-উপায়, বিন্দু-নাদ, নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি, গ্রাহক-গ্রাহ্য প্রভৃতি সর্বপ্রকারের দ্বৈতত্বের প্রতীক। এই দ্বৈতত্বের প্রতীক নাড়ীদ্বয়কে আরও অনেক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সাধারণ ভাবে দেহের বামদিকে শূন্যতা-রূপিণী প্রজ্ঞাতত্ত্ব এবং দক্ষিণদিককে করুণারূপ উপায়তত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। শূন্যতা বজ্র বলিয়া বামগা নাড়ী বজ্র, দক্ষিণগা নাড়ী সৃষ্ট্যাত্মক উপায়ের প্রতীক বলিয়া পদ্ম বলিয়াও অভিহিত হয়; ইহারা কুলিশ-কমল নামেও খ্যাত। শূন্যতা স্বতন্ত্রা বলিয়া বামগা নাড়ী স্বর (বা 'আলি' অর্থাৎ অকারাদিক্রমে বর্ণমালা) আর করুণা বা উপায় পরতন্ত্র বলিয়া দক্ষিণগা নাড়ী ব্যঞ্জন (বা 'কালি'—অর্থাৎ ক-কারাদি ক্রমে বর্ণমালা)। বামা হইল গঙ্গা নদী, দক্ষিণা যমুনা; বামা চন্দ্র (বা শশী), দক্ষিণা সূর্য (বা রবি); বামা রাত্রি, দক্ষিণা দিবা; এইরূপে আমরা আরও নাম দেখিতে পাই, যেমন—প্রাণ-অপান, ললনা-রসনা, চমন-ধমন, এবং ভব-নির্বাণ ইত্যাদি। সাধনার ক্ষেত্রে এই নামগুলি নাড়ীদ্বয় বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়াছে, আবার সাধারণভাবে সর্বপ্রকারের দ্বৈতত্ব বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেখানেই বাম দক্ষিণ ছাড়িয়া মধ্যপথের কথা বলা হইয়াছে-সেইখানেই অবধূতিকা মার্গ ঊর্ধ্বস্রোতে অদ্বয়-বোধিচিত্তের পথ বা মহাসুখ বা সহজানন্দের পথ বুঝিতে হইবে।

সহজিয়াগণের আসল সাধনা হইল সর্বপ্রকারের দ্বৈত-বিবর্জিত হইয়া অদ্বয় মহাসুখে বা সহজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকা। তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরমার্থ অনুভূতির জন্য তাঁহারা যে সাধনা করিতেন দেহই তাহার অবলম্বন বলিয়া নাড়ী-চক্রাদি অবলম্বিত সাধনার উপরে তাঁহারা জোর দিয়াছেন। প্রথমে বামা ও দক্ষিণা নাড়ীদ্বয়কে নিঃস্বাভাবীকৃত করিতে হইবে। তাহাদের ক্রিয়াধারা স্বাভাবিকভাবে নিম্নগা; এই নিম্নগা ধারাকে যোগের সাহায্যে প্রথমে বিশুদ্ধ করিয়া রুদ্ধ করিতে হইবে—তাহার পরে সমস্ত ধারাকে একীকরণের সাধনা; যখন সব ধারা একীকৃত হইল মধ্যমার্গে—তখন সেই মধ্যমার্গে তাহাকে করিতে হইবে ঊর্ধ্বগা। সেই ঊর্ধ্বগা ধারাই আনন্দের ধারা; সেই আনন্দের মধ্যে অনুভূতির তারতম্য আছে; প্রথমে যে ঊর্ধ্বস্পন্দনাত্মক আনন্দানুভূতি তাহার নাম আনন্দ,—দ্বিতীয়ানুভূতি হইল পরমানন্দ—তৃতীয়ানুভূতি বিরমানন্দ—চতুর্থানুভূতি হইল সহজানন্দ। এই চতুর্থানুভূতি সহজানন্দই হইল চতুর্থশূন্য প্রকৃতিপ্রভাস্বর সর্বশূন্য। বোধিচিত্ত উষ্ণীষ-কমলস্থিত চন্দ্র,—সহজানন্দেই ঘটে সেই চন্দ্র হইতে অমৃতক্ষরণ।

এই সহজানন্দের সাধনা—এই মহাসুখের সাধনা—বা এই অদ্বয় বোধিচিত্তের সাধনার কথা ছড়াইয়া আছে বহু চর্যাপদের মধ্যে। প্রথম পদেই বলা হইয়াছে চঞ্চলচিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত

করিতে হইবে মহাসুখের মধ্যে তাহাকে বিলীন করিয়া। সেই সাধনায় অগ্রসর হইয়া—

ভণই লুই আম্‌হে ঝানে (সাণে) দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা॥

'লুই বলিতেছে, আমি ধ্যানে (বা সানে, অর্থাৎ আভাসে-ইঙ্গিতে) দেখিলাম,—ধমন-চমন দুইয়ের উপরে বসিয়া আছি।' অর্থ দুইকে এক বলিয়া অদ্বয় মহাসুখে অবস্থিত বা মগ্ন আছি।

পঞ্চম পদে চাটিলপাদ বলিয়াছেন, দুই অন্তেই কাদা—মাঝে নাই থই। এই দুইকে তাহা হইলে মিলিত করিতে হইবে। চাটিলপাদ নদীর দুই পারে মিলাইয়া দিবার জন্য সাঁকো গড়িলেন—সাঁকো গড়া শব্দের অর্থই দুইকে মিলাইয়া দেওয়া; এই দুইকে জুড়িয়া সাঁকো গড়িবার জন্য মোহতরুকে ফাড়িয়া পাট জোড়া হইয়াছে—অদ্বয়-দৃষ্টিকে করা হইয়াছে টাঙ্গি। এই সাঁকোতে চড়িলেও 'দাহিণ বাম মা হোহী'—গ্রহণ করিতে হইবে অদ্বয় মহাসুখের মধ্যপথ।

কাহ্নপাদ যেখানে বলিয়াছেন 'অলিএঁ কালিএঁ ব্াট রুন্ধেলা',—তখন এই আলিকালি রূপ দ্বৈতত্ত্বের দ্বারা পরমার্থের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এই ব্যঞ্জনাই গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য যোগের দিক হইতে ইহার জন্য ব্যাখ্যাও করা চলে,—সেখানে অর্থ হইল, আলি এবং কালিকে বিশুদ্ধ করিয়া এবং উভয়কে একীকৃত করিয়া অবধূতী পথ রুদ্ধ করিলাম বা দৃঢ় করিলাম—অর্থাৎ সকল নিম্নগা ধারা রুদ্ধ করিয়া দিলাম। অষ্টমপদে কম্বলাম্বরপাদ বলিয়াছেন—

বাম দাহিণ চাপী মিলিমিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা॥

'বাম-দক্ষিণ চাপিয়া পথ মিলাইয়া মিলাইয়া—(অবধূতিকা) পথেই মিলিল মহাসুখের সঙ্গ।'

কাহ্নপাদ কোথাও চিত্তকে গজেন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন—যে মত্ত গজেন্দ্র 'এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড্ডিউ'—এ-কার এবং বং-কার রূপ দুইটি দৃঢ় থাম মর্দিত করিয়া দিয়াছে। আবার কোথাও—

আলি-কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে॥

আলি-কালির ঘণ্টা-নূপুর তাঁহার চরণে—রবিশশী কুণ্ডলের আভরণ তাঁহার কর্ণে। সব কথারই ব্যঞ্জনা দুইকে নাশ করিয়া অদ্বয় সহজ বা মহাসুখের সামরস্যে স্থিতি। বীণাপাদ আবার সূর্যকে লাউ করিয়া—চন্দ্রকে তাহার সঙ্গে তার লাগাইয়া—অবধূতীকে মাঝখানের দণ্ড করিয়া দেহকে চমৎকার একটি বীণাযন্ত্রে পরিবর্তিত করিয়া এই বীণা বাজাইয়াই সহজের সাধনা করিতেছেন। সরহপাদ বলিয়াছেন—

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল।
চিঅরাঅ সহাবে মুকুল॥

'নাদ নাই বিন্দু নাই—না আছে রবি-শশীর মণ্ডল—আছে শুধু স্বভাবে মুক্ত চিত্তরাজ', এই নাদ-বিন্দু, রবি-শশীর অতীত যে স্বভাবমুক্ত চিত্তরাজ—তাহাই হইল সহজ-স্বরূপ। এই পদের শেষেও তিনি বলিয়াছেন,—

বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বপা উজবাট ভাইলা॥

'বাম-দক্ষিণে খাল-বিখাল, সরহ বলে, বাপু সোজা পথ হইল।' সরহপাদ তাঁহার আর একটি পদে বলিয়াছেন,—

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মন কেডুআল।
সদ্‌গুরুবঅণে ধর পতবাল॥
চীঅ থির করি ধরহু রে নাই।
আন উপায়ে পার ণ জাই॥
নৌবাহী নৌকা টাণঅ গুণে।
মেলি মেল সহজে জাউ ণ আণেঁ॥
বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ।
ভব উলোলেঁ সব বি বোলিআ॥
কুল লই খরে সোন্তেঁ উজাঅ।
সরহ ভণই গঅণেঁ সমাঅ।

'কায় হইল নৌকা, খাঁটি মন হইল দাঁড়; সদ্‌গুরুর বচনে ধর হাল। চিত্ত স্থির করিয়া নাও ধর—অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না। নৌবাহী নৌকা গুণে টানে, সহজের সঙ্গেই মিলিত হও—আর অন্যত্র যাইও না। পথে ভয় বলবান্ শঠের (চন্দ্র-সূর্যের); (সেই দুই শঠের প্রভাবে) ভব (অস্তিত্ব) উল্লোলে সবই হইল পিচ্ছিল। কূল লইয়া খরস্রোতে উজাইয়া চলে—সরহ বলে গগনে গিয়া প্রবেশ করে।'

এখানে দেখিতে পাইতেছি, কায়-রূপ নৌকা লইয়া বাহিয়া আগাইয়া চলিবার প্রতিবন্ধক হইল পথের বলবান্ শঠেরা—ওই সেই 'দুই' শঠ। তাহাদের বশীভূত করিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু সেই আগাইবার পদ্ধতিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়—আগাইতে হইবে খরস্রোতে উজাইয়া।—আর গিয়া পৌঁছাইতে হইবে কোথায়? পৃথিবী হইতে রওনা হইয়া পৌঁছাইতে হইবে গিয়া গগনে। নৌকার গতি সাধারণত অনুকূল স্রোতের সঙ্গে নিম্ন দিকে; দেহ-নৌকার গতিও ভব-প্রবাহের অনুকূলে নিম্নমুখে; সেই গতি ফিরাইয়া লইতে হইবে; কায়কে লইয়া চলিতে হইবে ঊর্ধ্বগতির সাধনায়—পৌঁছিতে হইবে পৃথিবী হইতে গগনে—বিষয় হইতে শূন্যে—রূপ হইতে স্বরূপে। ইহাই হইল ভারতীয় যোগিগণের 'উলটা-সাধন' বা 'উজান-সাধন'। কম্বলাম্বরপাদও পৃথিবীর ঠাঁই রূপের রূপা রাখিয়া দিয়া শূন্যের সোনা লইয়া করুণার নায়ে রওনা হইয়াছেন। কোথায় যাইবেন?—'বাহতু কামলি গঅণ উবেসে' পৃথিবীর ঠাঁই রূপের রূপা রাখিয়া করুণার নায়ে শূন্যতার সোনা লইয়া তাহাকে যাইতে হইবে গগনের উদ্দেশ্যে—ঊর্ধ্বগতিতে এই যাত্রা।

রূপকচ্ছলে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সহজানন্দের কথা বুঝাইতে গিয়া চর্যাকারগণ সহজানন্দকে বহু স্থলে বিবিধরূপে নারী বলিয়া কল্পনা এবং বর্ণনা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাহাকে দেখিতে পাই 'যোগিনী' বলিয়া; যেমন—

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বি কমলরস পীবমি।

কোথাও এই সহজানন্দ-রূপিণী নৈরাত্মা-যোগিনীকে বলা হইয়াছে 'ডোম্বী', কোথাও চণ্ডালী, কোথাও মাতঙ্গী, কোথাও শবরী বলিয়া,—বেশি স্থানেই দেখিতে পাই তাহাকে স্পর্শের অযোগ্য নীচকুলোদ্ভবা বলিয়া। ইহার কারণ হইল এই সহজানন্দরূপিণী যোগিনীটি একেবারেই ইন্দ্রিয়াতীতা; ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা স্পর্শনীয়া নয় বলিয়াই এই যোগিনীটিকে অস্পর্শা নীচজাতীয়া রমণী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 'অস্পর্শা ভবতি যস্মাৎ তস্মাৎ ডোম্বী প্রকীর্তিতা'। দশম পদে এই ডোম্বীর একটি বিশদ বর্ণনা পাইতেছি। এই পদে দেখিতেছি, এই ইন্দ্রিয়াতীতা সহজানন্দরূপিণী ডোম্বীর বাস হইল নগরের বাহিরে—অর্থাৎ দেহ-নগরের বাহিরে, ইন্দ্রিয়াদির নাগালের বাহিরে; এই জন্য পাণ্ডিত্যাভিমানী যত ব্রাহ্মণ নেড়ার দল তাহারা ইহাকে যেন ছুঁইয়া ছুঁইয়া যায়—ঠিকভাবে ছুঁইতে পারে না। বাহ্য কাপালিক যাহারা তাহারা এইজাতীয় নীচ-জাতীয়া ডোম্বীর সঙ্গ করে একেবারে নিঘৃণ হইয়া; আর কাহ্নপাদ হইলেন আন্তর কাপালিক—'কং মহাসুখং পালয়তীতি কাপালিকঃ' মহাসুখকে পালন করেন বলিয়াই তিনি কাপালিক—তিনি ঘৃণার সংস্কার ত্যাগ করিয়া সঙ্গ করিতে চান এই সহজানন্দ ডোম্বীর। নাভিচক্রে (মণিপুরে—অর্থাৎ নির্মাণ-চক্রে) এই সহজানন্দের স্পন্দন প্রথম অনুভূত হয়, এই মণিপুরের পদ্ম হইল চৌষট্টি দলযুক্ত—সেই জন্যই বলা হইয়াছে যে, একটি পদ্ম, চৌষট্টিটি পাপড়ি—তাহাতে চড়িয়া নাচে আদরিণী ডোম্বী। বাহিরের ডোম্বী নৌকায় চড়িয়া আসা-যাওয়া করে—ভিতরের ডোম্বী কাহার নায়ে যে আসা-যাওয়া করে তাহার রহস্য কেহ জানে না। বাহিরের ডোম্বী তাঁত বিক্রয় করে আর করে চাঙ্গাড়ি বিক্রি—ভিতরের ডোম্বী বিক্রয় করে অবিদ্যার তাঁত—বিষয়াসক্তির চাঙ্গাড়ি। বাহিরের ডোম্বী পুকুর ভাঙ্গিয়া খায় মৃণালখণ্ড—তাহার ফলে মার খায় লোকের কাছে। অপরিশুদ্ধ সাংবৃতিক রূপে এই আনন্দানুভূতির ডোম্বী দেহ-সরোবরের সারাংশ আহার করে—যোগী তাই তাহাকে মারিতে চান—প্রাণ লইতে চান—অর্থাৎ যোগ সাধনার দ্বারা অপরিশুদ্ধা আনন্দরূপিণী ডোম্বীকে পরিবর্তিত করিতে চান পরিশুদ্ধা সহজানন্দরূপিণী ডোম্বীতে।

অপর একটি পদে দেখিতে পাই, এই সহজানন্দরূপিণী নৈরাত্মা দেবীকে একটি মতঙ্গকন্যা রূপে খেয়ার পাটনী রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। গঙ্গাযমুনার দুই ধারার মাঝখানে এই সামরস্যরূপিণী দেবী নৌকা লইয়া পারাপার করেন; এই গ্রাহ্য-গ্রাহকত্বের দুই ধারার ঢেউ প্রবল—মনে হয় এই দুইয়ের মাঝখানে যে পাটনী মেয়ে পারাপারের সংযোগ ব্যবস্থা করিতেছে সে বুঝি ডুবিয়াই গেল—দ্বৈতাশ্রয়ী বিষয়ানন্দই বুঝি অদ্বৈত সহজানন্দকে ঢাকিয়া ফেলিল; কিন্তু সাধনায় যাহার অচল প্রতিষ্ঠা সে যোগীকে এই মতঙ্গকন্যা ঠিক পার করিয়া দেয়। পাঁচ দাঁড়ে চলে এই নৌকা—এই পাঁচ দাঁড় হইল পঞ্চতথাগত-শরণ—এবং

পঞ্চসাধন-ক্রমের অবলম্বন। আর আছে পিঠে 'কাছি' (দড়াদড়ি) বাঁধিয়া নৌকা টানিবার কথা; ভিতরের অর্থে দেহের মধ্যে প্রত্যেকটি চক্রে একটি প্রসিদ্ধ 'পীঠ'-এর কল্পনা করা হইয়াছে,—সেই চক্রে বা পীঠে যৌগিক 'বন্ধ' (দেহ-মন স্থির করিবার জন্য ও উর্ধ্বধারা লাভ করিবার জন্য এক প্রকারের যৌগিক প্রক্রিয়া) প্রয়োগ করিতে হইবে। নৌকার জল—অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি-মল—সেঁচিতে হইবে গগন-সেঁউতিতে—অর্থাৎ প্রজ্ঞা দ্বারা। সৃষ্টি-সংহারের তত্ত্ব চন্দ্র-সূর্য হইল নৌকার দুই চাকা—মধ্যে আছে মাস্তুল অদ্বয়ের প্রতীক। এই পাটনী মেয়ে কড়ি-বুড়ি কিছুই লয় না—অর্থাৎ সহজ পথে দিতে হয় না কোনও কৃচ্ছ্রতার বা পাণ্ডিত্যের বহুমূল্য—স্বচ্ছন্দে যাওয়া যায় পার হইয়া।

অন্য একটি পদে বলা হইয়াছে, কাহ্নপাদ তিন ভুবন অবলীলায় বাহিয়া আসিয়াছেন; কায়বাক্‌চিত্তের তিনভুবন অতিক্রান্ত হইলে আসে অদ্বয়প্রতিষ্ঠা—তখনই আসে মহাসুখ-লীলায় মগ্নতা। এই মহাসুখে মগ্ন হইলেই লাভ হয় ইন্দ্রিয়াগোচরা সহজরূপিণী ডোম্বীর সঙ্গ। ডোম্বীর সঙ্গ লাভ করিয়া সিদ্ধাচার্য বলিতেছেন,—

> কইসনি হালো ডোম্বী তোহোরী ভাভরিআলী।
> অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবালী॥
> তঁইলো ডোম্বী সঅল বিটালিউ।
> কাজণ কারণ সসহর টালিউ॥
> কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
> বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলঈ॥
> কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডালী।
> ডোম্বিত আগলি নাহি চ্ছিণালী॥

চঞ্চলা ডোম্বীর চালাকি কিছুই যায় না বোঝা, কুলীনজনের সে বাইরে—ভিতরে থাকে কাপালিকের। কুলীন কথাটি দুই অর্থে এখানে ব্যবহৃত। যাহারা পাণ্ডিত্যাভিমানী তাহারাও কুলীন,—আর যাহারা 'কু'—অর্থাৎ দেহে লীন—অর্থাৎ দেহ-অবলম্বনে সাধনা করিতে গিয়া দেহকে যাহারা আর অতিক্রম করিতে পারে না—দেহেই প্রকারান্তরে বদ্ধ হইয়া পড়ে তাহারাই হইল 'কু-লীন'। এই দুই প্রকারের কোনও 'কুলীন'ই পায় না সহজরূপিণীর সন্ধান; সন্ধান পায় 'কাপালিক'—অর্থাৎ যে মহাসুখ-রূপ 'ক'-কে, পালন করিতে (ভিতরে ধারণ করিতে) জানে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই মহাসুখ-রূপিণী ডোম্বীর দুইটি রূপ আছে, সাংবৃতিক এবং পারমার্থিক—অপরিশুদ্ধা এবং পরিশুদ্ধা; অপরিশুদ্ধারূপে যে দেখা দেয় সর্ববিধ ক্লেশবন্ধনের কারণ বিষয়ানন্দরূপে—তাহাই আবার পরিশুদ্ধারূপে দেখা দেয় মহাসুখরূপিণী নৈরাত্মারূপে। তাই বলা হইয়াছে যে, এই অপরিশুদ্ধা সাংবৃতিকী ডোম্বীই সকল বিটালিত (নষ্ট) করে—সে-ই টালিত বা নষ্ট করে উষ্ণীষকমলে চন্দ্ররূপে অবস্থিত অমৃতময় বোধিচিত্তকে। এই মহাসুখের সাধনায় অনেকে করেন সংশয় প্রকাশ—এই জাতীয় মহাসুখে মগ্ন হওয়াই পরমার্থ কি না; কিন্তু কাহ্নপাদ বলিতেছেন,—এ-জাতীয় সংশয় হইল 'অবিদুজনে'র—যাহারা ভিতরের খবর সব জানে না তাহাদের; কিন্তু 'বিদুজন' কখনও এই ডোম্বীকে কণ্ঠ হইতে ত্যাগ করে না। যোগের দিক হইতে কণ্ঠ হইল সম্ভোগ-চক্র—সেইখানে সহজরূপিণীর

সহিত সম্ভোগ। সিদ্ধাচার্য তাই বলিতেছেন,—রহস্যময়ী এই 'কামচণ্ডালী'র গতি—মনে হয় তাহা অপেক্ষা আর নাই কেহ অধিক চপলমতি।

পরের পদটিতে কাহ্নপাদ রূপকচ্ছলে এই ডোম্বীকে বিবাহ করিতে চলিয়াছেন; সেই বিবাহের যাত্রার এবং অন্যান্য আয়োজনের—এবং বিবাহান্তিক নব-মিলনের অবিচ্ছিন্নতা ও গাঢ়তার রহিয়াছে ঘনসংবদ্ধ বর্ণনা। অপর একটি পদে শবরপাদ এই 'সহজসুন্দরী'কে ময়ূরপুচ্ছ এবং গুঞ্জামালায় শোভিত উচ্চপর্বতবাসিনী শবরী বালিকারূপে অপূর্ব কবিত্বে বর্ণনা করিয়াছেন। উচ্চ পর্বত এখানে দেহস্থ সর্বোচ্চ চক্র উষ্ণীষ-চক্র; ময়ূরপুচ্ছ এবং গুঞ্জামালায় তাহাকে বিচিত্র করিয়া তুলিবার কারণ—তাহার সাংবৃতিক-পারমার্থিক উভয়বিধ রূপের মধ্য দিয়া যে বিচিত্র রহস্যময়ীত্ব তাহারই একটা আভাস দেওয়া। এই রহস্যময়ী বালিকার পাগলা স্বামী (সাধক-চিত্ত) কি সব সময় তাহাকে চিনিতে পারে? নিজের দেহ-ঘরের 'ঘরিণী'কেই মানুষ চিনিতে পারে না—ইহাই হইল সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের কথা।

উৎস : বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি

# বাঙালির বিশিষ্টতা

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালি যে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের জাতিসকল হইতে পৃথক এবং স্বতন্ত্র, বাঙালির যে একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে, ইহা ঠিকমত বুঝিতে হইলে,—(১) বাঙালায় উপাসক-সম্প্রদায়ের পরিচয় লইতে হইবে, (২) বাঙালা ভাষার ব্যাপ্তি, পুষ্টি ও প্রকৃতির পরিচয় লইতে হইবে, (৩) জীমূতবাহন হইতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার পর্যন্ত প্রায় সাত শত বর্ষকাল কোন সিদ্ধান্তের উপরে বাঙালির স্মৃতি ও দায়শাস্ত্র বিস্তৃতি ও পুষ্টি লাভ করিয়াছে, তাহা জানিতে হইবে, (৪) বাঙালির জাতি এবং কুলপরিচয় পূর্ণরূপে লইতে হইবে। এই কয়টা বিষয় ঠিকমত ব্যাখ্যাত হইলে তবে বাঙালির বিশিষ্টতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। বাঙালির স্বাতন্ত্র্য বাঙালির বিশিষ্টতার মূল উপাদান। এমনকি, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে, যজ্ঞাদিতে বাঙালি ভবদেবের পদ্ধতি মান্য করিয়া চলে, অন্য কোনো আর্য পদ্ধতিকারকে গ্রাহ্যই করে না। দায়তত্ত্বে জীমূতবাহন বাঙালিকে অপূর্ব স্বাধীনতা দিয়া গিয়াছেন; দায়ভাগ বাঙালার হিন্দুয়ানিকে অনেকটা territorial বা দেশগত ও জাতিগত করিয়া রাখিয়াছে। জয়দেব, উমাপতি-প্রমুখ সংস্কৃত কবিগণ, লুইপাদ, কাহ্নু প্রমুখ সিদ্ধাচার্যগণ, শঙ্কর, কৃষ্ণানন্দ-প্রমুখ তান্ত্রিক আচার্যগণ বাঙালিকে এক অপূর্ব বিশিষ্টতা দিয়া গিয়াছেন। বাঙালার উপাসনাপদ্ধতি, কর্মপদ্ধতি, সাহিত্য, ভাষা এবং জাতি ও কুলপরিচয় সম্বন্ধে, ইংরেজি যুগে ইংরেজিনবিশ পণ্ডিতগণের দ্বারা যথারীতি আলোচনা হয় নাই, তাই ইংরেজিনবিশ বাঙালি স্বদেশের ও স্বজাতির প্রকৃত পরিচয় রাখেন না। বলিব কী মজার কথা, বৌদ্ধ যুগে ধর্ম কর্ম, শীল ও আচার লইয়া বাঙালি নালন্দার পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছিল। বাঙালাই বজ্রযানের আদি স্থান; আবার সে বজ্রযান সহজিয়া মত এবং তন্ত্রমতের দ্বারা এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়াছিল যে, পরে হীনযানী সদ্ধর্ম হইতে উহা পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হইয়াছিল।

## যত জীব, তত শিব

এই মহাবাক্য বাঙালা দেশেই প্রথম উত্থিত হয়; এই মহাবাক্য অনুসারে মনুষ্য-সমাজে যতটা কাজ হওয়া সম্ভবপর, তাহা বাঙালা দেশেই বাঙালি জাতির মধ্যে হইয়াছিল। বাঙালার সহজ মত, তন্ত্রধর্ম, এবং পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এই মহাবাক্যের বেদির উপরে বিন্যস্ত। এমন-কি, বাঙালির ভক্তিশাস্ত্রটা এই মহাবাক্যের দ্বারা এতটাই সং

যে, উহা রামানুজ, বল্লভাচার্য-প্রমুখ মধ্যযুগের আচার্যপাদগণের ব্যাখ্যাত ভক্তি-ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন হইয়া রহিয়াছে।

"যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে,
তাই আছে দেহভাণ্ডে!"

ইহাও বাঙ্গালার একটা মহাবাক্য। ব্রহ্মাণ্ড Macrocosm, নরদেহভাণ্ড Microcosm; একটা ব্যাপ্ত, অপরটা সঙ্কুচিত, একটা বিরাট, অপরটা স্বরাট। তাই তন্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন, "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে"—ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণরাশির খেলা হইতেছে, দেহভাণ্ডে—জীবমাত্রেরই কলেবরে সেই গুণরাশির ক্রিয়া হইয়া থাকে। দেহভাণ্ডকে বুঝিতে পারিলে, আয়ত্ত করিতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝা যায়, ব্রহ্মাণ্ডকে আয়ত্ত করা যায়। এই সিদ্ধান্ত, এই অপূর্ব generalisation বাঙ্গালির একটা বড়ো বিশিষ্টতা। এই সিদ্ধান্তের উপরে সহজিয়া মত এবং বৈষ্ণবদিগের "দেহতত্ত্ব" প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালির "দেহতত্ত্ব" বাঙ্গালির নিজস্ব; উহা বাঙ্গালার বাহিরে নাই; বাঙ্গালার বাহিরের ভাবুকগণ উহা ঠিকমত বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালির সাহিত্য, ভাষা, মহাজনী পদ ও কীর্তন, শ্যাম-শ্যামার গান, সবই এই দেহতত্ত্বের সিদ্ধান্তরাশির দ্বারা যেন অনুস্যূত—অনুপ্রাণিত। এই দেহতত্ত্বই বাঙ্গালির Anthropomorphism বা নরপূজার—নরদেবতাপূজার বেদি। তাই বাঙ্গালির দেবতা দ্বিভুজ মুরলীধর, চিদ্ঘন শ্যামসুন্দর, সচ্চিদানন্দমূর্তি। তাই বাঙ্গালির দেবী দ্বিভুজমুরলীধারিণী, একাম্র-কাননবিহারিণী, উমাসুন্দরী, চিন্ময়ী, চিদ্ঘনশ্যামারূপিণী। বাঙ্গালির আগমনি বাঙ্গালির নিজস্ব; আগমনিগান ভারতবর্ষের আর কোনো প্রদেশে নাই, আর কোনো জাতি অমন গান করে নাই, গান করিতে জানেও না। তাই বাঙ্গালা দেশেই শ্যাম-শ্যামার সমন্বয় সাধন অপূর্বভাবে হইয়াছিল। এই সমন্বয়ের মহাকবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ; তাঁহার রচিত "কালীকীর্তন" এই সমন্বয়ের অপূর্ব পরিচায়ক। বাঙ্গালিই একা নরবেদবতা এবং নারীদেবীকে পূজা করিতে শিখিয়াছিল। বাঙ্গালাদেশেই প্রেমের ধর্মের প্রথম বিকাশ হয়। হিন্দুস্থানে একা সুরদাস তাঁহার সঙ্গীতরাশিতে নরাকারের দেবতা দ্বিভুজ মুরলীধারীর পূজা ও বন্দনা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন; পরন্তু এই তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালি ভক্তগণের দ্বারা সাধিত হইয়াছিল। কথাটা আর একটু খুলিয়া বলিব।

## বৈদিক (Deism)

বেদেই বহির্দেবের পূজার প্রচলন আছে। বেদই অনুজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, সোম, বহ্নি আদি দেবতাগণের পূজা করিতে হইবে। ইঁহাদিগকে প্রসন্ন রাখিতে পারিলে জগৎ প্রসন্ন থাকিবে, পূজক—যাজ্ঞিকও প্রসন্ন হইবেন—সিদ্ধমনোরথ হইবেন। বেদের যজ্ঞাদি সকল কার্যই বাহিরের দেবতার পূজার নামান্তর মাত্র। সে দেবতা মানুষ নহে, অতিমানুষ শক্তি-সম্পন্ন জীববিশেষ—"ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং, প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।" সে দেবতা মানুষ-দেহের অতীত, বিশ্বসৃষ্টির উপরে বিন্যস্ত।

বেদের এই দেববাদের প্রতিবাদ বাঙ্গালার তান্ত্রিকগণ সার্থকভাবে করিতে পারিয়াছিল। অবশ্য অম্ভৃণকন্যা বাকের উক্তিতে—দেবীসূক্তে উহার প্রথম দ্যোতনা থাকিলেও ওই সূক্ত

অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালিই বেদের দেববাদের, বহির্দেবতার পূজাপদ্ধতির প্রতিবাদ করে। বাঙ্গালার তন্ত্রেই আছে,—

"আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা
বহির্দ্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা
ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া।।"

অর্থাৎ হাতে মুঠার মধ্যের কৌস্তুভমণিকে ফেলিয়া দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি কাচখণ্ড অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তি যেমন অজ্ঞতার পরিচয় দেয়, তেমনি যে ব্যক্তি চৌদ্দ পোয়া মাপের নরদেহে অবস্থিত আত্মরূপী দেবতাকে অবহেলা করিয়া বাহিরের অন্য দেবতার পূজায় ব্যস্ত হয়, সে ততোধিক মূর্খ। সোজা কথা এই; বাহিরের দেবতার পূজা বন্ধ করিয়া, যাগযজ্ঞাদি পরিহার করিয়া পরমাত্মার পূজায় ব্যাপৃত হও। ইহাই বাঙ্গালার ধার্মিকগণের আদেশ, ইহাই বাঙ্গালার সকল সাম্প্রদায়িক উপাসক গণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের উপরে বাঙ্গালির উপাসনাতত্ত্ব বিন্যস্ত। বাঙ্গালির দেহতত্ত্ব বেদের Deism-এর প্রতিবাদ। বাঙ্গালির দেহতত্ত্বের প্রভাবে বাঙ্গালায় বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি লোপ পাইয়াছিল; আমাদের মনে হয়, বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি এবং Deism কোনো কালেই বঙ্গদেশে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

## দেহতত্ত্ব

এই দেহতত্ত্বের অন্তরালে একটা প্রকাণ্ড Philosophy বা দর্শনশাস্ত্র নিহিত আছে। তাহার পুরাপুরি ব্যাখ্যা মাসিকপত্রের সন্দর্ভে সম্ভবপর নহে, তথাপি মোটামুটিভাবে এই সম্পর্কের গোটাকয়েক তত্ত্ব বলিয়া রাখিব। সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণের মধ্যে অনেকের দোঁহাবলীতে এই কয়টা সিদ্ধান্ত আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। আমার মনে হয়, এই কয়টা সিদ্ধান্তই বাঙ্গালার সাহিত্যে, ভাষায়, গানে, কীর্তনে, সাধনে-ভজনে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

(১) ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ—যুক্তিতর্কের দ্বারা, চাক্ষুষ বা পরোক্ষ প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা যখন বহির্দেবতা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করা যায় না, তখন তাঁহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া প্রয়োজন নাই। অজ্ঞেয়ত্বাৎ তিনি এখন বর্জনীয় হইয়া থাকুন।

(২) ঈশ্বর অনন্ত, অজ্ঞেয়, তাঁহার অনাদি সৃষ্টিও অনন্ত এবং অজ্ঞেয়। তবে একটা ব্যাপার আমরা দেখিতে পাই, আমাদের আয়ত্তের মধ্যে অবস্থিত এবং চেষ্টা করিলে ও সাধনা করিলে হয়তো তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। ক্ষুদ্রের এবং ব্যষ্টির ক্রিয়া এবং ক্রিয়াফলের পরিচয় পাইলে হয়তো আমরা মহানের, গোষ্ঠীর এবং সাকল্যের পরিচয় পাইলেও পাইতে পারি।

(৩) মানুষ হইতে মানুষের সৃষ্টি একটা অপূর্ব ব্যাপার নহে কী? জীব হইতে জীবের উৎপত্তি বিশ্বসৃষ্টির অংশস্বরূপ একটা অপূর্ব বিস্ময়জনক কার্য নহে কী? কেমন শক্তি দেহের মধ্যে বিরাজ করিতেছে, যাহার প্রভাবে নূতন জীবের উৎপত্তি ঘটিতেছে? সেই দেহস্থ শক্তির পরিচয় পাইলে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত অপূর্বা মহতী শক্তির কতকটা পরিচয় পাইতে পার। এই দেহতত্ত্ব বুঝিলে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বুঝিবে।

(৪) দেহস্থ এই শক্তিই কুলকুণ্ডলিনী;—"বিষতন্তুময়ী দেবী সর্ব্বদেহপ্রসারিণী"—পদ্মের নালের সূক্ষ্ম সুতার মতন এই শক্তি জীবদেহের সর্বত্র সম্প্রসারিত রহিয়াছেন। ইঁহা হইতেই সৃষ্টি, ইনিই জগজ্জননী। ইনিই পুরুষের চারি ধারে, অনাদিলিঙ্গের সর্বাবয়বে সর্পের ন্যায় জড়িত হইয়া আছেন।

(৫) দেহস্থ এই পুরুষ এবং প্রকৃতির পরিচয় পাইলে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী পুরুষ-প্রকৃতির পরিচয় পাইবে। ভাব ও রসের সাহায্যে ইহাদের পরিচয় পাইতে হয়। রস মনুষ্যদেহস্থ একাদশ প্রকারের আসক্তি হইতে নির্গলিত। ভাব জীবের মিলন-আকাঙ্ক্ষা হইতে উন্মেষ লাভ করিয়াছে। একটা অজ্ঞেয় অতৃপ্তিই জীবত্বের লক্ষণ। কী-যেন নাই, কী-যেন হারাইয়াছি, কী-যেন পাইলে পরমানন্দ লাভ করিতে পারি;—এই অতৃপ্তি ও লালসাই ভাবের জননী। রামপ্রসাদ গান করিয়াছেন,—"ডুব দে মন কালী ব'লে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে"; দেহতত্ত্বের বৈষ্ণব কবি গান করিয়াছেন,—"স্বপনে মন যে কেমন মানুষরতন হেরিয়াছে, সে যে অধরা মানুষ দেয় না ধরা, ধরিতে মন হার মেনেছে।"

এই দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইলে নাম, রূপ, ভাব, রস, এই চারি পদার্থকে বুঝিতে হইবে। এই দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইলে ষট্‌চক্রভেদ ব্যাপারটা বুঝিতে হইবে। নহিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অর্ধেকটা বুঝিতে পারিবে না, বাঙ্গালির বিশিষ্ট ভাবের অর্ধেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। এই যে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের (কী রামপ্রসাদের রচিত, কী ভারতচন্দ্রের রচিত) কালীপক্ষেও ব্যাখ্যা আছে, উহার মহিমা আদৌ পরিগ্রহ করিতে পারিবে না। চণ্ডীদাস-রচিত অনেক পদাবলির অর্থ ব্যাখ্যা করিতে এখন অনেকে পারেন না; কেন না, আজকালকার শিক্ষিত সমাজ দেহতত্ত্ব ভুলিয়াছে, ষট্‌চক্রভেদ জানে না। মান, মাথুর, দূতীসংবাদ, বাসকসজ্জা প্রভৃতি লীলাকীর্তনে রোদনের অবসর কোথায় আছে? অথচ, বাঙ্গালি ভাবুক এই সকল কীর্তনের পালা শুনিয়া কাঁদে কেন? উহা তো করুণ রসের উদ্ভব নহে। উহা কী? দেহতত্ত্ব বুঝিলে বাঙ্গালির রোদনের বিশিষ্টতাটুকু বেশ বুঝিতে পারিবে,—হয় তো শেষে নিজে কাঁদিয়া আকুল হইবে। ধর্মব্যাখ্যা তো করিতে বসি নাই, বাঙ্গালির বিশিষ্টতাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। তাই সামান্য ইঙ্গিত করা ছাড়া আর কিছু এ সম্বন্ধে বলিব না।

## বাঙ্গালির ব্যক্তিত্ব—Individualism

আসল কথা এই, বাঙ্গালির ব্যক্তিত্ব তাহার আবিষ্কৃত সকল ব্যাপারে যেন শতমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূর্বে কেবল মিথিলায় ন্যায়ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত, মিথিলার পণ্ডিতগণ বাঙ্গালি ছাত্রদের পুঁথি লিখিয়া আনিতে দিতেন না। তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রকে মিথিলার একচেটিয়া করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ছাত্রগণকে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বাধ্য হইয়া মিথিলায় যাইতেই হইত। বাঙ্গালার কানা ভট্ট শিরোমণি রঘুনাথ মেধার এতই উন্নতিসাধন করিলেন যে, তিনি ক্রমে শ্রুতিধর হইয়া উঠিলেন। তিনি মিথিলায় যাইয়া ন্যায়শাস্ত্র যথারীতি অধ্যয়ন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল পুঁথি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। দেশে আসিয়া একচক্ষু রঘুনাথ তাবৎ ন্যায়গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব মনীষাপ্রভাবে নব্য ন্যায়ের

উদ্ভাবনা করিলেন। ফলে, মিথিলার একচেটিয়া চূর্ণ হইল, নবদ্বীপ নব্য এবং পুরাতন ন্যায়ের পঠন-পাঠনের কেন্দ্রস্বরূপ হইল। ইহাই বাঙ্গালির বিশিষ্টতার পরিচায়ক। আবার মজার কথা, বাঙ্গালি ন্যায়ের এই অভ্যুদয়ধারা চারি শত বর্ষকাল অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিলেন, নবদ্বীপকে নব্য ন্যায়ের অদ্বিতীয় কেন্দ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন।

## "ভুবনান্তক গদাধর"

এই উক্তির অর্থ পরিগ্রহ করিতে পার কী? গদাধর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের সমসময়ের বা পূর্বেকার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার বংশে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ঁভুবনচন্দ্র বিদ্যারত্ন পর্যন্ত, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমানভাবে প্রধান ও সর্বজনবরেণ্য নৈয়ায়িক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এমনটি পৃথিবীর আর কোনো সভ্য জাতির পণ্ডিতসমাজে ঘটিয়াছে কী? ভারতবর্ষের আর কোনো প্রদেশে, কোনো পণ্ডিতবংশে মনীষার এমন অব্যাহত ধারা কেহ দেখাইতে পারে কী? ইহাই বাঙ্গালার ব্যক্তিত্বের এবং বিশিষ্টতার শ্লাঘ্য পরিচয়। বাঙ্গালি সকল বিষয়ে চূড়ান্ত করিয়াছে। গোটাকয়েক উদাহরণ দিব ঃ—

(১) দায়ভাগ ও স্ত্রীধনবিন্যাসে বাঙ্গালি স্মার্ত যে গণবাদের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ইংলন্ডেও ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কল্পনা মাত্র ছিল। জীমূতবাহনের সিদ্ধান্তসকল পুরামাত্রায় এখনও ব্রিটিশ জাতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। জীমূতবানের "দায়ভাগ" মিতাক্ষরার প্রকাণ্ড প্রতিবাদ, Feudalism-এর বিরুদ্ধে বিষম protest। সহস্র বৎসর পূর্বে, সকল সভ্য জাতির আগেভাগে বাঙ্গালি এই প্রতিবাদটি করিয়া গিয়াছেন।

(২) স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন একজন বিষম Protestant ছিলেন। তিনি গোঁড়ামির প্রতিষ্ঠাতা নহেন, বরং বলিব—ভারতবাসীর বৈদিক গোঁড়ামির অপহ্নবকর্তা। তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতিসকলের মধ্যে যে ব্যাপক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপূর্ব এবং অতুল্য। তাঁহারই প্রভাবে বাঙ্গালায় আচারীদিগের "ছুতমার্গ" দাক্ষিণাত্যের তুল্য প্রবল হইতে পারে নাই। রঘুনন্দনকে বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় ইদানীং বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই বলিয়া, অজ্ঞতাবশে তাঁহার প্রতি অনেকে কঠোর হইয়া আছেন। রঘুনন্দন বাঙ্গালির বিশিষ্টতা উন্মেষের একজন প্রধান সাধক পুরুষ।

(৩) শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বাঙ্গালির বিশিষ্টতার আর একটা উপাদান। রামানুজাচার্য, বল্লভাচার্য, মাধবাচার্য, নিম্বার্ক প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের আচার্য সম্প্রদায় যে নানাবিধ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সে সকল অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৃন্দাবনে, মথুরায়, নাথদ্বারায় হরিকীর্তন শুনিয়াছি, ভজন শুনিয়াছি। এই সকল হিন্দুস্থানি ভজনে ও কীর্তনে শ্বপচাদি অস্পৃশ্য জাতিসকল গণ্ডির বাহিরে স্থান পাইয়া থাকে। বাঙ্গালায় হরিসংকীর্তনে সে বাধা নাই, উচ্চ নীচ সকল জাতি সমানভাবে কীর্তন-আনন্দ উপভোগ করিতে পারে; কীর্তনের ক্ষেত্রে শ্বপচাদির স্পর্শে বাঙ্গালির জাতি যায় না। কেবল এইটুকুই নহে, সেই কীর্তনক্ষেত্রে সকল জাতীয় কীর্তনীয়ার পদরজের উপরে সোপবীত ব্রাহ্মণও ভাবাবেশে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। সেই কীর্তনমণ্ডলীর উপরে হরির লুটের বাতাসা ছড়াইয়া দিলে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সবাই তাহা কুড়াইয়া লইয়া মুখে দেয়। এতটা বাঙ্গালি ছাড়া আর কেহ, কোনো প্রদেশের বৈষ্ণব করিতে পারে নাই। বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কীর্তনে এমন ব্যাপার হইয়া থাকে।

(৪) আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ এবং শাক্তানন্দতরঙ্গিণী-প্রণেতা ব্রহ্মানন্দ গিরি বাঙ্গালির বিশিষ্টতা উন্মেষের আর দুই জন সাধক। ইঁহারাই "বাশিষ্ঠ পদ্ধতি' অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালায় "শৈব বিবাহে"র প্রচলন করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের কাল পর্যন্ত বাঙ্গালায় শাক্ত তান্ত্রিকসমাজে শৈব বিবাহের খুব প্রচলন ছিল। রাজা রামমোহন নিজেও শৈব বিবাহ করিয়াছিলেন। শৈব বিবাহে নারীর জাতি বিচার করিতে হয় না, যৌবনের পূর্ণ উন্মেষ না ঘটিলে শৈব বিবাহ হইতে পারে না। এই শৈব বিবাহের প্রভাবে বাঙ্গালায় নানা জাতির সম্মেলন ঘটিয়াছিল, এমনকি—মগ, আরাকানি, ভুটিয়া, তিব্বতি, পাঠান রমণী বাঙ্গালার শাক্ত ব্রাহ্মণের গৃহকর্ত্রী হইয়াছিলেন। কুলজি গ্রন্থসকল ঘাঁটিলে এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ গিরি এক পাঠান-রমণীকে শক্তির পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। শাক্তের যেমন শৈব বিবাহ, বৈষ্ণবের তেমনি "কণ্ঠিবদল" ছিল। সহজ মতের প্রচলন প্রভাবে "পরকীয়া অর্চনা"র বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজে খুব প্রচলন ছিল। সাহিত্য-পরিষদ তাঁহাদের একখানা প্রচারিত গ্রন্থে আড়াই শত বর্ষ পূর্বের স্বকীয়া-পরকীয়া সম্বন্ধে এক অপূর্ব আলোচনার কাগজপত্র ছাপিয়াছেন। সে এক বিরাট বিচার, খোদ সুবাদার সাহেব সে বিচারক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। জয়পুররাজ-প্রেরিত বিদেশীয় পণ্ডিত এ বিচারে পরাজিত হইয়াছিলেন, বাঙ্গালির পরকীয়াতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালার "কণ্ঠিবদল" সেই অবধি আজ পর্যন্ত বজায় রহিয়াছে।

(৫) দীপংকর শ্রীজ্ঞান অথবা বিক্রমপুরের নাস্তিক ভট্টাচার্য বাঙ্গালির ব্যক্তিত্বের একজন প্রধান সহায়ক। ইনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাই লোকে ইঁহাকে নাস্তিক ভট্টাচার্য বলিত। দীপংকর ভুটানে, তিব্বতে, চিনে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বাঙ্গালার বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পূর্ব-এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন; টেঙ্গুরে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়; নেপালে বাঙ্গালির কীর্তির অনেক পুঁথিপত্র আছে। ছিল দিন—যখন বাঙ্গালি বৈবাহিক সূত্রে তিব্বত, চিন, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশের সহিত সংবদ্ধ ছিল; ছিল দিন—যখন বাঙ্গালায় অসংখ্য বিদেশীয় পণ্ডিত আসিয়া বাস করিত এবং বাঙ্গালি রমণীকে শৈব বিবাহের সাহায্যে শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৃহস্থ হইয়া থাকিত। "ভরার মেয়ে বিবাহ" বাঙ্গালা দেশে বংশজ ও কষ্টশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল; শাক্ত কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে এবং কুলাচারী অন্য জাতির মধ্যে পাকস্পর্শের দিনে নব বধূর জাতি-কুলের পরিচয় লইয়া ঘোঁট হইত না। ইহা একটা বড়ো কথা।

(৬) দেবীবরের মেলবন্ধন এবং কৌলীন্যের নবপ্রতিষ্ঠা বাঙ্গালির ব্যক্তিত্বের একটা বড়ো পরিচয়। মিথিলায় ও কান্যকুব্জে যে কৌলীন্য এখনও প্রচলিত আছে, তাহা দেবীবর-প্রবর্তিত প্রথা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেবীবর মেলবন্ধন করিয়া যে কত সাঙ্কর্যকে ঢাকিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আর এখন হিসাব করিয়া বলা যায় না। অর্জুন মিশ্রের বিবাহ ব্যাপার একটা অপূর্ব ঘটনা, রত্নেশ্বরের বিবাহে আর একটা অপূর্ব ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এ সকলের আলোচনা, বিশ্লেষণ ও বিচার হওয়া কর্তব্য। কুলজি গ্রন্থসকল মন্থন করিলে বাঙ্গালির বিশিষ্টতার অসংখ্য উপাদান সংগ্রহ করা যায়।

(৭) বাঙ্গালার প্রথম ও মধ্য যুগের সাহিত্যেও একটা অপূর্বত্ব আছে। কবিকঙ্কণ, ঘনরাম প্রভৃতি সকল বড়ো কবিই ব্রাহ্মণ, পরন্তু তাঁহাদের লিখিত সকল মহাকাব্যের Hero and Heroine নায়ক-নায়িকা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নহে। গন্ধবণিক্, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত,

গোড়ো গোয়ালা প্রভৃতি জাতীয় পুরুষ সকলই এই সকল কাব্যের নায়ক। আরও মজা দেখ, ভারতচন্দ্রের পূর্বকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ-লিখিত সকল মহাকাব্যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের লেশ মাত্র নাই। চণ্ডীর ঘটস্থাপন ফুল্লরা নিজেই করিত, তজ্জন্য ব্রাহ্মণ ডাকিতে হইত না। কালকেতু, পুষ্পকেতু, ইছাই ঘোষ, লাউসেন, ভীম, ধনপতি-প্রমুখ নায়কগণ কোন জাতীয় ছিলেন? ইঁহারা যদি মহাকাব্যের নায়ক হইতে পারেন, তবে তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য বলি কোন্ হিসাবে? কাজেই বলিতে হয়, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের, জল আচরণীয় এবং জল অনাচরণীয়ের মধ্যে এমন অজ্ঞাত কোন তত্ত্ব আছে, যাহা এখনও আমরা ধরিতে পারি নাই। "অ-শূদ্র-প্রতিগ্রাহী" শব্দটা কত দিনকার, তাহার আলোচনাও এই সঙ্গে করিতে হয়।

(৮) এই সঙ্গে বাঙ্গালির ভাষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালিকে অপূর্ব বিশিষ্টতা দিয়াছে। সে পরিচয় পাইতে হইলে প্রায় সহস্র বৎসরের বাঙ্গালা ভাষার উন্মেষ-পদ্ধতি বুঝিতে হয়; সিদ্ধাচার্যগণের গীত ও দোহাবলি হইতে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পর্যন্ত সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের মন্থন প্রয়োজন। এই বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস লুকান আছে। কুলজি গ্রন্থসকল সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "মহাবংশ" অপূর্ব কাব্যও বটে, ইতিহাসও বটে। ইহা ছাড়া বাঙ্গালার সংগীত-সাহিত্যও অপূর্ব এবং অনন্যসাধারণ। কবির গান, পাঁচালীর গান, শ্যামাবিষয়ক গান, কীর্তন, গাথা প্রভৃতি কত রকমের সংগীত-সাহিত্য ছিল বা আছে, তাহাদের শ্রেণিবিভাগ, বিশ্লেষণ এবং সে সকল হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এখনও কেহ করে নাই, ঘটেও নাই। অথচ বাঙ্গালির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ঘটনার উল্লেখ এই সকল গানে ও ছড়ায় নিবদ্ধ আছে।

কত আর উল্লেখ করিয়া বলিব! বাঙ্গালির বিশিষ্টতা এবং ব্যক্তিত্ব সমাজ-শরীরের সর্বাবয়বে, শিল্পকলায়, গানে-নাচে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে, ঔষধ-নির্মাণে,—লাঠি খেলায়, ক্ষুরপা-রণপা নির্মাণে ও ব্যবহারে, নৌশিল্পে, নৌকা-প্রস্তুতিতে, কথকতায়-ব্যাখ্যায়, বয়ন-শিল্পে, তসর-গরদের বসন-প্রস্তুতিতে, গজদন্তের কারুকার্যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারে,—সভ্য জাতির সকল ব্যসন-বিলাসে যেন সদাই স্পষ্টীকৃত হইয়া আছে। মনীষী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, বাঙ্গালার ভূগর্ভ হইতে যত প্রতিমা বাহির হইতেছে, যত বৌদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাদের techniquc ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। বাঙ্গালির ভাস্কর্য অপূর্ব ও স্বতন্ত্র। বাঙ্গালার বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে খুব বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া আছে; বাঙ্গালার কবিওয়ালাদের ঢোল বাজানো অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ। এমনভাবে ঢোল বাজাইতে ভারতবর্ষের আর কোনো জাতি পারে না। বাঙ্গালির গৃহনির্মাণপদ্ধতিও স্বতন্ত্র। এমন ঘর ছাইতে ভারতবর্ষের, বুঝি বা পৃথিবীর আর কোনো জাতিতে পারে না। বাঙ্গালার আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপসকল সত্যই বিদেশীয়ের বিস্ময় উৎপাদন করিত; তেমনটি পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না—নাইও। বাঙ্গালার "পঙ্খের কাজ" বাঙ্গালির নিজস্ব; উহা বাঙ্গালার বাহিরে ছিল না,—নাইও। এখন সে "পঙ্খশিল্পের" নমুনা গবর্নমেন্ট হাউসের গোটাকয়েক স্তম্ভে বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন-কি, বাঙ্গালার জনার্দন, বিশ্বম্ভর, জনমেজয় প্রভৃতি কর্মকারগণ যেমন তোপ কামান তৈয়ার করিতে পারিত, দিল্লির কারিগরে তেমনটি পারিত না; জাহান-কোষা, দল-মাদল, কালে

খাঁ প্রভৃতি কামান এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বাঙ্গালির নৌশিল্প সত্যই অপরাজেয় ছিল। এমন নৌকা বানাইতে, জাল বুনিতে ভারতের আর কোনো জাতি পারিত না। বাঙ্গালার "ষাট বৈঠার ছিপে" চড়িয়া মির কাসেম এক রাত্রে গোদাগিরি হইতে মুঙ্গেরে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার আর একটা শিল্প ছিল—কুসুমশিল্প। নানা পুষ্পের আভরণ ও অলঙ্কার বাঙ্গালি যেমন তৈয়ার করিতে পারিত, এমন আর কোনো জাতি পারিত না। আওরঙ্গজেব-পুত্র যুবরাজ মহম্মদ পিতাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"কী আর মণিমুক্তা, চুনি পান্নার লোভ দেখাও পিতঃ, বাঙ্গালার কুসুমাভরণ দিল্লির জড়োয়া অলঙ্কার সকলকে হেলায় পরাজয় করে। এমনটি তুমি দেখ নাই।" সে শিল্প লোপ পাইয়াছে।

## বাঙ্গালি স্বতন্ত্র জাতি

আসল কথাটা কী জান, বাঙ্গালি আর্যাবর্তের আর্যগণ হইতে একটা সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি। বৈদিক যুগের সময় হইতে বাঙ্গালায় এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও মনুষ্যসমাজ বিদ্যমান ছিল। প্রাচ্যের সে সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বাঙ্গালায় বৈদিক ধর্ম, সভ্যতা, আচার ব্যবহার, কিছুই শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে নাই। যুগে যুগে, বারে বারে পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আমদানি করিয়াও বাঙ্গালায় যাগযজ্ঞাদির তেমন প্রচলন হয় নাই। এত আক্রমণেও বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালি জাতি স্বীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, উপরন্তু আগন্তুকগণকে বাঙ্গালার বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিতে পারিয়াছিল। স্বীকার করি বটে যে, বাঙ্গালি আর্যাবর্ত হইতে, আর্যগণের নিকট হইতে অনেক তথ্য, অনেক সিদ্ধান্ত, অনেক বিদ্যা সংগ্রহ করিয়াছিল; কিন্তু সে সকলকে বাঙ্গালির মনীষা যেন বাঙ্গালার কোমল, পেলব পলিমাটির আবরণ দিয়া এতই মধুর, এতই স্নিগ্ধ, এমনই রসাল করিয়াছিল যে, পরে উহা আর্যাবর্ত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদাবলির অনেকটা অংশ হিন্দুস্থানি কবি ও ভক্ত সুরদাস ও শ্যামদাসের অনুবাদ বলিলেও চলে; পরন্তু বাঙ্গালি মহাজন সে সকল ভাবের গানে এমন "আখর", এমন স্ফুটোক্তি বসাইয়াছেন, যে, কেবল তজ্জন্যই বাঙ্গালির পদাবলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উপাদেয় হইয়াছে। বাঙ্গালি আর্যাবর্তের অনুগামী হয় নাই বলিয়া মনে হয়, আর্যাবর্তের পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, তীর্থযাত্রা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে যাইয়া বাস করিলে "পুনঃ সংস্কারমর্হতি!" কেন না, বাঙ্গালায় দীর্ঘকাল বাস করিলে সোমরসপায়ী, গোঘ্ন আর্যগণের জাতিনাশ ঘটিত, তাহাদের বিশিষ্টতা নষ্ট হইত। বাঙ্গালায় জৈন ধর্মের প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। মহাবীর রাজমহলের কাছে কোনো গ্রামে ভূমিষ্ঠ হইয়া, জীবনের অর্ধেকটা কাল বর্ধমান-বিভাগে বা রাঢ়দেশে কাটাইয়াছিলেন; বাসুপূজ্য উত্তর-রাঢ়ে ও ভাগলপুর জেলার পূর্বাংশে জৈন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই জৈন ধর্ম বাঙ্গালির বিশিষ্টতার পুষ্টি পক্ষে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল। গোরক্ষনাথের "নাথী ধর্ম" বাঙ্গালার উত্তর-রাঢ়ে খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। এক পক্ষে জৈন তীর্থঙ্করগণ, অন্য পক্ষে গোরক্ষনাথের যোগী শিষ্যগণ বাঙ্গালির বিশিষ্টতার পুষ্টি পক্ষে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। আবার বলিব, বাঙ্গালি যজ্ঞবিলাসী, পশুবধে পটু সোমপায়ী

আর্য নহেন; বাঙ্গালারই কপিল কণাদ, বাঙ্গালাই অহিংসা পরম ধর্মের বেদি, বাঙ্গালাই জৈনাচার্যগণের লীলাক্ষেত্র, বাঙ্গালায় সিদ্ধাচার্যগণের প্রভাব এখনও ধর্ম-কর্মে, আচার-ব্যবহারে পরিস্ফুট। চিনিতে জানি না, চিনিতে পারি না, চিনিতে ভুলিয়াছি বলিয়া বাঙ্গালির ধর্ম-কর্ম, সাধনতন্ত্র, ভাবের ভাষা, রসের ভাষা প্রভৃতি সব ভুলিয়াছি। আমরা বাঙ্গালি হইয়াও বাঙ্গালার শ্লাঘায় আর শ্লাঘাবোধ করি না। এক বার তাকাও—মালঞ্চ-বেষ্টনী-পরিবৃত বাঙ্গালির নিজ নিকেতনের প্রতি সস্নেহে এক বার তাকাও,—জাতির অতীত ইতিহাসের মুকুরে স্বদেহের—স্বীয় সমাজ-শরীরের প্রতিবিম্ব দেখিয়া অধঃপতনের গভীরতা এক বার বুঝিয়া লও! তাহা হইলে আবার যেমন ছিলে, তেমনই হইবে, হারানিধি ফিরাইয়া পাইবে, তোমাদের শ্যামা জন্মভূমি তোমাদেরই হইবে।

উৎস : 'বঙ্গবাণী,' ভাদ্র ১৩২৯

# বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

হিন্দুসমাজ চারটি বর্ণ এবং অনেকগুলি জাতিতে বিভক্ত। উত্তর-পশ্চিম ভারতের চ্যালকোলিথিক উপনিবেশ ধ্বংসকারী আর্যগোষ্ঠী মূলত পুরোহিত, যোদ্ধা এবং উৎপাদক—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, রাজন্যবর্গ বা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। যে কোনো পুরোনো সমাজব্যবস্থাতেই এই ধরনের শ্রেণিবিভাজন অর্থাৎ দায়িত্ব অনুসারে প্রধান সামাজিক শ্রেণিগুলির প্রতিষ্ঠা ও বিভাগগুলির প্রচলন লক্ষ করা যায়। আর্য সমাজের এই শ্রেণিবিভাজনকে তুলনা করা যেতে পারে রোমান সমাজব্যবস্থার মিলাইট, ফ্ল্যামিন এবং কোয়ারাইটদের সঙ্গে অথবা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে সিজারের লিপিতে পাওয়া গ্যল-এর কেল্ট সমাজের ইক্যুইট, দ্রুইদ এবং প্লেবদের সঙ্গে। খাদ্য-সংগ্রহকারী উপজাতিদের আদিম সংস্কৃতি থেকে চ্যালকোলিথিক সভ্যতা পর্যন্ত সামাজিক বিকাশের সম্পূর্ণ বিন্যাস-এর ধারক ও বাহক দেশীয় অধিবাসীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ভারতে আসা আর্যদেরকে। আর্যরা তাদের পরাজিত করে এবং বশে আনে। বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থে পরাজিত এবং দমিত জনগোষ্ঠীকে দস্যু এবং দাস নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং তাদের বর্ণনা করা হয়েছে কৃষ্ণবর্ণ (কৃষ্ণত্বচ), ও চ্যাপ্টা-নাসিকাযুক্ত (অনাস) বলে, যাদের কথাবার্তা দুর্বোধ্য (মৃধ্রবচ), যাদের আনুষ্ঠানিক পশুবলি নেই (অযজ্ঞ), যারা ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন (অদেবায়ু), এবং যাদের প্রথাসমূহ অদ্ভুতধরনের (অন্যব্রত)। আপাতদৃষ্টিতে সংস্কৃতি ও জাতিগত বিশিষ্টতা—এই উভয়দিক থেকেই দেশীয় মানুষজন ছিল আর্যদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্বভাবতই আর্য বিজেতারা এই বিদেশী দস্যু এবং দাসদের, নিজস্ব সমাজবিভাজনের উপযোগী করে মানিয়ে নিতে পারেনি। এইসব বিজিত মানুষজনকে একত্রে একটি পৃথক শ্রেণিতে পরিণত করে নাম দেওয়া হল শূদ্র, যা তৈরি করল চতুর্থ বর্ণ। এই আর্যদের ভৃত্যে পরিণত হল শূদ্রগণ। আর্য ও অনার্যদের নিয়ে গঠিত এই যৌগিক সমাজব্যবস্থায় শূদ্রদের স্থান হল সর্বনিম্নে।

তত্ত্বগতভাবে বর্ণের অর্থ হল গুণ। সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের উদ্দেশ্যে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব প্রবণতা ও দক্ষতার মাধ্যমে প্রকাশিত সহজাতগুণের ভিত্তিতে এক একটি বিশেষ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হল। গুণানুসারে বর্ণ বিভাজনের ধারণাটি ব্যাপ্ত হল অন্যান্য বিষয়েও। বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভূমি এবং মন্দিরগুলিও বিভক্ত হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণিতে। কতগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে সমস্ত আর্য বর্ণগুলিই কতগুলি একই ধরনের অধিকার

ও বিশেষ সুবিধাকে অধিকার করেছে। আর্যরা, সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যে বর্ণই হোক না কেন প্রত্যেকেই দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিতীয়বার জাত। এই পরিচয়ে সম্মানিতরা সকলেই ছিলেন পবিত্রসূত্র গ্রহণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় জন্মের অধিকারী। দ্বিজ পরিচয়ে বৈদিক অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করার অধিকার ছিল তাঁদের এবং বর্ণাশ্রমধর্মের ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থ—এই প্রথম তিনটি অবস্থায় নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিকারীও ছিলেন তাঁরাই।

মূলত বর্ণ বিভাগগুলি বংশগত অথবা বংশকুলের মধ্যে বিবাহ দ্বারা আবদ্ধ স্বতন্ত্র গোষ্ঠী ছিল না। কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার পিতার অনুসৃত পেশা থেকে সরে এসে ভিন্ন বর্ণ অবলম্বন করা সম্ভবপর ছিল। মহাজ্ঞানী ভৃগু রচনা করেছিলেন স্তোত্র, কিন্তু তাঁর বংশধরেরা দক্ষ হয়েছিলেন রথ-নির্মাণে, যা কিনা আসলে বৈশ্যদের পেশা। জানা যায় বেশ কিছু ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। বিশ্বামিত্রর মতো বিখ্যাত উদাহরণ ছাড়াও দেবপি, গর্গ, মুদ্‌গলা, হারীত এবং কন্ব—প্রমুখের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসব ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণের পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে আবার দেখা যায় ব্রাহ্মণরাও অবলম্বন করেছিলেন ক্ষত্রিয়দের বৃত্তি। পরশুরাম, দ্রোণ এবং কৃপ তার কয়েকটি মাত্র উদাহরণ। বর্ণ হিসাবে মগধের মৌর্যবংশ আসলে ছিল বৈশ্য অথবা শূদ্র। কিন্তু পরবর্তীকালে মৌর্যদের পরিচিতি ঘটে ক্ষত্রিয় হিসেবে। জানা যায় বৈশ্যগণও ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন, যেমনটা ঘটেছিল নবগরিষ্ঠ-এর দুই পুত্রের ক্ষেত্রে। প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থসমূহে আন্তর্বর্ণ বিবাহের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি বর্ণ যখন বংশগত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল, তখনও কোনো ব্যক্তি সমাজে তার পদমর্যাদাকে সঙ্কটাপন্ন না করেই ভিন্ন, এমনকি নিম্নবর্ণে বিবাহ করতে পারত।

তৎসত্ত্বেও বর্ণ বিভাগগুলিকে একটি ক্রমোচ্চবিন্যাসে বিভাজনের একটা প্রবল ঝোঁক দেখা দিল। ব্রাহ্মণরা শিক্ষিত পুরোহিত শ্রেণির মানুষ; পবিত্র জ্ঞানরাশির ভাণ্ডার, জাদুমন্ত্র এবং শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ। তাঁদের পেশা ছিল শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা করা এবং শিক্ষাপ্রদান। রাজপদ অলংকরণ ও সৈন্যবাহিনী গঠন করল ক্ষত্রিয়গণ। পদাধিকার বলে তাঁরা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সামরিক ক্ষমতার অধিকারী হলেন। বৈশ্যরা ছিলেন কৃষক, কারিগর ও ব্যবসায়ী। পূর্ণ বিকশিত বর্ণ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণরা পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করলেন। অব্যবহিত পরবর্তী স্থান অধিকার করলেন ক্ষত্রিয়। তবে পদমর্যাদার এই অগ্রাধিকার নিয়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বহুকাল ধরে তিক্ত বিবাদ-বিসংবাদ চলেছিল। সামরিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের সামাজিক ক্ষমতাও নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণরা অনমনীয়ভাবে ক্ষত্রিয়দের সেই প্রচেষ্টা প্রতিহত করে। ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের ও ক্ষত্রিয় রাজাদের এবং সৈন্যবাহিনীকে স্বশাসনে আনার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিল বিরোধের আর একটি কারণ। এই প্রসঙ্গে বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র, শক্তি ও কল্মাষপাদ, পরশুরাম ও ক্ষত্রিয় রাজাগণ, বৈশম্পায়ন এবং জন্মেজয়ের সংঘর্ষের কাহিনীগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্ষমতা এবং সামাজিক এই পূর্বাধিকার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিসমাপ্তি একবারে ঘটেনি, বরং সময়ে সময়ে তার পুনরুদয় ঘটেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণরাই জীবনযাত্রার ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পদমর্যাদা অর্জনে সফল হয়েছিলেন। অন্যদিকে মন্ত্রী, পুরোহিত

এবং রাজা কর্তৃক প্রেরিত দূত হিসাবেও ব্রাহ্মণকুলের যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্জিত হয়। কিন্তু ক্ষত্রিয়রা, যাঁরা সামাজিক এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা এই উভয়ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণদের নিচে স্থান পেলেন, তাঁরা কখনই রাজনৈতিক ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকার লাভ করতে পারেননি। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত, যখন থেকে উত্তর ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতীক মগধের সিংহাসন অধিকার করলেন নন্দ নামে এক শূদ্র পরিবার, তখন থেকে ভারতের বেশির ভাগ রাজবংশই হল বর্ণ হিসাবে অক্ষত্রিয়। উত্তর ভারতের কিছু কিছু রাজপরিবার, যেমন শুঙ্গ এবং কম্ব-রা ছিলেন ব্রাহ্মণ। প্রায় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং সমুদ্রপথে ব্যাবসাবাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্যগণ খুব সমৃদ্ধিশালী এবং ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন এবং নিজেদের একটি গোষ্ঠীতে পরিণত করেন। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত সময়ে তাঁরা বেশ কিছুটা রাজনৈতিক ক্ষমতাও অর্জন করেছিলেন এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তবু তাঁরা সবসময়েই ক্ষত্রিয়দেব নীচে তৃতীয় বর্ণ হয়েই থেকে যান এবং কখনই সামাজিক পদমর্যাদার পূর্বাধিকার নিয়ে ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি।

পরিশেষে বর্ণব্যবস্থার ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাস বংশগত হয়ে দাঁড়াল এবং ধর্মশাস্ত্রগুলির অনুমোদনে বর্ণগুলি স্বতন্ত্র এবং অন্তঃগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক কতগুলি দলে বিভক্ত হল। তত্ত্বগতভাবে বিভিন্ন বর্ণগুলির ক্রিয়াকর্ম ও চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত গুণাবলির পূর্ববর্তিতার উপর ভিত্তি করেই এই ক্রমোচ্চ বিন্যাস নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণদের সত্ত্বগুণ পবিত্রতম। সুতরাং পবিত্রতার মাত্রা ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি ঃ তাঁরা পবিত্রতার প্রতিমূর্তি এবং মর্ত্যলোকে তাঁরাই ভগবান। পবিত্রতার মাত্রার ক্রমহ্রাস ঘটে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের প্রদর্শিত গুণাবলিতে, রজঃ ও তমঃ গুণে। নিম্নতম বর্ণ শূদ্রগণ এধরনের কোনো গুণই প্রদর্শন করে না। ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্ত যা কিনা পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে বিবেচিত হয়েছে—তার মধ্যে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণরা মহাপুরুষ অর্থাৎ সেই সর্বোচ্চ অস্তিমানের মুখ থেকে উদ্ভূত, ক্ষত্রিয়রা তাঁর বাহু, বৈশ্যরা তাঁর উরু এবং শূদ্রদের উদ্ভব হয়েছে তাঁর পা থেকে। পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার ভিত্তিতে, বর্ণের এই ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাসের যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে যে তত্ত্ব, তাকে বিপুলভাবে গ্রহণ করেছে হিন্দুসমাজ। প্রধান আইন প্রণেতারা, যেমন মনু, বর্ণগুলির নিজ নিজ অবস্থানকে এই তত্ত্বের উল্লেখ করেই ব্যাখ্যা করেছেন।

২

এটা জানা যায় না যে, বর্ণ ব্যবস্থার পূর্বকল্পিত প্রসারের ফলেই জাতি ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল কিনা, নাকি জাতি ব্যবস্থা ভারতের প্রাক্-আর্য চ্যালকোলিথিক সভ্যতায় বিদ্যমান শ্রমের ভিত্তিতে ক্রমোচ্চ সামাজিক বিভাজনেরই একটি ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ, যা আর্য সংস্কৃতি প্রভাবিত বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে পরে সমন্বিত হয়েছিল। যাই হোক, হিন্দু সমাজের চরিত্র ও গঠন বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, জাতিব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে প্রধানত পর্বত ও অরণ্যবাসী দেশীয় উপজাতি সমূহের এবং চ্যালকোলিথিক বাসিন্দাদের সম্প্রসারণশীল হিন্দুসমাজে আত্মভূতকরণের মাধ্যমে। রক্ষণশীল ধর্মশাস্ত্র অথবা

পুরাণ অনুযায়ী জাতিগুলির উদ্ভব হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের নারী ও পুরুষের মিলনের ফলে। তারপর জাতির শ্রেণিবিভাগ ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে সম্প্রসারিত হয়েছে ভিন্ন বর্ণ এবং জাতির মধ্যে অথবা ভিন্ন জাতিগুলির মধ্যেই বিবাহের ফলে। প্রসরণশীল আর্য ও দেশীয় অনার্যদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক ছিল অবশ্যম্ভাবী। বস্তুত প্রাচীন সংস্কৃত এবং পালি গ্রন্থে আন্তর্বর্ণ বিবাহের বহু উল্লেখ রয়েছে। এটা সম্ভব যে বর্ণবিভাগ যেহেতু দৃঢ় এবং বংশগত হয়ে উঠল, সেইহেতু আন্তর্বর্ণ বিবাহজাত সন্তানেরা শেষে একটি ভিন্ন শ্রেণিতে পর্যবসিত হল। তাই জাতি সমূহের উদ্ভব সম্পর্কে গোঁড়া মতবাদে খানিকটা সত্য হয়ত নিহিত আছে। কিন্তু মোটামুটিভাবে তত্ত্বটি নানা সংস্কৃতি থেকে বিভিন্ন জাতির দলগুলির হিন্দু সমাজের ভিতরে আত্মভূত হওয়ার পদ্ধতিকেই আর্য আদর্শের যুক্তি দিয়ে বিচার করার চেষ্টা করেছে।

ভারতের বিভিন্ন অংশে আর্য সংস্কৃতির প্রসারই পর্বত ও অরণ্যবাসী উপজাতিদের নিয়ে গঠিত দেশীয় মানুষজনকে ও চ্যালকোলিথিক জনবসতিগুলিকে হিন্দুসমাজের বিরোধী করে তুলেছিল। চ্যালকোলিথিক জনবসতিগুলি আর্যসংস্কৃতির নেতৃবর্গের কাছে পরাভূত হয় ও হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূত হয় এবং নিশ্চিতভাবে হিন্দুসমাজও চ্যালকোলিথিক সংস্কৃতির প্রযুক্তিবিদ্যার অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হয়েছিল। পাহাড়, পর্বত ও অরণ্যের উপজাতিগুলিও ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের প্রভাবাধীন হল। ভাস্কর্য ও নির্মাণকাজের জন্য প্রস্তর মূল্যবান রত্ন এবং সর্বোপরি ধাতু সন্ধানের উদ্দেশ্যে আর্য সংস্কৃতির বাহকরা পর্বতে ও জঙ্গলে অনুসন্ধান শুরু করে। অন্যদিকে উপজাতিরাও হিন্দু বসবাসকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল তাদের তৈরি জিনিসপত্র, যেমন ঝুড়ি, দড়ি, অরণ্য থেকে সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রী, দেশীয় উপায়ে নিষ্কাশিত লোহা ও তামা ইত্যাদি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে। হিন্দুসমাজের সঙ্গে সংযোগ নিশ্চিতভাবেই উপজাতিদের সংস্কৃতি ও জীবনকে প্রভাবিত করেছিল এবং তাদের কাছে হিন্দুদের উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যা এবং উৎপাদন ও বণ্টনের সুপরিচালিত ব্যবস্থা অত্যন্ত আকর্ষণীয় এমনকি দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল। হিন্দু সমাজের প্রভাব উপজাতিদের উৎপাদন ও বণ্টনের পদ্ধতিগুলিকে পরিবর্তন করল। পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই উপজাতিগুলি শেষে পরিণত হল হিন্দুসমাজের নিম্নপদস্থ জাতিতে। পরিবর্তিত উপজাতীয় দলগুলি হিন্দুজাতি হিসেবে স্থায়ী চাষাবাদ-এর কাজ গ্রহণ করল এবং অঙ্গীভূত হল জাতি-ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, যাতে জাতিগুলির পেশা ছিল নির্দিষ্ট এবং উৎপাদন ও কর্মবণ্টন ছিল নিয়ন্ত্রিত। হিন্দুসমাজের সামর্থ্য ও স্থানীয় চাহিদা অনুসারে প্রত্যেকটি দলের উপরে ভার ছিল একটি নির্দিষ্ট কর্মের। ধারণা করা হত দলটি বংশগতভাবে সেই পেশা চালিয়ে যাবে। উপজাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক বৃত্তি উপভোগের স্বাধীনতা থেকে নবাগতদের বঞ্চিত করল জাতিব্যবস্থার নিয়ম কানুন। কিন্তু হিন্দুসমাজের ভিতরে নিজেদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, পুরোনো বিশ্বাস, প্রথা এবং আচার-আচরণ রক্ষা করার অনুমতি তাদের দেওয়া হল। যদিও রূপান্তরিত উপজাতিদের মধ্যে হিন্দুসমাজের সাংস্কৃতিক আদর্শে, বিশেষত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণের মাধ্যমে, নিজেদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে নেওয়ার একটা অবশ্যম্ভাবী ঝোঁকও দেখা দিয়েছিল। হিন্দু সমাজাদর্শ সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের এই প্রচেষ্টাগুলিকে স্বীকার করে নেয় এবং মেনে নেয় সমাজের নিম্ন-স্তরের জাতিগুলির দ্বারা সাধিত পরিবর্তনগুলিকে। হিন্দু সমাজের উচ্চস্তরও নিজেদের

সাংস্কৃতিক আদর্শে উপজাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলিকে কিছুটা পরিবর্তিত করে গ্রহণ করেছিল। একে অন্যের সভ্যতা থেকে প্রথাদি গ্রহণের এই প্রণালি হিন্দু সমাজের অন্তর্গত অন্যান্য জাতিগুলির সঙ্গে নিম্নস্তরের জাতিগুলির একীভবনে সহায়তা করে। হিন্দু সমাজের ভিতরে অন্য সংস্কৃতি থেকে প্রথাসমূহ গ্রহণের এই ধারার ফলেই হিন্দু সংস্কৃতি প্রশস্ত বনিয়াদযুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সংঘবদ্ধ করেছে অসংখ্যস্তরের সাংস্কৃতিক গুণাবলিকে, যেগুলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে একে অপরের বিরুদ্ধাচারী বলে প্রতিভাত হতে পারে।

৩

বহিরাগতদের আত্মভূতকরণ এবং নিচুস্তরের জাতিদের সাংস্কৃতিক রূপান্তর হিন্দুসমাজের একটি বিরামহীন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, কিন্তু বর্ণব্যবস্থাই প্রাথমিক কাঠামোর জোগান দিয়েছে, তার মধ্যেই হিন্দু সমাজের প্রসার এবং অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনগুলি সাধিত হয়েছে। দেখতে পাওয়া যায় যে বর্ণব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলিই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশদীকৃত হয়েছে জাতিব্যবস্থার মধ্যে। বর্ণ-ভিত্তিক সাধারণ শ্রমবিভাজন সম্প্রসারিত হল জাতিব্যবস্থার মধ্যে পেশাগত বিভেদীকরণের বিশদ ব্যবস্থায় এবং বিভিন্ন দলের পারস্পরিক সম্পর্কে। আর্যসংস্কৃতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্যশ্রেণী ধীরে ধীরে কায়িক শ্রমসাপেক্ষ পেশা ত্যাগ করে ব্যাবসা ও তেজারতির মতো কাজকর্মে পূর্ণ মনোযোগ দিল। শূদ্রদের মূল পেশার সঙ্গে কৃষিকার্য, পশুপালন এবং কারিগরি শিল্পের কাজ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। অন্য যে কোনো পেশার থেকে কৃষিকার্যই অধিক সংখ্যক লোকের উপযোগী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে যারা হিন্দুসমাজের ভেতরে ঠাঁই পেল তাদের বেশির ভাগেরই চাষাবাদ সম্পর্কে খানিকটা অভিজ্ঞতা ছিল। যথার্থই কৃষিকার্য নানা জাতির সাধারণ পেশা হয়ে দাঁড়াল। কৃষিকর্মে রত জাতিগুলি খাদ্য এবং অর্থকর উভয়প্রকার শস্যই উৎপাদন করত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কয়েকটি দল বিশেষ ধরনের শস্য যেমন তুঁত এবং পান-এর চাষে বিশেষজ্ঞ হয়েছিল। কৃষক সমাজে এই বিশেষজ্ঞ দলগুলি বিশিষ্ট বলে চিহ্নিত হত। উদারহণস্বরূপ বাংলাদেশে পান-চাষি বারুইরা অন্য কোনো শস্যের চাষ করে না এবং একটি স্বতন্ত্র জাতি গঠন করে। বাংলাদেশের কিছু কিছু অঞ্চলে তুঁত-চাষি কৈবর্তগণ তুঁতে-কৈবর্ত নামে পরিচিত, যেহেতু তারা তুঁত-চাষে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু সাধারণত কৃষকজাতিগুলিকে বিশেষ বিশেষ শস্যে বিশেষজ্ঞ হতে দেখা যায় না। সব কৃষক জাতিগুলিই বাংলার প্রধানতম ফসল ধান-এর চাষ করে। তাদের মধ্যে কেউই তুলা কিংবা ইক্ষু চাষে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেনি, যদিও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সুতিবস্ত্র এবং শর্করা ছিল প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য। এমনকি রেশমগুটি চাষ করা তুঁতে কৈবর্তরাও ধান-এর চাষ করত।

কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিল্প, নানা সামগ্রীর ব্যাবসা এবং সমাজে বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজকর্ম—সবই বিশিষ্ট এবং বিশেষ দক্ষতার পেশা হিসাবে পরিগণিত হত, যেগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি জাতির জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। এইভাবেই কারিগরদের মধ্যে রয়েছে তন্তুবায় বা তাঁতি, কর্মকার বা কামার, মোদক বা ময়রা, সূত্রধর বা ছুতার, চর্মকার বা চামার বা মুচি, শাঁখারি, তেলি, কাঁসারি, শুঁড়ি এবং ডোম (যারা ঝুড়ি তৈরি করত)। ব্যবসায়ীদের মধ্যে রয়েছে গন্ধবণিক, তাম্বুলিবণিক এবং সুবর্ণবণিক আর সেবক জাতিদের মধ্যে নাপিত, ধোপা এবং হাড়ি। নির্দিষ্ট পেশার বিভিন্ন দলগুলিকে বিশিষ্ট

জাতি হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু একই সময়ে কৃষক, ব্যবসায়ী, কারিগর এবং সেবক জাতিগুলি বর্ণ হিসাবে শূদ্র বলে পরিচিত। বিশেষজ্ঞ পেশাদার দলগুলি প্রচুর সংখ্যায় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জাতিগুলির সংখ্যা বর্ণের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশি। বেশির ভাগ ব্যক্তিই জাতিগুলির পেশাদার গোষ্ঠীগুলির অন্তর্গত, যাদের মধ্যে সমাজের প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্বগুলি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। বর্ণ অপেক্ষা জাতির পরিভাষায় হিন্দুসমাজের কাঠামোটিকে বেশি ভালো করে বুঝতে পারা যায়। এই অবস্থায় বর্ণ দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে, বাংলার মতো অঞ্চলে যেখানে দেশীয় মানুষদের মধ্যে কোনো ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নেই, সেখানে ব্রাহ্মণরাও একটি জাতি হিসেবে পরিচিত, যদিও তাদের বর্ণশ্রেষ্ঠ বা সর্বোচ্চ বর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মনু (খ্রিস্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতক) রচিত "ধর্মশাস্ত্র"য় যেখানে পঞ্চাশটি জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেখানে পেশা ও জাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করা আছে। ১৮৭২ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে আদমশুমারির বিবরণে এবং আধুনিক জাতি-বিদ্যাসংক্রান্ত গ্রন্থগুলিতে ভারতবর্ষে যতগুলি জাতির সংখ্যা গণনা করা হয়েছে তা মনু রচিত গ্রন্থে অথবা পুরাণসহ অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি। আধুনিক গণনায় ভারতবর্ষে বিদ্যমান জাতিগুলির সংখ্যা ৩০০০-এরও বেশি। আধুনিক গ্রন্থগুলি আরও নির্দেশ করে যে প্রতিটি জাতি এক একটি বিশেষ পেশার সঙ্গে পুরুষানুক্রমিকভাবে যুক্ত ছিল। সেই একই অথবা সেই ধরনের পেশাগুলি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির জন্য নির্দিষ্ট ছিল বলে জাতিগুলির ক্রমশ সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। পুরুষানুক্রমে অনুসৃত একটি জাতির পেশাকে ধরা হয় তার একচেটিয়া সম্পত্তি, অন্য কোনো জাতির তাতে ভাগ বসানোর অধিকার নেই। কেবলমাত্র কৃষিকার্যের বেলাতেই এই নিয়ম শিথিল হয়েছে। কৃষিকার্যই সময়ে সময়ে এই নতুন দলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, বিশেষত যখন কর্ষণযোগ্য ভূমি পাওয়া গেছে। সম্ভবত বাড়তি জমির সংস্থানের জন্যই কৃষিকার্য কৃষকজাতিগুলির একচেটিয়া বলে বিবেচিত হয়নি। কিন্তু কারিগরি শিল্পে, ব্যবসায়ে এবং সেবামূলক কাজে সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির অধিকার চরম ও একচেটিয়া, এবং সেই কারণেই অলঙ্ঘনীয় বলে বিবেচিত হত। একটি বিশেষ জাতির সংরক্ষিত অধিকারে যাতে অবৈধ হস্তক্ষেপ না হয় সেদিকে নজর রাখত গ্রাম-পঞ্চায়েত বা স্থানীয় ব্রাহ্মণকুল অথবা স্থানীয় শাসক। সাধারণ অবস্থায় কেউই অন্যজাতির পেশা অবলম্বন করার চেষ্টা করে না, পাছে জাতির নিয়মগুলি, যেগুলিকে ধর্মীয় অনুমোদনে প্রামাণিক বা নির্ভরযোগ্য বলে বিশ্বাস করা হয় এবং যেগুলির ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত গুরুত্ব আছে, সেগুলি লঙ্ঘন করা হয়। জাতির নিয়ম কানুন লঙ্ঘন করলে ভ্রষ্ট ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবনের প্রত্যাশা বিপন্ন হবারই সম্ভাবনা। বর্তমান জীবনে সে নিশ্চিতভাবে গোটা সমাজের বিরেধিতার সম্মুখীন হবে, এমনকি তার সামাজিক শাস্তির সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে।

এইরকম সম্পূর্ণভাবে প্রতিযোগিতাহীন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিব্যবস্থা প্রতিটি ব্যক্তির জীবিকা নিশ্চিত করেছিল এবং তাকে ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা দিয়েছিল। সাধারণভাবে সমাজে এই ব্যবস্থা সীমিত সংগতির বাধার মধ্যেও সুষম উপায়ে উৎপাদন ও বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। কোনো বিশেষ কাজে বংশগত একচেটিয়া অধিকার

জাতিগুলিকে নিজ নিজ পেশায় বিশেষ কার্যক্ষমতা অর্জনের এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সেই জ্ঞান পিতা থেকে পুত্রে প্রদানের সুযোগ দিয়েছিল।

এইধরনের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা ভারতবর্ষে অন্ততপক্ষে সপ্তম শতক থেকে বিদ্যমান আঞ্চলিক অর্থনীতির অভাব ও নিশ্চল অবস্থার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল বলে মনে হয়। বস্তুত, তত্ত্বগত এবং ঐতিহাসিক—এই উভয়দিক থেকেই হিন্দু সামাজিক সংগঠন—হয় একটি বৃহৎ গ্রাম, না হয় অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রামের সমষ্টি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এই ধরনের প্রতিটি একক এরই জীবনের বেশিরভাগ প্রয়োজন মেটানোর নিজস্ব অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ছিল। সাধারণত, এককগুলির জনবসতি গঠিত ছিল কয়েকটি কৃষক জাতি এবং কিছু কারিগর এবং সেবক জাতিদের নিয়ে, যেমন, ব্রাহ্মণ, তাঁতি, কামার, কুমার, ছুতার, ময়রা, গন্ধবণিক, নাপিত, ধোপা, মালাকার, ডোম বা বাগ্‌দি, হাড়ি, চামার ইত্যাদি। এই জাতিগুলি একত্রে বিজড়িত ছিল একটি পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরতার সম্পর্কে, যেখানে তারা একে অপরের প্রয়োজনের জোগান দিত। তারা নিজেদের মধ্যে সেবা ও পণ্যদ্রব্যসমূহ বিনিময় করত। কৃষক জাতিগুলি কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামতের বিনিময়ে কামার ও ছুতারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান দিত। একই উপায়ে নাপিত অথবা ধোপার মতো সেবক জাতিগুলির পাওনা মেটাত কৃষকজাতিগুলি এবং ভূমির অধিকারী অন্যান্য লোকজন। পারস্পরিক সমন্বয়-ভিত্তিক ব্যবস্থায় তাঁতি, কামার, ছুতার, নাপিত এবং ধোপা একে অপরের জন্য কাজ করত। সময়মতো অপরের চাহিদা মেটানো প্রতিটি জাতিরই একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। সমাজে লভ্য সেবা বা দ্রব্যসমূহ আশানুরূপ উন্নতমানের না হলেও হয়ত কোনো দল বা স্বতন্ত্র ব্যক্তির পক্ষে তা অস্বীকার বা বাতিল করা সম্ভব হত না। একটি এককে যদি প্রত্যেকটি জাতি তাদের নিজেদের ঐতিহ্যিক বংশগত পেশাতেই নিযুক্ত থেকে পারস্পরিক নির্ভরতা আর সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে যেত তাহলে হয়ত ধাতু এবং লবণ ছাড়া দৈনন্দিন প্রয়োজনের আর কোনো জিনিসের জন্যই তাদের বাইরের কারও উপরে নির্ভর করার প্রয়োজন হত না। এইভাবে জাতিব্যবস্থা দ্রব্যসমূহ ও সেবার মান না হলেও, সমাজের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির সুষম সরবরাহ সুনিশ্চিত করেছিল এবং সুরক্ষিত করেছিল সমাজের দুর্বলশ্রেণিগুলিকে, এমনকি তা করা হয়েছিল দক্ষতার বিচার না করে বা বিসর্জন দিয়ে।

দেশীয় ব্যক্তিদের আত্মভূতকরণের মাধ্যমে আর্যসংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি, কারিগরি শিল্প এবং পশুপালন, যা বৈশ্যদের পেশা ছিল, তা ক্রমে শূদ্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হল। কারণ বৈশ্যরা নিজেদের কায়িক পরিশ্রম থেকে সরিয়ে নিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শূদ্ররাও ব্যাবসাবৃত্তি গ্রহণ করেছিল। যদিও বৈশ্যরা বর্ণের ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগে সর্বনিম্ন পদাধিকারী, তবুও আর্য হওয়ার সুবাদে তারা কিছুটা সমীহা দাবি করল। আর্য দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের অনুসৃত পেশাও সম্মানের বলে বিবেচিত ছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে পেশাগুলির সঙ্গে কায়িক পরিশ্রম জড়িত ছিল সেগুলির সঙ্গে অধীন হওয়ার দৌলতে আর্যসমাজের বাইরে থেকে আসা অনার্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী দলগুলি সংযুক্ত হয়ে পড়ল। ফলে আর্য সংস্কৃতির প্রচারকদের অবজ্ঞা পেল। পরিণতি-স্বরূপ তাদের সঙ্গে জড়িত পেশাগুলি চিহ্নিত হল নিচু এবং অপবিত্র বলে।

বর্ণব্যবস্থার ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ এবং সামাজিক ব্যাপার হিসেবে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণা শূদ্রগণের অভ্যন্তরীণ গঠন এবং শূদ্রজাতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ককে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অন্বিত করেছিল। কঠোর নিয়মানুবর্তীভাবে জাতিগুলি ক্রমোচ্চ শ্রেণিসজ্জায় সজ্জিত। অপেক্ষাকৃত পবিত্রতর জাতিগুলি ক্রমোচ্চ বিন্যাসে উপরের ধাপে অবস্থিত। পবিত্রতার দরুণ উচ্চ জাতিগুলির উৎকর্ষ অর্জনের যোগ্যতা অপেক্ষাকৃত বেশি বলে বিবেচিত হয়। অপবিত্রতার মাত্রা ধাপে ধাপে নিচের সারিগুলিতে সমানে বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উৎকর্ষ অর্জনের যোগ্যতাও ক্রমে হ্রাস পায়। কিন্তু একদিকে ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগে জাতিগুলির পদমর্যাদা ও অন্যদিকে তাদের পেশাগুলির সঙ্গে যুক্ত প্রয়োগবিদ্যা এবং পেশাগুলির উন্নতির সম্ভাবনার মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্কও চোখে পড়ে। বাংলায় বৈদ্যরা, যারা চিকিৎসক এবং কায়স্থরা, যারা পেশায় মূলত লেখক বা করণিক, তারা জাতি হিসাবে পুরুষানুক্রমিকভাবে জমির মালিক হিসাবেও প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারাই শূদ্রগণের অভ্যন্তরীণ ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগে একেবারে শীর্ষে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে 'সৎ' শূদ্রজাতিগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। প্রধান কারিগর জাতিগুলি এবং বেশির ভাগ ব্যবসায়ী জাতিগুলি সৎ শূদ্র বলে বিবেচিত হয়, যদিও তাদের স্থান বৈদ্য এবং কায়স্থদের নীচে। কৃষক জাতিগুলির মধ্যে পানচাষি বারুই এবং ফুল-চাষি মালাকার, যারা মালাও গাঁথে, তারাও মূলত শুদ্ধ শূদ্রগণের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু এই দুটি জাতি ছাড়া আর সব কৃষক-জাতিই নিশ্চিতভাবে শুদ্ধ শূদ্রদের তুলনায় ছিল নীচের সারিতে। কারিগরদের আয় কৃষকদের আয়ের থেকে মোটেই বেশি ছিল না। কিন্তু তাদের উচ্চতর পদমর্যাদার কারণ হয়তো তারা তাদের কাজে কোনো না কোনো যন্ত্রের ব্যবহার করত এবং কৃষকদের জমিকর্ষণ, বীজবপন, জলসেচন এবং ফসল কর্তনের মতো তাদের খোলা মাঠে পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ত না। প্রযুক্তিবিদ্যার মান এবং শাস্ত্রীয় আচারগত পদমর্যাদার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কিছুটা বেশি ভালো করে প্রদর্শিত হয় বাংলার বিভিন্ন শ্রেণির বয়নকারীদের নিজ নিজ পদমর্যাদায়। তন্তুবায়রা মোটা কাপড় প্রস্তুত করে, কিন্তু তারা নানাধরনের অত্যন্ত মিহি সূতি এবং রেশমি বস্ত্রবয়নেও কুশলী। তারাই বয়নকারীদের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং তাদের স্থান সৎ শূদ্রদের সারিতে। যোগী এবং শুক্লিরাও পুরুষানুক্রমিকভাবে তাঁতি। কিন্তু যোগীরা তৈরি করে নিকৃষ্ট শ্রেণির বস্ত্র, মোটা কম্বল এবং ফিতে। শুক্লিরা তৈরি করে মোটা কাপড়। এই দুই জাতির সামাজিক পদমর্যাদা তন্তুবায়দের তুলনায় অনেক নীচে। তারা হল নিম্নস্তরের 'অ-সৎ' শূদ্র। ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগে সর্বনিম্নস্থান অধিকার করে চোলাইকারী, জেলে, ঝুড়ি প্রস্তুতকারী, চর্মকার এবং শিকারির মতো দলগুলি। তাদের প্রযুক্তিবিদ্যা আদিম এবং তাদের পেশাগুলি থেকে আয়ের সম্ভাবনাও অত্যন্ত কম।

হিন্দুসমাজের, বিশেষত স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদের মতন গোঁড়া আদর্শ অনুযায়ী, কোনো জাতির অর্জিত সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাত্রা এবং ক্রমোচ্চ শ্রেণিতে জাতিগুলির অবস্থানের মধ্যেও একটি পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। এই দিক দিয়ে বৈদ্য এবং কায়স্থরাই সবচেয়ে অগ্রসর জাতি। পরপর নিম্নতর সারির জাতিগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবের মাত্রা ক্রমশ হ্রাস পেতে দেখা যায়। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাত্রা নামমাত্র দেখতে পাওয়া যায় ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগের নিম্নতম ধাপের জাতিগুলির মধ্যে অর্থাৎ অন্ত্যজদের মধ্যে,

যেমন বাগ্‌দি, বাউরি, মুচি, ডোম এবং হাড়ি, যারা তাদের উপরের জাতিগুলির চেয়ে তাদের মূল সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনেক বেশি পরিমাণে আঁকড়ে ধরে ছিল।

নিঃসন্দেহে, উপরে নির্দেশিত নকশার মধ্যে পড়ে না এমন কিছু জাতিও আছে। ছুতার এবং সোনারগণ অ-সৎ শূদ্র বলে পরিচিত, যদিও তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং কলাকৌশল তাঁতি বা কুমারদের অপেক্ষা খুব নিকৃষ্ট মানের নয়। সৎ শূদ্র জাতিগুলির থেকে তারা সংস্কৃতিগতভাবেও পশ্চাদপদ নয়। সুবর্ণবণিক, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবসায়ী এবং তেজারতির কারবারি তারাই হল সবচেয়ে সমৃদ্ধ জাতি। সাংস্কৃতিক দিক থেকে তারা সৎ শূদ্র ব্যবসায়ী জাতিগুলির মতোই উন্নত। কিন্তু তবুও তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অ-সৎ শূদ্রদের মধ্যে। প্রয়োগবিদ্যার উন্নতি সত্ত্বেও নিচের সারিতে হীনপদস্থ হওয়ার দরুণ বা সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার ফলেই হয়তো ব্যতিক্রমী ঘটনাগুলির উদ্ভব। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে, জাতির ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাসে উচ্চতর পদগুলির অধিকারী সেইসব জাতিই, যারা অপেক্ষাকৃত উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যার প্রদর্শক, অধিক সমৃদ্ধিশালী, অন্তত তার সম্ভাবনাপূর্ণ এবং যারা সাংস্কৃতিক দিক থেকে বেশি উন্নত। পবিত্রতার মাত্রাও এইসব জাতিতে অধিকতর। অন্ত্যজ জাতিগুলি, যারা আদিম প্রযুক্তিবিদ্যাসম্পন্ন, তারা সাধারণত, দরিদ্রতম এবং হিন্দুসমাজে তারাই সংস্কৃতিগতভাবে সবচেয়ে অনগ্রসর অংশ।

শুচি এবং অশুচির ধারণাটিকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিশদীকৃত নিয়মাবলির রূপ দেওয়া হল। বংশকুলের মধ্যেই বিবাহ জাতিগুলির দ্বারা অনুসরণীয় এক কঠোর নিয়ম। সমান সারির জাতিগুলির মধ্যেও বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ। একটি বিশেষ বৃত্তিতে বংশগতভাবে বিশেষজ্ঞতা অর্জনে অটল কোনো দলের কাছে ভিন্ন বৃত্তির কোনো পাত্রী বিবাহের ক্ষেত্রে আর কাম্য নয়। এছাড়া সমসারির জাতিগুলির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে নিষেধের আর একটি কারণ হল সম্ভবত, এই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে সংস্কৃতিগত পার্থক্যগুলি, যার প্রকাশ ঘটে মূল সংস্কৃতি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ অভ্যাস, আচরণ এবং প্রথাসমূহের মধ্যে। প্রতিটি জাতিই অপর জাতির বিশেষ ধরনের অভ্যাস, প্রথা এবং আচরণসমূহকে কিছুটা অপবিত্র বলে মনে করত। সুতরাং তাদের সংস্পর্শে নিজেদের মর্যাদা দূষিত হতে পারে। একই সারির ভিন্ন ভিন্ন জাতি একই ভূমিতে একসঙ্গে আহার করতে পারে, কিন্তু নিম্নতর পদমর্যাদার ব্যক্তিগণ সেই জায়গায় প্রবেশের অনুমতি পায় না, তাহলে আহার্য অশুচি হতে পারে। অবশ্য সমপদমর্যাদার ভিন্ন ভিন্ন জাতি সবসময়ে যে একই হুঁকো থেকে ধূমপান করত তা নয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, কায়স্থরা, যারা সৎ শূদ্র বলে পরিগণিত তারা অন্য সৎ শূদ্র ব্যবসায়ী বা কারিগরদের ব্যবহৃত হুঁকো থেকে ধূমপান করে না। আপাতদৃষ্টিতে জমির মালিকানার ঐতিহ্য কায়স্থদের মধ্যে একটা অহংকারবোধের সঞ্চার করেছিল, যেটা তারা পবিত্রতা এবং দূষণের ধারণার মাধ্যমে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে।

সাধারণত একটি জাতির অপবিত্রতার মাত্রা পরিমাপ করা হয় সেই জাতির প্রতি ব্রাহ্মণের মনোভাবে। যে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদের যাজন করে না তারা পবিত্রতম বলে বিবেচিত হয়। অবশ্য সৎ শূদ্র জাতিগুলির পুরোহিত হিসাবে কাজ করলে ব্রাহ্মণের জাতি দূষিত নাও হতে পারে। তবে এদের হাতের পানীয় জল গ্রহণ করলে ও হাতে প্রস্তুত খাদ্যগ্রহণে

তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের জাতি দূষিত হত। কতগুলি জাতি আছে যাদের কাছ থেকে ব্রাহ্মণ পানীয় জল গ্রহণ করে, কিন্তু দূষণের ভয়ে তাদের পুরোহিত হয় না। তারও নীচে কতগুলি জাতি আছে যাদের কাছ থেকে ব্রাহ্মণরা পানীয় জলও গ্রহণ করে না। সর্বশেষে আরও কতগুলি জাতি আছে যাদের স্পর্শ ব্রাহ্মণদের দূষিত করতে পারে। অন্যান্য জাতিগুলি তাদের চেয়ে নিম্নসারির জাতিগুলির প্রতি নিজেদের মনোভাব নির্ধারণ করে ব্রাহ্মণদের অনুসৃত আদর্শে। নাপিত এবং ধোপাদের আচরণ থেকে বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে অপবিত্রতার মাত্রার আরও কতকগুলি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নাপিতরা তাদের থেকে নিম্নপদমর্যাদার জাতিদের পরিচর্যা করতে পারে, কিন্তু কয়েকটি জাতির ক্ষেত্রে তারা আঙুলের নখ কাটবে না, যেহেতু সেই জাতিগুলি নাপিতদের পরিচর্যা পাবার পক্ষে যথেষ্ট পবিত্র বলে বিবেচিত নয়। নিম্নতম জাতিগুলি অর্থাৎ অস্পৃশ্যরা নাপিতদের পরিচর্যা পাবার যোগ্য নয়। ধোপারা, যারা নিজেরা অ-সৎ শূদ্র, তারাও নিম্নতম জাতিগুলির কাজ করে না। হিন্দুদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সকল জাতিগুলিকে একটি সমবায় সমিতিতে একত্রিত করতে যত্নবান হয়েছিল। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক একটি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রবণতার সৃষ্টি করে সমাজকে অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করে ফেলে এবং এমন কতগুলি বিষয়ের উপর জোর দেয় যাতে সেই খণ্ডগুলি একে অন্যের থেকে পৃথক হয়ে যায়।

## ৪

প্রায় সব জাতিগুলিকেই দেখতে পাওয়া যাস একই বংশকুলে বিবাহের সূত্রে কতগুলি খণ্ড জাতিতে (Sub-castes) বিভক্ত। বঙ্গদেশেব খণ্ড জাতিগুলি শ্রোণি, সমাজ, আশ্রম, থাক ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। একটি বিশেষ জাতির মধ্যবর্তী বিভিন্ন ভাগের শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানগত প্রতিষ্ঠা সমরূপ এবং অবশিষ্ট সমাজের সামনেও তাদের সাধারণ অবস্থান সমান। কিন্তু প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় বিশেষ জাতিগুলির অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন শ্রেণি উচ্চতর পদমর্যাদার জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। নিজের জাতির মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে শ্রেণিগুলি নিজেদের মধ্যে বিবাহ দেয় না, এমনকি এক পঙ্‌ক্তিতে একে অন্যের সঙ্গে আহারও করে না।

ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীগুলিকে সম্ভবত কোনো বংশানুক্রমে অধিগত বা বিশেষ আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে বিকশিত প্রযুক্তিগত বা সংস্কৃতিগত উৎকর্ষের ভিত্তিতেই শ্রেণি আর অন্তঃশ্রেণি বিভাজনের সূচনা হয়েছিল। একই ধরনের বৃত্তির জন্যই হয়ত একটি বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অনুষ্ঠান পদ্ধতির খুঁটিনাটি বিষয়ে অথবা যে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারসহ বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলিকে হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে নিবিষ্ট করা হয়েছিল তার মধ্যে পার্থক্য থাকা সম্ভব। একই ধরনের পার্থক্য হয়তো জাতিগুলির মধ্যে পরবর্তী পর্যায়েও দেখা দিয়েছে। যেমন—ঢাকার কুমারদের মধ্যে বড়ো ভাগিয়া এবং ছোটো ভাগিয়া শাখাগুলি পরস্পর স্বতন্ত্র, কারণ প্রথমটি লাল এবং কালো উভয়প্রকার মৃৎপাত্র তৈরি করে এবং অপরটি কেবলমাত্র লাল মৃৎপাত্র তৈরি করে।

বড়ো ভাগিয়ারা আবার দুটি দলে বিভক্ত। তাদের মধ্যে একদল কালো মৃৎপাত্র, অন্যদল লালমৃৎপাত্র নির্মাণে বিশেষজ্ঞ। যোগীদের ভেতরে একটি খণ্ডজাতির নাম কম্বুলে—এর

কারণ তারা কম্বল বয়নে বিশেষজ্ঞ বা পারদর্শী। যোগীদের ভেতরে রংরেজ খণ্ডজাতিটি তৈরি হয়েছিল তাদের নিয়ে, যারা কার্পাস সুতো রং করায় বিশেষজ্ঞ। ছুতারদের এক অংশ খড়িপেটিয়া নামে পরিচিত। খড়ি দিয়ে কাজকেই ইঙ্গিত করে নামটি। মনে হয়, খড়িপেটিয়ারা বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিল স্থাপত্য শিল্প সংক্রান্ত নকশা আঁকার কাজে, যাতে তারা খড়ি ব্যবহার করত।

একটি শ্রেণির স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্ভবত সৃষ্টি করেছিল এক বা ততোধিক গোষ্ঠী, যেগুলি ক্রমে বিস্তৃত হয়ে একটি শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিল, তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার থেকে। এইভাবে পূর্ব বাংলার যোগীদের ভেতরে একাদশ এবং মাস্যা শ্রেণি অথবা ঢাকার তাঁতিদের ভেতরে ঝম্পানিয়া শ্রেণি। তারা পূর্বপুরুষগণ দ্বারা প্রবর্তিত অথবা অনুসৃত বৈশিষ্ট্যসূচক রীতি বা প্রথার মধ্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের উৎস খুঁজে পায়। একাদশ যোগীরা মৃত্যুর পরে একাদশতম দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে যেখানে মাস্যাগোষ্ঠী শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে একটি মাস পূর্ণ হলে। এই কারণেই তারা একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত। ঝম্পানিয়া তাঁতিরা বরকে কনের বাড়িতে পালকি অর্থাৎ ঝম্পান-এ করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রথার মধ্যেই নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান করে। একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত কতগুলি গোষ্ঠী কখনো মিলিত হয়ে গঠন করে একটি খণ্ডজাতি। এইটিই ঘটতে দেখা যায় ছুতারদের অষ্টকুল (আটটি গোষ্ঠী) এবং গন্ধবণিকদের অষ্টাশ্রম (আটটি গোষ্ঠী) এবং ছত্রিশাশ্রমের (ছত্রিশ গোষ্ঠী) ক্ষেত্রে। কতগুলি গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি আবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বিস্তৃততর আঞ্চলিক পরিচয়ের মধ্যে, যার ওপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয়েছিল বহু খণ্ডজাতির। এইভাবে বাংলার বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে রয়েছে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ, মন্দারনি, বর্ধমানি, শিখরিয়া এবং কাঁসাইকূলা খণ্ডজাতিগুলি। এই খণ্ডজাতিগুলি সেইসব মানুষদের নিয়ে গঠিত যারা বাস করত যথাক্রমে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, মন্দারন, শিখরভূম অঞ্চলে এবং কাঁসাই নদীর দুই কূলে।

জাতিগুলির বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে কতকগুলি শ্রেণির উৎসের সন্ধান নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়। একটি জাতির মধ্যেই ঐতিহ্যগত পেশার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রযুক্তি বিদ্যাগত উদ্ভাবন বা বিশেষজ্ঞতা অর্জন অথবা অধিকার সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি, কিংবা সাংস্কৃতিক অগ্রসরতা, নতুন নতুন খণ্ডজাতি গঠনে উৎসাহ যুগিয়েছিল। তৈল উৎপাদনকারী তেলিদের তৈল পেষণের আদি কল হয়তো ছিল এক-বলদে-টানা সাদাসিধে একটি ঘানি। কিছুকাল পরে কয়েকজন তেলি যন্ত্রটির উন্নতিসাধন করল। নতুন কলটি অধিকতর জটিল এবং দুটি বলদ দ্বারা চালিত, কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা বেশি। পরবর্তীকালে দুটি বলদে টানা যন্ত্র ব্যবহারকারী তেলিরা একটি নতুন খণ্ডজাতি গঠন করল এবং একটি বলদে টানা তেলিদের থেকে পদমর্যাদায় তারা উচ্চতর এমন একটা ভাব দেখাল। ষোড়শ শতকে সপ্তগ্রাম বন্দরনিবাসী সুবর্ণবণিকগণ কর্জন সমাজের মধ্যে সকলের চেয়ে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। সমৃদ্ধির উপর ভিত্তি করেই সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিকরা এবং তাদের অনুষঙ্গীরা নিজ নিজ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সপ্তগ্রামি সমাজ গড়ে তুলল, যেটি সুবর্ণবণিকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী খণ্ডজাতি বলে পরিচিত। বসাক এবং শেঠ উপাধিধারী তাঁতিদের একটি অংশ বয়নকার্য পরিত্যাগ করে সুতি বস্ত্রের ব্যাবসা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজে উদ্যোগী হয়ে উঠল। যেহেতু তারা তাদের নিজ নিজ খণ্ডজাতির অন্যান্যদের চেয়ে

বেশি সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল, সেইহেতু তারা নিজেরাই গঠন করল এক নতুন খণ্ডজাতি। ঢাকার বসাক তাঁতিদের মধ্যে সর্বোচ্চ খণ্ডজাতি বলে পরিচিত হয় এবং সমপর্যায়ের সৌভাগ্যশালী ও অধিকতর সমৃদ্ধিশালী তাঁতিদের সঙ্গে যুক্ত হয়। পশ্চিমবাংলার কোনো কোনো অংশে শেঠ আর বসাকরা মিলিত হয়ে গঠন করে শেঠ-বসাক সমাজ, যেটি স্থানীয় তাঁতিদের মধ্যে সর্বোচ্চ সমাজ হিসাবে পরিচিত। তাম্বুলিবণিকদের চৌদ্দগ্রামি খণ্ডজাতিটি গঠিত হয়েছিল বিয়াল্লিশগ্রামি খণ্ডজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অংশ নিয়ে, বলা হয়ে থাকে এই খণ্ডজাতিটি গঠিত হয়েছিল একজন ব্যক্তির উদ্যমে, যে মূল খণ্ডজাতির বাইরে বিবাহ করেছিল এবং ফলে একই বংশকুলের মধ্যে বিবাহের নিয়ম ভেঙেছিল। ভ্রষ্ট ব্যক্তিটি এবং তার অনুগামীরা ছিল সমৃদ্ধিশালী। তারা কেবলমাত্র চৌদ্দগ্রামি খণ্ডজাতিটিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করল তাই নয়, তাম্বুলিবণিক খণ্ডজাতিগুলির মধ্যে নিজেদের সবচেয়ে উঁচুতে বসাল। কিন্তু এটাই দেখার যে, দুর্বলতর ব্যক্তির দ্বারা জাতির নিয়মভঙ্গ হলে সম্মানহানি হত। মনে হয় এই ঘটনাই ঘটেছে ধোপাদের হাজরা সমাজে। বলা হয়, ধোপা জাতিটির ২০০০ মানুষ একসময় জাতির কয়েকটি নিয়ম লঙ্ঘন করেছিল। ফলে তারা অধঃপতিত হয় এবং এই হীন ভ্রষ্ট, ব্যক্তিরাই ধোপাদের মধ্যে সর্বনিম্ন খণ্ডজাতিটি গঠন করে।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নততর গোষ্ঠীগুলি, নতুন নতুন খণ্ডজাতি গঠন করতে পারে বা অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির তুলনায় উচ্চতর পদমর্যাদা দাবি করতে পারে। উড়িষ্যার সেরাইকেল্লার তেলিদের মধ্যে শিখরিয়া এবং রাঢ়ী খণ্ডজাতিগুলি একই প্রযুক্তিবিদ্যা অনুসরণ করে। উভয়েই এক-বলদে-টানা তেল পেষণ যন্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু রাঢ়ীরা শিখরিয়াদের চেয়ে অগ্রাধিকার দাবি করে, কারণ তারা ব্রাহ্মণ্যবাদে বেশি প্রভাবিত—তারা বিধবা-বিবাহ প্রথা ত্যাগ করেছে, যা শিখরিয়ারা এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। আবার শিখরিয়ারা নিজেদের উচ্চতর মনে করে একই অঞ্চলের মগাহিয়া তেলিদের চেয়ে, যারা একটু ভিন্ন ধরনের এক-বলদ-এ টানা তেল-এর কল ব্যবহার করে, যাতে কায়িক শ্রম বেশি। হয়তো এই কারণেই শিখরিয়ারা মগাহিয়াদের চেয়ে নিজেদের উচ্চতর জ্ঞান করে। কিন্তু আরও একটি সম্ভাব্য কারণ হল মগাহিয়াদের মুরগি আর মদ খাওয়ার অভ্যাস, যা গোঁড়া হিন্দুরা অনুমোদন করে না। শিখরিয়ারা এইসব নিষিদ্ধ জিনিসগুলি গ্রহণ করে না, তাই তারা মগাহিয়াদের চেয়ে উচ্চতর পদমর্যাদার দাবিদার।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির কয়েকটি বিভাগ তাদের নিজেদের ঐতিহ্যিক পেশা পরিত্যাগ করে আরও লাভজনক নতুন পেশা অবলম্বন করেছে এমন চূড়ান্ত নিদর্শনও আছে। এই করে তারা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির অবশিষ্ট অংশ থেকে শুধু যে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হয়েছে তাই নয়, তাদের ঐতিহ্যিক পেশাগুলির সঙ্গে সংলগ্ন কলঙ্ক বা দোষ থেকেও মুক্ত হয়েছে। অধিকতর সমৃদ্ধি তাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পাদনে অতিরিক্ত অর্থব্যয়ে এবং সাংস্কৃতিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ব্রাহ্মণদের সহায়তা ও উপদেশ লাভে সাহায্য করেছিল। প্রদর্শিত ঘটনাগুলি হয়তো পরিশেষে নতুন নতুন জাতিগঠনের পথ প্রদর্শন করেছে। এই ধরনের ঘটনা বেশি না হলেও নতুন খণ্ডজাতি গঠন এবং নানা কারণে খণ্ডজাতিগুলির ক্ষুদ্রতর এককে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার নিদর্শন বেশ অনেকই দেখতে পাওয়া যায়। খণ্ডজাতিগুলি এবং খণ্ডজাতিগুলির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককগুলি মিলিয়ে ভারতে

বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে প্রায় ৫০,০০০টির মতো ভাগ রয়েছে। মূল খণ্ডজাতিগুলি এবং পরবর্তী পর্যায়ে জাতিগুলির নানা বিভাজনের শতকরা হিসাব নির্ণয় করা নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত কঠিন। কিন্তু খণ্ডজাতিগুলি এবং খণ্ডজাতিগুলির অভ্যন্তরস্থ ভাগগুলি, যেগুলিকে পরবর্তী পর্যায়ের বিবর্তন বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে, সেগুলির একটি মোটামুটি হিসাবও নির্দেশ করে যে টুকরো টুকরো হওয়ার ঝোঁক বাস্তবিকই অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ব্যাপক ছিল। নানা ধরনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিগুলির এবং জাতিগুলির ভেতরের ভাগগুলির উদ্ভব হয়েছিল। বিভিন্ন স্তরে বিভাজনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সমাজটিকে টুকরো টুকরো করে ভেঙেছিল একেবারে অতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পর্যন্ত। কিন্তু সাধারণভাবে বিদ্যমান সমাজের ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগের সূচিতে এই বিভাগ এবং উপবিভাগগুলিকে সাজানোর এবং পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ভিত্তিতে ক্রমোচ্চ শ্রেণির অংশস্বরূপ এই এককগুলির পদমর্যাদা বিশ্লেষণের একটি ঝোঁকও বরাবরই ছিল। সামাজিক ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগে বিভিন্ন সারির অবস্থান এবং পর পর সারিগুলিতে বিভিন্ন জাতিগুলির অবস্থান ছিল সুবিদিত এবং সর্বজনগৃহীত। জাতিগুলির অভ্যন্তরস্থ ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ হয়তো ততটা সুবিকশিত ছিল না। প্রতিটি জাতির ভেতরে বিভিন্ন শ্রেণি অনেক সময় একে অন্য অপেক্ষা অগ্রাধিকার দাবি করত। বাংলার ব্রাহ্মণরা প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত যথা, রাঢ়ী, বারেন্দ্র এবং বৈদিক। এই শ্রেণিগুলির প্রত্যেকটিই অপর শ্রেণির তুলনায় নিজেদের উচ্চতর বলে মনে করে এবং অন্যদের তুলনামূলকভাবে অপবিত্র জ্ঞান করে। সাধারণভাবে বলতে গেলে ব্রাহ্মণদের তিন শ্রেণির মধ্যে বিতর্ক হয়তো বাকি সমাজের কাছে অর্থহীন। কিন্তু তাম্বুলি বণিকদের ভেতরে চৌদ্দগ্রামি শ্রেণির এবং তাঁতিদের ভেতরে বসাক এবং শেঠ-বসাক সমাজের পূর্ববর্তিতা স্ব স্ব জাতির ভেতরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং নিজ নিজ জাতির ভেতরে এই শ্রেণিগুলির পূর্ববর্তিতা বাকি সমাজ স্বীকার করে নেয়। সাধারণত এই ধরনের পার্থক্য নির্ভর করে স্ব স্ব জাতিগুলির ঐতিহ্যগত পেশার উপরে অথবা পেশাকে ঘিরে কিছু প্রযুক্তিবিদ্যাগত উদ্ভাবন বা সফল প্রয়াসের উপর এবং সেই কীর্তির ফলস্বরূপ তুলনামূলক শ্রীবৃদ্ধির উপরে অথবা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শ্রেণিগুলির অর্জিত প্রগতির উপরে। উচ্চতর শ্রেণিগুলির উদ্ভবের সহায়ক এই ঘটনাগুলি জাতিগুলির মর্যাদার নির্দেশক সাধারণ রীতিগুলির সঙ্গেও খাপ খেয়ে যায়।

জাতির ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগে প্রযুক্তি বিদ্যার দিক দিয়ে অথবা সংস্কৃতিগতভাবে উন্নত জাতিগুলিই উচ্চতর স্থান এবং শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে উচ্চ পদমর্যাদা পেয়েছিল। এই জাতিগুলির হাতেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীভূত হবার ঝোঁক দেখা যায়। তাদের শাস্ত্রীয় আচার-ভিত্তিক উচ্চতর পদমর্যাদা তাদের শ্রীবৃদ্ধি এবং বস্তুগত ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। বস্তুগত অবস্থা এবং শাস্ত্রীয় আচার-ভিত্তিক পদমর্যাদার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কই জাতিগুলির নীচের স্তরের উত্থানশীল অংশগুলিকে নিজেদের শাস্ত্রীয় আচার-ভিত্তিক পদমর্যাদার উন্নয়নে উৎসাহিত করেছিল। অন্যভাষায় বলতে গেলে, অধিকতর পবিত্রতার মাত্রা অর্জনের পরিভাষাতেই সামাজিক গতিময়তা পরিশেষে প্রকাশিত হত। প্রযুক্তিগত বিদ্যা কিংবা বাণিজ্যিক সিদ্ধিলাভ অথবা সংস্কৃতিগত সাফল্যের উপর ভিত্তি করেই নতুন দলগুলি গঠিত হচ্ছিল। কিন্তু দলগুলির ভেতরে তাদের পেশা বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের সঙ্গে ধর্মাচারের

উচ্চতার একটা সম্বন্ধ তৈরি করার অপ্রতিরোধ্য বাসনা লক্ষিত হয়। বস্তুত এই সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা তাদের সামাজিক পদমর্যাদার বৈধতার সহায়ক ছিল। নতুন শ্রেণিগুলির অন্যান্যদের তুলনায় পূর্ববর্তিতা লাভের চেষ্টা এই প্রেরণারই বহিঃপ্রকাশ। এই প্রেরণার পূর্ণতর প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় ভ্রষ্ট দলগুলির দ্বারা উচ্চতর ধর্মীয় পদমর্যাদাসম্পন্ন নতুন নতুন জাতি গঠনের মধ্যে, যেখানে দলগুলি নিজেদের ঐতিহ্যিক বংশগত পেশা পরিত্যাগ করে অধিকতর লাভজনক পেশা গ্রহণ করছিল এবং সাংস্কৃতিক সংস্কারগুলির উপর জোর দিচ্ছিল সুসংবদ্ধ ও সংগঠিত প্রয়াসের মাধ্যমে।

৫

জাতিব্যবস্থার প্রতি বিভিন্ন জাতিগুলি কেন অটল আনুগত্যসম্পন্ন ছিল তার প্রধান কারণগুলির অন্যতম হল প্রতিযোগিতাবিহীন অর্থনৈতিক সংগঠনে বংশগত ব্যবস্থায় জীবিকা অর্জনের নিরাপত্তা। বংশগত পেশা অবলম্বনের একচেটিয়া অধিকার এবং জীবনের মূল চাহিদাগুলির সরবরাহ লাভের অধিকার নিশ্চয়ই সবার পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বিশেষত, অভাবগ্রস্ত সমাজের দুর্বলতর এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে অনগ্রসর অংশগুলির পক্ষে গুরুত্বের মাত্রা অধিক। উদারতা ও মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা—হিন্দুসংস্কৃতির এই দুটি উপাদানও জাতিব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে। যে সব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিন্দুসমাজের ভেতরে এল, জাতির ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগে তাদের নিম্নতর জাতি হিসাবে স্থান দেওয়া হল। তারা যতটা সম্ভব নিজেদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষা করতে পারত। আবার একই সঙ্গে হিন্দু সমাজের উচ্চতর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গেও তারা নিজেদের অভিন্নরূপে গণ্য করতে পারত। দেখা যায় তারা হিন্দু সমাজের সঙ্গে নিকটতর সংস্পর্শের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদের আদর্শে নিজেদের সংস্কৃতিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করেছে, এমনকী কতকগুলি ব্রাহ্মণ্য বৈশিষ্ট্যও সরাসরি গ্রহণ করেছে। হিন্দু সমাজের সঙ্গে নিম্নতর জাতিগুলির একীভবনে সাংস্কৃতিক সংস্কারের ভূমিকা সত্যই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নতর জাতিগুলি হল অধিকতর মাত্রায় অপবিত্রতার প্রতীক এবং সমাজের দরিদ্রতম এবং সবচেয়ে অনগ্রসর অংশ। নিচু জাতিগুলির মধ্যে নিম্নতম ধাপে আছে অস্পৃশ্য। তারা সবচেয়ে নিচু কাজগুলি করে এবং বাস করে গ্রামের প্রান্তে, যেখানে প্রাকৃতিক এবং পৌর সুবিধাগুলি হয় নামমাত্র, নয়তো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তারা মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি পায় না। গ্রামের ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসবগুলিতে যোগদানের অনুমতি যদি বা তাদের দেওয়া হয়, তবে তাদের জোর করে সীমাবদ্ধ রাখা হয় সম্মেলনের সবচেয়ে অসুবিধাজনক জায়গাগুলিতে। তবুও তারা হিন্দু সমাজ ও তার সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকে। তাদের প্রতি অত্যাচার দুর্ব্যবহার, সত্ত্বেও নিচু জাতিগুলি হিন্দুসমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের অঙ্গীভূত করে সম্ভবত সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা উপভোগ এবং সাংস্কৃতিক সংস্কারের সুবিধালাভের কারণে।

জাতিব্যবস্থার মধ্যে উর্ধ্বাভিমুখী গতিময়তার সম্ভাবনা হল আর একটি বিষয় যা জাতি ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য দায়ী। উচ্চতর ধর্মীয় আচার-ভিত্তিক পদমর্যাদা অর্জনের উদ্দেশ্যযুক্ত ব্যক্তিগণ বা দলগুলির ক্রমোন্নয়নের পথে নিঃসন্দেহে অনেক তীব্র বাধা ছিল। এই ধরনের প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিল পেশার পরিবর্তন ও জাতি ব্যবস্থার বিশদ ক্রমোচ্চ শ্রেণিতে অবস্থিত অন্যান্য জাতিগুলির সঙ্গে নতুন করে মানিয়ে নেওয়া

এবং অধিকতর মাত্রার পবিত্রতার দ্বারা চিহ্নিত উচ্চতর ধর্মীয় আচার-ভিত্তিক পদমর্যাদার দাবির স্বপক্ষে গোটা সমাজের, বিশেষত ব্রাহ্মণদের সম্মতি অর্জনের প্রশ্ন। অপ্রতুল সংগতি এবং সীমিত বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন এবং অধিকতর লাভজনক পেশায় নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের পক্ষে যথেষ্ট উদ্যম, উদ্যোগ এবং দারুণ ধৈর্যের প্রয়োজন পড়ত। উচ্চাভিলাষীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সমাজে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বৈধতা প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সমাজের বাকি জাতিগুলির সঙ্গে সম্পর্কের সমন্বয় সাধনের জন্যই হয়তো দীর্ঘকালব্যাপী পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হত। সৎ শূদ্র পদমর্যাদার অভিলাষীদের ওই পদে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতাকে সমাজ সাধারণভাবে স্বীকার না করে নিলে ব্রাহ্মণরা তাদের কাজ করতে অস্বীকার করত। অন্যথায় ব্রাহ্মণেরা অযোগ্য লোককে সেবা করার দায়ে নিজেদের জাতিকে অপবিত্র করত এবং মর্যাদাহানি ঘটাত। যখন সাধারণভাবে সমাজ সৎ শূদ্র পদমর্যাদার অভিলাষীদের দাবি অনুমোদন করে তখন ব্রাহ্মণরাও তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুরোহিত হিসাবে কাজ করে তাদের নতুন পদকে পাকাপাকিভাবে স্বীকৃতি দিতে রাজি হয়। স্বাভাবিকভাবেই গোটা পদ্ধতিটিই একটি দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু এইসব বাধা সত্ত্বেও, ভারতের অন্যান্য জায়গার মতো বাংলায় ও ঊর্ধ্বাভিমুখী গতিশীলতার স্থির অগ্রগতি লক্ষণীয়। বোঝাই যায় এই আন্দোলনগুলি থেকে ঘন ঘন নতুন নতুন জাতির উদ্ভব হয়নি। কিন্তু অসুবিধাগুলি যথেষ্ট কম ছিল সেইসব 'শ্রেণি'গুলির পক্ষে যারা সংশ্লিষ্ট জাতির অন্যান্য অংশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টায় ছিল এবং আরও কম ছিল সেইসব দলগুলির পক্ষে যারা 'শ্রেণি' গঠনের চেষ্টা করছিল। প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় উদ্যোগী দলগুলি নিজেরা প্রযুক্তি বিদ্যার্জন বা বাণিজ্যিক সাফল্য অথবা সাংস্কৃতিক অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে স্বতন্ত্র খণ্ডজাতি গঠন করেছে এবং তারপরে নিজেদের উচ্চতর খণ্ডজাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছে। উচ্চতর খণ্ডজাতিগুলির মধ্যে বেশি উদ্যোগীরা আবার আদি খণ্ডজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার চেষ্টা করেছে এবং উচ্চতর ধর্মীয় আচার-ভিত্তিক পদমর্যাদার দাবিতে নতুন জাতি গঠন করেছে।

সাধারণ মানুষ যে গোঁড়া সামাজিক চিন্তাধারার বাহকতা করে চলে তদনুসারে জাতির ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা হয় দৈব আদেশের দোহাই দিয়ে। জাতির নিয়মগুলিকে কল্পনা করা হয় ধর্মীয় বিধান হিসাবে এবং তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় আচার পরায়ণতা। তবুও জাতিগুলির মর্যাদা এবং শ্রেণিগুলির উদ্ভব এবং পরিণামে কতগুলি শ্রেণির উচ্চতর পদমর্যাদায় উন্নয়ন, দেখিয়ে দেয় যে, এমনকি আপাত অনমনীয় কাঠামোর ভেতরেও হিন্দুসমাজ প্রযুক্তিবিদ্যাগত উৎকর্ষ এবং বাণিজ্যিক অবদানের নিদর্শনকে স্বীকৃতি দিত। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিচু জাতির ব্যক্তিবিশেষ এবং দলগুলিই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতা অর্জন করেছিল। এই সব ব্যক্তির উত্থান সমাজে এক বিসদৃশ, বেখাপ্পা অবস্থার সৃষ্টি করে চলেছিল। এইসব সম্ভাব্য অসংগতিগুলি গুরুতর সামাজিক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারত। কারণ তাদের গোষ্ঠীগত দক্ষতা তথা অর্জিত বিশিষ্টতা আর পদমর্যাদা ছিল সম্পূর্ণ অনন্বিত। এছাড়াও সমাজের তলার ধাপ থেকে ওপরে উঠে আসা দলগুলি জাতির ক্রমোচ্চ শ্রেণিব্যবস্থার আদর্শগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারত এবং জাতির সমাজব্যবস্থার ক্রিয়াকর্মে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু জাতিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় নতুন প্রভাবশালী ব্যক্তিবিশেষ এবং দলগুলির উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জায়গা করে

দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আসলে এক বিশেষ সামাজিক প্রক্রিয়ায় এই সব দাবি শোধিত হয়েছে, তারই দীর্ঘকালের ব্যাপ্তিতে জাতিসমাজের প্রতীকী ধারার ছাঁচে। তারই ফলে পরিশেষে উচ্চাভিলাষীরা উচ্চতর পদমর্যাদার নতুন জাতি বা নতুন শ্রেণিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। জাতিব্যবস্থার এই তুলনামূলক নমনীয়তার জন্যই নীচের ধাপের মানুষের উত্থানের ফলে উদ্ভূত সামাজিক উত্তেজনাকে ঊর্ধ্বাভিমুখী সামাজিক গতিশীলতার আন্দোলনের মাধ্যমে চালিত করা গিয়েছিল এবং পরিশেষে জাতির ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগের মধ্যেই উচ্চতর পদমর্যাদার উন্নতিবর্ধনের দ্বারা প্রতিরোধ করা হয়েছিল।

## ৬

নতুন নতুন জাতি ও শ্রেণিগুলির উদ্ভব নির্দেশ করে যে, হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে একটি বিরামহীন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলছিল। নিচু জাতিগুলিকে হয়ত কলঙ্ককর অবস্থায় থাকতে হত। কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় তাদেরও উপরে ওঠার ও নিজের অবস্থান উন্নয়ন এবং উচ্চতর ধর্মীয় আচার-ভিত্তিক পদমর্যাদা অর্জনের সুযোগ ছিল। অতএব লক্ষ করা যেতে পারে যে উচ্চাভিলাষী দলগুলির গতিশীলতার আন্দোলনের ফলে যে পরিবর্তনগুলি সাধিত হচ্ছিল সেগুলির লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত সীমিত। উচ্চাভিলাষীদের চাওয়ার মধ্যে ছিল জাতির ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগে নীচের তলা থেকে উপরের তলায় উন্নতি ও জাতি-ব্যবস্থার শর্ত অনুযায়ী অধিকতর মর্যাদা। তারা কখনই জাতিব্যবস্থার গঠনতন্ত্র নষ্ট করতে চায়নি, বা যে মূল সূত্রগুলির উপরে ওই গঠনতন্ত্র স্থাপিত তাতে আপত্তি তোলেনি। বস্তুত উঁচু জাতিগুলির মতোই নিচু জাতিগুলিও জাতিব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় উৎসাহী ছিল। জাতি-সমাজের ভেতরে পরিবর্তনগুলি সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন দলগুলির মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের প্রকৃতি এবং সেই সম্পর্ক নির্দেশকারী নিয়মগুলি অপরিবর্তিতই রয়ে গেল।

কতগুলি ক্ষেত্রে জাতির পবিত্রতা ও অপবিত্রতার পরিভাষায় প্রকাশিত ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বিরোধিতা হয়েছিল। সন্ত এবং সংস্কারকগণ সমতা এবং সাহচর্যের 'বাণী' প্রচার করেছিলেন, তাদের প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছিল ব্যাপক সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। এগুলির মধ্যে কয়েকটি আন্দোলন, যেমন চর্তুদশ থেকে ষোড়শ শতকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী ভক্তি-আন্দোলন প্রায় গোটা ভারতবর্ষে দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছু কিছু সন্ত ও সংস্কারক নিশ্চিত ভাবেই জাতির বিরোধী ছিলেন। অন্যরা হয়ত সরাসরি জাতির বিরুদ্ধে কিছু বলেননি, কিন্তু তাঁদের প্রচারিত আদর্শবাদের সঙ্গে সংগতি রেখে আধ্যাত্মিক বিষয়ে জাতির নিয়মগুলিকে উপেক্ষা করেছিলেন। এই আন্দোলনের অনুগামীদের নিয়ে গঠিত হল বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়। কিন্তু তারা সামাজিক আন্দোলন টিকিয়ে রেখে সেই আদর্শবাদকে আর অগ্রসর করতে পারেনি। দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে জাতির নিয়মগুলি পালনে তারা বাধ্য ছিল এবং জাতি-ভিত্তিক সামাজিক সম্পর্কের পরিবেশের মধ্যেই কাজ করত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এমনকি এইসব ধর্মসম্প্রদায়গুলির ভাবতত্ত্বগুলিও জাতিব্যবস্থার আদর্শ-প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এই ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে কয়েকটি জাতিব্যবস্থার প্রভাবের কাছে এতদূর আত্মসমর্পণ করেছিল যে তারা তাদের আদর্শবাদের সঙ্গে জাতির নিয়মকানুনগুলির একটা আপোস-মীমাংসাও করে ফেলে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্মসম্প্রদায়গুলি বা ধর্মসম্প্রদায়গুলির কয়েকটি অংশ নিজেরাই বিশিষ্ট জাতিতে

বূপান্তরিত হয়। কর্ণাটকের লিঙ্গায়েত জাতি এবং বঙ্গদেশের জাতবৈষ্ণব জাতির উদ্ভব যথাক্রমে বীর শৈব এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায় থেকে।

মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের পক্ষে জাতির ধর্মীয় ব্যাখ্যা অথবা জাতির নিয়মগুলিব ধর্মীয় আচারগত তাৎপর্য বিশ্বাস করার কোনো যুক্তি ছিল না। তবুও ভারতে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে জাতিব্যবস্থার যথেষ্ট বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। মুসলমান এবং খ্রিস্টান জাতিগুলিকে আবার কেবলমাত্র স্বতন্ত্র পেশা দ্বারাই যে পৃথক করা হয় তা নয়, নিজ নিজ পবিত্রতা ও অপবিত্রতার মাত্রা অনুযায়ীও তাদেরকে একে অন্যের থেকে পৃথক করা হয়।

যে সাধারণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে জাতিব্যবস্থা কাজ করত তা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছিল। ভারতে প্রচণ্ড রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে ছোটো ছোটো রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছে। ক্রমে সাম্রাজ্যগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল এবং স্থানীয় বা আঞ্চলিক রাজ্যগুলি তার স্থান নিল। সংগঠিত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব পরিবর্তন দেখা দিল। সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক মান-এর যেসব পরমাদর্শ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে গড়ে উঠছিল সেগুলি সারা ভারতে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত। এই সময় থেকে সাংস্কৃতিক মান-এর সাধারণ আদর্শের অবনতি হতে থাকে এবং তা আঞ্চলিক আদর্শ এবং বৈশিষ্ট্যগুলিকে জায়গা ছেড়ে দেয়, যা ভারতের বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রস্ফুটনে প্রেরণা জোগায়। অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে এবং স্থলপথে ব্যাবসা সম্প্রসারণের ফলে ভারতের বিভিন্ন অংশ বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি লাভ করেছিল খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক এবং খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে। এমনকি এই বিস্ময়কর বাণিজ্যিক বিকাশকালের পরেও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে কৃষিকার্য, কারিগরি শিল্প ও সামরিক ক্রিয়াকলাপে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন সাংস্কৃতিক লক্ষণগুলি এসেছিল ব্যাবসা সূত্রে অথবা বিদেশী আক্রমণকারীদের মাধ্যমে, যারা নানা সময়ে ভারতের নানা এলাকা জয় করেছিল। এইসব ঘটনাগুলি ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে চিহ্ন রেখে গেছে। কিন্তু এই ঘটনাগুলির কোনটিই জাতিব্যবস্থার বুনিয়াদি বৈশিষ্ট্যগুলির উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বা সাধারণভাবে মানুষের জীবনে জাতিব্যবস্থার প্রভাবকে ক্ষয় করার ব্যাপারে সফল হয়নি। জাতিব্যবস্থা অবশ্য এই ঘটনাগুলির প্রতি সাড়া দিয়েছে, নতুন জাতিগত দল, প্রযুক্তিবিদ্যাগত উদ্ভাবন এবং সাংস্কৃতিক লক্ষণ সমূহকে অঙ্গীভূত করে এবং আপন বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে তাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করে। হিন্দুসমাজের ভেতরে পরিবর্তন আনয়নকারী শক্তিগুলির সঙ্গেও জাতিব্যবস্থা ঠিক এই একই ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তনের প্রভাব ভারতের সামাজিক অগ্রগতিতে একটি সহায়ক বিষয় হয়ে রইল, কারণ সে অগ্রগতি ছিল জাতিব্যবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী, শর্তাধীন। সম্ভবত এই কারণেই ভারতে জাতি-ভিত্তিক সমাজ প্রায়শই স্রোতোহীন বদ্ধ অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় বলে গণ্য হয়েছে। তবে সাধারণ মানবীয় পরিবেশের পরিবর্তনগুলির প্রভাব অন্তর্ভূত করার এবং হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরস্থ পরিবর্তনগুলিকে নিজস্ব পরিভাষায় নিয়ন্ত্রণ করার এই ক্ষমতার জন্যেই জাতিব্যবস্থা ভারতীয় পরিবেশে প্রাসঙ্গিক হয়ে থেকেছে এবং

মানবিক পরিবেশে বিরামহীন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সত্ত্বেও কয়েক শতাব্দী ধরে হিন্দুসমাজের প্রয়োজনগুলি পূরণ করেছে। এই স্পষ্ট কারণবশতই বহু শতাব্দীব্যাপী জাতিব্যবস্থার ধারাবাহিকতা ভারতের ইতিহাসে অন্যতম মুখ্য সমস্যা বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু ভারতীয় সমাজের অন্তঃস্থ সক্রিয়তার প্রকৃতিটিকে সন্ধান করতে হবে নানা পরিবর্তনের ধারা ও জাতি ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে।

৭

ভারতীয় সমাজে গত দুই শতক ধরে প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটেছে। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে দেশীয় শিল্পগুলির ধ্বংস এবং কৃষিকার্যের অবনতি ভারতীয় সামাজিক সংগঠনের ভিত্তিকে ক্ষয় করে দিয়েছিল। বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক-জাল, যা প্রতিটি ব্যক্তিকে জীবিকার নিরাপত্তা দিয়েছিল এবং সুগ্রথিত গ্রামীণ সমাজে প্রত্যেকের ভূমিকা নির্দেশ করেছিল, তা নষ্ট হয়ে গেল। বেশির ভাগ কারিগরই তাদের ঐতিহ্যগত পুরুষানুক্রমিক পেশা থেকে বিচ্যুত হল এবং চাষি বা দিনমজুরে পরিণত হতে বাধ্য হল। যেহেতু কারিগরেরা তাদের শিল্প হারাল সেহেতু গ্রামবাসীরাও গ্রামীণ সমাজের বাইরে দৃষ্টি দিতে এবং জীবনের মূল চাহিদাগুলি সরবরাহের জন্য বাইরের উৎসের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হল। ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্রের মাধ্যমে ব্রিটিশ-বাণিজ্যব্যবস্থা কার্পাস বস্ত্র, নুন, চিনি এবং ধাতুনির্মিত জিনিসপত্রের মতো প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহের উৎসগুলি প্রায় একচেটিয়াভাবে অধিকার করেছিল। বেশির ভাগ জিনিস ইংল্যান্ডে তৈরি হত ও ভারতে আমদানি করা হত। কৃষিকার্যের সাধারণ অবনতি এবং ভূমির উপর তাদের অধিকার হারানোর দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হল কৃষকদল। একই সময়ে বাণিজ্যিক কৃষিকার্য সম্প্রসারিত হল ধীরে ধীরে। কৃষকদের পক্ষে কারিগর এবং সেবক জাতিগুলির সঙ্গে নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের কিয়দংশও বিনিময় করা উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ভারতে আধুনিক শিল্পের বিস্তার হল এমন আর একটি বিষয় যা জাতিসমাজের ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। কারখানায় নিযুক্ত গ্রাম্য কারিগর ও কৃষকগণ শিল্পকেন্দ্রগুলিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে প্রতিস্থাপিত হল।

দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদপ্রথা পবিত্রতা, অপবিত্রতা এবং দূষণের মতো উপরিকাঠামোগত ধারণায় পর্যবসিত হল এবং বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের আদর্শগুলি নিশ্চিহ্ন হল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিচু জাতিগুলির প্রতি আচারগত অসাম্যমূলক আচরণ একটি সামাজিক অবিচার হিসাবে দেখা দিল। ফলত, জাতিগুলির ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগের ব্যবস্থা সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে তিক্ত উত্তেজনার উৎস হয়ে উঠল। উঁচু জাতিগুলি নিচু জাতিগুলির চেয়ে প্রায় সব বিষয়েই অনেক উন্নততর ছিল। এমনকী উঁচু জাতিগুলি নিজেদের ধর্মীয় আচারভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিল এবং সেটিকে ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ, গ্রামীণ কর্মে নিয়োগ ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক শক্তির মতো বিষয়গুলির সঙ্গে এক করে ফেলল তাদের সামাজিক নেতৃত্বকে নিরঙ্কুশ রাখবার জন্য। একদিকে যেমন উঁচু জাতি ধর্মীয় আচারভিত্তিক সুবিধার উপর গুরুত্ব দিচ্ছিল তেমনই অন্যদিকে নিচু জাতিগুলি এক বিকল্প নেতৃত্বের সন্ধান করছিল যা তাদের অবস্থার উন্নয়নের প্রচেষ্টাগুলিকে সংগঠিত করতে ও তাদের সামাজিক

অবস্থানের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারে। জাতিব্যবস্থা থেকে নিচু জাতিগুলির পাওয়ার কিছু ছিল না। কিন্তু একদিকে যেমন তাদের নতুন পরিচয়ের বাস্তব ভিত্তি ছিল না, তেমনি অন্যদিকে উঁচু জাতিগুলি ধর্মীয় আচারভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের উপর গুরুত্বদান করছিল—এই অবস্থায় পশ্চাদমুখীন হলেও জাতিগত পরিচয়ই হয়ে উঠল নিচু জাতিগুলির সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখ্য আবেদন। জাতির প্রতীকগুলিকে বর্তমানকালে দুটি কারণে পুনরায় বলবৎ এবং বিবর্ধিত করা হয়েছে। প্রথমত, রাজনৈতিক দরকষাকষিতে যাবতীয় অন্তর্জাতীয় উত্তেজনা বা মানসিক চাপ রূপান্তরিত হয়েছে মুখ্য বিষয়ে। দ্বিতীয়ত, আমলাতান্ত্রিক স্তরে জাতির ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগের উল্লেখ করে সামাজিক স্তর-বিন্যাসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এইসব ঘটনাগুলির জন্যই বিলম্বিত হয়েছে সামাজিক সম্পর্কের নতুন আদর্শগুলির বিবর্তন এবং ভারতীয় সমাজে বিভাজনকারী একটি শক্তির প্রতীক হিসাবে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে জাতিভেদ প্রথা।

উৎস : প্রবন্ধটি শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

# বাংলার সামাজিক ইতিহাসের মূল সূত্র

## হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাংলার সমাজের ইতিহাস অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। সহজে বুঝা যায় না—বুঝিবার উপায়ও নাই। লেখাপড়া নাই—বই নাই। যাহারা জানিত, সমাজ বুঝিত, সমাজ চালাইত, তাহারা নাই। নির্মূল হইয়াছে অথবা তাহাদের কথায় লোকের আস্থা নাই। প্রত্যেক জাতির প্রামাণিক ছিল, প্রামাণিকের একটা প্রাচীন শৈলী ছিল এবং কতকগুলি কর্মচারী ছিল, কতকগুলি কর্তব্য কার্য ছিল, এখন কিছুই নাই। পণ্ডিতেরা জাতির ব্যবস্থা দিতেন। সে ব্যবস্থার জন্য তাঁহারা নিজে দায়ী ছিলেন, তাহার ফলাফল তাঁহাদিগকেও ভোগ করিতে হইত। সুতরাং অনেক বিবেচনা করিয়া অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহাদিগকে ব্যবস্থা দিতে হইত। তাঁহারা আর নাই, যাঁহারা আছেন তাঁহাদের কথায় আস্থা নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে কথা কহিতে গেলে অনেক বিপদ। সকলেরই অপ্রিয় হইতে হয়। যাঁহার মনের মতো না হয়, তিনিই বিরক্ত হন, শত্রু হন, শেষটা পিছনে লাগেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে সব্সে আচ্ছা, চুপ।

কিন্তু চুপ করিয়া থাকিলেও তো চলিবে না। ইতিহাস জানার জন্য আগ্রহ তো সবারই আছে: চেষ্টাও সকলেই করিতেছেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফাঁকা-ফাঁকা। তাহাতে, অর্থাৎ সে চেষ্টায় আগ্রহ নাই। চেষ্টার জন্য যে ধৈর্য, যে পরিশ্রম চাই, তাহা নাই, একটা আবছাওয়া আবছাওয়া রকমের জিনিস আছে। মানব-তত্ত্বের চর্চা এখন অনেকেই করিতেছেন। সাহেবেরা ক্যাবেম, অ্যালগন, ফুঙগ, এস্কিমো, আসান্টিডেহাম, জুলু প্রভৃতি আদিম জাতি, সাঁওতাল, কোল, ভিল, ওঁরাও প্রভৃতি ভারতবর্ষের জংলা জাতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই পড়িয়া সকলে কৃতকৃতার্থ হইতেছেন ও দেশকে কৃতকৃতার্থ করিতেছেন বলিয়া গর্ব করিতেছেন। কত রকমেই মানব-তত্ত্বের চর্চা হইতেছে। কিন্তু কই, বাংলা সমাজের প্রাচীন ইতিহাসের জন্য কাহারও কোনো চেষ্টা দেখিতে পাই না। প্রাচীন মানবের অস্থিতত্ত্ব শিখাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু বাঙালির সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো কথাই তো শুনিতে পাই না।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ছিলেন, তাঁহারা সংস্কৃত পড়িতেন, স্মৃতির চর্চা করিতেন; বলিতেন, জাতি চারিটি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এই চারি জাতির সংকর হইয়া অথবা ইহা হইতে পতিত হইয়া অপর সকল জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। কথাটা বাংলার পক্ষে খাটে

কিনা, সেটা ভাবিতেন না। ব্রাত্য ও সংকরে সে-সকল কথার যে মীমাংসা হয় না, সেটা তাঁহাদের ধারণাই ছিল না। ইতিহাস বলিয়া একটা জিনিস যে আছে, সেটাও তাঁহাদের ধারণা ছিল না। তাঁহারা জানিতেন, আবহমান কাল হইতে ওই চারি জাতি, ওই সংকর আর ওই ব্রাত্য চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং উহার মধ্যেই সকলের মীমাংসা করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেন। একটা চেষ্টা বটে। সুচেষ্টাই হউক আর কুচেষ্টাই হউক, তাহাতে আগ্রহও একটু ছিল, সংস্কারের একটু দৃঢ়তাও ছিল। ৬০/৭০ কি ৮০ বৎসর পূর্বে নন্দকুমার [ভট্টাচার্য] কবিরত্ন 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা' [১৮৫১-৬৪ খৃ.] নামে একখানি পত্র বাহির করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে যত জাতি আছে—ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, ফিরিঙ্গি, হুন, হাঙ্গেরিয়ান, জর্মান, এমন কি স্পাটাগোনিয়ান পর্যন্ত এই চারি জাতির সংকর হইতে উৎপন্ন। কিন্তু তাঁহার কথা কেহ শুনিল না। 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা'র কথা এখন সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। নন্দকুমার পৃথিবীর সব জাতির কথা বুঝাইতে গিয়াছিলেন, পারেন নাই। আমি বলি, উহাতে শুধু বাঙালি হিন্দুর সমাজের অবস্থাও বুঝানো যায় না।

কেমন করিয়া বুঝিব? মনে করো, ব্রাহ্মণের সংখ্যা বাংলায় ৫ লক্ষ কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে সংকর হইয়া যে জাতির উৎপত্তি হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৫০ লক্ষ। এ কথা সত্য বলিয়া কেমন করিয়া মানিব? সুতরাং চারি জাতি হইতে সংকর হইয়া সব জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, কেমন করিয়া স্বীকার করিব? আর তারপর বাংলার যে চারি জাতি ছিল, তাহাই কেমন করিয়া স্বীকার করি? বাংলার শাস্ত্রকার রঘুনন্দন[১] বলিয়া গিয়াছেন, বাংলায় দুটি বই জাতি নাই। ব্রাহ্মণ আর শূদ্র! কেবল কি রঘুনন্দন? সারা দেশের স্মৃতিকারেরাও যেন ওই কথাই বলিয়া গিয়াছেন যে, কলিতে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র বই জাতি নাই। "নন্দান্তা ক্ষত্রিয়া"[২]—একথা সকল পুরাণেই আছে। সুতরাং ২৫০০ বৎসর পূর্বে অন্তত যত দূর নন্দরাজাদের রাজত্ব ছিল, তত দূর ক্ষত্রিয় লোপ হইয়াছিল, একথা সকল পুরাণই মানেন। সুতরাং ক্ষত্রিয় ছিল বলিয়াই যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে নন্দরাজাদের রাজত্বের বাহিরে দক্ষিণে এবং সুদূর পশ্চিমে। দেখুন, ক্ষত্রিয়ের উপাধি বর্মন। এখন প্রত্নতত্ত্বের কল্যাণে রাজার বংশাবলি অনেক পাওয়া গিয়াছে। আর্যাবর্তে বর্ম উপাধিওয়ালা রাজা কই? ছয় শত বৎসর পূর্বে পোকরন রাজবংশের বর্ম উপাধি ছিল আর পোকরন মরুদেশ, নন্দরাজার দেশের বাহিরে। কর্ণাটেও ২/৩ শতকে এক দল শর্মা ক্ষত্রিয-বৃত্তি লইয়া বর্মা হইয়াছিল। সুতরাং আমাদের এ অঞ্চলে ক্ষত্রিয়ের নামও ছিল না, গন্ধও ছিল না। অনেক দেশে আবার যে রাজা বা রাজপুরুষ হইত, তাহাকেই ক্ষত্রিয় বলিত—শবরস্বামী[৩] একথা স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং আমাদের দেশে চারি জাতি বা চারি বর্ণ খুঁজিয়া বেড়ানো বোধ হয় ভুল। নন্দরাজার পর আমাদের দেশে ক্ষত্রিয় ছিল না, এখনও নাই। যাহা আছে তাহা বিদেশী আমদানি এবং বেশি দিনের নহে। ৩০০ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশ বৈশ্য-প্রধান দেশ। এখানে রেশম, ছালটি, তুলার কাপড় খুব হইত; অনেক লোক নৌকার ব্যবসা করিত, মাছ অনেক লোক ধরিত, জঙ্গলের মধ্যে মহল করিয়াও অনেক লোক জীবিকা নির্বাহ করিত, তাহাতেই গালার ব্যবসায়, হরীতকী ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে। খনি হইতে লোহা অভ্র তুলিয়া অনেক লোক দিন গুজরান করিত। লোহার ব্যবসায়ের ব্যাপার কতক কতক

শুনিয়াছি। বীরভূমে এ বিষয়ে একটু অনুসন্ধানও চলিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লোহা আছে কিনা পরীক্ষা করিত এক জাতি। লোহা খুঁজিয়া বাহির করিত এক জাতি। লোহার মল বাহির করিয়া দিয়া খাঁটি লোহা লইত এক জাতি। লোহা হইতে ইস্পাত বাহির করিত এক জাতি। এইরূপে দশ-বারো জাতি পরস্পর সাহায্য করিয়া ইস্পাত বিক্রয় করিত। এইসব জাতিরই পরামাণিক, মেট পরামাণিক, খারিক, বারিক প্রভৃতি গভর্নমেন্টের সব সরঞ্জাম ছিল। এই সকল জাতির অনেকেই এখন মুসলমান হইয়া গিয়াছে। আর বেশি কথা বলার দরকার নাই। আমার কথা হইতেছে যে, বাংলায় বৈশ্যবৃত্তিই অধিক ছিল।

কিন্তু এই বৈশ্যেরা হিন্দু বৈশ্য ছিল না। অধিকাংশই বৌদ্ধ, জৈন, আজীবক প্রভৃতি ধর্ম আশ্রয় করিয়া চতুর্বর্ণ সমাজ হইতে তফাত হইয়া পড়িয়াছিল। একবার বৌদ্ধ হইয়া গেলে তাহাকে আবার যদি হিন্দু হইতে হয়, তবে তাহাকে শূদ্রই হইতে হইবে। এইরূপে সারা বাংলাই শূদ্র হইয়া গিয়াছিল। তাই রঘুনন্দন বলিয়া গিয়াছেন, বাংলায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য বর্ণ নাই। এখন একটা ধুয়া উঠিয়াছে যে, রঘুনন্দন কিছু নয়, রঘুনন্দনই দেশটাকে মাটি করিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দন কিন্তু অনেক পরিশ্রম করিয়া যাহা বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই দেশটা ৩০০ বৎসর বেশ চলিয়া যাইতেছে।

এ-সকল কথা বলিলাম শুদ্ধ জিনিসটা যে কত কঠিন সেইটা দেখাইবার জন্য। যেখানে রঘুনন্দনকেও লোকে বিশ্বাস করিতে চায় না, সেখানে আমাদের অতি সাবধান হইয়া যাইতে হইবে—অতি সাবধান হইয়া চলিতে হইবে।

বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাস লিখিতে বসিলে একটি কথার মানে লইয়া ভীষণ গোলে পড়িতে হয়। সে কথাটি জাতি। কোল, ভিল, গারো, খাসিয়া ইহারাও জাতি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইহারাও জাতি। তেলি, মালি, কামার, কুমার, কৈবর্ত, ইহারাও জাতি। প্রথমটি ethnos, দ্বিতীয়টি বর্ণ, তৃতীয়টি ব্যাবসা। কিন্তু সবাই জাতি। ইহাতে কোনো কোনো সময় গোলে পড়িতে হয়। জাতিভেদ বলিতে কোন্ জাতিভেদ বলিব? Ethnos-এর ভেদ, বর্ণের ভেদ না পৈতৃক ব্যবসায়ের ভেদ? বাংলায় কিন্তু তিন রকম জাতিই আছে। ছোটোনাগপুর প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসী একটু সভ্য হইয়া হিন্দু আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়াছে, তাহারা এক জাতি। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণ ইহারা জাতি। আবার ব্যবসায়ী ও নবশাখাদি জাতিও আছে। তাছাড়া ধর্ম ভাঙিয়াও জাতি হয়—যেমন বৈষ্ণব জাতি, যোগী জাতি ইত্যাদি। এইরূপ নানা অর্থে জাতি শব্দ ব্যবহার হওয়ায় জাতি ও জাতিভেদ শব্দ বুঝা বড়োই কঠিন হইয়াছে।

যতই কঠিন হউক, যখন বাংলার সামাজিক ইতিহাস বুঝিতে চেষ্টা করিতেই হইবে, তখন কঠিন বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? যেটা কর্তব্য কর্ম বলিয়া বোধ হইবে, তাহা করিতেই হইবে। যাহা না বুঝিলে আমি কোথা হইতে আসিলাম বুঝিতে পারিব না। তাহা বুঝিতেই হইবে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলিয়াছেন—তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি কায়স্থ, তুমি আগুরি, তুমি রাজপুত—তাহাতে আমার তৃপ্তি হইবে না। যাহা সত্য তাহাই খুঁজিতে হইবে। এ পর্যন্ত যাহা কেহ খোঁজে নাই, তাহাই খুঁজিতে হইবে। অনেক বার বিফল হইতে

হইবে, অনেক বার পথ পাইয়াছি বলিয়া বোধ হইবে, আবার পথ হারাইয়া যাইবে। কিন্তু হতাশ হইলে চলিবে না।

মুসলমান অধিকারের ৪/৫ শত বৎসর পূর্বে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল, লোক প্রায়ই বৌদ্ধ ছিল। হিওনসাঙগ বলিয়াছেন, কিরণ সুবর্ণ [কর্ণ সুবর্ণ], পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন, কোমলিঙগ প্রভৃতি স্থানে অন্তত ১০ হাজার বৌদ্ধ-মঠ ছিল ও প্রায় এক লক্ষ ভিক্ষু ছিল। সেকালে বৌদ্ধদের ভিতর ভিক্ষু ছাড়াও গৃহস্থ পুরোহিতও অনেক ছিল। তাহাদিগকে আর্য বলিত। তাহারা ভিক্ষুদিগকে প্রণাম করিত, ভিক্ষুরা তাহাদিগকে প্রণাম করিত না। সুতরাং এই সকল ভিক্ষু পুরোহিতদিগকে যাহারা ভিক্ষা দিত ও প্রতিপালন করিত তাহাদের সংখ্যা অনেক ছিল। কত তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না, তবে এক কোটির অধিক বই অল্প নহে। মোট লোক-সংখ্যা কত ছিল জানা যায় না, তাহার কত অংশ বৌদ্ধ তাহাও জানা যায় না। তবে দেশটা বৌদ্ধপ্লাবিত ছিল।

এইখানে একটা কথা উঠিতে পারে, বৌদ্ধ কাহাকে বলে? অনেকে বলেন, ভিক্ষুরাই বৌদ্ধ, ভিক্ষুর বাহিরে বৌদ্ধ নাই। গৃহস্থ বৌদ্ধ হইতেই পারে না। আবার অনেকে বলেন, যাঁহারা দশশীল[৪] গ্রহণ করেন, ভিক্ষু তাঁহারাই। যাঁহারা অষ্টশীল বা পঞ্চশীল গ্রহণ করেন, তাঁহারা গৃহস্থ-বৌদ্ধ। এ ছাড়া আর বৌদ্ধ নাই। কিন্তু বাংলা দেশের গুপ্ত মহাশয়েরা বাঙালি বৌদ্ধদের জন্য একখানি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে লেখা আছে—যে কেহ সকালে উঠিয়া বলেন, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি" তিনিই বৌদ্ধ। লক্ষণটা এত ব্যাপক হইয়া পড়িল যে, সব লোকই ইহার মধ্যে আসিতে পারে। বৌদ্ধ কাহাকে বলে ইহাতে এমন লক্ষণ আমি আর কোথাও পাই নাই। তাই সেই বইখানি আমি সামনে বসিয়া নকল করিয়া আনিয়াছি। উহাতে লেখা আছে, "অনেন রত্নত্রয় শরণেন বৌদ্ধ ইতি গীয়তে।"[৫] ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৌদ্ধ যাহারা, তাহারা পঞ্চশীল গ্রহণ করে। পঞ্চশীল বা পঞ্চ সম্বরের প্রথম সম্বর—"আমি যাবজ্জীবন প্রাণনাশ করিতে বিরত থাকিব।" এখন কথা উঠিবে, অনেক জাতি আছে যাহারা একেবারে অসম্বর অর্থাৎ সম্বর পাইতেই পারে না; যথা—কৈবর্ত, খাটিক, আখেটক ইত্যাদি। অর্থাৎ যাহারা মাছ ধরিয়া ব্যবসা করে, জন্তু মারিয়া মাংস বিক্রয় করে ও শিকার করিয়া জীবন নির্বাহ করে, ইহারা সকলেই অসম্বর। তবে যদি ইহারা জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় করে তবে ইহারা সম্বর পাইতে পারে। এই খানে আমরা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের প্রথম সূত্র পাইলাম। কৈবর্ত, খাটিক, আখেটক প্রভৃতি জাতি বাংলায় অনেক ছিল, তাহারা প্রাণীহত্যা করিয়া দিন গুজরান করিত, তাহারা বৌদ্ধ ছিল কিন্তু তাহারা সম্বর পাইত না। প্রাণীহিংসা ত্যাগ করিলে সম্বর পাইত। এইরূপে বাংলা দেশে হেলে কৈবর্ত, জেলে কৈবর্ত, হেলে তিওর, জেলে তিওর প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। যেহেতু মৎস্যজীবীরা সকল দেশেই সমাজের নিম্ন স্থান অধিকার করে এখানেও তাহাই করিত। যেহেতু তাহারা বৌদ্ধ ছিল সেইজন্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদের সঙেগ আচরণ করিতে চাহিতেন না। সেইজন্য হেলেই হউক আর জেলেই হউক, কৈবর্তাদি জাতি ব্রাহ্মণদের অনাচরণীয়।

এইখানে আমার একটি কথা বলিবার আছে। আমাদের ধর্মকে অনেকে 'ছুঁই-ছুঁই' ধর্ম বলেন, ছুতমার্গ বলেন, আমরা অপর জাতিকে ঘৃণা করি বলেন। আমরা ঘৃণা করি

বলিয়াই তাঁহারাও আমাদের উপর সদয় নন; তাঁহারাও আমাদের ঘৃণা করেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল কথা ভালো নহে। আমাদের ইহাতে দোষ কী? যাহারা আমাদের ধর্ম মানে না, আমাদের আচার-ব্যবহার মানে না, যাহাদের মনের গতি আমাদের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আমরা তাহাদের সঙ্গে আচার-ব্যবহার করি কীরূপে? আর তাহারাও কি আমাদের সঙ্গে আচার-ব্যবহার করিতে চাহিত? তাহারাও আমাদের সঙ্গে ব্যবহার রাখিতে চাহিত না, আমরাও চাহিতাম না। তাহারা এখন আত্মবিস্মৃত হইয়াছে, আমরা হই নাই। এখন তাহারা বলে, ব্রাহ্মণেরা তাহাদের উপর অত্যাচার করিতেছে। কিন্তু গোড়ায় তাহারাই আরম্ভ করিয়াছিল। একটি গল্প বলি—একটি ছেলে সর্বদা বৌদ্ধবিহারে যাইত, ভিক্ষুদের খুব সেবা করিত। একজন ভিক্ষু এক দিন তাহাকে বলিলেন, তুমি এমন ভক্ত, তুমি কেন ভিক্ষু হও না, না হয় উপাসক হও না? সে বলিল, দেরি আছে। মাস খানেক পরে আসিয়া সে বলিল, আমি এখন উপাসক হইতে পারি। ভিক্ষু বলিল, এত দিন পার নাই, এখন পার কেন? সে বলিল, এখন ব্রাহ্মণ দেখিলেই তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা হয়, কাজেই আমি বৌদ্ধ হইবার উপযুক্ত হইয়াছি। ইহাতে বোধ হয়, হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই পরস্পরকে অনাচরণীয় করিয়াছিলেন। করার হেতুও ছিল। একেবারে কিছুতেই মিলে না, তবে আচরণ হয় কীসে? আমরাও যেমন আচরণ করিতাম না, তাহারাও তেমনি আচরণ করিত না। ইহার জন্য কোনো পক্ষকেই দোষ দেওয়া যায় না। আহার-ব্যবহারেই অনাচরণ, অন্য সর্বত্র তো আচরণ ছিল। সুতরাং এই অনাচরণ আছে বলিয়া ব্রাহ্মণদেরই ছুতমার্গ বলা, ছুঁই-ছুঁই ধর্ম বলা, শুচিবাই বলা অত্যন্ত অন্যায়।

কৈবর্ত প্রভৃতি জাতিরা বৌদ্ধ ছিল, তাই তাহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের আচরণ ছিল না, এইটি আমাদের সামাজিক ইতিহাসের মূলসূত্র। এই সূত্র প্রণিধান পূর্বক ব্যাখ্যা করিলে দেখা যাইবে যে, যাহারা যাহারা অনাচরণীয়, সকলেই ভিন্নধর্মাবলম্বী ছিল। ইতিহাস যত দূর পাওয়া যায় সেগুলি ক্রমে দেখাইব। তবে একটা কথা, বৌদ্ধধর্ম যখন বাংলায় ফেল হইল তখন অনেকে আসিয়া ব্রাহ্মণদের আশ্রয় লইল। অনেকে লইল না—তাহারা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-পক্ষের সঙ্গে আচরণ করিতে তখনও রাজি হইল না।

[ অসমাপ্ত রচনা ]

'মাসিক বসুমতী'
ফাল্গুন, ১৩৫৬।।

*প্রাসঙ্গিক তথ্য*

---

(১) রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম নবদ্বীপে। **'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব'**, **'তীর্থযাত্রাবিধি'**, **'দায়তত্ত্ব'** প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ এবং জীমূতবাহনের **'দায়ভাগ'**-এর টীকা রচনা করেন।

(২) অনুবাদ ঃ নন্দরাজাতেই ক্ষত্রিয়ের শেষ।

(৩) পূর্বমীমাংসা-দর্শনের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শবরস্বামী ২০০ খ্রিস্টাব্দে জৈমিনির পূর্বমীমাংসা সূত্রের (আ. খৃ. পূ. ৪০০) বিস্তারিত ভাষ্য রচনা করেন। অনেকে মনে করেন, তার প্রকৃত নাম ছিল আদিত্যদেব এবং কাশ্মীর অথবা তক্ষশিলার অধিবাসী ছিলেন।

(৪) যে কুশলধর্মে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ আত্মমুখিনতার দিকে অগ্রসর হতে সমর্থ হয় তাকে বলা হয় শীল। শীল শব্দের অর্থ সুনীতি অবলম্বনে কায়িক, বাচনিক, মানসিক সংযম অভ্যাস। দশশীল : ১. প্রাণি বধ না করা, ২. অদত্তবস্তু না নেওয়া, ৩. ব্যাভিচার না করা, ৪. মিথ্যা না বলা, ৫. মদ্যপান না করা, ৬. বিকালে আহার না করা, ৭. নাচ-গান-বাজনায় যোগ না দেওয়া, ৮. মালা, সুগন্ধি ব্যবহার না করা, ৯. উঁচু শয্যায় না শোওয়া, ১০. সোনা-রূপা না নেওয়া—পালি বিনয় পিটকে এই দশশীলের উল্লেখ আছে।

(৫) এখানে ততকর গুপ্তর বইয়ের খণ্ডিত পুঁথির কথা বলছেন। রচনার বিষয় বৌদ্ধ আচার-বিধি। ততকর বলেন, "এইভাবে তিন রত্নের (বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ) শরণ নেওয়াতেই বৌদ্ধ—এই কথা বলা হয়।" ততকর গুপ্তর পুঁথির নির্দেশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে এই বইয়ে সংকলিত "হিন্দু বৌদ্ধে তফাত" প্রবন্ধে।

# কৌলীন্যপ্রথার উৎপত্তি

## রমেশচন্দ্র মজুমদার

বাংলা দেশের কুলপঞ্জিকাসংজ্ঞক গ্রন্থাবলির কাহিনিতে কৌলীন্যের উৎপত্তির সঙ্গে দুজন প্রাচীন নরপতির নাম সংযুক্ত দেখা যায়। এই নরপতিদ্বয় হলেন আদিশূর ও বল্লালসেন। অনুরূপভাবে মিথিলাদেশের কিংবদন্তি অনুসারে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমপাদে কর্ণাটবংশীয় অন্তিম রাজা হরিসিংহ বা হরসিংহ সেখানে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন।

বাংলার কৌলীন্য মূলত এবং প্রধানত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের সমাজকে প্রভাবিত করে। এই সমাজ দুটির নাম দক্ষিণপশ্চিম বাংলার রাঢ়দেশ এবং উত্তরবাংলার বরেন্দ্র দেশের সহিত সম্পর্কিত। ধীরে ধীরে কৌলীন্য প্রথার প্রভাব বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের সামাজিক ব্যবস্থাতে বিস্তৃত হয়েছিল। মিথিলার কৌলীন্য প্রথার ইতিহাসও অনুরূপ। মধ্যযুগে মিথিলা এবং বাংলার সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে একটা যোগসূত্র ছিল, তার প্রমাণ আছে। বাঙালি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের গাঙ্গুলি (গঙ্গোপাধ্যায়) গাঞি মৈথিল ব্রাহ্মণদের গঙ্গৌলী মূলগ্রামের সহিত অভিন্ন, তাতে সন্দেহ নেই। 'গাঞি' শব্দ সংস্কৃত 'গ্রামী' (গ্রামবাসী বা গ্রামাধিকারী) শব্দের বিকার। কথাটি পরিবারবিশেষের মূল বাসস্থানের দ্যোতক।

কৌলীন্য প্রথার পূর্ণপ্রভাব বাংলার সমাজব্যবস্থায়, বিশেষত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে, ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এর কুফল আজ বাঙালির অতীত সামাজিক ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকেও বাঙালি সমাজ হতে প্রথাটি সম্পূর্নরূপে বিলুপ্ত হয়নি এবং আজও যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় এবং বঙ্গজ কায়স্থসমাজে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র কখনও বা কিঞ্চিৎ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হন, এটা কৌলীন্য প্রথারই চিহ্নাবশেষ।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রদের কৌলীন্য প্রথা মোটামুটি একরূপ। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা কুলীন, সিদ্ধশ্রোত্রিয়, সাধ্যশ্রোত্রিয় এবং কষ্ট বা কাষ্ঠশ্রোত্রিয়—এই চার শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন। নিয়ম ছিল যে, কুলীনের পুত্র কুলীন, সিদ্ধশ্রোত্রিয় ও সাধ্যশ্রোত্রিয় বংশে বিবাহ করতে পারবে; সিদ্ধশ্রোত্রিয়ের পুত্র সিদ্ধ ও সাধ্য-শ্রোত্রিয়কুলের কন্যা বিবাহ করবে; কিন্তু সাধ্য এবং কষ্ট-শ্রোত্রিয় কেউ স্বকীয় শ্রেণির বাইরে বিবাহ করতে পারবে

না। স্ত্রীলোকের বেলায় ব্যবস্থা ছিল এর বিপরীত। সাধ্যশ্রোত্রিয়-কন্যার বিবাহ সাধ্য ও সিদ্ধশ্রোত্রিয় এবং কুলীন বংশে হতে পারত, এবং সিদ্ধশ্রোত্রিয়ের দুহিতা সিদ্ধশ্রোত্রিয় এবং কুলীন-শ্রেণিতে বিবাহিত হত; কিন্তু কুলীন ও কষ্টশ্রোত্রিয় কন্যাদের বিবাহ নিজ নিজ শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ ছিল। এই কুব্যবস্থার ফলে কুলীন সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত হয়। কুলীন ব্রাহ্মণেরা অনেকে শতাধিক বিবাহ করতেন এবং বৎসরে একবার করে বিভিন্ন শ্বশুরগৃহে পদার্পণপূর্বক যথাসম্ভব অর্থ আদায় করতেন; ওই অর্থেই তাঁদের অনেকের জীবিকা নির্বাহ হত। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'-লেখক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের নিকট শুনেছি, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার বজ্রযোগিনীগ্রামবাসী কৃষ্ণসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নীসংখ্যা ছিল ২৮৪টি। ওই শতাব্দীর শেষভাগে অভয়চন্দ্র দাস মহাশয় দুজন কুলীন ব্রাহ্মণের কথা বলেছেন; তাঁদের মধ্যে একব্যাক্তি ৬০ জন হতভাগিনীকে বিবাহ করেছিলেন এবং অপরজনের পত্নীর সংখ্যা ছিল শতাধিক। এই ব্রাহ্মণদ্বয়ের একটি করে খাতা ছিল; তাতে তাঁরা কোন্ কোন্ গ্রামে কার কার কন্যা বিবাহ করেছিলেন, তা লিখিত ছিল। প্রতি বৎসর শীতকালে তাঁরা ওই খাতা নিয়ে একে একে প্রত্যেক স্ত্রীকে দর্শন দিতেন এবং শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা অনুসারে অর্থ আদায় করতেন। আবার অনেক কুলীন স্বামী কদাচিৎ বিভিন্ন স্ত্রীকে দর্শন দিতেন। এর ফলে সমাজে নানা রকমের দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল। কথিত আছে, জনৈক কুলীন নিজ শ্বশুরের সঙ্গে নামসাদৃশ্যবশত ভুল করে জামাতারূপে অপর এক ব্রাহ্মণের গৃহে উঠেছিলেন এবং কিছুদিন পরে ওই ব্রাহ্মণের প্রকৃত জামাতার আবির্ভাবে ভুলটি ধরা পড়ে। এইরূপ কেলেঙ্কারির কাহিনী অগণিত। এই জাতীয় একটি কাহিনীর ভিত্তিতেই অদ্বিতীয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

কুলপঞ্জিকার কাহিনি অনুসারে, বাংলা দেশে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের অভাবহেতু আদিশূর নামক রাজা যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত কান্যকুব্জ কিংবা কোলাঞ্চ হতে পাঁচজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনয়ন করেছিলেন। বলা হয়েছে, এই পঞ্চ ব্রাহ্মণই বর্তমান রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ এবং তাঁদের পাঁচজন কায়স্থজাতীয় ভৃত্যের মধ্যে চারজনের বংশধরগণই পরে কুলীন কায়স্থরূপে পরিগণিত হয়েছেন। বাংলা দেশের স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা সাতশতী নামে পরিচিত ছিলেন। অবশ্য কালক্রমে তাঁরা সকলেই আপনাদের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বলে পরিচয় দিয়ে ওই ওই সমাজে মিশে যেতে সমর্থ হয়েছেন।

আদিশূর কর্তৃক রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষগণের বাংলা দেশে আনয়নের কাহিনি ঐতিহাসিক সমাজে গৃহীত হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত History of Bengal, Vol. I-গ্রন্থে এ বিষয়ে নিম্নোদ্ধৃত সমালোচনা দেখা যায় : "As regards Adisura, different genealogies of his family are given in different texts; he is referred to as the grandfather (mother's father) of Ballalasena in some and as that of a remote ancestor of Ballalasena in others. He is said to have been the ruler of Bengal and Orissa; but some authorities add Anga, Kalinga, Karnata, Kamarupa, Saurashtra, Magadha, Malava and Gurjara to his dominions. Some say that the whole affair (i.e. the bringing of the Brahmanas) was peaceful, as Adisura had married the daughter of

the Kanauj king, while, according to others, he fought with him (i.e. the king of Kanauj) : and his capital, where he received the Brahmanas, is placed by some at Gauda and by others at Vikramapura. The reasons why the Brahmanas were brought by him are variously stated. Six different authorities put forward names of different religious ceremonies for the performance of which the Brahmanas were requisitioned. According to a seventh account, the king of Kasi (not Kanauj as in the other texts) being asked by Adisura to pay tribute refused to do so, and in reply tauntingly referred to Adisura's dominions as bereft of Brahmanas and Vedic sacrifices whereupon Adisura defeated him in battle and brought the five Brahmanas. The date of this event is also variously put down as Saka 654, 675, 804, 854, 864, 914, 954, 994 and 999, while three sets of names are given as those of the five Brahmanas.''

এ সম্পর্কে আরও কিছু বলবার আছে। প্রথমত, বাংলা দেশের ঐতিহাসিক উপাদানে আদিশূর নামক কোনও রাজার অস্তিত্বের প্রমাণ নেই। কিন্তু নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে মৈথিল পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র তদীয় সমসাময়িক জনৈক আদিশূররাজের উল্লেখ করেছেন। এই আদিশূর সম্ভবত পালসম্রাট্‌দের সামন্তরূপে মিথিলা এবং উত্তরবাংলার কিয়দংশ শাসন করছিলেন। পালেরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বলেই হয়তো ব্রাহ্মণলেখকের রচনায় তাঁকে কিছু প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আবার এই আদিশূরের কোনো কীর্তির জন্য তাঁর নাম পূর্বভারতে পণ্ডিতব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এই অনুমানে কিছুমাত্র সত্য থাকলেও মৈথিলী কৌলীন্যপ্রথার নিকট বাংলার ঋণ স্বীকার করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, আদিশূর কাহিনিতে শকাব্দের উল্লেখ হতে বোধ হয় যে, কাহিনিটি সেন আমলে বাংলা দেশে শকাব্দের ব্যবহার সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরে কল্পিত হয়েছিল। তৃতীয়ত, চোলবংশীয় রাজা তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের (১১৭৮-১২১৬ খ্রিঃ) আমলের একখানি শিলালেখপাঠে অনুমিত হয় যে, আদিশূর কাহিনিটি মূলত দক্ষিণভারত হতে সেনরাজগণের সময়ে বাংলা দেশে আনীত হয়। সেনেরা কর্ণাটদেশ থেকে এসে বাংলায় উপনিবিষ্ট হন। বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত স্বদেশীয় রাজবংশের প্রসাদলোভী অনেকে সে সময়ে দক্ষিণভারত হতে বাংলায় এসে বাসস্থাপন করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য বাংলায় দক্ষিণভারতীয়দের উপনিবেশস্থাপন পাল আমলেই আরম্ভ হয়। পালবংশীয় রাজগণের মধ্যে অনেকে দক্ষিণি রাজবংশের কন্যা বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের প্রসাদভোজীদের মধ্যে কর্ণাট এবং চোল-জাতির উল্লেখ আছে। সুতরাং আদিমধ্যযুগে একটি দক্ষিণভারতীয় কিংবদন্তির বাংলায় প্রবেশ খুব সম্ভব বলে মনে হয়।

উপরে যে চোল শিলালেখের উল্লেখ করেছি তাতে বলা হয়েছে যে, অরিন্দম নামক একজন প্রাচীন নরপতি অন্তর্বেদী অর্থাৎ কান্যকুব্জ অঞ্চল হতে অনেক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনিয়ে চোলদেশে স্থাপন করেছিলেন। এই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁদের পাদুকা ও ছত্র-বাহী যে ভৃত্যগণ দক্ষিণে চোলদেশে গিয়েছিল, তারা বর্তমান তিরুচিরাপল্লি জেলায় পাঁচটি গ্রাম লাভ করে এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে। অরিন্দম এবং আদিশূরের কাহিনিদ্বয়ে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখা যায়। আমাদের সন্দেহ এই যে, সেন আমলে অরিন্দমের কাহিনি বাংলায় প্রবেশ করে কয়েক শতাব্দী পরে কুলপঞ্জিকার আদিশূরের কাহিনিতে আত্মপ্রকাশ

করেছিল। যে সকল কুলপঞ্জিকায় আদিশূরের কাহিনি উল্লিখিত হয়েছে, তার কোনোটিই অত প্রাচীন নয়। আমরা আদিশূরের প্রসঙ্গেও এ বিষয়টির আলোচনা করেছি।

আদিশূর কর্তৃক যে পাঁচজন পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণ বাংলায় আনীত হয়েছিলেন বলে কথিত আছে, কুলপঞ্জিকাতে তাঁদের নামের তিনটি স্বতন্ত্র তালিকা পাওয়া যায় ঃ (১) শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশ, ভারদ্বাজগোত্রীয় মেধাতিথি বা তিথিমেধা, কাশ্যপগোত্রীয় বীতরাগ, বাৎস্যগোত্রীয় সুধানিধি এবং সাবর্ণগোত্রীয় সৌভরি; (২) শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্ট-নারায়ণ, কাশ্যপগোত্রীয় শ্রীহর্ষ, বাৎস্যগোত্রীয় ছান্দড়, ভারদ্বাজগোত্রীয় দক্ষ এবং সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভ; এবং (৩) শাণ্ডিল্যগোত্রীয় নারায়ণ, বাৎস্যগোত্রীয় ধরাধর, কাশ্যপগোত্রীয় সুষেণ, ভারদ্বাজগোত্রীয় গৌতম, এবং সাবর্ণগোত্রীয় পরাশর। এ ছাড়াও বৈষম্য আছে; যেমন বেদগর্ভকে কখনও কখনও বাৎস্যগোত্রীয় বলা হয়েছে। যা হোক, ওই পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের বংশধরগণ সেনবংশীয় বল্লালসেনের (আ ১১৫৯-৭৯ খ্রি) নিকট কৌলীন্য মর্যাদা প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ৫৬টি গাঞিমধ্যে বল্লাল ১৯ ব্যক্তিকে কৌলীন্য দেন এবং বারেন্দ্রদিগের ১০০ গাঞি মধ্যে ৮ জনকে কুলীন, ৮ জনকে সৎ-শ্রোত্রিয় ও ৮৪ জনকে কষ্টশ্রোত্রিয় বলে নির্ধারিত করেন। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেন (আ ১১৭৯-১২০৬ খ্রি) নাকি রাঢ়ীয় কুলীনের সংখ্যা বাড়িয়ে ২১ করেছিলেন এবং ১৪ জন গৌণকুলীন সৃষ্টি করেছিলেন। আবার পরবর্তীকালে রাজা দানৌজামাধব রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কুলীন, সাধ্যশ্রোত্রিয়, সিদ্ধশ্রোত্রিয়, সুসিদ্ধশ্রোত্রিয় এবং অরি বা কষ্টশ্রোত্রিয়—এই পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। বল্লালের নিয়মে সম্ভবত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এবং কুলীন ও অকুলীনে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না; কিন্তু দনৌজার নিয়মে অরি বা কষ্টশ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করলে কুলীনের কুলভঙ্গ হত। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের সমাজে উদয়ন ভাদুড়ি পরিবর্ত-মর্যাদা স্থাপন করেন। তার ব্যবস্থিত আটটি পঠী-বিভাগের ফলে বিবাহব্যবস্থা আরও কঠোর হয়। উদয়নের নিয়মে কুলভ্রষ্ট কাপ-ব্রাহ্মণের জল স্পর্শ করলেও কুলীনের কুলভঙ্গ হত। রাজা কংসনারায়ণ শ্রোত্রিয়দিগকে সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্টভেদে শ্রেণিবদ্ধ করলেন। তাঁর নিয়মে কাপকন্যার সঙ্গে কুলীনপুত্রের বিবাহ হলে কোনও কোনও অবস্থায় কুলীনের কুলভঙ্গ হত না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় সমাজে মেলবন্ধন করে পালটি ঘরে বিবাহের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করেন। এটা উদয়নের পরিবর্ত মর্যাদা ও পটীবন্ধনের অনুরূপ। এরই ফলে কুলীনেরা বহুবিবাহের প্রশ্রয় দিতেন এবং অনেক কুলীন কন্যার বিবাহই হত না। সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য এতে বিশেষভাবে কলুষিত হয়েছিল।

বল্লাল কর্তৃক কৌলীন্যসৃষ্টির কাহিনিটি ঐতিহাসিকেরা গ্রহণ করেননি। কারণ সেনযুগের সাহিত্য ও তাম্রশাসনাদি থেকে এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। আবার বৈদ্যজাতির কুলপঞ্জিকা হতে জানা যায় যে, ওই সমাজে বিদ্যা, অর্থ, সদাচার প্রভৃতি গুণের জন্য লোকে কৌলীন্য মর্যাদা লাভ করত এবং সমাজপতি, কুলপঞ্জিকাকার ও ঘটকেরাই সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করতেন। অধিকন্তু রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজের প্রভাবেই বৈদ্যসমাজে কৌলীন্যের উদ্ভব হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। যা হোক, ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে লিখিত ভরত মল্লিকের 'চন্দ্র-প্রভা'তে বল্লালের নামোল্লেখ নেই এবং অর্থ, সদাচার প্রভৃতিকেই কৌলীন্যের কারণ বলা হয়েছে—

আচারাদয় এব হি সন্তি যেষাং মহাত্মনাম্।
ত এব হি কুলীনাঃ স্যুর্ন কুলং পারলৌকিকম্।।
ধনেন কুলমিত্যুক্তং যদ্ আচারবতাং হি তৎ।।

১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা' (কোনও মতে 'কবিকণ্ঠহার') গ্রন্থে কিন্তু স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, প্রাচীনদের মতে আচারাদিই কৌলীন্যের কারণ, কিন্তু আধুনিকদের মতে বৈদ্যবংশীয় নরপতি বল্লালসেন বৈদ্যসমাজে কৌলীন্যের প্রবর্তন করেছিলেন—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্।।
প্রাচীনমতমেতদ্ধি বদন্ত্যাধুনিকাঃ পুনঃ।
পুরা বৈদ্য-কুলোদ্ভূত-বল্লালেন মহৌজসা।
ব্যবস্থাপি চ কৌলীন্যং দুহিসেনাদি-বংশজে।।

সুতরাং বল্লালকর্তৃক বৈদ্যসমাজে কৌলীন্য প্রবর্তনের কাহিনী সপ্তদশ শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন নয়। আবার বল্লালকে বৈদ্যগণ বৈদ্য এবং কায়স্থেরা কায়স্থ বলে দাবি করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কর্ণাটদেশাগত ক্ষত্রিয় বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন।

সম্প্রতি পালবংশীয় তৃতীয় বিগ্রহপালের (আ ১০৪৩-৭০ খ্রি) বনগাঁও তাম্রশাসন হতে পূর্বভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজে কৌলীন্যের উদ্ভব এবং কুলপঞ্জিকা সাহিত্যের উৎপত্তির কারণ জানা গিয়েছে। বনগাঁও প্রাচীন মিথিলা বা তীরভুক্তি অর্থাৎ বর্তমান তীরহুত বা উত্তর বিহারের সাহারসা জেলার অন্তর্গত। এই জেলাটি ভাগলপুর জেলার গঙ্গার উত্তরতীরবর্তী অংশ নিয়ে কিছুকাল পূর্বে গঠিত হয়েছে। ওই তাম্রশাসন বিগ্রহপালের রাজত্বের ১৭শ বর্ষে অর্থাৎ আনুমানিক ১০৫৯ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাতীরবর্তী কাঞ্চনপুর হতে বিষুবসংক্রান্তি উপলক্ষে প্রদত্ত হয়েছিল।

বনগাঁও তাম্রশাসনদ্বারা বিগ্রহপাল তীরভুক্তি নামক প্রদেশের হোদ্রেয় সংজ্ঞক বিষয় বা জেলার অন্তর্গত বসুকাবর্তগ্রামের একাংশ নিষ্কর দান করেছিলেন। দানগ্রাহক ব্রাহ্মণের নাম ঘাণ্টুকশর্মা। তিনি উত্তরবিহারের ইট্টাহাক বা ইটুহোক গ্রামে বাস করতেন; কিন্তু তাঁর পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল কোলাঞ্চ। তিনি শাণ্ডিল্যগোত্রিয় ও ছন্দোগশাখাধ্যায়ী এবং মীমাংসা, ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম তুঙ্গ এবং পিতামহের নাম যোগস্বামী।

বনগাঁও তাম্রশাসনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর নিম্নোদ্ধৃত ক্রোড়পত্র।—

ক্রোড়াঞ্চান্নিরিয়ায় কাচ্ছ ইতি যঃ সদ্-ব্রাহ্মণানাং স্থিতি—
স্তস্মাদ্ গোহণকো দ্বিজোত্তম-গৃহং বিশ্রাম-ভূর্যজুনাম্।
অস্মাদিদ্ধহলেতি যত্র বিবদো যোগেশ্বরো যৎসুতঃ
খ্যাতস্তুঙ্গ ইতো'পি নির্মল-যশা ঘণ্টীশ-নামাত্মজঃ।।
যো গৌড়াধিপতেরসীম-গুণভূ রাজ্ঞো বিধেয়ো দিশাং
ভূপালেষু বিধায় মৈত্র্যমসমং সন্তুষ্ট-চিত্তাচিতঃ।
কৃত্বা শাসনমেতদাত্ম-হলতঃ কামপ্যবন্ধ্য-স্থিতিং
বিশ্রামায় চ দীন-দুঃখিত-জনস্যাভুদিহৈবাশ্রমম্।।

ক্রোড়পত্রটি হতে জানা যায় যে, বসুকাবর্তগ্রামটি বিগ্রহপালের ঘণ্টীশ নামক জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ কর্মচারীর জায়গির বা জমিদারির অন্তর্গত ছিল এবং তিনি রাজকোষে যথোপযুক্ত অর্থ জমা দিয়ে রাজা বিগ্রহপালের দ্বারা তার একাংশ কোলাঞ্চব্রাহ্মণ ঘাণ্টুকশর্মাকে নিষ্কর দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। জনৈক কোলাঞ্চব্রাহ্মণের প্রতি একজন মৈথিল ব্রাহ্মণের

এইরূপ অতিভক্তির কারণ কী? অবশ্যই তিনি কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণটির সঙ্গে আপন কন্যা কিংবা স্বীয় পরিবারের অপর কারও বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, মৈথিল ব্রাহ্মণ ঘণ্টীশ অপর একজন কোলাঞ্চব্রাহ্মণের রক্তবিন্দু তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত বলে গর্ব প্রকাশ করেছেন। এই কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণ ছিলেন ঘণ্টীশের পিতামহের পিতামহীর পিতামহ। কোলাঞ্চ (ক্রোড়াঞ্চ) হতে তীরভুক্তিতে আসেন কাচ্ছ; তাঁর পুত্র গোহ্ণক; গোহ্ণকের কন্য ইদ্ধহলা; তাঁর গর্ভজাত বিবদ; বিবদের পুত্র যোগেশ্বর; যোগেশ্বরের পুত্র তুঙ্গ এবং তুঙ্গের পুত্র ঘণ্টীশ। অতিদূরবর্তী কোলাঞ্চব্রাহ্মণের রক্তের এই দাবি হতে মৈথিল ব্রাহ্মণেরা পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহসম্পর্কের উপর কীরূপ মর্যাদা আরোপ করতেন, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই আগ্রহ হতেই কৌলীন্য প্রথার উদ্ভব। আবার এইরূপ দূরসম্পর্কের বিবরণ লিখে না রাখলে দীর্ঘকাল পরে তা প্রমাণ করা সম্ভব ছিল না। তাই কুলপঞ্জিকার উৎপত্তি।

মধ্যযুগের ভারতীয় রাজগণ যে সকল ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি দান করেছেন বলে জানা যায়, তাঁদের অনেকের পরিবারের আদিবাসস্থান ছিল ক্রোড়াঞ্চ (কোলাঞ্চ, ক্রোড়ঞ্জ, ক্রোড়ঞ্জি ইত্যাদি), মুক্তাবস্তু, শ্রাবস্তি, তর্কারী প্রভৃতি আধুনিক উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত গ্রামসমূহ। এগুলির মধ্যে শ্রাবস্তি, মুক্তাবস্তু ও তর্কারী বর্তমান গোন্ডা-বহ্‌রাইচ জেলাদ্বয়ের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এবং কোলাঞ্চ কান্যকুব্জের নিকটে অবস্থিত ছিল বলে মনে হয়। এই ব্রাহ্মণেরা যে বহুসংখ্যায় বাংলা দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। দশম-একাদশ শতাব্দীর শিলালেখসমূহ থেকে জানা যায় যে, উত্তরবাংলার হিলি-বালুরঘাট অঞ্চলের প্রাচীন পাহুনিয়োজন নামটি পরিবর্তিত হয়ে শ্রাবস্তি নাম হয় এবং ওই অঞ্চলের আর একটি স্থানের নাম হয় তর্কারী। উত্তরপ্রদেশের শ্রাবস্তি ও তর্কারীবাসী ব্রাহ্মণদের উপনিবেশ বলেই যে উত্তরবাংলার স্থানবিশেষের নাম শ্রাবস্তি ও তর্কারী হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এইরূপ নামকরণের একটি সুপরিচিত উদাহরণ তামিলনাড়ুর দক্ষিণআর্কট জেলার পাটলিপুত্রম্। প্রাচীন মগধরাষ্ট্রের রাজধানী বর্তমান পাটনায় অবস্থিত পাটলিপুত্রের ভট্ট ব্রাহ্মণেরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন বলেই দক্ষিণভারতের ওই স্থানটির নাম হয়েছিল পাটলিপুত্রম্।

উৎস : সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ

# কৌলীন্যমর্যাদার প্রথম ব্যবস্থা ও বর্তমান অবস্থা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রাজা আদিশূর, পুত্রেষ্টিযাগের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, অধিকারস্থ ব্রাহ্মণদিগকে যজ্ঞসম্পাদনার্থে আহ্বান করেন। এ দেশের তৎকালীন ব্রাহ্মণেরা আচারভ্রষ্ট ও বেদবিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা আদিশূরের অভিপ্রেত যজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না। রাজা, নিরুপায় হইয়া, ৯৯৯ শাকে[১] কান্যকুব্জরাজের নিকট, শাস্ত্রজ্ঞ ও আচারপূত পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রেরণ প্রার্থনায়, দূত প্রেরণ করিলেন। কান্যকুব্জরাজ, তদনুসারে, পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন;—

| | | |
|---|---|---|
| ১ | শাণ্ডিল্যগোত্র | ভট্টনারায়ণ। |
| ২ | কাশ্যপগোত্র | দক্ষ। |
| ৩ | বাৎস্যগোত্র | ছান্দড়। |
| ৪ | ভরদ্বাজগোত্র | শ্রীহর্ষ। |
| ৫ | সাবর্ণগোত্র | বেদগর্ভ।[২] |

ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক সভৃত্য অশ্বারোহণে গৌড়দেশে আগমন করেন। চরণে চর্মপাদুকা, সর্বাঙ্গ সূচিবিদ্ধ বস্ত্রে আবৃত, এইরূপ বেশে তাম্বুল চর্বণ করিতে করিতে, রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা দ্বারবানকে কহিলেন, ত্বরায় রাজার নিকট আমাদের আগমনসংবাদ দাও। দ্বারী, নরপতিগোচরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের আগমনসংবাদ প্রদান করিলে, তিনি প্রথমত অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; পরে, দৌবারিকমুখে তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদের বিষয় অবগত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ দেশের ব্রাহ্মণেরা আচারভ্রষ্ট ও ক্রিয়াহীন বলিয়া, আমি দূর দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইলাম। কিন্তু, যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে উঁহাদিগকে আচারপূত বা ক্রিয়াকুশল বলিয়া বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, আপাতত সাক্ষাৎ না করিয়া, উঁহাদের আচার প্রভৃতির বিষয় সবিশেষ অবগত হই, পরে

---

১ আদিসূরো নবনবত্যধিকনবশতীশতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানায়য়ামাস। কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র।

২ ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোহথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামা চ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।।

যেরূপ হয় করিব। এই স্থির করিয়া, রাজা দ্বারবানকে কহিলেন, ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগকে বল, আমি কার্যান্তরে ব্যাপৃত আছি, এক্ষণে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না; তাঁহারা বাসস্থানে গিয়া শ্রান্তিদূর করুন; অবকাশ পাইলেই, সাক্ষাৎ করিতেছি।

এই কথা শুনিয়া দ্বারবান, ব্রাহ্মণদিগের নিকটে আসিয়া, সমস্ত নিবেদন করিল। রাজা অবিলম্বেই তাঁহাদের সংবর্ধনা করিবেন, এই স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণেরা আশীর্বাদ করিবার নিমিত্ত জলগণ্ডূষ হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন; এক্ষণে তাঁহার অনাগমনবার্তা শ্রবণে, করস্থিত আশীর্বাদবারি নিকটবর্তী মল্লকাষ্ঠে ক্ষেপণ করিলেন; ব্রাহ্মণদিগের এমনই প্রভাব, আশীর্বাদবারির স্পর্শমাত্র, চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ সঞ্জীবিত, পল্লবিত ও পুষ্পফলে সুশোভিত হইয়া উঠিল।[৩] এই অদ্ভুত সংবাদ তৎক্ষণাৎ নরপতিগোচরে নীত হইল। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদের কথা শুনিয়া, প্রথমত তাঁহার মনে অশ্রদ্ধা ও বিরাগ জন্মিয়াছিল; এক্ষণে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিল। তখন তিনি, গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং দৃঢ়তর ভক্তিযোগসহকারে, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন।[৪] অনন্তর, রাজা নির্ধারিত শুভ দিবসে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্রেষ্টিযাগ করাইলেন। যাগপ্রভাবে রাজমহিষী গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইলেন। রাজা, যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, নিজ রাজ্যে বাস করিবার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণদিগকে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা, রাজার নির্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম এই রাজদত্ত পঞ্চ গ্রামে[৫] এক এক জন বসতি করিলেন।

ক্রমে ক্রমে এই পাঁচ জনের ষট্‌পঞ্চাশৎ সন্তান জন্মিল। ভট্টনারায়ণের ষোড়শ, দক্ষের ষোড়শ, শ্রীহর্ষের চারি, বেদগর্ভের দ্বাদশ, ছান্দড়ের আট।[৬] এই প্রত্যেক সন্তানকে রাজা বাসার্থে এক এক গ্রাম প্রদান করিলেন। সেই সেই গ্রামের নামানুসারে, তাঁহাদের সন্তানপরম্পরা অমুকগ্রামীণ, অর্থাৎ অমুকগাঁই, বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। শাণ্ডিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণবংশে বন্দ্য, কুসুম, দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষলি, বটব্যাল, পারিহা, কুলকুলি, কুশারি,

শাণ্ডিল্যগোত্রজশ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠোঽথ ছান্দড়ঃ।।
ভরদ্বাজকুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথা বেদ ইতি স্মৃতঃ।।

৩ বিক্রমপুরের লোকে বলেন, বল্লালসেনের বাটীর দক্ষিণে যে দিঘি আছে, তাহার উত্তর পাড়ে পাকা ঘাটের উপর ওই বৃক্ষ অদ্যাপি সজীব আছে। বৃক্ষ অতি বৃহৎ; নাম গজারিবৃক্ষ। এতজ্জাতীয় বৃক্ষ বিক্রমপুরের আর কোথাও নাই। ময়মনসিংহ জিলার মধুপুর পাহাড় ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। মল্লকাষ্ঠ স্থলে অনেকে গজের আলানস্তম্ভ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

৪ এই উপাখ্যান সচরাচর যেরূপ উল্লিখিত হইয়া থাকে, অবিকল সেইরূপ নির্দিষ্ট হইল।

৫ পঞ্চকোটিঃ কামকোটির্হরিকোটিস্তথৈব চ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রামস্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ।।

৬ ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শ।
চত্বারঃ শ্রীহর্ষজাতা দ্বাদশ বেদগর্ভতঃ।।
অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতাশ্ছান্দড়াত্মনেঃ।।

কুলভি, সেয়ক, গড়গড়ি, আকাশ, কেশরী, মাষচটক, বসুয়ারি, করাল, এই ষোল গাঁই।[৭] কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশে চট্ট, অম্বুলি, তৈলবাটী, পোড়ারি, হড়, গূড়, ভূরিষ্ঠাল, পালধি, পাকড়াশি, পূষলি, মূলগ্রামী, কোয়ারি, পলসায়ি, পীতমুণ্ডী, সিমলায়ি, ভট্ট এই ষোল গাঁই। [৮]ভরদ্বাজগোত্রে শ্রীহর্ষবংশে মুখুটী, ডিংসাই, সাহরী, রাই এই চারি গাঁই।[৯] সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভবংশে গাঙ্গুলি, পুংসিক, নন্দিগ্রামী, ঘণ্টেশ্বরী, কুন্দগ্রামী, সিয়ারি, সাটেশ্বরী, দায়ী, নায়েরি, পারিহাল, বালিয়া, সিদ্ধল এই বারো গাঁই।[১০] বাৎস্যগোত্রে ছান্দড় বংশে কাঞ্জিলাল, মহিন্তা, পূতিতুণ্ড, পিপলাই, ঘোষাল, বাপুলি, কাঞ্জারি, সিমলাল এই আট গাঁই।[১১]

ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির আগমনের পূর্বে, এ দেশে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা তদবধি হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া রহিলেন, এবং সপ্তশতীনামে প্রসিদ্ধ হইয়া পৃথক সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জগাই, ভাগাই, সাগাই, নানসি, আরথ, বালথবি, পিথুরি, মুলুকজুরি প্রভৃতি গাঁই ছিল। সপ্তশতী পঞ্চগোত্রবহির্ভূত; এজন্য কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরা ইঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদানপ্রদান করিতেন না; যাঁহারা করিতেন, তাঁহারাও সপ্তশতীর ন্যায় হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতেন।

কালক্রমে আদিশূরের বংশধ্বংস হইল। সেনবংশীয় রাজারা গৌড়দেশের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।[১২] এই বংশোদ্ভব অতিপ্রসিদ্ধ রাজা বল্লালসেনের অধিকারকালে কৌলীন্যমর্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে, কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণদিগের সন্তানপরম্পরার মধ্যে বিদ্যালোপ ও আচারভ্রংশ ঘটিয়া আসিতেছিল; তন্নিবারণই কৌলীন্যমর্যাদাস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজা বল্লালসেন বিবেচনা করিলেন, আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সবিশেষ পুরস্কার করিলে, ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই সেই সকল গুণের রক্ষাবিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিবেন। তদনুসারে, তিনি পরীক্ষা দ্বারা যাঁহাদিগকে নবগুণবিশিষ্ট দেখিলেন, তাঁহাদিগকে

৭ বন্দ্যাঃ কুসুমো দীর্ঘাঙ্গী ঘোষলী বটব্যালকঃ।
পারী কুলী কুশারিশ্চ কুলভিঃ সেয়কো গড়ঃ।
আকাশঃ কেশরী মাষোঙ্বসুয়ারিঃ করালকঃ।
ভট্টবংশোদ্ভবা এতে শাণ্ডিল্যে ষোড়শ স্মৃতাঃ।।

৮ চট্টোঽম্বুলী তৈলবাটী পোড়ারির্হড়গূড়কৌ।
ভূরিশ্চ পালধিশ্চৈব পর্কটিঃ পূষলী তথা।
মূলগ্রামী কোয়ারী চ পলসায়ী চ পীতকঃ।
সিমলায়ী তথা ভট্ট ইমে কাশ্যপসংজ্ঞকাঃ।।

৯ আদৌ মুখটী ডিণ্ডী চ সাহরী রাইকস্তথা।
ভারদ্বাজা ইমে জাতাঃ শ্রীহর্ষস্য তনূদ্ভবাঃ।।

১০ গাঙ্গুলিঃ পুংসিকো নন্দী ঘণ্টাকুন্দসিয়ারিকাঃ।
সাটো দায়ী তথা নায়ী পারী বালী চ সিদ্ধলঃ।
বেদগর্ভোদ্ভবা এতে সাবর্ণে দ্বাদশস্মৃতাঃ।।

১১ কাঞ্জিবিল্লী মহিন্তা চ পূতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
ঘোষালো বাপুলিশ্চৈব কাঞ্জারী চ তথৈব চ।
সিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎস্যকসংজ্ঞকাঃ।।

১২ আদিসূরের বংশধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিষ্বক্‌সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা।।

কৌলীন্যমর্যাদা প্রদান করিলেন। কৌলীন্যপ্রবর্তক নয় গুণ এই—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা দান।[১৩] আবৃত্তিশব্দের অর্থ পরিবর্ত; পরিবর্ত চারিপ্রকার; আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা।[১৪] আদান, অর্থাৎ সমান বা উৎকৃষ্ট গৃহ হইতে কন্যাগ্রহণ; প্রদান, অর্থাৎ সমান বা উৎকৃষ্ট গৃহে কন্যাদান; কুশত্যাগ, অর্থাৎ কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যার দান; ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ উভয় পক্ষে কন্যার অভাব ঘটিলে, ঘটকের সম্মুখে, বাক্যমাত্র দ্বারা পরস্পর কন্যাদান। সৎকুলে কন্যাদান ও সৎকুল হইতে কন্যাগ্রহণ কুলের প্রধান লক্ষণ; কিন্তু, কন্যার অভাব ঘটিলে, আদানপ্রদান সম্পন্ন হয় না; সুতরাং, কন্যাহীন ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুললক্ষণাক্রান্ত হইতে পারেন না। এই দোষের পরিহারার্থে কুশময়ী কন্যার দান ও ঘটকসমক্ষে বাক্যমাত্র দ্বারা পরস্পর কন্যাদানের ব্যবস্থা হয়।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ষট্‌পঞ্চাশৎ সন্তান এক এক গ্রামে বাস করেন। সেই সেই গ্রামের নামানুসারে, এক এক গাঁই হয়। তাঁহাদের সন্তানপরম্পরা সেই সেই গাঁই বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। সমুদয়ে ৫৬ গাঁই; তন্মধ্যে বন্দ্য, চট্ট, মুখুটি, ঘোষাল, পূতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি, কাঞ্জিলাল, কুন্দগ্রামী এই আট গাঁই সর্বতোভাবে নবগুণবিশিষ্ট ছিলেন,[১৫] এজন্য কৌলীন্যমর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন। এই আট গাঁইর মধ্যে চট্টোপাধ্যায়বংশে বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ, বাঙ্গাল এই পাঁচ; পূতিতুণ্ডবংশে গোবর্ধনাচার্য; ঘোষালবংশে শির; গঙ্গোপাধ্যায়বংশে শিশ; কুন্দগ্রামিবংশে রোষাকর; বন্দ্যোপাধ্যায়বংশে জাহ্লন, মহেশ্বর. দেবল, বামন, ঈশান, মকরন্দ এই ছয়; মুখোপাধ্যায়বংশে উৎসাহ, গরুড় এই দুই, কাঞ্জিলালবংশে কানু, কুতূহল এই দুই; সমুদয়ে এই উনিশ জন কুলীন হইলেন।[১৬] পালধি, পাকড়াশি, সিমলায়ী, বাপুলি, ভূরিষ্ঠাল, কুলকুলি, বটব্যাল, কুশারি, সেয়ক, কুসুম, ঘোষলি, মাষচটক, বসুয়ারি, করাল, অম্বুলি, তৈলবাটী, মূলগ্রামী, পুষলি, আকাশ, পলসায়ি, কোয়ারি, সাহরি, ভট্টাচার্য, সাটেশ্বরী, নায়েরি, দায়ী, পারিহাল, সিয়ারি, সিদ্ধল, পুংসিক, নন্দিগ্রামী, কাঞ্জারি,

১৩ আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্।।

এরূপ প্রবাদ আছে, পূর্বে 'নিষ্ঠা শান্তিস্তপো দানম্', এইরূপ পাঠ ছিল; পরে, বল্লালকালীন ঘটকেরা শান্তিশব্দস্থলে আবৃত্তিশব্দ নিবেশিত করিয়াছেন।

১৪ আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্তশ্চতুর্বিধঃ।।

১৫ বন্দ্যশ্চট্টোঽথ মুখুটী ঘোষালশ্চ ততঃ পরঃ।
পূতিতুণ্ডশ্চ গাঙ্গুলিঃ কাঞ্জিঃ কুন্দেন চাষ্টমঃ।।

১৬ বহুরূপঃ সুচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ।।
পূতির্গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ।
গাঙ্গুলীয়ঃ শিশো নাম্না কুন্দো রোষাকরোঽপিচ।।
জাহ্লনাখ্যস্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ।
দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ।।
উৎসাহগরুড়খ্যাতৌ মুখবংশসমুদ্ভবৌ।

সিমলায়, বালী, এই ৩৪ গাঁই অষ্টগুণবিশিষ্ট ছিলেন, এজন্য শ্রোত্রিয়সংজ্ঞাভাজন হইলেন।[১৭] পূর্বোক্ত নয় গুণের মধ্যে ইঁহারা আবৃত্তিগুণে বিহীন ছিলেন; অর্থাৎ বন্দ্য প্রভৃতি আট গাঁই, আদানপ্রদান বিষয়ে যেমন সাবধান ছিলেন, পালধি প্রভৃতি চৌত্রিশ গাঁই সে বিষয়ে তদ্রূপ সাবধান ছিলেন না; এজন্য তাঁহারা কৌলীন্যমর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন না। আর, দীর্ঘাঙগী, পারিহা, কুলভি, পোড়ারি, রাই, কেশরী, ঘণ্টেশ্বরী, ডিংসাই, পীতমুণ্ডী, মহিন্তা, গূড়, পিপলাই, হড়, গড়গড়ি, এই চৌদ্দ গাঁই সদাচারপরিভ্রষ্ট ছিলেন, এজন্য গৌণ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইলেন।[১৮]

এরূপ প্রবাদ আছে, রাজা বল্লালসেন কৌলীন্যমর্যাদাস্থাপনের দিন স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময়, আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময়, উপস্থিত হন। যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারা কৌলীন্যমর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; যাঁহারা দেড় প্রহরের সময়, তাঁহারা শ্রোত্রিয়, আর যাঁহারা এক প্রহরের সময়, তাঁহারা গৌণকুলীন, হইলেন। ইহার তাৎপর্য এই, প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিতে অধিক সময় লাগে; সুতরাং, যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিয়াছিলেন; তদ্দ্বারা রাজা তাঁহাদিগকে সদাচারপূত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এজন্য তাঁহাদিগকে প্রধান মর্যাদা প্রদান করিলেন। দেড় প্রহরের সময় আগতেরা আচারাংশে ন্যূন ছিলেন, এজন্য ন্যূন মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; আর এক প্রহরের সময় আগতেরা আচারভ্রষ্ট বলিয়া অবধারিত হইলেন, এজন্য রাজা তাঁহাদিগকে, হেয়জ্ঞান করিয়া, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলেন।

এই রূপে, কৌলীন্যমর্যাদা ব্যবস্থাপিত হইল। নিয়ম হইল, কুলীনেরা কুলীনের সহিত আদানপ্রদান নির্বাহ করিবেন; শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিতে পারিবেন না, করিলে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইবেন;[১৯] আর গৌণ কুলীনের কন্যাগ্রহণ করিলে, এককালে কুলক্ষয় হইবেক; এই নিমিত্ত, গৌণ কুলীনেরা অরি, অর্থাৎ কুলের শত্রু, বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরিগণিত হইলেন।[২০]

কানুকুতূহলাবেতৌ কাঞ্জিকুলপ্রতিষ্ঠিতৌ।
ঊনবিংশতিসংখ্যাতা মহারাজেন পূজিতাঃ।।

১৭ পালধিঃ পর্কটিশ্চৈব সিমলায়ী চ বাপুলিঃ।
ভূরিঃ কুলী বটব্যালঃ কুশারিঃ সেয়কস্তথা।
কুসুমো ঘোষলী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ।
অম্বুলী তৈলবাটী চ মূলগ্রামী চ পূষলী।
আকাশঃ পলসায়ী চ কোয়ারী সাহরিস্তথা।
ভট্টঃ সাটশ্চ নায়েরী দায়ী পারী সিয়ারকঃ।
সিদ্ধলঃ পুংসিকো নন্দী কাঞ্জারী সিমলালকঃ।
বালী চেতী চতুস্ত্রিংশদ্বল্লালনৃপপূজিতাঃ।।

১৮ দীর্ঘাঙ্গী পারিঃ কুলভী পোড়ারী রাই কেশরী।
ঘণ্টা ডিণ্ডী পীতমুণ্ডী মহিন্তা গূড় পিপ্পলী।
হড়শ্চ গড়গড়িশ্চৈব ইমে গৌণাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।

১৯ শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দত্ত্বা কুলীনো বংশজো ভবেৎ।

২০ অরয়ঃ কুলনাশকাঃ।
যৎকন্যালাভমাত্রেণ সমূলস্তু বিনশ্যতি।।

কৌলীন্যমর্যাদাব্যবস্থাপনের পর, বল্লালসেনের আদেশানুসারে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঘটক এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ঘটকদিকের এই ব্যবসায় নিরূপিত হইল যে, তাঁহারা কুলীনদিগের স্তুতিবাদ ও বংশাবলি কীর্তন করিবেন এবং তাঁহাদের গুণ, দোষ ও কৌলীন্যমর্যাদাসংক্রান্ত নিয়ম বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।[২১]

কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গৌণকুলীন ব্যতিরিক্ত, আর একপ্রকার ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের নাম বংশজ। এরূপ নির্দিষ্ট আছে, ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেণিবদ্ধ করিবার সময়, বল্লালের মুখ হইতে বংশজশব্দ নির্গত হইয়াছিল এইমাত্র; বাস্তবিক, তিনি কোনও ব্রাহ্মণদিগকে বংশজ বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণিতে সন্নিবেশিত করেন নাই; উত্তর কালে বংশজ ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সকল কুলীনের কন্যা ঘটনাক্রমে শ্রোত্রিয়গৃহে বিবাহিতা হইল, তাঁহারা কুলভ্রষ্ট হইলেন। এই রূপে যাঁহাদের কুলভ্রংশ ঘটিল, তাঁহারা বংশজসংজ্ঞাভাজন ও মর্যাদাবিষয়ে গৌণ কুলীনের সমকক্ষ হইলেন; অর্থাৎ, গৌণ কুলীনের কন্যাগ্রহণ করিলে যেমন কুলক্ষয় হইয়া যায়, বংশজকন্যা গ্রহণ করিলেও কুলীনের সেইরূপ কুলক্ষয় ঘটে। এতদনুসারে, বংশজ ত্রিবিধ,—প্রথম, শ্রোত্রিয় পাত্রে কন্যাদাতা কুলীন বংশজ; দ্বিতীয়, গৌণ কুলীনের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ; তৃতীয়, বংশজের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ। স্থূল কথা এই, কোনও ক্রমে কুলক্ষয় হইলেই, কুলীন বংশজভাবাপন্ন হইয়া থাকেন।[২২]

কৌলীন্যমর্যাদা ব্যবস্থাপিত হইলে, এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরা পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত হইলেন—প্রথম, কুলীন; দ্বিতীয়, শ্রোত্রিয়; তৃতীয়, বংশজ; চতুর্থ, গৌণ; পঞ্চম, পঞ্চগোত্রবহির্ভূত সপ্তশতী সম্প্রদায়।

কালক্রমে, গৌণ কুলীনেরা শ্রোত্রিয়শ্রেণিতে নিবেশিত হইলেন, কিন্তু সর্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না। প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয়, ও গৌণ কুলীনেরা কষ্ট শ্রোত্রিয়, বলিয়া উল্লিখিত হইতে লাগিলেন। গৌণকুলীন-সংজ্ঞাকালে তাঁহারা যেরূপ হেয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন, কষ্টশ্রোত্রিয়সংজ্ঞাকালেও সেইরূপ রহিলেন।

২১ বল্লালবিষয়ে নূনং কুলীনা দেবতাঃ স্বযম্।
শ্রোত্রিয়া মেরবো জ্ঞেয়া ঘটকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ।।
অশং বংশং তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ।
ত এব ঘটকা জ্ঞেয়া ন নামগ্রহণাৎ পরম্।।

২২ বল্লালের মুখ হইতে বংশজ শব্দ নির্গত হইয়াছিল এই মাত্র, তিনি বংশজব্যবস্থা করেন নাই, ঘটকদিগেব এই নির্দেশ সম্যক্ সংলগ্ন বোধ হয় না। ৫৬ গাঁইর মধ্যে, ৩৫ গাঁই শ্রোত্রিয়, ও ১৪ গাঁই গৌণ কুলীন, বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছিলেন; অবশিষ্ট ৮ গাঁইর লোকের মধ্যে কেবল ১৯ জন কুলীন হন। এই ১৯ জন ব্যতিরিক্ত লোকদিগের বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হইতেছে, বল্লাল এই সকল লোকদিগকে বংশজশ্রেণিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ইঁহারাই আদিবংশজ। তৎপরে, আদানপ্রদানদোষে, যে সকল কুলীনের কুলভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাঁহারাও বংশজসংজ্ঞাভাজন হইয়াছেন। ইহাও সম্পূর্ণ সম্ভব বোধ হয়, এই আদিবংশজেরাই বল্লালের নিকট ঘটক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উৎস : বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ

# বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

## কামরূপ—রংপুর

কোনো দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এই দেশ কী ছিল? আর এখন এ দেশ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, কী প্রকারে—কীসের বলে এ অবস্থান্তর প্রাপ্তি, ইহা আগে না বুঝিয়া ইতিহাস লিখিতে বসা অনর্থক কালহরণ মাত্র। আমাদের কথা দূরে থাক, ইংরেজ ইতিহাসবেত্তাদিগের মধ্যে এই ভ্রান্তির বাড়াবাড়ি হইয়াছে। "বাঙ্গালার ইতিহাস" ইহার এক প্রমাণ। বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িতে বসিয়া আমরা পড়িয়া থাকি, পালবংশ সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা ছিলেন, বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিলেন, পাঠানেরা বাঙ্গালায় রাজা হইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকলই ভ্রান্তি; কেন না, সেন, পাল ও বখ্‌তিয়ারের সময় বাঙ্গালা বলিয়া কোনো রাজ্য ছিল না। এখনকার এই বাঙ্গালা দেশের কোনো নামান্তরও ছিল না। সেন ও পাল গৌড়ের রাজা ছিলেন, বখ্‌তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণাবতী জয় করিয়াছিলেন। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী বাঙ্গালার প্রাচীন নাম নহে। বাঙ্গালি বলিয়া কোনো জাতি তথাকার অধিবাসী ছিল না। যাহাকে এখন বাঙ্গালা বলি, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তাহার এক অংশ মাত্র। সে দেশে যাহারা বাস করিত, তাহারা অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আধুনিক বাঙ্গালি হইয়াছে। যেমন গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী একটি রাজ্য ছিল, তেমনি আরও অনেকগুলি পৃথক্‌ রাজ্য ছিল। সেগুলি বাঙ্গালার অংশ ছিল না; কেন না, বাঙ্গালাই তখন ছিল না। সেগুলি কোনো একটি রাজ্যের অংশ ছিল না—সকলই পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্ব স্ব প্রধান। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন অনার্য জাতির বাসভূমি। ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতি। কিন্তু সর্বত্র প্রায় আর্য প্রধান; এই আর্যেরাই এই ভিন্ন দেশগুলি একীভূত করিবার মূল কারণ। যে দেশে যে জাতি থাকুক না কেন, তাহারা আর্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিল, আর্যদিগের ধর্ম গ্রহণ করিল। আগে একধর্ম, একভাষা, তার পর শেষে একচ্ছত্রাধীন হইয়া আধুনিক বাঙ্গালায় পরিণত হইল।

কিন্তু সেই একচ্ছত্রাধীনত্ব সম্প্রতি হইয়াছে মাত্র, ইংরেজের সময়ে। বাঙ্গালির দেশ, মুসলমানেরা কখনই একচ্ছত্রাধীন করিতে পারেন নাই। মোগলেরা অনেক দূর করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও আধুনিক বাঙ্গালার অধীশ্বর হইতে পারেন নাই।

অতএব যে অর্থে গ্রিসের ইতিহাস আছে, রোমের ইতিহাস আছে, সে অর্থে বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। যেমন আধুনিক ফ্লোরেন্সের ইতিহাস লিখিলে বা মিলানের ইতিহাস লিখিলে

বা নেপল্‌সের ইতিহাস লিখিলে আধুনিক ইতালির ইতিহাস লেখা হয় না, বাঙ্গালারও কতক তেমনি। কিন্তু ইতালি বলিয়া দেশ ছিল; বাঙ্গালা বলিয়া দেশ ছিল না। বাঙ্গালার ইতিহাস আরম্ভ মোগলের সময় হইতে।

আমরা বাঙ্গালার ঐতিহাসিক ধ্যান এখন আর পরিস্ফুট না করিয়া, যাহা বলিতেছি বা বলিব, আগে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে উত্তর-পূর্ব বাঙ্গালার কথা বলিব। দেখা যাউক, কবে এ অংশ বাঙ্গালাভুক্ত হইয়াছে, কবেই বা বাঙ্গালার সংস্পর্শে আসিয়াছে।

যেমন এখন যাহাকে বাঙ্গালা বলি, আগে তাহা বাঙ্গালা ছিল না, তেমনি এখন যাহাকে আসাম বলি, তাহা আসাম ছিল না। অতি অল্পকাল হইল, আহম নামে অনার্য জাতি আসিয়া ওই দেশ জয় করিয়া বাস করাতে উহার নাম আসাম হইয়াছিল। সেখানে, যথায় এখন কামরূপ, তথায় অতি প্রাচীন কালে এক আর্যরাজ্য ছিল। তাহাকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বলিত। বোধ হয়, এই রাজ্য পূর্বাঞ্চলের অনার্যভূমিমধ্যে একা আর্য জাতির প্রভা বিস্তার করিত বলিয়া ইহার এই নাম। মহাভারতের যুদ্ধে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, দুর্যোধনের সাহায্যে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার অধিবাসী, তাম্রলিপ্ত, পৌণ্ড্র, মৎস্য প্রভৃতি সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তাহারা অনার্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাঙ্গালা যে সময়ে অনার্যভূমি, সে সময়ে আসাম যে আর্যভূমি হইবে, ইহা এক বিষম সমস্যা। কিন্তু তাহা অঘটনীয় নহে। মুসলমানদিগের সময়ে ইংরেজদিগের এক আড্ডা মান্দ্রাজে, আর আড্ডা পিপ্পলী ও কলিকাতায়, মধ্যবর্তী প্রদেশ সকলের সঙ্গে তাহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই। ইহার ইতিহাস আছে বলিয়া বুঝিতে পারি। তেমনি প্রাগ্‌জ্যোতিষের আর্যদিগের ইতিহাস থাকিলে, তাহাদিগের দূর গমনের কথাও বুঝিতে পারিতাম। বোধ হয়, তাহারা প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার পশ্চিমভাগেই বাস করিয়াছিল। তারপর আর্যেরা দাক্ষিণাত্যজয়ে প্রবৃত্ত হইলে, সেখানকার অনার্য জাতি সকল দূরীকৃত হইয়া, ঠেলিয়া উত্তরপূর্বমুখে আসিয়া বাঙ্গালা দখল করিয়াছিল। তাহাদেরই ঠেলাঠেলিতে অল্পসংখ্যক আর্য ঔপনিবেশিকেরা সরিয়া সরিয়া ক্রমে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

এক সময়ে এই কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্বে করতোয়া ইহার সীমা ছিল; আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্ত্যা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রংপুর, জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল। আইন আকবরিতে লেখে যে, ভগদত্তের বংশের ২৩ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। যাহাই হউক, পৃথুনামা রাজার পূর্বে কোনো রাজার নামের নির্দেশ পাওয়া যায় না। পৃথু রাজার রাজধানী তম্মা নামে নদীতীরে, চাকলা ও বোদা পরগনা বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যস্থলে ছিল, অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। কথিত আছে, কীচক নামে এক ম্লেচ্ছজাতির দ্বারা পৃথু রাজা আক্রান্ত হয়েন। ম্লেচ্ছের স্পর্শের ভয়ে তিনি এক সরোবরের জলে অবগাহন করেন। তথায় নিমজ্জনে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।

তারপর পালবংশীয়েরা রংপুরে রাজা হয়েন। ইতিপূর্বে রংপুর কামরূপ হইতে কিয়ৎকালজন্য পৃথক্ রাজ্য হইয়াছিল। বোধহয়, রংপুরে পালবংশের প্রথম রাজা ধর্মপাল। এই পালেরা ইউরোপের বুর্বোঁ বংশের আর আসিয়ার তৈমুরবংশের ন্যায় নানা দেশে রাজা ছিলেন। গৌড়ে পাল রাজা, মৎস্যে পাল রাজা, রংপুরে পাল রাজা, কামরূপে পাল রাজা ছিল। বোধ হয়, এই রাজবংশ অতিশয় প্রতাপশালী ছিল। ধর্মপালের রাজধানীর

ভগ্নাবশেষ, ডিমলার দক্ষিণে আজিও আছে। তাহার ক্রোশেক দূরে, রানি মীনাবতীর গড় ছিল। রানি মীনাবতী ধর্মপালের ভ্রাতৃজায়া। মীনাবতী অতি তেজস্বিনী ছিলেন—বড়ো দুর্দান্তপ্রতাপ। গোপীচন্দ্র নামে তাঁহার পুত্র ছিল। মীনাবতী ধর্মপালকে বলিলেন, "আমার পুত্র রাজা হইবে, তুমি কে?" ধর্মপাল রাজ্য না দেওয়াতে মীনাবতী সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গোপীচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু গোপীচন্দ্র নামমাত্র রাজা হইলেন, রাজমাতা তাঁহাকে রাজ্য করিতে দিবেন না, স্বয়ং রাজ্য করিবেন ইচ্ছা। পুত্রকে ভুলাইবার জন্য তাঁহার একশত মহিষী করিয়া দিলেন, কিন্তু পুত্র ভুলিল না। তখন মাতা পুত্রকে ধর্মে মতি দিতে লাগিলেন। এইবার পুত্র ভুলিয়া, যোগধর্ম অবলম্বন করিয়া, বনে গমন করিলেন।

গোপীচন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র রাজা হইলেন। পাঠক হবচন্দ্র রাজা, গবচন্দ্র পাত্রের কথা শুনিয়াছেন? এই সেই হবচন্দ্র। নাম হবচন্দ্র নয়—ভবচন্দ্র, আর একটি নাম উদয়চন্দ্র। ভবচন্দ্র গবচন্দ্রের বুদ্ধিবিদ্যার পরিচয় লোকপ্রবাদে এত আছে যে, তাহার পুনরুক্তি না করিলেও হয়। লোকে গল্প করে, গবচন্দ্র, বুদ্ধি বাহির হইয়া যাইবে ভয়ে, ঢিপ্‌লে দিয়া নাক কান বন্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট নন, পাছে বুদ্ধি বাহির হইয়া যায় ভয়ে সিন্ধুকে গিয়া লুকাইয়া থাকিতেন, রাজার কোনো বিপদ্ আপদ্ পড়িলে, সিন্ধুক হইতে বাহির হইয়া, নাক কানের পুঁটলি খুলিয়া বুদ্ধি বাহির করিতেন। একদিন রাজার এইরূপ এক বিপদ্ উপস্থিত, নগরে একটা শূকর দেখা দিয়াছে। শূকর রাজসমীপে আনীত হইলে রাজা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না যে, এ কী জন্তু। বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীকে সিন্ধুক হইতে বাহির করিলেন। মন্ত্রী ঢিপ্‌লে খুলিয়া অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, এটা অবশ্য হস্তী, না খাইয়া রোগা হইয়াছে, নচেৎ ইন্দুর, খাইয়া বড়ো মোটা হইয়াছে। আর একদিন দুই জন পথিক আসিয়া সায়াহ্নে এক পুষ্করিণীতীরে উত্তীর্ণ হইল। রাত্রে পাকশাক করিবার জন্য সরোবরতীরে স্থান পরিষ্কার করিয়া চুলা কাটিতে আরম্ভ করিল। নগরের রক্ষিবর্গ দেখিয়া মনে করিল যে, যখন পুকুর থাকিতেও তার কাছে আবার খানা কাটিতেছে, তখন অবশ্য ইহাদের অসৎ অভিপ্রায় আছে। রক্ষিগণ পথিক দুই জনকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। রাজা স্বয়ং এরূপ গুরুতর সমস্যার কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া, পরম ধীমান্ পাত্র মহাশয়কে সিন্ধুকের ভিতর হইতে বাহির করিলেন। তিনি নাক কানের ঢিপ্‌লে খুলিয়াই দিব্যচক্ষে কাণ্ডখানা দর্পণের মত পরিস্কার দেখিলেন। তিনি আজ্ঞা করিলেন, "নিশ্চিত ইহারা চোর! পুকুরটা চুরি করিবার জন্য পাড়ের উপর সিঁধ কাটিতেছিল। ইহাদিগকে শূলে দেওয়া বিধেয়।" রাজা ভবচন্দ্র, মন্ত্রীর বুদ্ধিপ্রাখর্যে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণেই পুষ্করিণীচোরদ্বয়ের প্রতি শূলে যাইবার বিধি প্রচার করিলেন।

কথা এখনও ফুরায় নাই। পুকুরচোরেরা শূলে যাইবার পূর্বে পরামর্শ করিয়া হঠাৎ পরস্পর ঠেলাঠেলি মারামারি আরম্ভ করিল। রাজা ও রাজমন্ত্রী এই বিচিত্র কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্যাপার কী? তখন একজন চোর নিবেদন করিল যে, "হে মহারাজ! দেখুন, দুই শূলের মধ্যে একটি বড়ো, একটি ছোটো। আমরা জ্যোতিষ জানি। আমরা গণনা করিয়া জানিয়াছি যে, আজি যে ব্যক্তি এই দীর্ঘ শূলে আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, সে পুনর্জন্মে চক্রবর্তী রাজা হইয়া সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে, আর

যে এই ছোটো শূলে মরিবে, সে তাহার মন্ত্রী হইয়া জন্মিবে। মহারাজ! তাই আমি দীর্ঘ শূলে চড়িতে যাইতেছিলাম, এই হতভাগা আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, আপনি বড়ো শূলে মরিয়া সম্রাট্ হইতে চায়।" তখন দ্বিতীয় চোর জোড় হাত করিয়া বলিল "মহারাজ! ও কে যে, ও চক্রবর্তী রাজা হইবে? আমি কেন না হইব? আজ্ঞা হউক, ও ছোটো শূলে চড়ুক, আমি সম্রাট্ হইব, ও আমার মন্ত্রী হইবে।" তখন রাজা ভবচন্দ্র ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিলেন, "কী! এত বড়ো স্পর্ধা! তোরা চোর হইয়া জন্মান্তরে চক্রবর্তী রাজা হইতে চাহিস্! সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্র যদি কেহ থাকে, তবে সে আমি। আমি থাকিতে তোরা!!" এই বলিয়া রাজা ভবচন্দ্র তখন দ্বারীগণকে আজ্ঞা দিলেন যে, এই পাপাত্মাদিগকে তাড়াইয়া বাহির করিয়া দাও। এবং মন্ত্রীবরকে আহ্বানপূর্বক সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্যের লোভে স্বয়ং উচ্চ শূলে আরোহণ করিলেন। মন্ত্রী মহাশয়ও আগামী জন্মে তাদৃশ চক্রবর্তী রাজার মন্ত্রী হইবার লোভে ছোটো শূলে গিয়া চড়িলেন। এইরূপে তাঁহাদের মানবলীলা সমাপ্ত হইল।

এ ইতিহাস নহে—এ সত্যই নহে—এ পিতামহীর উপন্যাস মাত্র। তবে এ ঐতিহাসিক প্রবন্ধে এই অমূলক গালগল্পকে স্থান দিলাম কেন? এই কথাগুলি রাজার ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে। ইহাতে দেখা যায়, সে রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধে এতদূর নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক গল্প বাঙ্গালির মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে। ভবচন্দ্র রাজা ও গবচন্দ্র পাত্রের দ্বারাও বাঙ্গালায় রাজ্য চলিতে পারে, ইহা বাঙ্গালির বিশ্বাস। যে দেশে এই সকল প্রবাদ চলিত, সে দেশের লোকের বিবেচনা এই যে, রাজা-রাজড়া সচরাচর ঘোরতর গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকে, হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। বাস্তবিক এই কথাই সত্য। বাঙ্গালায় চিরকাল সমাজই সমাজকে শাসিত ও রক্ষিত করিয়া আসিয়াছে। রাজারা হয় সেই বাঙ্গালা কবিকুলরত্ন শ্রীহর্ষ দেবের চিত্রিত বৎসরাজের ন্যায় মোমের পুতুল, নয় এই ভবচন্দ্র হবচন্দ্রের ন্যায় বারোইয়ারির সং। আজকালের রাজপুরুষদের কথা বলিতেছি না; তাঁহারা অতিশয় দক্ষ। কথাটা এই যে, আমাদের এ নিরীহ জাতির শাসনকর্তা বটবৃক্ষকে করিলেও হয়।

ভবচন্দ্রের পর কামরূপ রংপুর রাজ্যে আর একজন মাত্র পালবংশীয় রাজা রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পর মেছ গারো কোচ লেপ্চা প্রভৃতি অনার্য জাতিগণ রাজ্যমধ্যে ঘোরতর উপদ্রব করে। কিন্তু তারপর আবার আর্যজাতীয় নূতন রাজবংশ দেখা যায়। তাঁহারা কী প্রকারে রাজা হইলেন, তাহার কিছু কিম্বদন্তি নাই। এই বংশের প্রথম রাজা নীলধ্বজ। নীলধ্বজ কমতাপুর নামে নগরী নির্মাণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ আজিও কুচবেহার রাজ্যে আছে। ইহার পরিধি ৯॥০ ক্রোশ, অতএব নগরী অতি বৃহৎ ছিল সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে সাত ক্রোশ বেড়িয়া নগরীর প্রাচীর ছিল, আর ২॥০ ক্রোশ একটি নদীর দ্বারা রক্ষিত। প্রাচীরের ভিতর প্রাচীর; গড়ের ভিতর গড়—মধ্যে রাজপুরী। সে কালের নগরীসকলের সচরাচর এইরূপ গঠন ছিল। শত্রুশঙ্কাহীন আধুনিক বাঙ্গালি খোলা শহরে বাস করে, বাঙ্গালার সে কালের শহর সকলের গঠন কিছুই অনুভব করিতে পারে না।

এই বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের সময়ে রাজ্য পুনর্বার সুবিস্তৃত হইয়াছিল দেখা যায়। কামরূপ, ঘোড়াঘাট পর্যন্ত রংপুর, আর মৎস্যের কিয়দংশ তাঁহার ছত্রাধীন ছিল। এই সময়ে বাংলার স্বাধীন পাঠান রাজারা দিল্লির বাদশাহের সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত, অতএব অবসর পাইয়া নীলাম্বর তাঁহাদের কিছু কাড়িয়া লইয়াছিলেন বোধ হয়। কমতাপুর

হইতে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত তিনি এক বৃহৎ রাজবর্ত্ম নির্মিত করেন, অদ্যাপি সে বর্ত্ম সেই প্রদেশের প্রধান রাজবর্ত্ম। তিনি বহুতর দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি নিষ্ঠুরস্বভাব ছিলেন, তাহাতেই তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইল। শচীপুত্র নামে তাঁহার এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিল। শচীপুত্রের পুত্র কোনো গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল। নীলাম্বর তাহাকে বধ করিলেন। কিন্তু কেবল বধ করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, তাহার মাংস রাঁধাইয়া শচীপুত্রকে কৌশলে ভোজন করাইলেন। শচীপুত্র জানিতে পারিয়া দেশত্যাগ করিয়া গৌড়ের পাঠান রাজার দরবারে উপস্থিত হইল। শচীপুত্রের দেখানো প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া, পাঠানরাজ (আমি কখনই গৌড়ের পাঠান রাজাদিগকে বাংলার রাজা বলিব না।) নীলাম্বরকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর আর যাই হউন—বাঙ্গালার সেনকুলাঙ্গারের মতো ছিলেন না। খড়কির দ্বার দিয়া পলায়ন না করিয়া সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে মুসলমানকে পরাজিত করিলেন। তখন সেই ক্ষৌরিতমুণ্ড প্রতারক, যে পথে ট্রয় হইতে আজিকালিকার অনেক রাজ্য পর্যন্ত নীত হইয়াছে, চোরের মতো সেই অন্ধকারপথে গেল। হার মানিল; সন্ধি চাহিল। সন্ধি হইল। ক্ষৌরিতমুণ্ড বলিল, "মুসলমানের বিবিরা মহারানিজিকে সেলাম করিতে যাইবে।" মহারাজ তখনই সম্মত হইলেন। কিন্তু যে সকল দোলা বিবিদের লইয়া আসিল, তাহারা রাজপুরমধ্যে পৌঁছিল। তাহার ভিতর হইতে একটিও পাঠানকন্যা বা কোনো জাতীয় কন্যা বাহির হইল না—যাহারা বাহির হইল, তাহারা শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত সশস্ত্র যুবা পাঠান। তাহারা তৎক্ষণাৎ রাজপুরী আক্রমণ করিয়া নীলাম্বরকে এক পিঞ্জরের ভিতর পুরিয়া গৌড়ে পাঠাইল। নীলাম্বর পথে পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয়, অধিকদিন জীবিত ছিলেন না; কেন না, কেহ তাঁহাকে আর দেখে নাই।

এ দেশে রাজা গেলেই রাজ্য যায়। নীলাম্বর গেলেন তো তাঁহার রাজ্য পাঠানের অধীন হইল। ইহার পূর্বে মুসলমান কখনো এ দেশে আইসে নাই। কিন্তু যখন নীলাম্বরের পর আর্যবংশীয় রাজার কথা শুনা যায় না, তখন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, রংপুররাজ্য এই সময় পাঠানের করকবলিত হইল।

এই সময়ে—কিন্তু কোন্ সময়ে সেই আসল কথা! সন তারিখশূন্য যে ইতিহাস—সে পথশূন্য অরণ্যতুল্য—প্রবেশের উপায় নাই—এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে যে, বিখ্যাত পাঠানরাজ হোসেন শাহাই রংপুরের জয়কর্তা। হোসেন শাহা ইং ১৪৯৭ সন হইতে ১৫২১ সন পর্যন্ত রাজ্য করেন। মুসলমানেরা রংপুরের কিয়দংশ মাত্র অধিকৃত করিয়াছিলেন। কামরূপ কোচেরা অধিকৃত করিয়াছিল। তাহারা রংপুরের অবশিষ্ট অংশ অধিকৃত করিয়া কোচবিহার রাজ্য স্থাপন করিল।

# বাঙ্গালির উৎপত্তি

## বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

### প্রথম পরিচ্ছেদ

অনেকে, বাঙ্গালির উৎপত্তি কী?—এই প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইতে পারেন। অনেকের ধারণা আছে যে, বাঙ্গালায় চিরকাল বাঙ্গালি আছে, তাহাদিগের উৎপত্তি আবার খুঁজিয়া কি হইবে? তাহাদিগের অপেক্ষা শিক্ষায় যাঁহারা একটু উন্নত, তাঁহারা বিবেচনা করেন, বাঙ্গালির উৎপত্তি তো জানাই আছে; আমরা প্রাচীন হিন্দুগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। যে জাতি বেদপাঠ করিত, সংস্কৃতভাষায় কথা কহিত, যে জাতি মহাভারত ও রামায়ণ, পুরাণ ও দর্শন, পাণিনির ব্যাকরণ, কালিদাসের কাব্য, মনুর স্মৃতি ও শাক্যসিংহের ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছিল, আমরা সেই জাতির সন্তান; এ কথা তো জানাই আছে। তবে আবার বাঙ্গালির উৎপত্তি খুঁজিয়া কী হইবে?

এ কথা সত্য, কিন্তু বড়ো পরিষ্কার নহে। লোকসংখ্যা গণনায় স্থির হইয়াছে যে, যাহাদিগকে বাঙ্গালি বলা যায়, যাহারা বাঙ্গালাদেশে বাস করে, বাঙ্গালাভাষায় কথা কয়, তাহাদিগের মধ্যে অর্ধেক মুসলমান। ইহারা বাঙ্গালি বটে, কিন্তু ইহারাও কি সেই প্রাচীন বৈদিকধর্মাবলম্বী জাতির সন্ততি? হাড়ি, কাওরা, ডোম ও মুচি; কৈবর্ত, জেলে, কোঁচ, পলি, ইহারাও কি তাঁহাদিগের সন্ততি? তাহা যদি নিশ্চিত না হয়, তবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। কেবল ব্রাহ্মণ কায়স্থে বাঙ্গালা পরিপূর্ণ নহে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাঙ্গালির অতি অল্পভাগ। বাঙ্গালির মধ্যে যাহারা সংখ্যায় প্রবল, তাহাদিগেরই উৎপত্তিতত্ত্ব অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

যে প্রাচীন হিন্দুজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমরা মনে মনে স্পর্ধা করি, তাঁহারা বেদে আপনাদিগকে আর্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখন তো অনেক দিনের পর ইউরোপ হইতে 'আর্য' শব্দ আসিয়া আবার ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা আর্য ছিলেন; অথবা তাঁহাদিগের সন্তান। এজন্য আমরা আর্যবংশ। কিন্তু এই আর্য শব্দ আর বেদের আর্য শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদিক ঋষিরা বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটি আর্যবর্ণ। এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এবং তাঁহাদিগের অনুবর্তী হইয়া ভারতীয় আধুনিকেরাও বলিয়া থাকেন, ইংরেজ, ফরাসি, জর্মান্, রুশ, যবন, পারসিক, রোমক, হিন্দু, সকলই আর্য। আবার ভারতবর্ষের সকল অধিবাসী এ নামের অধিকারী হয় না;

হিন্দুরা আর্য বলিয়া খ্যাত, কিন্তু কোল, ভিল, সাঁওতাল আর্য নহে। তবে আর্য শব্দের অর্থ কী?

এই প্রভেদের কারণ কী? কতকগুলি দেশীয় লোক আর্যবংশীয়, কতকগুলি অনার্যবংশীয়, এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কী? আর্য কাহারা,—কোথা হইতেই বা আসিল? অনার্য কাহারা, কোথা হইতেই বা আসিল? এক দেশে দুইপ্রকার মনুষ্যবংশ কেন? আর্যের দেশে অনার্য আসিয়া বাস করিয়াছে, না অনার্যের দেশে আর্য আসিয়া বাস করিয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসের এই প্রথম কথা।

ইহার মীমাংসাজন্য ভাষাবিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। একজাতীয় ভাষায়, ধাতুর সঙ্গে যোগমাত্রের দ্বারা বাক্যের গঠন হয়; কোনো ধাতুর কোনো প্রকার রূপান্তর হয় না। এ সকল ভাষায় বিভক্তি নাই, ইহাদিগকে "সংযোগের অসাপেক্ষ" (isolating) ভাষা বলা যায়। চৈনিক, শ্যামদেশীয়, আনাম দেশীয় বা ব্রহ্মদেশীয় ভাষা এইরূপ। দ্বিতীয় শ্রেণির ভাষাতেও বিভক্তি নাই, কিন্তু উপসর্গ প্রত্যয়াদি ধাতু দ্বারা রূপান্তর হয়। ইহার ধাতুতে ধাতুতে বা ধাতু ও সর্বনামে একপ্রকার সংযোগ হয়। এই সকল ভাষাকে সংযোগসাপেক্ষ (compounding) ভাষা বলে। দক্ষিণের তামিল প্রভৃতি ভাষা, তাতার ভাষা, আমেরিকার আদিমজাতীয় ভাষা এই জাতীয়। তৃতীয় শ্রেণির ভাষাতেই প্রকৃষ্টরূপে বিভক্তি আছে, সংযোগকালে ধাতুর ও সর্বনামের রূপান্তর ঘটে। ইহাদিগকে বিভক্তিসম্পন্ন ভাষা (inflecting) বলে। পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ ভাষা, সকলই এই শ্রেণির অন্তর্গত।* আরবি, ইহুদি, গ্রিক, লাটিন, ইংরেজি, ফরাসি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, ফারসি প্রভৃতি এই শ্রেণির অন্তর্গত।

দেখা গিয়াছে যে, এই তৃতীয় শ্রেণির ভাষাগুলি ধাতু এবং বিভক্তিচিহ্ন লইয়া গঠিত। ধাতুর পর বিভক্তি ও প্রত্যয়বিশেষের আদেশে শব্দ ও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তাহা ছাড়া ভাষায় আর যাহা আছে, তাহাকে সাধারণত সর্বনাম বলা যাইতে পারে। সর্বনামগুলি যে অবস্থাভ্রষ্ট ধাতু, ইহাও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। কিন্তু তাহা হউক বা না হউক, ধাতু, বিভক্তিচিহ্ন ও সর্বনাম লইয়া ভাষা। যদি কোনো দুইটি ভাষায় দেখা যায় যে, ভাষার মূলীভূত ধাতু, বিভক্তি ও সর্বনাম একই, কেবল দেশকালভেদে কিছু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে অবশ্য অনুমান করিতে হইবে যে, ওই দুইটি ভাষা উভয়েই একটি আদিম ভাষা হইতে উৎপন্ন। ভাষাবিজ্ঞানের অতি বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়া এই, তৃতীয় শ্রেণির ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাতেই ভাষার মূলগত ধাতু, বিভক্তিচিহ্ন ও সর্বনাম এক। অতএব সেই সকল ভাষা যে একটি প্রাচীন মূলগত ভাষা হইতে উৎপন্ন, ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। সেই সকল ভাষাগুলি একপরিবারভুক্ত।

ভারতবর্ষের সংস্কৃত এবং সংস্কৃতমূলক পালি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা; বাঙ্গালা, হিন্দি প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক আধুনিক ভাষা; জেন্দ, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যের অধিবাসীদিগের ভাষা ও আধুনিক পারসি; প্রাচীন গ্রিক্ ও লাটিন; লাটিনসম্ভূত ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয়

* এই শ্রেণিবিভাগ অগস্ত শ্লেচর্ নামক জর্মান লেখককৃত। মক্ষ্মূলর প্রভৃতি ভাষার যেরূপ শ্রেণিভাগ করেন, তাহা আর এক প্রকার। তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণিকে দুইটি স্বতন্ত্র শ্রেণিতে পরিণত করেন—সেমীয় ও আর্য। কিন্তু সেমীয় ও আর্য যখন উভয়েই তৃতীয় শ্রেণির লক্ষণাক্রান্ত, তখন তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণি বলিয়া দাঁড় করানো, কিছু বৈজ্ঞানিক-নীতি-বিরুদ্ধ।

প্রভৃতি, রোমান্স্‌জাতীয় ভাষা, টিউটন্‌বংশীয়দিগের ভাষা, অর্থাৎ জর্মান্‌, ওলন্দাজি, ইংরেজি; ব্রিটেনীয় আদিমবাসীদিগের কেল্‌টিক্ ভাষা, স্কটলন্ডের পার্বত্যদেশের গেলিক্‌, দিনেমারি, সুইডেনি, নরওয়ের ভাষা, রুশ প্রভৃতি স্লাবনিক্ ভাষা,—সকলই সেই এক প্রাচীনা ভাষা হইতে উৎপন্ন,—সকলেই সেই এক বৃদ্ধা মাতার দুহিতা। সেই বহুভাষার জননী প্রাচীনা ভাষা এখন আর নাই—কিন্তু একদিন ছিল। যেমন কোনো গৃহে, কতকগুলি মাতৃহীন ভ্রাতা ও ভগিনীর বাস করিতে দেখিয়া, অনুমান করি যে, ইহাদের একজন জননী ছিল, তেমনি এই একবংশীয়া বহুতর ভাষা দেখিয়া মনে করি যে, এক প্রাচীন মূল ভাষা ছিল। যে জাতি ওই ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা আর্যজাতি বলিয়া অধুনা নামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই ভাষাসমুৎপন্ন ভাষাগুলি আর্যভাষা নামপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল জাতির ভাষা আর্যভাষা, তাহারা আর্যবংশীয় বলিয়া অনুমিত এবং বর্ণিত হইয়া থাকে। যাহারা আর্যবংশসম্ভূত নহে, তাহারা অনার্যজাতি।

এখন কোল, সাঁওতাল, কোঁচ, কাছাড়ি প্রভৃতি জাতিদিগের ভাষা যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, এই সকল ভাষা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্গত—এই সকল ভাষায় বিভক্তি নাই। অতএব এই সকল ভাষা অনার্যভাষা। যে সকল জাতির মাতৃভাষা অনার্যভাষা, সে সকল জাতি অনার্যজাতি। কোল, সাঁওতাল, মেছ, কাছাড়ি অনার্যজাতি। আর্য ও অনার্য এ ভেদের তাৎপর্য এই।

সে কথা এই যে, প্রাচীন আর্যজাতি—যাঁহারা পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ জাতির এবং আমাদিগের পূর্বপুরুষ—তাঁহারা কোথায় বাস করিতেন?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা আর্যভাষা সকলের বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মত এই যে, আর্যেরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহেন—অন্যত্র হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন আসেন, তখন ভারতবর্ষে অনার্য জাতি বাস করিত। আর্যেরা অনার্যদিগকে জয় করিয়া বশীভূত অথবা বন্য এবং পার্বত্যদেশে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। এই স্থলে সেই সকল কথার প্রমাণের সবিস্তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। শ্লেগেল্‌, লাসেন্‌, বেন্‌ফি, মক্ষমূলর, স্পিজেল, রেনা, পিক্ত, মূর প্রভৃতির এই মত। এই মতও এক্ষণে সকল পণ্ডিত কর্তৃক আদৃত। ‡

অতএব আর্যেরা দেশান্তর হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, হিন্দুকুশ পর্বতমালার উত্তরে, আসিয়ার মধ্যভাগে প্রাচীন আর্যভূমি ছিল, সেইখান হইতে তাঁহারা দলে দলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার মূর্‌ বিবেচনা করেন, ওই হিমালয়োত্তরপ্রদেশই ভারতীয় আর্যদিগের মধ্যে উত্তরকুরু খ্যাত ছিল। একদল ইউরোপের এক প্রান্তে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, হেলেনিক্ নামধারণ করিয়া, জগতে অতুল্য সাহিত্য শিল্প দর্শনাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আর একদল ইতালীর নীলাকাশতলে সপ্তগিরিশিখরে নগরী নির্মাণ করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। আর একদল বহুকাল জর্মানির অরণ্যরাজিমধ্যে বিহার করিয়া এখনকার দিনে পৃথিবীর নেতা ও শিক্ষাদাতা হইয়াছেন। আর একদল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অনন্তমহিমাময় কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের শোণিত বাঙ্গালির শরীরে আছে। সে রক্তের তেজে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিসকল শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, বাঙালির শরীরেও সেই রক্ত বহিতেছে।

‡ ডাক্তার মূর সাহেবের *Sanskrit Texts* দ্বিতীয় খণ্ডে ইহার সমালোচনা দেখ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—অনার্য

আর্যেরা উত্তর-পশ্চিম হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রথমে সপ্তসিন্ধুশোভিত পঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। বস্তুত তাঁহাদিগের প্রথম বাস যে সেই সপ্তসিন্ধুবিধৌত পুণ্যভূমি, তাহার প্রমাণ আর্যদিগের বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে আছে। আচার্য রোথ্ বলেন ঋগ্বেদসংহিতায় সিন্ধুনদের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে, কিন্তু গঙ্গার নাম একবার মাত্র গৃহীত হইয়াছে। পঞ্জাবের নদী সকল ও পঞ্জাবের নিকটস্থ গান্ধারাদি দেশই বেদপ্রণেতৃগণের নিকট সুপরিচিত। ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ আছে। †

যদি তাঁহারা উত্তর-পশ্চিম হইতে আসিয়া প্রথমে পঞ্জাবে বাস করিয়া থাকেন, তবে ইহা অবশ্য সিদ্ধ যে, তাঁহারা পঞ্জাবে আসিবার পরে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। প্রথমে ব্রহ্মাবর্ত, তারপর ব্রহ্মর্ষিদেশ, তার পর মধ্যদেশ, সর্বশেষে তাঁহারা সমগ্র আর্যাবর্তব্যাপী হইয়াছিলেন। ‡ বাঙ্গালা, ব্রহ্মাবর্ত বা ব্রহ্মর্ষিদেশ বা মধ্যদেশের মধ্যগত নহে, বাঙ্গালা আর্যাবর্তের শেষভাগ। প্রথম কোন্ সময়ে আর্যেরা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা স্থানান্তরে করিব, অথবা চেষ্টার নিষ্ফলতা প্রতিপন্ন করিব—এক্ষণে আমাদিগের আলোচ্য এই যে, যখন আর্যেরা বাঙ্গালায় আসেন নাই, তখন বাঙ্গালায় কে বাস করিত?

এ প্রশ্নের সচরাচর উত্তর এই যে, আর্যের পূর্বে অনার্যেরা বাঙ্গালায় বাস করিত। এ উত্তর সত্য কি না, তাহার কিছু বিচার আবশ্যক। এক্ষণে বাঙ্গালায় আর্য ও অনার্য উভয়ে বাস করিতেছে। যদি আর্য এখানকার আদিমবাসী না হইল, যদি ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, তাহারা কোনো ঐতিহাসিক কালে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তবে অবশ্য অনার্যেরা তৎপূর্বে এখানে বাস করিত—কেবল এইরূপ বিচার অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু এ বিচার অসম্পূর্ণ। এমন কি হইতে পারে না যে, যখন আর্যেরা প্রথম বাঙ্গালায় আসেন, তখন অনার্যেরা বা কোনো জাতীয় মনুষ্য বাঙ্গালায় বাস করিত না? এমন কি হইতে পারে না যে, আর্যেরা বাঙ্গালাকে শূন্য ভূমি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন, তাহার পর অনার্যেরা আসিয়া বন্য ও পার্বত্য প্রভৃতি প্রদেশ খালি পাইয়া তাহাতে বাস

† Vide Muir's *Sanskrit Texts*, Part II, Chapter II, Sec XI & Chapter III, Sec III.

‡ সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে॥
ত স্মন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥
কুরুক্ষেত্রশ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্তাদনন্তরং॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাসাদ্ অগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ॥
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্ বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ॥
আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব দাসমুদ্রাত্ত পশ্চিমাৎ।
তয়োরনন্তরং গির্যোরার্য্যাবর্তং বির্দুবুধাঃ॥

মনু ২।১৭—২২

করিতে লাগিল? আর্যেরা ঐতিহাসিক কালে বাংলায় আসিয়াছিল বলিয়া অনার্যেরা যে তাহার পরে আসে নাই, এ মত সিদ্ধ হইল না। দেশ থাকিলেই যে লোক থাকিবে, এমত কথা নহে। সত্য বটে, এখনকার দিনে বাঙ্গালার ন্যায় বিস্তৃত ও উর্বর এবং জীবননির্বাহের নানাবিধ সুখকর উপাদানবিশিষ্ট দেশ জনশূন্য থাকে না। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে যখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা এত বাড়ে নাই, যখন জাতিতে জাতিতে বড়ো ঠেলাঠেলি হয় নাই, তখন বাংলাও বসতিহীন থাকা বিচিত্র নহে। অতএব প্রশ্ন মীমাংসার আর কি প্রমাণ আছে, দেখা যাউক।

যদি ভারতীয় অনার্যদিগের এখনকার বাসস্থান ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম বা উত্তরপূর্ব প্রদেশ হইত, তাহা হইলে অবশ্য বলিতাম যে, তাহারা বাহির হইতে আসিয়া ওই সকল স্থান খালি পাইয়া বাস করিয়াছে। বস্তুত ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে, বিশেষ উত্তরপূর্বভাগে কতকগুলি অনার্যজাতির বাস আছে; এবং তাহারাও যে আর্যদিগের আসার পরে আসিয়াছিল, তাহাও ঐতিহাসিক কথা। সে সকল কথা পরে বলিব। অধিকাংশ অনার্যজাতি এরূপ সংস্থানবিশিষ্ট নহে। তাহারা কোথাও মধ্যভারতে, কোথাও দক্ষিণে, যেখানে সেখানে বসতি করিতেছে। তাহাদের চারিপাশে আর্যনিবাস। ভারতে প্রবেশের পথ আর তাহাদিগের বর্তমান বসতিস্থলের মধ্যে আর্যনিবাস। এ অবস্থা দেখিয়া যিনি বলিবেন যে, আর্যের পরে এই অনার্যেরা আসিয়াছিল, তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, অনার্যেরা আর্যদিগকে জয় করিয়া, আর্যনিবাস ভেদ করিয়া, তাহাদের এখনকার বাসে আসিয়াছে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে যে সকল স্থান উত্তম, মনুষ্যবাসের যোগ্য, সেই সকল স্থানে তাহারা বাস করিত। কদর্য স্থান সকলে পরাজিতেরা যাইত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সেরূপ নহে। আনুগঙ্গ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বাসভূমিতেই আর্যনিবাস, কদর্য স্থানেই অনার্যনিবাস। বিন্ধ্যোত্তর ভারতে যে সকল সুখের স্থান, সেখানে তাহাদের বাস নাই। ইচ্ছা করিয়া যে সকল স্থানে বাস করিতে হয়, সে সকল স্থানে তাহাদের বাস নাই। যেখানে ভূমি উর্বরা, পৃথ্বী সমতলা, নদী নৌবাহিনী, এবং ধনধান্য প্রচুর, সেখানে তাহারা নাই। যেখানে ভূমি অনুর্বরা, পর্বতে পথ বন্ধুর, পৃথিবী অরণ্যময়ী, মনুষ্যভাণ্ডার ধনশূন্য, সেই সকল স্থানে তাহাদের বাস। যাহারা বিজয়ী, তাহারা কদর্য স্থান সকল বাছিয়া লইবে—যাহারা বিজিত, তাহাদিগকে ভাল স্থান ছাড়িয়া দিবে, ইহা অঘটনীয়। অতএব আর্যের পর অনার্য আসিয়াছে, এ পক্ষ সমর্থন করা যায় না। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আগে অনার্য ছিল, তার পর আর্য আসিয়াছে।

দেখা যাউক, এই পূর্ববর্তী অনার্য কাহারা। দেশী বিদেশী সকলেই স্বীকার করেন, বেদ প্রাচীন। দেশীয়েরা বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয়ত্ববাদ ছাড়িয়া দিয়া, বিদেশীয়দিগের ন্যায় বলা যাউক যে, বেদের ন্যায় প্রাচীন আর্যরচনা আর কিছুই নাই। প্রতীচ্যদিগের মত বেদের মধ্যে ঋগ্বেদসংহিতাই প্রাচীন। সেই ঋগ্বেদসংহিতায় "বিজানীহি আর্যান্ যে চ দস্যবঃ," "অয়মেতি বিচাকশদ্ বিচিন্বন্ দাস আর্যম্"* ইত্যাদি বাক্যে আর্য হইতে একটি পৃথক্ জাতি পাওয়া যায়। তাহারা দাস বা দস্যু নামে বেদে বর্ণিত। দস্যু শব্দের এখন প্রচলিত অর্থ—ডাকাত, দাসের প্রচলিত অর্থ চাকর। কিন্তু এ অর্থে দস্যু বা দাস শব্দ ঋগ্বেদে ব্যবহৃত নহে। দাসদিগের স্বতন্ত্র নগর, সুতরাং স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।† তাহারা আর্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিত—তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্যেরাও ইন্দ্রাদির পূজা করিতেন। দাস বা দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ—আর্যেরা গৌর। তাহারা "বর্হিষ্মান্"—যজ্ঞ করে না—

আর্যেরা যজমান—যজ্ঞ করে। তাহারা "অব্রত"—আর্যেরা সব্রত—সুতরাং হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, তাহাদের মার, আর্যদের বশীভূত কর। আর্যদের এই কথা। তাহারা "অদেব"—সুতরাং "বয়ং তান্ বনুয়াম সঙ্গমে"—তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাই। তাহারা "অন্যব্রত"—"অমানুষ" —"অযজমান"—তাহারা "মৃধ্রবাচ"—কথা কহিতেও জানে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপ বর্ণনায় নিশ্চিত বুঝা যায় যে, যাহাদিগের কথা হইতেছে, তাহারা আর্য হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী—এবং আর্যদিগের পরমশত্রু। আর্যেরা ভারতবর্ষে প্রথম আসিয়া ইহাদিগের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইহারা অবশ্য অনার্য।

বেদের অনেক পরে মন্বাদি স্মৃতি। মনুতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মনুসংহিতা সঙ্কলনকালে আর্যদিগের চারি পার্শ্বে অনার্যেরা ছিল। মনুতে তাহারা ভ্রষ্টক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত আছে। আচারভ্রংশ হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চৈনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥"

ইহাদিগের মধ্যে যবন পহ্লব আর্য, অবশিষ্ট অনার্য। ইহা ভাষাতত্ত্ব-প্রদত্ত প্রমাণ দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে।

মনু ও মহাভারত হইতে এইরূপ অনেক অনার্যজাতির তালিকা বাহির করা যাইতে পারে। তাহাতে অন্ধ্র, পুলিন্দ, সবর, মূতিব ইত্যাদি অনার্যজাতির নাম পাওয়া যায়। এবং মহাভারতের সভাপর্বে উহারাই দস্যু নামে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"দস্যুনাং সশিরস্ত্রাণৈঃ শিরোভির্লূনমূর্দ্ধজৈঃ।
দীর্ঘকূর্চৈর্মহী কীর্ণা বিবর্হৈরণ্ডজৈরিব॥"

ইহারা যে পরিশেষে আর্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চিত। পরাজিত হইয়াই উহারা, যে যেখানে বন্য ও পার্বত্য প্রদেশ পাইয়াছিল, সে সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সেই সকল প্রদেশ দুর্ভেদ্য,—আর্যেরাও সে সকল কুদেশ অধিকারে তাদৃশ ইচ্ছুক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং সেখানে আত্মরক্ষা সাধ্য হইল। কোনো কোনো স্থান—যথা দ্রাবিড়, আর্যের অধিকৃত হইলেও অনার্যেরা তথায় বাস করিতে লাগিল, আর্যেরা কেবল প্রভু হইয়া রহিলেন।* আর্যাবর্তের সাধারণ লোক আর্য—দাক্ষিণাত্যে সাধারণ লোক অনার্য। আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য তুল্যরূপে আর্যাধিকৃত দেশ, তবে আর্যাবর্তের ও দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন অবস্থা কেন ঘটিল, এ প্রস্তাবে সে কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়। † ভারতবর্ষে আর্য ও অনার্যের সামঞ্জস্য একরকমে ঘটে নাই। আমরা তিন প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই।

প্রথম। ভারতবর্ষে কোনো কোনো অংশ আর্যজিত নহে—অনার্যেরা সেখানে প্রধান; কতকগুলি আর্যও সেখানে বাস করে, কিন্তু তাহারা অপ্রধান। ইহার উদাহরণ সিংভূম।

* ঋচ ১।৫১।৮—৯। মুরধৃত। মক্ষমূলরধৃত *Sanskrit Texts*, Part II, Chap. III, Sect. I.
† ঋচ। ১০।৮৬।১৯। মুরধৃত। Ib.

দ্বিতীয়। অবশিষ্ট আর্যজিত প্রদেশের মধ্যে কোনো কোনো প্রদেশ এরূপ আর্যীভূত যে, সে দেশে আর্যবংশ কেবল প্রাধান্যবিশিষ্ট, এমত নহে—লোকের মাতৃভাষাও আর্যভাষা। উত্তরপশ্চিম, মধ্যদেশ ইহার উদাহরণ।

তৃতীয়। কোনো কোনো আর্যজিত দেশ এরূপ অল্প পরিমাণে আর্যীভূত যে, সে সকল স্থানে লোকের মাতৃভাষা আজিও অনার্য। দ্রাবিড় কর্ণাট প্রভৃতিতে আর্যধর্মের বিশেষ গৌরব ও সংস্কৃতের বিশেষ চর্চা থাকিলেও, সে সকল দেশ এই শ্রেণির অন্তর্গত।

বাংলা দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্গত কিন্তু তাহা হইলেও বাংলার মধ্যে বিস্তর অনার্য। অন্য কোনো আর্যদেশে অনার্যশোণিতের এত প্রবল স্রোত বহে না। সেই কথা এক্ষণে আমরা স্পষ্টীকৃত করিব।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ—অনার্যের দুই বংশ, দ্রাবিড়ি ও কোল

আমরা বুঝাইয়াছি যে, ভারতবর্ষে আগে অনার্যের বাস ছিল—তার পর আর্যেরা আসিয়া তাহাদিগকে জয় করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। অনার্যেরা বন্য ও পার্বত্য প্রদেশে গিয়া বাস করিতেছে। ভারতবর্ষে অন্যত্র যাহা ঘটিয়াছে—বাঙ্গালাতেও তাই, ইহা সহজে অনুমেয়। কিন্তু বাঙ্গালার সঙ্গে মধ্যদেশাদির একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। মধ্যদেশাদির ন্যায় বাঙ্গালার অনার্যগণ সকলেই বিজয়ী আর্যদিগের ভয়ে পলায়ন করে নাই। কেহ কেহ পলাইয়াছে—কেহ কেহ ঘরেই আছে।

জয় দ্বিবিধ, কখন কখন কোনো প্রবল জাতি জাত্যন্তরকে বিজিত করিয়া তাহাদিগের দেশ অধিকৃত করিয়া আদিমবাসীদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করে। আদিমবাসীরা সকলে হয় জেতৃগণের হস্তে প্রাণ হারায়, নয় দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে পলাইয়া বাস করে। টিউটন্‌গণকর্তৃক ব্রিটেন্ জয়ের ফল এইরূপ হইয়াছিল। সাক্সনেরা ব্রিটন্ জয় করিয়া পূর্বাধিবাসীদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়াছিলেন। কেবল যাহারা ওয়েল্‌স্, কর্নওয়াল বা ব্রিটানী প্রদেশে গিয়া পলাইয়া বাস করিয়া রহিল, তাহারাই রক্ষা পাইল। ইংলণ্ডে আর ব্রিটন্ রহিল না। ইংলণ্ড কেবল টিউটনের দেশ হইল। দ্বিতীয় প্রকারে দেশজয়ে পূর্বাধিবাসীরা বিনষ্ট বা তাড়িত হয় না। বিজয়ীদিগের সঙ্গে মিশিয়া যায়। নর্মান্‌গণকর্তৃক ইংলন্ড জয় ইহার উদাহরণ। আর্যগণ বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা টিউটন্‌দিগের মতো অনার্যদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস বা বিদূরিত করিয়াছিলেন বা নর্মান্‌বিজিত সাক্সনের মতো অনার্যেরা বঙ্গজেতা আর্যদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল, তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। যদি দেখি যে, বাঙ্গালার বর্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে অনার্যবংশ এখনও আছে, তবে বুঝিতে হইবে যে, অনার্যেরা আর্যদিগের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

* "Though by this superior civilization and energy they placed themselves at the head of the Dravidian communities, they must have been so inferior in numbers to the Dravidian inhabitants as to render it impracticable to dislodge the primitive speech of the country, and to replace it by their own language. They would therefore be compelled to acquire the Dravidian dialects" Muir's *Sanskrit Texts*, Part II.

† মুরের দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদে ধৃত মন্ত্রসকল দেখ—ইহার ভূরি ভূমি প্রমাণ পাইবে। এখানে সে সকল উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

প্রথমে দেখা যাউক, বাঙ্গালার কোথায় কোন্ কোন্ অনার্যজাতি আছে। সে গণনার পূর্বে প্রথমে বুঝিতে হইবে, বাঙ্গালা কাহাকে বলিতেছি। কেন না, বাঙ্গালা নাম অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক অর্থে পেশোয়ার পর্যন্ত বাঙ্গালার অন্তর্গত—যথা, "বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি" "বেঙ্গল আর্মি"। আর এক অর্থে বাঙ্গালা তত দূর বিস্তৃত না হউক, মগধ, মিথিলা, উড়িষ্যা, পালামৌ উহার অন্তর্গত—এই সকল প্রদেশ বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেন্ট্ গভর্নরের অধীন। এই দুই অর্থের কোনো অর্থেই "বাঙ্গালা" শব্দ এ প্রবন্ধে ব্যবহার করিতেছি না। যে দেশের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালি; আমরা সেই বাঙ্গালির উৎপত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত। তাহার বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের ইতিহাস লিখিব না—সাঁওতাল বা নাগা এ প্রবন্ধের কেহ নহে। তবে এখানে বাঙ্গালার বাহিরে দৃষ্টিপাত না করিলে, আমরা কৃতকার্য হইতে পারিব না। যে সকল অনার্যজাতি বাঙ্গালার আর্য কর্তৃক দূরীভূত হইয়াছে, তাহারা অবশ্য বাঙ্গালার বাহিরে আছে। বাঙ্গালার ভিতরে ও বাঙ্গালার পার্শ্বে কোন্ কোন্ অনার্যজাতি বাস করিতেছে—দুইই দেখিতে হইবে।

উত্তরসীমায় ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই, খামটি, সিংফো, মিশ্‌মি, চুলকাটা মিশ্‌মি। তারপর অপর জাতি, তাহাও অনেক প্রকার। যথা—পাদম্ মিরি দফ্‌লা ইত্যাদি। তারপর আসামপ্রদেশের নাগা, কুকি, মণিপুরী; কৌপয়ী, তাহার বাহিরে মিকির, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া ও গারো জাতি। আসামের মধ্যে ব্রহ্মপুত্রতীরে দেখিতে পাই, কাছারি বা বোড়ো, মেচ্ ও ধিমালজাতি এবং বাঙ্গালার মধ্যে তাহাদিগের নিকটকুটুম্ব কোচজাতি। তৎপরে উত্তরে, হিমালয়পর্বতের ভিতরে বাস করে, ভোট, লেপ্‌ছা, লিম্বু, কিরান্তি বা কিরাতি (প্রাচীন কিরাত)। তার পর বাংলার পূর্ব-দক্ষিণ সীমায় মগ, লুসাই, কুকি, কারেন্, তালাইন্ প্রভৃতি জাতি। ত্রিপুরার ভিতরেই রাজবংশী নওয়াতিয়া প্রভৃতি জাতি আছে; বাঙ্গালার পশ্চিম দিকে কোল, সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কোঁড়োয়া ওঁরাঁও বা ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনার্যজাতি বাস করে। এই শেষোক্ত কয়েকটি জাতির সম্বন্ধেই আমাদের অনেকগুলি কথা বলিতে হইবে। উত্তর ও পূর্বের অনার্যদিগের সঙ্গে আমাদিগের ততটা সম্বন্ধ নাই, তাহারা অনেকেই হালের আমদানি।

আমরা কেবল কয়েকটি প্রধান জাতির নাম করিলাম—জাতির ভিতর উপজাতি আছে এবং অন্যান্য জাতি আছে। প্রসঙ্গক্রমে তাহাদের কথাও বলিতে হইবে।

এখন প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহারা সকলে কি একবংশসম্ভূত? আর্যেরা সকলেই একবংশসম্ভূত—আর্য শব্দের অর্থই তাই। কিন্তু "অনার্য" বলিলে কেবল ইহাই বুঝায় যে, ইহারা আর্য নহে। যাহারা আর্য নহে, তাহারা সকলেই যে একজাতীয়, এমত বুঝায় না। যদি এমত প্রমাণ থাকে যে, ইহারা একবংশোদ্ভূত, তবে সহজে অনুমান করিতে পারা যায় যে, ইহারা সকলেই বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী—আর্যগণকর্তৃক তাড়িত হইয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া নানাদেশে নানা নাম ধারণ করিয়াছে; কিন্তু যদি সে প্রমাণ না থাকে—বরং তদ্বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকে যে, তাহারা নানাবংশীয়, তবে আবার বিচার করিতে হইবে, এইগুলির মধ্যে কাহারা কাহারা বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী।

প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবে ভাষাবিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়া এ সকল বিষয়ে গুরুতর প্রমাণ। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে যে তিন শ্রেণিতে ভাষার কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে তৃতীয় শ্রেণির ভাষার অন্তর্গত আর্যভাষা ও সেমীয়ভাষা (আরবি, হিব্রু প্রভৃতি)। প্রথম শ্রেণির

ভাষাগুলি—যাহা সংযোগনিরপেক্ষ অথবা বিভক্তিবিশিষ্ট নহে—সেই সকল ভাষাকে ইউরোপীয়েরা ভারতচৈনিক বলিয়া থাকেন। নামটি আমাদিগের ব্যবহারের অযোগ্য—আমরা ওই ভাষাগুলি চৈনিকীয় ভাষা বলিব। দ্বিতীয় শ্রেণির ভাষার সাধারণ নাম তুরানি। বাঙ্গালার মধ্য বা প্রান্তস্থিত অনার্যজাতিসকলের ভাষা এই দ্বিবিধ—কতকগুলির জাতির ভাষা চৈনিকীয—ইহাদিগের বাস প্রায় আসামে বা বাঙ্গালার পূর্বসীমায়। তাহারা অনেকেই আর্যদিগের পরে আসিয়াছে, এমত ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তার পর অবশিষ্ট যে সকল অনার্যজাতি—তাহাদিগের সকলেরই ভাষা তুরানিশ্রেণিস্থ।

কিন্তু সেই সকল অনার্যভাষার মধ্যেও জাতিগত পার্থক্য দেখা যায়। পূর্বেই কথিত হইয়াছে, দ্রাবিড়ভাষা তুরানিশ্রেণিস্থ। বাংলার অনার্যভাষার মধ্যে কতকগুলি জাতির ভাষার শব্দ সমাস ও ব্যাকরণ সমালোচন করিয়া পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, ওই সকল ভাষা দ্রাবিড়ি ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট। আর কতকগুলি অনার্যভাষাতে দ্রাবিড়ি ভাষার সঙ্গে কোনো প্রকার সাদৃশ্য নাই। ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, বাঙ্গালার কতকগুলি অনার্যজাতি দ্রাবিড়িদিগের জ্ঞাতি—কতকগুলি তাহাদিগের হইতে ভিন্ন জাতি।

যাহারা অ-দ্রাবিড়ি, তাহাদিগের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য আছে। কোল বা হো, সাঁওতাল, মুণ্ড প্রভৃতি এখন ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতি বটে, কিন্তু যেমন সকল আর্যভাষাই পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য ও সম্বন্ধবিশিষ্ট, কোল, মুণ্ড, সাঁওতাল প্রভৃতির ভাষাও সেইরূপ সাদৃশ্য ও সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতএব ইহারা সকলেই একজাতীয় বলিয়া বোধ হয়।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ—আর্যীকরণ

(১) সাঁওতাল, (২) হো, (৩) ভূমিজ, (৪) মুণ্ড, (৫) বীরহোড়্, (৬) কড়ুয়া, (৭) কুর্ বা কুর্বু বা মুযার্সি, (৮) খাড়িয়া, (৯) জুয়াং, এই কয়টি কোলবংশীয় বাঙ্গালার লেঃ গভর্নরের শাসন অধীনে পাওয়া যায়।

জুয়াঙ্গোরা উড়িষ্যার ঢেঁকানাল ও কেঁওঝড় প্রদেশে বাস করে। কুর্ বা মুয়ার্সির সঙ্গে এ ইতিহাসের কোনো সম্বন্ধ নাই। খাড়িয়ারা সিংহভূমের অতিশয় বনাকীর্ণ প্রদেশে বাস করে; মানভূমের পাহাড়েও তাহাদের পাওয়া যায়। বীর বীরহোড়েরা হাজারিবাগের জঙ্গলে থাকে। কড়ুয়ারা সরগুজা, যশপুর ও পালামৌ অঞ্চলে থাকে। উহাদিগের সঙ্গে মিশ্রিত "অসুর" নামে আর একটি কোলবংশীয় জাতি পাওয়া যায়। কুর্কু জাতি আরও পশ্চিমে।

সাঁওতালেরা গঙ্গাতীর হইতে উড়িষ্যায় বৈতরণীতীর পর্যন্ত ৩৫০ মাইল ব্যাপ্ত করিয়া বাস করে—কোথাও কম, কোথাও বেশি। যে প্রদেশ এখন "সাঁওতাল পরগনা" বলিয়া খ্যাত, তাহা ভিন্ন ভাগলপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাজারিবাগ, মানভূম, মেদিনীপুর, সিংভূম, বালেশ্বর, এই কয় জেলায় ও ময়ূরভঞ্জে সাঁওতালদিগের বাস আছে।

হো, ভূমিজ এবং মুন্ডের সাধারণ নাম কোল। হো জাতিকে লড়্কা বা লড়াইয়া কোল বলে। ভূমিজেরা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রভৃতি প্রদেশে বাস করে। মুণ্ড বা মুণ্ডারিরা চুটিয়া নাগপুর অঞ্চলে বাস করে।

হরিবংশে আছে যে, যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র তুর্বসুর বংশে কোল নামে রাজা ছিলেন। উত্তরভারতে তাঁহার রাজ্য ছিল; তাঁহারই বংশে কোলদিগের উৎপত্তি।† মনুতে "কোলি সর্প" দিগের পুনঃপুন প্রসঙ্গ দেখা যায়। ভারতবর্ষে কোলেরা এককালে প্রধান ছিল, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। হন্টর্ সাহেব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতবর্ষে সর্বত্রই হো নামক কোনো আদিম জাতির বাসের চিহ্ন পাওয়া যায়।‡ তিনি যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশে অধিক শ্রদ্ধা করা যায় না; কিন্তু হো বা কোলজাতি যে একদিন বহুদূর বিস্তৃত দেশের অধিবাসী ছিল, তাহাও সম্ভব বোধ হয়। হো শব্দেই কোলি ভাষায় মনুষ্য বুঝায়। এক সময়ে ইহারা স্বজাতি ভিন্ন অন্য কোনো জাতির অস্তিত্ব জ্ঞাত ছিল না।

কর্নেল্ ডাল্টন্ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোলেরাই পূর্বে মগধাদি অনুগঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী ছিল—যাহা এখন বাঙ্গালা ও বিহার, সে প্রদেশে তখন কোলভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা প্রচলিত ছিল না। মগধ প্রদেশে, বিশেষত শাহাবাদ জেলায় অনেক ভগ্নমন্দির অট্টালিকা আছে। প্রবাদ আছে যে, সে সকল চেরো এবং কোলজাতীয়দিগের নির্মিত। কিংবদন্তি এইরূপ যে, ওই প্রদেশে সাধারণ লোক কোল ছিল, রাজারা চেরো ছিল।

কথিত আছে যে, কোলেরা শবর নামক দ্রাবিড়ি অনার্যজাতি কর্তৃক মগধ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। শবরেরা মনু ও মহাভারতে অনার্যজাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শবর অদ্যাপি উড়িষ্যার নিকটবর্তী প্রদেশে বর্তমান আছে।

দ্রাবিড়ীয়গণ বাঙ্গালার উপান্তভাগ সকলে কোলবংশীয়দিগের অপেক্ষা বিরল। হাজারিবাগের ওঁরাও (ধাঙ্গড়) ও রাজমহলের পাহাড়িরা ভিন্ন আর কেহ নিকটে নাই। গোন্দেরা দ্রাবিড়ি বটে, কিন্তু তাহারা আমাদিগের নিকটবাসী নহে। কিন্তু বাঙ্গালার ভিতরেই এমন অনেক জাতি বাস করে যে, তাহারা দ্রাবিড়বংশীয় হইলে হইতে পারে। কর্নেল্ ডাল্টন্ বলেন যে, কোচেরা অনুগঙ্গবিজয়ী দ্রাবিড়িগণ হইতে উৎপন্ন। বহুতর কোচ বাঙ্গালার ভিতরেই বাস করিতেছে। দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহি, রঙ্গপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় কোচদিগকে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ভিতর প্রায় এক লক্ষ কোচের বাস আছে। এই লক্ষ লোককে বাঙ্গালি বলা যাইবে কি না?* কেহ কেহ বলেন, ইহাদিগকেও বাঙ্গালির সামিল ধরিতে হইবে। আমরা সে বিষয়ে সন্দিহান। কোচেরা বাঙ্গালি হউক বা না হউক, বাঙ্গালার ভিতরে অনার্য আছে কি না, এ কথার আমাদিগের একবার আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

কে আর্য, কে অনার্য? ইহা নিরূপণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বই প্রধান উপায়, ইহা দেখানো গিয়াছে। যাহার ভাষা আর্যজাতীয় ভাষা, সেই আর্যবংশীয়। যাহার ভাষা অনার্যভাষা, সেই অনার্যজাতীয়, ইহা স্থির করা গিয়াছে। পরে দেখান গিয়াছে যে, যে অনার্যের ভাষা দ্রাবিড়জাতীয় ভাষা, সেই দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য; যাহার ভাষা কোলজাতীয়ভাষা, সেই কোলবংশীয়

† *Asiatic Researches*, Vol. IX, P. 91 & 92.

‡ *Non-Aryan Dictionary*. Linguistic Dissertation P. 25 & c.

* "The proud Brahman who traces his lineage back to the palmy days of Kanauj and the half civilized Koch or Palya of Dinagepore may both be fitly spoken as Bengali." *Bengal Census Report, 1871*.

অনার্য। কিন্তু এমন কি হইতে পারে না যে, ভাষা একজাতীয়, বংশ অন্যজাতীয় একাধারে সমাবিষ্ট হইয়াছে? এমন কি হইতে পারে না যে, পরাজিত জাতি জেতৃগণের ধর্ম, জেতৃগণের ভাষা গ্রহণ করিয়া জেতৃদিগের জাতিভুক্ত হইয়াছে?

এমন উদাহরণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। ফ্রান্সের বর্তমান ভাষা লাটিন-মূলক, কিন্তু ফরাসি জাতির অস্থিমজ্জা কেল্‌টীয় শোণিতে নির্মিত। প্রাচীন গলেরা রোমকগণ কর্তৃক পরাজিত ও রোমকরাজ্যভুক্ত হইলে পর রোমীয় সভ্যতা গ্রহণ করে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রোমীয় ভাষা অর্থাৎ লাটিনভাষা গ্রহণ করে। যখন পশ্চিম রোমকসাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন গল্‌দিগের মধ্যে লাটিনভাষাই প্রচলিত ছিল, পরে তাহারই অপভ্রংশে বর্তমান ফরাসি ভাষা দাঁড়াইয়াছে। আইবিরিয়াতেও (স্পেন ও পর্টুগল্) ওইরূপ ঘটিয়াছিল। আমেরিকার কাফ্‌রি দাসদিগের বংশ প্রভুদিগের ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, জাতীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি বা ফরাসি ব্যবহার করিয়া থাকে।* অতএব ভাষা আর্যভাষা হইলেই আর্যবংশীয় বলা যাইতে পারে না—অন্য প্রমাণ আবশ্যক।

সকলেই জানে যে, আর্যেরা ককেশীয়বংশীয়। ককেশীয় বংশের মধ্যে আর্য ভিন্ন অন্য বংশও আছে, কিন্তু ককেশীয় বংশের অন্তর্গত নহে, এমন আর্যজাতি নাই। ককেশীয়দিগের লক্ষণ—গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শরীর, মস্তক সুগঠন, হনূদ্বয় অত্যুন্নত। মোঙ্গল বংশ ককেশীয়দিগের হইতে পৃথক। মোঙ্গলীয়েরা খর্বাকার, মস্তকের গঠন চতুষ্কোণ, হনূদ্বয় অত্যুন্নত। যদি কোনো জাতিকে এমন পাওয়া যায় যে, তাহাদিগের শারীরিক গঠন মোঙ্গলীয়, তবে সে জাতিকে কখনো আর্য বলা যাইবে না। যদি দেখিতে পাই, সে জাতীয়ের ভাষা আর্যভাষা, তাহা হইলে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে, তাহারা আদৌ অনার্যজাতি, অনার্যদিগের সহিত কোনো প্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আর্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। আবার যদি দেখি যে, সেই অনার্য জাতি কেবল আর্যভাষা নহে, আর্যধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করিয়া আর্যসমাজভুক্ত হইয়াছে—তখন বুঝিতে হইবে যে, এক জাতি অপর জাতিকে বিজিত করিয়া একত্র বাস করায় একের সঙ্গে অন্য মিশিয়া গিয়াছে। যদি আবার দেখি যে, এই বিমিশ্র জাতিদ্বয়ের মধ্যে আর্য উন্নত—অনার্য অবনত, তবে বিবেচনা করিতে হইবে যে, আর্যেরা জয়কারী, অনার্যেরাই বিজিত হইয়া আর্যসমাজের নিম্নস্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

ইহাতে এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম অহিন্দুর পক্ষে গ্রহণীয় নহে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে খ্রিস্টীয়, কি ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া খ্রিস্টিয়ান বা মুসলমান হইতে

* ভারতবর্ষেও এই আর্য অনার্য জাতিদিগের মধ্যে আজিকার দিনেই আমাদিগের প্রত্যক্ষ গোচরে এইরূপ ভাষাপরিবর্তন ঘটিতেছে। এখনও অনেকস্থানে অনার্যেরা দিনে দিনে আপন মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্যভাষা গ্রহণ করিতেছে। কর্নেল্ ডাল্‌টন্ বলেন যে, তিনি ১৮৬৮ সালে কোড়বা জাতীয়গণের ভাষা সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে কোড়বাদিগের বাসভূমি যশপুর বাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার তলবমতে বহুসংখ্যক অসভ্য কোড়বা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই কোড়বা ভাষার এক বর্ণও বলিতে পারিল না। তাহারা বলিল, তাহারা ডিহি কোড়বা—অর্থাৎ পার্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্বক সমতল প্রদেশে বাস করিয়া চাষ আবাদ করিতেছে। দেশ ও সমাজ পরিত্যাগের সঙ্গে ভাষাও ত্যাগ করিয়াছে। উদাহরণের স্বরূপ কর্নেল্ ডাল্‌টন্ আরও বলেন যে, চুটিয়া নাগপুর প্রদেশে ও রাওদিগের যে সকল গ্রাম আছে, তাহার মধ্যে অনেক অনেক গ্রামের ওঁরাওয়েরা জাতীয় ভাষা বলিতে পারে না, হিন্দু বা মুণ্ডদিগের ভাষায় কথা কহে। *Ethnology of Bengal*, P. 115.

পারেন। কিন্তু যে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই—সে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিতে পারে না। অতএব যে অনার্য আদৌ হিন্দুকুলজাত নহে, সে কখনও হিন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিয়াছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না।

এই আপত্তি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বলবৎ বটে। কিন্তু এক একটি বৃহৎ জাতির পক্ষে ইহা খাটিতে পারে না। বিশেষত বন্য অনার্য জাতিদিগের পক্ষে খাটিতে পারে না। মুসলমান বা খ্রিস্টিয়ান কখনও হিন্দু হইতে পারে না; কেন না, যে সকল আচার হিন্দুত্ব ধ্বংসকারক, তাহারা পুরুষানুক্রমে সেই সকল আচার করিয়া পুরুষানুক্রমে পতিত। কিন্তু এ প্রদেশের বন্য অনার্য জাতিদিগের মধ্যে হিন্দুত্ববিনাশক এমন কোনো আচার ব্যবহার নাই যে, তাহা হিন্দুদিগের অতি নিকৃষ্ট জাতিদিগের মধ্যে—হাড়ি ডোম মুচি কাওরা প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যায় না। মনে কর, যেখানে হিন্দু প্রবল, এমন কোনো প্রদেশের সন্নিকটে অথবা হিন্দুদিগের অধীনে কোনো অসভ্য অনার্য জাতি বাস করে। এমন স্থলে ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে, আর্যেরা সমাজের বড়ো, অনার্যেরা সমাজের ছোটো থাকিবে। মনুষ্যের স্বভাব এই যে, যে বড়ো, ছোটো তাহার অনুকরণ করে। কাজে কাজেই এমতস্থলে অনার্যেরা হিন্দুদিগের সর্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইবে। আমরা এখন ইংরেজদিগের অনুকরণ করিতেছি, পূর্বে মুসলমানদিগের অনুকরণ করিতাম। আমাদিগের একটি প্রাচীন ধর্ম আছে, চারি হাজার বৎসর হইতে সেই ধর্ম নানাবিধ কাব্য দর্শন ও উচ্চ নৈতিক তত্ত্বের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া লোকমনোমোহন হইয়াছে, তাহার কাছে নিরাভরণ ইস্লাম বা খ্রিস্টীয় ধর্ম অনুরাগভাজন হয় না। এইজন্য আমরা এখন সর্বথা ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়াও, ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের ততটা অনুগমন করি না। কতকটা না করিতেছি, এমনও নহে। কিন্তু অনার্যদিগের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল বা শোভাবিশিষ্ট কোনো জাতীয় ধর্ম নাই। অনেক স্থলে একেবারে কোনো প্রকার জাতীয় ধর্ম নাই। এমত অবস্থায় অধীন অনার্যসমাজ প্রভু আর্যদিগের অন্য বিষয়ে যেমন অনুকরণ করিবে, ধর্মসম্বন্ধেও সেইরূপ অনুকরণ করিবে। হিন্দুরা যে সকল উৎসব করে, তাহারাও সেই সকল উৎসব করিতে আরম্ভ করিবে। জীবননির্বাহের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম সকলে হিন্দুদিগের ন্যায় আচার ব্যবহার করিতে থাকিবে। সমগ্র জাতি এইরূপ ব্যবহার করিতে থাকিলে কালক্রমে তাহারাও হিন্দু নাম ধারণ করিবে। অন্য হিন্দু কেহ কখনও তাহাদিগের অন্ন খাইবে না। তাহাদিগের সহিত কন্যা আদান প্রদান করিবে না, অথবা অন্য কোনো প্রকারে তাহাদিগের সহিত মিশিবে না—হয় তো তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল পর্যন্তও গ্রহণ করিবে না। অতএব তাহারাও একটি পৃথক্ হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইবে। তাহারা আগে যেমন পৃথক্ জাতি ছিল, এখনও তেমনি পৃথক্ জাতি রহিল, কেবল হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া খ্যাত হইল। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে একটি বিবাদের কথা আছে। কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দু ধর্ম "proselytizing" নহে অর্থাৎ যে জন্মাবধি হিন্দু নয়, হিন্দুরা তাহাকে হিন্দু করে না। আর এক সম্প্রদায় বলেন যে, হিন্দু ধর্ম proselytizing, অর্থাৎ অহিন্দুও হিন্দু হয়। এ বিবাদের স্থূলমর্ম উপরে বুঝান গেল। খ্রিস্টান বা মুসলমানদিগের proselytism এইরূপ যে, তাহারা অন্যকে ডাকে "তুমি খ্রিস্টান হও, তুমি মুসলমান হও।" আহূত ব্যক্তি খ্রিস্টান বা মুসলমান হইলে তাহার সঙ্গে আহার

ব্যবহার, কন্যা আদান প্রদান প্রভৃতি সামাজিক কার্য সকলেই করিয়া থাকে বা করিতে পারে। হিন্দুদিগের proselytization সেরূপ নহে। হিন্দুরা কাহাকেও ডাকে না যে, "তুমি স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া আসিয়া হিন্দু হও।" যদি কেহ স্বেচ্ছাক্রমে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে, তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার বা কোনো প্রকার সামাজিক কার্য করে না, কিন্তু যে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বংশে হিন্দুধর্ম বজায় থাকিলে, তাহার হিন্দুনামও লোপ করিতে পারে না। একটা সম্পূর্ণ জাতি এইরূপে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়া পুরুষানুক্রমে হিন্দুধর্ম পালন করিলে, সকলেই তাহাকে হিন্দুজাতি বলিয়া স্বীকার করে। হিন্দুদিগের proselytism এই প্রকার। ওই শব্দ মুসলমান বা খ্রিস্টান সম্বন্ধে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, হিন্দুদিগের সম্বন্ধে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে হিন্দুদিগের মধ্যে proselytism নাই এবং তদর্থবাচক ভারতীয় কোনো আর্যভাষায় কোনো শব্দ নাই।

যে অর্থে অহিন্দু হিন্দু হইতে পারে বলা গিয়াছে, সে অর্থে এখনও অনেক অনার্য জাতি হিন্দু হইতেছে।

অনার্যজাতি যে আপনাদিগের অনার্যভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্যভাষা ও আর্যধর্ম গ্রহণপূর্বক হিন্দু হইয়াছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

প্রথম। হাজারিবাগ প্রদেশে বিদ্যা নামে একটি জাতি বাস করে। বেদিয়া হইতে তাহারা পৃথক। বিদ্যামাহাত্ম্য নাম তাহারা কখনও কখনও ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দি ভাষা কয় এবং হিন্দুমধ্যে গণ্য; কিন্তু এই বিদ্যাগণ মুণ্ডজাতীয় কোল, তাহাতে কোনো সংশয় নাই। চুটিয়া নাগপুরের মুণ্ডদিগের যেরূপ আকৃতি, ইহাদিগেরও সেইরূপ আকৃতি। মুণ্ডদিগের মধ্যে পহন নামে এক একজন পুরোহিত বা গ্রাম্য কর্মচারী সর্বত্র দেখা যায়, বিদ্যাগণের মধ্যেও ওইরূপ গ্রামে গ্রামে পহ্ন আছে। মুণ্ডেরা লোহা প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ এবং সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বিদ্যাগণও সেই কাজে সুদক্ষ ও সুব্যবসায়ী। আর মুণ্ডদিগের মধ্যে কিলি অর্থাৎ জাতিবিভাগ আছে, ইহাদিগেরও সেইরূপ আছে। মুণ্ডদিগের কিলীরও যে যে নাম, বিদ্যাদিগের কিলিরও সেই সেই নাম। অতএব ইহা এক প্রকার নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, বিদ্যাগণ মুণ্ড কোল। কিন্তু এখন তাহারা হিন্দিভাষা বলে ও হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়া চলে।*

দ্বিতীয়। আসামে চুটিয়া নামে একটি জাতি আছে। তাহাদের মুখাবয়ব অনার্যের ন্যায়। কোনো অসমিয়া বুরুঞ্জিতে কর্নেল্ ডাল্টন্ দেখিয়াছেন যে, উত্তরপ্রদেশস্থ পর্বত হইতে তাহারা উপর আসামে প্রবেশ করিয়া, সুবলেশ্বরী পার হইয়া সদিয়াপ্রদেশে বাস করে। লকিমপুরপ্রদেশে দিব্রু নদীর উপরে, এবং উপর আসামের অন্যত্র দেউরি চুটিয়া নামে এক চুটিয়াজাতি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগের ভাষা সমালোচন করিয়া স্থির হইয়াছে যে, ওই চুটিয়া ভাষা গারো ও বোড়োদিগের ভাষার সঙ্গে একজাতীয়। অতএব চুটিয়ারা যে অনার্যজাতি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এক্ষণে আসামের অধিকাংশ চুটিয়া হিন্দু বলিয়া গণ্য। এবং তাহারা

* Statistical Account of Bengal, Vol. VII, P. 213.

আপনারাও হিন্দু চুটিয়া বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। হিন্দু চুটিয়া বলিলেই বুঝাইবে যে, ম্লেচ্ছ চুটিয়া ছিল বা আছে।*

তৃতীয়। কাছাড়িরা অনার্যবংশ। তাহাদের অবয়ব মোঙ্গলীয়। কিন্তু আসাম প্রদেশীয় কাছাড়িরা হিন্দু হইয়াছে। এবং এক্ষণেও অনেকে হিন্দু হইতেছে।

চতুর্থ। কোচেরা আর একটি অনার্যজাতি। আসল কোচভাষা মেছকাছাড়ি ভাষা সদৃশ, কিন্তু ঐতিহাসিক সময়েই কোচবেহারের রাজাদিগের আদিপুরুষ হজুর পৌত্র বিসু সিং হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কোচবেহারের যত ভদ্রলোক হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা রাজবংশী নাম গ্রহণ করিলেন। ইতর কোচেরা মুসলমান হইল। †

পঞ্চম। ত্রিপুরার পাহাড়ি লোক অনার্যজাতি। কিন্তু তাহারাও হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। ‡

ষষ্ঠ। খাড়োয়ার নামক অনার্যজাতি কালীপূজা করিয়া থাকে। §

সপ্তম। পহেয়া নামে পালামৌতে এক জাতি আছে, তাহারা হিন্দিভাষা কয় এবং কতকগুলি আচার ব্যবহার তাহাদের হিন্দুদিগের ন্যায়। তাহাদের অনার্যত্ব নিঃসন্দেহ।

অষ্টম। সর্গুজায় কিসান বলিয়া এক জাতি আছে, তাহারাও অনার্য এবং তাহাদিগের আচার ব্যবহার সব কোলের ন্যায়, তাহাদেরও ভাষা হিন্দি এবং তাহারা কতক কতক হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে। @

নবম। "বুনো" কুলি সকলেই দেখিয়াছেন। তাহারা জাতিতে সাঁওতাল, কোল বা ধাঙ্গড় (ওরাঁও), কিন্তু এ দেশে যত "বুনো" দেখা যায়, সকলেই হিন্দু।

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যাহা দেওয়া গেল, তাহাতেই যথেষ্ট হইবে। এই কয়েকটি উদাহরণ দ্বারাই উত্তমরূপে প্রমাণ হইতেছে যে, বাঙ্গালার বাহিরে এমন অনেক অনার্যবংশ পাওয়া যায় যে, তাহারা আর্যভাষা গ্রহণ করিয়া ও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যদি বাঙ্গালার বাহিরে অনার্য হিন্দু পাওয়া যাইতেছে, তবে বাঙ্গালার ভিতরে বাঙ্গালির মধ্যে এরূপ অনার্য হিন্দু থাকাও সম্ভব। বাস্তবিক আছে কি না, তাহা বিচার করার প্রয়োজন।

এইখানে বলা উচিত যে, পাশ্চাত্যদিগের সাধারণ মত এই যে, প্রাচীন চতুর্বর্ণের মধ্যে শূদ্রদিগের উৎপত্তি এইরূপই ঘটিয়াছিল। জাতিভেদ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত প্রচার করিয়াছেন। আমাদিগের মতে জাতিভেদ তিন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম, আর্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যভেদ। এটি ব্যবসায়ভেদেই উৎপন্ন হইয়াছিল। এখন আমরা ইউরোপে দেখিতে পাই যে, কোনো কোনো কুলীনবংশ পুরুষানুক্রমে রাজকার্যে লিপ্ত। কোনো সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে বাণিজ্য করিতেছে। কোনো সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে কৃষিকার্য বা মজুরি করিতেছে।

* *Statistical Account of Bengal*, Vol. XVI, P. 82-83.
† Dalton's *Ethnology*, P. 78.
‡ Buchanan Hamilton—*Rungpur*, Vol. III, P. 419. Hodgson I. A. S. B. XXXI. July 1849.
§ Dalton's *Ethnology*, P. 130.
@ Dalton's *Ethnology*, P. 132.

কিন্তু ইউরোপে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের ব্যবসায় গ্রহণ করার পক্ষে কোনো বিঘ্ন নাই। এবং সচরাচর এরূপ ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্যেরা বিবেচনা করিতেন যে, যাহার পিতৃ-পিতামহ যে ব্যবসায় করিয়াছে, সে সেই ব্যবসাতেই সুদক্ষ হয়। তাহাতে সুবিধা আছে বলিয়া লোকে প্রথমত ইচ্ছা করিয়া পৈতৃপিতামহিক ব্যবসায় অবলম্বন করিত। শেষ উচ্চব্যবসায়ীদিগের নিকট নীচব্যবসায়ীরা ঘৃণ্য হওয়াতেই হউক অথবা ব্রাহ্মণদিগের প্রণীত দৃঢ়বদ্ধ সমাজনীতির বলেই হউক, বিদ্যাব্যবসায়ী যুদ্ধব্যবসায়ীর সঙ্গে মিশিল না। যুদ্ধব্যবসায়ী বণিকের সঙ্গে মিশিল না। এইরূপে তিনটি আর্যবর্ণের সৃষ্টি। জাতিভেদ উৎপত্তির দ্বিতীয় রূপ শূদ্রদিগের বিবরণে দেখা যায়। তাহা উপরে বুঝাইয়াছি। শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় সকল আর্যেরা আপনার হাতে রাখিল, নীচব্যবসায় শূদ্রের উপর পড়িল। বোধ হয়, প্রথম কেবল আর্যে ও শূদ্রে ভেদ জন্মে; কেন না, এ ভেদ স্বাভাবিক। শূদ্রেরা যেমন নূতন নূতন আর্যসমাজভুক্ত হইতে লাগিল, তেমনি পৃথক্ বর্ণ বলিয়া, আর্য হইতে তফাত রহিল। বর্ণ শব্দই ইহার প্রমাণ। বর্ণ অর্থে রঙ। পূর্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি যে, আর্যেরা গৌর, অনার্যেরা "কৃষ্ণত্বচ্"। তবে গৌর কৃষ্ণ দুইটি বর্ণ পাওয়া গেল। সেই প্রভেদে প্রথম আর্য ও শূদ্র, এই দুইটি বর্ণ ভিন্ন হইল। একবার সমাজের মধ্যে থাক আরম্ভ হইলে, আর্যদিগের হস্তে ক্রমেই থাক বাড়িতে থাকিবে। তখন আর্যদিগের মধ্যে ব্যবসায়ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিনটি শ্রেণি পৃথক্ হইয়া পড়িল, সেই ভেদ বুঝাইবার জন্য পূর্বপরিচিত "বর্ণ" নামই গৃহীত হইল। তারপর আর্যে আর্যে, আর্যে অনার্যে বৈধ বা অবৈধ সংসর্গে সংকর জাতিসকল উৎপন্ন হইতে লাগিল। সংকরে সংকরে মিলিয়া আরও জাতিভেদ বাড়িল। জাতিভেদের তৃতীয় উৎপত্তি এইরূপ।

এক্ষণে আমরা বাঙ্গালি শূদ্রদিগের মধ্যে অনার্যত্বের অনুসন্ধান করিব।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ—অনার্য বাঙালি জাতি

বাঙ্গালার মধ্যে মাল ও মালো বলিয়া দুইটি জাতি আছে। রাজমহল জেলার অন্তর্গত মালপাহাড়িয়া বলিয়া একটি অনার্য জাতি আছে; তাহারা কোনো আর্যভাষা কহে না। কিন্তু বাঙ্গালি মালেরা বাঙ্গালা কথা কয় এবং বাঙ্গালি বলিয়া গণ্য। জেনারেল্ কনিংহ্যাম্ প্রাচীন রোমীয় লেখক প্লিনি হইতে দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তখনও মালেবা বলিয়া জাতি ভারতবর্ষে ছিল। পুরাণাদিতে মালবের প্রসঙ্গ ভূয়োভূয় দেখা যায় এবং মেঘদূতে মালবদিগের নাম উল্লেখ আছে। অতএব এখন যেমন মালজাতি আছে, প্রাচীন মালজাতিও সেইরূপ ছিল। কিন্তু প্লিনি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, মালেরা আর্যজাতি হইতে একটি পৃথক্ জাতি ছিল। জেনারেল্ কনিংহ্যাম্ বলেন, এই প্লিনির লিখিত মালেরা টলেমি প্রণীত মণ্ডলজাতি। টলেমিলিখিত মণ্ডলজাতি আধুনিক মুণ্ড কোলজাতি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বিভার্‌লি সাহেব অনুমান করেন যে, ওই প্লিনির লিখিত মালজাতি এখনকার বাঙ্গালি মাল। এখন বাঙ্গালার বাহিরে যেখানে মাল নাম

পাই, সেইখানে সেইখানে অনার্যদিগকেই দেখিতে পাই। কান্দু নামক অতি অসভ্য অনার্যজাতির দেশের বিভাগকে মাল বা মালো বা মালিয়া বলে।* অনার্যপ্রধান মানভূম প্রদেশকে মালভূম বা মল্লভূমি বলে। রাজমহলের দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য পাহাড়িদিগকে মালের জাতি বলে। উড়িষ্যার কিঁউঝড় নামক আরণ্য রাজ্যে ভুঁইয়া নামক এক অনার্যজাতি আছে, তাহাদের একটি থাকের নাম মালভুঁইয়া।† বুকানন্ হ্যামিল্টন্ ভাগলপুর জেলার ভিতরে বন্য জাতির মধ্যে মালেব বলিয়া একটি অনার্যজাতি দেখিয়াছিলেন। কাঁধদিগের মালিয়া বলিয়া একটি জাতি আছে।‡ রাজমহলীয় মাল পাহাড়িদিগের কথা পূর্বে বলিয়াছি। পক্ষান্তরে আর্যদিগের মধ্যে মল্ল শব্দ আছে—অনেকে বলেন, এই মালেরা আর্যমল্ল। আর্যমল্ল হইতে মালজাতির উৎপত্তি, না অনার্য মল্লগণ বাহুযুদ্ধে কুশলী বলিয়া আর্যভাষায় বাহুযোদ্ধার নাম মল্ল হইয়াছে? মালেরা যে অনার্যজাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা এক প্রকার স্থির বলা যাইতে পারে।

সাঁওতালদিগের পাহাড়মধ্যে ডম নামে একটি অনার্যজাতি আছে। তাহাদিগের হইতে বাঙগালার ডোমজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, হন্টর সাহেব এমন অনুমান করেন।§ ইহা সত্য বটে যে, অন্যান্য নীচ হিন্দুজাতির ন্যায় ডোমেরা ব্রাহ্মণদিগের পৌরোহিত্য গ্রহণ করে না। তাহাদিগের পৃথক্ ধর্মযাজক আছে। ওই ধর্মযাজকদিগের নাম পণ্ডিত। এইরূপ ডোমের পণ্ডিত আমি স্বয়ং অনেক দেখিয়াছি। নেপালের নিকটে ডুমি নামে এক অনার্যজাতি আজিও বাস করে। @

হন্টর সাহেব দেখাইয়াছেন যে, অনেক অনার্যজাতির নাম অনার্যভাষায় মনুষ্যবাচক শব্দবিশেষ হইতে হইয়াছে। হো শব্দ ইহার পূর্বে উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে। সাঁওতালি ভাষায় হাড় = হড় শব্দে মনুষ্য। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, হাড়ি অনার্যবংশ।

পূর্বে বলিয়াছি যে, ককেশীয় ও মোঙ্গলীয় ভিন্ন আরও অনেক মনুষ্যজাতি আছে, তাহার মধ্যে কোনো কোনো জাতি স্বভাবতই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ। আফ্রিকার নিগ্রোরা ইহার উদাহরণ। কেবল রৌদ্রের উত্তাপে তাহারা এত কৃষ্ণবর্ণ, এমত নহে; যেমন তপ্ত দেশে কাফ্রির বাস আছে, তেমনি তপ্ত দেশে গৌরবর্ণ আর্য বা মোঙ্গলের বাস আছে। আমেরিকার যে প্রদেশে ইন্ডিয়ানদিগের বর্ণ লোহিত, সেই প্রদেশেই সাক্সন্ বংশীয়দিগের বর্ণ গৌর; তিনশত বৎসরে কিছুমাত্র কৃষ্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে এক প্রদেশেই শ্যামবর্ণ আর্যেরা এবং মসীবর্ণ অনার্যেরা একত্র বাস করিতেছে। রৌদ্রসন্তাপে কতক দূর কৃষ্ণতা জন্মিতে পারে বটে। ভারতীয় আর্যদের তাহা কিছু দূর জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ গৌর, কেহ শ্যামল, কিন্তু বিন্ধ্যপর্বতের নিকটবাসী কতকগুলি অনার্যজাতি একেবারে মসীকৃষ্ণ।

---

* Dalton, P. 299.
† Dalton, P. 145.
‡ Dalton, P. 293.
§ *Non-Aryan Dictionary*, P. 29.
@ *Non-Aryan Dictionary*, P. 29.

বিষ্ণুপুরাণে তাহাদিগের বর্ণনা আছে। কথিত আছে যে, বেণ রাজার উরুদেশ হইতে দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় খর্বকায় অট্টাস্য এক পুরুষ জন্মে। এই বর্ণনায় মধ্যভারতের খর্বাকৃত অট্টাস্য কৃষ্ণকায় অনার্যদিগকে পাওয়া যায়। ওই পুরুষ নিষাদ নামে সংজ্ঞাত হইয়াছে।* ইহারই বংশে নিষাদাখ্য অনার্যজাতির উৎপত্তি।† হরিবংশে বেণের উপাখ্যানে ওইরূপ লিখিত হইয়া, ওই পুরুষকে নিষাদ ও ধীবর জাতির আদিপুরুষ বলিয়া বর্ণনা আছে।‡ মনু বলিয়াছেন যে, আয়োগবি অর্থাৎ শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে উৎপাদিতা স্ত্রীর গর্ভে নিষাদের ঔরসে মার্গব বা দাস জন্মে। আর্যাবর্তে তাহাদিগকে কৈবর্ত বলে।§ অমরকোষাভিধানে কৈবর্তদিগের নাম কৈবর্ত, দাস, ধীবর। পূর্বেই দেখান গিয়াছে যে, ঋগ্বেদ সমালোচনায় দাস নামে অনার্যজাতি পাওয়া যায়। দাস, ধীবর, কৈবর্ত তিনই এক। যদি দাস ও ধীবর অনার্য হইল, তবে কৈবর্তও অনার্যজাতি। এক্ষণে বাঙ্গালায় কৈবর্তের মধ্যে কতকগুলি চাষা কৈবর্ত; কতকগুলি জেলে কৈবর্ত। পূর্বে সকলেই মৎস্যব্যবসায়ী ধীবর ছিল, সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কতকগুলি কৃষিব্যবসায় অবলম্বন করিল, তাহারাই চাষা কৈবর্ত। ধোপারা ওইরূপ কেহ কেহ চাষ করিয়া চাষাধোপা বলিয়া পৃথক্ জাতি হইয়াছে।

পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র নামে প্রাচীন জাতির উল্লেখ মন্বাদিতে পাওয়া যায়। মনু লিখিয়াছেন যে, পৌণ্ড্রক প্রভৃতি জাতি ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পৌণ্ড্রকদিগের সঙ্গে আর যে সকল জাতি গণনা করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে যবন ও পহ্লব ভারতবর্ষের বাহিরে। ভিতরে সকলগুলিই অনার্য; যথা—

"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, "অন্ধ্রা পুণ্ড্রা সবরা পুলিন্দা মুতিবা ইত্যুদন্তা বহবো ভবন্তি।" মহাভারতেও এই পুণ্ড্রদিগের কথা আছে। সভাপর্বে আছে যে, ভীম দিগ্বিজয়ে আসিয়া পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব এবং কৌশিকিকচ্ছবাসী মনৌজা রাজা, এই দুই মহাবলপরাক্রান্ত বীরকে পরাজিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গ আধুনিক বাঙ্গালার পূর্বভাগকে বলিত। এখনও সাধারণ লোকে সেই প্রদেশকেই বঙ্গদেশ বলে। ভীম পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া যে দেশ জয় করিয়া বাঙ্গালার পূর্বভাগে প্রবেশ করিলেন, সে দেশ অবশ্য বাঙ্গালার পশ্চিমভাগে। উইল্‌সন্ সাহেবও স্বকৃত বিষ্ণুপুরাণানুবাদে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক তত্ত্ব নিরূপণকালে বাঙ্গালার পশ্চিমাংশেই পুণ্ড্রজাতিকে সংস্থাপন

* "কিং করোমীতি তান্ সর্বান্ বিপ্রান্ আহ স চাতুরঃ।
নিষীদেতি তমুচুস্তে নিষাদস্তেন সোহভবৎ॥"

† "তেন দ্বারেণ নিষ্ক্রান্তং তৎ পাপং তস্য ভূপতেঃ।
নিষাদাস্তে তথা যাতা বেণকল্মষসম্ভবাঃ॥"

‡ "নিষাদবংশকর্তাসৌ বভূব বদতাং বরঃ।
ধীবরানসৃজচ্চাপি বেণকল্মষসম্ভবান্॥"

§ "নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকর্মজীবিনং।
কৈবর্তমিতি যং প্রাহুরার্যাবর্তনিবাসিনঃ॥"
মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক।

করিয়াছেন।* তার পর খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিয়েন্থ্ সাঙ্ নামক চীন পরিব্রাজক এ প্রদেশে আসিয়া পুণ্ড্রদিগের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধন দেখিয়া গিয়াছেন। জেনারেল কনিংহাম্ সাহেব ওই চীন পরিব্রাজকের লিখিত দিক্ ও দূরতা লইয়া পৌণ্ড্রবর্ধন কোথায় ছিল, তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি কিছু ইতস্তত করিয়া আধুনিক পাবনাকে পৌণ্ড্রবর্ধন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পাবনা না হইয়া বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী মালদহ জেলার অন্তর্গত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী পাণ্ডুয়া বলিলে পৌণ্ড্রবর্ধনের প্রকৃত সংস্থান ঘটিত। তারপর দশকুমারচরিতে লেখা আছে, "অনুজায় বিষাণবর্মণে দণ্ডচক্রং চ পুণ্ড্রাভিযোগায় বিরোচেয়ং।" অর্থাৎ পুণ্ড্রদেশ আক্রমণের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষাণবর্মাকে দণ্ড চক্র অর্থাৎ সৈন্যাদি দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।** দশকুমারচরিত আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ। উপরিলিখিত উক্তি কোনো মৈথিল রাজার উক্তি, অতএব দশকুমার যখন প্রণীত হয়, তখনও পুণ্ড্রেরা মিথিলার নিকটবাসী।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, স্মৃতি, এ সকলের সময় হইতে অর্থাৎ অতি পূর্বকাল হইতে দশকুমারচরিত ও হিয়েন্থ্সাঙের সময় পর্যন্ত পুণ্ড্রনামে প্রবল জাতি

* "*Pundras* the western Provinces of Bengal, or as sometimes used in a more comprehensive sense, it includes the following districts : Rajashahi, Dinagepore, and Rungpore; Nadiya, Beerbhoom, Burdwan, part of Midnapore and the Jungle Mehals; Ramghur, Pacheti, Palamow, and part of Chunar. See and account of Pundra translated from what is said to be part of the Brahmanda Section of the Bhavishyat Purana in the Quarterly Oriental Magazine, Decr. 1824 Wilson's *Vishnu Puranas.*

আমাদিগের প্রিয়বন্ধু, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভবিষ্যপুরাণখানি সন্ধান করিয়া লেখিয়াছেন (ভবিষ্যপুরাণ, ভবিষ্যৎ পুরাণ নহে; ব্রহ্মখণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড নহে; এগুলি ছোটো ছোটো সাহেবি ভুল)। উহার এক কাপি সংস্কৃত কলেজে আছে। পুঁথিখানি খণ্ডিত, আসাম মণিপুর হইতে আরম্ভ করিয়া কাশী পর্যন্ত সমস্ত দেশের বিশেষ বিবরণ উহাতে দেওয়া আছে; কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িয়া ভক্তি হয় না। গ্রন্থখানিতে বিদ্যাসুন্দরের গল্প আছে। মানসিংহ কর্তৃক যশোরের আক্রমণ বর্ণিত আছে। যবনাধিকারের চারি শত বৎসর পরে চম্পারণের ও নেপালি রাজার যে যুদ্ধ হয়, তাহার বর্ণনা আছে। বিশেষ, গ্রন্থকারের বঙ্গদেশমধ্যে আসাম, চট্টল এবং মণিপুর পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এতদূর তো গ্রন্থের পরিচয় গেল। তাহাতে আছে যে, পৌণ্ড্রদেশ সাত ভাগে বিভক্ত ঃ—গৌড়দেশ, বারেন্দ্রভূমি, নীবৃত, বরাহভূমি, বর্ধমান, নারীখণ্ড ও বিন্ধ্যপার্শ্ব। এই সকল দেশের লোক দুষ্ট, চোর, পরদারনিরত ইত্যাদি ইত্যাদি। গৌড়দেশের প্রধান নগরসমূহের মধ্যে মৌরসিধাবাদ, (মুরশিদাবাদ নামের সংস্কৃত ফরম; মুরশিদাবাদ নাম ১৭০৪ সালে হয়, তাহার আগে উহাকে মুকশুধাবাদ বলিত বলিয়া স্টুয়ার্টের হিস্টরি অব্ বেঙ্গলে উক্ত আছে); সুতরাং গ্রন্থখানি ২০০ বৎসরের মধ্যে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। গৌড়দেশে গৌড়নগরের উল্লেখ নাই। পাণ্ডুয়ারও উল্লেখ নাই। বরেন্দ্রভূমির প্রধান নগর পুট্টিলা, নটারো, চপলা (যেখানকার রাজা ব্রাহ্মণ), কাকমারী। নীবৃত দেশের প্রধান নগর কচ্ছপ, নসর, শ্রীরঙ্গপুর ও বিহার। রঙ্গপুরে বাগদি রাজা। নারীখণ্ডের প্রধান নগর বৈদ্যনাথ, দেবগড়, করা, সোণামুখী ইত্যাদি। বরাহভূমের প্রধান নগর রঘুনাথপুর, ধবল ইত্যাদি। বর্ধমানের প্রধান নগর বর্ধমান, নবদ্বীপ, মায়াপুর, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি। বিন্ধ্যপার্শ্বের প্রধান নগর সুদর্শন, পুষ্পগ্রাম ও বদরী কুড়ক গ্রাম। এই সকল দেশের আচার ব্যবহার ও চতুঃসীমা আছে। আমাদের যতদূর মানচিত্র বোধ আছে, তাহাতে বোধ হয়, চতুঃসীমা অনেক ভজিবে না। গৌড়দেশের উত্তরে পদ্মাবতী ও দক্ষিণে বর্ধমান। আসল গৌড়নগর ইহার মধ্যে পড়িল না।

উইল্‌সন্ সাহেব ওই স্থলে আরও লিখিয়াছেন যে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকে পুণ্ড্র দাক্ষিণাত্যে স্থাপিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ওই শ্লোকটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—

"নদীং গোদাবরীং চৈব সর্বমেবানুপশ্যতঃ।
তথৈবান্ধ্রাংশ্চ পুণ্ড্রাংশ্চ চোলান্ পাণ্ড্যাংশ্চ কেরলান্।।"

** *দশকুমারচরিত*, তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

বাঙ্গালার পশ্চিমাংশে বাস করিত। এক্ষণে বাঙ্গালায় বা বাঙ্গালার নিকট বা ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশে পুণ্ড্র নামে কোনো জাতি নাই। এই পুণ্ড্রজাতি তবে কোথায় গেল?

সংস্কৃত শব্দে "ণ্ড" থাকিলে, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষায় ড-কার, ড়-কার হইয়া যায়। আর ণ-কার লুপ্ত হইয়া পূর্ববর্তী হলবর্ণে চন্দ্রবিন্দুরূপে পরিণত হয়। যথা—ভাণ্ডের স্থলে ভাঁড়, ষণ্ডের স্থলে ষাঁড়, শুণ্ডের স্থলে শুঁড়। আর সংস্কৃত হইতে অপভ্রংশপ্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালাদিতে পরিণত হইতে গেলে শব্দের র-কারাদির সচরাচর লোপ হয়,—যথা—তাম্র স্থলে তামা, আম্র স্থলে আম ইত্যাদি। অতএব পুণ্ড্র শব্দ লৌকিক ভাষায় চলিত হইলে প্রথমে রেফ লুপ্ত করিয়া পুণ্ড শব্দে পরিণত হইবে। তার পর যেমন ভাণ্ড স্থলে ভাঁড় হয়, শুণ্ড স্থলে শুঁড় হয়, তেমনি পুণ্ড স্থলে পুঁড় বা পুঁড়ো হইবে। পুঁড়ো বাঙ্গালায় একটি সংখ্যায় প্রধান জাতি।

আমরা পূর্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও মনুতে পুণ্ড্রেরা অনার্যজাতির সঙ্গে গণিত হইয়াছে। অতএব পুঁড়ো আর একটি অনার্যবংশোদ্ভূত বাঙ্গালি জাতি।

শব্দের অপভ্রংশ এক প্রকার হয় না। প্রাচীন ভাষার কোনো শব্দ ভাষান্তরে অপভ্রষ্ট হইয়া প্রবেশ করিলে দুই তিন রূপ ধারণ করে। এক সংস্কৃত 'স্থান' শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় কোথাও থান, কোথাও ঠাঁই। 'চন্দ্র' শব্দ কখনো চন্দ্র, কখনো চাঁদ। যেমন চন্দ্র শব্দ বাঙ্গালির উচ্চারণে চন্দ্র হয়, ভদ্র শব্দ ভদ্দর হয়, তন্ত্র শব্দ তন্তর হয়, তেমনি পুণ্ড্র শব্দ স্থানবিশেষে পুণ্ডর হইবে। জাতিবাচক অর্থে কখনো কখনো বাঙ্গালিরা শব্দের পরে একটা ঈকার বেশির ভাগ যোগ করিয়া দিয়া থাকে; যেমন সাঁওতাল সাঁওতালি, গয়াল গয়ালি, দেশওয়াল হইতে দেশওয়ালি। এইরূপ ঈকার যোগে পুণ্ড্র শব্দ পুণ্ডর হইয়া পুণ্ডরীতে পরিণত হয়। পুণ্ডরী বলিয়া একটি বহুসংখ্যক বাঙ্গালি জাতি আছে, পুণ্ড্রেরা এবং পুঁড়োরা যদি অনার্য, তবে পুণ্ডরীরাও অনার্যজাতি।

পোদ শব্দ পুণ্ড্র শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। এবং পুণ্ড্র শব্দ হইতেই পোদ নাম জন্মিয়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয়।

যে সকল কথা বলা গেল, তাহাতে বোধ হয় প্রতীতি জন্মিয়া থাকিবে যে, পুঁড়ো, পুণ্ডরী এবং পোদ, তিনটি আদৌ এক জাতি এবং তিনটি আদি প্রাচীন পুণ্ড্রজাতির সন্তান। পুণ্ড্রেরা অনার্যজাতি ছিল, অতএব বাঙ্গালি সমাজের ভিতর আর তিনটি অনার্যজাতি পাওয়া যাইতেছে।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—আর্য শূদ্র

পূর্বপরিচ্ছেদে আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় ইহা স্থির হইয়াছে যে, বাঙ্গালির মধ্যে অনেকগুলি জাতি অনার্যবংশ। আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, সকল কয়টি এক্ষণে বাঙ্গালি শূদ্র বলিয়া গণিত। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গালি শূদ্রে সকল না হউক, কেহ কেহ অনার্যবংশ। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আমরা পূর্বপরিচ্ছেদে যে সকল প্রমাণ দিয়াছি, তাহা সবগুলি ছিদ্রশূন্য নহে। তাহা আমরা কতক স্বীকার করি, কিন্তু এক প্রমাণ অচ্ছিদ্র, অখণ্ডনীয় আছে। যেখানে বর্ণ ও

আকৃতি আর্যজাতীয় নহে, সেখানে যে অনার্যশোণিত বর্তমান, তাহা নিশ্চিত। আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, সকল কয় জাতি সম্বন্ধেই অন্যান্য প্রমাণের উপর এই আকারগত প্রমাণ বিদ্যমান; অতএব ওই কয়টি জাতির অনার্যত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া যাইতে পারে।

আমরা মনে করিলে এরূপ উদাহরণ অনেক দিতে পারিতাম। দিনাজপুর ও মালদহে পলি বা পলিয়াদিগের কথা লিখিতে পারিতাম। পলিয়ারা ভাষায় বাঙ্গালি ও ধর্মে হিন্দু, সুতরাং তাহারা বাঙ্গালি বলিয়া গণ্য। কিন্তু তাহাদের আকার ও আচার অনার্যের ন্যায়। তাহারা কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃত, শূকর পালে এবং শূকর খায়। সুতরাং তাহাদিগের অনার্যত্বে কোনো সংশয় নাই। মনু, মহাভারতাদির পুলিন্দ জাতি বর্তমান পলিদিগের পূর্বপুরুষ, এমন অনুমান কতদূর সংগত, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে পারিলাম না।

কোনো আর্যবংশীয় জাতি যে শূকর পালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে, ইহা সম্ভব নহে। কেন না, শূকর আর্যশাস্ত্রানুসারে অতি অপবিত্র জন্তু; বাঙ্গালাজয়কারী আর্যেরা ওই সকল ব্যবসায় যে অনার্যদিগের হাতে রাখিবেন, ইহাই সম্ভব। বিশেষ, শূকর বা শূকরমাংস আর্যদিগের কোনো কাজে লাগে না। যদি এইরূপে শূকরপালক জাতিদিগকে অনার্য বলিয়া স্থির করা যায়, তাহা হইলে দক্ষিণবাঙ্গালার কাওরারাও অনার্য বলিয়া বোধ হয়। কাওরাদিগের জাতীয় আকারও অনার্যদিগের ন্যায়। কাওরারা কোন্ অনার্যজাতিসম্ভূত, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু কতকগুলি অনার্যজাতির সঙ্গে ইহাদিগের নামের সাদৃশ্য আছে। যথা—কোড়োয়া, খাড়োয়া, খাড়িয়া, কৌর ইত্যাদি। কিরাত শব্দ প্রাকৃততে কিরাও হইবে। কিরাও শব্দের অপভ্রংশে কাওরাও হওয়া অসম্ভব নহে। বাঙ্গালার উত্তরে কিরাতেরা কিরাতি বা কিরান্তি নামে অদ্যাপি বর্তমান আছে।

পাশ্চাত্যেরা বাগদিদিগকেও অনার্যবংশ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। বাস্তবিক বাগদিদিগের আকার ও বর্ণ হইতে অনার্যবংশ অনুমান করা অসংগত বোধ হয় না। অনেকে বাগদি ও বাউরি এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন।

আমাদিগের এমত ইচ্ছা নহে যে, বাঙ্গালার হিন্দুজাতিদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ জাতি অনার্যবংশ, তাহা একে একে নিঃশেষ করিয়া মীমাংসা করি। বাঙ্গালার শূদ্রদিগের মধ্যে অনেকাংশ যে অনার্যবংশ, ইহাই দেখান আমাদিগের উদ্দেশ্য এবং পূর্বপরিচ্ছেদে যে সকল উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙালি শূদ্রের মধ্যে অনার্যবংশ অতিশয় প্রবল। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে, শূদ্র মাত্রেই অনার্যবংশ। প্রথম বর্ণভেদ উৎপত্তির সময়ে সকল শূদ্রই অনার্য ছিল বোধ হয়। কিন্তু ক্রমে আর্যসম্ভূত সংকীর্ণ বর্ণ ও অসংকীর্ণ আর্যবর্ণ যে এখন শূদ্রের মধ্যে মিশিয়াছে, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। এখনকার সকল শূদ্রই অনার্য, এই কথার অমূলকতা প্রতিপাদন করিতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথম, কে আর্য আর কে অনার্য, ইহা মীমাংসা করিবার দুইটি মাত্র উপায়। এক ভাষা, দ্বিতীয় আকার। দেখা যাইতেছে যে, কেবল ভাষার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার ভিতরে ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। কেন না, সকল বাঙ্গালি শূদ্রই আর্যভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। তবে আকারই একমাত্র সহায় রহিল। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কায়স্থ প্রভৃতি অনেক শূদ্রের আকার আর্য প্রকৃত। কায়স্থে ও ব্রাহ্মণে আকার বা বর্ণগত কোনো বৈসাদৃশ্য নাই। আকারে প্রমাণ হইতেছে, কতকগুলি শূদ্র আর্যবংশীয়।

দ্বিতীয়, পূর্বে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের রীতি ছিল; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যাকে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিত। ইহাকে অনুলোম বিবাহ বলিত। এইরূপ অধঃস্থজাতীয় পুরুষ শ্রেষ্ঠজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিলে, প্রতিলোম বিবাহ বলিত। ইহার বিধি মন্বাদিতে আছে। যেখানে বিবাহ বিধি ছিল, সেখানে অবশ্য বৈধ বিবাহ ব্যতীতও অসবর্ণ সংযোগে সন্তানাদি জন্মিত। তাহারা চতুর্বর্ণের মধ্যে স্থান পাইত না। মনু বলিয়াছেন, চতুর্বর্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই।* টীকাকার কুল্লুক ভট্ট তাহাতে লেখেন যে, সংকীর্ণ জাতিগণ অশ্বতরবৎ মাতা বা পিতার জাতি হইতে ভিন্ন; তাহারা জাত্যন্তর বলিয়া তাহাদিগের বর্ণত্ব নাই।† এইরূপ অসবর্ণ পরিণয়াদিতে কাহারা জন্মিত, তাহা দেখা যাউক।

"ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে।।"

মনু, ১০ম অধ্যায়, ৮ শ্লোক।

অর্থাৎ বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে অম্বষ্ঠের জন্ম, আর শূদ্রকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে নিষাদ বা পারশবের জন্ম। পুনশ্চ

"শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাং।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসংকরাঃ।।" মনু, ১০ম অ, ১২।

অর্থাৎ বৈশ্যার গর্ভে শূদ্র হইতে আয়োগব, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূদ্র হইতে ক্ষত্তা, আর ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে শূদ্র হইতে চণ্ডালের জন্ম।

যে সকল ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ অব্রত হইয়া পতিত হয়, মনু তাহাদিগকে ব্রাত্য বলিয়াছেন। এবং ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় ব্রাত্য এবং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে নীচজাতির উৎপত্তির কথা লিখিয়াছেন। মহাভারতে অনুশাসন পর্বে ব্রাত্যদিগকে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূদ্র হইতে জাত বলিয়া বর্ণিত আছে।

এই সকল সংকরবর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যমধ্যে স্থান পায় নাই, ইহা একরূপ নিশ্চিত এবং ইহারা যে শূদ্রদিগের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। আয়োগব বা ব্রাত্য এক্ষণে বাঙ্গালায় নাই; কখনো ছিল কি না সন্দেহ; কেন না, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় কখনও আইসে নাই। কিন্তু চণ্ডালেরা বাঙগালায় অতিশয় বহুল; বাঙ্গালি শূদ্রের তাহা একটি প্রধান ভাগ। চণ্ডালেরা অন্তত মাতৃকুলে আর্যবংশীয়। বাঙগালায় শূদ্রজাতি অনেকেরই সংকরবর্ণ; সংকরবর্ণ হইলেই যে তাহাদের শরীরে আর্যশোণিত, হয় পিতৃকুল, নয় মাতৃকুল হইতে আগত হইয়া বাহিত হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বাঙ্গালায় অম্বষ্ঠ আছে, তাহারা যে উভয় কুলে বিশুদ্ধ আর্য, তাহার প্রমাণ উপরে দেওয়া গিয়াছে। কেন না, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য উভয়েই বিশুদ্ধ আর্য।

তৃতীয়, আমরা শেষ তিন পরিচ্ছেদে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে উপলব্ধি হইতেছে যে, বাঙ্গালায় শূদ্রমধ্যে কতকগুলি বিশুদ্ধ আর্যবংশীয় এবং কতকগুলি আর্যে অনার্যে মিশ্রিত, পিতৃমাতৃকুলের মধ্যে এক কুলে আর্য, আর কুলে অনার্য।

* "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।।"
মনু, ১০ম অধ্যায়, ৪।

† "পঞ্চমঃ পুনর্বর্ণো নাস্তি। সংকীর্ণজাতীনাং ত্বশ্বতরবৎ মাতাপিতৃজাতিব্যতিরিক্ত জাত্যন্তরত্বাৎ ন বর্ণত্বং।"

চতুর্থত, কতকগুলি শূদ্রজাতি প্রাচীন কাল হইতে আর্যজাতিমধ্যে গণ্য, কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালায় তাহারা শূদ্র বলিয়া পরিচিত; যথা বণিক। বণিকেরা বৈশ্য; তাহার প্রমাণ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বোধ হয়, কেহই তাহাদিগের বৈশ্যত্ব অস্বীকার করিবেন না। বাঙ্গালায় শূদ্রমধ্যে যে বৈশ্য আছে, তাহার ইহাই এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ—স্থূল কথা

বাঙ্গালি জাতির উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহার পুনরুক্তি করিতেছি।

ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রধান জাতিসকল এক প্রাচীন আর্যবংশ হইতে উৎপন্ন। যাহার ভাষা আর্যভাষা, সেই আর্য বংশীয়। বাঙ্গালির ভাষা আর্যভাষা, এজন্য বাঙ্গালি আর্যবংশীয় জাতি।

কিন্তু বাঙ্গাালি অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ আর্য নহে। ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত এবং বিশুদ্ধ আর্য সন্দেহ নাই, কেন না, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপত্তি ভিন্ন সংকরত্ব সম্ভবে না, সংকরত্ব ঘটিলে ব্রাহ্মণত্ব যায়। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সম্বন্ধে ওইরূপ হইলে হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় নাই বলিলেই হয়। অতি অল্পসংখ্যক বৈদ্য ও বণিক্‌গণকে বাদ দিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালি কেবল দুই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ আর্য, কিন্তু শূদ্রদিগকে বিশুদ্ধ আর্য, কি বিশুদ্ধ অনার্য বিবেচনা করিব, কি মিশ্রিত বিবেচনা করিব, ইহারই বিচার আমরা এতদূর বিস্তারিত করিয়াছি। কেন না, বাঙ্গালি জাতির মধ্যে সংখ্যায় শূদ্রই প্রধান।†

অনুসন্ধানে ইহাও পাওয়া গিয়াছে যে আর্যেরা দেশান্তর হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তখন আমরা এই তত্ত্ব উত্থাপন করিয়াছিলাম যে, তাঁহারা আসিবার পূর্বে বাঙ্গালায় বসতি ছিল কি না?

বিচারে পাওয়া গিয়াছে যে, আর্যেরা বাঙ্গালায় আসিবার পূর্বে বাঙ্গালায় অনার্যদিগের বাস ছিল। তারপর দেখিয়াছি যে, সেই অনার্যগণ একবংশীয় নহে। কতকগুলি কোলবংশীয়, আর কতকগুলি দ্রাবিড়বংশীয়। দ্রাবিড়বংশের পূর্বে কোল বংশীয়েরা বাঙ্গালার অধিকারী ছিল তারপর দ্রাবিড়বংশীয়েরা আইসে। পরে আর্যগণ আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিলে কোলীয় ও দ্রাবিড়ি অনার্যগণ তাঁহাদিগের তাড়নায় পলায়ন করিয়া বন্য ও পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কিন্তু সকল অনার্যই আর্যের তাড়নায় বাঙ্গালা হইতে পলাইয়া বন্য ও পার্বত্য দেশে আশ্রয় লইয়াছিল, এমত নহে; আমরা দেখিয়াছি যে, অনার্যগণ আর্যের সংঘর্ষণে পড়িলে আর্যধর্ম ও আর্যভাষা গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়া হিন্দুসমাজভুক্ত হইতে পারে, হইয়াছিল ও হইতেছে। অতএব বাঙ্গালি শূদ্রদিগের মধ্যে এইরূপে হিন্দুত্বপ্রাপ্ত অনার্য থাকা অসম্ভব নহে। আছে কি না—তাহার প্রমাণ খুঁজিয়া দেখিয়াছি।

† ৭১ সালের লোকসংখ্যাগণনায় স্থির হইয়াছে যে, বাঙ্গালার যে অংশে বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত, তাহাতে ৩০৬০০০০০ লোক বসতি করে—তন্মধ্যে ১১ লক্ষ মাত্র ব্রাহ্মণ।

দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষার এমন একটি ভাগ আছে যে, অনার্যভাষাই তাহার মূল বলিয়া বোধ হয়। আরও দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালি শূদ্রদিগের মধ্যে এমন অনেকগুলি জাতি আছে যে, অনার্যগণকে তাহাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া বোধ হয়।

পরিশেষে ইহাও প্রমাণ করা গিয়াছে যে, বাঙ্গালি শূদ্রের কিয়দংশ অনার্য সম্ভূত হইলেও অপরাংশ আর্যবংশীয়। কেহ বিশুদ্ধ আর্য, যেমন অম্বষ্ঠ, কায়স্থ; কেহ আর্য অনার্য উভয়কুলজাত, যেমন চণ্ডাল।

এক্ষণে এই বাঙ্গালি জাতি কী প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা আমরা বুঝিয়াছি। প্রথম কোলবংশীয় অনার্য, তারপর দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য, তারপর আর্য; এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙ্গালি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সাক্সন্, ডেন্ ও নর্মান্ মিশিয়া ইংরেজ জন্মিয়াছে। কিন্তু ইংরেজের গঠনে ও বাঙ্গালির গঠনে দুইটি বিশেষ প্রভেদ আছে। টিউটন্ হউক বা নর্মান্ হউক, যতগুলি জাতির সংমিশ্রণে ইংরেজ জাতি প্রস্তুত হইয়াছে, সকলগুলিই আর্যবংশীয়। বাঙ্গালি যে কয়েকটি জাতিতে গঠিত হইয়াছে, তাহার কেহ আর্য, কেহ অনার্য। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, ইংলণ্ডে টিউটন্ ও ডেন্ ও নর্মান, এই তিন জাতির রক্ত একত্রে মিশিয়াছে। পরস্পরের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধের দ্বারা মিলিত হইয়া তাহাদিগের পার্থক্য লুপ্ত হইয়াছে। তিনে এক জাতি দাঁড়াইয়াছে, বাছিয়া তিনটি পৃথক্ করিবার উপায় নাই। মোটের উপর এক ইংরেজ জাতি কেবল পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় আর্যদিগের বর্ণধর্মিত্বহেতু বাঙ্গালায় তিনটি পৃথক্ স্রোত মিশিয়া একটি প্রবল প্রবাহে পরিণত হয় নাই; আর্যসম্ভূত ব্রাহ্মণ অনার্যসম্ভূত অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ রহিয়াছেন। যদি কোনো স্থানে আর্যে অনার্যে বৈধ বিবাহ বা অবৈধ সংসর্গের দ্বারা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানে সেই সংমিশ্রণে উৎপন্ন সন্তানেরা আর্য অনার্য হইতে আর একটি পৃথক্ জাতি হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডালেরা ইহার উদাহরণ। ইংরেজ একজাতি, বাঙ্গালিরা বহুজাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালি বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালি পাই। এক আর্য, দ্বিতীয় অনার্য হিন্দু, তৃতীয় আর্যানার্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙগালি মুসলমান। চারি ভাগ পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকে। বাঙ্গালিসমাজের নিম্নস্তরেই বাঙ্গালি অনার্য বা মিশ্রিত আর্য ও বাঙ্গালি মুসলমান; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য। এই জন্যে দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালিজাতি অমিশ্রিত আর্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আর্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।

উৎস : বঙ্গদর্শন

# বাংলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

আহমদ শরীফ

সংস্কৃতি সম্পর্কে কথা বলা একটু কঠিন। কঠিন এই কারণে যে, সংস্কৃতিকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, কঠিন তরল বা বায়বীয় কোনো পদার্থের মতো সংস্কৃতিকে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে পাওয়া যায় না। তবু সংস্কৃতি বলে একটা কিছু যে আছে তা চেতনাসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তিই উপলব্ধি করেন এবং অনুভব করেন। সংস্কৃতি বিমূর্ত বিষয় উপলব্ধির বিষয়, অনুভবের বিষয়, হৃদয় এবং বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার বিষয়। সংস্কৃতির কোনো বস্তুগত অস্তিত্ব না থাকার ফলে সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা অনেকটা 'অন্ধের হস্তীদর্শন-ন্যায়ে'র মতো ব্যাপার। সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা যতই আলোচনা করি, যতই মত-বিনিময় করি, মনে হয়, কোনো দুইজন ব্যক্তির ধারণাই এ-সম্পর্কে হুবহু এক হবে না। কাজেই আমি যা বলব, তাও যে আপনারা সবাই মেনে নেবেন, তেমন ভরসা আমার নেই। সংস্কৃতিকে যদিও ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, স্পর্শ করা যায় না, কোনো বস্তুর মতো মূর্তিমান দেখা যায় না, তবু মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যেই—অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, ধর্মীয়, ব্যবহারিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত ইত্যাদি সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যেই তার সংস্কৃতি নিহিত থাকে। সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলের প্রতি মানুষের যে প্রবণতা—মানুষ সচেতনভাবে চেষ্টার দ্বারা যে সৌন্দর্য-চেতনা, কল্যাণবুদ্ধি ও শোভন জগৎদৃষ্টি অর্জন করতে চায়—তাকেই হয়তো তার সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়।

সংস্কৃতি হল মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিস্রুত জীবনচেতনা। জীবিকা-সম্পৃক্ত ও পরিবেষ্টনী -প্রসূত হলেও প্রজ্ঞা ও বোধি-সম্পন্ন ব্যক্তি-চিত্তেই এর উদ্ভব এবং বিকাশ—ব্যক্তি থেকে ক্রমে সমাজে এবং সমাজ থেকে বিশ্বে তা হয় ব্যাপ্ত। চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর, শোভন, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। আত্মসম্মানবোধ, সহিষ্ণুতা, যুক্তিনিষ্ঠা, উদারতা, কল্যাণবুদ্ধি ও মহত্ত্বই সংস্কৃতিবানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অনুকৃত বা অনুশীলিত হয়ে সংস্কৃতিবানের কাছ থেকে সংস্কৃতি সমাজে, দেশে সংক্রমিত হয়, এবং তখন তা পরিচিত হয় দেশীয় বা জাতীয় সংস্কৃতি নামে। বাঙালি সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, ইউরোপীয় সংস্কৃতি, মধ্যযুগের সংস্কৃতি ইত্যাদি কথার তাৎপর্য এভাবেই বুঝতে চেষ্টা করতে হবে।

যে কোনো উদ্ভাবন-আবিষ্কার ব্যক্তিগত চিন্তার অনুভূতির ও প্রয়াসের ফল। সংস্কৃতির সঙ্গে এই উৎভাবনশক্তির সম্পর্ক আছে। সাধারণ মানুষ সৃষ্টিশীল নয়, তাদের উদ্ভাবন-ক্ষমতা বা নতুনভাবে চিন্তা করার শক্তি নেই। এজন্যে তারা গ্রহণশীল হয়েই সংস্কৃতিবান হয়। কাজেই সৃজনশীলতার সঙ্গে গ্রহণশীলতাও থাকা চাই। নইলে সংস্কৃতির ধারা সচল থাকে না।

এই যে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অনুভবযোগ্য একটা বিমূর্ত বিষয় সংস্কৃতি—একে বুঝবার চেষ্টা করা অন্ধের হস্তী দর্শনের মতো একটা ব্যাপার ছাড়া আর কী বলা যায়। আমাদের বাংলাভাষী অঞ্চলের সামন্ত যুগের সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনাও তাই এই অন্ধের হস্তী দর্শনেরই ব্যাপার।

সামন্ত যুগে বাংলা দেশ বা বাংলাভাষী অঞ্চল, কখনও এক ছিল না, অখণ্ড ছিল না। বাঙালি জাতি কিংবা বাংলা দেশ বলেও কিছু ছিল না। এই অঞ্চলের, এই ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে কোনো একক ঐক্যচেতনা বা জাতীয় চেতনাও ছিল না। সুতরাং সামন্ত যুগের বাংলা দেশ যখন বলা হয়, তখন আমাদের আজকের ধারণাই জনমনে চাপিয়ে দেওয়া হয়—আরোপ করা হয় ভিন্ন এক দেশ-কালের উপর। অর্থাৎ অতীতকে বিচার করা হয় বর্তমানের অগ্রসর ধারণা দিয়ে।

হাজার বছর আগে অবধি এই ভূভাগ বিভক্ত ছিল ছোটো ছোটো রাজ্যে জনপদ রাজ্যে। অনেকগুলো ছিল জনপদ রাজ্য। তাদের মধ্যে কতকগুলোর নাম পাওয়া যায়, location-এর কথা জানা যায় এবং কতকগুলো সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সেকালে ছিল এই ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বতন্ত্র আঞ্চলিক সত্তা। মানুষের চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা-অভিজ্ঞতা-আনুগত্য আবর্তিত হত নিজ নিজ অঞ্চলকে—বড়জোর রাজ্যকে কেন্দ্র করে। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের আগে আজকের বাংলাভাষী অঞ্চল কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল না। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘলেরা চট্টগ্রাম জয় করলে বাংলা একচ্ছত্র শাসনে আসে। আসাম কখনও জয় করতে পারেননি মুঘলেরা—যদিও আসামও ছিল বঙ্গভাষী অঞ্চল। কাজেই ব্রিটিশ শাসনের আগে গোটা বঙ্গ বা গোটা ভারত কখনও কোনো একক শাসনে ছিল না। আমরা জানি, একক শাসনে না থাকলে কখনও একক জাতি গড়ে উঠতে পারে না এবং কখনও গড়েও ওঠেনি ব্রিটিশপূর্ব আমলে। ১৮১৮ থেকে সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র ইত্যাদির প্রকাশ আরম্ভ হওয়ার আগে কোনো সর্ববঙ্গীয় সাহিত্যও ছিল না, কোনো সর্ববঙ্গীয় একক চিন্তা-চেতনাও ছিল না। সর্ববঙ্গীয় চিন্তার আরম্ভ ইংরেজ আমলের ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনাপুষ্ট সাহিত্যে—উনিশ শতকের প্রথম পাদ থেকে।

আমরা দেখেছি, ধর্মমঙ্গল রাঢ় অঞ্চলের বাইরে যায়নি। এখনকার বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু অংশের বাইরে কখনও ধর্মমঙ্গল রচিত হয়নি। আমরা দেখেছি মনসামঙ্গল পূর্ব বঙ্গের বাইরে কোথাও ক্বচিৎ লিখিত হয়েছে। আমরা ষোল শতকের চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ফলে দশ হাজার বৈষ্ণব পদ পেয়েছি, এবং তিন শ'র মতো পদকার পেয়েছি—দীনেশ সেন বোধহয় ২৮৭ জনের নাম সংগ্রহ করেছিলেন। এই কবিদের কারও বাড়ি প্রেসিডেন্সি এবং বর্ধমান বিভাগের বাইরে নয়। আমরা দেখেছি, এই যে মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল—এর একটাও পূর্ব বঙ্গে রচিত হয়নি। অতএব সারা বাংলাদেশটা ১৮১৮ সনের আগে পর্যন্ত খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। কাজেই আমরা বলতে পারি—যখন থেকে

কলকাতা শহর হতে পত্রিকা বের হচ্ছে—ইংরেজি শিক্ষিতরা বাংলাতে গল্প কবিতা প্রবন্ধ লিখছেন, তার আগে পর্যন্ত কখনও সর্ববঙ্গীয় সংহতিও ছিল না, সর্ববঙ্গীয় চিন্তা-চেতনাও ছিল না এবং কখনও সর্ববঙ্গের মানুষ পরস্পরকে আপনও ভাবতে পারেনি। যে পরিচয় থাকলে—হৃদ্যতা থাকলে-প্রশাসনিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক থাকলে আপনত্বের একটা দাবি গড়ে ওঠে, তা হয়নি। এখন যেমন বাংলাভাষী মাত্রকেই আমরা বাঙালি বলছি—যদিও বা আমরা এক গোত্রীয় নই, তেমনি-একচ্ছত্র শাসনে থাকলে যেমন হয়-এক সময় আমরা পাকিস্তানিও ছিলাম—আমরা পেশোয়ারের, খাইবার পাসের লোককেও চিনতাম-তার political মত-পথের সঙ্গেও পরিচিত ছিলাম এবং interested ছিলাম। কিন্তু ভারতবর্ষের ছিলাম না, যেহেতু তা ছিল অন্য রাষ্ট্র। অন্য রাষ্ট্র হলেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়—পর হয়ে যায়। কাজেই সামন্তযুগে সব সময়ই আমাদের দেশ ছিল আঞ্চলিক।

আমাদের ঐতিহাসিক সূত্রের শুরু মৌর্য যুগ থেকে। মৌর্যরা উত্তর বঙ্গের কিছু অংশ দখল করে রেখেছিল। পালেরা বাংলাদেশের খণ্ডাংশে রাজত্ব করেছে বটে কিন্তু বাঙালি নয়। যে কথাটা চালু রয়েছে, তা সত্য নয়। পালদের উত্থানও পাটনাতে-বিহারে, পতনও বিহারে। অবশ্য সেই বিহারের সীমা বোধহয় সে যুগে আমাদের রংপুর, দিনাজপুর, কুচবিহার অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই অঞ্চলটাতেই ছিলেন গোপাল। আর এতেই পালেরা পরিচিত হয়ে গেল বাঙালি বলে। আসলে পালেরা কখনও সমগ্র বাংলা দেশের ওপর রাজত্ব করেনি। পাল আমলকে বাংলার স্বর্ণ-যুগ বলা হয় বটে, কিন্তু পাল আমলে বাংলা দেশে পালদের তেমন কোনো অবদানের দৃষ্টান্ত আমরা পাইনে। পালেরা যদি শুধু বাঙালি হত, তাহলে পালদের আমলে বৌদ্ধ বিহারগুলো বাংলা দেশে হত। নালন্দা এখানে নয়, উড্ডীয়ানা এখানে নয়। শুধু মহাস্থানগড় এখানে, পাহাড়পুর এখানে। এগুলো, মনে করলে, বাংলাদেশের অন্তর্গত; আবার মনে করলে, সে যুগের বিহারের-অন্তর্গতও।

কাজেই মুঘল আমলের আগে—বিশেষ করে ইংরেজ আমলের আগে—উনিশ শতকের আগে—বাংলাদেশ-বাংলাভাষী অঞ্চল কখনও এক ছিল না, একক শাসনে ছিল না, ঐক্যবদ্ধ ছিল না। বাংলাভাষী অঞ্চলে বিভিন্ন রাজ্য ছিল, বিভিন্ন রাজা ছিল, বিভিন্ন রাজবংশ ছিল। জনসাধারণের আনুগত্যও ছিল বিভিন্ন রাজায় ও সংস্কৃতিতে। তারা পরিচিতও ছিল বিভিন্ন দৈশিক নামে। গোত্রীয় সর্ববঙ্গীয় কোনো সংহতিবোধ ছিল না, জাতীয়তাবোধ ছিল না-আধুনিক জাতীয় চেতনা থাকার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই আজকের আলোচনায় আমাদের ভৌগোলিক অবস্থার কথা ভাবতে হবে-প্রাকৃত-অবস্থায় এই ভূভাগের মানুষের জীবনের কথা ভাবতে হবে। আজকের মন নিয়ে সে কালের ঘটনা বিচার করতে গিয়ে আজকের অবস্থার সঙ্গে সে কালের অবস্থাকে গুলিয়ে ফেললে আমরা বিভ্রান্ত হব।

আমাদের সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য, দুই হাজার বছরের মধ্যে-অশোক শুদ্ধ ধরলে তেইশশো বছর হবে-এই তেইশশো বছরের মধ্যে আমরা বাঙালি বলে মাত্র এক স্বদেশী রাজার নাম শুনি। তিনি শশাঙ্ক। তাও অন্য মত আছে। শশাঙ্ক মুর্শিদাবাদে-কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করতেন। কেউ কেউ বলেন যে তিনি আসাম থেকে এসেছিলেন। এই একজনের নাম পাই। আর কারও নাম পাই না। তারপর অনেক পরে নাম পাই আমরা এক বিদ্রোহী সামন্তের, নাম দিব্যক। দিব্যক, রুদ্রক আর ভীম মানে তিন পুরুষ। এই দেখি। আর আমরা বাঙালি শাসক দেখি না। হুসেন শাহ সৈয়দ হলে বাঙালি হন না। সৈয়দ হলে বাঙালি হওয়া যায়—সে

যুগে তা হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। হুসেন শাহ্ হয় সৈয়দ হিসেবে সত্য, না হয় বাঙালি হিসেবে সত্য। আর এক বাঙালিকে জানি, যাকে বাঙালি বলে স্বীকার করলেও করা যায়, না-করলেও কোনো ক্ষতি হয় না-তিনি হচ্ছেন রাজা গণেশ। গণেশ ব্রাহ্মণ যদি হন, তাহলে বাঙালি হতেই পারেন না, বহিরাগত। তাঁর ছেলে যদু জালালুদ্দীন বা মহেন্দ্র এবং তাঁর পৌত্রসহ সবাই মিলে ১২/১৩ বছর রাজত্ব করেন। এ ছাড়া বাঙালি কখনও বাংলাভাষী অঞ্চলে ১৯৪৭-এর আগে রাজত্ব করেননি। ১৯৪৭ এর পরের ইতিহাস বলার দরকার হয় না, আপনারা জানেন।

বাঙালি চিরকাল বিদেশী-শাসিত—বিজাতি-শাসিত। বাংলা দেশের যেসব ধর্ম সেগুলোও বিদেশ থেকে আগত—হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম বিদেশ থেকে আসা,-উত্তর ভারত থেকে আসা, আরব থেকে আসা, এবং হিব্রু অঞ্চল থেকে আসে খ্রিস্টান ধর্ম। আমাদের ভাষাও হচ্ছে উত্তর ভারতীয়। আমাদের প্রশাসনও ছিল উত্তর ভারতীয়। কাজেই বাঙালির যে গৌরব এবং গর্ব আমরা করছি, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালির গৌরব—তার কোনোটাই বাঙালির কীর্তি বা কৃতি নয়। এইটাই হচ্ছে দুঃখের কথা। এই যে শিলালিপির বাহাদুরি আমরা করছি, বলছি যে আমাদের এখানে ব্যাবসা-বাণিজ্য উন্নত ছিল, আমাদের এখানে মুদ্রা পাওয়া গেছে, আমাদের এখানে সাহিত্যিক ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, বহু বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, ইত্যাদি অনেক কথা বলি, কেন? যারা এই দেশের অধিবাসী—সেই হাড়ি ডোম, চণ্ডাল, বাগদি—যারা শূদ্র, অস্পৃশ্য—তাদের কথা তো বাংলাদেশের ইতিহাসে লেখা হয়নি, তাদের কোনো অস্তিত্বও তো আজও পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি। বাঙালির ইতিহাস পূর্ণ অবাঙালি বহিরাগতের বিবরণ দিয়ে। বিদেশী-বিভাষী-বিজাতি-বিধর্মী যারা এখানে পরাক্রান্ত হয়ে এসেছে, যারা এখানে ধর্ম নিয়ে এসেছে, তাদেরই রাজত্বের কথা—তাদেরই বিদ্যাবুদ্ধির কথা—তাদেরই জ্ঞান-গৌরবের কথা, তাদেরই প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা আমরা আমাদের বলে দাবি করে গর্বে বুক স্ফীত করছি। যেমন একালের মুসলমানেরা বই লেখে, বই থেকে মুখস্থ করে, এবং মনে করে, যে তুর্কি-মুঘলেরা তাদের স্বগোত্র। তারা ভাবে, ফিরোজ শাহ্, শের শাহ্, আকবর, আওরঙ্গজেব, সিরাজুদ্দৌলা তাদের স্বজাতি, স্বগোত্র। এবং এদের শাসনকে নিজেদের রাজত্ব মনে করে তারা গর্বে বুক স্ফীত করে। এতে তারা আত্মপ্রতারণা করে, আত্মপ্রবঞ্চনা করে—মিথ্যা আস্ফালন করে। আমরাও বাংলা দেশের ইতিহাস যখন বলি—তখন মিথ্যা গর্বে গর্বিত হতে চাই। তাতে স্বদেশের, স্বজাতির আসল পরিচয় গোপন করে নানা কাল্পনিক কাহিনি দিয়ে মন ভরাতে চাই। কেন?

আজকাল যে কথাটা স্বীকৃত হতে যাচ্ছে, অর্থাৎ আমরা যদি অস্ট্রিক-মোঙ্গলদের বংশধর হই, তাহলে সেই অস্ট্রিক-মোঙ্গলেরা চিরকাল এ দেশে ছিল নির্জিত, নিপীড়িত। তাদের অধিকাংশ মানুষ এখনও নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের-অস্পৃশ্য। তারা কখনও মানুষ হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। তাদের মধ্যে যারা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গেছে তারা সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া ইত্যাদি। যারা এখানে ছিল তাদেরকে দেখছি দাস ও অস্পৃশ্য। এদের কিছুলোক উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন রকমে আসা লোকের সঙ্গে মিশে উচ্চ বর্ণের হয়েছে, শাসকশোষক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উনিশ শতকে কোনো কোনো বাঙালি যেমন স্বদেশকে ত্যাগ করেছে, বিলাতকে হোম মনে করেছে এবং সাহেব-ভদ্রলোক হওয়ার চেষ্টা করেছে, ওদের সমাজে ওঠার চেষ্টা করেছে, লর্ড-সিন্‌হা পর্যন্ত হয়েছে, ঠিক তেমনি তাদের

মধ্য থেকেও যারা কিছুটা বড়ো হয়েছে, মাথা তুলবার চেষ্টা করেছে, তাদের কিছু কিছু শাসকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারা জাত বদলিয়েছে, খানদান বদলিয়েছে। যেমন আপনারা জানেন—নিজেরাও দেখেছেন—আজকে শেখ, কালকে খন্দকার, পরশু কোরেশি, তারপরের দিন সৈয়দ, ইত্যাদি ব্যাপার এখনও চলছে। আজকে দাস, কালকে চৌধুরী বা মজুমদার, তার পরে দাশগুপ্ত, সেনগুপ্ত ইত্যাদি খানদান পরিবর্তন ও জাতে-ওঠার প্রবণতা আজও আছে—প্রবলভাবেই আছে। খানদান ওঠা-নামার ব্যাপার চিরকাল ঘটেছে। এর সবটাই যে কৃত্রিম, অন্য রকমেও বলতে পারি। এই দেশে শতকরা পঁচানব্বই জন ছিল বৌদ্ধ। সে সময়ে তাদের কোনো জাতিভেদ ছিল না। তারপর আবার যখন ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনর্জাগরণ হল, তখন সেন আমলে, নতুন করে বর্ণ বিন্যাস করা হয়েছে। কাজেই আমাদের ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত সমগ্র বর্ণ-বিন্যাসটাই হচ্ছে কৃত্রিম। অত্যন্ত কৃত্রিম। তার প্রমাণ বল্লালচরিতে আছে, কুলজীতে আছে, তার প্রমাণ জাতিমালা-কাচারিতে আছে। কাজেই আমাদের পরিপূর্ণ পরিচয়টা জানতে হলে, বুঝতে হলে, সর্বপ্রকার সংস্কার ও সংকোচ ত্যাগ করে আরম্ভ করতে হবে।

আমাদের বুঝতে হবে যে, 'বাঙালি-বাঙালি' 'বাংলাদেশী-বাংলাদেশী' করে চিৎকার করলেই আমাদের আত্মপরিচয় মিলবে না। আমাদের বুঝতে হবে বাংলাভাষী বিশাল ভূখণ্ডে সেকালে আঞ্চলিকভাবে জীবন গড়ে উঠছে, সমাজ গড়ে উঠছে, অর্থনীতি গড়ে উঠছে, শাস্ত্র গড়ে উঠেছে, ধর্ম গড়ে উঠেছে, রাজ্য ও রাজত্ব গড়ে উঠেছে, শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সামন্ত যুগে সর্ববঙ্গীয় বলে কোনো কিছুই ছিল না—সমাজ ছিল না, রাজ্য ছিল না, ধর্ম ছিল না-কোনো রকম সংহতিবোধই ছিল না। ধর্মের ক্ষেত্রেও হিন্দু আমলে সারা বাংলাদেশে একক দেবতার পুজো হয়নি। মনসার পুজো হয়েছে এক জায়গাতে, চণ্ডীর পুজো হয়েছে আর এক জায়গাতে, শিবের পুজো হয়েছে আর এক জায়গাতে, বিষ্ণুর পুজো হয়েছে আর এক জায়গাতে। এক ধর্মাবলম্বী হিন্দু সমাজ ব্রিটিশ পূর্বকালে সামন্তযুগে—বাংলাদেশে ছিল না।

অর্থনীতির দিক থেকেও সে-যুগে খণ্ড আঞ্চলিক রূপেরই সাক্ষাৎ পাই, কোনো একক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা পরিস্থিতির পরিচয় পাই না। যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা না থাকার ফলে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের অবস্থার কোনো মিল ছিল না। আজকের দিনে যেমন ঢাকার বাজার দর আর কক্সবাজারের বাজার দর মোটামুটি একই থাকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনীতির সম্পর্ক থাকে, তেমন অবস্থা সে কালে কখনও ছিল না। তবে ব্যবসায় বাণিজ্য অবশ্যই ছিল। কিন্তু সে দিনের ব্যবসা-বাণিজ্য আজকের মতো নয়। তার প্রকৃতি অনেক ভিন্ন। কোনো অঞ্চলই যেহেতু সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হতে পারে না, সে জন্যেই বিনিময়ের প্রচলন হয়েছিল, বিনিময়ের মাধ্যমও তৈরি হয়েছিল। কাশ্মীরের শালের সেদিনও দরকার হয়েছিল। এটা কমনসেন্সের কথা। এরজন্য প্রত্নতাত্ত্বিক মুদ্রা আবিষ্কার জরুরি নয়। আমাদের একটা প্রবণতা হল—সবকিছুকে একটা সর্ববঙ্গীয় রূপ দেওয়ার। বল্লাল সেন কিংবা লক্ষ্মণ সেন কিংবা ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ্‌র কালের কোনো বিশেষ স্থানের অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক কোনো একটি ঘটনাকে যখন সর্ববঙ্গীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তখনই সত্যের অপলাপ হয়—ইতিহাস বিকৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে সেকালের কোনো কিছুরই সর্ববঙ্গীয় রূপ দেওয়ার উপায় নেই।

আমাদের সংস্কৃতিক্ষেত্রেও সেই খণ্ডরূপ। এক অখণ্ড বঙ্গীয় সংস্কৃতি বলে সে যুগের সংস্কৃতিকে অভিহিত করবার কোনো উপায় নেই। এক অঞ্চলে যারা বাস করত তাদের সংস্কৃতিও এক হয়নি, হতে পারেনি। সমাজে নানা রকম ভেদাভেদ ছিল। দাস-প্রভুর ভেদাভেদ ছিল। সামন্তপ্রভু আর কৃষকের মধ্যে ব্যবধান ছিল। ধর্মভেদ ছিল। জাতিভেদ ছিল। অধিকারভেদ ছিল। পোশাকে-পরিচ্ছদে, খাওয়ায়-পরায়, চলায়-ফেরায়, কথায়-বার্তায়, চিন্তায়-ভাবনায়, জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে পার্থক্য ছিল। ভেদাভেদ ছিল। তার প্রমাণ 'চণ্ডাল সপচানান্তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ো' ইত্যাদি পাঁতি। মূল কথাটা হল, যারা চণ্ডাল, যারা ছোটলোক, নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য তারা গ্রামের মধ্যে বাস করতে পারবে না, গ্রামের বাইরে বাস করবে। দুই নম্বর, তারা পুরো চালের ভাত রেঁধে খেতে পারবে না, উচ্ছিষ্ট খাবে; যদি উচ্ছিষ্ট না পায় তবে তারা খুদ রেঁধে খাবে, ভাত রেঁধে খেতে পারবে না। পুরো কাপড়—নতুন কাপড় তারা পরতে পারবে না, তারা ছিন্ন বস্ত্র পরবে।—এগুলোর অধিকার ছিল না। আমি নিজে দেখেছি ১৯৪০-এর আগে সব লোকের জুতো পায়ে দেওয়ার অধিকার ছিল না। যেমন পিয়ন-চাপরাশির সাহেবের সামনে জুতো পায়ে দেওয়ার অধিকার ছিল না। ছোটো লোকে বড়ো লোকে ব্যবধান ছিল। গ্রামাঞ্চলেও ব্যবধান প্রখর ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে গেছে। পোশাকে-পরিচ্ছদে, রীতি-নীতিতে ভেদাভেদমূলক অনেক রীতি এখন উঠে গেছে। এগুলো আমরা নিজেদের চোখে দেখেছি। কাজেই সংস্কৃতির কথা যদি বলতে হয় তা হলে বলতে হবে যে, মানুষের সংস্কৃতিতে সেকালে বারো আনা প্রভাব ছিল ধর্মের এবং পার্থিব ও সামাজিক নিয়মের। প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে নরেন বিশ্বাস সংস্কৃতির সংজ্ঞা দেওয়ার একটা চেষ্টা করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমরা বলতে পারি, সংস্কৃতি হচ্ছে চেষ্টা দ্বারা অর্জিত আচরণ। মানুষ উৎকর্ষ অর্জন করতে চায়। উৎকর্ষ অর্জন করবার—Excel করবার—শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবার, সুন্দরতমকে পাওয়ার, মহত্ত্বে পৌঁছবার চেষ্টার পেছনেই মানুষের সংস্কৃতির অস্তিত্ব। এই সংস্কৃতির অধিকার লাভের জন্যে একটা দৈশিক অবস্থা চাই, একটা বৈষয়িক পরিস্থিতি চাই, একটা আর্থিক পর্যায় চাই, একটা রাষ্ট্রিক স্তর চাই, শৈক্ষিক স্তর চাই। তা না হলে সুন্দরতম অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি অশিক্ষিত, অনভ্যস্ত, কোনো উৎকর্ষ অর্জন করেনি, তাকে সুন্দর পোশাক পরিয়ে দিলেও তার সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা সহজেই চোখে পড়ে। আমার বাসার চাকুরেকে আমার পোশাক পরিয়ে দিলেও সে চলতে পারবে না। যে ব্রাহ্মণ নয়, যে মৌলানা নয়, তাকে ব্রাহ্মণের বা মৌলানার পোশাক পরিয়ে দিলেও সে সেভাবে চলতে পারবে না, cheat হিসেবে সে ধরা পড়বে কিংবা লোকে তাকে cheat বলবে। তখনকার দিনে ধর্ম দিয়ে, শাস্ত্র দিয়ে এবং এসব বিষয়ের জ্ঞান দিয়ে সাংস্কৃতিক মান নির্ণীত হত। শিক্ষা দিয়েও নির্ণয় করা হত। কিন্তু এসব অর্জনের জন্যে জন্মগত অধিকার দরকার হত। আর্থিক সংগতিও দরকার হত। জন্মগত অধিকার আর আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে জীবনে লাবণ্য ফোটাবার—সুন্দর চিন্তা করার এবং সুন্দর জীবন যাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হত। আমি যতই সুন্দর মনের অধিকারী হই, যদি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এমন হয় যে, আমার কোনো অধিকারই নেই, কিংবা যদি আমার কোনো আর্থিক সংগতি না থাকে, তাহলে আমার চেষ্টা ব্যর্থ হবে, আমার ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা আর্তনাদে পরিণত হবে। সে যুগে এটাই হয়েছে কোটি কোটি মানুষের বেলায়। ইচ্ছা করলেই মানুষ সংস্কৃতির চর্চা বা সাধনা করতে পারে না। সামাজিক, রাজনৈতিক,

নৈতিক, আর্থিক এবং প্রথা-পদ্ধতি, আচার-বিশ্বাস ইত্যাদি অনেক কিছুর বাধা থাকে। সে যুগের বাংলাভাষী এলাকা অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। আঞ্চলিক পার্থক্যের জন্যে সংস্কৃতিতে পার্থক্য ছিল, বৈচিত্র্য ছিল। ধর্মের পার্থক্যের জন্যেও পার্থক্য ছিল; হিন্দু-বৌদ্ধের সংস্কৃতি এক ছিল না, আর মুসলমানের ছিল আরও আলাদা। আবার সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর-ভেদের জন্যে সংস্কৃতিতে পার্থক্য ছিল। এই ঢাকা শহরেই নীলক্ষেত এলাকার সঙ্গে পুরোনো ঢাকার-লালবাগ-ইসলামপুরের-সংস্কৃতির পার্থক্য আছে। আবার গুলশান-ধানমণ্ডি ইস্কাটন-বেলিরোডের সংস্কৃতি অন্য এলাকার সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অবস্থা ও অবস্থানের পার্থক্যের জন্যে এই পার্থক্য। জাতিভেদেও সংস্কৃতির পার্থক্য ছিল। ব্রাহ্মণ-শূদ্র-আশরাফ-আতরাফে পার্থক্য ছিল। কাজেই সেকালের সংস্কৃতিকে ঢালওভাবে বাঙালি সংস্কৃতি বললে ভুল করা হয়। সেকালের রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষা, সাহিত্য, জীবনপদ্ধতি, ধর্ম—এসবের কোনোটারই জাতীয় রূপ কল্পনা করা যায় না। তা করতে গেলে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। ক্ষতি হবে।

আমাদের দেশের পরিচয় নিতে হলে—জিওপলিটিকাল পরিবর্তনের কথা জানতে হবে। এই ভূখণ্ডে রাজ্য, রাষ্ট্র, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্তন যুগে যুগে কী ভাবে হয়েছে—তা জনপদের যুগ থেকে আজকের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত—সবটা জানতে হবে। জাতি পরিচয়ে আমরা অস্ট্রিক-মোঙ্গলদের বংশধর—তা স্বীকার করতে হবে। এতে লজ্জার কিছু নেই। আত্ম-অবমাননা বোধ করবারও কিছু নেই। আত্মপ্রবঞ্চনা করে মিথ্যা পরিচয়ে বড়ো হবার চেষ্টা করলে আমরা বড়ো হতে পারব না। ছোটো হব।

অস্ট্রিক-মোঙ্গলদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। সেটাই চিরকাল বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা। তার প্রভাব থেকে বাঙালি কখনও মুক্ত হতে পারবে না। সে পরিচয় মুছে ফেলবার চেষ্টা করলেও মুছে দেওয়া যাবে না। বাঙালির চেতনায়, স্নায়ুতে, রক্তধারায় তা মিশে আছে—যুগ যুগ ধরে চলছে। সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র, দেহতত্ত্ব—এগুলো হচ্ছে বাংলার আদি মোঙ্গলদের দান, আর নারী দেবতা, পশু-পাখি ও বৃক্ষদেবতা, জন্মান্তর প্রভৃতি হচ্ছে অস্ট্রিকদের দান। এগুলোর মধ্যে মন-মানসিকতা ও মননের যে বৈশিষ্ট্য লুক্কায়িত আছে, তার প্রভাব থেকে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ কখনও মুক্ত ছিল না, আজও মুক্ত হয়নি, ভবিষ্যতেও হতে পারবে না। এ বৈশিষ্ট্য বাঙালির চরিত্রে ও জীবনে অন্তর্নিহিত। বাঙালি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, ইসলাম প্রভৃতি ধর্ম গ্রহণ করে নানা সম্প্রদায়ের রূপ লাভ করেছে বটে, কিন্তু কখনও সে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব ছাড়তে পারেনি। ফলে বহিরাগত প্রতিটি মতবাদ এখানে এসে নতুন রূপ লাভ করেছে। নতুন চরিত্র নিয়েছে। বাঙালি রূপ নিয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম এখানে মহাযানী-দেহতত্ত্বে ও দেব-ভাবনায় অবসিত, ব্রাহ্মণ্যধর্ম গীতি-স্মৃতি-সংহিতা বিরুদ্ধ লৌকিক দেব-পূজায় রূপায়িত, ইসলামও লোকায়ত রূপ পেয়ে পরিবর্তিত। এখানে এসে সব শাস্ত্রই বাঙালি চেতনার বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। পার্থিব জীবনে জীবিকার অরি-মিত্র দেবদেবী—মনসা, শীতলা, ওলাদেবী, সত্যনারায়ণ—হিন্দুর জীবন করছে নিয়ন্ত্রিত। তেমনি কেরামত আলির ও ওহাবি-ফরায়েজি মতবাদের প্রভাব ও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ধর্ম ছিল তাবিজে-কবজে-পিরে-দরগায় এবং সত্যপির-ওলাবিবি-খাজাখিজির সেবায় সীমিত।

নির্ভেজাল মানব-সংস্কৃতির কথা আমরা আজও ভাবতে পারি না। সম্প্রদায় চেতনার কূপমণ্ডূকতা আজও আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। বাঙালি সংস্কৃতির আলোচনা যখন শুনি,

তখনও মিথ্যা আস্ফালন আর অতীত নিয়ে অযথা গর্বে বুক স্ফীত করার চেষ্টা দেখতে পাই। ভাবটা এমন যেন সংস্কৃতি একটা জিয়াল মাছ। রক্ষা করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে জিয়াল মাছের মতো সংস্কৃতি রক্ষা করা যায় না। সংস্কৃতি বহতা নদীর মতো প্রবহমান—গতিশীল। নতুন নতুন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির প্রবাহ সচল থাকে। সেই চলমানতার প্রয়াস চালালে, নতুন সৃষ্টি দিয়ে কিংবা কল্যাণকর অনুকৃতি দিয়ে সংস্কৃতিকে সজীব রাখতে পারলেই আমরা কল্যাণবুদ্ধির পরিচয় দেব। সৃষ্টির ধারায় নতুনকে গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবীর সকল জাতির সকল রাষ্ট্রের মহত্তর যা কিছু, তা গ্রহণ করে নিজেদের সৃষ্টিশক্তিকে বিকশিত করতে হবে। অন্যথায় বাঙালি সংস্কৃতির গর্বে—শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টায় পেছনের দিকে তাকিয়ে থেকে—কোনো মঙ্গলের ভরসা নেই।

লোক-সংস্কৃতির মাহাত্ম্য কীর্তনের চেষ্টা দেখা যায় অনেকের মধ্যে। লোক সংস্কৃতি মানে কী? আমাদের দরিদ্র, পশ্চাৎপদ, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, জনসাধারণের এবং হাজার বছরের অতীতের সংস্কৃতিই লোক সংস্কৃতি। সেই অজ্ঞতাকে, সেই কুসংস্কারকে মহিমান্বিত করে আজ লাভ কী? এই বিজ্ঞানের যুগের দিকে পিছন দিয়ে অজ্ঞতা, অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা চালালে তার পরিণতি কী হবে? আমাদের অক্ষমতা ও দীনতাকে বড়ো করে কী লাভ? ঢাকা শহরে আমরা নিজেদের জন্য কামনা করছি বিল্ডিং, ফ্যান-ফ্রিজ-ফোন-সোফা ইত্যাদি; অথচ এই ঢাকা শহরেই যাত্রা, জারি-পিঠা, শিকা-তালের পাখা দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এর দ্বারা গণমানুষের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পায় না। আমরা নিজের জন্যে যা কামনা করি না, অন্যের জন্যে তা কামনা করা উচিত নয়। মাটির ঘর আর বেড়ার ঘরকে বড়ো করে দেখিয়ে নিজেদের জন্য এয়ার কণ্ডিশনের এই আয়োজনে প্রবঞ্চনা আছে—প্রতারণা আছে। গ্রামের মানুষ যে দুঃখে আছে, তা দেখে আমাদের কান্না পাওয়া উচিত। সে জায়গায় লোকসংস্কৃতির নামে এই প্রহসন করে-হাসির আর রঙ্গ-রসিকতার এই ব্যবস্থা করে লাভ কি? লোকসাহিত্য ধারা নষ্ট হয়ে গেল বলে বিলডিংএ থেকে এই দরদ দেখানো তো গণমানুষের প্রতি ব্যঙ্গ করারই শামিল। রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে এই প্রহসনে। লোকের নিঃস্বতার, দুর্ভাগ্যের, নিরক্ষরতার এবং সে সঙ্গে লোক সংস্কৃতির অবসান চাই আমরা।

ইতিহাস-চেতনা দিয়ে যদি আমরা উদ্বুদ্ধ হতে চাই তাহলে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে আমাদের। সেজন্যে আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা একটা নির্জিত জাতি, আমরা একটা পীড়িত জাতি। আমরা দুই হাজার বছর ধরে বিজাতি, বিভাষী বিদেশীদের দ্বারা পীড়িত হয়েছি, নির্জিত হয়েছি। আমাদের স্বগোত্র স্বজাতি আজও নিরন্ন, নিপীড়িত, নিম্নবিত্ত ও মানবিক-মৌলিক অধিকার-বঞ্চিত। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে-হাড়ি-ডোম-মুচি-মেথর-বাগদিরাই আমাদের স্বগোত্র, স্বজাতি, আমাদের ভাই। আমাদের দেহে তাদেরই রক্তের ধারা বহমান। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, সাঁওতাল, কোচ, গারো, খাসিয়া, চাকমা আমাদের ভাই। আমরা যারা আমাদের গোত্র পরিচয় মুছে দিয়ে আমাদের জাতি পরিচয় লুকিয়ে বিদেশী, বিভাষী, বিজাতি শাসক শ্রেণিতে মিশে যেতে চেয়েছি, শাসকের সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ করেছি, শাসকের পরিচয়ে আত্মপরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করছি, তারা ভুল করেছি, আত্মপ্রবঞ্চনা করেছি—তার জন্যে আমাদের দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে, আজও

হচ্ছে। এটা আমাদের উপলব্ধিতে না আসলে ইতিহাস চর্চা হবে অর্থহীন। মুসলমান হয়ে যারা তুর্কি-মোঘলদের জ্ঞাতিত্বের পরিচয় দিয়ে, আরবি-ইরানি পরিচয় দিয়ে, নামের সঙ্গে সৈয়দ কোরেশি ইত্যাদি লাগিয়ে জাতে ওঠার চেষ্টা করেছে তারা আমাদের বিভ্রান্ত করেছে,—আমাদের সর্বনাশ করেছে। তারা নিজেরা দুইকূল হারাবার অবস্থায় পৌঁছবে। কারণ মিথ্যা কুল-পরিচয়ে—নিজের বাপ-ভাইয়ের পরিচয়কে মুছে ফেলে-মিথ্যা খানদান পরিচয়ে—শেষ পর্যন্ত দাঁড়ানো যায় না। বাংলাদেশে যত সৈয়দ আছে, কোরেশরা যদি প্রত্যেকে চৌদ্দটা করে বিয়ে করত এবং প্রত্যেকের পঞ্চাশটা করে সন্তান হত তাহলেও বোধহয় এত হত না। ভেবে দেখুন আমরা কী মিথ্যা পরিচয়ে চলছি। গত আড়াই হাজার বছর ধরে যে-ই বাঙালি চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছে সে-ই বলেছে যে, বাঙালি চোর, মিথ্যাবাদী, ভীরু, কাপুরুষ, পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ ইত্যাদি। এর কারণ কী? কারণ আমরা পরাধীন ছিলাম। যে পরাধীন, যে দাস, সে তো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, মেরুদণ্ড ঋজু রাখতে পারে না, সামনা-সামনি কথা বলে ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে পারে না। তাতে নিজেদের মধ্যে ঈর্ষাপরায়ণতা ও কাপুরুষতা জাগে। স্বনির্ভর হয় না, ফিকিরে বাঁচতে চায় বলে চোর ও মিথ্যাবাদী হয়। সংঘশক্তি গড়ে ওঠে না। সংঘশক্তির জন্যে দরকার নতুন আত্মচেতনা। ইতিহাস যদি সেই আত্মচেতনা আমাদের মধ্যে জাগায়—অতীতের কলঙ্ক জয় করে যদি আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারি, তা-হলেই এইসব আয়োজনের সার্থকতা। নইলে মিথ্যা আস্ফালন আর জাতীয় গর্বে—বাঙালি গর্বে—আমাদের কল্যাণ নেই।

এত পীড়নের মধ্যেও বাঙালি টিকে আছে। বাঙালি জনসাধারণ গণশক্তির পরিচয় দিয়েছে। বাঙালি জনগণ সম্ভাবনাহীন নয়—সম্ভাবনাহীন হলে বাঙালি আজও টিকে থাকতে পারত না। বাঙালি সুস্থ এবং স্বস্থ হলে জয়ী হবেই।

কিন্তু আড়াই হাজার বছরের পরাধীনতার এবং দাসত্বের মনোভাব বদলাতে হবে। যে পরাধীন—পরাধীনতার মনোভাব যার প্রতি পদক্ষেপে—সে কখনও প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। বাঙালিকে মানুষ হতে হলে আত্মসম্মানবোধ এবং স্বাধীন মানুষের চেতনা অর্জন করতে হবে। মোনাফেকের স্বভাব ত্যাগ করে, পেছনে কথা বলার অভ্যাস ত্যাগ করে, কূর্মস্বভাব ত্যাগ করে, কালো পিপঁড়ের মতো, তাড়া খেয়ে লুকাবার স্বভাব ত্যাগ করে, মেরুদণ্ড ঋজু করে দাঁড়াতে হবে। বাঙালির চাই চরিত্র, চাই মনুষ্যত্ব, চাই মহত্ত্ব, চাই আদর্শপরায়ণতা, চাই মহৎ ও সুন্দরের জন্য সাধনা ও সংগ্রাম। এসব অর্জনের চেষ্টা করলে বাঙালির সুপ্ত শক্তি, অবদমিত শক্তি, আড়াই হাজার বছরের অবদমিত শক্তি জেগে উঠবে। বাঙালি পৃথিবীর বুকে মানুষ হয়ে দাঁড়াবে—প্রকৃত আত্মপরিচয় ঘোষণা করবে। তখন পৃথিবীকে জানাবার মতো একটা নতুন বাণী নিয়ে বাঙালি দাঁড়াবে।

বাঙালি নিজের মনের মতো না হলে কিছুই গ্রহণ করে না, কিছুই মানে না। শক্তি দিয়ে যারা মানায়, তাদের শক্তি পশুশক্তি। পশ্বাচার মানুষের কাম্য হতে পারে না। মানুষের সাধনা মনুষ্যত্বের সাধনা। সাধারণ বাঙালির মধ্যে এই সাধনা দুর্লভ নয়। বাঙালি গণমানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে—বার বার বিদ্রোহ করেছে—স্মরণাতীত কাল থেকে করেছে। পূর্ব বাংলার বাঙালিরা করেছে, পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা করেছে—অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু এই বাঙালির বিদ্রোহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে যারা বিজাতি,

বিভাষী, বিদেশীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তারাই বাঙালির সর্বনাশ করেছে। বিদ্রোহী বাঙালি পরাজয় মেনে নেয়নি। সাধারণ বাঙালি শাসিত হতে পারে, কিন্তু দাসত্ব মানেনি—তার অন্তর্নিহিত শক্তি বিকিয়ে দেয়নি। এই যে বিদ্রোহী বাঙালি, তার জয়ের সম্ভাবনা অফুরন্ত।

সংস্কৃতির কথা যখন আমরা বলি তখন মনে রাখতে হবে, সকলের সংস্কৃতি এক নয়। আমরা কার সংস্কৃতির বিকাশ চাই? কার উন্নতি চাই? দাসের এক সংস্কৃতি, গরিবের এক সংস্কৃতি, অস্পৃশ্যের এক সংস্কৃতি, হিন্দুর এক সংস্কৃতি, বৌদ্ধের এক সংস্কৃতি, মুসলমানের এক সংস্কৃতি। অন্যদিকে প্রভুর এক সংস্কৃতি, ধনীর এক সংস্কৃতি, ব্রাহ্মণের এক সংস্কৃতি, ধর্মব্যবসায়ীর এক সংস্কৃতি, মোনাফেকের এক সংস্কৃতি, প্রতারকের এক সংস্কৃতি, মিথ্যাবাদীর এক সংস্কৃতি। একদিকে জালেমের সংস্কৃতি, আর একদিকে মজলুমের সংস্কৃতি। আমরা কোন্ সংস্কৃতি চাই? আমরা কার পক্ষে? নাকি আমরা নিরপেক্ষ? নিরপেক্ষ তো ধূর্ত, কপট, মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, চালবাজ, সুবিধাবাদী, মোনাফেক, মক্কর। আমরা তাহলে কোন্ সংস্কৃতির প্রতিনিধি—জালেমের না মজলুমের?

ইতিহাসের আলোচনা থেকে এটাই আমাদের শিখতে হবে যে, আমাদের স্বস্থ হওয়া দরকার—আত্মপরিচয় নিয়ে দাঁড়ানো দরকার। বাংলাভাষী অঞ্চলের রাষ্ট্রসত্তার বিবর্তনের পরিচয় ভৌগোলিক পটভূমির আশ্রয়ে আমাদের বুঝতে হবে—ঐতিহাসিক প্রবণতা ও ইতিহাসের ইঙ্গিত আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। আমরা যদি একথা স্বীকার করার সৎসাহস অর্জন করি যে, আমাদের দেহে শেখ-সৈয়দ-কোরেশির রক্ত নেই, তুর্কি-মোগল-পাঠানের রক্তও নেই, আর্যরক্তও নেই—আমরা এই দেশের এই মাটিরই সন্তান, আমরা যদি মানতে পারি যে, আমাদের শতকরা ৭০ ভাগ অস্ট্রিক, পঁচিশ ভাগ মোঙ্গল এবং বাকি পাঁচ ভাগ হাবসি, তুর্কি, মোগল, আফগান, ইরানি ইত্যাদি সংকর রক্তে, এবং আমরা যদি উপলব্ধি করি যে, অস্ট্রিক, মোঙ্গল, হাবসি, তুর্কি, মোঘল, আফগান, ইরানি সব আজ এক দেহে লীন, এবং আমরা যদি বুঝতে চেষ্টা করি যে, আমাদের দেব-দেবী, ধর্মচিন্তা, আচার, অনুষ্ঠান, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি কোথা থেকে এসেছে এবং এগুলোর উৎস কোথায়, আদি কোথায়, তাহলে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব, এবং অনেক সমস্যারই সমাধান সহজ হবে। আর্যরক্তের গৌরব করার একটা প্রবণতা সারা ভারত জুড়ে আছে, বাংলার—বাংলাদেশের মুসলমানেরও আছে। যে মুসলমান নিম্নবর্ণের হিন্দু, বা বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে, সেও গর্বের সঙ্গে পরিচয় দিতে চায় এই বলে যে, ব্রাহ্মণের থেকে কনভার্ট হয়েছিল। যা কিছু ভালো, মহৎ, বড়ো, সবই আর্যের দান—এমন ধারণাও আজও প্রচার করা হয়। আর্য-সভ্যতা বা ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার ধারক বলে পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করার চেষ্টার আজও অন্ত নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে আর্যের অবদান কী? আর্যরা ঋগ্বেদের কিছু অংশ সম্বল করে পশ্চিমের পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। যেহেতু তারা সংখ্যায় অতি অল্প—সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার তুলনায় আর্য একেবারেই অল্প—কাজেই তারা তাদের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব ভারতীয় সমাজে রক্ষা করে চলতে পারেনি। যেমন মোগল, পাঠান, তুর্কি, কেউই ভারতে এসে নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারেনি, তেমনি আর্যেরাও পারেনি। এ-জন্যেই ঋগ্বেদের ধর্ম তারা রক্ষা করতে পারেনি। ভারতীয় সম্পদ তারা গ্রহণ করেছে, দখল করেছে। এতে আমাদের বাংলাদেশেরও দান

আছে। আমাদের নিজেদের সম্পদ সাংখ্য, তন্ত্র এবং যোগ তারা গোড়াতেই গ্রহণ করেছে—গ্রহণ না করে উপায় ছিল না। জন্মান্তরবাদ, প্রতিমা পূজা, মন্দির উপাসনা, পশু দেবতা, বৃক্ষ দেবতা ইত্যাদি বারো মাসে তেরো পূজা সবগুলোই আমাদের এখান থেকে তাদের নেওয়া। অতএব আর্য-ব্রাহ্মণ্য বললেই বড়ো হয় না। তারা শাসক বটে—কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতিটা আমাদের কাছ থেকে তারা নিয়েছে। অতএব এতেই আমাদের গৌরব যা আমরা চিরকাল এসবের উত্তরাধিকার রক্ষা করে চলেছি, লালন করে চলেছি। ভারতের অন্যত্র লিঙ্গায়েত, শাক্ত, শৈব, রামনামী ইত্যাদির যে কোনো এক দেবতার পূজা প্রচলিত। শুধু বাঙালিই সব দেবতার পূজা করে। তাই পঞ্চোপাসক বলা হয় বাংলার হিন্দু সমাজকে। আমাদের কৃতিত্ব হল এর সবগুলোই আমাদের দেবতা, আমাদের বানানো দেবতা—আমাদের প্রয়োজনে আমরা বানিয়েছি। আমাদের দেশী দেবতা। এইসব দেবতা বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধ নামে, ব্রাহ্মণ্য যুগে ব্রাহ্মণ্য নামে, মুসলমান যুগে মুসলমান নামে চালু ছিল। কালুরায় হিন্দুর কুমির-দেবতা-মুসলমানের কালুগাজি, তেমনি হিন্দু ও মুসলমানের বনদেবী-বনবিবি, ওলাদেবী-ওলাবিবি, সত্যনারায়ণ-সত্যপির প্রভৃতি সেব্য দেবতা। বাঙালি মুসলমান যে শতকরা পঁচানব্বই জন হাড়ি, ডোম, বাগদি, চাঁড়াল, মুচি, মেথর থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে তার প্রমাণ হচ্ছে, হিন্দুর মধ্যে উনিশ শতক পর্যন্ত যেমন নিম্ন বর্ণের লোকদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা কিছুই ছিল না তেমনই মুসলমানেরও ছিল না। ওরা যেমন দেবতার পূজা করে—নিম্নবর্ণের লোকদের দেবতা আলাদা, সেই রকম বাঙালি মুসলমানের দেবতাও আলাদা। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যেমন নিজেদের কৃতি ও কীর্তির স্বাক্ষর নিজেরাও রাখতে পারেনি তেমনি বাঙালি মুসলমানও পারেনি। বাঙালি মুসলমানেরা আজ অবধি সাতশো বছরেও একজন বাঙালি দরবেশ তৈরি করতে পারেনি। এ থেকে বোঝা যায়, আমরা কিছু করতে পারিনি, ফলে আমরা শুধু নিয়েছি। আমাদের দৃষ্টি এখনও আরব ইরান ইরাকের মরুভূমিতে ঘুরে, আমরা এখনও আমাদের ঐতিহ্য সন্ধান করি স্বধর্মীর সাহারায় ও গোবি মরুভূমিতে। সেই জন্যেই বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ইতিহাসে মুসলমানের দান ইত্যাদি নিয়ে আজও বাঙালি মুসলমানের গর্ব-গৌরবের অন্ত নেই। এই করে কোনো জাতি বড়ো হতে পারে না। নিজের জাত-জন্মের জন্য লজ্জিত হয়ে আত্মপরিচয় গোপন করে কুল-খানদানের মিথ্যা পরিচয় জোগাড় করে কোনো জাতি বড়ো হয় না—হতে পারে না। স্বরূপে জানতে হয় নিজেকে। 'জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো'—এই মনোভাব থাকতে হয়। ঐতিহ্য দিয়ে কি হয়। চোরের ছেলে চোর না হয়ে ভালো মানুষও হয়। আবার মহাপুরুষের ছেলেও কাপুরুষ অমানুষ হয়। ঐতিহ্য কী করে! মহাপুরুষের বংশধরদেরকে চিরকাল মহাপুরুষ করে তুলতে পারে না কেন ঐতিহ্য? এ প্রশ্নের উত্তর নেই। উত্তরের দরকারও নেই। আমাদের শুধু দরকার এই মনোভাব যে, আমাদের বাঙালিদের বড়ো হবার সম্ভাবনা ছাড়া কিছুই নেই—সব আমাদের করে নিতে হবে এবং সব আমরা করে নেব। ঐতিহ্য কী করে? ঐতিহ্য দিয়ে কী হয়? গ্রিসের অনেক ঐতিহ্য ছিল; কিন্তু তারা আজ কোথায়? রোমের অনেক ঐতিহ্য ছিল, কিন্তু তারা আজ কোথায়? শের শাহের কী ঐতিহ্য ছিল? আফ্রিকার কী ঐতিহ্য আছে? তাই বলে আফ্রিকা কি উঠবে না কোন দিন? ঐতিহ্য না থাকলে কী হয়? আমাদের কিছু নেই, কিন্তু সম্ভাবনা তো আছে? আমরা গড়ে নেব, চেষ্টা করব। কিন্তু আমাদের কিছু

আর্য, কিছু আরবি, কিছু ইরানি ইত্যাদি করে আমরা যেন আর আত্মপ্রবঞ্চনা না করি। আমাদের প্রাচীনযুগের ইতিহাস রচিত হবে জনপদ ভিত্তিক, মধ্যযুগের ইতিহাস হবে অঞ্চল ভিত্তিক, আধুনিক যুগের ইতিহাস হবে বাঙালির জাতিসত্তার চেতনা ও পরিচিতি ভিত্তিক। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য খুঁজব জীবিকা পদ্ধতিতে এবং সাংখ্য-যোগ্য তন্ত্রদর্শনে, মধ্যযুগে খুঁজব জীবন-জীবিকার অরি-মিত্র দেবকল্পনায় ও বিদেশীপ্রভাবে এবং আধুনিক যুগের ইতিহাসে সন্ধান করব ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-মনন-সংস্কৃতির প্রভাবের ব্যাপকতায় ও গভীরতায়। আত্মপ্রবঞ্চনা ত্যাগ করলে চেষ্টা করলে বাঙালি উন্নতি করবেই—এটা বিশ্বাস করি।

সুকান্ত অ্যাকাডেমির সেমিনারে প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতা

# সংস্কৃতির কথা

## কাজী আবদুল ওদুদ

মনে হয় মানুষ স্বভাবত পৌত্তলিক : কোনো বিশেষ প্রতিমা বিশেষ তত্ত্ব বিশেষ আচার বা বিশেষ ধরন-ধারণ—এ না হলে যেন তার চলতে চায় না। আর এরই সঙ্গে সঙ্গে সে পরিবর্তনপ্রিয়—তার প্রতিমাতত্ত্ব আচার বা ধরন-ধারণ ক্রমাগত বদলায়।

সংস্কৃতির কথাটা ইউরোপে প্রবল হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে নানা ধরনের বিপ্লব দেখা দেয়—ভাব-বিপ্লব, অর্থনৈতিক বিপ্লব, রাষ্ট্রিক বিপ্লব, সবই। সেই বিপ্লবের পরে উনবিংশ শতাব্দীতে আসে নতুন সংগঠনের কাল। সেই দিনে অতীতের ধর্মের স্থান দখল করে সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি বলতে বোঝা হয় এক বিশেষ সমন্বয়—খ্রিস্টান অখ্রিস্টান সমস্ত রকমের জ্ঞান ও উৎকর্ষ এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়—অতীতের শ্রেষ্ঠ ভাব-সম্পদের সমাহার। প্রথমে এর প্রবণতা হয় ব্যক্তিতান্ত্রিকতার দিকে—ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষই হয় এর প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ইউরোপে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন অনেক বেশি সক্রিয়, তাই অচিরেই এই ব্যক্তিতান্ত্রিকতার মোড় ফেরে সামাজিকতার দিকে।

ভারতবর্ষ চিন্তার দিক দিয়ে ইউরোপের অন্তত পঞ্চাশ বৎসর পেছনে পড়ে রয়েছে; ইউরোপের উনবিংশ শতাব্দীর ঢেউ ভারতবর্ষে যে এসে লাগবে বিংশ শতাব্দীতে এতে আশ্চর্য হবার তেমন কিছু নেই। সংস্কৃতির ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রবণতা আমাদের দেশে দুই চার বৎসর আগেও অত্যন্ত প্রবল ছিল। ভদ্রলোক হওয়া বা একটি ভদ্রপরিবার গড়ে তোলা এইই ছিল আমাদের দেশের শিক্ষিতদের লক্ষ্য। সম্প্রতি দেশে যে গণতান্ত্রিক শাসন-নীতি প্রবর্তিত হয়েছে আর সাম্প্রদায়িক বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছে তার ফলে আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনায় সমাজ-বোধ একটা বড়ো জায়গা করতে চাচ্ছে।

ভারতবর্ষের একালের সাংস্কৃতিক চিন্তার ইতিহাসে দুই জনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—একজন বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র অপরজন পাঞ্জাবের ইকবাল। এঁদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর চিন্তাশীলের জন্ম একালের ভারতবর্ষে হয়েছে, কিন্তু চিন্তা-নায়ক হিসাবে এঁদের মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে আর কেউ পারেননি। এঁরা দুজনেই চেয়েছেন প্রাচীন ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দিতে, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী রাষ্ট্রজীবন গঠন বলতে যা বোঝায় তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত এঁদের বাণীতে রয়েছে। মানুষ একই সঙ্গে স্থিতিশীল ও গতিশীল, আমাদের দেশের

লোক স্থিতিশীল কিছু বেশি—জীবনে নতুন নতুন পরীক্ষা করবার সুযোগ তাদের জন্য সংকীর্ণ বোধ হয় মুখ্যত এই কারণে। বঙ্কিমচন্দ্র ও ইকবালের চিন্তায় সনাতন স্থিতিশীলতার সঙ্গে কিছু গতিশীলতা যে মিশেছে, এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে তাঁদের জনপ্রিয়তার রহস্য। স্থিতিশীলতার আর গতিশীলতার এই যে অদ্ভুত মিশ্রণ আমাদের দেশের চিন্তায় ঘটেছে আমাদের একালের সংস্কৃতিগত চিন্তায় এই একটি গোড়ার কথা। কিন্তু সুচিন্তার কাজ হচ্ছে চিন্তার গ্রন্থির জটিলতা ঘুচিয়ে তাকে ঋজু করা—জীবনে কার্যকরী করা।

আমাদের জীবনে নতুন নতুন পরীক্ষার সুযোগ সংকীর্ণ—বিচিত্র ও দূরপ্রসারী এই ব্যাপারটির প্রভাব। এর ফলে যেমন কঠিন আমাদের পক্ষে মাত্রাজ্ঞান-সম্পন্ন হওয়া তেমনি দুর্নিবার আমাদের জন্য চরমপন্থিত্বের আকর্ষণ; যে-চিন্তার লক্ষ্য দীর্ঘাভিসারী কর্ম-পন্থা আমাদের কৌতূহল সহজেই তা থেকে হয় প্রতিনিবৃত্ত, আর যে চিন্তা আমাদের জন্য এনে দেয় ভাবোন্মত্ততা সহজেই আমাদের মন হয় তার দ্বারা বন্দী। এই প্রতিকূল পরিবেশ আর অব্যবস্থিত চিত্ত—বেশ বড়ো রকমের দুর্ঘটনা এসব আমাদের জীবনে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিতান্ত্রিকতা যে দুর্বল চিন্তা তা বোঝা কঠিন নয়। মানুষ বিশেষভাবে সামাজিক জীব। কাজেই যে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক উৎকর্ষের সামাজিক মূল্য কম তা যত সুদর্শনই হোক শেষ পর্যন্ত অদ্ভুত ভিন্ন আর কিছু নয়। অবশ্য একথা সত্য যে এক যুগে যার সামাজিক মূল্য কম অন্য যুগে তার সামাজিক মূল্য বেশি হতে পারে। কিন্তু এমন কতকগুলো ব্যাপার আছে স্বভাবতই যার সামাজিক মূল্য কম। মানুষের ইতিহাস বিচিত্র—বিচিত্র ভাবের মধ্য দিয়ে তার অভিব্যক্তি হয়েছে ও হচ্ছে। তাই যে-সব চিন্তা প্রকৃতপক্ষে জনহিতকর নয়, বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বা দলের চেতন বা অবচেতন স্বার্থবোধের অনুকূল মাত্র, অথবা ক্ষণিক খেয়াল, সে-সবের দিকেও মাঝে মাঝে নেতৃস্থানীয়দের প্রবণতা জন্মেছে।

সেকালের ধর্মের মতো একালের সংস্কৃতিরও মূল কথা হওয়া চাই সামাজিক উৎকর্ষ লাভ। আর যেহেতু সমাজের অর্থ একদিকে বিশ্বমানব-সমাজ অন্যদিকে বিশেষ বিশেষ দেশগত বা রাষ্ট্রগত সমাজ, সেজন্যে সংস্কৃতিও মূলত বিশ্বসামাজিক ও রাষ্ট্রিক। অন্য কথায়, যে চিন্তা জগতের অনেকের মনে অনুরণন জাগায় না এবং যার রাষ্ট্রিক সার্থকতা কম তা বাস্তবিকই স্বল্পমূল্য বা মূল্যহীন—হোক না তা অন্যভাবে যত অসাধারণ।

এই দিক দিয়ে দেখলে হিন্দু-সংস্কৃতি মুসলিম-সংস্কৃতি আর্য-সংস্কৃতি সেমীয়-সংস্কৃতি ইত্যাদি কথা যে দেশে উঠেছে সে-সবের মূলে সুচিন্তা যে তেমন কার্যকরী হচ্ছে না তা সহজেই বোঝা যায়। যদি হিন্দু ও মুসলমানের রাষ্ট্রিক জীবন সম্মিলিত হয় তবে তাদের সাংস্কৃতিক জীবন বিভিন্ন হতে পারে না, অন্তত সে-বিভিন্নতা অগ্রগণ্য হতে পারে না—হলে সংস্কৃতির যে একটি প্রধান লক্ষ্য সামাজিক অর্থাৎ রাষ্ট্রিক উৎকর্ষ লাভ তাই হয় ব্যাহত। হিন্দু-সংস্কৃতি মুসলিম-সংস্কৃতি এসব চিন্তা কিছু পরিমাণে কার্যকরী হতে পারে যদি হিন্দু ও মুসলমানের রাষ্ট্রিক জীবন স্বতন্ত্র হয়। কিন্তু যাঁরা হিন্দু-সংস্কৃতি মুসলিম-সংস্কৃতি ইত্যাদি কথা বলছেন তাঁরা ভারতবর্ষের অথবা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কথা তেমন ভাবছেন তা মনে হয় না।

সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশ্বজনীনতার কথা তোলা হয়েছে। চিন্তা চিরদিনই বিশ্বজনীন। আর একালে চিন্তার বিশ্বজনীনতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিভিন্ন দেশের মানুষ পরস্পরের

অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছে বলে। এই চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন নতুন সম্ভাবনার কথা আজ মানুষ জ্ঞাতসারে মনে স্থান দিচ্ছে, ফলে প্রাচীন চিন্তাধারা তার চিত্তকে আর বন্দী করে রাখতে পারছে না—যে সব দেশে প্রাচীন ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত বেশি সে সব দেশেও নয়। কাজেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচীন চিন্তার দোহাই একালে বাস্তবিকই অচল। সংস্কৃতি মানুষের শৌখিন পোশাক-পরিচ্ছদ নয়, তা তার জীবন-যুদ্ধের অস্ত্র—আর অস্ত্রের প্রাচীনতাই তার গৌরবের বিষয় নয়।

আমাদের দেশের একশ্রেণির চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই ব্যাপারের দিকে একটু বিভিন্ন দৃষ্টিতে তাকান। আমাদের বর্তমান শক্তিহীনতার কথা তাঁরা বোঝেন, আর বুঝে তাঁরা এই ভাবেন যে এ অবস্থায় 'আক্রমণের' চাইতে 'প্রতিরোধের' মনোভাব বরণ করাই আমাদের জন্য প্রশস্ত। এই প্রতিরোধ মুখ্যত তাঁদের জন্য কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন। কূর্ম যেমন বিপদ কালে নিজেকে গুটিয়ে নেয় তার আবরণের মধ্যে এঁরাও তেমনি আত্মরক্ষার প্রয়াসী হন দেশের বা সমাজের সনাতন ভাবধারার আশ্রয়ে। কিন্তু এই চিন্তাধারা খুব দুর্বল। কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন করে বিশেষ বিশেষ প্রাচীন সম্প্রদায় জগতের নানা স্থানে আজো টিকে আছে, কিন্তু তারা নাম পেয়েছে পিছিয়ে-পড়া-সম্প্রদায় অথবা বর্বর সম্প্রদায়। জগতে বাস্তবিকই তারা পিছিয়ে পড়েছে।—সাবধানতা সাধারণত একটি সদ্‌গুণ কিন্তু তা যদি হয় পরাজয়-স্বীকৃতির অন্য নাম তবে তার চাইতে দোষার্হ আর কিছু নেই।

বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতির সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে গিয়ে আমাদের এই ভূমিকার অবতারণা করতে হল। বাংলার মুসলমানের উৎপত্তির কথা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। তাতে দেখেছি বৌদ্ধ হিন্দু পাঠান আরব ইত্যাদি বিচিত্র উপাদানে এই সমাজ গঠিত। কিছুদিন পূর্বেও এই সমাজে দুটি শ্রেণি ছিল : একটি সম্ভ্রান্ত "আশরাফ", অপরটি সাধারণ "আতরাফ", এবং এই দুই শ্রেণির মধ্যে সামাজিক আদান প্রদান প্রায় ছিল না বললেই চলে—কতকটা হিন্দুর জাতিভেদের মতো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এমনি বিচিত্র সমাজ ও মত ভারতবর্ষের প্রশস্ত বুকে স্থান লাভ করেছে। ক্ষুদ্র-সংহতি-জীবনই মুখ্যত তাদের উপজীব্য হয়েছে, বৃহত্তর দেশ সম্বন্ধে চেতনা কদাচিৎ অনুভূত হয়েছে। এই যে একধরনের "যত মত তত পথ" অথবা "যত পথ তত মত" তত্ত্বের সূত্রে ভারতবর্ষের লোকদের জীবন গ্রথিত হয়েছিল তাতে কিছু শান্তি হয়ত ভারতীয় সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু যার অভাব ঘটেছিল তার নাম সচেতনতা। হাজার বৎসর পূর্বে আল্‌বেরুনি এটি লক্ষ করেছিলেন, আর আজো এটি কম লক্ষযোগ্য নয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনা সম্বন্ধে আমাদের একালের অনেক চিন্তশীলের এই যে এক সিদ্ধান্ত যে অনন্ত বৈচিত্র্যের ভিতরে একত্বের সন্ধান করতে হবে, এটি আংশিক ভাবেই গ্রহণযোগ্য। সত্য শুধু মানস ব্যাপার নয়, বিশেষ ভাবে সামাজিক ব্যাপার; বৈচিত্র্য কম হোক আর বেশি হোক তার ভিতরকার একত্ব হওয়া চাই সুদৃঢ়—সামাজিক অর্থে; আর ততখানি বৈচিত্র্যই স্বীকার্য যা এই সুদৃঢ় একত্বের অনুকূল। ফলের প্রাচুর্যে ডাল যদি ভেঙে পড়ে তবে তা ফল ও ডাল দুইয়েরই জন্য হয় অসার্থক।

বাংলায় মুসলমানের আবির্ভাব হয়েছে অন্তত সাত শতাব্দী পূর্বে। কিন্তু তার এই দীর্ঘ জীবনের ইতিহাস অতি সামান্যই আমরা জানি। যেটুকু জানি তাতে বলা যায়, তার "সম্ভ্রান্ত" ও "সাধারণ" শ্রেণির মধ্যে দুই বিভিন্ন রকমের মনোভাব ছিল। যাঁরা "সম্ভ্রান্ত" তাঁরা

প্রধানত অনুবর্তী ছিলেন ইসলামি সংস্কৃতি বলতে যা বোঝা যায় তার, আর যাঁরা "সাধারণ" তাঁদের জীবন সাধারণত চলত তাঁদের পূর্বপুরুষদের ধারায়। অবশ্য দেশের সমস্ত সমাজের উপরেই তখন প্রভাবশীল ছিল লীলা-বাদ এবং তার ফলে প্রত্যেক সমাজই মোটের উপর সন্তুষ্ট ছিল তাদের ভাগ্য নিয়ে। এমনি ভাবে দীর্ঘকাল কাটবার পরে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলার, লাভ হল ইউরোপের স্পর্শ। এই স্পর্শে প্রথমে দেশের যা লাভ হলো এক হিসাবে তা বহুমূল্য, কেননা হিন্দু-মুসলমান দেশের সব সমাজেই আত্ম-অন্বেষণে সক্রিয় হল এবং দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনেক মহিমময় ব্যক্তির আবির্ভাব হল।

কিন্তু অচিরেই দেশের মনোভাবে পরিবর্তন ঘটল। দেশ মুগ্ধ হয়েছিল ইউরোপের ভাবুক রূপের দ্বারা। কিন্তু ইউরোপের প্রভু-রূপের সঙ্গে তার পরিচিত হতে দেরি হল না এবং তার ফলে তার ইউরোপ-পূজা রূপান্তরিত হল ইউরোপ-বিদ্বেষে বা ইউবোপ-ভীতিতে। এই ইউরোপ-বিদ্বেষ বা ভীতির সঙ্গে দেশের একালের রাজনৈতিক চেতনা সম্বদ্ধ। সুতরাং আমাদের একালের সাংস্কৃতিক চিন্তারও গভীর যোগ এই বিদ্বেষ বা ভীতির সঙ্গে।

আত্মরক্ষার জন্য কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বনের উল্লেখ আমরা করেছি। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সাংস্কৃতিক চেতনা বলতে মোটের উপর বোঝেন এই কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন—বিপন্ন কূর্মের মতো অক্ষম আক্রোশ হয়ত তাঁদেরও এই চেষ্টার আনুষঙ্গিক। কিন্তু যাঁরা প্রধানত বিদ্বেষ পরায়ণ বা ভীত তাঁদের স্বাভাবিক মনুষ্যত্বে গ্লানি পৌঁচেছে—সুচিন্তা, অর্থাৎ কল্যাণপ্রসূচিন্তা, সেই অবস্থায় আর তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাঁদের সঙ্গে সংস্কৃতির মতো গুরু বিষয়ের আলাপ আলোচনা না করাই হয়ত শোভন। কিন্তু তাঁদের আত্মীয়স্থানীয় অপর একটি দল আছেন, তাঁরা সময় সময় চিন্তাশীল বলে আদৃত হবেন। তাঁরা বলতে চান—চিন্তা উচ্চাঙ্গের অথবা সারগর্ভ হলেই জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য হয় না, গ্রহণযোগ্য হয় তাদের অভ্যস্ত ভাবধারার অনুকূল হলে; এত কাল এদেশের লোকে বিভিন্ন সমাজে ও ধর্মে বিভক্ত হয়ে জীবন অতিবাহিত করে এসেছে, আজ যদি তাদের—তা যে প্রয়োজনেই হোক—বলা হয় যে তাদের সেই ভাবধারা তাদের জন্য আর কল্যাণপ্রসূ নয়, তবে তাদের বিহ্বল ও বিভ্রান্তই করা হবে বেশি, পথের নির্দেশ দেওয়া হবে মনে হয় না। এই শ্রেণির ভাবুকদের বড়ো ত্রুটি এইখানে যে, যে-চিন্তাকে তাঁরা জনসাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য জ্ঞান করেন সেটি—অথবা অন্য কোনো চিন্তাধারা—তাঁদের নিজেদের সহজবোধ্য হয়েছে কিনা সে-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হন তাঁরা কদাচিৎ। অথচ কে না জানে যে সার্থক প্রচার আমাদের দ্বারা তখনই সম্ভবপর যখন কোনো মত বা পথ আমরা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছি। মানুষের নব নব ইতিহাস নিয়তই রচিত হচ্ছে, আর রচিত হচ্ছে তাদের দ্বারা নয় যাঁরা কিছু বুদ্ধিমান কিন্তু দ্বিধান্বিত, পরন্তু তাঁদের দ্বারা সত্য ও কল্যাণকে বুঝবার চেষ্টায় যাঁদের ত্রুটি নেই সঙ্গে সঙ্গে যা তাঁরা সত্য ও কল্যাণকর বলে বুঝেছেন তাতে আত্মসমর্পণ করেছেন। সংস্কৃতির একটি সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে—সুন্দরের সাধনা। যাঁদের ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রবণতা বেশি তাঁদেরও এই সংজ্ঞা হয়ত মনঃপূত হবে। কিন্তু সুন্দর তো শুধু মোহকর নয়, সুন্দর বিশেষভাবে সত্যাশ্রয়ী—জগৎ ও জীবনের সঙ্গে তার যোগ যেমন দৃঢ় তেমনি তার গতি সার্থকতা লাভের দিকে। সত্যাশ্রয়িতা, অর্থাৎ সত্য উপলব্ধির চেষ্টা আর সার্থক হবার আকাঙ্ক্ষা, যাঁদের অন্তরের ধর্ম নয় তাঁরা জ্ঞানীও নন কর্মীও নন।

এই সত্যপ্রিয়তার দৃষ্টিভূমি থেকে যদি আমরা বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতির দিকে তাকাই তাহলে কী দেখব? দেখব—নানা দৈন্যে বাংলার মুসলমান জর্জরিত, আর্থিক দৈন্য তার যত তার চাইতে অনেক বড়ো তার ভাবের দৈন্য, সংকল্পের দৈন্য। মুসলমান হিসাবে প্রতিমা পূজায় আপত্তি জানিয়ে সে প্রকৃত জীবন অনেকখানি অস্বীকার করেছে; কিন্তু জীবনে বড়ো কথা 'অস্বীকার করা' নয় বরং বড়ো কথা হচ্ছে 'স্বীকার করা'—তার স্বীকার করা উচিত ছিল সজাগ-মানব-জীবন অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেমের জীবন—ইসলামের অর্থ কেবল তাই হতে পারে। কিন্তু তেমন করে স্বীকার সে কিছুই করতে পারে নি—যা স্বীকার করেছে অথবা করতে চেয়েছে তা তুচ্ছ আচার-পূজা ভিন্ন আর কিছু নয়।

তা অতীত যাই-ই হোক তার চাইতে বড়ো কথা বর্তমানের প্রয়োজন। সেই বর্তমানে তার অজ্ঞান ও অভাবাত্মক মনোভাব দূর হোক, সে স্বীকার করুক ভাবাত্মক মনোভাব—জাগ্রত আদর্শ। যে জ্ঞান ও প্রেমের জীবন তার স্বীকার করা উচিত ছিল সৌভাগ্যক্রমে তা শুধু তারই স্বীকার্য নয়, জগতের সবারই স্বীকার্য, জগতের বিভিন্ন দেশের বা বিভিন্ন সমাজের মানুষের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে বলে। সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিতে বৈশিষ্ট্য ও বিরোধ আজ প্রধানত অতীতের কথা। আজ বড়ো কথা সে-সবের প্রাণশক্তির সন্ধান যা থেকে সম্ভবপর হবে জাতিতে জাতিতে অথবা সমাজে সমাজে গাঢ়তর সহযোগিতা ও মঙ্গলতর ভবিষ্যৎ। মানুষের বিচিত্র সংস্কৃতির সেই প্রাণশক্তি আজ চিন্তার ক্ষেত্রে নাম পেয়েছে বৈজ্ঞানিকতা আর কর্মের ক্ষেত্রে নাম পেয়েছে সুব্যবস্থিত রাষ্ট্র-জীবন। একালে বাংলার মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনও প্রতিষ্ঠিত হবে সেই বৈজ্ঞানিকতা ও সুব্যবস্থিত রাষ্ট্রের ভিত্তির উপরেই।

দেশের হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের কথা এ ক্ষেত্রে সহজেই ওঠে। এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যাঁরা বলছেন, হিন্দু-মুসলমানের পৃথক রাষ্ট্র-জীবন ভিন্ন এর সমাধান নেই তাঁদের কথা বোঝা যাচ্ছে না এই কারণে যে রাষ্ট্র-জীবনের অর্থ হচ্ছে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রভূত-ক্ষমতা-সমন্বিত সংহতি-জীবন, কিন্তু ভারতবর্ষের মতো ভৌগোলিক অবস্থানের দেশে সেই ক্ষমতা সমস্ত দেশের পক্ষে লাভ হওয়াই সম্ভবপর মনে হয়, প্রদেশ-বিশেষের বা অংশ-বিশেষের জন্য তা একান্তই দুঃসাধ্য। আমরা যতটা ভাবতে পেরেছি তাতে মনে হয়েছে ভারতবর্ষের অথবা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা যদি নিজেদের কোনো রকমের সত্যকার উন্নতি চায় তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই, এবং এই জন্যই তাদের অতীত ও বর্তমানের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা সুসংগত হওয়া চাই তাদের জীবনের এই এক শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনের সঙ্গে। বলা বাহুল্য এই সম্মিলন বৈচিত্র্যহীন হতেই পারে না—কিন্তু বৈচিত্র্য যেন কদাচ বিপন্ন না করে একত্বকে। আজকার বিবর্ধিত বিরোধের দিনে এই চিন্তাধারা কারো কারো মনে হতে পারে অবাস্তব। এই 'বাস্তব'বাদীদের দৃষ্টি এই কঠিন বাস্তবতার দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত যে আজ পর্যন্ত এদেশের হিন্দু-মুসলমান যত মারামারি করেছে তাতে শক্তিতে শক্তিতে যোঝাযুঝির পরিচয় নেই আদৌ, আছে দুর্দৈব ও দুর্বুদ্ধির পরিচয় মাত্র। অবশ্য রোগভোগ দীর্ঘ দিন ধরে চললে তাকেই সময় সময় ভ্রম হয় স্বাভাবিক অবস্থা বলে। কিন্তু রোগ রোগই—তা কদাচ স্বাস্থ্য নয়।

হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জীবন ভিন্ন আর কিছু যদি এদেশে সম্ভবপর না হয় তবে হিন্দু-সংস্কৃতি মুসলমান-সংস্কৃতি আর্য-সংস্কৃতি সেমীয়-সংস্কৃতি এসব কথা হয়ে পড়ে দায়িত্বহীন,

এবং এসবের প্রচলন আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে যত কম হয় ততই মঙ্গল—ততই চিন্তার সৌখীনতা আমাদের ঘুচবে আর আমরা সত্যাশ্রয়ী হব। সার্থক সমাজ-সত্তার দিক দিয়ে বাংলার মুসলমান অথবা হিন্দু বাংলার অথবা বিশাল ভারতবর্ষের অংশ ভিন্ন যখন আর কিছু নয় তখন তার সাংস্কৃতিক জীবনের সার্থকতা লাভের পথ এই বিশাল সত্তার সঙ্গে তার গূঢ় যোগ উপলব্ধির ভিতর দিয়েই—ঝরণার সার্থকতা যেমন নদীর পুষ্টিসাধন করে—এ সত্য যত অকপট ভাবে স্বীকার করা যাবে ততই শক্তি ও শ্রী লাভের পথে আমরা অগ্রসর হব।

আজকার অসার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তর থেকে সার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তরে উপনীত হতে হলে যে সব ধাপ আমাদের অতিক্রম করতে হবে তার কিছু নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে এইভাবে :

(১) দেশে অভুক্ত ও কর্মহীন কেউ থাকবে না।

(২) একান্ত বীভৎস না হলে কোনো সমাজেরই ধর্মাচার অশ্রদ্ধেয় বিবেচিত হবে না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে যে—যা প্রাচীন তা প্রাচীন বলেই বরণীয় নয়, বরণীয় তার বর্তমান কার্যকারিতার জন্যে।

(৩) হিন্দু-মুসলমানের পোশাক ও নামের ব্যবধান থাকবে না অথবা অস্বীকার করা হবে।

(৪) সামাজিক আদান-প্রদান—বিবাহ-আদি সমেত—সর্বত্র সহজে হবে।

(৫) আইন সমস্ত দেশের জন্য এক হবে।

উৎস : চতুরঙ্গ, চতুর্থ বর্ষ, ১৩৪৮-৪৯

# বারোমাসে তেরো পার্বণ

## যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

### পর্ব

যে যেমন মানুষ, সে তেমন আনন্দ চায়। আনন্দ ব্যতীত কেহ বাঁচিতে পারে না। হিন্দুর জীবনযাত্রা আনন্দময় ছিল। তাহার বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল।

সংস্কৃত পর্বন্ হইতে পার্বণ। পর্বন্ শব্দের মূলার্থ গ্রন্থি, সন্ধি। ইহা হইতে এক অর্থ উৎসব। বারোমাসে তেরো পার্বণ, তেরো উৎসব। ঠিক তেরো নয়, অনেক। একখানা পাঁজি দেখিলে নানা দেবদেবীর পূজা ও নানাবিধ ব্রতের দিন পাওয়া যাইবে। পুরাণে এসকলের প্রমাণ আছে। স্মৃতিশাস্ত্রকার সেই প্রমাণে এক এক পূজার ও এক এক ব্রতের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এসকল ব্যতীত স্মৃতিবহির্ভূত পার্বণ আছে, সেসব আচার। কোন্ জাতির এত পার্বণ আছে? কোন্ জাতি এত উৎসবের আনন্দ ভোগ করে? কোনো দুইটি পার্বণ এক প্রকার নয়। এই কারণে পার্বণের আনন্দও এক প্রকার নয়।

পার্বণের তিন উদ্দেশ্য। পুরাণ ও শাস্ত্রকার বুঝিয়াছিলেন, মানুষ একই প্রকার নিত্যনিয়মিত কর্ম করিতে পারে না। সে নিত্যনিয়মিত কর্মের বিরাম চায়, কর্মের বৈচিত্র্য চায়। না পাইলে তাহার চিত্ত স্বভাবত চঞ্চল হয়, তাহার কর্মে শৈথিল্য আসে। দ্বিতীয়ত মানুষের ইন্দ্রিয়-গ্রাম বিষয়ের প্রতি নিরন্তর ধাবিত হইতেছে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ নিরন্তর উপভোগ করিয়াও তাহার তৃপ্তি হয় না। যতই ভোগ করে, তৃষ্ণা ততই বাড়িয়া যায়। তাহার সন্তোষ নাই। যাহার সন্তোষ নাই, তাহার শান্তিও নাই। লোকে বুঝে না, চিত্তের আশ্রয় চাই। শান্তির উৎস তাহার অন্তরেই আছে। প্রত্যহ না হউক, মাঝে মাঝে এক এক দিন সেই আত্মারামের ধ্যান করিতে পারিলে, দুর্বলের চির আশ্রয়, চির-শরণের সম্মুখীন হইতে পারিলে অশান্ত চিত্তে শান্তি আসে। যে সুখের পরিণাম আনন্দ, সে সুখই সুখ। সে সুখ শান্তি-সুখ। অনেক ভুগিয়া অনেক সহিয়া এক বৃদ্ধ বলিতেন, "দাদা, টাকায় সুখ নাই।" শাস্ত্রকার মোহাচ্ছন্ন মনকে বলপূর্বক বিষয় হইতে অন্য দিকে টানিয়া লইয়া যান। প্রত্যেক পার্বণে, প্রত্যেক উৎসবে ভগবৎচিন্তা আছেই আছে। যে যেমন অধিকারী তাহার জন্য তেমন ব্যবস্থা আছে। এমনটি আর কোনো জাতির নাই। খ্রিস্টান রবিবারে নিত্যকর্ম হইতে বিরত হন, সকাল-সন্ধ্যায় গির্জায় যান, ঈশ্বরচিন্তা ও আত্মচিন্তা করেন। কিন্তু প্রত্যেক রবিবারে সেই এক বিধি। অধিকারী অনধিকারী সকলের পক্ষেই সেই এক বিধি।

যে সে দিন পার্বণ হয় না। প্রত্যেকের দিন নির্দিষ্ট আছে। এই সকল দিন ইচ্ছামতো নির্দিষ্ট হয় নাই। বৎসরের যে যে দিন আমাদের জানিতে হয়, স্মরণ রাখিতে হয়, বাছিয়া বাছিয়া সেসকল দিনের সহিত পূজা ও ব্রতারম্ভ সংযোজিত হইয়াছে। ইহা পার্বণের তৃতীয় উদ্দেশ্য। আমরা সকল দিন-নির্দেশের হেতু বুঝিতে পারি না। সহজে কতকগুলির পারি, অনুসন্ধান করিলে আরও কতকগুলির পারি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কয়েকটি দিন নির্দেশের হেতু বলা যাইবে।

আচারের দৃষ্টান্ত সকলেই জানেন। পৌষ সংক্রান্তিতে পৌষলি পার্বণ বা পিঠা পরব। কত কষ্টের, কত যত্নের ধান্য গৃহাগত হইয়াছে। যে ধান্য গৃহস্থকে সপরিবারে জীবিত রাখিবে, সে ধান্য আসিলে তাহার আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত হয়। লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহার পূজা চাই, তাঁহাকে গৃহে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। গৃহিণী ধানের মরাই, গোলা প্রভৃতি খড় দিয়া বাঁধেন, পেঁটরাও বাঁধেন। আর ছেলেরা বলিতে থাকে, "আওনি, বাওনি, চাওনি। তিন দিন পিঠা খাওনি।।" লক্ষ্মীর আগমন ও বন্ধন হইয়াছে; তিনি গৃহে চিরদিন থাকুন, এখন এই প্রার্থনা (চাহনি)। যে সে পিঠা নয়, পুলি-পিঠা। যে পিঠার মধ্যে নারিকেলের পুর থাকে সেই পিঠা, পুর-পিঠা বা পুলি পিঠা। নূতন তণ্ডুল সুস্বাদু, নারিকেল-যোগে আরও সুস্বাদু হয়। কোনো পিঠা শৃঙ্গাটক (পানিফলের মতো), কোনো পিঠা স্বস্তিক (চতুর্ভুজ)। সে সময় নূতন আখের গুড়ও দেখা দেয়। তেমন স্বাদু ঝোলা গুড় (ফাণিত) অন্য সময় পাওয়া যায় না। প্রত্যেক বাড়িতেই পিঠা। কাহাকেও বলিতে হয় না, এই উৎসব করিতে হইবে। এইরূপ, অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে আশ্‌কে (আশুকিয়া) পিঠা, আশুধান্যের পিঠা। পূর্ববঙ্গে ইহার নাম চিতই পিঠা (স° চিতি, রাশি, স্তূপ)। ইহার পাক-প্রণালি ভিন্ন, আস্বাদও ভিন্ন। স্মৃতিতে ব্যবস্থা আছে, দেবতাকে নিবেদন করিয়া খাইতে হইবে। বৈদিককালের পুরোডাশ এইরূপ ছিল, কিন্তু প্রায়ই যবচূর্ণের হইত। আশুধান্য আশ্বিন মাসে পাকে। আশ্বিন মাসে আশকে পরব না হইয়া অগ্রহায়ণ মাসে কেন? কথাটা চিন্তনীয়। কোনো অতীতকালে অগ্রহায়ণ মাসে আশু ধান্য ফলিত কি? আশ্বিন মাসে শরৎ ঋতু আরম্ভ হয়। যে কালে অগ্রহায়ণ মাসে শরৎ প্রবেশ করিত, আশ্‌কে পরব কি সেই অতীত কালের স্মৃতি? গ্রামবাসীর পক্ষে পিঠা-পরব সামান্য ব্যাপার নয়। নগরবাসী পিঠা-পরবের আনন্দ হইতে বঞ্চিত।

রন্ধনীরও কর্মের বিরাম চাই। মাঝে মাঝে অরন্ধন ও ভোজ্যান্তর আছে। দশহরার দিন ভোজ্যান্তর। সেদিন দধি, দুগ্ধ, মুড়ি, মুড়কি ও আম-কাঁঠাল যোগে 'ফলার'। বোধ হয় পূর্বে খই, দই ও ফল ভক্ষণ নিয়ম ছিল। এই হেতু রাঢ়ে নাম খই-ঢেরা, শুদ্ধ নাম খই-ধারা। তার পর কোথাও শ্রাবণ সংক্রান্তিতে, কোথাও ভাদ্র সংক্রান্তিতে অরন্ধন। সেদিন মনসা পূজা। কোনো গৃহস্থের বাড়িতে উনান জ্বালা হয় না। পূর্ব রাত্রে অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া রাখা হয়। পরদিন তাহাই ভোজ্য। উনানে মনসার ডাল রাখিয়া দুগ্ধে স্নান করাইয়া মনসাপূজা হয়। কোথাও কোথাও মনসার প্রতিমা গড়িয়া পূজা হয়। পূর্ববঙ্গে শ্রাবণ মাসের ৫ই হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত সর্পালংকৃত অপক্ক ঘটে এবং শেষদিন প্রতিমায় পূজা হয়। মনসাদেবী বৃক্ষ-বিশেষে থাকেন। এই হেতু পশ্চিমবঙ্গে সে বৃক্ষের নাম মনসা হইয়া গিয়াছে। সে বৃক্ষের সংস্কৃত নাম সুহী, বাংলায় পাতাসিজ, পূর্ববঙ্গেও সিজ। কিন্তু সেখানে অরন্ধন নাই। দশহরাতেও অরন্ধন নাই। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন দিবাভাগে উপবাস, রাত্রে চিপিটক ও নারিকেল ভক্ষণ বিহিত। কিন্তু সে বিধি নামমাত্র পালিত হইতেছে।

অম্বুবাচী এক বিশেষ দিন। সেদিন বর্ষা-আরম্ভ। পৃথিবী রসসিক্তা হয়, রজঃস্বলা হয়, অশুচি হয়। তিনদিন অশৌচের পর বীজ বপন এবং যথাকালে বীজ হইতে ফলোৎপাদন হয়। এই তিনদিন কৃষক হলকর্ষণ করে না, ভূমিখননও করে না। বিধবা ও অনেক ব্রাহ্মণ অশুচি পৃথিবীর স্পর্শে অন্নপাক করেন না, ফলমূল খাইয়া থাকেন। বর্ষাহেতু বিল হইতে বিষধর সর্প বহির্গত হইয়া গৃহে, বিশেষত নির্জন নিম্ন-ভূমি পাকশালার উনানে আশ্রয় লয়। সর্পের পানের নিমিত্ত দুগ্ধ রাখা হইত, সর্প কাহাকেও দংশন করিত না। বিধি আছে, সর্পভয়-নিবারণের জন্য দুগ্ধপান কর্তব্য। মানুষে পান করিলে সর্পভয়-নিবারণ হইতে পারে না। পরে দেখা যাইবে, আমরা যেদিন অরন্ধন করি, সেদিন অম্বুবাচী হইত।

সরস্বতী পূজার পরদিন ষষ্ঠীতে পশ্চিমবঙ্গে পূর্বদিনের রাঁধা অন্নব্যঞ্জন খাইবার আচার আছে। আর পুত্রবতী নারী বাটনা-বাটা শিলে পিঠালির জলে যাইট নরমূর্তি লিখিয়া হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রে আবৃত করেন; ব্রাহ্মণ তাহাকে শীতলা ষষ্ঠী নামে পূজা করেন। পূর্ববঙ্গে এই আচার নাই। আমার বোধ হয়, এই দুই আচারই ভুলক্রমে চলিতেছে। এই ষষ্ঠীর নাম শীতলা ষষ্ঠী। ইহার অর্থ শীতল ভোজ্য গ্রহণের ষষ্ঠী না হইয়া শীতঋতু-আরম্ভের ষষ্ঠী হইতে পারে। বস্তুত শীতের দিনে পর্যুষিত অন্নব্যঞ্জন রুচিকর হইতে পারে না। স্কন্দ কার্তিকেয়, তাঁহার ছয় মাতা। তাঁহারাই ষষ্ঠী, ষষ্ঠি নয়। কিন্তু স্কন্দষষ্ঠী আর একদিন, এই দিন নয়। পূর্ববঙ্গে এই অরন্ধনও নাই। সেখানে সরস্বতীপূজার দিন এক জোড়া ইলিশমাছের ঝোল খাইতেই হয়। বিজয়া দশমীর দিন হইতে ইলিশ-ভক্ষণ বন্ধ ছিল। ইলিশমাছের ডিম হয়, এই কারণে এই কয়মাস ইলিশমাছ মারা হয় না। প্রয়োজনবশে আচারের উৎপত্তি হয়।

স্থানে স্থানে নানা প্রকার উৎসব আছে। সেসকল উৎসবে বহু লোক একত্র হয়। মনে পড়িতেছে, বাল্যকালে আরামবাগের অন্তঃপাতী বালি গ্রামে রাসোৎসব দেখিতে যাইতাম। এক জমিদার রাসোৎসব করিতেন। একটা পুরাতন তেলানিয়া পুকুরের সম্মুখের তিন পাড়ে সোলার কদমগাছ, আরও কত কী গাছ রোঁপিত হইত। সে-ই বৃন্দাবন। কার্তিকী পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্নায় বৃন্দাবনের অপূর্ব শোভা হইত। আর অপরাহ্নে পুকুরের মাঝখানে একটা মঞ্চের উপরে পুতুলনাচ হইত। দূরে পুকুরের আড়ায় বসিয়া কারিকর দড়ি টানিত। আর নারীমূর্তি নানাভঙ্গিতে নাচিত। চারি পাড়ের অগণ্য দর্শক হাঁ করিয়া দেখিত। রাত্রিতে যাত্রা হইত। কতদূর হইতে সহস্র সহস্র দর্শক ও শ্রোতা সে রাসোৎসব দেখিতে যাইত! একদিন নয়, তিনদিন। এইরূপে দেশের লক্ষ্মীমন্তেরা আনন্দদান করিতেন।

চৈত্র মাসে বারুণী। আরামবাগের এক ক্রোশ দক্ষিণে রাজা রণজিৎ রায়ের বিস্তীর্ণ দিঘি আছে। তাহার জলে সহস্র সহস্র নরনারী বারুণী স্নান করিত। সে বিস্তীর্ণ দিঘির চারিদিকের নির্মল জল ঘোলা হইয়া উঠিত। উঁচু পাড়ে অগণ্য দোকান বসিত। বাঁশের চারি খুঁটি, উপরে চাদর। নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হইত। গ্রামের কুলনারী হাটে যান না, নিজে দেখিয়া কোনো কিছু কিনিতে পান না। এই বারুণীর দিন পাড়ের দোকানে দোকানে দেখিয়া বেড়াইতেন; নিজের ইচ্ছামত দেখিয়া বাছিয়া জিনিস কিনিয়া লইয়া যাইতেন। কোথাও বটতলার বহির দোকান। ক্রেতার ভিড় হইয়াছে, একটু পড়িয়া দেখিতেছে। রামায়ণ, শতস্কন্ধ-রাবণবধ, দাশুরায়ের পাঁচালি, রুক্মিণী-হরণ, শিশুবোধক, অন্নদামের আরও অনেক প্রকার বই বিক্রয় হইত। কোথাও লোহার কড়া-বেড়ি-খন্তি, কোথাও তালা-চাবি-ছুরি-ছুঁচ, কোথাও মনিহারী দোকানে আরশি-চিরনি-কাঁকই-ঘুনসি, কোথাও ছেলেদের খেলনা ও পুতুল, তাল-

পাখা তালপাতার বোনা ও বাঁশের চাঁচের পাখা ইত্যাদি ইত্যাদি নিত্য-প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য সেখানে কিনিতে পাওয়া যাইত। তখনও বিলাতি জিনিস আসে নাই, সব দেশী। কেবল ছেলেদের জামার ছিট ও ঘড়ঘড়ি খেলনার টিন বিলাতি। স্থানে স্থানে ময়রা ভিয়ান করিত। পুরি-কচুরি নয়, ঘর হইতে মিঠাই ও নারিকেল সন্দেশ আনিত, আর সেখানে তেলে ভাজা গুড়ে়া ঝিলাপী করিত। এই ঝিলাপি যে কী সুস্বাদু হইত, এখন তাহা স্বপ্নেরও অতীত। তেল খাঁটি সরিষার নয়, তিলই বেশি থাকিত। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ঝিলাপি খাইতে ভালোবাসিতেন। নিশ্চয় তিনি এই ঝিলাপি খুঁজিতেন। ইহাই তাঁহার দেশের ঝিলাপি, বাল্যকালের ঝিলাপি। কত বর্ষীয়সী নাতির জন্য দুই-এক পয়সার ঝিলাপি কিনিয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেন। নাতি ছোটো, ঘরে আছে, আসিতে পারে নাই। কেহ নাতির জন্য খেলনা লইয়া যাইতেন। এইরূপ, যাহার যেরূপ সাধ, সে বারুণীর জাতে মিটাইয়া আসিত। দিঘির মাহাত্ম্যও কম নয়। নিকটে দ্বারকেশ্বর নদী। নদীতে স্নান নয়, সেই দিঘিতে স্নান। এক গ্রাম্য কবি দিঘির মাহাত্ম্যবর্ণনার এক গাথা রচনা করিয়াছিলেন।

আষাঢ় মাসে নিকটবর্তী সালেপুর গ্রামে রথ। লোকারণ্য হইত। রথ বড়ো। যে সে গ্রামে রথ থাকে না। নানা দোকান পাট বসিত। ছেলেদের পুতুল প্রচুর বিক্রয় হইত। পোড়া মাটির রং-মাখানো পুতুল, শিমুল কাঠের কুঁচবর্ণ লাটিম ও ছেলেদের সেই বর্ণের চুষিকাঠি বিক্রয় হইত। ময়রা চিনির রথ বিক্রয় করিত। কড়া পাকের চিনি ছাঁচে ঢালিয়া রথ করিত; খাইতে অতিশয় মিষ্ট। তেলে ভাজা গুড়ে়া ঝিলাপিও প্রচুর বিক্রয় হইত। তৎকালে পয়সার দাম বেশি ছিল। রথ দেখিতে দুই আনা পয়সা কম হইত না।

গ্রামে আরও উৎসব আছে। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে শিবের গাজন হয়। সকল শিবের হয় না। গ্রাম-যোলআনার শিবের হয়। সকল গ্রামে এই শিব নাই, গাজনও হয় না। লোকে মানসিক করে, কয়েকদিনের নিমিত্ত শিবের সন্ন্যাসী হয়। শিবের গাজন এক বৃহৎ ব্যাপার। ঢাক বাজিতে থাকে; প্রখর গ্রীষ্মে কড়াং কড়াং শব্দ করে। পাঁচ-সাত দিন ধরিয়া গ্রামে সাড়া পড়িয়া যায়। কোথাও কোথাও অপরাহ্ণে চড়ক হয়। পাশের দশ-পনেরো খানা গ্রামের লোক গাজন ও চড়ক দেখিতে আসে। শিবের গাজনের অনুকরণে কোথাও কোথাও ধর্মের গাজন হয়। শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হরকালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু "গাজন" শব্দ আসিয়াছে। ধর্মের গাজনে মুক্তির সহিত ধর্মের বিবাহ হয়। দুই বিবাহই প্রচ্ছন্ন।

যে কালের কথা লিখিতেছি, এখন আর সে কাল নাই। এখনও লোকে বারুণীর দিন দিঘিতে প্রাতঃস্নান করে, সালেপুরের রথযাত্রায় লোকের ভিড় হয়, কিন্তু সে প্রাণ আর নাই। সে পুরাতন রাসোৎসব অনেকদিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কমলা চঞ্চলা, একগৃহে চিরদিন থাকেন না। এখনও গাজন হয়। সন্ন্যাসী সূতার উত্তরীয় কণ্ঠে ধারণ করিয়া হাতে বেত্র লইয়া 'গাজন তোলেন'। ঢাকি তাহার ছোটো ঢাক ছিটের কাপড় দিয়া মুড়িয়া বকের পালকের হস্তিশুণ্ডাকার গজকা আঁটিয়া বাজায়। সবই হয়, হয়ও না। লোকের সে উৎসাহ নাই, আনন্দ-উপভোগের ক্ষমতা নাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণি দেশের যাবতীয় উৎসবের উদ্‌যোক্তা ছিলেন। তাঁহারাই গ্রামবাসীকে নানা প্রকারে আনন্দদান করিতেন। গ্রামবাসী তাহাদিগকে আপনজন মনে করিত। অল্পে অল্পে সে শ্রেণি অদৃশ্য হইতেছে। যাঁহারা অর্থোপার্জন করিয়া ধনবান হইতেছেন, তাঁহাদের সে কৌলিক ধারা নাই, দেবদেবীর পূজায় শ্রদ্ধা নাই। তাঁহারা

রামায়ণ ও ভাগবতপাঠ করান না; বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, দেবালয় প্রতিষ্ঠা ও পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা করান না। প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থই জানেন না। এখন নগরবাসী পতাকা লইয়া পথে পথে ভ্রমণ করেন এবং মনে করেন, উৎসব হইতেছে। আর, দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার সমাপ্তি হইতেছে। তাঁহারা জানেন না, উৎসব মাত্রেরই তিনটি অঙ্গ আছে। প্রথমে দেবার্চনা, তারপর কর্মের অনুষ্ঠান, অবশেষে ভুরিভোজন।

কত দেবদেবীর পূজা হইত, এখনও হইতেছে। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা ইত্যাদি হইতেছে। কিন্তু সে সে পূজায় ক্রমশ তামসিক ভাব আসিতেছে। শিল্পী প্রতিমা নির্মাণে ধ্যানের প্রয়োজন বুঝিতে পারেন না। ধ্যানে দুর্গাপ্রতিমা তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা। কিন্তু কলিকাতায় চম্পকবর্ণা দেখিয়াছি। নগরে কালীপ্রতিমার জিহ্বা অতিশয় দীর্ঘ। দেখিলে মনে হয় যেন একটা কৃত্রিম জিহ্বা মুখে পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই জিহ্বা লক্‌লক্ করিতে পারে না। কালীপ্রতিমা-নির্মাণ অতিশয় কঠিন, যে সে শিল্পীর কর্ম নয়। সেকালে পাঠশালার পড়ুয়ারা মাসে মাসে শুক্লাপঞ্চমীতে তালপাতার তাড়ি, বই ও দোয়াত-কলমে সরস্বতী পূজা করিত। এখন নগরে নগরে বৎসরে মাত্র একদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সরস্বতী প্রতিমার পূজা করে। তাঁহার হাতে পুস্তক, মস্যাধার ও লেখনী থাকে না, থাকে বীণা! ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে গন্ধর্ব বিদ্যা শিখিতে যায় না। অনেক কাল পূর্বে এক বিখ্যাত চিত্রকরের অঙ্কিত সরস্বতীর চিত্র দেখিয়াছিলাম। দীনা, শীর্ণা, কোটরনয়না, অবসন্নদেহা এক তরুণী বীণা বাজাইতেছেন। মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত রাত্রি জাগিয়া পড়িয়া পড়িয়া তাঁহার এই দশা হইয়াছে। সরস্বতী নিজে বিদ্যাভ্যাস করেন না, তপঃ- ক্লেশ করেন না। প্রসন্না হইলে তিনি বিদ্যাদান করেন। অবনতি একদিকে নয়, নানাদিকে ঘটিয়াছে।

এখনও গ্রামবাসী সহজ ও অনাড়ম্বরভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। এখনও শিল্পজীবী যন্ত্র রাখিয়া বিশ্বকর্মা পূজা করে, পোতবাহী নৌকায় গঙ্গাপূজা করে, গৃহস্থ গো-পার্বণ করে, ধানের রাশিতে লক্ষ্মী পূজা করে, কোথাও কোথাও প্রতি বৃহস্পতিবারে ঘটে পূজা করে। কিন্তু এই সহজ ভাব আর বেশিদিন নয়।

এখন বালিকারা ইতুপূজা ও পুণ্যপুকুর ব্রত করে না। পূর্ববঙ্গে মাঘমণ্ডল ব্রতের "আম-কাঠালিয়া পীড়িখানি ঘৃতে ম ম করে", সেই সুমধুর গীত ক্রমশ ক্ষীণ হইতেছে। নারী ষট্‌পঞ্চমীব্রত, কঠিন সাবিত্রীব্রত ও অনন্ত চতুর্দশীব্রত ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন আর কাহাকেও কঠিন চাতুর্মাস্যব্রত করিতে দেখি না। কদাচিৎ কেহ বর্ষাকালে গুড় ও অন্য প্রিয় খাদ্য বর্জন করেন। কিন্তু অনেক পুরুষও বৎসরে ছয়দিন উপবাস করেন।

"শোয়া ওঠা পাশমোড়া।
তার অর্ধেক ভীমে ছোঁড়া।।
ক্ষেপার চৌদ্দ ক্ষেপীর আট।
এই নিয়ে কাল কাট।।"

অর্থাৎ, চাতুর্মাস্যের শয়ন একাদশী, পার্শ্বপরিবর্তন ও উত্থান একাদশী, ভৈমী একাদশী, শিবরাত্রি ও দুর্গাষ্টমী, এই ছয়দিন উপবাস করিবে। সকল ব্রতেই দেহের কষ্ট আছে। মুসলমান রমজান মাসে রোজা রাখেন; দিবাভাগে জল পর্যন্ত স্পর্শ করেন না। রমজান বৎসরের সকল ঋতুতেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। প্রখর গ্রীষ্মকালেও আসে। তথাপি মুসলমান রোজা পালন করিয়া আসিতেছেন। নবরাত্র-ব্রতে (দুর্গাপূজার নয়দিন) নক্তভোজন বিহিত ছিল; কিন্তু মাত্র নয় দিন।

পূজা মাত্রই ব্রত, ব্রত মাত্রেই সঙ্কল্প প্রধান। ব্রতধারণ দ্বারা আত্মার প্রসন্নতা হয়, চিত্তের সংযম অভ্যাস হয়, ইষ্টের প্রতি একাগ্র ভক্তি এবং সমুদয় নরনারীর প্রতি উদার ভাব জাগ্রত হয়।

## পর্বের দিন

আমাদের পাঁজিতে যেসকল ব্রত ও পূজার দিন লিখিত হইতেছে, সেসকল দিন যদৃচ্ছাক্রমে স্থির হয় নাই। জ্যোতিষিক যোগ, বিশেষত স্মরণীয় যোগ ঘটিলে সেদিন কোনো ব্রত ব্যবস্থিত হইয়াছে। ব্রত মাত্রেই দেবার্চনা আছে, দেবার্চনা মাত্রই ব্রত।

'শারদোৎসবে' দেখিয়াছি, নবরাত্র ব্রতই দুর্গাপূজা। ব্রত-অন্তে নূতন শরৎবর্ষ আরম্ভ হয়। সেদিন বিজয়া দশমী। সেই প্রবন্ধে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা এবং ভীষ্মাষ্টমীর হেতু পাইয়াছি। শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা, কার্ত্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা ও ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোলযাত্রার উৎপত্তিও উল্লেখ করিয়াছি।

আমাদের যাবতীয় ধর্মকৃত্য চান্দ্রমাস, তিথি ও নক্ষত্র ধরিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে (পরিশিষ্ট পশ্য)। দুই পাঁচটা সৌরমাস সংক্রান্তি ধরিয়া হইয়াছে। সেসব আচার। মাস বলিলেই চান্দ্রমাস বুঝাইত। আমরা বঙ্গদেশে সৌরমাস ও সৌরমাসের দিন গণিয়া থাকি। কিন্তু ভারতের প্রায় তিন ভাগে চান্দ্রমাস ও তিথি গণনা প্রচলিত আছে। মাসে ৩০ তিথি। ১২ মাসে ৩৬০ তিথি। কিন্তু আরও ১১।১২ দিন না গেলে বৎসর পূর্ণ হয় না। পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা এক মাস। এই মাসের প্রথমে কৃষ্ণ, পরে শুক্লপক্ষ। এই কারণে এই মাস পূর্ণিমান্ত। উত্তর ভারতে সম্বৎগণনায় পূর্ণিমান্ত মাস চলিয়াছে। অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা, অমান্ত মাস। এই মাসের প্রথমে শুক্ল, পরে কৃষ্ণ পক্ষ। ভগবদ্‌গীতায় এই মাস ধরা হইয়াছে। আমরা বঙ্গদেশে এই মাস গণি, শকাব্দগণনায় অমান্ত মাস ধরিতে হয়। পূর্ণিমান্ত ও অমান্ত, এই দ্বিবিধ মাস গণনাতেই শুক্লপক্ষের মাস-নাম একই। কৃষ্ণপক্ষের মাস-নামে এক মাসের প্রভেদ হয়। যেমন, শ্রাবণ শুক্লাষ্টমী, উভয় পদ্ধতিতেই মাস নাম শ্রাবণ (চিত্র ২২ পশ্য)। কিন্তু কৃষ্ণাষ্টমী, অমান্ত গণনায় শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী এবং পূর্ণিমান্ত গণনায় ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী। অবশ্য শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী যে দিন, ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীও সেই দিন। কেবল মাস-নামে এক মাসের প্রভেদ। অতএব কৃষ্ণপক্ষের তিথির উল্লেখ করিতে হইলে মাস পূর্ণিমান্ত কি অমান্ত, তাহা বলিতে হইবে।

নক্ষত্রের নামে মাসের নাম হইয়াছে। অনুমান হয়, খ্রি-পূ ৩০০০ হইতে খ্রি-পূ ৩২৫০ অব্দের কালে চন্দ্রপথের ২৮টি নক্ষত্র চিহ্নিত হইয়াছিল। তখন নক্ষত্র শব্দে তারাময় আকৃতি বুঝিতে হইত। যেমন, অশ্লেষা বলিলে পঞ্চ-তারক শ্ব-পুচ্ছ আকৃতি বুঝিতে হইত; মঘা বলিলে পঞ্চ-তারক হলাকৃতি বুঝাইত। প্রত্যেক নক্ষত্রের যে তারাটি সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, সে তারাই সে নক্ষত্রের তারা। যেমন, শকটাকার রোহিণীর উজ্জ্বল, আ-লোহিত তারাটি রোহিণী তারা। হলাকৃতি মঘার উজ্জ্বল নক্ষত্রটি মঘা তারা। এইসকল নক্ষত্র সমান সমান দূরে অবস্থিত নয়। খ্রি-পূ ১৮৫০ অব্দে রবিপথ ২৭ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। এক এক ভাগের নাম নক্ষত্র এবং যে তারাময় আকৃতি যে ভাগের মধ্যে বা নিকটে ছিল, সে নক্ষত্রের নামে সে ভাগের নাম হইয়াছিল। তৎকালে কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা ইত্যাদি ২৭ নক্ষত্র-ভাগ কল্পিত হইয়াছে। অদ্যাপি আমরা সেই ভাগ ধরিয়া পাঁজি গণিতেছি। সে সময়ে চৈত্রাদি

মাস-নামও রচিত হইয়াছিল। যে মাসে চিত্রা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয় সে মাসের নাম চৈত্র। এইরূপে অন্যান্য মাস-নামও হইয়াছে। এসকল চান্দ্রমাস। কতকাল পরে চান্দ্রমাসের নাম দ্বারা সৌরমাসের নামও হইয়াছে, তাহা অজ্ঞাত। এখানে আমাদের সৌরমাসের উল্লেখের প্রয়োজন হইবে না। মাস বলিলেই চান্দ্রমাস বুঝিতে হইবে।

বৎসরে চারিটি দিন স্মরণীয়। দুই অয়নাদি (অয়নের আরম্ভ) দিন এবং দুই বিষুব-দিন। যেদিন সূর্য দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমন করেন, সেদিন উত্তরায়ণাদি। যেমন, ২২ ডিসেম্বর। সেদিন রাত্রি পরম দীর্ঘ, দিবা পরম হ্রস্ব। যেদিন সূর্য উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করেন, সেদিন দক্ষিণায়নাদি। যেমন ২১ জুন। সেদিন দিবা পরম দীর্ঘ, রাত্রি পরম হ্রস্ব। সেদিনই অম্বুবাচী, বর্ষা আরম্ভ ধরা হয়। পৃথ্বী জলসিক্তা হয়, এই হেতু নাম অম্বুবাচী। আর দুইদিন দিবা ও রাত্রি সমান হয়। সে দুইদিন বিষুব-দিন। বসন্তকালে যে বিষুব হয়, তাহা মহাবিষুব। যেমন ২১ মার্চ। শরৎকালে যে বিষুব হয়, তাহা জলবিষুব। যেমন ২২ সেপ্টেম্বর।

অয়নাদি পশ্চাদ্‌গামী হইতেছে। প্রায় সহস্র বৎসরে এক নক্ষত্রভাগ পিছাইতেছে। নক্ষত্র যেখানে, সেখানেই আছে। সুতরাং মাস যেখানে, সেখানেই আছে। কিন্তু অয়নাদি এবং সেহেতু ঋতু পিছাইতেছে। কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসরে একমাস পিছাইতেছে। রবিপথ দুই অয়নাদি ও দুই বিষুব স্থান দ্বারা চারিপাদে বিভক্ত হইয়াছে। এক এক পাদ অতিক্রম করিতে রবির তিন সৌরমাস লাগে। কিন্তু চন্দ্রের তিন মাসের দুই তিন তিথি অধিক লাগে। স্থূল গণনায় তিন মাস ধরা যাইতে পারে।

যে বৎসর পুষ্যা নক্ষত্র-ভাগের আদিতে দক্ষিণায়ন হইয়াছিল, সে বৎসরই শকমুখ (৭৮ খ্রি)। ২৪১ শক=৩১৯ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণায়নস্থান এক নক্ষত্র পাদ পিছাইয়া আসিয়া পুনর্বসুর তৃতীয় পাদে হইয়াছিল। সে বৎসরই গুপ্তাব্দ-মুখ। মহাবিষুব হইতে দক্ষিণায়নাদি ৯০°=৬দ° নক্ষত্র। কাজেই অশ্বিনীভাগের আদিতে মহাবিষুব হইত। তদবধি আমরা অশ্বিনী, ভরণী ইত্যাদি ক্রমে নক্ষত্র গণিতেছি। সে সময়ের পাঁজিই বর্তমানে চলিতেছে। বর্তমানে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ; ১৬৩০ বৎসর অতীত হইয়াছে।

২৪১ শকে =৩১৯ খ্রিষ্টাব্দে চৈত্রপূর্ণিমায় মহাবিষুব-দিন হইয়াছিল। মনে করি, সে সময় সৌরমাস-গণনা প্রচলিত ছিল। তাহা হইলে তখনকার ঋতুবিভাগ সৌরমাসে এইরূপ ছিল—

| | | | |
|---|---|---|---|
| চৈত্র-বৈশাখ | - | - | বসন্ত |
| জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় | - | - | গ্রীষ্ম |
| শ্রাবণ-ভাদ্র | - | - | বর্ষা |
| আশ্বিন-কার্তিক | - | - | শরৎ |
| অগ্রহায়ণ-পৌষ | - | - | হেমন্ত |
| মাঘ-ফাল্গুন | - | - | শিশির |

অর্থাৎ, চৈত্র সংক্রান্তিতে মহাবিষুব, আষাঢ় সংক্রান্তিতে দক্ষিণায়নাদি, আশ্বিন-সংক্রান্তিতে জল-বিষুব এবং পৌষ-সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণাদি। এই গণনা অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে, যদিও বিষুবাদি ২৩ দিন পিছাইয়া আসিয়াছে। ইহা হইতে পাইতেছি, এই এই সংক্রান্তিতে আমাদের যে সকল কৃত্য আছে, সেসকল ৩১৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ছিল কিনা সন্দেহ। শিবের

গাজন হইলে মাস ও তিথি ধরিয়া হইত, অরন্ধন ও পিঠা-পরবও মাস ও তিথি ধরিয়া হইত।

কয়েক বৎসর হইতে পূর্ববঙ্গে ও কলিকাতার কেহ কেহ পয়লা বৈশাখ নববর্ষোৎসব করিতেছে। তাহারা ভুলিয়াছে, বিজয়াদশমীই আমাদের নববর্ষারম্ভ। বৎসরে দুইটা নববর্ষোৎসব হইতে পারে না। পয়লা বৈশাখ বণিকেরা নূতন খাতা করে। তাহারা ক্রেতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ধার আদায় করে। ইহার সহিত সমাজের কোনো সম্পর্ক নাই। নববর্ষ প্রবেশের নববস্ত্রপরিধানাদি একটা লক্ষণও নাই।

৩১৯ খ্রিস্টাব্দে চৈত্র পূর্ণিমার দিন মহাবিষুব হইয়াছিল। অতএব স্থূল গণনায় ইহার তিন মাস পরে আষাঢ়-পূর্ণিমায় দক্ষিণায়নাদি, আশ্বিন-পূর্ণিমায় জল-বিষুব এবং পৌষ-পূর্ণিমায় উত্তরায়ণাদি হইত।

এই সময়ের কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্বে, খ্রি-পূ ১৮৫০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাবিষুব হইত। তখনকার ছয় ঋতু এইরূপ ছিল—

| | | | |
|---|---|---|---|
| বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ | - | - | বসন্ত |
| আষাঢ়-শ্রাবণ | - | - | গ্রীষ্ম |
| ভাদ্র-আশ্বিন | - | - | বর্ষা |
| কার্তিক-অগ্রহায়ণ | - | - | শরৎ |
| পৌষ-মাঘ | - | - | হেমন্ত |
| ফাল্গুন-চৈত্র | - | - | শিশির |

বৈশাখী পূর্ণিমার তিন মাস পরে শ্রাবণী পূর্ণিমায় দক্ষিণায়নাদি, ইহার তিনমাস পরে কার্তিকী পূর্ণিমায় জলবিষুব, ইহার তিন মাস পরে মাঘী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণাদি হইত। এই চারি পূর্ণিমাই প্রসিদ্ধ। বৈশাখী পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমা স্নান-দানাদির শুভ দিন।

## শ্রীকৃষ্ণের রাস, দোল ও ঝুলন যাত্রা

কার্তিকী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। সেদিন সূর্যরূপ কৃষ্ণ বিশাখা অর্থাৎ রাধানক্ষত্রে থাকেন। ইনি ব্রজের কৃষ্ণ। শ্রাবণী পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন। সেদিন শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন অর্থাৎ দোলন। এইরূপ মাঘী পূর্ণিমায় সূর্যের উত্তরায়ণ। সেদিন কৃষ্ণের দোলযাত্রা হইবার কথা। কিন্তু কী কারণে কে জানে, প্রাচীন ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে শ্রীকৃষ্ণের দোল হইতেছে। কোনো পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের এই তিন যাত্রার উল্লেখ নাই। রঘুনন্দনও (ষোড়শ শতাব্দ) ধরেন নাই। কিন্তু বৃহদ্ধর্মপুরাণ নামক উপপুরাণে পুষ্পপরাগ নিক্ষেপ দ্বারা দোলযাত্রা বর্ণিত আছে। বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের রাস বর্ণিত আছে। কিন্তু তাহার অনুকরণে লোকে রাসোৎসব করিত না। কৃষ্ণের রাস ও দোলোৎসব বোধ হয় তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন হইবে না। পূর্ববঙ্গের ভবানন্দের হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের দোলের উল্লেখ আছে। সে বই তিনশত বৎসরের অধিক পুরাতন হইবে না। ঝুলনযাত্রা আরও আধুনিক। শ্রাবণী পূর্ণিমায় অম্বুবাচী, ঘোর দুর্যোগ। সেদিন ঝুলন প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কিন্তু বিষ্ণুর দোলন অবশ্য হইত।

## জন্মাষ্টমী

কার্তিকী পূর্ণিমা হইতে গনিয়া গেলে শ্রাবণী পূর্ণিমায় নয় মাস পূর্ণ হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম গণনায় আরও আটদিন পরে অমান্ত শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে রবির দক্ষিণায়ন হইয়াছিল। সেদিন অম্বুবাচী ও কৃষ্ণের জন্মতিথি। সেদিনের তিথি শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমী, নক্ষত্র রোহিণী। পরিশিষ্টে প্রদত্ত গণিত সূত্র হইতে পাইতেছি, সেদিন রবি মঘানক্ষত্রে ছিলেন। অর্থাৎ মঘানক্ষত্রে দক্ষিণায়ন হইয়াছিল। অতএব ৩১৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী কল্পিত হইয়াছিল। সেই সময়ের মধ্যে রাস ও ঝুলনও হইয়াছিল।

## জ্যৈষ্ঠাদি চারি পূর্ণিমা

যজুর্বেদের কালেও (খ্রি-পূ ২৫০০) বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাবিষুব হইয়াছিল। অতএব তৎকালেও বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ বসন্ত বলিতে পারা যায়। ইহার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে, খ্রি-পূ ৪৫০০ অব্দে, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় বসন্ত হইয়াছিল। কিন্তু আষাঢ়ের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না; অনেক পরের কালে জ্যৈষ্ঠের উল্লেখ আছে। খ্রি-পূ ৩২৫০ অব্দে ধ্রুব, সূর্য ও রোহিণী-তারা একসূত্রে আসিলে মহাবিষুব হইয়াছিল। সেদিন জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইয়াছিল। এই হেতু এই পূর্ণিমার নাম জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা। যদি চন্দ্রের নিকট বৃহস্পতি থাকেন, তাহা হইলে পূর্ণিমা মহাজ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা। এককালে বৃহস্পতিবর্ষ নামে এক বর্ষ গণিত হইত; কোথাও কোথাও এখনও হয়। বোধ হয় এই সময় হইতে সে বর্ষ গণনার আরম্ভ হইয়াছে। ইহার তিনমাস পরে ভাদ্র-পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন, তাহার তিনমাস পরে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় জলবিষুব ও তাহার তিনমাস পরে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রবির উত্তরায়ণ হইয়াছিল। ঋতু ক্রমে ক্রমে পিছাইয়া পিছাইয়া যজুর্বেদের কালে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। এই সময়ে মাস-নাম দ্বারা ঋতু-বিভাগ ছিল না। থাকিলে ঋতু-বিভাগ খ্রি-পূ ১৮৫০ অব্দের মতো হইত।

জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা, ভাদ্র-পূর্ণিমা, অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমা ও ফাল্গুন-পূর্ণিমা, চারি পূর্ণিমাই স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে। সে সে দিন স্নানদানাদি বিহিত। জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। এইদিন কেন স্নানযাত্রা, তাহার কারণ থাকিতে পারে (পরে পশ্য)। ভাদ্র-পূর্ণিমা ও পরবর্তীকালের শ্রাবণ-পূর্ণিমার স্থানে ভাদ্র-ও শ্রাবণ সংক্রান্তি ধরিয়া স্থান-বিশেষে অরন্ধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সে সে দিন অম্বুবাচী। ঘোর বর্ষা।

## দশহরা

জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা অপেক্ষা জ্যৈষ্ঠ-শুক্লদশমী প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এইদিন দশহরা। রঘুনন্দন প্রমাণ তুলিয়াছেন, এইদিন এক সম্বৎসরের মুখ। আমরা সে বৎসর একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু বুঝিতেছি, ইহার পূর্বদিন মহাবিষুব হইত। নচেৎ সেদিন নববর্ষমুখ হইত না। যে বৎসর অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমায় জলবিষুব হইত, সেই বৎসর জ্যৈষ্ঠ-শুক্ল-নবমীতে মহাবিষুব সংক্রান্তি অবশ্য ঘটিত। কারণ, দুই বিষুব পরস্পর বিপরীত দিকে; ছয়মাসে প্রায় ছয় তিথির অন্তর পড়ে। গণিত দ্বারা জানিতেছি, খ্রি-পূ ৩২৫৬ অব্দে জ্যৈষ্ঠ-শুক্লনবমী কিংবা দশমীতে মহাবিষুব হইয়াছিল। বর্ষে বর্ষে এই যোগ হইতেছে, কিন্তু বর্ষে বর্ষে মহাবিষুব হয় না, সেই একবারমাত্র হইয়াছিল। এই কারণে তাহার পরদিন দশমী এক বিশেষ পুণ্যদিন। সেদিন গঙ্গাস্নান করিবে

এবং মাতৃস্বরূপা গঙ্গার নিকট কৃত দশবিধ পাপখ্যাপন করিবে। লোকে এই বিধির গুরুত্ব বুঝে না। মনে করে, গঙ্গাকে পাপ অর্পণ করিয়া সে শুদ্ধ হয়। কিন্তু এত সহজে পাপমুক্ত হইতে পারা যায় না। মনুতে বচন আছে, 'খ্যাপনেনানুতাপেন ইতি' (১১।২২৮), অর্থাৎ পাপকৃৎ নিজের পাপ খ্যাপন (কথন, জ্ঞাপন), পাপের জন্য অনুতাপ, তপস্যা এবং বেদাধ্যায়ন দ্বারা এবং আপৎকালে দান দ্বারাও নিষ্কৃতি লাভ করে। বস্তুত যে ব্যক্তি নিজকৃত পাপ মনে মনেও স্বীকার করিতে পারে, তাহার অনুতাপ জন্মে এবং সে আর সে পাপ প্রায় করিতে পারে না। পাপ বিদিত কিংবা অবিদিত। যে পাপ লোকে জানে, সে পাপ বিদিত। সে পাপের রাজদণ্ড আছে, প্রায়শ্চিত্তও আছে। যে পাপ আর কেহ জানে না, সেই অবিদিত পাপ অন্যের নিকট খ্যাপন করিতে হইবে। সংসারে একমাত্র মাতা আছেন, যাঁহার নিকট পুত্র নিজকৃত পাপ স্বীকার করিতে পারে। কারণ, "কুপুত্র যদিবা হয়, কুমাতা কদাপি নয়।" গঙ্গা মাতৃস্বরূপা মনে করিয়া তাঁহার নিকট পাপ স্বীকার করিতে হইবে। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পাপখ্যাপনের (কন্‌ফেশন) বিধি আছে। এক পাদরি এক নিভৃতগৃহে পাপস্বীকার শুনেন। উভয় স্থলে উদ্দেশ্য একই। কিন্তু নারী পরপুরুষের নিকটে কৃতপাপ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে পারে কি না সন্দেহ।

পাপ ত্রিবিধ—কায়িক, বাচিক ও মানস। অদত্ত দ্রব্যের গ্রহণ (চুরি), অবৈধ হিংসা, পরদারোপসেবা, এই ত্রিবিধ কায়িক পাপ। পারুষ্য, অনৃত বচন, পৈশুন্য (অন্যের অর্থহানির নিমিত্ত দোষখ্যাপন), অসম্বদ্ধ প্রলাপ, এই চতুর্বিধ বাচিক পাপ। পরদ্রব্যে লোভ, অপরের অনিষ্ট-চিন্তা ও অসত্যে অভিনিবেশ, এই ত্রিবিধ মানস পাপ। সেদিন কেবল গঙ্গার নিকট পাপখ্যাপন নয়, অনুতাপ করিতে হইবে; তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও দান করিতে হইবে। তপস্যার স্থানে উপবাস বিহিত হইয়াছে।

## গঙ্গার জন্ম

পুরাণে ও রামায়ণে গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গ হইতে গঙ্গাবতরণের কথাও আছে। গঙ্গা দুইটি। একটি স্বর্গে, স্বর্গঙ্গা, অপরটি পৃথিবীতে, ভাগীরথী। স্বর্গঙ্গা ছায়াপথ। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি সন্ধ্যার পর পূর্ব আকাশে স্বর্গঙ্গার উদয় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় উত্তর বিন্দু হইতে দক্ষিণ বিন্দু পর্যন্ত একটি দুগ্ধবর্ণ বলয়ার্ধ উঠিতে দেখা যায়। ইহা বিষ্ণুগঙ্গা। (অপরার্ধ অগ্রহায়ণ মাসে, ইহা শিবগঙ্গা)। উদয়ের নাম জন্ম। এই অর্থ বহু প্রাচীন। এই অর্থে প্রত্যহ সূর্যের জন্ম হয়। এই বলয়ার্ধের উত্তর সীমার একটু দূরে ধ্রুবমৎস্য নক্ষত্র। ইহার চারিদিকে সর্বোচ্চ স্বর্গে বিষ্ণুলোক। এই হেতু গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা। দক্ষিণে উজ্জ্বল আলোহিত জ্যেষ্ঠা তারা দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় এই স্বর্গঙ্গার উদয় হেতু জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা কল্পিত হইয়াছে। মনে করিতে হইবে, জগন্নাথদেব মন্দাকিনীতে স্নান করিতেছেন।

কিন্তু আমরা স্বর্গের মন্দাকিনী পাই না। তাহারই তুল্য পবিত্র ভূ-গঙ্গা পাইতেছি। আমরা ভারতভূমিকে মাতা বলি। সেইরূপ গঙ্গাও মাতৃস্বরূপা। এক উপাখ্যান আছে, ভগীরথ স্বর্গ হইতে এই গঙ্গা মর্ত্যে আনিয়াছিলেন! এখানে দুইটি উপাখ্যান মিশ্রিত হইয়াছে। একটি স্বর্গের গঙ্গার, অপরটি মর্ত্যের। ভগীরথ পার্থিব গঙ্গার স্রোত ধরিয়া সমুদ্র পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। এই গঙ্গা-আনয়নের উপাখ্যানে দুইটি বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ছায়াপথের দীপ্তির কারণ

কী? কবি বলিতেছেন, সগর রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্র তারকা হইয়া স্বর্গঙ্গা উৎপন্ন করিয়াছেন। কপিল মুনির ক্রোধাগ্নিতে সগরসন্তানগণ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। জাহ্নবীর জলস্পর্শে তাঁহারা স্বর্গে তারকা হইয়াছিলেন।

ভগীরথ রাজমহল পর্যন্ত আসিয়া সমুদ্র পাইয়াছিলেন। রাজমহল পাহাড়ে আগ্নেয়গিরি ছিল। এখনও তাহার চিহ্ন আছে। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডও তাহার আর এক প্রমাণ। উপাখ্যানে, সেখানেই কপিল মুনির আশ্রম ছিল। তৎকালে গঙ্গার মুখে একটা দ্বীপ জন্মিয়াছিল। সেখানে জহ্নুমুনির আশ্রম ছিল। সেই দ্বীপ বর্তমান মালদহ। জোয়ারের জলে সে দ্বীপ ডুবিয়া যাইত। জহ্নুমুনির আশ্রমও ডুবিত। তিনি ভগীরথের গঙ্গা পান করিয়া ফেলিলেন, পরে ভগীরথের স্তবে প্রীত হইয়া মুনি মালদহের দুই দিক দিয়া দুই স্রোত করিয়া দিলেন। মালদহ নামের অর্থ, যে দহ মাল (উচ্চ) হইয়াছে। নদীর মুখে দ্বীপ হইলে প্রবাহে বাধা পড়ে, কোলের দিকে শাখা বাহির হয়। সেই শাখা বঙ্গে ভাগীরথী।

কতকাল পূর্বের ঘটনা? তাহার মোটামুটি হিসাব করিতে পারা যায়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সূর্যবংশীয় রাজা বৃহদ্‌বল নিহত হইয়াছিলেন। ভগীরথ তাঁহার পূর্বপুরুষ। উভয়ের মধ্যে বাহান্ন পুরুষের ব্যবধান। বাহান্নপুরুষে ১৩০০ বৎসর। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খ্রি-পূ ১৪৪১ অব্দে। অতএব ভগীরথ খ্রি-পূ (১৪৪১+১৩০০) ২৭৪১ অব্দে ছিলেন। অতএব প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে মধ্যবঙ্গ জলময় ছিল। অসম্ভব নয়।

## ইন্দ্রপূজা

উপরে পাইয়াছি, এককালে জ্যৈষ্ঠ শুক্ল-নবমীতে মহাবিষুব হইয়াছিল। ইহার ৩ মাস ৩ তিথি পরে, অর্থাৎ ভাদ্র শুক্ল-দ্বাদশীতে রবির দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইয়াছিল। সে তিথির নাম বামন-দ্বাদশী। সেদিন ভারতের কোনো কোনো দেশীয় রাজ্যে ইন্দ্র-ধ্বজ-রোপণ নামক বৃহৎ উৎসব হয়। সে দিন রাজা অমাত্য ও প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইয়া এক দীর্ঘ ধ্বজ রোপণ করেন। ধ্বজের শীর্ষে এক দীর্ঘ পতাকা থাকে। কোন্ দিন রবির দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইবে, তাহা ধ্বজের ছায়া দ্বারা এবং বায়ু-প্রবাহের দিক্ পতাকা দ্বারা নির্ণীত হইত। বহুকাল পূর্বে চেদী দেশের রাজা উপরিচর-বসু এই উৎসব প্রবর্তিত করিয়া ছিলেন! অদ্যাপি বাঁকুড়া জেলার খাতড়া নামক স্থানে এই ইন্দ্রপূজা সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। পাঁজিতে ইহারই নাম শক্রোত্থান লিখিত হইতেছে। বিবাহের পূর্বে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের সময়ে গৃহ-ভিত্তিতে ঘৃতের 'বসুধারা' করা হয়। অভিপ্রায় এই, বিবাহের ফলস্বরূপ সন্ততিবর্গও যেন ধারার তুল্য বর্ধিত হয়। উপরিচর-বসুর নামানুসারে এই ধারার নাম বসুধারা।

## বারুণী

বারুণী-স্নানও বহুফলজনক। সেদিন অমান্ত ফাল্গুন-কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী। চন্দ্র শতভিষা নক্ষত্রে থাকেন। শতভিষা নক্ষত্রের অধিপতি বরুণ। এই হেতু শতভিষার এক নাম বারুণী। পরিশিষ্টে প্রদত্ত গণিতকর্ম দ্বারা পাইতেছি, সেদিন রবি উত্তর-ভাদ্রপদা নক্ষত্রে থাকেন। প্রচলিত দোলযাত্রার দিন রবি পূর্ব-ভাদ্রপদায় থাকেন। রবি ভাদ্রপদা নক্ষত্রে আসিলে পূর্বকালে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। সেদিন ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইত। ফল্গুনী দুইটি, ভাদ্রপদাও

দুইটি। বর্তমান প্রচলিত দোল যাত্রার দিন রবি পূর্ব-ভাদ্রপদা নক্ষত্রে থাকেন এবং চন্দ্র পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণ হয়। অতএব যে সময়ে পূর্ব-ফল্গুনীতে রবি আসিলে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত, এই দোলপূর্ণিমা তাহারই স্মৃতি। বারুণী ইহার এক নক্ষত্র পূর্বের, প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বের স্মৃতি। আরও সহজে বারুণীর উৎপত্তি বুঝিতে পারা যায়। দোল-পূর্ণিমার ১৩ তিথি পরে বারুণী। ১৩ তিথিতে চন্দ্র প্রায় এক নক্ষত্র অতিক্রম করেন। অতএব, দোলপূর্ণিমার সময় হইতে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বের স্মৃতি বারুণীতে পালিত হইতেছে।

## কোজাগরী পূর্ণিমা

উপরে দেখিয়াছি, ভাদ্র-পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন হইত, অর্থৎ সেদিন অম্বুবাচী হইত। ভাদ্র-পূর্ণিমা হইতে আশ্বিন-পূর্ণিমা এক মাস। অতএব আশ্বিন মাস বর্ষার প্রথম মাস ছিল। ভাদ্র-পূর্ণিমায় অম্বুবাচী হইবার অন্তত দুই সহস্র বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ খ্রি-পূ ৪৫০০ + ২০০০ = ৬৫০০ অব্দে, আশ্বিন-পূর্ণিমায় অম্বুবাচী হইয়াছিল। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা তাহারই স্মৃতি। এই কাল অন্য প্রকারেও পাইতে পারি। আশ্বিন-পূর্ণিমার দিন রবি অশ্বিনী হইতে চতুর্দশ নক্ষত্র পশ্চাতে অর্থাৎ চিত্রানক্ষত্রে অবশ্য থাকেন। অতএব পূর্বকালে চিত্রানক্ষত্রে রবি আসিলে দাক্ষিণায়ন হইত। বর্তমানে রবি আর্দ্রায় আসিলে দক্ষিণায়ন হইতেছে। আর্দ্রা হইতে চিত্রা নবম নক্ষত্র। অয়ন এক এক নক্ষত্র পিছাইতে প্রায় সহস্র বৎসর লাগে। অতএব অদ্যাবধি আট-নয় সহস্র বৎসর পূর্বের স্মৃতি পাইতেছি।

লক্ষ্মীদেবী বেদের ইলা বা ইড়া। অম্বুবাচী দিবসে তাঁহার জন্ম হইত। রঘুনন্দন ব্রহ্মপুরাণ হইতে এক উপাখ্যান তুলিয়াছেন। "নিকুম্ভনামে এক রাক্ষস যুদ্ধ করিয়া সেনার সহিত সেদিন বালুকা-সাগর হইতে আসে।" এই বালুকাসাগর নিশ্চয় শুভ্র বালুকাসাগর, ছায়াপথ। পুরাণে আছে, রাক্ষসেরা সাগর কিম্বা বিস্তীর্ণ জলরাশির নিকট বাস করিত। নিকুম্ভের সাগরও নিশ্চয় জলরাশি। আর সে জলরাশি স্বর্গঙ্গা। ইহারই নামান্তর ক্ষীরোদ সাগর। সে অপূর্ব কাহিনী ঋগ্বেদে আছে। সেখানে রাক্ষস নাই, অসুর আছে। ইন্দ্র সেই অসুরের সহিত অম্বুবাচীর দিন যুদ্ধ করিতেন। কোজাগরী পূর্ণিমাতে অম্বুবাচী হইত। এই কথাই পুরাণকার উপাখ্যানে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই হেতু কোজাগরী লক্ষ্মীকে চারি দিক-হস্তী স্নান করায়। সেদিন অরন্ধন; এই হেতু চিপিটক-নারিকেল-ভক্ষণ বিহিত।

## মহালয়া ও দীপালি

এ পর্যন্ত আমরা পূর্ণিমাই দেখিয়া আসিতেছি। অমাবস্যাতেও অনেক কৃত্য আছে। বিশেষত সেদিন পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ বিহিত। যে বৎসর ভাদ্রপূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন হয়, তাহার চতুর্থ বর্ষে অমাবস্যায় দক্ষিণায়ন হইবে। কারণ বর্ষে বর্ষে ১১.০৬ তিথি বৃদ্ধি হইয়া চতুর্থ বর্ষে ৪৪.২৪ তিথি হয়; অর্থাৎ একমাস ও একপক্ষ গতে অমাবস্যা আসে। অতএব, যেকালে ভাদ্রপূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন হইত, সেকালে ভাদ্র অমাবস্যাতেও হইত, কেবল চারি বৎসরের অন্তর। প্রাচীনেরা বিশ্বাস করিতেন, পুণ্যাত্মা পিতৃপুরুষগণ মৃত্যুর পরেই উচ্চ স্বর্গে গমন করেন ও দেবতাদের সহিত দেবলোকে বাস করেন। দেবলোক সদা আলোকময়। কিন্তু সকলের ভাগ্যে স্বর্গবাস হয় না। তাঁহারা দক্ষিণে অন্ধকার যমলোকে গমন করেন ও সেখানে বাস করেন। এই কারণে দক্ষিণ দিকে পা রাখিয়া শয়ন নিষিদ্ধ। দক্ষিণ হইতে

উত্তরে যাইবার পথ আছে। ধ্রুব ও দক্ষিণায়নাদি বিন্দু এক রেখা দ্বারা যোগ করিয়া সেই রেখা বর্ধিত করিলে, সেই রেখাই সে পথ। এই পথের নাম পিতৃযান। ইহা উত্তরে পিতৃলোকে যাইবার পথ। এইরূপ দেবলোকে যাইবার এক পথ আছে। ধ্রুব ও উত্তরায়নাদি বিন্দুর যোগরেখা বর্ধিত করিলে সে পথ হয়। ইহা দেবযান। কুরুকুলপতি ভীষ্ম দেবযান পথ পাইবার নিমিত্ত ৫৮ দিন শরশয্যায় শয়ান ছিলেন। অয়নাদি বিন্দু ক্রমশ পশ্চিমগামী হইতেছে, এই দুই পথও স্থান পরিবর্তন করিতেছে। এককালে ছায়া পথের এক অর্ধ পিতৃযান হইতে পারিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে সে অর্ধের উদয় হয়। সেই ঘটনা হইতে সে পথের নাম বৈতরণী হইয়াছিল।

অমান্ত ভাদ্রঅমাবস্যা মহালয়া। সেদিন পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃগণকে দীপ দেখাইতে হয়। অন্ধকার যমলোক হইতে তাঁহারা পিতৃযান পথে মহা-আলয়ে গমন করেন। এই কারণে মহালয়া দীপান্বিতা অমাবস্যা। অবিকল সেই কারণে আশ্বিন-অমাবস্যা দীপান্বিতা। সেদিন দীপালি। সেদিনও লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়। বঙ্গের গ্রামবাসী জানে, কেন সেদিন দীপদান ও ইঁজল-পিঁজল করে। পশ্চিম ভারতে যেমন গুজরাট ও বোম্বাই প্রদেশের লোকে জানে না। তাহারা কার্তিক-শুক্ল প্রতিপদে নূতন বৎসর গণে। এই কারণে মনে করে, দীপালি নববর্ষের পূর্ব রাত্রির উৎসব। যেকালে আশ্বিনপূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন হইত (অমান্ত) আশ্বিন অমাবস্যাও সেই কালের। খ্রি-পূ ছয় সহস্র বৎসর বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পাঠক ভাবিয়া দেখুন, কোন্ অতীত কালের স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন!

আমি বুঝিতেছি, অনেক পাঠক এই প্রাচীনতা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। তাঁহারা শুধাইবেন, আর্যেরা কি আট সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতখণ্ডে আসিয়াছিলেন? আর আশ্বিন মাসের শেষ দিকে বর্ষা নামিতে দেখিয়াছিলেন? অসম্ভব! আরও দশ-পনেরো সহস্র বৎসর পূর্বে কি হইয়াছিল, তাহা গণিত দ্বারা বলিতে পারি। কিন্তু গণিত দ্বারা বাস্তব প্রমাণিত হয় না। ঋগ্‌বেদের কালে ভাদ্র-আশ্বিন ইত্যাদি মাস নামই ছিল না।

আমি এখানে সম্পূর্ণ নূতন বৃত্তান্ত শুনাইতেছি; পাঠকের সংশয় স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি দেখিবেন, প্রত্যেক স্থলে প্রথমে তথ্য দিয়াছি। পরে তাহা হইতে কাল অনুমান করিয়াছি। কুত্রাপি গণিত দ্বারা তথ্য আনি নাই। পুনর্বার লিখিতেছি।

(১) বিষ্ণুপুরাণে (২।৮।৭১) ও বায়ুপুরাণে আছে, মেষান্তে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাবিষুব হইয়াছিল। ৩১৯ খ্রিস্টাব্দে মেষের আদিতে হইত। আমরা অদ্যাপি তাহা স্বীকার করিয়া আসিতেছি। এখন গণিত আসিতেছে। কত বৎসর পূর্বে মেষান্তে মহাবিষুব হইত? কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খ্রি-পূ ১৮৫০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে হইত। দেখিয়াছি, এই সময়ের পরে কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, রাস ও ঝুলনের দিনের হেতু মিলিয়াছে।

(২) কৃষ্ণ যজুর্বেদে অভিজিৎ লইয়া ২৮ নক্ষত্রের নাম আছে। এই সকল নক্ষত্র তারাময় প্রত্যক্ষ নক্ষত্র, নক্ষত্র-ভাগ নয়। ইহা হইতে এবং অন্য দুই তিন প্রমাণ হইতে পাইতেছি, যজুর্বেদের কাল খ্রি-পূ ২৫০০ অব্দের নিকটবর্তী। সে সময়ে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাবিষুব হইত। জিজ্ঞাসু পাঠক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (২য় সংখ্যা, ৪৬ বর্ষ) প্রকাশিত "বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়ে যজুর্বেদের কাল", এই প্রকরণ পড়িতে পারেন।

(৩) ইহার পূর্বে ঋগ্‌বেদের কাল চলিয়াছিল। আমরা ইহার আদি জানি না, কিন্তু মধ্য ও অন্ত জানি। এখানে বৈদিক গ্রন্থ হইতে তথ্য বিচার অসম্ভব। কিন্তু পৌরাণিক প্রমাণ

সুবোধ্য। পূর্বে দেখিয়াছি, এই সময়ের খ্রি-পূ ৪৫০০ হইতে ৩৫০০ অব্দের মধ্যে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ হইত। এই হেতু অগ্রহায়ণ মাস শরৎঋতুর প্রথম মাস হইতে পারিয়াছিল। পুরাণে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা ও দশহরার দিন পাইয়াছি। একটা কথা পাঠক সহজে বুঝিতে পারিবেন। জ্যেষ্ঠা এক নক্ষত্রের নাম কেন হইল? নিশ্চয় ইহা নক্ষত্র-চক্রের প্রথমে ছিল। জ্যেষ্ঠার পর মূলা। এই নক্ষত্রের নামও পুরাকালের সাক্ষী। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইলে জ্যেষ্ঠার পশ্চিমে চতুর্দশ নক্ষত্রে অর্থাৎ রোহিণীতে সূর্য থাকিতেন। তৎকালে রোহিণী, জ্যেষ্ঠা প্রভৃতি নক্ষত্র তারাময় আকৃতি বুঝাইত। ইহা হইতে গণিতক্রমে খ্রি-পূ ৩২৫০ অব্দে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় ও খ্রি-পূ ৩২৫৬ অব্দে জ্যৈষ্ঠশুক্লাদশমীতে মহাবিষুব পাইয়াছি।

(৪) যদি খ্রি-পূ ৪৫০০ অব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ হয়, তাহা হইলে অন্তত ইহার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে চৈত্রী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ হইত; অতএব আশ্বিনপূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন হইত। ইহা হইতে পাইতেছি, অশ্বিনীর চতুর্দশ নক্ষত্র পশ্চিমে চিত্রা নক্ষত্রে রবি আসিলে দক্ষিণায়ন হইত। এখন আর্দ্রা প্রবেশে দক্ষিণায়ন হইতেছে। আর্দ্রা ৬, চিত্রা ১৪ নক্ষত্র : ৮ নক্ষত্রের ব্যবধান। অতএব এখন হইতে অন্তত ৮ সহস্র বৎসর পূর্বের কথা। পুরাণে ইহার প্রমাণ, আশ্বিনী পূর্ণিমায় কোজাগরী ও আশ্বিন অমাবস্যায় দীপালি পাইতেছি। ঋগ্‌বেদে এই কালের প্রমাণ অবশ্য আছে। কিন্তু সেখানে অশ্বিনী ও চিত্রার নামগন্ধও নাই। নক্ষত্রগুলা আছে, অন্য নামে আছে। যাঁহার চক্ষু আছে তিনি দেখিতে পান, যাঁহার বর্ণজ্ঞান হইয়াছে তিনি পড়িতে পারেন। যে অন্ধ সে কী দেখিবে। যে বধির সে কী শুনিবে। ভারতের অতীত প্রত্যক্ষ হইয়া কথা কহিতেছেন। পুরাণ পুরাবৃত্ত। পুরাণকার যাহা দেখিয়াছিলেন, যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পাঠক ভাবিয়া দেখুন, কি সুকৌশলে পুরাণকার জনসাধারণের মনে ধর্মভাব জাগাইয়া রাখিয়াছেন এবং আমাদের পুরাতন ইতিহাস রক্ষা করিয়াছেন!

উৎস : পূজা-পার্বণ

# জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য

## সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালি জাতি, বাঙ্গালি সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পর্কে দুই-চারিটি কথা নিবেদন করতে চাহি।

'বাঙ্গালি জাতি' বলিলে, যে জন-সমষ্টি বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে বা ঘরোয়া ভাষা রূপে ব্যবহার করে, সেই জন-সমষ্টিকে বুঝি। বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালা-ভাষী জন-সমষ্টির মধ্যে দেশের জলবায়ু ও তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবন-যাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া, এবং মুখ্যত প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতের ভাব-ধারায় পুষ্ট হইয়া, গত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি, গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা-ই 'বাঙ্গালি সংস্কৃতি'। এবং এই সংস্কৃতি, বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি-কাল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত যে-সকল কাব্যে কবিতায় ও অন্য সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা-ই 'বাঙ্গালা সাহিত্য'।

এখন পাঁচ কোটির অধিক লোকে বাঙ্গালা ভাষা বলে।* সংখ্যা হিসাবে বাঙ্গালি জাতি নগণ্য নহে। গ্রেট-ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি—ইহাদের প্রত্যেকের অধিবাসীগণের চেয়ে বাঙ্গালি অর্থাৎ বাঙ্গালা-ভাষী জনগণের সংখ্যা অধিক। আমি এই বিষয়ে আমার দেশবাসীগণের ও অন্য লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি যে, ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ব্যক্তি মাতৃভাষা হিসাবে বাঙ্গালা বলে। অবশ্য, কেবল অন্যতম সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভাষা হওয়ায় বাঙ্গালার বা আর কোনও ভাষার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কিছু নাই; কিন্তু সংখ্যাধিক্য উপেক্ষণীয় বস্তু নহে; এবং সংখ্যাধিক্য ভিন্ন বাঙ্গালার সাহিত্য-গৌরবও অন্য পাঁচটি ভাষার মধ্যে বাঙ্গালার একটি প্রতিষ্ঠা আনিয়াছে।

এই যে কয়েক কোটি বাঙ্গালা-ভাষী যাহারা সারা বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া এবং বাঙ্গালার প্রত্যন্ত দেশ জুড়িয়া বাস করিতেছে, এবং কিছু কিছু বাঙ্গালার বাহিরে অ-বাঙ্গালিদের দেশে গিয়াও যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই পরস্পরের মধ্যে একটা ভাষা-গত স্বাজাত্য অনুভব করে। বিদেশে অন্য ভাষা-ভাষীদের মধ্যে গেলে, এই

* উপস্থিত কালে (১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে) সাড়ে সাত কোটির উপর লোকের মাতৃভাষা বাংলা। [বর্তমানে, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে, বাঙ্গালাভাষীর সংখ্যা চোদ্দ কোটির মতো।]

স্বাজাত্য-বোধটুকু আমাদের কাছে বিশেষ পরিস্ফুট হয়। আজ-কাল জাতীয়তা বা স্বাজাত্যের প্রধান আধার হইতেছে ভাষা। যেখানে বিভিন্ন ভাষা, সেখানে ধর্ম, মানসিক সংস্কৃতি, অতীত ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থান এক হইলেও, সম্পূর্ণ ঐক্য হওয়া কঠিন,—সম্পূর্ণাঙ্গ স্বাজাত্য-বোধ আসা একরকম অসম্ভব। বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে এমন একাধিক জনসমষ্টিকে, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কারণে একরাজ্য-পাশে বদ্ধ করা যায়; কিন্তু দেখা যায়, ভাষা-গত বৈষম্য থাকিলে, ওতপ্রোত-ভাবে মিল হয় না। রাষ্ট্রীয় বন্ধনে সঙ্ঘ-বদ্ধ বিবিধ ভাষা-ভাষী একাধিক জন-সমষ্টির মধ্যে একটি বিশেষ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা-স্বরূপ গ্রহণ করিলে, একতার সূত্র একটা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রান্তিক সত্তা বর্জন করিয়া সকলে মিলিত হইতে চাহে না বা পারে না। সম্পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে, দেশে মাত্র একটি ভাষাকে রাখিতে হয়,—অন্যগুলিকে হয় একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হয়, নতুবা নির্জীব ও ক্ষয়িষ্ণু করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ করিয়াই তবে গ্রেট-ব্রিটেনে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ঘটিয়াছে—স্কট্ল্যান্ডের গেলিক ও ওয়েলস্-এর ওয়েল্শ্-ভাষাকে বিলোপের পথে আগাইয়া দিয়া ইংরেজির প্রতিষ্ঠা ও সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজি ভাষাকে আশ্রয় করিয়া ব্রিটিশ একতা। ফ্রান্সেও এইরূপে দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রভাঁসাল ভাষাকে নির্জীব ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের ব্রেতঁ ভাষাকে ক্ষয়িষ্ণু ও মৃতকল্প করিয়া, ফরাসি ভাষার অবিসংবাদিত ও অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠার আসনেই ফ্রান্সের রাষ্ট্রগত একতা স্থাপিত হইয়াছে। বহুভাষাময় রুশ সাম্রাজ্যেও এই প্রকারে প্রান্তিক ভাষাগুলিকে পিষ্ট ও বিনষ্ট করিয়া দিয়া রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু রুশ সাম্রাজ্যে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়,—এক সময়ে রাজভাষা রুশের চাপে পোলীয় ভাষা, লিথুআনীয়, লেট্, এস্তোনীয়, ফিন্, আর্মানি প্রভৃতি ভাষার প্রাণসংশয় হইয়াছিল; কিন্তু রুশ সাম্রাজ্যের পতন ও উক্ত সাম্রাজ্যের খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এই সকল ভাষা যাহারা বলে তাহারা মাথা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে, নিজ-নিজ ভাষাকে অবলম্বন করিয়া ইহারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিয়া লইয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ঐক্যের প্রধান অন্তরায় মনে করিয়া, কেহ-কেহ হয়তো এগুলির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন ও ইহাদের স্থানে একমাত্র হিন্দির অবস্থান কামনা করিবেন; কিন্তু কার্যত তাহার সাধন করা অসম্ভব—এক কোটি, দুই কোটি, পাঁচ কোটি লোকের ভাষাকে এভাবে মারা যায় না। বিশেষত প্রান্তিক জনগণ যেখানে পৃথক্ প্রান্তিক সত্তা সম্বন্ধে সাত্মাভিমান হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে এরূপ কল্পনা করাও যায় না।

এই প্রান্তিক সত্তার প্রাণ-ই হইতেছে—প্রান্তিক ভাষা। এইজন্য বিভিন্ন প্রান্তিক ভাষা যাহারা বলে, তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা মানিয়া লইয়া, সম্পূর্ণ রূপে একীভূত রাষ্ট্রের পরিবর্তে, রাষ্ট্র-সঙ্ঘের গঠনকেই আদর্শ ধরিতে হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ হইয়াছে। রুশ সাম্রাজ্যের তাবৎ ভাষাকে এখন নিজ নিজ গৃহে স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া সমগ্র দেশ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষেও দাঁড়াইতেছে তাহা-ই। The United States of India, অর্থাৎ 'ভারতবর্ষের সংযুক্ত রাষ্ট্র'—ইহা হইতেছে ভবিষ্যৎ ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ। কংগ্রেস ভারতকে বঙ্গদেশ, আসাম, উৎকল, বিহার, হিন্দুস্থান বা সংযুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হিন্দুস্থানি মধ্যপ্রদেশ, মহাকোশল, মারাঠি মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, সিন্ধু, গুজরাট, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরল, কর্ণাট প্রভৃতি ভাষাগত প্রদেশে বিভাগ করিয়াছেন। এক-একটি প্রদেশে এক-

একটি ভাষা, এক-একটি ভাষা অবলম্বন করিয়া এক-একটি স্বতন্ত্র জাতি; সকলেই বৃহত্তর বৃত্তস্বরূপ ভারতবর্ষের অন্তর্গত, সকলেরই প্রাদেশিক বা প্রান্তিক সত্তা বা সভ্যতা প্রাচীন ভারতের সার্বভৌম ভারতীয় সত্তা বা সভ্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সকলকেই হিন্দি ভাষাকে 'রাষ্ট্রভাষা' বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; ব্যবহার করিতে হইবে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আসিয়া গিয়াছে; সকলেরই অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য ও অনপনেয়-সম্মিলনে আধুনিক কালের এক অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা।

বাঙ্গালি জাতির বা বাঙ্গালা দেশের সম্বন্ধে কিছু কথা বলিতে হইলে, ভারতবর্ষকে বাদ দেওয়া চলে না। ভারত হইতেছে সাধারণ, বাঙ্গালা হইতেছে বিশেষ। যাহা লইয়া বাঙ্গালির বাঙ্গালিত্ব বাঙ্গালির অস্তিত্ব, তাহার মধ্যে বেশির ভাগই ভারতবর্ষের অন্য জাতির মধ্যেও মিলে; ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেদের সঙ্গে সেইসব বিষয়ে বাঙ্গালিদের সমতা আছে। বিশেষের উপরে ঝোঁক দিয়া সাধারণকে ভুলিলে চলিবে না—সাধারণটাই যখন প্রধান। ভারতের সমস্ত-প্রদেশ-সুলভ একটা সাধারণ ভারতীয়ত্ব আছে, বাঙ্গালাও তাহার অংশীদার। অন্য দেশের সমক্ষে, ভারতের সমস্ত প্রদেশে বিদ্যমান এই ভারতীয়ত্বটুকু, ঈষৎ-পরিবর্তিত বিভিন্ন প্রাদেশিক রূপে তত্তৎ প্রদেশের বৈশিষ্ট্যের পর্যায়েই পড়ে। একটি বাহ্য ও সহজ ব্যাপারেই এইটি দেখা যায়। আমাদের চেহারায় একটা সাধারণ অনন্যদেশ-লভ্য ভারতীয়ত্ব বা ভারতীয় বৈশিষ্ট্য আছে; অন্য দেশের মানুষের তুলনায়, আমাদের দেশের যে-কোনো প্রদেশের মানুষের মধ্যে এই জিনিসটি পাওয়া যায়। গায়ের গৌর-বর্ণে, কিংবা শ্যাম-বর্ণে, মুখ-চোখের সমাবেশে, চাহনিতে, চলনে, বলনে, এমন একটা লক্ষণীয় জিনিস আছে, যাহা কেবল ভারতবর্ষেরই পরিচায়ক। অত্যন্ত গৌরবর্ণ পারসি অথবা কাশ্মীরি, অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি পাঞ্জাবি, খুব খাটো চেহারার এবং খুব কালো রঙের সাঁওতাল, প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় জনসঙ্ঘের মধ্যে কতকগুলি extreme type অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রতীক বাদ দিলে, যে-কোনো প্রদেশ হইতে হউক না কেন, সাধারণ ভারতবাসী জনকতককে ধরিয়া, তাহাদের দেহ হইতে কানের মাকড়ি, লম্বা চুল, গালপাট্টা, উড়ে খোঁপা, লম্বা টিকি, ফোঁটা বা বিভূতির ঘটা, মুসলমানি কায়দায় ছাঁটা গোঁফ, প্রভৃতি প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক লাঞ্ছন দূর করিয়া দিয়া, এক রকমের কাপড়-চোপড় পরাইয়া দিলে, তাহারা কোন্ প্রদেশের লোক তাহা বলা কঠিন হইবে। ইউরোপে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এ-জিনিস দেখিয়াছি, আমার মতো অনেকেও দেখিয়াছেন; এদেশেও লোকে অহরহ দেখিতেছি। ইংরেজি পোশাক-পরা সাধারণ ভারতীয় মানুষকে, যদি বাঙ্গালায় বা বাঙ্গালার বাহিরে রেলে বা অন্যত্র দেখি, তাহা হইলে জোর করিয়া বলা কঠিন হয়—লোকটি কোন্ প্রদেশের; লোকটি বাঙ্গালি হইতে পারে, না-ও হইতে পারে, এ বোধও আমাদের আসে। আকারে যেমন, প্রকৃতিতেও তেমনি—বাঙ্গালি ভারতীয়-ই বটে। বাঙ্গালি তাহার আধুনিক সংস্কৃতিতে হয়তো চার আনা ইউরোপীয়,—তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে সে কতটা ইউরোপীয় হইবে,—এবং আট আনা ভারতীয়; বাকি চার আনায় সে বাঙ্গালি, এবং এই চার আনার মধ্যে আবার অনেকটা ভারতীয়ত্বের বাঙ্গালা বিকারমাত্র,—বাকিটুকু খাঁটি বাঙ্গালি, অর্থাৎ গ্রাম্য বাঙ্গালি। বাঙ্গালি জাতির এক অংশে আবার ইস্‌লামের প্রভাব আছে—সে প্রভাব কতটা আছে, তাহার নির্ণয় বাঙ্গালি মুসলমান ঐতিহাসিকেরাই করিবেন; তবে তাহা খুব বেশি নহে; এ-বিষয় লইয়া পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এতটা কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্গালি জাতির কথা, বাঙ্গালির সংস্কৃতির কথা, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে, এইসব জিনিসের ভারতীয় আধার বা পটভূমিকার কথা বাদ দিলে চলিবে না। অন্যান্য প্রদেশের অর্থনৈতিক আক্রমণের চাপে আমরা মৃতকল্প হইয়া পড়িতেছি; ইংরেজ সরকারের প্ররোচনায় ঘরের মুসলমানের চাপও আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালার হিন্দুদের উপর অনুচিত ও অন্যায়ভাবে এখন আসিয়া পড়িতেছে। কতকটা দিশাহারা হইয়া আমাদের এক দল উপদেশ দিতেছেন— "সামাল সামাল, এটা আপদের সময়; কমঠ-ব্রত বা কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, বাঙালিয়ানার খোলার ভিতরে হাত পা গুটাইয়া ব'সো, বাঁচিয়া যাইবে; 'ভারত' 'ভারত' বলিয়া চেঁচাইও না। বলো, 'বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান উভয়ের মা বঙ্গ-মাতার জয়'; Sinn Fein অর্থাৎ We Ourselves এই মন্ত্র জপ করিয়া, প্রকাশ্য ভাবে বঙ্গ-বহির্ভূত ভারতের অর্থনৈতিক উপদ্রব ও শোষণ হইতে বাঁচ; এবং সম্ভব হইলে, এই মন্ত্র আওড়াইয়াই আরব তথা উর্দুওয়ালা পশ্চিমা মুসলমানদের আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক আক্রমণ হইতে বাঙ্গালার মুসলমানদেরও বাঁচাও,—তাহারা খাঁটি বাঙ্গালি থাকিলে, বাঙ্গালি হিন্দু, তুমিও বাঁচিয়া যাইবে।"

কথাটা খুবই সমীচীন, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিবার। Confusion of issues অর্থাৎ বিষয়-বিভ্রম যাহাতে না ঘটে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাঙ্গালার বুকের ভিতরে যে বৃহত্তর মারওয়াড়, বৃহত্তর উৎকল, বৃহত্তর সংযুক্ত প্রদেশ, বৃহত্তর পাঞ্জাব, বৃহত্তর ভাটিয়া ভূমি, বৃহত্তর বিহার, বৃহত্তর অন্ধ্র, বৃহত্তর কেরল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রাণপণে সে-সকলের অর্থনৈতিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া, আমাদের সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাকে, এবং অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে ও প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আমাদের যে আধ্যাত্মিক যোগ আছে সেই যোগকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। যত প্রকার শক্তি আছে তাহার প্রয়োগ করিয়া, অর্থনৈতিক দিকে অত্যন্ত সংকীর্ণমনা প্রাদেশিক বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া, আমাদের আত্মরক্ষা করিতেই হইবে। ভারতীয় জাতীয়তার দোহাই পাড়িয়া যাহারা আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমাদের বাড়া ভাতে ভাগ বসাইতেছে, মুখের গ্রাসটি কাড়িয়া লইতেছে, তাহাদের বাধা দিতে হইবে। কিন্তু সেই কারণে বাঙ্গালার বাহিরের ভারতের, নিখিল ভারতের সভ্যতাই যে বাঙ্গালার সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, তাহা ভুলিলে চলিবে না। অর্থনৈতিক শোষণ রোধ করিব,—কিন্তু সাংস্কৃতিক যোগ ভুলিব না; নূতন সাংস্কৃতিক যোগের সম্ভাবনাকে বিসর্জন দিব না; এবং আমাদের অতীতের কথার আলোচনার কালে, আমাদের জাতি ও জাতীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য বিচারের কালে, বাঙ্গালার পটভূমিকা নিখিল ভারতবর্ষকে প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতবর্ষকে বিস্মৃত হইব না। বাঙ্গালা পল্লিগাথার মলুয়া মদিনা ও কমলার চরিত্র লইয়া আমরা গর্ব করিব-ই,—এই অপূর্ব নারীচরিত্রগুলি আমাদের বাঙ্গলারই পল্লিজীবনের সৃষ্টি; কিন্তু উমা সীতা ও সাবিত্রীকে লইয়া কম গৌরব করিব না; কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের উমা সীতা সাবিত্রী বাঙ্গালার বিশেষকে অতিক্রম করিয়া, বাঙ্গালারই অন্তর্নিহিত প্রাণের সহিত অচ্ছেদ্য স্নেহ ও শ্রদ্ধার সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া, বাঙ্গালির জীবনে শ্রেষ্ঠতম নারীর প্রতীক হইয়া বিরাজ করিতেছেন;—আদি আর্যভাষাকে বাদ দিলে যেমন বাঙ্গালা ভাষাই থাকে না, তেমনি সীতা-সাবিত্রীকে অর্থাৎ আদি আর্য-যুগের বা সংস্কৃত-যুগের ঐতিহ্য ও আদর্শকে বাদ

দিলে, বাঙ্গালার সংস্কৃতি বলিয়া আমরা কোনও জিনিসের কল্পনা করিতে পারি না। রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সীতা-সাবিত্রীকে "ঘাঘরা-পরা বিদেশিনী" এই আখ্যা দান করিয়া, বাঙ্গালার হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতে চাহেন, বা হৃদয়-সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিতে চাহেন; তাঁহাদের স্থানে নবাবিষ্কৃত বাঙ্গালা-পল্লি-গাথাবলির নায়িকা মলুয়া মদিনা ও কমলাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। সীতা-সাবিত্রীর সত্যকার পোশাক যাহাই থাকুক (তবে প্রাচীন আর্য-যুগে মেয়েরা যে 'ঘাঘরা' পরিত না, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই), বাঙ্গালার মাটিতে তাঁহারা কোনো এক অজ্ঞাত পুণ্য মুহূর্তে পাদক্ষেপ করা মাত্রই আমরা তাঁহাদের বাঙ্গালি ধরনের শাড়ি পরাইয়া দিয়া আমাদের নিতান্ত আপনার জন করিয়া লইয়াছি, ঘরের মধ্যেই তাঁহাদের পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। রায় বাহাদুরের এই চেষ্টার বিশ্লেষণ এখন করিব না; কিন্তু আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত একটি শব্দ দ্বারা এই চেষ্টার-বর্ণনা করা যায়—সে শব্দটা হইতেছে, 'আদিখ্যেতা'—অর্থাৎ বিশেষ এক প্রকার ভাববিলাসের আতিশয্য; এবং এই চেষ্টার মূলে, অন্যান্য মনোভাব ও চিন্তা ব্যতীত এই জিনিসটি দেখিতে পাই—আমাদের বাঙ্গালার জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা বা আধার-ভূমি কী কী বিষয় লইয়া, তৎসম্বন্ধে অবহিত না হইয়া, নূতন ও অনপেক্ষিত কথা (তাহা যুক্তি-সহ হউক বা না হউক) বলিয়া, sensationalism বা চমকপ্রদতার সৃষ্টি করা। বঙ্গদেশ তুর্কিদের দ্বারা বিজিত না হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যই গড়িয়া উঠিত না—ইহাও এইরূপই sensational এবং যুক্তি-হীন কথা।

ভাষা না হইলে nation বা জাতি হয় না; এবং ভাষা সম্বন্ধে সচেতন না হইলে, জাতীয়তা-বোধও আসে না। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি লইয়া অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। যে-সমস্ত উপকরণের সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির কথা পুনরুদ্ধার করা যায়, সেগুলি হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, বাঙ্গালা এখন হইতে মাত্র হাজার বৎসর পূর্বে নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পূর্বে বাঙ্গালা সৃজ্যমান, তখন বঙ্গদেশের ভাষা অপভ্রংশ ও প্রাকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। বাঙ্গালা দেশ হিমাচল-কন্যা গঙ্গার দান; পলিমাটিতেই বাঙ্গালার উদ্ভব। বাঙ্গালা দেশের ভাষাও তেমনি উত্তরভারতে উদ্ভূত আর্যভাষা, প্রাকৃত হইতেই উৎপন্ন। গঙ্গার মতো আর্যভাষার নদী বাঙ্গালা দেশেও বহিল, এই নদীর স্রোতে দেশের প্রাচীন অনার্য ভাষা ভাসিয়া গেল—আর্য ভাষা প্রাকৃত এই বাঙ্গালায় আসিয়া ক্রমে বাঙ্গালা ভাষার রূপ ধারণ করিল; প্রাকৃতের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার ধাত্রী-রূপে সংস্কৃতও আসিল।

মৌর্যরাজগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্বে, বাঙ্গালা দেশে আর্য ভাষার ও আনুষঙ্গিক উত্তর-ভারতের গাঙ্গ-উপত্যকার সভ্যতার বিস্তার ঘটে নাই বলিয়া অনুমান হয়। মৌর্য-বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্ত রাজবংশের রাজত্ব পর্যন্ত—খ্রিস্ট-পূর্ব ৩০০ হইতে খ্রিস্টীয় ৫০০ পর্যন্ত, এই আট শত বৎসর ধরিয়া, ভাষায় বাঙ্গালা দেশের আর্যীকরণ চলিতেছিল; এই আট শ' বাঙ্গালার অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়-ভাষী-জনগণ নিজ অনার্য ভাষা সমূহকে ত্যাগ করিয়া ধীরে-ধীরে আর্য ভাষা—অর্থাৎ মগধের প্রাকৃত—গ্রহণ করে; উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সভ্যতা এবং তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য—অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত উত্তর-ভারতের আর্য ও অনার্যের ইতিহাস ও পুরাণ—বঙ্গদেশের অধিবাসীরাও গ্রহণ করিল; বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ আসিল, তাহাও বাঙ্গালায় গৃহীত হইল।

এইরূপে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য—এই তিন জাতির মিলনে বাঙ্গালি জাতির সৃষ্টি হইল। উত্তর-ভারতের গাঙ্গ-সভ্যতাই যেন এই নব-সৃষ্ট আর্য-ভাষী বাঙ্গালি জাতির জন্ম-নীড় হইল। রক্তে ও ভাষার আদিম বাঙ্গালি মুখ্যত অনার্য ছিল। যেটুকু আর্যরক্ত বাঙ্গালি জাতির গঠনে আসিয়াছিল, সেটুকু আবার উত্তর-ভারতেই অনার্য-মিশ্র হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আর্য ভাষার সঙ্গে-সঙ্গে সৃজ্যমান বাঙ্গালি জাতি একটা নূতন মানসিক নীতি বা বিনয়-পরিপাটি, যাহাকে ইংরেজিতে discipline বলে, তাহা পাইল; বাঙালির অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রকৃতির উপরে আর্য মনের ছাপ পড়িল। ইহা তাহার পক্ষে মঙ্গালের কারণই হইল। আর্য মনের—ব্রাহ্মণ্যের—এই ছাপটুকু, আদিম অপরিস্ফুট বাঙ্গালিকে একটা চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য দিল।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম পাদে যখন চীনা পরিব্রাজক Hiuen Tsang হিউ-এন্ থসাঙ্ বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহার কথার ভাবে মনে হয় যে, তখন সমস্ত বাঙ্গালা দেশটা আর্য-ভাষী হইয়া গিয়াছিল। তারপরে ৭৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে বরেন্দ্র ভূমিতে পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল, নব সৃষ্ট বাঙ্গালি জাতি নবীন এক গৌরবময় জীবনে প্রবেশ লাভ করিল। প্রথমটায় বঙ্গাদেশের পণ্ডিতেরা সমগ্র ভারতবর্ষের সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃতেরই চর্চায় তৎপর হইলেন। তাহার পরে তাঁহারা দেশ-ভাষার দিকে দৃষ্টি দিলেন। পাল-রাজগণের রাজ্যের প্রতিষ্ঠার দুই শতকের মধ্যেই মাগধী প্রাকৃত এবং বঙ্গাদেশে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ হইতে একটু বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করিয়া, বাঙ্গালা ভাষা, একটি স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়াইল; এবং খ্রিস্টীয় দশম শতকের মধ্য-ভাগ হইতে বৌদ্ধ গুরুদের হাতে এই স্বতন্ত্র ভাষায়, অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালায়, সাহিত্য-সৃষ্টি—গান-রচনা—হইতে লাগিল।

আমাদের বাঙ্গালি জাতির ও বাঙ্গালা ভাষা এবং সাহিত্যের উৎপত্তির ইতিহাসের কাঠামো বা মূল-কথা এইরূপ বলিয়াই আমার ধারণা। আর্যভাষী বাঙ্গালি জাতির গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যখন বাঙ্গালি সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়, তখন কেহ বাঙ্গালির নিজস্ব অনার্য সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই; তখন যে-ছাঁচে বাঙ্গালির মন, বাঙ্গালির সমাজ, বাঙ্গালির ঐতিহ্য—রীতি-নীতি শিল্প-সাহিত্য সব-ই ঢালা হইয়াছিল, তাহা ছিল উত্তর-ভারতের বা নিখিল ভারতের সর্ব-জয়ী হিন্দু (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন) মন,—ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন সমাজ, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, শিল্প ও সাহিত্য। যে-ছাঁচে সৃজ্যমান বাঙ্গালি জাতিকে ঢালা হইল, মোটের উপর সেই ছাঁচ এখনো বাঙ্গালি সমাজে বিদ্যমান। উপস্থিত কালে, অর্থনৈতিক ও মানসিক নানা বিপর্যয় এবং বিপ্লবের আগমনে, আমরা স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় আমাদের সমাজকে ভাঙিয়া-চুরিয়া আবার এক নূতন ছাঁচে ঢালিতে যাইতেছি।

পাল-যুগে নূতন সৃষ্ট বাঙালি জাতির মনের সুর, তাহার আর্য ভাষার তারকে অবলম্বন করিয়া, উত্তর-ভারতের মনের সঙ্গে যেভাবে বাঁধা হইয়া গিয়াছে, মোটের উপর সে-সুরটি এখনো প্রবলভাবে বিদ্যমান। এই এক-ই সুরে নানান ঝংকার শুনা গিয়াছে; কখনো বৌদ্ধ, কখনো ব্রাহ্মণ্য; ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে কখনো বৈদিক (বৈদিকের ঝংকার বাংলা দেশের সুরে চিরকালই অতি ক্ষীণভাবে শুনা গিয়াছে), কখনো শৈব, কখনো শাক্ত, কখনো বৈষ্ণব, এবং কখনো মুসলমান সুফি। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ তন্ত্রও এই ঝংকারের অন্যতম।

শ্রীদনুজমর্দন দেব দেখা দিলেন। ইনি সমগ্র বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দু রাজা হন, এবং যে কার্য সারা উত্তর-ভারতের কোনও হিন্দু রাজা তুর্কি-বিজয়ের পরে করিতে সাহসী হন নাই, সেই কার্য ইনি-ই করিয়াছিলেন—নিজ নামে দেশ-ভাষায় মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। দনুজমর্দন দেবকে অনেকে মুসলমান ইতিহাসে বর্ণিত রাজা "কন্‌স্" ('কাঁশ' বা কংশ)-এর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। এই রাজা কংশ-ই বাঙ্গালা রামায়ণের রচয়িতা ব্রাহ্মণ কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এইরূপ অনুমান হয়। সমগ্র বঙ্গের স্বাধীন হিন্দু রাজ্য দনুজমর্দন দেব কংশ, হিন্দু-শাস্ত্রগ্রন্থ রামায়ণ ভাষায় প্রচারে উদ্যোগী; কর্ম-চেষ্টা ও জাতীয় সাহিত্যের প্রসার, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে নিঃসন্দেহে দুই-ই সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়াছিল।

এইরূপে ভাষায় প্রাচীন সাহিত্য প্রচারের ফলে বাঙ্গালা দেশে যাহা ঘটিল, তাহা বাঙ্গালি জাতির উত্তর-কালের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পরিস্ফুট। শিক্ষিত ব্যক্তিরা সংস্কৃতে বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ, সারদা তিলক তন্ত্র প্রভৃতি পড়িতেন—চৈতন্যদেবের পূর্বেকার কালে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা এই-সব সংস্কৃত পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পুথিশালায় সংগৃহীত হইয়া আছে। এই প্রকারের ইতিহাস ও পুরাণ-গ্রন্থ ভাষায় অনূদিত হইতে লাগিল। জন-সাধারণে ইহার স্বাদ পাইল। কথকতা—ভারত-পুরাণ পাঠ—সংস্কৃতি-প্রচার বিষয়ে দেশের এক প্রাচীন পদ্ধতি ছিল। বাঙ্গালা দেশের স্থানীয় পুরাণকথা, যেগুলি সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ হয় নাই বলিয়া ভারতে অন্যত্র সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হইতে পারে নাই, সেগুলিও নবীন 'মঙ্গল-কাব্য' আকারে বহুল প্রচারিত হইতে লাগিল। এইসব স্থানীয় পুরাণ-মধ্যে, বৌদ্ধ পুরাণও বাদ পড়িল না। এইভাবে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত শিবায়ন ও অন্য পুরাণের আখ্যায়িকার পাশে, লখিন্দর-বেহুলা কালকেতু-ফুল্লরা ধনপতি-খুল্লনার কথা এবং লাউসেন ও গোপীচাঁদের কথাও বহুল ভাবে পুনঃ-প্রচারিত হইল। প্রাচীন-কথা ও লোক-গাথা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সাহিত্যিক রূপ পাইল। সমাজের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সংরক্ষক ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার নূতন করিয়া জ্ঞান-বল সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হইল। স্বদেশে সংস্কৃত বিদ্যা মৃতপ্রায়; সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা হয় নালন্দার বিহারের মতো অন্যান্য বিহারের ধ্বংসের কালে তুর্কির ভল্ল ও তরবারির আঘাতে নিহত হইয়াছেন, না হয় পুথি-পত্র লইয়া তাঁহারা নেপালে পলাইয়া গিয়া প্রাণ ও বিদ্যা উভয়েরই রক্ষা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে তুর্কির আগমনে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পলায়ন করিয়া পূর্ব-বঙ্গের নদী খাল বিলের দ্বারা সুরক্ষিত জনপদে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের বিদ্যা দেশের কেন্দ্রস্থলে না থাকায় আর কার্যকর হইতেছিল না। তখন বাঙ্গালি ব্রাহ্মণবটু বিদেশ হইতে সংস্কৃত জ্ঞানকে আবাহন করিয়া আনিবার জন্য বাহির হইলেন। মিথিলা সে-যুগে তুর্কির অধীন হয় নাই। হিন্দু রাজা ছিল বলিয়া, তুর্কি-বিজয়ের পরে ধ্বংসের শতকেও মিথিলার সংস্কৃত বিদ্যার কেন্দ্রস্থলগুলি জীবিত ছিল—বাঙ্গালির ছেলেরা সেখানে বিশেষ করিয়া ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতি পড়িতেই যাইত। এই প্রসঙ্গে রঘুনাথ শিরোমণি ও পক্ষধর মিশ্রের কথা আমরা সকলেই জানি। মিথিলায় যে-সব ছেলে পড়িতে যাইত, তাহারা কেবল যে সংস্কৃত শাস্ত্র পড়িত তাহা নহে। মিথিলার দেশভাষা মৈথিলে ওই প্রদেশের পণ্ডিতেরা সুন্দর সুন্দর গান বাঁধিতেন। কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর (ইঁহার জীবৎকাল আনুমানিক ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ) মৈথিল কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-

বিষয়ক পদ বাঙ্গালি ছাত্রদের দ্বারায় বাঙ্গালা দেশে আনীত হয়, এবং সেই-সকল পদের অপূর্ব কবিত্বে বাঙ্গালিদের মধ্যে অনেকে মোহিত হইয়া যান—বাঙ্গালা দেশে সেগুলি বহুল প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের অনুকরণও আরম্ভ হয়। বিদ্যাপতির পদের মৈথিল ভাষা বাঙ্গালির মুখে অবিকৃত থাকিতে পারিল না; এবং বাঙ্গালির হাতে বিদ্যাপতির পদের ভাষা বিকৃত হইল, আবার বাঙ্গালা ও মৈথিল এই দুই ভাষা মিলিয়া, মৈথিলের নকলে এক অতি মধুর কৃত্রিম সাহিত্যের ভাষার সৃষ্টি করিল, এই ভাষার নাম হইল 'ব্রজবুলি'। বাংলা গীতি-সাহিত্যের অনেকখানি অংশ এই ব্রজবুলিকে লইয়া।

এইভাবে বাঙ্গালার পণ্ডিতের হাতে দুই দিকে কাজ চলিল; বাঙ্গালার সংস্কৃতির দুইটি দিক্-ই ইঁহারা পুষ্ট করিতে লাগিলেন—সংস্কৃত বিদ্যা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালার মস্তিষ্ক খেলিতে লাগিল; এবং বাঙ্গালা কাব্য ও কবিতা, যাহাতে বাঙ্গালার হৃদয়ের প্রকাশ হইল। এই দুই দিকেই, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব-ই ছিল মূল প্রেরণা। বাঙ্গালার গ্রাম্য জীবনে যে ডাক ও খনার বচন ছিল, তাহা প্রাচীন মুসলমান-পর্ব যুগের সংস্কৃতির প্রতিধ্বনি মাত্র। তুর্কি-বিজয়ের দেড়-শত দুই-শত বৎসরের মধ্যে যখন সমস্ত উত্তর-ভারতময় মুসলমান ভাব-জগতের প্রতাপ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতের জীবনে অনুভূত হইতে লাগিল, তখন সহজ-বোধ্য ভক্তি-মার্গ পুনরায় প্রকটিত হইল, 'নাম-ধর্ম' প্রসার-লাভ করিল। নাম-ধর্মের নানা সাধক দেখা দিলেন; রামানন্দ কবির প্রমুখ উত্তর-ভারতের সন্তমার্গী সাধুগণ; বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্যদেব; এবং পাঞ্জাবে গুরু নানক ও তৎশিষ্য ও অনুশিষ্য শিখ গুরুগণ।

বাঙ্গালির সংস্কৃতির অনেকটা মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবকেই আশ্রয় করিয়া পুষ্টি-লাভ করে। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনী বাঙ্গালি সংস্কৃতিতে অনেকগুলি নূতন ধারা সৃষ্ট বা প্রবর্তিত করিয়াছিল। সংস্কৃত বিদ্যার মর্যাদা তাঁহার হাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই; বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ, এবং শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের গুরু-পরম্পরা, সংস্কৃত ভাষায় যে-দার্শনিক বিচার প্রকট করিলেন, যে-রসশাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন, যে-সকল মূল গ্রন্থ, টীকা ও কাব্যাদি রচনা করিলেন, তাহা বিদ্যা ও বুদ্ধির দিক হইতে বাঙ্গালি সংস্কৃতির অপূর্ব সৃষ্টি; বাঙ্গালির বুদ্ধির প্রকাশ যেমন নব্য-ন্যায়ের ও স্মৃতি-শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের এবং শ্রীকুল্লুকভট্ট, শ্রীমধুসূদন সরস্বতী, আগমবাগীশ শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রমুখ টীকাকার ও সংকলয়িতাদের মেধায় দেখা যায়, তেমনি ইহা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যদের পাণ্ডিত্যেও দেখা যায়। আবার বৈষ্ণবপদাবলিতে বাঙ্গালির হৃদয়ের, তাহার রসানুভূতির যে-পরিচয় পাই, তাহা শ্রীচৈতন্যদেবেরই অনুপ্রেরণার ফল। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালার জন-সংগীত কীর্তনগানে যে লক্ষণীয় এবং অতি বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করিল, বাঙ্গালার নিজস্ব সংগীতের প্রাণ-স্বরূপ সেই কীর্তনগানও সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসাদ। ঘরমুখো বাঙ্গালি ঘর ছাড়িয়া নূতন উদ্যমে পুরী গয়া কাশী বৃন্দাবনে গেল, জয়পুরে গেল, এবং আরও পশ্চিমে গেল;—ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এক সত্যকার গৌরবময় বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিল। এখানেও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের প্রভাব দেখি।

বাঙ্গালার সংস্কৃতি মুখ্যত গ্রাম্য জীবনকেই অবলম্বন করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছিল; এদিকে বাঙ্গালা দেশ বোধ হয় আদিম অস্ট্রিক জাতি হইতে প্রাপ্ত রিক্থকেই রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। প্রাচীন ভারতে গ্রাম ও নগর উভয়কেই আশ্রয় করিয়া সভ্যতার প্রকাশ

ঘটিয়াছিল। গ্রামের বড়ো দান ছিল দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি, নগরের দান ছিল বাস্তব সভ্যতা, কর্মপ্রাণ সভ্যতা। ইউরোপের সভ্যতা অর্থে Civilisation—যাহা civis বা নগরকেই অবলম্বন করিয়া থাকে, 'নাগরিকতার ভাব'; ইউরোপের polis বা নগর হইতে politics-এর উৎপত্তি। আরবদের মধ্যেও 'মদিনা' বা নগরের জীবন-যাত্রাই 'তমদ্দুন' বা সভ্যতা। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে কখনো নগরের প্রাধান্য ছিল না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শিল্প-সম্ভারপূর্ণ, বিরাট্ মন্দির ও অন্য গৃহে শোভিত, বড়ো-বড়ো নগর প্রাচীন কাল হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল দেখা যায়; যেমন, প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা; প্রাচীন কালের অহিচ্ছত্র. মথুরা, কাশী, পাটলিপুত্র, তক্ষশীলা, সাকেত, গোনর্দ, উজ্জয়িনী, প্রতিষ্ঠান, ধান্যকটক (অমরাবতী), মহাবলিপুর, কাঞ্চীপুর প্রভৃতি, যে-সব নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাই; মধ্য যুগের দিল্লি, আগ্রা, লাহোর, মদুরা, পুনা, মাণ্ডু প্রভৃতি। উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে নগরাদির ধ্বংসাবশেষ যে-রূপ পাওয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা দেশে সে-রূপ ততটা পাওয়া যায় নাই; কাশী, মথুরা, পুনা, উজ্জয়িনী, লাহোর প্রভৃতির সহিত একসঙ্গে নাম করা যায় এমন নগর বাঙ্গালা দেশে বেশি গড়িয়া উঠে নাই—বাঙ্গালা দেশের নাগরিক জীবন মুখ্যত গ্রামের জীবনেরই একটি বিস্তৃত সংস্করণ ছিল। বাঙ্গালার নগরের মধ্যে লক্ষ্মণাবতী, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি দুই-একটির নাম মাত্র করা যায়। বাঙ্গালা দেশ ভারতের জীবনের স্রোতের এক পাশে, একটু যেন বিচ্ছিন্ন ভাবেই বরাবর ছিল। শিল্প-নগরী রূপে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পশ্চিমবঙ্গে বিষ্ণুপুর বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। এই সময়ের বিষ্ণুপুরের হঠাৎ বড়ো হইয়া উঠার দুইটি কারণ ছিল—[১] উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব উপকূলের সহিত উত্তর-ভারতের যোগ-বিধায়ক পথের উপরেই বিষ্ণুপুর অবস্থিত; সেইজন্য উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে তীর্থযাত্রা ও অন্য উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা যাতায়াত করিত, তাহাদের মারফত বাহিরের জগতের সহিত বিষ্ণুপুরের সংযোগ সহজ হইয়াছিল; [২] বিষ্ণুপুরের সঙ্গে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালা দেশের হৃদয়-স্থানীয় নবদ্বীপ অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ষোড়শ শতকের শেষভাগে এবং সমগ্র সপ্তদশ শতক ধরিয়া, কতকগুলি বাঙ্গালি পণ্ডিত ও কর্মী বাঙ্গালা দেশের গ্রাম্য সংকীর্ণতা ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন, বাঙ্গালার বাহিরেও একটি বিরাট্ কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার কারণ যেমন একদিকে ছিল শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা, অন্য দিকে ছিল—বাঙ্গালা দেশের স্বাধীন মুসলমান নরপতির হাত হইতে মুক্ত হইয়া, মোগল সম্রাটের অধীন হওয়া। স্বাধীন মুসলমান রাজাদের অধীনে থাকিয়া বাঙ্গালা দেশ ভারতবর্ষের এক কোণে পড়িয়াছিল, এবং রুদ্ধবারি জলাশয়ের মতো অবস্থায় ছিল; বাহিরের জগতের সঙ্গে তাহার তেমন কোনো যোগ ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, বাঙ্গালার পক্ষে আংশিকভাবে সমগ্র ভারতের প্রাণের স্পন্দন পাওয়া সম্ভবপর হইল। দিল্লি-আগ্রার কেন্দ্রীভূত শাসন বাঙ্গালার পক্ষে হিতকর হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গালির প্রতিভা বাঙ্গালার বাহিরে আদর পাইল—বাঙ্গালার বিদ্যাধর পণ্ডিত জয়পুর নগর স্থাপন কালে সাহায্য করিলেন (১৭২৮ খ্রিস্টাব্দ)। বাঙ্গালার পণ্ডিত ও গোস্বামীরা উত্তর-ভারতের ধর্ম-জীবনের অংশগ্রহণ করিলেন, বাঙ্গালার মধুসূদন সরস্বতী শঙ্করাচার্যের মতকে উত্তরভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, দিল্লি-আগ্রা জয়পুর-চিতোর হইতে পারস্য ও তুরস্ক পর্যন্ত সর্বত্র রাজদরবারে বাঙ্গালার ঢাকাই মলমলের চাহিদা

বাড়িয়া গেল, বাঙ্গালার বাঁশে তৈয়ারি 'কুঁড়ে' ঘরের বাঁকা ধাঁচা, 'রেওটি' নামে রাজপুত-মোগল বাস্তু-শিল্পের মধ্যে স্থান পাইল। মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, হিন্দু-যুগের অবসানের পরে, বাঙ্গালি গ্রামীণ সভ্যতার গণ্ডি প্রথম কাটাইয়া, নিখিল-ভারতীয় সভ্যতার অংশ গ্রহণের একটা বড়ো সুযোগ পাইল। সপ্তদশ শতকে উত্তর-ভারতের লোক ভাষা ('হিন্দি') হইতে বাঙ্গালাতে দুইখানি বই অনূদিত হইল—নাভাজি দাসের 'ভক্তমাল', এবং মালিক মুহম্মদ জয়সির 'পদুমাবৎ'।

দিল্লি-আগ্রা এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের সঙ্গে যে-যোগ নূতন করিয়া মোগল-বিজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে আরম্ভ হইল, সে-যোগ আর বিলুপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালির সংস্কৃতির ইতিহাসে এই যোগকে একটা বড়ো স্থান দিতে হয়।

যদিও বাঙ্গালি জাতির অর্ধেকের উপর এখন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহা লক্ষণীয় যে অতি অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান সংস্কৃতি (অর্থাৎ আরবি, ফারসি ও উত্তর-ভারতীয় মুসলমান মনোভাব বা বাস্তব সভ্যতা, রীতি-নীতি এবং চিন্তা-প্রণালি) বাঙ্গালি মুসলমানের জীবনেও তেমন কার্যকর হয় নাই। সুফি মতের ইস্‌লামের সহিত বাঙ্গালি (অর্থাৎ বাঙ্গালি হিন্দু) মনোভাবের একটা আপস হইয়াছিল, সে-কথা পূর্বে বলিয়াছি। সাধারণ বাঙ্গালি মুসলমান (কতকগুলি বিশেষ প্রান্তে, বিশেষ কতকগুলি গোষ্ঠী বা পরিবার ব্যতীত), বিশিষ্ট মুসলমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। যে-দুই-চারি জন বড়ো বড়ো আলেম, মোল্লা ও মৌলবি বাঙ্গালি মুসলমানদের মধ্যে হইতেন, তাঁহারা নিজেদের আরবি ফারসি কেতাবের মধ্যেই নিমগ্ন থাকিতেন, বাঙ্গালা ভাষার চর্চা তাঁহারা বড়ো একটা করিতেন না; ফলে, আরবি ফারসি জগতের খবর বাঙ্গালির কাছে বেশি করিয়া পৌঁছায় নাই। কিছু কিছু আরবি প্রার্থনা, মুসলমানি স্মৃতিশাস্ত্রের কথা এবং মুসলমানি ইতিহাস পুরাণ কেচ্ছা কাহিনী বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছিল, এইটুকু মাত্র। উত্তর ভারতের এবং ভারতের বাহিরের দেশের মুসলমান সংস্কৃতির সহিত এবং কোরান অনুমোদিত ইস্‌লামের সহিত বাঙ্গালি মুসলমান অতি আধুনিক কালে—বিগত মাত্র ২৫/৩০ বৎসর মধ্যে—একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু নানা কারণে তাহার জীবনে সে পরিচয় কার্যকর হইতেছে না।

* * *

ফরমাইস দিয়া ইচ্ছামতো 'জাতীয় সংস্কৃতি' তৈয়ার করা চলে না। বাঙ্গালি মুসলমানের জীবনে যেটুকু মুসলমান প্রভাব বিদ্যমান, ধীরে-ধীরে এই পাঁচ ছয় সাত শত বৎসর ধরিয়া, ইস্‌লামগত-প্রাণ পূর্ণবিশ্বাসী আলেম মোল্লা মৌলবিদের চেষ্টাতেই হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালি মুসলমানদের কেহ-কেহ যেভাবে বাঙ্গালায় 'ইস্‌লামি সংস্কৃতি' আনিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহার মধ্যে Positive অর্থাৎ সংগঠনকারী দিক্‌ অপেক্ষা negative অর্থাৎ ধ্বংসকারী দিক্‌টাই প্রবল। ইঁহাদের কাছে ইস্‌লামীয় মনোভাব মানে মুখ্যত যাহা ভারতীয়ত্বের বা হিন্দুত্বের বিরোধী; কারণ ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব ইঁহাদের চোখে 'কুফ্‌র্‌' বা বিধর্মিত্ব এবং 'শির্‌ক্‌' বা বহু-দেব-বাদিত্বেরই নামান্তর। হিন্দু বা ভারতীয় মাটিতে জন্ম—এই কথাতেই যেন কুফ্‌র্‌ ও শির্‌ক্‌-এর আমেজ লাগিয়া আছে; তাই বহু ভারতীয় বা বাঙ্গালি মুসলমান নিজেকে সৈয়দ বা আরব, অথবা ইরানি, পাঠান, মোগল বা তুর্কি বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে কৃতার্থ হয়। বাঙ্গালি বা ভারতীয় মুসলমানদের এই আত্মমর্যাদাবোধ-

হীনতা তাহাদের পক্ষে—এবং আমাদের পক্ষেও বটে—এক হৃদয় বিদারক, সর্বনাশকর ট্রাজেডি। পারস্যের মুসলমানেরা কখনো এইভাবে আত্মমর্যাদা হারায় নাই; ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে পারসিকেরা নিজ জাতির আভিজাত্য, তাহার প্রাচীন ঐতিহ্য ভুলিতে চাহে নাই—বরং তাহাদের 'শাহ্‌নামা' গ্রন্থে, মুসলমান-পূর্ব যুগের পুরাণ-কথাকে তাহারা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। তুর্কি মুসলমানেরা তিন চার শতকের বিস্মৃতির পরে, আবার নূতন করিয়া তাহাদের জাতির গৌরব-কথা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছে—তুর্কিরা এখন আরব ও ইরানি প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

বাঙ্গালি সংস্কৃতিতে মুসলমান উপাদান যেটুকু আসিয়াছে, এ-তাবৎ তাহা বাঙ্গালির জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্য রাখিয়াই আসিয়াছে। এখন কোনো কোনো দিক হইতে যে নবীন প্রয়াস হইতেছে, তদ্দ্বারা ভাঙন ঘটিবে—তাহার দ্বারা বড়ো একটা কিছু গড়িয়া উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালি মুসলমানদের প্রকৃতি এবং ইস্‌লামধর্মী অন্যান্য জাতির মনের ও সভ্যতার প্রকৃতি ভালো করিয়া না বুঝিয়া, বাঙ্গালি মুসলমানের মনকে চালিত করিবার চেষ্টা করিলে, একটা কিম্ভূত-কিমাকার বস্তুই সৃষ্ট হইবে, সত্যকার জাতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি হইবে না।

বাংলা দেশে যে সংস্কৃতি গত এক হাজার বৎসর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, যে-যে বস্তু বা অনুষ্ঠান অথবা মনোভাবকে অবলম্বন করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, নীচে তাহার একটা নিগ্‌দর্শন বা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইতেছে।—

[১] **বাঙ্গালার বাস্তব সভ্যতা—**

বাঙ্গালায় খড়ের চালের কুটির; পূর্ববঙ্গের বেতের ও বাঁশের কাজ (লুপ্তপ্রায়); প্রাচীন কালের কাঠের কাজ—ঘর ও চণ্ডীমণ্ডপের থাম বা খুঁটি, চালের বাতা প্রভৃতিতে নানা চিত্র খোদাই করা (এই কাষ্ঠ-শিল্প এখন-প্রায় লুপ্ত, এবং ইহা প্রাচীন হিন্দু যুগের কাষ্ঠের ও প্রস্তরময় ভাস্কর্যের ক্ষীণ ধারাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে); ইটের মন্দির; পোড়া-মাটির ভাস্কর্য—ইটের উপরে নানা রকমের খোদাই (মন্দির ও ইটে-খোদাই কাজের কথা বলিলে, ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বিষ্ণুপুরকে বিশেষ করিয়া এই শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র-স্বরূপ উল্লেখ করিতে হয়)—ইটে খোদাই ও মন্দিরের বাস্তুবিদ্যা এখন প্রায় অবলুপ্ত।

চিত্রবিদ্যা—পুঁথির পাটা (লুপ্ত), দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকা (প্রায়লুপ্ত), এবং অন্য প্রকারের খাঁটি বাঙ্গালি চিত্রপদ্ধতি, যথা—পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ার পট, কালীঘাটের পট, পূর্ব-বঙ্গের গাজির পট, শরায় ছবি আঁকা—ইহার অধিকাংশই এখন প্রায় লুপ্ত; মাটির ঠাকুর গড়া, ঠাকুরে চাল-চিত্র আঁকা, মাটির সঙের পুতুলের পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্র—ইহাই আমাদের বার্ষিক পূজাগুলির কল্যাণে কোনো রকমে টিকিয়া আছে; রঙিন মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল,—গ্রাম-শিল্পের মধ্যে অন্যতম শিল্প—জাপানি সেলুলয়েড পুতুলের সহিত আর প্রতিযোগিতা করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

দাঁইহাট-কাটোয়ার ভাস্করদের পাথরের দেবমূর্তি-শিল্প ও অন্য ভাস্কর্য, মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতার ভাস্করদের হাতির দাঁতের কারুশিল্প—মূর্তি, চুড়ি, কৌটা প্রভৃতি (বাঙ্গালার হাতির দাঁতের কারুশিল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রতিষ্ঠিত হয়, গত শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালি শিল্পীরা এই কাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এখন তাহাদের প্রভাব দিল্লি,

জয়পুর, অমৃতসর পর্যন্ত পঁহুছিয়াছে); বিষ্ণুপুর ও ঢাকার শাঁখের কাজ—শাঁখে খোদাই, আধুনিক মিহি কাজের শাঁখের সরু চুড়ি ইত্যাদি। সারা বাঙ্গালায় সোলার কাজ—খেলনা, ঠাকুরের সাজ; ডাকের সাজ।

এতদ্ভিন্ন, ঢাকার filigree work বা রূপার তারের কাজ; কলিকাতায় রূপার repousse work বা নকশা তোলা কাজ; কলিকাতার স্বর্ণকারদের অলংকার শিল্প এবং বিলাতি ধরনের মীনার কাজ—এগুলির প্রভাব বাঙ্গালার বাহিরেও গিয়াছে।

বাঙ্গালার পিতল-কাঁসার বাসন, মুর্শিদাবাদ খাগড়ার কাঁসার বাসন, বিষ্ণুপুরের পিতল-কাঁসা ও ভরনের বাসন, দাঁইহাট-কাটোয়ার, বনপাস-বর্ধমানের এবং ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব-বঙ্গের নানা স্থানের পিতলের বাসন; কলিকাতার পিতলের বাসন ও পিতলের দেব-বিগ্রহ, নবদ্বীপের মূর্তি ঢালাই; শাসপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের ইস্পাতের কাজ।

বাঙ্গালার খাদ্যদ্রব্য—বাঙ্গালা দেশের বিশিষ্ট শাক শুক্তানি ঘণ্ট নিরামিষ ব্যঞ্জন ও তরকারি; (বাঙ্গালার বিশেষত পূর্ব-বঙ্গের) মৎস্য ও মাংস পাকের বিশেষ রীতি; বাঙ্গালার কাসুন্দি, ছড়া তেঁতুল; আচার, খেজুরে গুড়, পাটালি; মুড়ি, মুড়কি, চালের গুঁড়া, নারকেল ও ক্ষীরের তৈয়ারি নানা পিষ্টক ও মিষ্টান্ন; বীরখণ্ডি, কদমা, খাজা, গজা, সীতাভোগ, মিহিদানা ইত্যাদি; ছানার তৈয়ারি বাঙ্গালার নিজস্ব মিষ্টান্ন, নানা প্রকারের সন্দেশ, পানিতোয়া, রসগোল্লা।

বাঙ্গালার পরিধেয়—মিহি মল্‌মল, ঢাকার জামদানি (ফুলতোলা কাপড়), টাঙ্গাইল শান্তিপুর চন্দ্রকোণা ফরাসডাঙ্গা (চন্দননগর) প্রভৃতি স্থানের ধুতি ও শাড়ি, কুমিল্লার ময়নামতী শাড়ি, মুর্শিদাবাদের রেশম, গরদ, তসর; বীরভূম বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রেশম; রাজশাহির মট্‌কা, বীরভূম তাঁতিপাড়ার ও কড়িধার তসর; বিষ্ণুপুরের রেশম-কেটে, চেলি, নকশা-দার ও বুটিদার শাড়ি; অধুনা-বিলুপ্ত মুর্শিদাবাদের বালুচরের শাড়ি; হিমালয় প্রান্তের মোটা পশমি কম্বল; অধুনা-প্রচলিত বাঙ্গালার ছাপা রেশমের শাড়ি।

মেদিনীপুরের সূক্ষ্ম মাদুর, কুমিল্লা নোয়াখালি ও শ্রীহট্টের শীতলপাটি।

বাঙ্গালার নিজস্ব কৃষি-শিল্প—নানা প্রকারের ধান; পাট; বাঙ্গালার মাছের চাষ।

বাঙ্গালার নৌ-শিল্প—বিভিন্ন সরকারের নৌকা (এই নৌ-শিল্প এখন প্রায় অবলুপ্ত); বীরভূমের খুহিতাল এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এই শিল্প সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

[২] **বাঙ্গালার অনুষ্ঠান-মূলক সংস্কৃতি—**

বাঙ্গালার সামাজিক বিধি ও ধর্ম-সাধন সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান, বাঙ্গালার হিন্দুর সম্পত্তি উত্তরাধিকারের রীতি—দায়ভাগ; বাঙ্গালার সামাজিকতা—বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদিতে উৎসব ও মিলনের রীতি, এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব ও মিত্র সম্মেলনের বিশেষ রীতি; বাঙ্গালার পূজা—দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, দোল, রাস, সরস্বতী পূজা, সত্যনারায়ণ পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা প্রভৃতি বিশেষত্বময় পূজা ও অনুষ্ঠানসমূহ, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালির জীবনে দুর্গাপূজা; মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত বালিকা-ব্রত; পারিবারিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় জীবনকে অবলম্বন করিয়া নানা উৎসব—আটকৌড়িয়া, অন্নপ্রাশন, ভাইফোঁটা, জামাই-ষষ্ঠী, পৌষ-পার্বণ, নবান্ন, অরন্ধন, নূতন-খাতা প্রভৃতি।

মেয়েদের আলিপনা-আঁকা, কাঁথা-সেলাই ও অন্যান্য গৃহ-শিল্প।

বাঙ্গালার লাঠিখেলা ও ক্রীড়া-কসরৎ, রায়বেঁশে নাচ; পূজার সময় ঢাকি-ঢুলিদের নাচ; পূর্ববঙ্গের আরতি-নৃত্য; মেয়েদের ব্রত-নৃত্য; অন্য নানা প্রকারের নৃত্য।

বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ঈদের উৎসব, মহরমের ও শাহ্‌মাদারের অনুষ্ঠান; নানাবিধ নৃত্য ও কসরৎ।

[৩] **বাঙ্গালার মানসিক আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি—**

টোল-চতুষ্পাঠী; বাঙ্গালার সংস্কৃত বিদ্যা—জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার সংস্কৃতি কবি, দার্শনিক ও পণ্ডিতের কীর্তি; বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ; নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর, কোটালিপাড়া, ত্রিপুরা, চট্টল, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রের সংস্কৃত পণ্ডিতদের পরম্পরা; নৈয়ায়িক ও স্মার্তগণ; আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ প্রমুখ তান্ত্রিক আচার্যগণ; মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ বৈদান্তিকগণ; বাঙ্গালার আধ্যাত্মিক পদ; বৌদ্ধ চর্যাপদ; বড়ুচণ্ডীদাস, শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব; কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' ; ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি ও ব্রজবুলি সাহিত্য; বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ; শাক্ত পদ—রামপ্রসাদ; রামায়ণ মহাভারতের বাঙ্গালা রূপ; বাঙ্গালা দেশে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর বিশিষ্ট অভিব্যক্তি; শাক্ত, শৈব ও বৌদ্ধ মঙ্গল-কাব্যের উপাখ্যান—বেহুলা-লখিন্দরের কথা, কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনার কথা; লাউসেন-কথা (অধুনা কম প্রচারিত); পশ্চিমবঙ্গের ধর্মপূজা; বাঙ্গালার কথকতা; কীর্তনগান—কীর্তনের অভিব্যক্তি—গড়েরহাটি বা গরানহাটি, মনোহরশাহী, রানিহাটি, প্রভৃতি বিভিন্ন রীতির কীর্তন; বাউল ও ভাটিয়াল গান; বাঙ্গালার শ্লোক-পড়ার সুর; কবি, ঝুমুর, তরজা ও অন্য গ্রাম্য গীত; পাঁচালি; বাঙ্গালার 'যাত্রা'; জারি গান; মুসলমান মারফতি গান, মর্সিয়া গান; বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান পুঁথিপড়ার সুর; বাঙ্গালার পয়ার; পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দিগানের বাংলায় প্রচার—বাঙ্গালার ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুম্‌রি, ঢপ, খেমটা।

বাঙ্গালার সাহিত্যে—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', চৈতন্য ও বৈষ্ণবগুরুগণের চরিত্র বিষয়ক পুস্তক, পদাবলি-সাহিত্য, প্রাচীন বাঙ্গালার কাব্যাবলি (মঙ্গল-কাব্য ইত্যাদি); ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ; বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশিষ্ট বস্তু—গীতিকবিতা।

এই প্রকারের বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় অবলম্বন করিয়া, ইংরেজদের আগমন পর্যন্ত বাঙ্গালার নিজস্ব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। অধুনা ইহার কতকগুলি বিষয় একেবারে লোপ পাইয়াছে, কতকগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে এবং কতকগুলির আমরা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আছি। ইংরেজ-আমলে বাঙ্গালা কতকগুলি নূতন জিনিসে, তথা এই প্রাচীন জিনিসগুলির অনেকগুলিতে সমগ্র ভারতের দ্বারায় স্বীকৃত বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আধুনিক কালের বাঙ্গালির সংস্কৃতির পরিচয়-স্বরূপ বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুর মধ্যে উল্লেখ করা যায়—

[১] বাঙ্গালার ব্রাহ্ম ধর্ম—রামমোহন, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী।

[২] বাঙ্গালায় হিন্দুধর্মের নবীন জাগৃতি—রামকৃষ্ণ পরমহংস, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ভূদেব, বিজয়কৃষ্ণ, হীরেন্দ্রনাথ। ধর্মকে অবলম্বন করিয়া জনসেবা—ব্রাহ্ম সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, হিন্দু মিশন।

[৩] আধুনিক বাঙ্গালার সংস্কৃত-চর্চা—রাধাকান্ত দেব, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, কালীপ্রসন্ন সিংহ, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, চন্দ্রকান্ত

তর্কালংকার, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, শিবচন্দ্র সার্বভৌম, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, পঞ্চানন তর্করত্ন, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণ।

[৪] বাঙ্গালার সাহিত্য—ঈশ্বরচন্দ্র, প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভূদেব, বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল. কালীপ্রসন্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকগণ।

[৫] বাঙ্গালার নবীন শিল্প-পদ্ধতি—ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা—অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও ইঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণ।

[৬] নাট্যশিল্পের প্রযোজনায় বাঙ্গালির কৃতিত্ব কী রঙ্গমঞ্চের কী চলচ্চিত্রের আধুনিক উন্নতিতে, সমগ্র ভারতে ও বিশ্বে স্বীকৃত। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, অপরেশচন্দ্র, অর্ধেন্দুকুমার, শিশিরকুমার প্রভৃতির নবীনত্ব ও কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ ছিল। চলচ্চিত্রে বাঙ্গালি প্রযোজকের নাম ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

[৭] রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত বাঙ্গালা সংগীতের নূতন ধারা; শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় এবং অন্যত্র উদয়শংকর প্রভৃতি বাঙ্গালি নৃত্যকলাবিদ্‌গণের দ্বারা প্রবর্তিত ভারতীয় নৃত্যের নূতন ধারা।

[৮] বাঙ্গালার সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টা ও সংরক্ষণ চেষ্টা—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, বিপিনচন্দ্র।

[৯] বাঙ্গালায় আরব্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন, এবং বঙ্কিম প্রমুখ বাঙ্গালি কর্তৃক ভারত-মাতার কল্পনা। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, যাত্রামোহন সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু।

[১০] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ে বাঙ্গালি পণ্ডিতদের গবেষণা—আশুতোষ, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ।

[১১] বাঙ্গালির প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ক সার্থক গবেষণা—রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরৎচন্দ্র দাস. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, রমাপ্রসাদ চন্দ, শরৎচন্দ্র রায়।

বাঙ্গালা সংস্কৃতিতে যে একাধারে পাণ্ডিত্য ও কৃতকারিতার অভাব নাই, তাহা আধুনিক বাঙ্গালার 'বাচস্পত্য' সংস্কৃত অভিধানের সংকলয়িতা তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং বাঙ্গালা 'বিশ্বকোষ'কার নগেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গত বিশিষ্ট বাঙ্গালি সংস্কৃতির কতকগুলি লক্ষণীয় অঙ্গ বা উপজীব্য বস্তু, অনুষ্ঠান ও প্রকাশের উল্লেখ করা গেল। বাঙ্গালার সংস্কৃতির গতির দিগ্‌দর্শনে ফিরিয়া আসা যাউক।

মোগল-যুগের মধ্যেই, বাঙ্গালা দেশে ইউরোপীয়—পোর্তুগিস, ওলন্দাজ, ফরাসি, দিনেমার ও ইংরেজ—আসিল। ইংরেজ ধীরে ধীরে দেশের রাজা হইয়া বসিল। বাঙ্গালির সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে, ইংরেজের সহিত সাহচর্যের ফলে, আর একবার যুগান্তর উপস্থিত হইল।

এই যুগান্তর এখনও চলিতেছে। ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্যন্ত, এই যুগান্তর ব্যাপারে আমরা চারিটি পর্যায় বা ক্রম দেখিতে পাই। (১) রামমোহন যুগ, (২) 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর যুগ, (৩) বঙ্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দ যুগ, ও (৪) অতি আধুনিক যুগ, বা লড়াইয়ের পরের যুগ।

[১] প্রথম যুগে ইউরোপীয় মনের সহিত বাঙ্গালি মনের প্রথম পরিচয়। এই প্রথম পরিচয়ের সময়ে, ভারতের প্রাচীন শিক্ষায় সুশিক্ষিত মন একটু সাবধানতা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিল, একেবারে নিজেকে বিকাইয়া দিতে চাহে নাই। রামমোহন এই যুগের প্রতীক। ইনি অসাধারণ-মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তখনকার দিনের সামাজিক জীবন ও নৈতিক আদর্শের ঊর্ধ্বে উঠিতে না পারিলেও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সার কথা উপনিষদকে আশ্রয় করিয়া তিনি ইউরোপের চিন্তার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের সভ্যতা যে একটা dynamic বা গতিশীল ব্যাপার, উপনিষদেই ইহার পর্যবসান নহে,—এই বোধ আংশিকভাবে রামমোহনের ও পরে তাঁহার বহু অনুগামীদের মনে না থাকায়, রামমোহনের প্রস্তাবিত সমাধান বা সামঞ্জস্য একদেশদর্শী রহিয়া গেল; এবং বৈরাগ্য-যুক্ত চিত্তের মানুষ না হওয়ায়, রামমোহন এ-দেশের মন যাহা চায়—তদনুরূপ ঈশ্বরে একান্তভাবে নিমজ্জিত লোকপূজিত ধর্মগুরু হইতে পারিলেন না।

[২] দ্বিতীয় যুগে বাঙ্গালি যুবকদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সহিত পরিচয়ের অভাবে, ইহার প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহারা নানা উপায়ে ইউরোপীয় মনোভাব—এমনকি ইউরোপীয় রীতিনীতি ও জীবন-যাত্রার প্রণালি—সমস্তই ভারতবর্ষের উপর আরোপ করিতে চাহিলেন। এরূপ উলট-পালট করিবার মতো সংখ্যা বা শক্তি তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু ইংরেজি-শিক্ষিত অথবা ইংরেজি শিক্ষাকামী জনগণের মধ্যে তাঁহারা একটি ছাপ দিয়া গেলেন।

[৩] তারপরে আসিল যথার্থ সাংস্কৃতিক সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা—এই চেষ্টায় ছিল—প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাকে রক্ষা করিয়া, ইউরোপীয় সংস্কৃতির যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও আমাদের পক্ষে হিতকর তাহা আত্মসাৎ করা। বঙ্কিম, ভূদেব ও বিবেকানন্দের যুগে—অর্থাৎ মোটামুটি ১৮৬০ হইতে ১৯০০ পর্যন্ত—জীবন ধীরমন্থর গতিতে চলিতেছিল; ইউরোপীয় সভ্যতা আজকালকার মতো এতটা সর্বগ্রাসীভাবে আমাদের সমক্ষে তখন দেখা দেয় নাই, আমাদের জীবনে আজকালকার মতো এত জটিল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাও আসে নাই। তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া ধীরে সুস্থে বিচার করিবার অবকাশ ছিল, তাই আমরা বঙ্কিমে ভূদেবে বিবেকানন্দে বাঙ্গালি জাতির পক্ষে হিতকর—তাহার সংহতি-শক্তিকে দৃঢ় করিবার উপযোগী এবং তাহাকে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিবার যোগ্য—কথা পাই; সমীক্ষা ও অনুশীলন ছিল বলিয়াই বঙ্কিম ও মধুসূদন বাঙ্গালির জন্য এমন চিরন্তন রস-সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যাহা বাঙ্গালির সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

[৪] এখন বাঙ্গালা সংস্কৃতিতে যে-যুগ চলিতেছে, তাহার মূল কথা হইতেছে—বাঙ্গালির জীবনে ইউরোপীয় সভ্যতায় প্রচণ্ড আঘাত বাঙ্গালির জীবনে ক্রমবর্ধনশীল অর্থনৈতিক অবনতি ও তাহার আনুষঙ্গিক মানসিক ও নৈতিক অবনমন, এবং আদর্শ-বিপর্যয়—বাঙ্গালির রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বনাশকর হিন্দু-মুসলমান বিরোধও এই যুগের চারিত্রিক এবং অর্থনৈতিক অবনতির একটা প্রধান কারণ। এখনকার কালে চারিদিক হইতে ইউরোপীয়

সমাজের প্রভাব বাঙ্গালির জীবনে আসিয়া পড়িতেছে। এই যে দ্রুত ভাব-বিনিময়—সংবাদপত্রের ও সাহিত্যের বহুল প্রচার, চলচ্চিত্র ও সবাক্‌চিত্র প্রভৃতির যুগে এরূপটি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অর্থনৈতিক অবস্থাবৈগুণ্যে বাঙ্গালির সামাজিক আদর্শও পরিবর্তিত হইতেছে; প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ, যাহা এতাবৎ কন্যাপণ এবং কন্যার সংখ্যাল্পতা হেতু নিম্নশ্রেণির বাঙ্গালিদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, অর্থনৈতিক সংকটে বেশি করিয়া ক্লিষ্ট হওয়ায় তাহা মধ্যবিত্ত ঘরেও আসিয়া পড়িতেছে; অকৃতদার পুরুষ ও অবীরা বা কুমারী নারী,—নূতন যুগের এই বৈশিষ্ট্য বহুশ বাঙ্গালি সমাজেও পরিব্যপ্ত হইতেছে ও হইবে। সহশিক্ষা-রূপ নূতন সমস্যাও আসিতেছে।

বাঙ্গালির উৎপত্তি ও তাহার ইতিহাস এবং কৃতিত্ব বিচার করিয়া, উপস্থিত সংকট-কালে তাহার মানসিক চর্চা সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলা যায়—

[১] বাঙ্গালি ভাবপ্রবণ জাতি, ইহা সত্য বটে,—কিন্তু এই ভাবপ্রবণতাই তাহার পূর্ণ পরিচয় নহে। বাঙ্গালি লক্ষণীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু সেই সাহিত্য, জগতে এমন অপূর্ব কিছু বস্তু নহে,—তাহার প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক কি শতখানেক বৈষ্ণব পদ এবং কতকগুলি আখ্যায়িকা এবং আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে কতকটা মধুসূদনের কাব্যাংশ, বঙ্কিমের খানকয়েক উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধ ও অন্য রচনা—মাত্র এই কয়টি জিনিস আমরা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থাপিত করিতে পারি। ভাটিয়া বা মারোয়ারি, অথবা পাঞ্জাবি বা হিন্দুস্থানিব তুলনায় বাঙ্গালি ব্যবসায়-বাণিজ্যে তেমন সুবিধা করিতে পারিতেছে না; ইহার কারণ নির্দেশ করিবার জন্য অমনিই সিদ্ধান্ত করা হইল, বাঙ্গালি কবি জাতি, ভাবপ্রবণ জাতি, তাহার মধ্যে কর্মশক্তি নাই, তাহার উৎসাহ ও উদ্যোগের সমস্তটাই ভাবুকের খেয়ালে, কবির কল্পনায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। আমরাও এই কথাটা যেন পাকে প্রকারে মানিয়া লইয়াছি, রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির পর হইতে, আমাদের সাহিত্যের সম্বন্ধে বেশ সচেতন গৌরব-বোধ আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, একটা গর্ব সুখে আমাদের চিত্ত ভরিয়া গিয়াছে। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান কার্যত ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-সংগীতরূপে গৃহীত হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে মারোয়াড়ির মতো কৃতিত্ব আমাদের মধ্যে না দেখিয়া, সকলেই আমাদের কল্পনা-শক্তিরই তারিফ করিতেছে; আমরাও সেই কথা সত্য ভাবিয়া, প্রেমানন্দে নাচিতেছি,—আমাদের ব্যর্থতাকে আমরা কেবল আমাদের প্রতিকূল অবস্থা অথবা দৈব দুর্বিপাক হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহার প্রতিকারের শক্তিকে খর্ব করিতেছি। আমাদের দেশের নেতারা কেহ সাহিত্যে, কীর্তনের গানে, আমাদের ভাবুক প্রাণের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কবিতা ও গান, ইহা-ই যেন হইল আমাদের মানসিক সংস্কৃতির চরম ফল। বার বার একটা কথা শুনিয়া, সেই কথা ক্রমাগত মন্ত্রের মতো জপ করিয়া, আমরা সেই কথাটাকে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতেছি।

কিন্তু বাস্তবিক এই কথাটাই কি ঠিক? আমরা কি কেবল ভাব-প্রবণ জাতি? আমাদের মধ্যে কি জ্ঞানের সাধনা, কর্মের সার্থকতা নাই—হয় নাই? আমার মনে হয়—ভাবুকতা, কল্পনা-প্রবণতা, সাহিত্য-রসে মশগুল হইয়া থাকা—ইহা আমাদের মানসিক সংস্কৃতির

একটা দিক্ মাত্র—ইহা সর্বপ্রধান দিক্ও নহে। প্রাচীনকালে কীর্তনের সভায় ও কবি বা পাঁচালি গানের আখড়ায়, বাউলের জমায়েতে ও মারফতি গানের মজলিসে যেমন বাঙালির সংস্কৃতি প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি পণ্ডিতের টোলে এবং বিচার সভায় তাহার জ্ঞানের দিক্‌টা প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের জ্ঞান-মন্দিরে বাঙ্গালি রিক্ত হস্তে যায় নাই। ভারতের সংগীতোদ্যানে বাঙ্গালা কীর্তন একটি বিশিষ্ট সুরভি পুষ্প, সন্দেহ নাই; কিন্তু নব্য ন্যায়, বাঙ্গালার সংস্কৃত কাব্য, বাঙ্গালার বৈষ্ণব-গোস্বামীদের সংস্কৃত গ্রন্থাবলি; বাঙ্গালার মধুসূদন সরস্বতী, এবং আধুনিক কালে বাঙ্গালার রামমোহন, বাঙ্গালার বিদ্যাসাগর, বাঙ্গালার কেশবচন্দ্র সেন, বাঙ্গালার বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গালি গবেষক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক—ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাড়াইতে ও ভারতের চিন্তাকে পুষ্ট করিতে ইঁহাদের দান কম নয়; ইঁহারা বাঙ্গালার মানসিক সংস্কৃতির অপর একটি দিক্—এবং একটি বড়ো দিক—নিছক ভাব-প্রবণতার অত্যাবশ্যক প্রতিষেধক দিককে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালি হিন্দুর এখন জীবন-মরণ সংকট উপস্থিত; আমাদের ভাবুকতা, কল্পনা প্রবণতা সবই শুখাইয়া যাইতেছে এবং অন্নের অভাবে তাহা আরও শুখাইয়া যাইবে। জাতির জীবনের স্ফূর্তি আশা, আনন্দ, উৎসাহ, জয়ের আগ্রহ না থাকিলে, সেই জাতির মধ্যে সত্যকার প্রাণবন্ত সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। আমাদের এখন সাহিত্য-সৃষ্টির সাহিত্য-চর্চার চেষ্টা কল্পনার আবাহন, ভাবুকতার সাধন—সে যেন যে গাছের গোড়া শুখাইয়া আসিতেছে, শিকড়ে যাহার রস নাই সেই গাছের আগডালে বারিসেচন করা। আমাদের জীবনে ভোগ করিবার, ত্যাগ করিবার কী আছে? অর্জন করিবার, জয় করিবার কী আছে? যেটুকু আছে, তাহা তো রক্ষা করিবারও পথ পাইতেছি না। এ অবস্থায় কী প্রকারের সাহিত্য আমাদের হাত দিয়া বাহির হইতে পারে? বাঙ্গালি হিন্দুর ঘরে আগুন লাগিয়াছে; রসচর্চা লইয়া মাতামাতি করা এখন তাহার পক্ষে নিতান্তই অশোভন দেখায়। এখন প্রাণধারণের, দুর্দিনের রাত্রে কোনো রকমে টিকিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। এখন তাহাকে সর্ব বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। এখন তাহার আত্মবিশ্লেষণ কার্যে তাহাকে জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তির আবাহন করিতে হইবে; যে-শক্তির পরিচয় সে দিয়াছে, সে শক্তি তাহার আছে, এবং সে-শক্তি তাহার কল্পনা বা ভাবুকতা হইতে কোনও অংশে কম নহে।

[২] প্রত্যেকে সমাজের মধ্যে দুই প্রকারের শক্তি কার্য করে—কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রাপ্রসারী, আত্মসমাহিতকারী এবং আত্মপ্রসারকারী। এই দুইয়ের সামঞ্জস্যে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়। কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালি সম্প্রতি একটু বেশি রকম করিয়া বহির্মুখী হইতে চাহিতেছে। এখানে জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া তাহাকে একটু অন্তর্মুখী করা, এখন তাহার প্রাণরক্ষার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিস্ফুরণের দোহাই দিয়া, ব্যক্তিগত জীবনে অবাধ স্বাধীন গতি এই কেন্দ্রপসারিত্বের একটি বাহ্য প্রকাশ। কিন্তু সমাজ-গত সমষ্টির বিভিন্ন অংশ-স্বরূপ ব্যক্তিগত ব্যষ্টি, যদি এই রূপে মুক্ত, স্বতন্ত্র ও সংঘ-বিচ্যুত হইয়া অবাধ গতি অবলম্বন করিয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সমাজ-সমষ্টি আর সমষ্টিবদ্ধ থাকে না। এক কথায় Social Discipline বা সমাজগত চর্যা বা নীতি বা বিনয় না থাকিলে, সমাজ ও জাতি টিকিতে পারে না। এখন বাঙ্গালির জীবনে বাহিরের ও ভিতরের নানা প্রতিকূলতার বিপক্ষে সংগ্রাম শুরু হইয়া গিয়াছে।

ব্যক্তিত্বের অবাধপ্রসারের সময় ইহা নয়; একমাত্রসংঘগতভাবে অবস্থান দ্বারাই ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন ও স্বার্থ উভয়ই রক্ষিত হইতে পারে। বাঙ্গালির জীবনে এই রক্ষয়িত্রী শক্তির উজ্জীবন করিতে হইবে—আবার সমাজকে, সংঘকে, জাতিকে ব্যক্তি বা ব্যষ্টির ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হইবে। সমাজকে কীভাবে এ-কার্য করা উচিত, তাহা অবশ্য বিচারসাপেক্ষ। রক্ষয়িত্রী শক্তি অর্থে নিছক গোঁড়ামি নহে। দেশ ও কালের উপযোগীভাবে নিজ জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি হইতে বিচ্যুত না হওয়া-ই হইতেছে সামাজিক জীবনে কার্যকর রক্ষণশীলতা। এ কাজের জন্য প্রথম আবশ্যক—জ্ঞান, আলোচনা, অনুশীলন; নিজের জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে, এবং বাহিরের জগতের প্রগতি বিষয়ে বাঙ্গালিকে আবার একটা বাঁধা ধরা discipline মানিতে হইবে—'ন্যায়-আঁকড়িয়া' হইয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে রাশ ছাড়িয়া দিলে, তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বলিতে হইবে।

[৩] বাঙ্গালি কর্মী নহে, তাহার এই একটা অপবাদ আছে। সত্য বটে, হাজারে হাজারে লাখে-লাখে বাঙ্গালি অন্ন-উপার্জনের জন্য বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া বাঙ্গালার বাহিরে যায় নাই—যেমন পাঞ্জাবি বা হিন্দুস্থানিরা বাঙ্গালায় আসিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, এতাবৎ বাঙ্গালির ঘরে একমুঠা ভাতের অভাব হয় নাই। সেদিন পর্যন্ত মধ্যবিত্ত ঘরের অন্নচিন্তা ছিল না। গরিব লোকে দেশে বসিয়াই পেট ভরাইতে পারিত, বা আধ-পেটা খাইয়া কোনো রকমে থাকিতে পারিত, ১৫।২০ টাকার জন্য কাঁচা মাথা দিবার আবশ্যকতা তাহার ছিল না, 'রুটি-অর্জন' করিতে বাহিরে ছুটিতে হইত না। এখন সে আবশ্যকতা আসিতেছে, আমার মনে হয়। তথাকথিত ভাব-প্রবণ বাঙ্গালি, কবি বাঙ্গালি এখন দরকার পড়িলে কর্মী বাঙ্গালি হইতে পিছপাও হইবে না। আবশ্যকতা পড়িয়াছে বলিয়াই ময়মনসিংহের বাঙ্গালি কৃষক এখন ঘর ছাড়িয়া আসাম প্রদেশ ছাইয়া ফেলিতেছে, বর্মা ও শ্যামে গিয়া বসবাস করিতেছে। দেখা গিয়াছে, কার্যক্ষেত্রে বাঙ্গালি অন্য জাতির লোকেদের চেয়ে কিছু কম কৃতিত্ব দেখায় নাই। মানুষের কর্ম-শক্তি অভ্যন্তর urge বা তাড়নার উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালির অবস্থা-বৈগুণ্যে সে-তাড়না আসিতেছে। বাঙ্গালিকে নূতন করিয়া শ্রমী ও কর্মী হইতেই হইবে। 'তুমি কবি ও ভাবুকের জাতি, তোমার দ্বারা এ-সব কিছু হইবে না', এইরূপ নিরুৎসাহ-বাক্যে তাহার শত্রুরাই তাহাকে নিবৃত্ত করিবে।

[৪] বাঙ্গালির বাঙ্গালিপনার বা বাঙ্গালিত্বের দিকে ঝোঁক দিয়া কেহ, কেহ তাহাকে অসম্ভব রকমে বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার মনে শক্তি জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালির মতন শিল্পী জাতি দুনিয়ায় নাই—প্রমাণ, বাঙ্গালি পটুয়ার পট, বাঙ্গালি ছুতারের কাঠ-খোদাই, মধ্য-যুগের বাঙ্গালার ইটে-কাটা মন্দিরের নক্শা; বাঙ্গালির নাচ অপূর্ব—প্রমাণ বাঙ্গালির মল্লনৃত্য, রায়বেঁশে নাচ, বাঙ্গালার কোনো-কোনো জেলার মেয়েদের মধ্যে বিলোপ-শীল ব্রত-নৃত্য। আমাদের দেশের গ্রাম-শিল্পকে আমরা প্রাণ দিয়া ভালোবাসিব। যতটা সাধ্য তাহাকে রক্ষা করিব। এই শিল্প আমাদের গ্রামীণ জীবনের একটি মনোহর অভিব্যক্তি, কিন্তু তাই বলিয়া, জগতের অন্য সমস্ত শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর জিনিসকে টেক্কা দিয়াছে আমাদের বাঙ্গালার এই শিল্প ও সৌন্দর্য-সৃষ্টি এরূপ কথা প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঙ্গালির মুখে হাস্যের উদ্রেক করিবে। সাহিত্যে একজন রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গমাতা অঙ্কে ধারণ করিয়াছেন, তাই বলিয়া যেমন ইহা প্রমাণিত হয় না যে, বাঙ্গালি মাত্রই কবি, তেমনি একজন অবনীন্দ্র বা নন্দলাল ভারতীর নিজ হস্ত হইতে তুলিকা পাইয়াছেন বলিয়া, সমগ্র বাঙ্গালি জাতির শিল্প-বিষয়ে অসাধারণত্ব সূচিত হয় না।

আমরা ভারতের আর পাঁচটি জাতির মতোই একটি প্রধান ভারতীয় জাতি। আমাদের ভাবুকতা আছে, আমাদের বুদ্ধি আছে, আমাদের যথেষ্ট শিল্প-বোধ আছে; ভারতের সভ্যতার ভাণ্ডারে হাত পাতিয়া আমরা কেবল লই নাই, দিয়াছিও যথেষ্ট; আমাদের সাহিত্য, আমাদের সংগীত, আমাদের বিদ্যা, গবেষণা ও আবিষ্কার, আমাদের হিন্দু-যুগের ও মধ্য-যুগের মন্দির-শিল্প ও ভাস্কর্য, পট ও ইটে-খোদাই,—এ-সব গর্ব করিবার বস্তু, ভারতের সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট প্রকাশ-স্বরূপ এগুলি বিশ্বজন-সমাজে দেখাইবার যোগ্য; এবং আমাদের সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব কোনো-কোনো বিষয়ে বিশ্বজনও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে, ও করিবে, এখানেই আমাদের পূর্ণ সার্থকতা। আমরা অনুচিত গর্ব করিতে চাহি না; তবে যে-কোনো অবস্থায় আমরা যে অকৃতকার্য হইব না—আমার পূর্ব কৃতিত্ব আলোচনা করিয়া সেইটুকু আত্মবিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকের মনে আনিতে চাহি।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। শেষ এই কথা বলি—অনার্য এবং আর্য পিতৃপুরুষ ও সংস্কৃতি-গুরুদের নিকট হইতে আমরা বাঙ্গালিরা যে-মনঃ-প্রকৃতি পাইয়াছি, তাহা নিন্দার নহে; আমাদের নৈসর্গিক পারিপার্শ্বিক ও ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া আমাদের মধ্যে যে-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনও পূর্ণাঙ্গ হয় নাই—আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম দিয়া তাহাকে প্রবর্ধমান করিয়া তুলিতে হইবে। উপস্থিত আমাদের মানস-প্রকৃতিতে কল্পনা ও ভাবুকতা এবং রসানন্দের দিকে ঝোঁক না দিয়া, আত্মরক্ষার জন্য আমাদের জ্ঞান ও কর্মের দিকেই বেশি করিয়া ঝোঁক দিতে হইবে—ইহাই আমার নিবেদন।।

রাঁচি হিন্দু ফ্রেন্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাব কর্তৃক আহুত সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ রূপে পঠিত, কার্তিক ২১, ১৩৪১ পরে, 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য' ওই নামে লেখকের একখানি প্রবন্ধ-সংকলনে পুনর্মুদ্রিত (বঙ্গাব্দ ১৩৪৫)। এই সংকলনে দু'বার পুনর্মুদ্রণের পর, ১৩৬৪ সালে, 'ভারত-সংস্কৃতি' নামে লেখকের অন্য একখানি প্রবন্ধ-সংগ্রহে ছাপা হয়। স্বল্প সংযোজন সহ 'ভারত সংস্কৃতি'র ১৩৭০ সালের সংস্করণে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে 'ভারত-সংস্কৃতি'তে মুদ্রিত পাঠের কিছু অংশ বাদ দিয়ে, প্রবন্ধটির সংক্ষেপিত রূপ পরিবেশন করা হল।

# বাংলার মুসলমানের কথা

কাজী আবদুল ওদুদ

### উৎপত্তি

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে প্রধানত রিজ্‌লি, বেভেরলি, হাণ্টার প্রমুখ পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তক্রমে এই মত প্রাধান্য লাভ করে যে, বাংলার মুসলমান বাংলার হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তর থেকে উদ্ভূত—ইসলামের তলোয়ারের জোরে তারা মুসলমান হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষে এর প্রতিবাদ করেন মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারের দেওয়ান খোন্দকার মোহম্মদ ফজ্‌লে রব্বি তাঁর হকিকত্-ই-মুসলমানান-ই-বাঙ্গালা নামক পারসি গ্রন্থে। *The Origin of the Musalmans of Bengal* নাম দিয়ে এর একটি ইংরেজি অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেন। এতে তিনি যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেন সে-সবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যুক্তিটি—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ইসলামের তলোয়ারের জোর কম ছিল না, কিন্তু সেখানে মুসলমানের সংখ্যা এত কম কেন? সৈনিকরূপে, উচ্চ রাজকর্মচারীরূপে, সম্ভ্রান্ত বাসিন্দারূপে, বহু মুসলমান যে বাংলার বাইরে থেকে বাংলায় এসেছিলেন দেওয়ান সাহেবের গবেষণায় তা অনেকখানি প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে আরও দুটি ব্যাপারের উল্লেখ করা যেতে পারে : পাঠানশাসনকালে বাংলাদেশ পাঠান-বসতির একটা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মোগলদের সঙ্গে তাদের যোঝাযুঝি যেমন প্রবল তেমনি দীর্ঘকালব্যাপী হয়েছিল। সেই বিপুল পাঠানদল বাংলা দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, তাদের সন্তান-সন্ততি এদেশে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে। দ্বিতীয়ত, পলাশিতে মুসলমানের ভাগ্যবিপর্যয়ের পরে মিরজাফর-প্রমুখ নবাবদের বহু পাঠান সৈন্য বিতাড়িত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহীদের মতো বহুদিন তারা এদেশে মজনু শা-র মতো নায়কদের অধীনে ফকির-বিদ্রোহ জিইয়ে রাখে। পরে পরে তারা এদেশের লোকসংখ্যায় মিশে যায়। যাঁরা বাংলা দেশের 'সম্ভ্রান্ত' মুসলমান তাঁদের অনেকে যে বাংলার বাইরে থেকে এদেশে এসেছেন দেওয়ান সাহেবের এই মত প্রমাণসহ বলেই মনে হয়।

কিন্তু তবু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই (দেওয়ান সাহেব অবশ্য অস্বীকার করতে চেয়েছেন) যে, বাংলার প্রাচীন অধিবাসীদের ভিতর থেকে বহু লোক কালে কালে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুসলমানের সংখ্যা পুষ্ট করেছে। তার সঙ্গে একথাও মনে

রাখতে হবে যে, বিজেতারা সাধারণত বিজিত দেশ থেকে স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে। এদেশে ইসলামপ্রচারের মূলে তলোয়ার যে প্রধান শক্তি নয়, প্রধান শক্তি মুসলমান ফকির-দরবেশদের প্রভাব, 'বঙ্গে সুফি প্রভাব'-এর লেখক ডক্টর এনামুল হকের গবেষণায় সম্প্রতি তার কিছু কিছু প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে। বাস্তবিক, বাংলায় মুসলমান দরবেশদের আগমন অতি প্রাচীন ব্যাপার। সেন-রাজত্বের শেষভাগে এমনি একজন দরবেশ বা শেখ নাকি এদেশে আসেন, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে রাজা লক্ষ্মণসেন তাঁর প্রসন্নতা বিধানের বিশেষ চেষ্টা করেন, 'সেকশুভোদয়া' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে তার বর্ণনা রয়েছে। শ্রীহট্টে শাহ্‌জালালের ধর্মপ্রচারও সুবিদিত।

এই মুসলমান দরবেশদের ধর্মপ্রচার কার্যকর হতে পেরেছিল যে-সব কারণে, সে-সবের মধ্যে দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ প্রথমত, বাংলার লোকদের পরিবর্তনমুখী প্রকৃতি, দ্বিতীয়ত, তদানীন্তন বাংলার ধর্ম-সংঘর্ষ যার অন্য নাম বৌদ্ধ-হিন্দু-সংঘর্ষ। বাংলা দেশকে যে এক সময়ে বৌদ্ধ দেশ বলা যেতে পারত, অনেক ঐতিহাসিকের এই মত। সেই বিরাট বৌদ্ধ সমাজ হিন্দুত্বের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-সমাজে মিশে যায়, এ মত বিচারসহ নয় বলেই মনে হয়। এদেশের নির্যাতিত সমাজ সেই দিনে বিজয়ী মুসলমানদের প্রতি কী দৃষ্টিতে চেয়েছিল, সে-সম্বন্ধে রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের একটি বর্ণনা সুবিখ্যাত ঃ

জাজপুর পুরবাদি[১] সোলসঅ ঘর বেদি[২]
বেদি লয় কেবোল দুর্জন।
দখিন্যা[৩] মাগিতে যাঅ জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিয়া পুড়ায় ভুবন[৪]।।
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের[৫] নাঞিক দিসপাস।
বলিষ্ঠ হইল বড় দস বিষ হয়্যা জড়
সদ্ধর্মিরে[৬] করএ বিনাস।।
বেদ করে উচ্চারণ বের‍্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিআ সভাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান।।
এইরূপে দ্বিজগন করে সৃষ্টি সংহারন
ই বড় হোইল অবিচার
বৈকণ্ঠে ডাকিআ ধর্ম্ম মনেতে পাইয়া মর্ম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার[৭]।।
ধর্ম্ম হৈল্যা জবন রূপি মাথাএ ত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিকচ কামান[৮]।

১. পুরবাদি—পূর্ব প্রভৃতি দিক; ২. বেদি—বৈদিক; ৩. দখিন্যা—দক্ষিণা; ৪. ভুবন—ভবন। ৫. জালের—আরবি জাল—ভুলভ্রান্তি, অপরাধ। ৬. সদ্ধর্মি—বৌদ্ধ ৭. অন্ধকার—পাঠান্তরে খনকার—ফারসি খুনকার—রাজা, প্রভু। ৮. ত্রিকচ কামান—ফারসি তীরকশ=ধনু, কামান=ধনু (ফারসি)।

চাপিয়া উত্তর হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়

খোদায় বলিয়া এক নাম।।

নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত[৯] অবতার

মুখেতে বলেত দম্বাদার[১০]।

যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন

আনন্দেতে পরিল ইজার[১১]।।

ব্রহ্মা হৈল মহাঁমদ[১২] বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর[১৩]

আদম্ফ[১৪] হৈল সুলপানি।

গনেশ হৈল গাজী[১৫] কার্তিক হৈল কাজি[১৬]

ফকির[১৭] হইল্যা যত মুনি।।

তেজিয়া আপন ভেক[১৮] নারদ হইলা সেক[১৯]

পুরন্দর হইল মলনা[২০]।

চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে

সভে মিলে বাজায় বাজনা।।

আপুনি চণ্ডিকা দেবি তিহুঁ হৈল্যা হায়া বিবি[২১]

পদ্মাবতী হল্য বিবি নূর।[২২]

জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে এক মন

প্রবেশ করিল জাজপুর।।

দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে

পাখড় পাখড়[২৩] বোলে বোল।

ধরিআ ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়

ই বড় বিসম গণ্ডগোল।।

বৌদ্ধদের অথবা বৌদ্ধসমাজ থেকে সদ্য-হিন্দুসমাজে-আগতদের মুসলমান-ধর্ম গ্রহণে আনুকূল্য করেছিল যে-সব কারণ, সে-সবের মধ্যে এই দুটির কথা ভাবা যেতে পারে ঃ বৌদ্ধদের মতোই এই নবাগত ধর্ম মূলত নিরাকারবাদী ও জাতিভেদহীন, আর বৌদ্ধদের অনুরূপ অলৌকিকতা-প্রীতি ও গুরুপূজা এই নবাগত ধর্মে ছিল। বাংলার লোকদের প্রকৃতি যে পরিবর্তন-লোলুপ, তার একটি প্রমাণ ইংরেজ আমলেও মিলেছে ঃ খ্রিস্টান ধর্ম এদেশে

৯. ভেস্ত—বেহেশ্‌ত=স্বর্গ; ১০. দম্বাদার—দম্‌মাদার, কথিত আছে ১৪৩৩ সালে প্রায় ৪০০ বৎসর বয়সে মাদার পীরের মৃত্যু হয়। ১১. ইজার—পাজামা।

১২. মহাঁমদ—মোহম্মদ; ১৩. পেকাম্বর—পয়গম্বর=ঈশ্বরের বার্তাবহ; ১৪. আদম্ফ—আদম=আদি মানব; ১৫. গাজী=যোদ্ধা; ১৬. কাজি=বিচারক; ১৭. ফকির=সন্ন্যাসী; ১৮. ভেক=বেশ; ১৯. সেক—শেখ=সম্মানিত ব্যক্তি (এখানে ধর্মগুরু); ২০. মলনা—মওলানা; ২১. হায়া বিবি=হাওয়া বিবি Eve; ২২. নুর=বিবি ফাতেমা—হজরত মোহম্মদের কন্যা; ২৩. পাখড় পাখড়=পাকড়াও।—বসুমতী সংস্করণ।

ব্যাপ্ত হতে পারেনি সংস্কার-আন্দোলনের ফলে—হিন্দু আর মুসলমান দুই সমাজেই—কিন্তু বাংলায় ইউরোপের প্রভাব যত ব্যাপক ও গভীর, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আজও তত নয়।

বাংলার মুসলমানের অতীত সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পারা গেছে তাতে বলা যায়, বহু উপাদানে এ সমাজ গঠিত। বৌদ্ধ ও হিন্দু উপাদান, অর্থাৎ আদিম বাঙালি উপাদান, তাতে প্রচুর নিঃসন্দেহ, কিন্তু আরবি, পারসি ও পাঠান উপাদানও তাতে নগণ্য নয়। চট্টগ্রামের পথে বহু আরব যে বাংলায় আসে চট্টগ্রামের ভাষায় আরবি ভাষার প্রভাব তার এক বড়ো প্রমাণ। পারসিক যারা এদেশে এসেছিল তারা সংখ্যায় কম, সাধারণত রাজকর্মচারী। আর এসেছিল পাঠান—উচ্চ ও নীচ উভয় শ্রেণির। পাঠান জমিদার-বংশ এখনও বাংলায় দুর্লভ নয়।

বাংলার মুসলমানের অতীত বলতে একটা দীর্ঘকালের ব্যাপার বোঝায়—মুসলমান এদেশে যখন থেকে এসেছে তখন থেকে ইংরেজ-শাসনের সূচনা পর্যন্ত, অর্থাৎ দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। এই দীর্ঘকাল যে এদেশের মুসলমানসমাজ একই অবস্থার ভিতর দিয়ে কাটায়নি তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তার সেই সামাজিক ইতিহাসের একটা পরিচ্ছন্ন রূপ আঁকবার মতো সামর্থ্য আজও এদেশের ঐতিহাসিকদের লাভ হয়নি। শুধু এই কথাটা বলা যায় যে মুসলমানের প্রথম অবস্থার স্বাতন্ত্র্য ও বিজয়-দর্পণ কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে যে ভাবে অঙ্কিত হয়েছে, পরে পরে তার সমূহ পরিবর্তন ঘটে। হিন্দু আর মুসলমান-সমাজের স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিহ্ন হয়নি কোনো দিন কিন্তু উভয় সমাজের শ্রেষ্ঠ চিন্তা-ভাবনার ধারা যে কালে প্রায় একমুখী হয়ে পড়ে, বাউল-সাহিত্য ও মুসলমান-বৈষ্ণব-কবিদের রচনা তার প্রমাণ। মধ্য যুগে সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের এই ধরনের মিলনের মনোজ্ঞ বর্ণনা রয়েছে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা গ্রন্থে।

মধ্যযুগে হিন্দু-চিন্তাধারার সঙ্গে মুসলমানের চিন্তাধারার এই ধরনের অভিন্নতা সাধারণত একালের শিক্ষিত মুসলমানদের দুঃখ দেয়। তাঁদের ধারণা, এটি এদেশে মুসলমানের আত্মবিলোপের পরিচয়—ইসলামের সত্যকার আদর্শ যে কালে কালে এদেশের মুসলমানদের মধ্যে শিথিল হয়ে যায়, তার এক রূঢ় প্রমাণ। এই মতের জন্মকথাও আমাদের আলোচনার বিষয় হবে কিন্তু আপাতত বলা দরকার যে, এই ওহাবি-প্রভাবান্বিত মতকে সত্য বলে গ্রহণ করলে দীর্ঘ সুফি-সাধনাকে ইসলামের ইতিহাসে একটি উপদ্রব বলেই গণ্য করতে হয়—মুসলমান-সমাজ ব্যাপকভাবে আর অনেক চিন্তাশীল মুসলমান বিশেষভাবে আজও তেমন মনোভাব পোষণের বিরোধী।

### একালের সূচনা বা ব্রিটিশ যুগ

যে কারণে বাংলার মুসলমানের সেকাল আর একাল বলতে আমরা তার ব্রিটিশ-পূর্ব আর ব্রিটিশ-পরবর্তী অবস্থা বুঝতে চাচ্ছি তা সামান্য নয়। এই ব্রিটিশ-পরবর্তী কালে

এদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা যে ব্যাপকভাবে হীন হয়ে পড়েছে তা যথার্থ। এ সম্পর্কে আমাদের প্রধান আশ্রয়স্থল হান্টার সাহেবের সুবিখ্যাত কিন্তু অধুনা দুষ্প্রাপ্য *Our Indian Mussalmans* গ্রন্থ—১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। তাতে লেখকের অকুণ্ঠিত মত এই ঃ

১৭০ বৎসর পূর্বে বাংলা দেশে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল; আজ ধনী থাকাই তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব।*

কিন্তু এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতির চাইতেও বড়ো কারণ এই বিভাগের মূলে আছে। এই কালে মুসলমান সমাজের চিন্তাধারায় যে সমূহ পরিবর্তন ঘটে সেটি বিশেষভাবে লক্ষ করবার বিষয়। এই পরিবর্তন সংঘটিত হয় ওহাবি-আন্দোলনের ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যা সমবয়সী, আর যার মূলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ প্রবলভাবে বিদ্যমান। এই ব্রিটিশ-পরবর্তী যুগকে মুসলমান-সমাজের জন্য ওহাবি-যুগও বলা যেতে পারে। কিন্তু ওহাবি-আন্দোলন ও তার বিচিত্র পরিণতি যখন এদেশে ব্রিটিশ প্রভাবেই বিশেষভাবে ঘটে, তখন এর প্রাক্-ব্রিটিশ আর ব্রিটিশ-পরবর্তী নামকরণই বেশি সংগত মনে হয়।

ওহাবি মতবাদ সম্বন্ধে গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য নয়। এর মূল ইসলামের ইতিহাসে গভীরভাবে প্রোথিত। কোরআনের কোনো উক্তি সম্বন্ধে "কেন?" এই প্রশ্ন করা চলবে না, কোরআনে যা আছে, যে ভাবে আছে, তাইই মানতে হবে, এই যে বিচারবিরোধী মত, এটি অষ্টম শতাব্দীর ইমাম আবু হানিফার বিচার-বাদের মতোই সুপ্রাচীন। কিন্তু প্রথমে ইসলামের ইতিহাসে বিকাশের সুযোগ পায় বিচার-বাদ। একাদশ শতাব্দীর ইমাম গাজ্জালির সময় থেকে বিচার-বাদ দুর্দশাগ্রস্ত হয় ও সুফি-বাদ মুসলমান সমাজে প্রাধান্য লাভ করে, এ কথা বলা যায়। সুফি-মত বহুমতের সমষ্টি। তবে সে-সবের একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে, তাতে গুরুর আনুগত্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়। শাস্ত্রকেও সুফিরা মানেন, কিন্তু পির বা গুরুকে বিশেষভাবে মানেন; সত্যের সত্যকার ভাণ্ডারী গুরু—এই তাঁদের বিশ্বাস, আর তাঁদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—বিশ্বের যিনি বিধাতা তাঁর সঙ্গে প্রেমের যোগ বা পরমাত্মীয়তা স্থাপন করা। সুফি-মত মুসলমান-জগতে ও মুসলমান-সংশ্লিষ্ট জগতে দীর্ঘকাল প্রভাব বিস্তার করে চলে। চতুর্দশ শতাব্দীতে সুফি-মতের এই গুরুবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উত্থাপন করেন ইমাম ইব্‌নে তায়মিয়া। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন কিন্তু সুফি-প্রাধান্য খর্ব করতে পারেন না। সুফি-বাদের আনুষঙ্গিক গুরুপূজা তার অশেষ বৈচিত্র্য নিয়ে মুসলমান-জগতে ব্যাপকভাবে প্রভাবশীল হয়ে চলে। এর বিরুদ্ধে আবার প্রবল আন্দোলন উত্থাপন করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরব-বীর আবদুল ওয়াহ্‌হাব। রাজনৈতিক বলও তাঁর লাভ হয়। তাঁর প্রচার মুসলমানজগতে বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে। তাঁরই পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রায়বেরেলি নিবাসী শাহ্ সৈয়দ আহ্‌মদের প্রচারে ভারতে ওহাবি আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে।

* A hundred and seventy years ago it was almost impossible for a wellborn Mussalman in Bengal to become poor; at present it is almost impossible for him to continue rich (p. 155).

ওহাবী-মতকে সহজেই ধারণা করা যেতে পারে ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসে একটি বিশেষ ধর্মমত বলে—হজরত মোহম্মদের দৈনন্দিন জীবনযাপন-পদ্ধতি একান্ত অনুসরণ যাতে অতি বড়ো ধর্মাদির্শ জ্ঞান করা হয়। কিন্তু একালে এর আশ্চর্য প্রসারের মূলে যে শুধু ধর্মব্যাকুলতা নয় বরং এর খুব বড়ো কারণ রাজনৈতিক, একথা না বুঝলে ওহাবি আন্দোলনের গুরুত্ব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধেই মুসলমান-জগতে ধ্বংসের চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, অপর পক্ষে ইউরোপীয় জাতিদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই সংকটে মুসলমান চিন্তাশীলদের মনে একথা প্রবলভাবে জাগা বিচিত্র নয় যে ইসলামের প্রতিশ্রুতি এই যে, তার অনুবর্তীরা জগতে জয়ী হবে, কিন্তু আজ তারা পরাজিত হচ্ছে কেন? ওহাবি-চিন্তা-নায়করা এই উত্তর নিজেদের অন্তরে পান যে, ইসলাম তার প্রবর্তকের হাতে যে-রূপ লাভ করেছিল তার সমূহ পরিবর্তন ঘটেছে—সেটি এক মহা অপরাধ।

আরবের ওহাবি-আন্দোলনকে বলা যায় মুখ্যত ধর্মান্দোলন—তার রাজনৈতিক রূপ অনেকখানি প্রচ্ছন্ন। কিন্তু ভারতের ওহাবি-আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপ অত্যন্ত অপ্রচ্ছন্ন। অষ্টাদশ শতাব্দী ভারতীয় মুসলমানের জন্য এক গভীর চেতনাহীনতার শতাব্দী, সৈয়দ গোলাম হোসেন যার রূপ তাঁর "সিয়ারুল্ মোতাআখেরীন" গ্রন্থে নিপুণ হস্তে এঁকেছেন। এই চেতনাহীনতার কালে একে একে ভারতীয় মুসলমানের রাজ্য গেল, ধনৈশ্বর্য গেল, সম্ভ্রম গেল, কিন্তু এত বড়ো সর্বনাশ যে তার হল সে-চেতনা তার জাগল বহু দেরিতে—এমন সময়ে যখন কপালে করাঘাত করা ভিন্ন আর কিছু তার করবার নেই। কিন্তু এই অবস্থায়ও সে একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে প্রাণপণ চেষ্টা করলে—ভারতীয় ওহাবি আন্দোলনের তাই-ই প্রথম ও প্রধান পরিচয় (অবশ্য তার পরবর্তী পরিচয়ও কম অর্থপূর্ণ নয়।) ওহাবিদের প্রথমে যুদ্ধ বাধে শিখদের সঙ্গে, তারপরে দীর্ঘকাল ধরে তাদের অক্লান্ত অভিযান চলে ইংরেজের বিরুদ্ধে। শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদের ফতোয়া *Our Indian Mussalmans* গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে এই ভাবে*:

শিখজাতি দীর্ঘদিন লাহোরে ও অন্যান্য জায়গায় প্রভুত্ব করে আসছে, তাদের উৎপীড়ন সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গেছে। শত সহস্র মুসলমানকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, শত সহস্র মুসলমানের উপরে তারা অপমানের গুরুভার চাপিয়েছে। মসজিদে মসজিদে আজান আর হতে পারে না, গোহত্যা তারা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের এই অপমানকর অত্যাচার যখন একেবারে অসহনীয় হয়েছে তখন হজরত সৈয়দ আহ্‌মদ (তাঁর সৌভাগ্য সুচিরস্থায়ী হোক) কেবলমাত্র ধর্ম রক্ষা হেতু কতিপয় মুসলমান সমভিব্যাহারে

---

* The Sikh nation has long held sway in Lahore and other places. Their oppressions have exceeded all bounds. Thousands of Muhammadans have they unjustly killed, and on thousands they have heaped disgrace. No longer do they allow the Call of Prayer from the mosques, and the killing of cows they have entirely prohibited. When at last their insulting tyranny could no more be endured, Hazrat Sayyid Ahmad (may his fortunes and blessings ever abide) having for his single object the protection of the Faith, took with him a few Mussalmans, and going in the direction of Kabul and Peshawar, succeeded in rousing Muhammadans from their slumber of indifference and nerving their courage for action. Praise be to God, some thousands of believers became ready at his call to tread the path of God's service; and on the 21st December, 1836 the Jihad against the infidel Sikhs begins (P. 15).

কাবুল ও পেশোয়ারের দিকে গমন করেন ও মুসলমানদের অনবধানতার নিদ্রা দূর করে তাদের অন্তরে কর্মের সাহস সঞ্চার করেন। আল্লাহ্‌র মহিমা—তাঁর এই আহ্বানে কয়েক সহস্র ইমানদার আল্লাহ্‌র সেবার পথচারী হতে প্রস্তুত হন; আর কাফের শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ আরম্ভের তারিখ হচ্ছে ২১শে ডিসেম্বর, ১৮২৬ সাল।

ইংরেজের বিরুদ্ধে তাদের প্রচারের ধারাও উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে* ঃ

"যারা অপরকে জেহাদ অথবা হিজরত (দেশত্যাগ) থেকে নিরস্ত করতে চায় তারা মোনাফেক (ভণ্ড) একথা সবাই জেনে রাখুক। যে দেশে মুসলমান ধর্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম রাজশক্তির অধিকারী সেখানে মোহম্মদের ধর্মনীতি প্রভাবশালী হতে পারে না। মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ও কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। যারা যুদ্ধে যোগ দিতে অসমর্থ তাদের কর্তব্য হচ্ছে সত্যধর্মশাসিত কোনো দেশে হিজরত করা। বর্তমান কালে হিন্দুস্থানে হিজরত একটি কঠোর কর্তব্য। যে এ কথা অস্বীকার করে সে বলুক যে সে ভোগ-বিলাসের দাস। যে হিজরত করে ফিরে আসে সে জানুক যে তার সমস্ত অতীত ধর্ম-কর্ম বৃথা হয়েছে। যদি হিন্দুস্থানে তার মৃত্যু হয় তবে মুক্তির পথ তার মিলবে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়—ভাই সব, আমাদের অবস্থার জন্য আমাদের অশ্রুপাত করা উচিত, কেননা আল্লাহ্‌র নবি এই কাফেরিস্তানে বাসের জন্য আমাদের উপরে ক্রুদ্ধ। যখন আল্লাহ্‌র নবিই আমাদের উপর অসন্তুষ্ট তখন কার কাছে আমরা আশ্রয় পাব? আল্লাহ্ যাদের সংগতি দিয়েছেন তাদ্দের হিজরতের জন্য কৃতসংকল্প হওয়া উচিত, কেননা এখানে আগুন লেগে গেছে। যদি আমরা সত্য কথা বলি তবে আমাদের মৃত্যু বরণ করতে হবে, আর যদি চুপ করে থাকি তবে আমাদের ধর্মে আঘাত পড়ে।"

এ থেকে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষ যে অমুসলমান রাজ্য দারুল্ হর্‌ব্ হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ মুসলমান-ধর্মানুমোদিত শাসন এদেশে অসম্ভব হয়ে পড়েছে, এতেই ওহাবিদের যত বিক্ষোভ। তাই মনে হতে পরে ধর্ম-সম্বন্ধীয় কারণই এই বিক্ষোভের মূলে। এক হিসাবে ব্যাপারটা তাই-ই। কিন্তু ধর্ম এখানে প্রচলিত অর্থের ধর্ম নয়, এখানে ধর্মের বিশেষ অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার, হান্টার সাহেব তাঁর বইয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে সে-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য এই ঃ মুসলমান শাস্ত্র মতে আমান-ই-আউয়াল, যেখানে মুসলমানেরা ভোগ করতে পারে না, সেটি অমুসলমান

* Those who would deter others from Holy war or Flight are in heart hypocrites. Let all know this. In a country where the ruling religion is other than Muhammadanism, the religious principles of Muhammad cannot be enforced. It is incumbent on Muhammadans to join together, and wage war upon the infidels. Those who are unable to take part in the fight should emigrate to a country of the True Faith. At the present time in India Flight is a stern duty. He who denies this, let him declare himself a slave to sensuality. He who having gone away, returns again, let him know that all his past services are vain. Should he die in India, he will lose his way to salvation.—In short, O Brethren, we ought to weep over our state, for the messenger of God is angered with us because of our living in the land of the infidel. When the Prophet of God himself is displeased with us, to whom shall we look for shelter? Those whom God has supplied with the means should resolve upon flight, for a fire is raging here. If we speak the truth, we shall be strangled; and if we remain silent, injury is done to our faith (p. 70).

রাজ্য—দারুল্ হর্ব্। আমান-ই-আউয়াল-এর অর্থ যাঁরা করেন ধর্ম-চর্চার অধিকার আর সেই বিবেচনা থেকে ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষকে দারুল্ ইসলাম (ইসলামি রাজ্য) বলেন, হাণ্টার সাহেবের মতে তাঁরা ভ্রান্ত। আমান-ই-আউয়াল-এর অর্থ* ঃ

মুসলমানেরা তাঁদের নিজেদের রাজত্বকালে যে-নির্বিঘ্নতা ও ধর্মগত অধিকার ভোগ করতেন তার সমগ্রতা।

মুসলমানের সেই সব অধিকার কেমন করে নিশ্চিহ্ন হল যথেষ্ট সমবেদনার সঙ্গে হাণ্টার সাহেব তার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে দীর্ঘ অংশের উদ্ধার আমাদের করতে হবে, কেননা বিষয়টি সাধারণত অপরিজ্ঞাত এবং কৌতুকাবহ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় মুসলমানের আশ্চর্য চেতনাহীনতার কথা বলা হয়েছে। তাদের সেই চেতনাহীনতার সঙ্গে এদেশে ইংরেজের রাজ্যবিস্তার এমন সন্তর্পণে নিষ্পন্ন হয়ে চলল যে, এত বড়ো একটা পরিবর্তনের কথা দুই পক্ষেরই অজানা রইল দীর্ঘকাল ধরে। এ সম্বন্ধে হান্টার সাহেবের উক্তি এই** ঃ

"ইংরেজরা বাংলা দেশ লাভ করেছিলেন দিল্লির বাদশাহের প্রধান তহশিলদাররূপে মাত্র। মোটা ঘুষ না দিয়ে তলোয়ারের জোরে আমরা এই পদ পেয়েছিলাম। কিন্তু আইনত আমরা লাভ করেছিলাম মাত্র দেওয়ানের পদ অথবা প্রধান-রাজস্ব-আদায়কারীর পদ। (মিঃ এইচিসনের গ্রন্থে, অথবা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৮১২ সালের সংগৃহীত দলিলের ১৬ থেকে ২০ সংখ্যায়, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্টের ফরমান দ্রষ্টব্য)। এজন্য মুসলমানেরা দাবি করেন যে মুসলমান শাসন-পদ্ধতি চালাবার ভার যে আমরা নিয়েছিলাম তা নিষ্ঠার সঙ্গে নিষ্পন্ন করতে আমরা আইনত বাধ্য ছিলাম। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে এই সন্ধির সময়ে উভয় পক্ষের মনে এই কথাই ছিল। কিছুকাল পর্যন্ত ইংরেজরা মুসলমান কর্মচারীদেরই তাঁদের বিভিন্ন পদে বহাল রেখেছিলেন। আর এর সংস্কারে যখন তাঁরা হাত দিতে আরম্ভ করলেন তখন অত্যন্ত সংযতভাবে এমনকী ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হলেন।

কিন্তু পরিবর্তন যা ঘটবার তা কালে কালে ঘটল আর তার ফলও প্রত্যক্ষ হলো*** ঃ

* The whole security and full religious status which the Muhammadans formerly enjoyed under their own rule (p. 126)

** The English obtained Bengal simply as the Chief Revenue Officer of the Delhi Emperor. Instead of buying the appointment by a fat bribe we won it by the sword But our legal title was simply that of the Dewan or Chief Revenue Officer. (See the Firman of the 12th August, 1765 in Mr. Aitchison's Treaties. in the Quarto collection put forth by the East India Company in 1812, XVI to XX). As such the Muhammadans hold that, we were bound to carry out the Muhammadan system which we then undertook to administer. There can be little doubt, I think, that both parties to the treaty at the time understood this. For some years the English maintained the Muhammadan Officers in their posts; and when they began to venture upon reform, they did so with a caution bordering on timidity.

*** The greatest blow which we dealt to the old system was in one sense an underhand one, for neither the English nor the Muhammadans foresaw its effects. This was the series of changes introduced by Lord Cornwallis and Sir John Shore ending in the Permanent Settlement of 1793. By it we usurped the functions of those higher Mussalman officers who had formerly

প্রাচীন ব্যবস্থার মূলে সব চাইতে বড়ো আঘাত যা পড়ল তা এক হিসাবে অলক্ষিত ভাবে কেন-না ইংরেজ অথবা মুসলমান কেউই এর পরিণামের কথা ভাবেনি। সেই আঘাত হচ্ছে লর্ড কর্নওয়ালিস ও সার জন শোর প্রবর্তিত সংস্কার-পরম্পরা যার পরিণতি হল ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। এই-সংস্কারের ফলে আমরা অধিকার করলাম সেই সব উচ্চ মুসলমান-রাজপুরুষদের আসন যাঁরা রাজশক্তি ও প্রজার নিকট থেকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে রাজস্ব সংগ্রহকারী এই দুয়ের মধ্যবর্তী ছিলেন, আর যাঁদের নিযুক্ত কর্মচারীদের হাতেই ছিল ভূমিকর আদায় সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থার ভার। ঢালি-ঘোড়সওয়ার সমন্বিত মুসলমান তহশিলদারদের পরিবর্তে আমরা জেলায় জেলায় স্থাপন করলাম এক একজন ইংরেজ কালেক্টার, তাঁর আদালতের সঙ্গে সংযুক্ত হল ধর-পাকড়-নিলাম ইত্যাদির ক্ষমতাযুক্ত আমলাদের মতো অস্ত্রহীন বরকন্দাজ। উচ্চশ্রেণির মুসলমানেরা (এর ফলে) হয় ভূমিকরের সঙ্গে তাঁদের পূর্বের সম্পর্ক হারালেন অথবা মাত্র ভূম্যধিকারী হলেন, ভূমিজাত লভ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি বর্জিত একটি সামান্য অংশ-মাত্রে রইল তাঁদের অধিকার।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই পরিবর্তনের সূচনা হল না বরং এর পরিণতি ঘটল। আর-একভাবে বড়ো বড়ো মুসলমান ঘরের পক্ষে এটি বিষম ক্ষতির কারণ হল—এই বন্দোবস্তের প্রবণতা হল যেসব হিন্দু কর্মচারী সাক্ষাৎভাবে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়-আদি করতেন তাঁদের জমিদার বলে স্বীকার করার দিকে। ১৭৮৮-৯০ সালের ভূমি-বন্দোবস্তের হাতেলেখা রিপোর্ট আমি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি; ১৭৯৩ সালের আইন-সংগ্রহে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের কথা কিছু থাকলেও এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে সেই দিনের ভূমিকর-

subsisted between the actual collector and the Government, and whose dragoons were the recognized machinery for enforcing Land-Tax. Instead of the Mussalman Revenue-Farmers with their troopers and spearmen, we placed an English collector in each District with an unarmed fiscal police attached like common bailiffs to his court. The Muhammadan nobility either lost their former connection with the Land-Tax or became mere land-holders with an inelastic title to a part of the profits of the soil.

The Permanent Settlement, however, consummated rather than introduced this change It was in another respect that it most seriously damaged the position of the great Muhammadan Houses. For the whole tendency of the settlement was to acknowledge as the land-lords the subordinate Hindu officers who dealt directly with the husbandmen I have carefully gone over the Mss. Settlement Reports of 1788—1790, and notwithstanding the clauses touching intermediate holders in the code of 1793, it is clear to me that our Revenue officers of those days had an eye to only three links in the previous system—the state, the local agent or landholder who collected direct from the peasantry, and the husbandmen who tilled the soil These were the three features of the former administration requisite to our new plan, and by degrees all the other links of the Muhammadan Revenue system were either extruded or allowed to drop out. For Example the provision respecting the separation of Independent Talukdars was in itself fatal to the greatness of many a Muhammadan House. Such a family, although it might grant away part of its territory in permanent farms, always exercised a sort of Jurisdiction over its subordinate holders and when occasion demanded, managed to extreat cesses or benevolences, in short money in one form or other, from them. The officer (Mr. James O'Kinealy, C. S ) who has studied the Permanent Settlement most intimately in connection with the present Muhammadan disaffection (Wahhabi Rebellion writes thus :— It elevated the Hindu collectors, who upto that time had held but unimportant posts, to the position of land-holders, gave them a proprietory right in the soil, and allowed them to accumulate wealth which would have gone to the Mussalmans under their own Rule.

আদায়কারী কর্মচারীদের পূর্ববর্তী ব্যবস্থার মাত্র তিনটি অংশের দিকে দৃষ্টি ছিল—সরকার, প্রজার কাছ থেকে যিনি সাক্ষাৎভাবে খাজনা আদায় করতেন সেই স্থানীয় আমলা অথবা জমিদার, আর জমি যারা চাষ-আবাদ করত সেই প্রজারা। আমাদের নতুন ব্যবস্থায় মাত্র এই তিনটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়েছিল; এ ভিন্ন মুসলমান আমলের ভূমিকর আদায় সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থা হয় বাদ দেওয়া হয়েছিল না হয় আস্তে আস্তে বাদ পড়ে গিয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই ব্যাপারটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্বাতন্ত্র্যভোগী তালুকদারদের বিষয়-বন্দোবস্ত সম্পর্কে বিধি অনেক বড়ো বড়ো মুসলমান ঘরের জন্য সমূহ বিপত্তির কারণ হল; পূর্বের নিয়ম অনুসারে এই সমস্ত ঘর তাঁদের তালুকদারির বিভিন্ন অংশ চিরস্থায়ী ভাবে পত্তন দিলেও পত্তনীদারদের উপরে তাঁদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হত না। প্রয়োজন হলে সেস বা চাঁদা অর্থাৎ কোনো না কোনো রকমে অর্থ তাঁদের কাছ থেকে তাঁরা আদায় করতে পারতেন। বর্তমান মুসলিম অসন্তোষ (ওহাবি বিদ্রোহ) সম্পর্কে যিনি (মিঃ জেম্‌স্‌ ও' কিনিলি, সি, এস্‌) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষ যত্ন সহকারে অনুধাবন করেছেন তিনি লিখেছেন—এর ফলে যে সমস্ত হিন্দু ভূমিকর-আদায়কারী এতদিন নগণ্য পদের অধিকারী ছিলেন তাঁরা হলেন জমিদার, জমির মালিকানা স্বত্ব তাঁদের হল, আর মুসলমান আমলে যেসব টাকা মুসলমানদের ঘরে যেত তা গেল তাঁদের ঘরে।"

কিন্তু চিবস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার উপরে যা হল তার চাইতেও গুরুতর হল Resumption Proceedings—নিষ্কর বাজেয়াপ্তের ব্যাপার—সে সম্বন্ধে হান্টার সাহেবের বক্তব্য এই : "ইংরেজ বাংলার রাজা হয়ে যখন জমির অবস্থার খোঁজ নিলে তখন দেখলে, দেশের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ জমি নিষ্কর-ভোগীদের করায়ত্ত। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন্‌ হেস্টিংস্‌ এটি বুঝলেন। কিন্তু* এই ধরনের জমিজমা বাজেয়াপ্ত

* The feeling against resuming such tenures was then too strong to allow of any active steps being taken. In 1793 Lord Cornwallis again asserted in the strongest and broadest manner the inalienable right of Government to the rent-free grants which had not obtained the sanction of the Ruling Power. But even the stronger Government of that day did not venture to carry out this principle. The subject rested for another quarter of a century until 1819, when the Government again asserted its rights, but again shrank from enforcing them. It was not until 1928 that the Legislature and the Executive combined to make one great effort. Special Courts were created, and during the next eighteen years the whole Province was over-run with informers, false witnesses, and calm stern Resumption officers. At an outlay of £ 800,000 upon Resumption proceedings an additional revenue of £ 300,000 a year was permanently gained by the state representing a capital of five per cent of six millions sterlings. A large part of this sum was derived from lands held rent-free by Mussalmans or Muhammadan foundations. The panic and hatred which ensued have stamped themselves for ever on rural records. Hundreds of ancient families were ruined, and the educational system of the Mussalmans, which was almost entirely maintained by rent-free grants, received its deathblow.......Muhammadan foundations suffered most; for with regard to their title-deeds, as with regard to all other matters, the former conquerors of India had displayed a haughty indifference unknown to the provident and astute Hindu. (The Resumption proceedings were fiercest at the beginning, and after languishing for seven years were officially terminated by the Government order of March 4, 1846)

করার বিরুদ্ধে তখন জনমত এত প্রবল ছিল যে কাজে কিছু হয়ে উঠল না। ১৭৯৭ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস ব্যাপকভাবে ও জোরালোভাবে ঘোষণা করলেন যে বর্তমান সরকারের অননুমোদিত নিষ্করসমূহে সরকারের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব বর্তমান। কিন্তু সে দিনের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজশক্তিও এই নীতি কার্যে পরিণত করতে সাহসী হলেন না। এক-চতুর্থ শতাব্দী কাল এই ভাবেই কাটল। তারপর ১৮১৯ সালে সরকার আবার তাঁদের এই অধিকারের কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু এবারও কার্যে অগ্রসর হলেন না। অবশেষে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্যবস্থাপক-শক্তি ও শাসন-শক্তি একযোগে এক বড়ো চেষ্টা করলেন। বিশেষ-ক্ষমতাসমন্বিত আদালতের সৃষ্টি হল, আর তার পরের আঠারো বৎসর ধরে সমস্ত বঙ্গ প্রদেশে চলল সন্ধানী, মিথ্যাসাক্ষী, আর অটল ও মমতাহীন বাজেয়াপ্তকারী রাজপুরুষদের রাজত্ব। এই নিষ্কর বাজেয়াপ্তে আট লক্ষ পাউন্ড খরচ করে বার্ষিক তিন লক্ষ পাউন্ডের স্থায়ী আয় সরকারের লাভ হল, অর্থাৎ যাট লক্ষ পাউন্ড বার্ষিক শতকরা পাঁচ পাউন্ড সুদে খাটলে যত আয় হত তত আয়। এই অর্থের মোটা অংশ পাওয়া গিয়েছিল মুসলমান পরিবারের, অথবা মুসলমান প্রতিষ্ঠানের বাজেয়াপ্ত নিষ্কর থেকে: এর ফলে যে ভীতি ও বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয়েছিল, পল্লির উপর তার ছাপ চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হয়ে গেছে। শত শত প্রাচীন পরিবার এর ফলে বিনষ্ট হল, আর, মুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় সবই নিষ্করের আয়ে চলত, এর ফলে সে-সব মৃত্যুদণ্ড লাভ করল।.......মুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলোরই খুব বেশি ক্ষতি হল কেন-না অন্যান্য ব্যাপারের মতো এই সব নিষ্কর স্বত্বের তায়দাদ রক্ষা ব্যাপারেও এক সময়ের এই ভারত বিজেতারা গর্বিত ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, সঞ্চয়ী ও সূক্ষ্মবুদ্ধি হিন্দুর মনে সে-ভাব ঠাঁই পায়নি। (নিষ্কর বাজেয়াপ্ত প্রথম অবস্থায়ই নিদারুণ হয়ে উঠেছিল, তারপর সাত বৎসর কাল মন্থর ভাবে এ চলে। অবশেষে ১৮৪৬ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখের সরকারি ইস্তাহারে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।)

নিষ্কর যাঁরা ভোগ করতেন তাঁদের অনেকেরই ন্যায়-সঙ্গত অধিকার ছিল না, হান্টার সাহেব এই মত দিয়েছেন, তবু তিনি বলেছেন* :

মাঝে মাঝে প্রতিবাদ জানিয়েও ৭৫ বৎসর ধরে আমরা এক প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজি সহ্য করে আসছিলাম; আর সেই দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত শাস্তি গিয়ে পড়ল এক-পুরুষের উপরে।

নিষ্কর বাজেয়াপ্ত যে যুগে চলে সেই যুগেই আদালতের ভাষা পারসির পরিবর্তে ইংরাজি হয়। মুসলমানরা যে দুটি কারণে ইংরাজি শিখতে এগুল না তার প্রথমটি ধর্মনাশ ভয়—এ সময়ে দেশে খ্রিস্টান করবার ও হবার হিড়িক পড়ে যায়—কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি প্রথম কারণের চাইতে অনেক বড়ো, সেটি—নব রাজশক্তির প্রতি মুসলমানের বিরূপতা-দীর্ঘ ওহাবি-বিদ্রোহের ভিতরে রয়েছে যার সুস্পষ্ট পরিচয়। ওহাবি-বিদ্রোহকে যে শাসকরা ব্যাপকভাবে ভারতীয় মুসলমানের বিদ্রোহ জ্ঞান করেছিলেন হান্টার সাহেবের বইয়ের নামকরণ তার এক প্রমাণ—তাঁর বইয়ের পুরো নাম হচ্ছে—*Our Indian Mussalmans* : are they bound to owe allegiance to the Queen? "আমাদের ভারতীয় মুসলমান

* During seventyfive years we had submitted under protest to a gigantic system of fraud, and the accumulated penalty fell upon a single generation (p. 183).

প্রজা—মহারানির আনুগত্য স্বীকারে তারা কি বাধ্য?"—এই বিদ্রোহ বাংলার মুসলমান-পল্লিসমাজে পর্যন্ত কীরূপ ব্যাপক হয়েছিল যে সম্পর্কে হান্টার সাহেবের এই বিবৃতিটি কৌতুকাবহ* ঃ

"পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রত্যেক জেলা থেকে ওহাবি প্রচারকেরা সাধারণত বিশ বৎসরের কম বয়সের শত শত সরলমতি যুবককে, অনেক সময়ে তাদের পিতা-মাতার অজ্ঞাতে, নিশ্চিতপ্রায় মৃত্যুর পথে সঁপে দিয়েছে। শত সহস্র কৃষক পরিবারে তারা দারিদ্র্য ও শোক প্রবৃষ্ট করিয়েছে, আর আশা-ভরসা-স্থল যুবকদের সম্বন্ধে পরিজনের অন্তরে একটা স্থায়ী দুর্ভাবনা এনে দিয়েছে। যে ওহাবি পিতার বিশেষ-গুণবান অথবা বিশেষ-ধর্মপ্রবণ পুত্র বিদ্যমান তিনি জানেন না কোন্ সময়ে তাঁর পুত্র গ্রাম থেকে উধাও হয়ে যাবে। এই ভাবে যেসব যুবককে উধাও করা হয়েছে তাদের অনেকেই ব্যাধি, অনাহার অথবা তরবারির আঘাতে বিনষ্ট হয়েছে।"

এটিকে কৌতুকাবহ বলেছি এর সঙ্গে এ কালের হিন্দুসমাজের সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের আশ্চর্য মিল দেখে। বাংলার লোকদের প্রকৃতি যে পরিবর্তনলোলুপ, নতুনত্বের মোহ তাদের জন্য যে দুর্নিবার তা সে-নতুনত্ব যত বিপদসংকুলই হোক, তারও সমর্থন রয়েছে এর মধ্যে।

ওহাবিদের এই বিরূপতা সমগ্র মুসলমান সমাজের প্রতি শাসকদের মনকে সহজেই বিরূপ করে তুলল আর তার অপরিহার্য ফল দাঁড়াল—দেশের শাসনকার্যের সঙ্গে মুসলমানদের অদ্ভুত বিচ্ছেদ—দীর্ঘ দিন যাতে পরিবর্তন ঘটল না। এ সম্পর্কে Our Indian Mussalmans গ্রন্থে উদ্ধৃত ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুলাইয়ের "দূরবীন" নামক পারসিভাষায় লিখিত সংবাদ-পত্রের এই অভিযোগ অর্থপূর্ণ** ঃ

"বড়ো ছোটো সমস্ত রকমের চাকুরি মুসলমানদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য জাতীয় লোকদের, বিশেষ করে হিন্দুদের, দেওয়া হচ্ছে। সরকার বাহাদুরের কর্তব্য হচ্ছে সর্বশ্রেণির প্রজার উপরে সমদৃষ্টি হওয়া, কিন্তু এখন এমন কাল এসেছে যখন সরকারি চাকরি থেকে মুসলমানদের বাদ দেওয়ার কথা প্রকাশ্য ভাবে গেজেটে লেখা হয়। সম্প্রতি

---

* The Wahhabi preachers have drafted away to almost certain slaughter hundreds of deluded youths, generally under twenty, and often without the consent of their parents, from nearly every district of Eastern Bengal. They have introduced misery and bereavement into thousands of peasant families and created a feeling of chronic anxiety throughout the whole rural population with regard to their most promising young men. No Wahhabi father who has a boy of more than usual parts or piety, can tell the moment at which his son may not suddenly disappear from the hamlet. Of the youths thus spirited away by far the greater portion perished by pestilence, famine and the sword (p. 110).

** All sorts of employments great and small, are being gradually sncatched away from the Muhammadans and bestowed on men of other races, particularly the Hindus. The Government is bound to look upon all classes of its subjects with an equal eye, yet the time has now come when it publicly singles out the Muhammadans in its gazettes for exclusion from official posts. Recently when several vacancies occurred in the office of the Sundarbans Commissioner, that official, in advertising them in Government gazettee, stated that the appointments should be given to none but Hindus. In short the Mahammadans have now sunk so low, that even when qualified for Government employ, they are studiously kept out of it by Government notifications. Nobody takes any notice of their helpless condition and the higher authorities do not deign even to acknowledge their existence.

সুন্দরবন কমিশনারের আপিসে কতকগুলি চাকরি খালি হলে উক্ত রাজকর্মচারী সরকারি গেজেটে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দেন যে এই সব পদ হিন্দু ভিন্ন আর কাউকে দেওয়া হবে না। মোটের উপর মুসলমানদের এখন এমন দুর্গতি হয়েছে যে সরকারি চাকরির যোগ্যতা তাদের লাভ হলেও সরকারি ইস্তাহার সহযোগে ইচ্ছা করে তাদের দূরে রাখা হয়। কেউ তাদের অসহায় অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করে না, তারা যে আছে এই কথাটাও উচ্চতর রাজকর্মচারীদের মনে স্থান পায় না।"

এর উপরে হান্টার সাহেব এই মন্তব্য করেছেন*ঃ

"এই পারস্য-ভাষাভাষী সাংবাদিকের উক্তির যাথার্থ্য নিরূপণ করবার মতো দলিলাদি এখন আমার হাতে নেই, কিন্তু সেই সময়ে এই উক্তির প্রতি কিছু মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল, আর এর প্রতিবাদের কথা আমি শুনিনি।"

শাসক-শ্রেণির প্রতিনিধিস্থানীয় হান্টার সাহেব বিদ্রোহী মুসলমানদের কথা যে এতখানি সমবেদনার সঙ্গে ভাবতে পেরেছেন সেজন্যে তিনি প্রশংসার্হ ও শ্রদ্ধার্হ। কিন্তু তাঁর মূল দৃষ্টিকোণে যে গলদ আছে সে কথাও ভাবতে হবে। তিনি ভারতীয় মুসলমানের সমস্যার দিকে তাকিয়েছেন শাসকের দৃষ্টিতে—শাসক-শ্রেণির তরফ থেকে অনুগ্রহ বিতরণ যথাসম্ভব ন্যায়-ধর্মানুমোদিত হোক এই তাঁর বক্তব্য। মুসলমানেরা তাদের শাসনকালে যে সমস্ত সুখ সুবিধা ভোগ করত তা যে পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত ছিল না সে সম্বন্ধেও অকুণ্ঠিত তাঁর মতামত**ঃ

"প্রকৃত ব্যাপার এই যে মুসলমান আমলে রাজ্য-শাসন ছিল বহুকে রক্ষা করবার জন্যে নয় বরং মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে সমৃদ্ধ করবার যন্ত্র। প্রত্যেক জেলায় অল্প কয়েকটি পরিবার আনন্দে বিলাসে দিন কাটাবে এ জন্য অগণিত চাষীকে যে গ্রীষ্মের খররৌদ্র ও বর্ষার বারিধারা নগ্ন পৃষ্ঠে সহ্য করে পরিশ্রম করতে হয়, মনে হয়, একথাটি শাসকদের হৃদয়কে কখনো স্পর্শ করেনি অথবা তাঁদের বিবেককে বিচলিত করেনি। দেশের দশজনের অস্তিত্ব তখনই স্পষ্ট হয়ে উঠল যখন আমরা প্রাচীন ব্যবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে আরম্ভ করলাম যদিও ন্যায়ত সেই প্রাচীন ব্যবস্থার রক্ষার ভারই আমাদের উপরে পড়েছিল। মুসলমান অভিজাত শ্রেণির অধিকারের সীমা যে আমরা নির্দেশ করলাম এই হল তাঁদের প্রতি আমাদের সব চাইতে বড়ো অন্যায়।"

মুসলমান-শাসনের এমন অধোগতি মুসলমান-শাসনের অন্তিম দশায়ই ঘটেছিল—সুবিখ্যাত সিয়ারুলমোতাআখেরীন-এর লেখকও এই মত ব্যক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন, যে, মুসলমান শাসনের গৌরবের দিনে দীনতম প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও অধিকার

* I have not at present the means of officially tracing and verifying this statement of the Persian journalist, but it attracted some notice at the time, and was not, so far as I heard, contradicted (p. 172).

** The truth is that under the Muhammadans Government was an engine for enriching the few, not protecting the many. It never seems to have touched the hearts or moved the consciences of the rulers, that a vast population of husbandmen was toiling bare backed in the heat of summer and in the rain of autumn, in order that a few families in each district might lead lives of luxurious ease. It is only after we had begun to break away from the system which we had virtually engaged to uphold that the exitence of the people discloses itself. The greatest wrong which we did to the Mussalman aristrocracy was in defining their rights.

সম্বন্ধেও বাদশা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানের অতীত যাই-ই হোক একালে সে ভারতবাসী ভিন্ন আর কিছুই নয়—অর্থাৎ ভারতবর্ষ একটি দেশ আর ভারতবাসী একটি জাতি, ভারতবর্ষের অন্যান্য বহু ধর্মাবলম্বীর মতো মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের কথাও সেই দেশ ও জাতির শ্রীবৃদ্ধির দিক থেকেই ভাবতে হবে, সম্প্রদায় হিসাবে বিশেষ অনুগ্রহ বা বিশেষ নিগ্রহের ভাবনা তার জন্য অসত্য সুতরাং শেষ পর্যন্ত অনিষ্টকর—এই গোড়ার কথাটা হান্টার সাহেবের ভাবনার বিষয় হয়নি।

## ওহাবি-বিদ্রোহের পরে

ওহাবিদের দমন করতে ইংরেজ গভর্ণমেন্টের লোকবল ও অর্থবল দুইয়েরই অপচয় হয়েছিল। পরিশেষে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বহু ওহাবিকে নির্বাসনে পাঠিয়ে শাসকবর্গ কিঞ্চিৎ স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। সিপাহি-বিদ্রোহ দমন ও ওহাবি-বিদ্রোহ দমন এই দুইয়ের প্রভাবে মুসলমান-সম্প্রদায় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল, অথবা তাদের দুর্বলতা অত্যন্ত প্রকট হল, এবং শাসকবর্গের কৃপাভিক্ষা ভিন্ন তাদের গত্যন্তর রইল না। বিফল বিদ্রোহের এমন বিনতি স্বাভাবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু বড়ো করুণ।

এই দুর্দিনে তাদের চলল ধর্ম সম্বন্ধে নতুন চিন্তা। ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে অমুসলমান রাজ্য "দারুল্ হর্ব্" নয়, কেননা মুসলমানের দৈনন্দিন ধর্মেকর্মে এদেশের শাসকবর্গ বাধা দেন না—এই মতের প্রসার-লাভের দিন এল। এই সম্পর্কে নবাব আবদুল লতিফ খান বাহাদুরের নেতৃত্ব স্মরণীয়, আর স্মরণীয় এই সিদ্ধান্তের উপরে হান্টার সাহেবের কটাক্ষ* ঃ

"এই সিদ্ধান্ত অবস্থাপন্ন মুসলমানদের মনঃপূত হল কেননা সীমান্তের যুদ্ধরত ধর্মোন্মত্ত ছাউনিতে চাঁদা পাঠানোর বিপত্তি থেকে এতে তাঁরা রক্ষা পেলেন, আর আমাদেরও সন্তোষ বিধান করলে, কেননা বোঝা গেল, ধর্মবিধি আর ধর্মপ্রবর্তক উভয়েরই সদ্‌ব্যবহার যেমন হতে পারে বিদ্রোহের পক্ষে তেমনি হতে পারে বশ্যতারও পক্ষে।"

আস্তে আস্তে মুসলমানের নতুন মানসিকতা পরিচ্ছন্ন রূপ গ্রহণ করল। ওহাবির অকৃত্রিম কিন্তু অদ্ভুত (অদ্ভুত এই জন্য যে বিপক্ষের বলবীর্য সম্বন্ধে যোগ্য চেতনা দীর্ঘকালেও তাদের মনে জাগেনি) বিরোধিতা অতীতের সামগ্রী হল, সর্বসাধারণ মুসলমানের প্রধান অবলম্বন হল প্রাত্যহিক জীবনে পালনীয় নিরুপদ্রব ধর্মাচার। যেমন মধ্যযুগে মুসলমান-বিজয়ের প্রভাবে হিন্দু-সমাজে দেখা দিয়েছিল পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধের অভাব ও ধর্মাচারের আধিক্য, তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজবিজয়ের প্রভাবে মুসলমান-সমাজে দেখা দিল নৈরাশ্য ও মাত্রাতিরিক্ত ধর্মাচারপ্রীতি—এ কথা বোঝা কঠিন নয় কিন্তু বোঝানো কঠিন।

## অতি-আধুনিক কালের কথা

সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে দিশাহারা ভাব আর পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে মাত্রাতিরিক্ত উৎকণ্ঠা, এইই একাল পর্যন্ত ব্যাপকভাবে ভারতীয় মুসলিম জীবনের পরিচায়ক বলা যেতে

---

* The result (decision) must be accepted as like satisfactory to the well-to-do Mussalmans whom it saves from the perils of contributing to the Fanatic Camp on our Frontier, and gratifying to ourselves as proving that Law and Prophets can be utilized on the side of loyalty as well as the side of sedition (p. 120).

পারে। কিন্তু মুসলমান-সমাজও জগতের বৃহত্তর মানবসমাজের অন্তর্গত, সেই বৃহত্তর মানবসমাজে একালে যেসব চিন্তা-ভাবনা প্রকট হয়েছে, যেমন, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, মানুষের জাগতিক জীবনের সাফল্য, অবনত ও পদানত জাতিদের অভ্যুত্থান, জগতের বঞ্চিতদের অভিযান, সে-সব তাদেরও মর্মদ্বারে ঘা না দিয়ে ছাড়ছে না। তাতে এ পর্যন্ত আশানুরূপ ফল লাভ হয়নি, তবে অতি-আধুনিক কালে তা এক বিশেষ রূপ নিয়েছে মুসলমানের মনে ঃ মুসলমানও আর নিষ্ক্রিয় থাকবে না—এই বোধ তার অন্তরে জেগেছে, আর তার প্রবল ধারণা জন্মেছে যে, তার সমস্ত রকমের দুর্গতির জন্যে প্রধানত দায়ী তার সব সময়ের সংগী হিন্দু।

মুসলমানের এমন ধারণা অদ্ভুত নিঃসন্দেহে, কিন্তু অর্থশূন্য নয়। তার এ রকম ধারণার মূলে যাঁরা দেখেন মাত্র শাসকশ্রেণির Divide and Rule (ভেদ) নীতির ক্রিয়া তাঁদের মতকে বেশি মূল্য দেওয়া যায় না। ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনায় যখন মুসলমানের ভূসম্পত্তি নষ্ট হল ও তা প্রধানত হিন্দুর করায়ত্ত হল সেটি যে কোনো স্পষ্ট শাসন-নীতির ফলে হয়েছিল তা নয়। এ সম্পর্কে হান্টার সাহেবের উক্তি স্মরণীয় ঃ

The greatest blow which we dealt to the old system was in one sense an underhand one, for neither the English nor the Muhammadans foresaw its effects.*

তারপর ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মুসলমানের দীর্ঘকালব্যাপী বিরূপতা আর হিন্দুর অনুরাগ যে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি স্পষ্ট বিরোধিতার জন্য সম্ভবপর হল তা নয়, শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে ব্যবধান মুসলমান আমলে ছিল তাইই দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ রইল মাত্র। এই বিদ্রোহী মুসলমানদল দীর্ঘ দিন বিদ্রোহী থেকে শেষে হল বিপর্যস্ত, কিন্তু অনুগ্রহকামী হিন্দুর দলে কালে জন্মাল নব-মানবতার বাণীবাহক একটি ক্ষুদ্র দলও। এই ক্ষুদ্র সৃষ্টিধর্মী দলের কাছ থেকেই দেশ কালে কালে পেলে তার রাজনৈতিক জাগরণ—বহু ত্রুটি সত্ত্বেও যার অকৃত্রিমতায় জগতের সন্দেহ নেই। কিন্তু নিগৃহীত মুসলমান অনুগৃহীত হিন্দুর এহেন পরিবর্তন সম্ভাবনার প্রতি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ভিন্ন তাকাতে পারছে না, বিশেষত সেই হিন্দুর সমাজজীবনে অস্পৃশ্যতা, কঠোর জাতিভেদ, প্রভৃতি তুচ্ছতার প্রভাব আজও যখন অপ্রবল নয়।—অতি-আধুনিক কালের এই বিবর্ধিত হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের দিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে অভিভূত না হয়ে আশ্বস্তও হওয়া যায়। বৃহত্তর জগতের ঘটনা ও চিন্তা-প্রবাহে যখন ভারতীয় জীবনে চেতনার সঞ্চার হয়েছে তখন সেই উদার স্রোতই সংশোধিত করে চলছে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের বিচিত্র বিকৃতি। এর সংগে মুসলমান-জগতে মুস্তফা কামালের আবির্ভাবের কথাও স্মরণীয়। ওহাবিদের আদিম-ইসলামে-প্রত্যাবর্তন-বাদ আজও যত প্রবলই হোক কামালের বিজ্ঞান-বাদ ও জাতীয়তা-বাদের অপূর্ব সাফল্য যে তার যোগ্য প্রভাব বিস্তারে অপারগ হবে না, এ আশা করা যায়।

উৎস : শাশ্বত বঙ্গ, ১৩৪৪

* প্রাচীন ব্যবস্থার মূলে সব চাইতে বড়ো আঘাত যা পড়ল তা একহিসাবে অলক্ষিতভাবে কেননা ইংরেজ অথবা মুসলমান কেউই তখন এর পরিণতির কথা ভাবেনি।

# মুসলিম সংস্কৃতির হেরফের

সৈয়দ মুজ্‌তবা আলী

মুসলমান ধর্ম আরবে যে যুগে জন্মগ্রহণ করিল তাহাকে আরব ঐতিহাসিকেরাই বর্বর (জাহিলিয়া) যুগ নাম দিয়াছেন। মহাপুরুষ মুহম্মদের সমসাময়িক ও তৎপরবর্তী ঐতিহাসিকদের বর্ণনা হইতে দেখা যায় আরবদেশ মহাপুরুষের সময় সভ্যতার দ্বিতীয় স্তরে মাত্র পৌঁছিয়াছে। কৃষ্টি বলিতে আরবদের সে-যুগে একমাত্র গৌরব ছিল কবিতা রচনা। সে কবিতাকেও ব্যাপক কাব্য বলা চলে না; প্রেম, মৃত্যুশোক ও শৌর্যবীর্য লইয়াই তাহার কারবার। দ্বিতীয়ত যে সব কবিতা জাহিলিয়ার নামে চলে তাহার কতটুকু ধর্মে-পরাঙ্মুখ, নামে মুসলমান ওম্মাই বাদশাহদের উৎসাহে পরবর্তী যুগে রচিত হইয়াছিল আর কতটুকু খাঁটি জাহিলিয়া সে লইয়া পণ্ডিতদের তর্কবিতর্ক এখনও চলিতেছে।

কিন্তু এই আরবেরাই যখন পরপর পারস্য, সিরিয়া, ফিলস্তিন, মিশর, স্পেন, তুর্কিস্তান, এশিয়ামাইনর, তুর্কি, আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষ জয় করিল তখন বিজিত জাতিদের লইয়া তাহারা যে সভ্যতা গড়িয়া তুলিল তাহা যে শুধু সে যুগের মুসলমান, অমুসলমান পণ্ডিতদের চমৎকৃত করিয়াছিল তাহা নহে, এখনও তৎকালীন মুসলমান সভ্যতার সংগে সমসাময়িক ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনা করিয়া আশ্চর্য হই।

আরবরা রুমি (বাইজান্‌টাইন্‌) দিগের নিকট হইতে স্থপতিবিদ্যার বর্ণশিক্ষা করিল ও তাহার সংগে পারসিক, মিশরি ও ভারতবর্ষীয় গঠনপ্রণালি মিশাইয়া যে অপূর্ব মসজিদ, সমাধিমন্দির, রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিল তাহার চিহ্ন স্পেন হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিদ্যমান। তুর্কিস্তানে সে স্থপতির যে আশ্চর্য বিকাশ হইল তাহার ইতিহাস লেখা আজও শেষ হয় নাই। বাগদাদী খলিফাদের উৎসাহে ইহুদিরা গ্রিক দর্শনের তর্জমা আরম্ভ করিল; কিন্দি, ফারাবি, ইবনে সিনা তাহার সমৃদ্ধি সাধন করিলেন ও তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের প্রসারতা করিলেন। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্ধ পৃথিবীর বিদ্যাকেন্দ্র ছিল বাগদাদ ও কাইরো।

কিন্তু ইসলামের বিজয় অভিযানের আদ্যোপান্ত বর্ণনা ও তাহার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ভারতবর্ষে ইসলাম কি রূপ নিয়া প্রবেশ করিল, বাঙালি মুসলমান সে ধর্ম হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে কি পাইয়াছে ও বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বলিতে কি বুঝায় এখানে তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

নিতান্ত অশিক্ষিত বর্বর দেশগুলি বাদ দিয়া ইসলামের জয়যাত্রার অনুসরণ করিলে আরব ছাড়িয়া প্রথমেই পারস্যে আসিতে হয়। পারসিকরা তখন আরবদের অপেক্ষা অনেকগুণে সভ্য, তাহাদের স্থপতি, কলা, অলঙ্কার, রাজসভার ঐশ্বর্য, জীবনযাপনের তৈজসপত্র, রণসম্ভার সভ্য বাইজান্টাইন্দিগের অপেক্ষা কোনো হিসাবে নিকৃষ্ট তো ছিলই না বরং অনুমিত হয় পারসিকদিগের প্রভাব তখন বাইজান্টাইনের সভ্যতাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অশিক্ষিত অসভ্য আরব শুধু যে সেই পারসিকদের পরাজিত ও বশীভূত করিল তাহা নহে, আরবের সরল, দৃঢ় একেশ্বরবাদের সম্মুখে পারসিক দ্বৈতবাদ পরাজিত হইল। ধর্মের ইতিহাসে সে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। পারসিকদিগের ধর্ম প্রাচীন, মার্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন ছিল কিন্তু মনে হয়, সে ধর্ম সত্য ও অসত্য দুইকে চিরন্তন ও শাশ্বতরূপে স্বীকার করিয়া নিয়াছিল বলিয়া পারসিক জনসাধারণ তাহাদের উপরে ধনিক ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের যে অত্যাচার যুগ যুগ ধরিয়া চলিতেছিল তাহা হইতে নিষ্কৃতির পথ পাইতেছিল না। অসত্য যদি সত্যেরই মত শাশ্বত হয় তাহা হইলে উৎপীড়নের অসত্য হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবে কোন নীতি, কোন মহাপুরুষ, কোন ধর্ম?

মুসলমানরা বলিল অত্যাচার অসত্য, ভগবান অসত্য নষ্ট করেন—মানুষের কর্তব্য অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। সত্যাসত্যের দ্বন্দ্ব ও তাহার সংগে ভগবানের সম্পর্ক কি সে লইয়া চুলচেরা শাস্ত্রীয় তর্ক সে যুগে হয় নাই,—ধর্মের ইতিহাসে দেখিতে পাই আপামর জনসাধারণ এরূপ তর্কে যোগদান করে না—উৎপীড়িত প্রজাকুল মুসলমান ধর্মের আশ্বাসে উৎসাহ পাইল। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে মুসলমানের সাম্যবাদ পারসিক সভ্যতাতে নূতন প্রাণ আনয়ন করিল। ক্রমে ক্রমে বাগদাদ পারসিক ও আরবি সভ্যতার সম্মিলিত কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হইল।

পারসিক পণ্ডিতমণ্ডলী সরল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন কিন্তু তাঁহাদের ধার্মিক মন শুধু শরিয়ত (ক্রিয়াকাণ্ড) মানিয়া তৃপ্ত হইল না। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে আজ মুসলমান ধর্ম বলিতে আমরা যে সুস্পষ্ট সংজ্ঞাবদ্ধ বিশ্বাস ও আচরণের ফিরিস্তি পাই তখনও তাহা গড়িয়া উঠে নাই। শুধু যে চারি ইমাম মালিক, হন্বল্, হনিফা ও শাফির মতবাদ তখন নানারকমের তর্কজাল সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা নহে অন্যান্য নানা সম্প্রদায় তাঁহাদের সমস্ত চিন্তাশক্তি এই তর্কযুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কালামিরা গ্রিক দর্শন দিয়া কুরানের বাক্য বিশ্লেষণ ও সমর্থনে নিযুক্ত হইলেন, মুতাজিলারা ঈশ্বরের স্বরূপ, স্বর্গনরক, কর্মফল নিয়া তর্ক জুড়িলেন, কদরী ও জবরীরা কর্মে মনুষ্যের স্বাধীনতা পরাধীনতার আলোচনা করিলেন ও কিরামিতারা একেশ্বরবাদকে এতই উচ্চ আসন দিলেন যে কাবার কৃষ্ণপ্রস্তরকে সম্মানপ্রদর্শন পৌত্তলিকতা বলিয়া প্রচার করিলেন। শিয়া মতবাদ মদিনায় জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তাহার পরিপুষ্টি হইল পারস্যে। গণতান্ত্রিক আরবের মধ্যে মহাপুরুষ মুহম্মদের বংশধরগণের বিধিদত্ত অধিকার স্বীকৃত হইল না, কিন্তু প্রাচীন ইরানে ভূপতিকে ঈশ্বরের অবতাররূপে স্বীকার করা হইত বলিয়া আলী ও তাঁহার বংশধরগণ সেখানে ঐশী শক্তির আধার-রূপে স্বীকৃত হইলেন। পারস্যে তাই আলী ও তাঁহার বংশধরগণ শুধু যে রাজনৈতিক সমর্থন পাইলেন তাহা নহে, ধর্মক্ষেত্রেও স্বীকৃত হইল যে তাঁহাদের বাণী আপ্তবাক্য। কুরান যেরূপ অভ্রান্ত ইঁহাদের বাণীও সেইরূপ পূত, তাঁহাদের জীবন নিষ্কলঙ্ক। সুন্নিরা

বলিল কোনো মানুষই অভ্রান্ত হইতে পারে না—ধর্মক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে বিশেষ কোনো অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না—সেখানেও গণতন্ত্র। একমাত্র পণ্ডিতদের সর্ববাদী মতই অভ্রান্ত হইতে পারে—কারণ মহাপুরুষ বলিয়াছেন আমার বংশধরেরা কোনো বিষয়ে একমত হইলে তাহা ভুল হইতে পারে না। ইহাই মুসলমানের স্মৃতিতে 'ইজমা' রূপে গৃহীত।

ইহার মধ্যে আরেক ভাবতরঙ্গ আসিয়া পারস্যের ধর্মজগৎকে আলোড়িত করিল। নিওপ্লাতনিজমের রহস্যবাদ ইস্কন্দরিয়ায় পুষ্টিসাধন করত আরবিতে অনুদিত হইয়াছিল। দুই একজন আরব সাধু এই রহস্যবাদের (সুফি বা ভক্তিমার্গের) দিকে আকৃষ্ট হইলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন ইহা ইসলামে সম্পূর্ণ নূতন নহে। কুরানের 'নূর' অধ্যায়ে আল্লার যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে রহস্যবাদের উৎস পাওয়া যায়। আল্লা যদি নূরই (জ্যোতি) হইলেন, তাহা হইলে শুধু শরিয়তের বিধান মানিয়া তাঁহাকে কি করিয়া পাইব? মানুষের ভিতর যে নূর আছে তাহাকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের তমসান্ধকার কাটাইয়া সেই বিশ্বনূরের সহিত মিলিত হইতে হইবে। তাহার জন্য কৃচ্ছ্রসাধন দরকার—ধ্যানের প্রয়োজন। আর কে না জানে মহাপুরুষ ঐশী বাণী প্রাপ্ত হইবার পূর্বে মাসের পর মাস হিরার পর্বত কন্দরে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। সুফিরা বলিলেন শাস্ত্রের তর্কজালে বন্দী হইয়ো না; স্বয়ং মহাপুরুষ যে মার্গ গ্রহণ করিয়া নূর পাইয়াছিলেন সেই পথ ধর।

পারস্যে সুফিসাধনা প্রসার করিল। তাহার মূল তত্ত্ব হইল শরিয়ত অনুসরণ করিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংযম করিবে। সেবাদ্বারা গুরুকে (মুরশিদ) তুষ্ট করিবে, তিনি দিবেন জ্ঞান—পূর্বেই বলিয়াছি শিয়ারা ইমাম ও হুজ্‌জৎকে (গুরু) অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন। আর সর্বশেষে ভক্তির সাধনা ঈশ্বরকে রসস্বরূপে আরাধনা করিয়া সমাধিস্থ হইবে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের কর্মদ্বার রুদ্ধ হইবে ও তাহার চরম পরিণতি পরমালোকের সহিত মানুবের ক্ষুদ্র আলোকের সম্মেলন—"কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতি সমুদ্রেই।" হর্তেন প্রভৃতি জর্মন পণ্ডিতদের মতে সুফির 'আনা ল্-হক্' (আমিই ঈশ্বর) ভারতবর্ষীয় প্রভাবে গঠিত হইয়াছিল—হয়ত বৌদ্ধনির্বাণও তাহাতে যুক্ত হইয়াছিল। মাসিন্ন প্রভৃতি ফরাসি পণ্ডিতগণ আপত্তি করিয়া বলেন, সুফিমার্গের এই চরম ফল পারস্যের নিজস্ব সম্পত্তি। সে তর্ক এখানে অবান্তর।

সুফিমার্গের সাধনা পারস্যের চতুর্দিকে বিস্তৃতিলাভ করিল। প্রাচীনপন্থীরা ঘোর প্রতিবাদ তুলিলেন কিন্তু তাহার সমাধান করিলেন সাধু গজ্জাল। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, শাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিত ও সুফি। তাঁহার অপূর্ব লেখনির বলে সুফিমতবাদ পাংক্তেয় হইল ও সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত বহু মত সুফীধর্মের ভিতরে আসিয়া আশ্রয় হইল।

এখানে ফারসি ভাষার কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন।

আরবেরা বহু দেশ জয় করিয়াছে, সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আরবি চালাইয়াছে। ফলে সিরিয়া, ফিলস্তিন, মিশর, সুদান, লিবিয়া, মরক্কো, সাহারা, স্পেন সর্বত্রই আরবি ভাষা মুসলমান জ্ঞানবিজ্ঞানের বাহন হইল। শুধু তুর্কি, ইরান, আফগানিস্তান, চীন ও ভারতবর্ষে আরবি চালাইতে পারিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মুসলিম কৃষ্টি ইসলাম জগতে অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিশেষ অসুবিধা হইল না।

ফারসি ভাষা আর্যবংশীয় কিন্তু আরবি সেমিতি। তথাপি আরবি ফারসিকে শব্দসম্পদে এমনি অভিভূত করিয়া ফেলিল যে ইংরেজির সঙ্গে লাতিনের যে সম্পর্ক, ফারসি-আরবি, উর্দু-আরবি ও তুর্কি-আরবিতে আজ সেই সম্পর্ক। দৈনন্দিন কথাবার্তা লাতিন-বর্জিত ইংরেজিতে যদি বা দুই চারিটি বলা চলে মনোজগতে প্রবেশ করিয়া কোনও ভাব বা সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশ করিতে হইলেই লাতিনের দরকার। আরবি-বর্জিত ফারসিতে যদি বা নাম-ধাম-সাকিন জিজ্ঞাসা করা যায়, দর্শন, ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা আরবি-বর্জিত ফারসিতে অসম্ভব। তুর্কি, উর্দু ও সিন্ধি ভাষাতেও তাই। বাংলা ও গুজরাতি বহু আরবি (ও ফারসি) শব্দ গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু চিন্তার জগতে তাহারা শব্দ ঋণ করে সংস্কৃত মহাজনের নিকটে। কিন্তু সে আলোচনা পরে হইবে।

কাজেই যদি বা ইরানে ফারসি প্রচলিত রহিল তাহার রূপ যা হইল তাহা আবেস্তা পণ্ডিত নিজেরই মাতা বলিয়া চিনিতে পারিবেন না। ফারসি আরবির শব্দভাণ্ডার গ্রহণ করিয়া ধনী হইল—ভাষার মাধুর্য তাহার পূর্বেই ছিল। সুফি কবিরা সেই মধুর ও গম্ভীর ভাষাতে অপূর্ব রসধারার সৃষ্টি করিলেন। ধর্মপণ্ডিতদের তাড়নার ভয়ে ভীত না হইয়া ফারসি জনসাধারণ একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল সুফি কবি মওলানা জালাল উদ্‌দীন রূমীর কেতাব ফারসির কুরান। ফিরদৌসির মহাকাব্য, সাদীর নীতিকবিতা, হাফিজের সুরা ও সাকীর গজল, এমনকী উমরে খাইয়ামের অজ্ঞেয়বাদ সমস্তই ফারসি-সাহিত্যকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসমাজে সভাসদ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে আরবি শব্দভাণ্ডারের গুণে ইসলামি চিন্তাধারার স্রোত ফারসি সাহিত্যে প্রবাহমান রহিল।

মুসলমানেরা এদেশে আসিল প্রধানত আফগানিস্তানের উপর দিয়া। এখানে আফগান সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন কারণ আফগান সংস্কৃতিনামক কোনো পদার্থ নাই। আফগানরা পশতু ভাষায় কথা বলে কিন্তু সে ভাষাতে তাহারা লেখাপড়া করে না। পারসিক সভ্যতাই আফগান সভ্যতা। কাবুল বা গজনীর কবি ফারসিতেই কবিতা লিখেন, মসজিদ নির্মাণে পারসিক ইমারতের সাদৃশ্যেই গঠিত হয় আর আফগান সুফি ও ইরানি সুফির ধর্মবিশ্বাসে কোনো পার্থক্য নেই। ভারতবর্ষে যখন মোগলরা রাজত্ব করিত তখন আফগানিস্তানের পূর্বার্ধ তাহাদের হাতে ছিল। কাবুল গজনী হইতে কবিরা আসিয়া দিল্লির রাজদরবারে ফারসি কবিতা শুনাইতেন ও হিরাতের কবিরা যাইতেন ইরানে। দুইদলের লেখাতে কোনো পার্থক্য নাই।

মুসলমানরা ভারতবর্ষে আসিয়া ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করিবার জন্য যে ভাষা নির্মাণ করিলেন তাহার নাম উর্দু। আরবরা ইরানে যে রকম পারসিক কাঠামোর উপর আরবির কাদা রং লাগাইয়া ফারসি ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন ঠিক সেইরূপ মোগলেরা উত্তর ভারতবর্ষে প্রচলিত দেশি ভাষার কাঠামো লইয়া উর্দু গড়িলেন। পার্থক্য এইমাত্র যে ফারসিতে শুধু আরবি যোগ করা হইয়াছিল, উর্দুতে আরবি ও বিস্তর ফারসি শব্দ লাগানো হইল। ফলে ইরানে যাহা হইয়াছিল উত্তর ভারতবর্ষে তাহাই হইল। দৈনন্দিন কথাবার্তা যদি বা আরবি-ফারসি-বর্জিত উর্দুতে বলা চলে চিন্তার জগতে সে ভাষা লইয়া পদক্ষেপ করিবার উপায় নাই। এক কথায় আরবি ছাড়া যে রকম ফারসি অচল ঠিক সেইরূপ আরবি ফারসি ছাড়া উর্দু অচল।

উর্দু ভাষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতবর্ষে মুসলমানদের ভিতরে দুই চিন্তাজগতের সৃষ্টি হইল। একদল কুরান, হদীস, ফিকা ধর্মশাস্ত্রের উর্দু তর্জমা করিতে লাগিলেন, তাহার নূতন টিকাটিপ্পনি, নূতন আলোচনা, নূতন তর্কবিতর্ক। ইহাদের উৎসাহ ইরানিদের অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল কারণ ইরানিরা শিয়া। তাঁহারা আরব মুসলমানদের অধিকাংশ সুন্নি ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না। শুধু কুরান আর কিছু হদীস লইয়া তাঁহারা শিয়াধর্ম গড়িয়া তুলিয়াছিলেন অথবা সুফিতত্ত্বে মগ্ন হইয়া শাস্ত্রালোচনা উপেক্ষা করিতেছিলেন। ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা সুন্নি ধর্মগ্রহণ করিলেন বলিয়া তাঁহারা খাঁটি আরবি ধর্মশাস্ত্রের উপর জোর দিলেন বেশি। ভারতবর্ষ ধর্ম ও দর্শনের মহাদেশ কাজেই মুসলমান শাস্ত্রচর্চা এদেশে এমন উৎসাহ পাইল যে বহু নুতন আরবি কেতাবও লেখা হইল, অনেক আরবি পুস্তকের প্রথম মুদ্রণ এদেশেই হইল; আজ পর্যন্ত হয়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ও লখণৌয়ের নওল কিশোর প্রেসে ছাপা আরবি বই মিশর, দমস্কস, বাগদাদ ও ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলীতে সমাদৃত। এইসব শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রলিখনে মুসলমানদের ভাষার দিক দিয়া কোনোই অসুবিধা হইল না, কারণ পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি যে উর্দু এমন ভাবে গড়া হইয়াছিল যে তাহাতে যদৃচ্ছা আরবি শব্দ ব্যবহার করা যায়। ইহার আরেকটি তুলনা দেওয়া যাইতে পারে—দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলি দ্রাবিড় কিন্তু সেগুলিতে সংস্কৃত শব্দ এত অধিক মাত্রায় প্রবেশ করিয়াছে যে আর্য সংস্কৃতি তাহাতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় ধারা হইল সুফিতত্ত্বের প্রচার ও প্রসার। কিন্তু তৎপূর্বে এইখানে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের কিঞ্চিৎ ইতিহাসের প্রয়োজন।

সকলেই জানেন বৌদ্ধধর্মের পূর্বে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেতর জাতির শাস্ত্রে অধিকার ছিল না। বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহার ধর্ম বর্ণের কৌলীন্য স্বীকার করে নাই। আপামর জনসাধারণকে ধর্মে পূর্ণাধিকার দিবার জন্য বুদ্ধ সে ধর্ম পণ্ডিতি সংস্কৃতে প্রচার না করিয়া শরণ লইলেন তৎকালীন প্রচলিত ভাষার।

পরবর্তী যুগে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হইল। দলে দলে বৌদ্ধেরা হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু এবারে তাঁহারা ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে ধর্মে পূর্ণাধিকার দাবি করিল কারণ ধর্ম বদলাইলে মানুষের মন বদলায় না; বৌদ্ধধর্মে তাহারা যে অধিকার পাইয়াছিল হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আসিয়া সেই অধিকারই দাবি করিল। তখন হইল ভক্তিমার্গের প্রচার। একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষে ভক্তির সাধনা ছিল না। কারণ বেদের বরুণ মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, মহাভারতের শান্তিপর্বে, গীতায়, ভাগবতে, পাঞ্চরাত্রে, নারদ শাণ্ডিল্যাদির সূত্রে ভক্তির যথেষ্ট পরিপুষ্টি হইয়াছিল কিন্তু ভক্তির পূর্ণ প্রসার হইল বৌদ্ধধর্মের লোপের পর, মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ও তাহার পর আজ পর্যন্ত ভক্তির বিজয় অভিযান এখনও পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে। এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভক্তিমার্গের ব্যাপকতম প্রসার হইল গৌণত মুসলমান ধর্ম প্রচারের ফলে। পূর্বেই বলিয়াছি বৌদ্ধধর্ম হইতে প্রত্যাবর্ত হিন্দুরা ধর্মে অধিকার লাভের জন্য আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের পক্ষে আরেকটি যুক্তি হইল প্রতিবেশী মুসলমানের ধর্মে পূর্ণাধিকার। যে শূদ্র দুইদিন পূর্বে মন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশ করিতে পাইত না সে কিনা

মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া মসজিদে অবাধে প্রবেশ করিতে লাগিল। হিন্দুরা দেখিয়া বিস্মিত হইল যে সেই নও-মুসলিমের ধর্মবিশ্বাস, ক্রিয়াকর্মে ও মুসলিম পণ্ডিতের ক্রিয়াকর্মে কোনোও পার্থক্য নাই।

অস্পৃশ্য ও শূদ্রেরা সম্ভবত এ উদাহরণ তর্কস্বরূপ ব্রাহ্মণদের দরবারে পেশ করে নাই কিন্তু গণ আন্দোলন তর্ক ও যুক্তির পাকা রাস্তা দিয়া চলে না। প্রতিবেশীর উদাহরণ, দৃষ্টান্ত ক্ষণে ক্ষণে নানা পথ দিয়া আসিয়া শাস্ত্রবন্ধনের বেড়ার উপর ধাক্কা লাগায়—বাঁধন টুটিতে থাকে।

ভক্তির চারি আচার্য তবু শূদ্রকে শাস্ত্রে অধিকার দেন নাই। তাহাদিগকে ধর্মে পূর্ণ অধিকার দিবার চেষ্টা করিলেন বাংলা দেশের মহাপুরুষ—শ্রীচৈতন্য। তিনি সে-যুগে হৃদয়ংগম করিতে পারিয়াছিলেন যে ইসলামের বিজয় অভিযান যদি রুদ্ধ করিতে হয় তবে চণ্ডালকে, শূদ্রকে, এমনকি যে হিন্দু মুসলমান হইয়া গিয়াছে তাহাকে, এক কথায় আপামর সর্বসাধারণকে ধর্মে পূর্ণাধিকার দিতে হইবে। বল্লভ নিম্বার্ক যে সাহস দেখাইতে পারেন নাই মহাপ্রভুর দ্বারা তাহা সম্ভব হইল। কিন্তু চৈতন্যের উদার ধর্ম পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না। যে উদ্দেশ্য লইয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রচার হইল তাহা সফল হইল না সত্য, তবু হিন্দুসমাজে প্রচুর উদারতা প্রবেশ করিল।

এই উদারতার দরুন সুফিদের প্রচারকর্মের সুবিধা হইল। পূর্বেই বলিয়াছি ভক্তি ও সুফিতত্ত্ব দুইই প্রেমরসাত্মক। শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রীয় মুসলমান ধর্মে মিলন হইল না—সে মিলনের চেষ্টা রাজপুত্র দারা শি কূহর মতো দুই একজন পণ্ডিত চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু প্রেমের গংগা-যমুনার মিলন হইল। উত্তর ভারতবর্ষে কবির, দাদূ; মহারাষ্ট্রে সন্তোজী, মুহম্মদ উভয়ধর্মের শাস্ত্রের শাসনকে উপেক্ষা করিয়া মধুর কণ্ঠে প্রেমের গান গাহিলেন। সে-গান মসজিদে মন্দিরে প্রবেশ করিল না কিন্তু ধর্মপিপাসার্ত লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে সুধাবর্ষণ করিল। আজিও উত্তর ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া ধর্মে উদার গুজরাত ও কাঠিয়াওয়াড়ে সে গান গীত হয়।

হিন্দুমুসলমানের মিলনের এই চেষ্টা সাধুরা করিয়াছিলেন প্রেমের দ্বারা। আরেক দল চেষ্টা করিলেন ধর্ম-বিশ্বাসের সম্মেলন দ্বারা। তাহা হইতে খোজাদের ধর্মের সৃষ্টি হইল (আগাখান এই দলের ইমাম বা গুরু)। খোজারা শিয়া কিন্তু বিশ্বাস করে যে বিষ্ণু নয়বার পৃথিবীতে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শুধু যেখানে বৈষ্ণবরা বিশ্বাস করে ভবিষ্যৎকালে বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন সেখানে খোজারা বিশ্বাস করে যে আলী (শিয়াদের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম) কল্কিরূপে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মা তাঁহার পুত্র হাসান, তৎপর হুসেন ও বংশানুক্রমে অবতীর্ণ হইয়া আগাখানে আসিয়াছে। আগাখান তাই শুধু পীর বা ইমাম নহেন তিনি সাক্ষাৎ কল্কি। খোজারা তাই কুরান পড়ে না, তাহাদের সর্বপ্রধান ধর্মগ্রন্থ তাহাদেরই এক পীর কর্তৃক গুজরাতিতে লেখা "দশাবতার"। খোজারা জকাত দেয় না—আগাখানকে "দশোন্দ" দেয়, হজে যায় না, আগাখানকে প্রদর্শন করে—তাই তাঁহাকে প্রায়ই বোম্বাই আসিতে হয়। রমজান মাসে উপবাস করে না ও নমাজ পড়ে তিনবার, তাও আরবিতে নয়, হয় কচ্ছী

নয় গুজরাতিতে। পাঞ্চরাত্রে যে সব দেব দেবীর উল্লেখ আছে তাঁহাদের নাম উপাসনার সময় স্মরণ করে। বিষ্ণুর নয় অবতারকে বিশেষ ভক্তি নিবেদন করে আর আগাখান তো স্বয়ং বিষ্ণু।

নওসারীর মতিয়া গুজরাতিরাও হিন্দুমুসলমানের একতার চেষ্টার ফল। তাহারা রমজানে উপবাস করে, কিন্তু নমাজ পড়ে না। বিবাহে ব্রাহ্মণকে ডাকে, কিন্তু মৃতদেহ দাহ করে না, গোর দেয়। সে সময় ডাকা হয় মোল্লাকে। মতিয়াদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার ব্যবহারে ইতিহাস ও বর্ণনা এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

মালেকানারা রাজপুতরা আধা হিন্দু আধা মুসলমান। একই পরিবারে কাহারো নাম আশরফ উদ্দীন কাহারো নাম প্রতাপ সিং। কয়েক বৎসর পূর্বে তাহাদের ধর্ম নিয়া তামাম হিন্দুস্থানে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

এইবার বাংলাদেশে ইসলাম কিরূপে প্রকাশ পাইল তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

উর্দু ভাষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতবর্ষে মুসলমানদের ভিতরে দুই চিন্তাজগতের সৃষ্টি হইয়াছিল পূর্বেই বলিয়াছি। উর্দু ফারসির ন্যায় আরবি শব্দভাণ্ডার গ্রহণ করায় শাস্ত্রালোচনায় তাহার কোনও বিঘ্ন হয় নাই—ইসলামি চিন্তাধারা উর্দুতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছিল। বাংলাদেশেও এই দুই চিন্তাধারার সৃষ্টি হইল অর্থাৎ (১) উর্দুর দ্বারা কুরান, হদীস, ফিকা ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা ও (২) সুফিমতের প্রসার।

(১) উর্দুর মারফতে মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের চর্চা।

মুসলমানেরা বাংলা দেশে দেশজ ভাষার কাঠামো লইয়া উর্দু জাতীয় কোনো নূতন ভাষা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করে নাই। তাহার প্রধান কারণ আরবি ফারসি-বর্জিত তৎকালীন উর্দুর কাঠামো ও বাংলার কাঠামোতে তফাৎ অতি অল্প ছিল অর্থাৎ বাঙালি মুসলমান অনায়াসে সাধারণ উর্দু শিখিতে পারিত। দ্বিতীয়ত তখনকার দিনের বাংলা দেশের মুসলমান ঔপনিবেশিকদের অধিকাংশ ছিলেন উর্দু ভাষাভাষী, তৃতীয়ত বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র ছিল দিল্লি, রামপুরের আশেপাশে, সে সব জায়গায় মিডিয়ম অব ইনস্ট্রাকশন্ ছিল উর্দু।

কোনো চেষ্টা হয় নাই বলা ভুল কারণ অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিস্তর ইসলামি ধর্মগ্রন্থ বাংলাতে প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলিতে আরবি ফারসি শব্দের প্রাধান্য। কিন্তু প্রধানত অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য লিখিত বা গীত হইয়াছিল বলিয়া সেগুলি ঠিক ইসলামি শ্রুতি, স্মৃতি বলা চলে না, তাহাদের ধরণ অনেকটা পৌরাণিক। নানারকম গল্পগাথাও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রসার পূর্ব বাংলায় এখনও আছে।

আরেক চেষ্টা হইয়াছিল শ্রীহট্টাঞ্চলে। সে ভাষাকে 'সিলটী নাগরী' বলা হয় ও এখন জীবন্মৃতাবস্থায়। তাহার প্রধান লক্ষণ যে তার হরফ দেবনাগরী নয়, বাংলাও নয়, মাঝামাঝি; ই কার উ কারে হ্রস্বদীর্ঘ নাই; ঔ কার ঐ কার নাই, এক শ-তে তিন শ-এর কাজ চালায়, অন্তস্থ য নাই, সংযুক্ত বর্ণ বিলকুল নাই, পাঁচ রকম অনুনাসিকের বালাই নাই আর শব্দের ভাণ্ডারে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, উর্দু ও খাস সিলেটি শব্দের আন্তরিক দহরম মহরম।

কিন্তু এই সব চেষ্টার সঙ্গে মুসলমান পণ্ডিতমণ্ডলীর যোগাযোগ ছিল না—তাঁহারা উর্দুর মারফতে শাস্ত্র চর্চায় মশগুল—তাই উর্দুজাতীয় কোনো সবল ভাষার সৃষ্টি হইল না।

তাহারি ফলে আজ বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতির ও শিক্ষার দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। এ দ্বন্দ্ব বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত মুসলমান বলিলে আরবি, ফারসি, উর্দু শিক্ষিত মুসলমানকে বুঝাইত। তাঁহার শিক্ষা দীক্ষায় কোনও দ্বন্দ্ব ছিল না; তিনি বাঙলা জানিতেন না অথবা এত অল্প জানিতেন যে হিন্দু-চিন্তাধারা তাঁহার ইসলামি জগতে প্রবেশ করিত না। আরব, পারস্য, উত্তর ভারতবর্ষের ইসলামি চিন্তা ও ভাব জগতের সঙ্গে তাহার যোগসূত্র ছিল।

বিংশ শতাব্দীতে কলহের সৃষ্টি হইল। হিন্দু সমাজেও এ কলহ ক্ষণস্থায়ীরূপে তাহার পূর্বে দেখা দিয়াছিল। সে যুগে পিতা ছিলেন ইংরেজি অনভিজ্ঞ খাঁটি হিন্দু, পুত্র ইংরেজি শিক্ষিত 'নাস্তিক'। পিতার পশ্চাতে হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্য, পুত্রের পশ্চাতে মিল, কঁৎ আর ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস। আজ পিতাপুত্র উভয়ই ইংরেজি শিক্ষায় গঠিত—কষ্টেসৃষ্টে হয়ত মেঘদূত পড়িতে পারেন—আর পণ্ডিত হইলেও ভেনিস স্টেশনে মুর্গী খান ও লাল মদ্য 'খাদ্য' হিসাবে গ্রহণ করেন; কলহের অবসান হইয়াছে। মুসলমান সমাজে এই দ্বন্দ্ব আজ উগ্র মূর্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের ধর্মের প্রতি টান বেশি—মধুসূদন, লালবিহারী, কৃষ্ণমোহনের দৃষ্টান্ত মুসলমান সমাজে নাই—তাই পিতার তিরস্কারে পুত্র লজ্জিত হয়, বিদ্রোহ ঘোষণা করে না। পিতা বলেন "আরবি ফারসি জানো না, ধর্মকর্ম ভুলিয়া গিয়াছ।" পুত্র ভাবিয়া দেখে হক্ কথা, দোষ দেয় তাহার শিক্ষাকে—ইসলামি কায়দায় কেন সে শিক্ষিত হইল না। ইহার পর দ্বন্দ্ব আরও কঠোর হইল। ভারতবর্ষের মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে। সিকন্দর হায়াত বাংলা দেশে আসিয়া উর্দুতে বক্তৃতা দেন, দাওয়াতে-খানা-পিনাতে উর্দু বলেন, ফারসি বয়েত ঝাড়েন, আরবি কোটেশন ঠোকেন, তাঁহাদের সঙ্গে মৌলানা আকরম অক্লেশে কথা বলেন, কলিকাতার দুই একজন ঔপনিবেশিক উর্দু বলিয়া লজ্জা রক্ষা করেন কিন্তু কলেজে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান নেতা তখন ভাষণ না করিয়া শোভা পাইবার চেষ্টা করেন। যদিবা কষ্টেসৃষ্টে কথার স্রোত ঘুরাইয়া ইংরেজি জমির উপর দিয়া চালান তখন ধরা পড়ে মুসলমান কৃষ্টিতে তাঁহার অভ্রভেদী, পাতালস্পর্শী অজ্ঞতা। বীরের তুলনা দিতে গেলে তাঁহার মনে ভীষ্মার্জুন, প্রেমিক প্রেমিকার কথা বলিতে গেলে রাধাকৃষ্ণ, দার্শনিকের নাম করিতে শংকর-রামানুজ। হাসন-হোসেন, লায়লী-মজনু, ইবনি, সিনা-গজ্জালীর নাম শুনিয়াছেন—পরিচয় নাই। ব্যাপার আরও মর্মন্তুদ হয় ঐ বাঙালি মুসলমান নেতারই পলিটিক্স্-ইকনমিক্স্- সোসিয়লজি-লীগ-কংগ্রেস অনভিজ্ঞ "ওল্ডফেশনড্" পিতা যখন মজলিসে উপস্থিত হইয়া অক্লেশে উর্দু বলেন, সিকন্দরের বয়েত শুনিয়া "শাবাশ্" বলেন, কায়দা মাফিক উলটা বয়েত ঝাড়েন।

উর্দু বলিতে পারা বাঙালি মুসলমানের চরম মোক্ষ নহে। উর্দু না বলিয়াও মুসলমান সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রাখা সম্ভব; যেমন আজ সংস্কৃত না জানিয়াও হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে মোটামুটি সম্বন্ধ রক্ষা করা যায়। সংস্কৃতে লিখিত হিন্দু সভ্যতার প্রায় সব প্রধান গ্রন্থ বাংলাতে তর্জমা হইয়াছে, বিস্তর টীকাটিপ্পনি ও নূতন কেতাব লেখা হইয়াছে। 'বসুমতী', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী'র পিয়েস দ্য রেজিজস্তাঁস এখনও গুরুগম্ভীর বৈষ্ণবতত্ত্ব, তান্ত্রিক মতবাদ বা উপনিষদের জ্যোতির্ময় পুরুষ। এ সমস্ত বাঙালি হিন্দুর মাতৃভাষায় লেখা,

তাহার সঙ্গে পরিচয় থাকিলে সে অনায়াসে পুনাতে হিন্দুমণ্ডলীর ভিতরে বসিতে পারে—যদিও তাহার পক্ষে সেখানে সংস্কৃত উচ্চারণ (জাগাঁবল্ক!) না করাই প্রশস্ত। কিন্তু বাংলাতে মুসলমানদের সেরকম কিছু নাই।

সংস্কৃতির এই দ্বন্দ্বে যে শুধু বাঙালি মুসলমানই দিশাহারা হইয়াছে তাহা নহে—উত্তর ভারতবর্ষের উর্দু ভাষাভাষী হিন্দুরাও এই বিপদে সগোত্র। তেজবাহাদুর কিসনের বান্‌সরী মাত্রই শুনিয়াছেন, জওয়াহির লাল বৃহৎ তকলীফ করিয়া হিন্দি লেখা মকশো করিয়াছেন কিন্তু পিতা মোতিলাল এসেমব্লিতে গালাগাল দিতেও "মন তুরা হাজী মীগূয়ম তুমরা কাজী বগো" বলিয়াছেন। ইঁহাদের সমস্যার কিন্তু সমাধান আছে, উর্দু না শিখিয়া হিন্দি শিখিলেই বাঙালি হিন্দুর মতো হিন্দু সংস্কৃতির সহিত সংযুক্ত হইবেন।

কিন্তু বাঙালি মুসলমান যায় কোথায়?

উত্তর হইতে পারে—

(১) হিন্দু মুসলমান দুই সংস্কৃতি বাদ দিয়া শিক্ষা লাভ করো; উত্তরে নীচশে সাহেব বলিয়াছেন "নেমট্‌ নূর ডি গ্রীযেন, সাম্‌ট্‌ ডের ফিলোসফী উনট্‌ ডের কুন্‌স্‌ট্‌ বেক্: অন বেলধের লইটর বল্‌ট্‌ ঈর নখ্‌ ত্‌সুর বিলডুন্‌ক্ এম্‌পর্ স্টাইগেন?" টিপ্পনি অনাবশ্যক, দুই মই-ই যদি কাড়িয়া লওয়া হয় তবে বাঙালি মুসলমান চড়িবে কোথায়।

দ্বিতীয় উত্তর হইতে পারে বাংলার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া উর্দু শিখা। কিন্তু সে অসম্ভব। যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের উর্দু হিন্দির ন্যায় বাংলাদেশে উর্দু বাঙলার নূতন সমস্যা সৃষ্টি করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না।

তৃতীয় উত্তর হইতে পারে বাংলাতে মুসলমান সংস্কৃতির আলোচনা ও সাহিত্য-সৃষ্টি—হিন্দুরা যেরূপ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা বাংলাতে গত একশত বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন। ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য অত্যধিক বাক্যব্যয় না করিলেও চলিবে। মাতৃভাষাতে ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোচনা না করার বিষময় ফলের চমৎকার দৃষ্টান্ত পশ্চিম ভারতবর্ষের পার্সি সমাজ। মাতৃভাষা তাহাদের গুজরাতি। অধিকাংশ পার্সিই মাতৃভাষা ভালো করিয়া জানে না ও গুজরাতিতে পার্সি ধর্ম ও সংস্কৃতির পুস্তক সংখ্যা নগণ্য। ফলে পার্সিরা সংস্কৃতিহীন-অনুকরণশীল।

মুসলমানি যুগে তাহারা মোগলাই খানা খাইয়াছে, ফারসি ভাষা শিখিয়াছে, কিন্তু কোনোও সাহিত্য সৃষ্টি করে নাই। গত একশত বৎসর ধরিয়া তাহারা ইংরেজি কায়দায় উঠে বসে ও খাঁটি অক্‌স্‌ফোর্ডী উচ্চারণ করিতে পারা চরম মোক্ষ বলিয়া ধরিয়া নিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে ধর্মে সঙ্কীর্ণতা এবং তাহার প্রধান কারণ ধর্মালোচনার সুবিধা মাতৃভাষাতে নাই বলিয়া। পার্সি বাল্যকাল হইতে ধর্ম বলিতে বোঝে কয়েকটি ক্রিয়াকাণ্ড। হিন্দুর মতো রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের আদর্শ ও ত্যাগের আবহাওয়ায় গড়িয়া উঠে না। এই অজ্ঞতাই তাহাকে ধর্মের রাজ্যে অন্ধ করিয়া তোলে—ভাবে যাহা জানা নাই তাহা চক্ষু বন্ধ করিয়া মানিয়া লওয়াই প্রশস্ত। তাই সেদিন যখন এক পার্সির উইলের কথা জানাজানি হইয়া গেল যে তিনি মৃত্যুর পরে যেন তাহার দেহ টাওয়ার অব সায়লেন্সে না রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন তখন তামাম পার্সি সমাজ হুঙ্কার দিয়া উঠিল—তাহার নাপিত ধোপা

বন্ধ করিয়া দিল। প্রতিবেশী ইসমাঈলীয়া শিয়া বোহরা সমাজেরও ঐ অবস্থা। জাতে মুসলমান, মাতৃভাষা গুজরাতি, সে ভাষাতে মুসলমানি কিছু নাই। তাহাদের মতো ধর্মে অজ্ঞ ও তাহারই ফলস্বরূপ ধর্মে অন্ধ জাতি পৃথিবীতে কম। আরবিতে লেখা তাহাদের বহু প্রাচীন ধর্ম পুস্তক 'মোটা-মোল্লাজী'র বাড়িতে পোকায় কাটিতেছে। ইংরেজি ও আরবি শিক্ষিত এক বোহরা যুবক তাহারই একখানি মুদ্রণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভদ্রলোকের নাকের উপর সমাজ তাহার দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে এ সাহিত্য রচনা করিবে কে? যাঁহারা ভালো বাংলা জানেন তাঁহারা ইসলাম চিনেন না, যাঁহারা ইসলামের পূর্ণ সংস্কৃতির খবর রাখেন তাঁহারা বাংলা জানেন না। কাজেই এই ব্যাপক সাহিত্য একদিনে গড়িয়া উঠিতে পারে না—বহু লেখকের, বহু দিবসের, বহু তপস্যার প্রয়োজন। এই সব লেখকের নির্মাণ করিব কি করিয়া? শিক্ষাপ্রণালির সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া—অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানকে সনাতন বাংলা শিখিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের পূর্ণ সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইতে হইবে। কেহ কেহ হয়ত আপত্তি জানাইয়া বলিবেন "শিক্ষা দ্বিখণ্ডিত হইবে"। তাহাতেও ভীত হইবার কারণ নাই—সুইজারল্যাণ্ডে (ও নাৎসি অবতরণের পূর্বে জর্মনিতেও এখনও কিয়ৎ পরিমাণে) বহু বালকবালিকা প্রটেস্টন্ট্ ও ক্যাথলিকদের জন্য বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক স্কুলে যায়। দুই বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন এক, শুধু ধর্মশিক্ষা স্বতন্ত্র। বিশ্ববিদ্যালয়েও ক্যাথলিক থিয়লজি ও প্রটেসসটন্ট্ থিয়লজির দুই বিভাগ। সেখানে শুধু ধর্ম শিক্ষা হয় না, ছাত্রেরা ক্যাথলিক ও প্রটেস্টন্ট্ স্ব স্ব সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হয়। অথচ পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে এমন কোনো বিচ্ছেদ এ যাবত হয় নাই যাহার জন্য এ শিক্ষা নিন্দার কারণ হইয়াছে। তর্ক উঠিতে পারে, দৃষ্টান্তটি ঠিক হইল না কারণ প্রটেস্টন্ট্ ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পার্থক্য হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য অপেক্ষা কম। সত্য আজ কম কিন্তু মধ্য যুগে এই দুই সম্প্রদায় শুধু ধর্মের জন্য যে রক্তারক্তি করিয়াছে ভারতবর্ষে সেইরূপ তাণ্ডব নৃত্য কখনও হয় নাই; অথচ শিক্ষার দিক দিয়া আমরা তো এখনও মধ্যযুগে।

আমাদের বক্তব্য এই, মুসলমানকে ধর্মে ও সংস্কৃতিতে অজ্ঞ রাখিলে ক্রমে ক্রমে সে উদার হইবে এ আশা দুরাশা। সে তাহার ধর্ম ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় পুষ্ট হউক, বাংলা সাহিত্য ও হিন্দু কৃষ্টির সঙ্গে সংযুক্ত থাকুক, তবেই সে উদার হইবে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথে অগ্রসর হইবে।

রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন "মানব সংসারে জ্ঞানালোকের দেয়ালি উৎসব চলিতেছে; প্রত্যেক জাতি আপন বাতি উঁচু করিয়া ধরিলে এই উৎসব সমাধা হইবে।"

(২) সুফিমত তাহার নানা শাখাপ্রশাখায় কাদেরিয়া, কদমিয়া, নকশাবন্দী নানা সম্প্রদায় এদেশে প্রসার লাভ করিল। বাঙালি সুফিরা জিকর বা ভজন করেন, বারংবার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 'হাল' বা দশা প্রাপ্ত হন, সেতার বা একতারা যোগে মধুর গান করেন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সমাধিস্থ হন। এক কথায় বাঙালি সুফি ইরান ও উত্তর ভারতবর্ষের সুফি ঐতিহ্য সঞ্জীবিত রাখিলেন।

কিন্তু ইহাদের প্রভাবে অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণির হিন্দুমুসলমানের ভিতর যে রসধারার সৃষ্টি হইল তাহা অপূর্ব ও আধ্যাত্মিক জগতে তাহাদের যে মিলন হইল পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার

স্থান পাওয়া উচিত। আউল, বাউল, মুরশীদিয়া, দরবেশী, সাঁই, মরমিয়া, জারীগান, গাজির গীত সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে উঠিয়াছে তথাপি সে গীতে বাঙালি ভক্তের আধ্যাত্মিক অনুভূতির যে পরিচয় পাই তাহার সহিত কোনো দেশেরই—ইউরোপের বলুন আর এশিয়ার বলুন-লোক-সাহিত্যের তুলনা হয় না।

এ সম্পদের সম্পূর্ণ আহরণ এখনও হয় নাই। যেটুকু সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার বিশেষ লক্ষণ তাহাতে সর্বধর্মসমন্বয়। তাহারই দুই একটি নিদর্শন দেওয়া গেল।

বেদান্তের আত্মা পরমাত্মার অনন্যতা, মায়াবাদ, মনসূর অল-হল্লাজের "আনা'ল হক" বহু গীতে অতি সরল ভাষায় অভিজ্ঞতার অন্তস্থল হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে;

আপনার আপনিরে মন না জানো ঠিকানা
পরের অন্তর কেটে সমুদ্দুর কি যে যাবে জানা?
পর অর্থে পরম ঈশ্বর, আত্মারূপে করে বিহার
দ্বিদল বারামখানা, শতদল সহস্রদল অনন্ত করুণা,
সিরাজ সাঁই বলেরে লালন গুরুপদে ডুবে আপন
আত্মার ভেদ জেনে নে না;
আত্মা আর পরমাত্মা নিত্য জেনে নে না।

(মতিলাল দাস, বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৪১)

অশিক্ষিত হাসন রাজার তত্ত্বজ্ঞান ও 'স্পর্ধা' দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয় :

আমি হইতে আল্লা, রসুল আমি হইতে কুল।
পাগল হাসন রাজা বলে তাতে নাই ভুল।
আমি হইতে আসমান জমীন, আমি হইতেই সব
আমি হইতে ত্রিগজৎ, আমি হইতে রব।[১]
আক্কেল হইতে পয়দা হইল মাবুদ আল্লার
বিশ্বাসে করিল পয়দা রসুল[২] আল্লার
মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন
কর্ণ হইতে পয়দা হইছে, মুসলমানী দীন[৩]
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদবয়,
আমি হইতে সব উৎপত্তি হাসন রাজায় কয়।
মরণ জীয়ন নাইরে আমার, ভাবিয়া দেখ ভাই
ঘর ভাঙিগয়া ঘর বানানি, এই দেখতে পাই।

(হাছন উদাস, ৮৫)

অক্ষরে না ধরে নাম শ্যাম বিনোদিয়া
দেখ, ভোলা মন আপন ঘরে আছে ছাপাইয়া।।[৪]
চুরি করো ধারি করো আপনার লাগিয়া

---

(১) রব (আরবি) = আল্লা। (২) রসুল (আরবি) = প্রেরিত পুরুষ মুহম্মদ। (৩) দীন (আরবি) = ধর্ম। (৪) ছাপাইয়া (শ্রীহট্টের ভাষায়) লুকাইয়া।

আপনার নামে আসবে শমন সব যাবে পলাইয়া।।
আল্লা আদম দুইদম একদম করিয়া
আদমপুরের বাজারে গোলাঘর বাঁধিয়া।।
সাবাল আলী কহিল মুরশীদ চরণে ধরিয়া
অক্ষরে না ধরে নাম তাই দেও বাতাইয়া।।

(সৈয়দা হবীব উন-নিসার সংগ্রহ)

"আল্লা" আর "আদম" (মানুষ) আদমপুরে (মানুষের ভিতরে) গোলাঘর বাঁধিয়া বসিয়া আছেন, সাবাল আলী তাই মুরশীদকে চরণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহার পূর্ণ নাম, পূর্ণ স্বরূপ কি?

সাংখ্য দর্শনের স্থান মুসলমান ধর্মে নাই—ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে আল্লা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া তাহাতে আদম ও পরপর মহাপুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন কিন্তু শিয়া ও সুফি বাতিনিয়ারা (ইঁহারা বিশ্বাস করেন কুরানের এক বাহ্য—জাহির—অর্থ ও আরেক গুহ্য—বাতিন—অর্থ আছে) বলেন যে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আল্লা ও নূর (জ্যোতি) দুই চিরন্তন সত্তা বিরাজিত ছিলেন। সেই নূর আদমে প্রকাশিত হইয়া তাহার পুত্রে সঞ্চারিত হয়। যুগ যুগ ধরিয়া সেই জ্যোতি নানা মহাপুরুষের ভিতর দিয়া আসিয়া মহাপুরুষ মুহম্মদের পিতামহে দুই অংশে বিভক্ত হয়, তাহার এক অংশ মুহম্মদের উদ্ভাসিত (জাহির) হয় ও অন্য অংশ আলীতে গোপন (বাতিন) থাকে। মুহম্মদের নূর তাঁহার কন্যা ফাতিমাতে যায় ও আলীর ঔরসে ও ফাতিমার গর্ভে যে সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের ভিতর সেই খণ্ডিত নূর সংযুক্ত হয়। বাতিনিয়ার এই বিশ্বাস যে আল্লা-নূর আবহমান কাল হইতে বিদ্যমান সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিতে সাড়া পাইয়াছে—

অপারের কান্ডার নবিজী আমার
ভজন সাধন বৃথা গেল নবি না চিনে
নবি আউয়াল[১] ও আখির[২]
জাহির ও বাতিন
কোন সময় কোন রূপ
ধারণ করে কোন খানে।
আসমান জমীন জলধি পবন
নবীর নূরে করিলেন সৃজন,
তখন কোথায় ছিল নবীজীর আসন
নবী পুরুষ কি প্রকৃতি আকার।
আল্লা নবী দুটি অবতার
আছে গাছ বীজেতে যে প্রকার,
গাছ বড় না ফলটি বড়,
তাও নাও হে জেনে।

(১) প্রথম। (২) শেষ।

আত্মতত্ত্বে ফাজিল[১] যে জনা
সেই জানে সাঁইয়ের নিগূঢ় কারখানা,
হলেন রসুলরূপে প্রকাশ রববানা[২],
অধীন লালন বলে দরবেশ সিরাজ সাঁইয়ের গুণে।

(মনসুর উদ্দীন, হারামণি, ৪৯)

মুসলমান সৃষ্টিতত্ত্বে বৈষ্ণবের লীলার স্থান নাই কারণ ভগবান মানুষের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার স্তব করিবার জন্য কিন্তু বাঙালি সুফিরা আত্মতত্ত্বে লীলার স্থান দিয়াছেন—

লীলায় নিরঞ্জন আমার
আধ লীলে করলেন প্রচার,
জানলে আপনার জন্মের বিচার,
সব জানা যায়

(মনসুর উদ্দীন, হারামণি, ৫৯)

আর লালনেরই মতো পূর্ববঙ্গের কবি সৈয়দ শাহ নূর আপনার শরীরে (ওজুদ) বৈষ্ণব "লীলার কারখানা মৌজুদ" দেখিয়াছেন। তাই উপদেশ দিলেন বৈষ্ণব প্রেমের দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের মোহ কাটাইয়া সত্ত্বরসে পরিপূর্ণ হইতে—তাহাই ফানা।

রসিক চাইয়া প্রেম করিয়ো যার দিন ফানা,
অরসিকে প্রেম করিলে চোখ থাকিতে কানা।
অজুদে মজুদ হইয়া লীলার কারখানা,
সৈয়দ শা নূরে কইল দেখলে তনু ফানা।

(সৈয়েদা হবীব উন-নিসার সংগ্রহ)

শ্রীচৈতন্যের উদার ধর্ম মুসলমান কবির হৃদয় স্পর্শ করিল, 'বিধর্মী' রূপসনাতনকে 'ফকির' উপাধি দিয়া পাঙক্তেয় করিল—

প্রেমের দেশে প্রেমের মানুষ,
জানে তারা আগম নিগম,
প্রেমুন তারা রূপ সনাতন,
ফকির হল ভাই দুজন।

(হারামণি, ৭৯)

পারস্যের সুফি গুরু জলাল উদ-দীন রূমীর প্রভাবই এই সাধকদের উপর সর্বাপেক্ষা প্রসার পাইয়াছিল। মসনবীতে জলাল তোতা কাহিনীর অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন তোতা মরার ভাণ করাতে মনীব তাহাকে পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল, তাহাতে তাহার মুক্তি লাভ হইল। সেইরূপ মৃত্যু আসিবার পূর্বেই যদি মরার মতো হইতে পার তবেই তোমার ফানা, মোক্ষ। তাই রূমী বলিলেন গসসালের (মৃতদেহকে যাহারা গোসল

(১) পণ্ডিত। (২) আমাদের আল্লা।

দেয়) হাতে মৃতের যে আচরণ তাহাই অভ্যাস কর। বাঙালি সুফি ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন—জীবিতের বেশ তাজ (টুপি) ও তহবন্দ (লুঙ্গি) ত্যাগ করিয়া মৃতের বেশ খিলফা-কাফন গ্রহণ কর, যেন গসসালের হাতে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছ—

মরার আগে ম'লে শমন জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে সে মরা কেমন, মুরশিদ ধরে জানতে হয়।।
যে জন জেন্দা লয় খেলকা কাফন
দিয়ে তার তাজ তহবন,
ভেক সাজায়।।
মরার আগে মলে শমন জ্বালা ঘুচে যায়।।

(হারামণি, ৯)

দাদূও বলিয়াছেন,

দাদূ মেরা বৈরী মৈঁ মুরা মুঝৈ ন মারৈ কোই।

"হে দাদূ, আমার বৈরি সেই 'আমি' মরিয়াছে, আমাকে কেহই পারে না মারিতে"। (অধ্যক্ষ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, দাদূ, ১৩৪২, পৃ. ১০৯)

কবিরও বলিয়াছেন—

তজ অভিমানা সীখো জ্ঞানা
সতগুরু সংগত তরতা হৈ।।
কহেঁ কবির কোই বিরল হংসা
জীবত হী জো মরতা হৈ?

"অভিমান ত্যাগ কর, জ্ঞান শিক্ষা কর, সদগুরুর সঙ্গে এই সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কবির কহেন, 'জীবনের মধ্যেই মৃত্যুকে লাভ করিয়াছেন বিরল তেমন সাধক।" (অধ্যক্ষ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, কবির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯)

সাধনা ও ধ্যানের ক্ষেত্র ব্যতীত লোক-সাহিত্যেও হিন্দু-মুসলমানের অনুভূতি সম্মেলিত হইয়াছে। হাসন-হোসেনের শোকগাথায় কবি রামলক্ষ্মণের অযোধ্যা ত্যাগের হৃদয়বিদারক দৃশ্য স্মরণ করাইয়া শ্রোতার সহানুভূতি জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—

হানেফ বলে আয়রে কোলে জয়নাল বাছাধন
ওরে যে না পথে দিছিরে দুই ভাই জোড়ের হোসেন হাসান
সেই না পথে যাবোরে আমি করো আমার গোর কাফন।
রামলক্ষণ গেছেরে বনে অযোধ্যা ছেড়ে,
এই রকম গেছেরে দুই-ভাই মদিনা শূন্য করে।

(হারামণি, ৮৯)

সাধনার গভীরতম সর্বজনীন সত্য ইঁহাদের হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে উঠিয়াছে। নানাদেশের সাধু নানাকালে যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন মনে হয়, ইঁহারা অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা তাহারই

সন্ধান পাইয়াছেন। অন্তরতর যদয়মাত্মা, উপনিষদের বাণী ইঁহাদের মুখে "মনের মানুষ" রূপে বাহির হইল—(রবীন্দ্রনাথ, "হারামণি"র আশীর্বাদ প.)।

আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা।
অতি নির্জনে বসে বসে দেখছে খেলা।
আছে রয়ে, ডাকে তারে, উচ্চস্বরে কোন পাগলা;
ওরে যে যা বোঝে, তাই সে বোঝে থাক রে ভোলা।
যে জন দেখে সে রূপ, করিয়ে চুপ রয় নিরালা,
ও সে লালন ভেঁড়োর লোক জানান হরি বলা।

(হারামণি, ১)

তারে কেউ ধরিতে না পারে
সকল রঙেগর মানুষ একটি থাকে মোর ঘরে।।

ঘরে থাকে বাইরে থাকে থাকে সে অন্তরে
তার লাগিয়া পাগল হইয়া হাসান রাজায় ফিরে!

রঙগ করে ঢঙ করে আরো করে খেলা
সেই মানুষে লাগাইয়াছে ভবার্ণবের মেলা।।
হাসান রাজা হইছে পাগল দেখিয়া তার লাগি,
তারে যদি ধরতে চাও রাত্রি থাকিয়ো জাগি।।

(হাছন উদাস, ১৩৮)

"সে দূরে নয়", "সে দূরে নয়", তাই শিরাজ লালনকে বলেন

কে কথা কয়রে দেখা দেয় না,
নড়ে চড়ে হাতের কাছে,
খুঁজলে জনমভর মিলে না।
খুঁজি যারে আকাশ জমিন,
আমারে চিন না আমি
সে বড় বিষম ভ্রমের ভ্রমি,
সে কোন জন আমি কোন জনা।।
হাতের কাছে হয় না খবর
খুঁজতে গেলাম দিল্লী শহর
সিরাজ কয় লালনরে তোর
তবুও মনের ঘোর গেল না।।

(হারামণি, ১৭)

তাহারই যেন স্পষ্ট প্রতিধ্বনি গ্যোটের

বারুম ইন ডি ফের্নে শ্বুয়াইফেন
সী, ডাস গ্ল্যুক লীগট সো না

(দূরে দূরে তুমি কেন খুঁজে মরো
শান্তি সে তো হাতের কাছে)

গুরু প্রশস্তিতে আবার হিন্দু-মুসলমানের ভক্তি স্তোত্র মিলিত হইয়াছে। ইরানি কবি হাফিজ বলিয়াছেন, 'মুরশিদ যদি আদেশ দেন তবে আমি মদ দিয়া আমার জায়নামাজ রাঙা করিব।' পূর্ববঙ্গের হিন্দু কবি গাহিয়াছেন :

গুরু জগৎ উদ্ধার
আমারে কাঙাল জানিয়া পার কর।
আকাশেতে থাক তুমি, পাতালে বাস কর
রমণীর রূপ ধরিয়া গুরু, পুরুষের মন হর।
সর্প হইয়া দংশ তুমি, ওঝা হইয়া ঝাড়ো।
বুঝিতে না পারি তোমার মহিমা অপার।।
ভেবে রাধারমণ বলে এই পারো, সেই পারো,
সকলরে তরাইলায় গুরু, আমারে পার করো।।

আর পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান কবি গাহিয়াছেন :

মুরশিদের চরণ সুধা — পান করিলে যাবে ক্ষুধা
করো না দেখে দ্বিধা — যেহি মুর্শিদ, সেহি খোদা।
আপনি খোদা আপনি নবি, — আপনি সে আদম ছবি
অনন্তরূপ করে ধারণ, — কে বোঝে তার নিরাকরণ
নিরকার হাকিম নিরঞ্জন মুর্শিদ রূপ ভজন পথে।

(ম, দাশ, বসুমতী, ১৩৪১)


পুস্তকাবলি :—

(১) মৌলবী মনসুরউদ্দীন, 'হারামণি'।
(২) অধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহন সেন, 'দাদূ' 'কবীর'।



উৎস : চতুরঙ্গ, প্রথম বর্ষ, ১৩৪৫-৪৬

# ভারতীয় মুসলমানের উপর হিন্দু প্রভাব

রেজাউল করীম

ভারত বিভাগের পূর্বে মুসলিম সমাজের একটা বিরাট অংশ এই দাবি করিয়াছিলেন যে তাঁহারা একটা স্বতন্ত্র জাতি, ভারতের হিন্দু ও অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের কোনো জাতীয় সম্পর্ক নাই। শত শত বৎসর ধরিয়া একই দেশে পাশাপাশি একই সঙ্গে বাস করা সত্ত্বেও মুসলিম সম্প্রদায় এদেশের মাটির সহিত মিশিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সংস্কৃতি, আচার, বিচার, ভাষা, চালচলন, সবই স্বতন্ত্র ও পৃথক। সুতরাং স্বতন্ত্র জাতি হিসাবেই তাঁহারা এদেশে থাকিবেন, আর সেজন্যই একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তাঁহারা চাহিয়া বসিলেন। যাঁহারা এই ধরনের কথা বলিয়াছেন তাঁহারা ইতিহাসকে একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সত্য বটে, ধর্ম ও আচার বিচার ইত্যাদি ব্যাপারে এদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু পার্থক্য বিদ্যমান আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করা চলে না যে, কালের অমোঘ প্রভাবে ক্রমবিবর্তনের পথে ধীরে ধীরে কখনও জ্ঞাতসারে কখনও অজ্ঞাতসারে ভারতের মুসলমান সমাজের মধ্যে ভারতীয় তথা হিন্দু ভাবধারা প্রবেশ করিয়াছে। এই বিষয়টা লক্ষ করা হয় নাই বলিয়াই স্বতন্ত্র জাতিত্বের দাবি উঠিয়াছিল। একটু ধীরভাবে লক্ষ করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতে দুই জাতিত্বের থিওরি অচল। ভারতীয় বহু মুসলমান ভাবিয়া থাকেন যে, তাঁহারা আরব, ইরান, তুরান, মিশরের মুসলমানের সঙ্গে সব বিষয়েই এক, কিন্তু তাঁহাদের এ ধারণা ভুল। এক তো নহেই, বরং বহুবিষয়েই বহু পার্থক্য বিদ্যমান আছে। ধর্মের দিক দিয়া সব মুসলমানই এক। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরিয়া বিভিন্ন দেশে বসবাস করার জন্যে আরব, ইরানের মুসলমান এবং এদেশের মুসলমান সমাজের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতির স্পর্শে থাকার ফলে মুসলমান সমাজ আরবের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিচ্ছেদ কেবলমাত্র ভৌগোলিক নহে—মনের বিচ্ছেদও হইয়াছে। পৃথিবীর যেখানেই সে গিয়াছে সেইখানকার জলবায়ুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে সংস্কৃতিগত সমন্বয়ও হইয়াছে। ভারতেও এই সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। পাঠান আমলে যে সমন্বয় আরম্ভ হইয়াছিল, দাদু, কবির, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ সাধকগণ যে সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন মোগল আমলে তাহা আরও পুষ্টিলাভ করে। পাঠান আমলে শাসকদের পক্ষ হইতে সমন্বয়ের জন্য বিশেষ কিছু করা হয় নাই, কিন্তু মোগল আমলে শাসকগণ ভারত-আরব সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের বহু

প্রকার চেষ্টার ফলে হিন্দুদের মধ্যে যেমন ইসলামিক প্রভাব প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপ অনায়াসে মুসলমান সমাজের মধ্যেও হিন্দু প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে। আকবর, জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের রাজত্বকালে অব্যাহত ভাবে চলিয়াছিল সমন্বয় সাধনের ধারা। আওরঙ্গজেব অত্যধিক ইসলাম-প্রীতির জন্য সেই ধারাকে বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ো বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। যখন মুসলমান সমাজের পরতে পরতে ভারতীয় তথা হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব প্রবেশ করিয়া ভারতীয় মুসলমানকে আরবীয় মুসলমান হইতে বহুদিক দিয়া পৃথক করিয়াছে, তখন কোনো অনুদার শাসকের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি বা অনুশাসন সমন্বয়ের গতিরোধ করিতে পারে না। আওরঙ্গজেব তাহা পারেন নাই। বরং ফল হইয়াছে উলটা। রাজনীতির দিক দিয়া তিনি মোগল-গরিমার সমাধি রচনা করিলেন। কিন্তু যে "খাঁটি" ইসলাম রক্ষার জন্য তিনি এতসব অনুদার পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাহা একটুও সফলতা লাভ করিল না। আওরঙ্গজেবের পরে তাঁহার ধর্মান্ধতার কীর্তিকলাপ দুঃস্বপ্নের মতো অল্পদিনের মধ্যে কোথায় বিলীন হইয়া গেল। আওরঙ্গজেবের পরেই মোগল শক্তির পতন আরম্ভ হইল। এই পতন-যুগে বহু অঞ্চলে বিদ্রোহ বিপ্লব দেখা দিল। আশ্চর্যের কথা এই যে, এইসব বিদ্রোহ বিপ্লব কোনওরূপ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে হয় নাই। তাই দেখা যায় যে, কোথাও কোথাও হিন্দু রাজা মুসলমানের সহযোগিতা লইয়া মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। আবার অনেক স্থলে মুসলমান শাসক হিন্দুর সাহায্যে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাইয়াছে। ভারতবর্ষ যদি ইউরোপীয় শক্তির দ্বারা অধিকৃত না হইত, তবে দেশের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হইয়া যাইত। একই দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় বসবাস করিলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। ইতিহাসে ইহার বহু প্রমাণ আছে। রোমকগণ যখন খ্রিস্টান ধর্ম অবলম্বন করিল, তখন কিছুদিন তাহাদের মধ্যে দুইটি আদর্শ সমানভাবে ক্রিয়া করিতে লাগিল। সত্য বটে, পৌত্তলিক রোমকগণ খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাবে বাহিরের দিক দিয়া অ-পৌত্তলিক হইয়া গেল; কিন্তু তাহারাও এমনভাবে খ্রিস্টানগণকে প্রভাবিত করিল যে, চিন্তায়, ভাবে, আচরণে তাহারা মূলত রোমকই হইয়া রহিল। এমনকী বহু আচার ও অনুষ্ঠান রোমান সভ্যতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে আজিও ইউরোপের বহু ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে রোমান প্রভাব পাওয়া যাইবে। প্রোটেস্টান্ট বিপ্লবের সময় পিউরিটান সম্প্রদায় সেই প্রাচীন হিব্রুযুগে প্রত্যাবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। শেক্সপিয়ার, মিলটন, শেলি, কিটস, বায়রন প্রভৃতি কবিদের মধ্যে গ্রিক ও রোমান প্রভাব এত বেশি আছে যে মনে হয় তাঁহারা যেন প্রাচীন কালচারের মধ্যেই পুষ্ট হইয়াছেন। সেইজন্য একজন সমালোচক গর্ব করিয়া বলিয়াছেন, 'উই আর দি চিলড্রেন অব দি গ্রিকস্।' সেইরূপ ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে এত বেশি হিন্দু প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে যে, আমরাও বলিতে পারি, "উই আর দি চিলড্রেন অব দি হিন্দু এরিয়ান্স।" আমরাও আর্য হিন্দুদেরই সন্তান।

আমার কথা শুনিয়া যাঁহারা চমকিয়া উঠিবেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ভারতের মুসলমানের কয়জন আরব, ইরান, তুর্কি, তাতার হইতে আসিয়াছেন? নির্দিষ্ট কতিপয় পরিবার, কিছু সংখ্যক সৈন্য সামন্তদের বংশধর, আর কতক কতক শাসক শ্রেণির আত্মীয় স্বজনের অধস্তন পুরুষ ব্যতীত ভারতের কোটি কোটি মুসলমানের অধিকাংশই এদেশের সন্তান। অতীতকালে তাঁহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেও হিন্দু ভাবধারা ও হিন্দু সংস্কৃতি একেবারেই

বর্জন করিতে পারেন নাই। আজ ভারতীয় মুসলমানদের জীবনযাত্রার মধ্যে হিন্দু প্রভাবের বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে আরব, ইরান প্রভৃতি দেশের প্রভাবের অল্প চিহ্নই অবশিষ্ট আছে। সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরি, মহম্মদ তুঘলক প্রমুখ জাঁদরেল শাসকগণ, যাঁহারা কোন অতীতে মধ্য এশিয়া আফগনিস্তান প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এদেশের কোথাও তাঁহাদের চিহ্নমাত্র নাই, মুসলিম বিজেতাগণ সম্পূর্ণভাবে ভারতের জনগণের সঙ্গে একাঙ্গ হইয়া মিশিয়া গিয়াছেন। মুসলিম প্রভুত্বের যুগে যেসব জাতি উপজাতি, বংশ প্রভৃতির নাম আমরা শুনিতে পাই, তাহাদের কথা মানুষের মন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। এদেশের বহু লোক ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া মুসলিম সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন এবং এইভাবে মুসলমানগণের আরবি ও ইরানীয় রূপ ও সংস্কৃতিকেই প্রভাবিত করিয়াছেন। বিদেশের মুসলমানগণ এদেশের ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন, এদেশে বিবাহ করিয়াছেন, এদেশের জনগণের সহিত জীবন সংগ্রাম করিয়াছেন। একই প্রকার জীবিকার পথ গ্রহণ করিয়াছেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে ভারতের একটা সমজাতীয় ভাব গড়িয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আর তাঁহাদের পুরাতন ভূমিতে ফিরিয়া যান নাই।

ভারতের মুসলমানগণ যে সমাজ-ব্যবস্থা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা হইতে বেশি পৃথক নহে। ভারতের বাহিরের মুসলমানের সহিত তুলনা করিলেই এই পার্থক্যটা ধরা পড়িবে। সাম্য ইসলামের একটি প্রধান আদর্শ। এই 'সাম্যবোধ' ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। এখানে রীতিমত উচ্চবংশ ও নিম্নবংশের মধ্যে বেশ একটা সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই যে উচ্চবংশ ও নিম্নবংশের পার্থক্য তাহা অর্থনৈতিক ও বৃত্তিগত নহে। বংশ পরম্পরাগতভাবে অভিজাত শ্রেণি মুসলমান সমাজে সৃষ্ট হইয়াছে। মধ্যযুগে ধর্মান্তর আরম্ভ হইয়াছিল প্রবলভাবে। উচ্চবংশ আজ মুসলমান সমাজে একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এইরূপ হইবার প্রধান কারণ মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু প্রভাবের অনুপ্রবেশ। প্রত্যেক সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড ও প্রথার মধ্যে নারীসমাজ একটা বিশিষ্টস্থান অধিকার করে। আরব ইরানের মুসলিম নারীদের মধ্যে প্রচলিত বহু প্রথা ভারতের মুসলিম নারীসমাজের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। আবার ভারতের মুসলিম নারীসমাজের বহু প্রথা আরব, ইরানে অজ্ঞাত। এখানকার মুসলিম নারী সাধারণত ভারতীয় নারীদের প্রথাই গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ শাড়ি অলঙ্কার, সিন্দুর ব্যবহার, সামাজিক মেলামেশার ধরন এইসবই হিন্দুদের অনুরূপ। এখনও বহু অঞ্চলের সধবা নারী কপালে সিন্দুরের ফোঁটা দেয়। আর বিধবা হইলে সাদা শাড়ি পরিধান করে। নিকট প্রাচ্যের মুসলিম নারীদের প্রথা এরূপ নহে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যাপারেও ভারতের মুসলিম নারী এদেশের হিন্দুদের মতোই চলিয়া থাকে। তবে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যেমন হিন্দুদের মতো মুসলিম সধবা নারীরা শাঁখা ব্যবহার করে না। মুসলিম বিধবাগণ হিন্দু বিধবাদের মতো খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে না। মুসলিম বিবাহের বহু বহিরানুষ্ঠান হিন্দুদেরই অনুরূপ। গায়ে হলুদ, তেল মাখা, মাথায় তেল দেওয়া, বিবাহ বাসরের নিয়মপদ্ধতি, বরপণ প্রথা এইসব ব্যাপারে মুসলিম প্রথা হিন্দু প্রথার উপর ভিত্তি করিয়াই যেন রচিত। সামান্য একটু এদিক ওদিক হইতে পারে—কিন্তু মূলত অধিকাংশ প্রথাই এদেশের অনুকরণে গৃহীত হইয়াছে, বিবাহের নীতিগত পার্থক্য

অবশ্য অক্ষুণ্ণ আছে। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে বিবাহ একটা Sacrament বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। মুসলিম বিবাহ হইতেছে একটা চুক্তি বিশেষ। কিন্তু ভারতের মুসলিম বিবাহের এই ধারণারও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছে। বিবাহটা অনেকটা Sacrament-এর মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহে অশ্রদ্ধা, মেয়েদের স্বামীনির্ভরতা এই সব বিষয়ে এদেশের মুসলমানগণ ভারতীয় প্রথাই গ্রহণ করিয়াছে। মোটের উপর হিন্দু মুসলমানের বিবাহ-প্রথা অনেকটা একই প্রকার।

আপাত দৃষ্টিতে ইসলাম ধর্ম ও হিন্দুধর্ম স্বতন্ত্র আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রাক্-ইসলামিক যুগে আরবদের মধ্যে যে পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল, ভারতের হিন্দুদের পৌত্তলিকতা সে প্রকার নহে। প্রাচীন বেদ উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র একেশ্বরবাদের আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে। ইসলামের একেশ্বরবাদ হইতে উপনিষদের একেশ্বরবাদ পৃথক নহে। বোধহয় সেইজন্যই মুসলিমগণ হিন্দুধর্মের মূলনীতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আর সেইজন্য সমাজের উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে সহজেই হিন্দু প্রভাব প্রবেশ করিতে দিয়াছিল। কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠান প্রায় একইরূপ। মহরমের সময় এমন কতকগুলি প্রথা ও ক্রিয়াকাণ্ড হইয়া থাকে যাহা আরবেব কোথাও প্রচলিত নাই। এগুলি ভারতবর্ষেই বিকশিত হইয়াছে। শবেবরাতের সহিত শিবরাত্রির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। নবান্ন উৎসব হিন্দু মুসলমান সকলেই পালন করিয়া থাকে। মহরমের মাতমে যেমন বহু হিন্দু যোগদান করেন, সেইরূপ হোলি উৎসবে মুসলমানকেও রঙ খেলিতে দেখা যায়। মৃত্যুর পরের অনুষ্ঠানে মূল বিষয়ে পাথর্ক্য আছে। হিন্দুরা শব দাহ করে, আর মুসলমানরা সমাধিস্থ করে। কিন্তু তবুও লক্ষ করিলে দেখা যাইবে যে মৃত্যুর পরে যেসব অনুষ্ঠানাদি হয়, তাহা যেন কতকটা একইরূপ। মৃতের আত্মার সদ্গতির জন্য উভয় সম্প্রদায় প্রায় একইরূপ অনুষ্ঠান পালন করে। মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট দিনে দরিদ্র-ভোজন, মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, বা তাহার আত্মার মুক্তির জন্য বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় সমাবেশে শাস্ত্রপাঠ এইসব অনুষ্ঠানে বিশেষ পার্থক্য নাই। গৃহে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে অনেক ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায় প্রায় একইরূপ অনুষ্ঠান পালন করে। সন্তানের নামকরণ উৎসব, ক্ষীর খাওয়ানো বা অন্নপ্রাশন, সন্তানের মস্তক মুণ্ডন এইসবও প্রায় একইরূপ।

পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি লক্ষ করিলেও দেখা যাইবে যে, সেখানেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কেমন একটা সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। প্রদেশে প্রদেশে পোশাক-পরিচ্ছদের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে স্বতন্ত্র পোশাক খুব কম ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাংলাদেশের সাধারণ পোশাক হইতেছে ধুতি। আর পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ পোশাক পাজামা। বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু-মুসলমান সেই প্রদেশে প্রচলিত পোশাকই ব্যবহার করে। পোশাক দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই কে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত। বাংলার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খায় না বলিয়া সাধারণত বাংলার হিন্দু-মুসলমান কেহই টুপি ব্যবহার করে না। আর পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে টুপি ব্যবহার করে। ভারতের মুসলমানগণ কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই আরব ও ইরানের পোশাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া এদেশের পোশাকই গ্রহণ করিয়াছে। আরবি পাগড়ি, আমামা, জুব্বা, রিদা আর বড়ো একটা চলে না। মধ্য এশিয়ার মোঘল পোশাকও অচল হইয়া গিয়াছে। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতেই পোশাকের পরিবর্তন লক্ষ করিয়া ঐতিহাসিক মসুদি বলিয়াছেন ঃ

"The mode of life of both the Hindus and the Moslems was so similar that it was difficult to distinguish one from the other."

ইহার বহুদিন পরে একজন ফরাসি পর্যটক বলেন যে, "দাক্ষিণাত্যে যেসব মুসলমান উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহারা অবিকল হিন্দু প্রথায় পোশাক পরিত।" মুসলিম বাদশাহ ও নওয়াবগণ দেওয়ালি, শিবরাত্রি, হোলি প্রভৃতি উৎসব পালন করিতেন। আর অনেকেই সেই সময় এদেশীয় পোশাক পরিধান করিতে লজ্জিত হইতেন না। আজিও দিল্লির বহু উচ্চ বংশের মুসলমান আড়ম্বরের সহিত বসন্ত উৎসব পালন করিয়া থাকেন। সেই সময় তাঁহাদের পরিধানে থাকে বাসন্তী রঙের বস্ত্র। দিল্লির ফুলের মেলা 'নওরোজ' প্রভৃতি উৎসব ইতিহাস বিখ্যাত। ইহা হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ উৎসবে পরিণত হইয়াছিল। বাহাদুর শাহের সময় পর্যন্ত এই সব উৎসব আড়ম্বরের সহিত প্রতিপালিত হইত।

ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। একই ভাষা যখন সকল সম্প্রদায়ের ভাব প্রকাশের বাহন হয়, তখন আরও নানাপ্রকার বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই ভাষাবিভেদের মধ্যেও ঐক্য ও মিত্রতা স্থাপনে সহায়তা করে। ভারতের মুসলমানগণ আরবি ও ফারসি ভাষা এদেশে চালাইতে পারেন নাই। তাঁহারা এদেশের ভাষাকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্বে উর্দু ও হিন্দি ভাষা লইয়া বহু বিতর্ক হইয়াছে, অনেকের বিশ্বাস উর্দু মুসলমানের ভাষা আর হিন্দি হিন্দুদের ভাষা। কিন্তু এ ধারণা ভুল। উর্দু ও হিন্দি উভয় ভাষাই দেশের মাটিতেই জন্মিয়াছে—এদেশের ভাষা। প্রথম যুগের মুসলিম শাসকগণ তুর্কি ভাষায় কথা বলিতেন আর শাসনকার্য চলিত ফারসি ভাষার সাহায্যে। আজ তুর্কি অথবা ফারসির কোনোটাই সচল নহে। শাসকগণ এদেশের প্রচলিত ভাষার মধ্যে ফারসি ও আরবি শব্দ যোগ করিয়া তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার ফলে ভাষাটা আরও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। উর্দু ভারতের বাহিরে কোথাও চলে না। উর্দুর উৎস হইতেছে সংস্কৃত ও হিন্দি। ইহার বাক্যগঠন ও ব্যাকরণ-প্রণালী হিন্দিরই অনুরূপ। সাধারণত দিল্লি অঞ্চলে উর্দু ভাষা প্রচলিত ছিল। যখন প্রথমযুগে মুসলিমগণ দিল্লিতে বসবাস আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা এই ভাষাকেই গ্রহণ করেন। ইহাই কালক্রমে তাহাদের কথ্যভাষা হইয়া পড়িল। ইহার অনেক পরে কথ্যভাষা লিখিত ভাষাতে পরিণত হইল। বর্তমানে উর্দু ভাষাতে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার শব্দ আছে। ইহার মধ্যে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার শব্দ হিন্দিভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। বাকি তেরো হাজার শব্দের জন্য আরবি ফারসি ও তুর্কিভাষা দাবি করিতে পারে। তাই দেখা যায় যে, বহুযুগ ধরিয়া বহু হিন্দু-মুসলমান স্বচ্ছন্দভাবে উর্দুভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া করিয়া আসিয়াছে।

আবার একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, হিন্দি ভাষাও কেবল হিন্দুর নহে। বহু অঞ্চলের মুসলমান স্বচ্ছন্দে হিন্দি ভাষাকে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছে। শুধু হিন্দি নহে—এদেশের আরও অনেক প্রাদেশিক ভাষা মুসলমানের মাতৃভাষায় পরিণত হইয়াছে। আসামি, ওড়িয়া ভাষা, পাঞ্জাবি ভাষা, গুজরাটি ভাষা, বাংলা ভাষা—তামিল ও তেলেগু [তেলুগু] ভাষাও সেই সেই অঞ্চলের মুসলমানগণ গ্রহণ করিয়াছে এবং সাধ্যমত সেগুলির পৃষ্ঠপোষকতাও করিয়াছে। মনীষী অলবেরুনি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগের সৈয়দ আলি বেলগ্রামি পর্যন্ত এই দীর্ঘযুগে বহু মুসলিম সুধী সংস্কৃত ভাষার প্রতি যথার্থ আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। কবি আমির খুসরু, মালিক মহম্মদ জয়সি, খান খানান, কুতুবান, মোল্লাদাউদ, রাইসখান, মহম্মদ ইয়াকুব, ইনশাল্লাহ খান, নাজির আহমদ এইসব কবি ও সাহিত্যিক হিন্দি ভাষার সেবা ও চর্চা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের লিখিত কাজের নিদর্শন

এখনও বিদ্যমান আছে। আরব ও পারস্যের মুসলিম লেখকগণের লিখিবার বিষয়বস্তু ও ভঙ্গিমার প্রতি লক্ষ করিলে দেখা যাইবে যে, এ দেশের মুসলিম লেখকগণের লিখিবার বিষয়বস্তু ও ধরন অনেকটা পৃথক। মুসলিম লেখকগণের হিন্দি, গুজরাটি, বাংলা রচনা এ দেশের হিন্দু লেখকগণের অনুরূপ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া আরব পারস্যের কোনো লেখক কবিতা লেখেন নাই। অথচ এ দেশের মুসলিম লেখকগণ এ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি কবিতা লিখিয়াছেন।

ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা Common Culture সৃষ্টি করিবার প্রয়াস বরাবরই হইয়া আসিয়াছে। প্রথমে ভাষার মাধ্যমে এই চেষ্টা হইয়াছিল। আজ যেমন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন, মধ্যযুগেও সেইরূপ হিন্দু-মুসলমান লেখক ও কবিগণ সর্বত্র সমানভাবে আদৃত ও সম্মানিত হইতেন। এই সাধারণ সংস্কৃতি সৃষ্টি করিবার প্রয়াস কেবল ভাষার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প স্থাপত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়াছিল। গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, চিকিৎসা, দর্শন, নীতিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একটা Common Culture গড়িয়া উঠিয়াছিল। মধ্যযুগের স্থাপত্যের যেসব নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা সমন্বয়ের কথাই প্রমাণ করে। ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্বে মুসলিম শিল্পীগণ একটা বিশেষ ধরনের আর্ট আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারতের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের সেই আর্টের ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। এ দেশের আর্টকে বিসর্জন দিতে পারেন নাই, অথবা অপরিবর্তিত অবস্থায় আরব ইরানের আর্টকেও চালাইয়া দিতে পারেন নাই। দুই দেশীয় আর্টের মধ্যে একটা সুন্দর সমন্বয় হইয়াছিল। দামেস্ক, জেরুজালেম, কার্ডোভা (স্পেন) প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিম স্থাপত্যের যে সব নিদর্শন আছে ভারতের মুসলিম স্থাপত্য তাহা হইতে পৃথক। ভারতের মুসলিম স্থাপত্যের মধ্যে আছে হিন্দু ও মুসলিম আদর্শের মধ্যে একটা সমন্বয়ের নিদর্শন।

চিত্রাঙ্কণ ও সংগীতচর্চার মধ্যেও সমন্বয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন চিত্রকেই মোগল শিল্পীগণ আদর্শরূপে গ্রহণ করেন এবং তাহার উন্নতিসাধন করেন। মধ্য এশিয়া ও পারস্য হইতে বহু শিল্পী ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এদেশের উন্নত ধরনের শিল্পকার্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। সুতরাং অনায়াসে এ দেশের শিল্পের মডেল গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এবং হিন্দু শিল্পীদের সহযোগিতায় নূতন পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করিলেন। হিন্দু শিল্পীগণও নবাগত শিল্পীকে অগ্রাহ্য করিলেন না। একটা বিশেষ চিত্রের প্রতি লক্ষ করিলে ইহার শিল্পী হিন্দু না মুসলমান তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। সংগীত চর্চার মধ্যেও সহজে সমন্বয় হইয়াছে। মুসলিম সংগীতজ্ঞগণ এদেশের নিকট নূতন জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। আবার তাঁহারাও নূতন নূতন সংগীতযন্ত্র ও নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া এদেশের সংগীতের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজ হিন্দুসংগীতে ও মুসলিম সংগীত বলিয়া সংগীত-ক্ষেত্রে কোনও রূপ সাম্প্রদায়িকতা নাই। সংগীতে পূর্ণ সমন্বয় হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, কাব্য সাহিত্য শিল্পস্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ে সমন্বয় হইতে পারে, কিন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে কি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনো সমন্বয় হইয়াছিল? ভারতের সাত শত বৎসরের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এরূপ সমন্বয়ও কিছু কিছু হইয়াছিল। একথা সত্য যে একদল উলেমা বরাবরই প্রচার করিয়া

আসিতেছিলেন যে, ইসলাম ও হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলাম একেবারে পূর্ণধর্ম—অপর ধর্মের নিকট মুসলমানের শিখিবার কিছুই নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অলবেরুনির আদর্শ অনুসারে বহু মুসলমান পণ্ডিত হিন্দু ধর্মকে সঠিকভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, এই প্রাচীন ধর্মের মধ্যে সারবস্তু আছে, তখন তাঁহারা হিন্দুধর্মের আদর্শ প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মনীষী অলবেরুনির কথা অনেকেই জানেন। তাঁহার পরেও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বহু পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। মধ্যযুগে মুসলিম সুধীগণ হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় বহু মূল্যবান পুস্তক ফারসি ও আরবিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের অনুবাদ হইতে বাগদাদের পণ্ডিতগণ নানাভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন। দর্শনের দিক দিয়া আরবগণের প্রধান 'অথরিটি' ছিল গ্রিকদর্শন। কিন্তু চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদের প্রধান অথরিটি ছিল ভারতবর্ষ।

ইসলামে প্রতিমা-পূজা নাই। আর হিন্দু সমাজে প্রতিমা-পূজা প্রচলিত। প্রথম প্রথম মুসলিম সুধীগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নাই। কিন্তু পরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, হিন্দুদের প্রতিমা-পূজা প্রাক্-ইসলামিক যুগের আরবদের প্রতিমা-পূজা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, তখন তাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কয়েকজন মুসলিম পণ্ডিত হিন্দু সমাজের প্রচলিত প্রতিমা ব্যবহারের যে মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। মির্জা মাজহার জান জানান বলেন যে, "প্রতিমা পূজা সুফিদের জিকির পদ্ধতির অনুরূপ। আরবের পৌত্তলিকগণ যে প্রতিমা পূজা করিত, ইহা তাহা নহে। আরবগণ বিশ্বাস করিত যে, প্রতিমা নিজেই ঈশ্বর এবং তাহার অনন্ত শক্তি আছে। সুতরাং প্রতিমাই তাহাদের প্রভু। কিন্তু হিন্দুদের প্রতিমা তাহা নহে। তাহারা প্রতিমাকে ঐশ্বরিক শক্তির যন্ত্র বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রতিমাকেই-ঈশ্বর বলে না।" মির্জা মাজহার এ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করেন এবং এই কথাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, হিন্দুদের পন্থায় আছে ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়। তাঁহার মতে সুফি মতবাদেও এই তিনের সমন্বয় সাধিত হয়।

ভারতবর্ষে বহুদিন বাস করার ফলে হিন্দুদের পূজা-পদ্ধতির বহু অনুষ্ঠান বেমালুম সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। জপমালা (তসবি), বিশেষ ধরনের সাধনার জন্য নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ, নানাপ্রকার যৌগিক ক্রিয়া, যোগীর মত ধ্যানাসন, মাছ মাংসে অশ্রদ্ধা এইসব আচার ও প্রক্রিয়া বহু মুসলিম পির মুর্শেদ ও সাধক অনুমোদন করিয়াছেন। ইঁহাদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, বেদান্তের বহু বিশ্বাস ও আচার পদ্ধতিকে তাঁহারা ইসলাম জ্ঞানেই অবলম্বন করিয়াছেন। মূল ইসলামের মধ্যে এইসব বস্তুর কোনো প্রমাণ নাই। বস্তুত ভারতের সমস্ত সুফি মতবাদটাই বেদান্ত দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। এই ধরনের সমন্বয় অজ্ঞাতসারে হয় নাই। দেশ ও কালের অনুরূপ করিবার জন্য জ্ঞাতসারেই বেদান্ত দর্শনের বহু আদর্শ মুসলিম সমাজের মধ্যে সুফিগণ প্রবর্তন করিয়াছেন। সম্রাট আকবরের "দীনে এলাহি" এইরূপ একটা সজ্ঞান প্রচেষ্টা। রাজকুমার দারা শিকোহ হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সর্বসাধারণ লোকের সহজ পন্থায় ধর্মকে ঐক্য ও প্রেমের ভিত্তিতে গড়িবার চেষ্টা নানা সাধকের দ্বারা হইয়াছিল। তাঁহারা আচার অনুষ্ঠান অপেক্ষা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন।

কবির, নানক, দাদু, শ্রীচৈতন্য ও তুকারাম প্রভৃতি সাধকগণ যে নূতন ধর্মবোধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আচার অনুষ্ঠানের গণ্ডি ভেদ করিয়া সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। মহাত্মা দাদু সর্বজনীন ধর্মের বাণীই প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি উক্তি হইতে বুঝা যাইবে, তিনি ধর্ম বিষয়ে কীরূপ উদারনীতি প্রচার করিতেন—

পাখা পাখী সংসার সব
নির্পখ বিরলা কোই
সেই নির্পখ হোয়েগা জোকৈ
নাও নিরঞ্জন হোই।

অর্থাৎ জগৎ জুড়িয়া দলাদলি চলিতেছে। এমন লোক অল্পই আছেন যিনি দলাদলির ঊর্ধ্বে। যিনি জীবনে নিরঞ্জন লাভ করিয়াছেন তিনি দলাদলি মুক্ত হইতে পারেন।

দাদুর আর একটি উক্তি লক্ষণীয় :—

যহু সব খেল খালিক হরি
তেরা তৈ হি এক করলিলা
দাদু জপতি জানি কর ঐসী তব
যহু প্রাণ পঁতীলা।

অর্থাৎ হে খালিক ও হরি, এসবই তোমার খেলা, তুমিই নিজেকে সর্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সকলকে ঐক্যবন্ধনে যুক্ত করিয়া লইয়াছ। দাদু বলেন যে, জগতে তোমার এই লীলা উপলব্ধি করিয়া প্রাণে বিশ্বাস লাভ হইয়াছে।

কবিরের উক্তি অনেকটা এইরূপ :—

এক সমানা সকল মে
সকল সমানা তাহি
কবির সমানা বুঝি মে
জাঁহা দোসরা নাহি

অর্থাৎ—সেই এক সমানভাবে বহুরূপে প্রকট হইয়াছেন। আবার সকল সত্তা তাঁহাতে লয় পাইয়া সমান হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় নাই বলিয়া কবিরের কাছে এখন সবাই সমান।

খ্রিস্টীয় চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বরাবর ভারতে হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বাংলাদেশে এই সমন্বয়-প্রচেষ্টা কীরূপভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহার একটি উদাহরণ দিব। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলিম লেখক সৈয়দ আকবর "জেবলমূলক শামারবখ" কাব্যে লিখিয়াছেন :—

"বিন এ করিআ বন্দি ফিরিস্তার পদ
ছুন্নিকুলে ফিরিস্তা যে হিন্দুকুলে নারদ।
তক্ত সিংহাসন বন্দি আল্লার দরবার
হিন্দুকুলে ঈশ্বর হেন জগতে প্রচার।
পএগম্বর সকলে বন্দি করিআ ভকতি

হিন্দুকুলে দেবতা হেন হইলা প্রকৃতি।
হজরত আদম বন্দি জগতের বাপ
হিন্দুকুলে অনাদি নর প্রচার প্রতাপ।
মা হাওবা জগত বন্দম জগত জননী
হিন্দুকুলে কালী নাম প্রচার মোহিনী।
হজরত রসুলে বন্দি প্রভু নিজ সখা
হিন্দুকুলে অবতারি চৈতন্যরূপে দেখা।
খোআজ খিজির বন্দম জলেতে বসতি
হিন্দুকুলে বাসুদেব শূন্যে যে প্রকৃতি।
আছাব্বা সকলে বন্দি নবীর সভাএ
হিন্দুকুলে দোওয়াদশ গোপালে ধেয়াএ।
আউলিয়া আম্বিয়া বন্দি রব্বানি কোরান
হিন্দুকুলে মুনিভাব আজ এ পুরান।
পির মুর্শিদ বন্দম ওস্তাদ চরণ
হিন্দুকুলে গুরু যেন কর এ পূজন।

একদিকে সাধক ও সুফি শ্রেণির মহান ব্যক্তিগণ, আর অপরদিকে কবি শিল্পীগণ সকলেই বিভিন্ন দিক দিয়া ধর্মকে উদার দৃষ্টিতে দেখিবার ও দেখাইবার এবং বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধর্মকে কেবল বহিরাচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখিতে শিখিলে ধর্ম সম্বন্ধে উদার ভাব জাগিতে পারে না। যে আদর্শ সে যুগের সাধক ও কবিদের প্রাণকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা হইতেছে ভক্তির আদর্শ। তাঁহারা ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধনের কথা ভাবিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য দেখা যায় যে, হিন্দু সাধকের নিকট মুসলমান দীক্ষা লইয়াছে। আবার অনেক হিন্দু মুসলমান সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা যখন নিজ নিজ সমাজের সহিত মেলামেশা করিয়াছে, তখন নিজেদের ধর্মবোধ দ্বারা সমাজকে অনেকটা প্রভাবিত করিয়াছে। ইহা সর্বজনবিদিত কথা যে, শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট কয়েকজন মুসলমান দীক্ষা লইয়াছিলেন। আবার কবিরের শিষ্যের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা কম ছিল না। আজমিরের হোসেনি পণ্ডিতগণের অস্তিত্ব আজিও বিদ্যমান আছে। লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের কতকগুলি নীতির সহিত ইসলামের সাদৃশ্য আছে। রামানন্দ, দাদু, নানক, তুকারাম ইঁহারা হিন্দু-মুসলমানের আ্যধ্যাত্মিক গুরুর মর্যাদা পাইয়াছিলেন। এইসব সাধক একটা কথা দ্বিধাহীনভাবে প্রচার করিতেন যে, আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের বড়ো কথা নহে। তাঁহারা ন্যায়, সততা, ভক্তি, সাম্য ও সৎজীবনের উপর গুরুত্ব প্রদান করিতেন। মনের সৌন্দর্য সাধন ছিল তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। ধর্ম সম্বন্ধে এই উদার মতবাদের কারণেই উভয় সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরিয়া পাশাপাশি শান্তির সহিত বসবাস করিতে পারিয়াছেন। অতীতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোথাও কোনো রূপ ঝগড়া বিবাদ হয় নাই, একথা বলি না। কিন্তু সে যুগে ব্রিটিশ যুগের মত জঘন্য ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি জাগ্রত হয় নাই অথবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হয় নাই।

মধ্যযুগের মুসলমানদের আদি বাসভূমি যেখানেই থাকুক না কেন, তাঁহারা ভারতবর্ষকেই নিজেদের মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভারতের জীবন-ধারার সঙেগ মিশিয়া গিয়াছিলেন। ভারতের সুখ-দুঃখের সহিত নিজেদের জীবনকে জড়িত করিয়াছিলেন। ভারতের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ভাস্কর্য সবই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমনকী ধর্মের মধ্যে যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই। ফলে সমস্ত জীবন-দর্শনের মধ্যে একটা সাধারণ দৃষ্টিভঙিগ গড়িয়া উঠিয়াছে। জীবনযাত্রার পদ্ধতিও অনেকটা একই রূপ হইয়াছে। বিগত কয়েক শতাব্দীর সংযোগ, সহযোগিতা ও মিলনের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাহিরের আকারগত চালচলনগত সমন্বয় সাধন হইয়াছে। দুই-চারটি পারিবারিক শব্দ ব্যতীত কথ্যভাষার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে। দুইজনের পরস্পরের কথাবার্তার মধ্যে ধর্মের পার্থক্য কেহ সহজে ধরিতে পারিবে না যাহাকে আমরা বলি কুসংস্কার (superstition) তাহা সাধারণত আদিম সংস্কারের ক্রমবিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত বহু কুসংস্কার একই রূপ। এইসব কুসংস্কার হইতে বুঝা যাইবে যে কত গভীরভাবে সমন্বয়ের কাজ সফলতা অর্জন করিয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "দিবে আর নিবে,....যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে" ইহাই হইতেছে ভারতের শাশ্বত নীতি। বহুর মধ্যে একের বিকাশ, আবার একের মধ্যে বহুর প্রকাশ, এই নীতি কেবল ভারতবর্ষে সম্ভব হইয়াছে। ভারতের হিন্দু নবাগত মুসলমানকে ফিরাইয়া দেয় নাই। তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। সেজন্য হিন্দুকে বহু জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে। তবুও সে ভারতের শাশ্বত নীতি বিসর্জন দেয় নাই। আবার মুসলমান যখন এদেশে আসিয়াছে, তখন সেও তাহার বহুকিছু খাইবার গিরিপথের অপর পার্শ্বে রাখিয়া দিয়া ভারতের বহুকিছুকে বেমালুম গ্রহণ করিয়াছে। আজ যদি সে বলে, তাহারা স্বতন্ত্র জাতি, তবে সাতশত বৎসরের সমগ্র ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হইবে। ভারতবর্ষ মুসলমানকে অঙগীভূত করিয়াছে আর মুসলমানও ভারতকে তাহার সর্বস্ব দান করিয়াছে। এই নেওয়া দেওয়ার মধ্যে ইতিহাসের জয়যাত্রা অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। ভবিষ্যতেও চলিতে থাকিবে। রাজনৈতিক কারণে ভারত বিভক্ত হইলেও এ সমন্বয়ের ধারা কোথাও থামিবে না।

উৎস : সংস্কৃতি সমন্বয় : কিছু ভাবনা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩

# তুহ্ ফত্-উল্-মুওয়াহিদ্দিন্

## রামমোহন রায়

### ভূমিকা

**বিশ্বজনীন ও সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস**

আমি পৃথিবীর বহু দূর দেশে গিয়েছি। কখনো সমতলভূমিতে, কখনো বা পার্বত্য প্রদেশের নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি। সর্বত্রই দেখেছি যে সে সকল দেশের লোকেরা একটি বিষয়ে একমত যে এই জগতে সব কিছুরই আদি কারণ ও তার বিধাতারূপে (governor) এক পরম সত্তা বিদ্যমান আছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে (personality) সাধারণভাবে সকলেই বিশ্বাস করে। কিন্তু সেই সত্তার বিশেষ বিশেষ স্বরূপ লক্ষণ এবং ধর্মের বিভিন্ন মত ও বিধি (halal) নিষেধের (haram) বিচিত্র ব্যবস্থা সম্বন্ধে একমত নন। এই ব্যাপ্তি-নির্ণয় (Induction) থেকেই আমি জানতে পেরেছি যে সাধারণভাবে মানুষের পক্ষে এক অনন্ত সত্তার দিকে তাকানো অত্যন্ত স্বাভাবিক, এবং সর্বমানবের যেন এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য। পরন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কোনো বিশেষ গুণবিশিষ্ট এক বা বহু দেবতার দিকে আকর্ষণ, এবং কোনো বিশেষ উপাসনা বা পূজা প্রণালির বশবর্তী হওয়া,—এ সমস্তই বাহ্য লক্ষণ, যেগুলি অভ্যাস ও দলগত শিক্ষা থেকেই উদ্ভূত। এ সকলই বাহিরের জিনিষ—অবান্তর গুণ মাত্র। স্বভাব ও অভ্যাসের মধ্যে কত আকাশ-পাতাল প্রভেদ!

কোনো কোনো সম্প্রদায়ের লোককে দেখতে পাই যে তারা অন্যের ধর্ম্মমতের সঙ্গে নিজের মতের মিল নেই বলে অন্যের মতকে এই বলে অগ্রাহ্য করতে চান যে তাদের সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষেরা যা বলে গেছেন, তা নির্ভুল। কিন্তু তাদের ওই পূর্বপুরুষেরাও তো অন্যান্য মানুষের মতোই অন্যায় বা ভুল করতে পারেন। সুতরাং যদি বলা হয় যে এরূপ মতাবলম্বীরা সকলেই হয় অভ্রান্ত, অথবা ভ্রান্ত, তাহলে সেটা খুব অসঙ্গত হয় না। এখানে প্রথম ক্ষেত্রে,—অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সকলেই অভ্রান্ত ধরলে—দুটি পরস্পর বিরোধী মত স্বীকার করতে হয়, যা তর্কশাস্ত্রানুমোদিত হতে পারে না (Principle of non contradiction) দ্বিতীয় ক্ষেত্রে—অর্থাৎ সকলেই ভ্রান্ত ধরলে, কোনো বিশেষ বিশেষ

ধর্মে ভ্রান্তি রয়েছে বলা যেতে পারে, কিংবা সকল ধর্মেই সাধারণভাবে ভ্রান্তি রয়েছে বলা চলে। বিশেষ বিশেষ ধর্মের উপর ভ্রান্তি আরোপ করলে, অকারণেই একটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, এবং তাও ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত (principle of sufficient reason) নয়। সুতরাং কোনো বিশেষ পার্থক্য না করে বলা যায় যে সকল ধর্মেই সাধারণভাবে কিছু কিছু ভ্রান্তি রয়েছে। আমার এই মত, এবার আমি পারসি* ভাষায় ব্যাখ্যা করলাম, কারণ আজমবাসীদের (অনারবীয়দের) কাছে এই ভাষাই অধিকতর বোধগম্য হবে।

*এর আগে রামমোহন আরবি ভাষায় তাঁর অধুনালুপ্ত "মনজারাৎ-উল-আদীয়ান" বা "বিচিত্র ধর্মের আলোচনা" গ্রন্থটি লিখেছিলেন সে কথা "তুফাৎ" পুস্তিকার শেষে তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—"রাজা রামমোহন রায়" পৃঃ ৫৫২—৫৯৩, পঞ্চম সংস্করণ (১৯২৮) দ্রষ্টব্য। জ. ন. দ.।

# একেশ্বর-বিশ্বাসীদিগকে উপহার

(মূল পারসি ভাষায়)

## সত্য নির্ণয়ের আনন্দ

মানুষের অভ্যাস ও পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার ফলে যে সকল অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা যাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেন, আবার সমগ্রভাবে প্রাণীজগতের বিশেষ বিশেষ জাতির (species), কিংবা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির খেয়াল, স্বভাব বা প্রকৃতির ফলস্বরূপ যে সকল দোষ ও গুণের উদ্ভব হয়, তা যাঁরা পৃথক করে দেখান, এবং যাঁরা নানাধর্মের বিভিন্ন নীতির (principles) বা তত্ত্বের কোনো একটাকে বেশি মূল্য না দিয়ে তার সত্যাসত্যের পরীক্ষা করেন,—শুধু তাই নয়, যাঁরা সাধারণের প্রচারিত মতের প্রতি কোনোও পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে, তাঁদের সাধ্যমত, সেই প্রায়-স্বতঃসিদ্ধ মতগুলি বিচার করে দেখেন, তাঁদের সময় কী আনন্দেই কাটে! কারণ, যেমন নানা প্রয়োজনীয় বস্তুর নানা সার্থকতা (utility) ও তথ্য নিরূপণ করা আদর্শ মানুষের (perfect man) সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ, তেমনি বিভিন্ন কাজের মাত্রার অনুপাত এবং তার বিচিত্র নিগূঢ় ফলের যথার্থ পরিমাণ নির্ণয় করাও তাঁদের শ্রেষ্ঠ কাজ।

## অলৌকিকতার (miracles) আড়ালে অসত্য ও অন্যায়

কিন্তু সেটি বহুলাংশে অজ্ঞানতার আবরণে ঢাকা থাকে বলে সহজে বোধগম্য হয় না। তাই দেখি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী নেতারা তাদের নাম সহজে অক্ষয় করবার জন্য এবং নিজের নিজের যশ বাড়াবার জন্য, বিশুদ্ধ সত্য (pure truth)-গুলিকে নিজেদের বিশেষ বিশেষ মতের আবরণে ঢেকে রাখেন। সেগুলিকে কোথাও বা অলৌকিকতার (miracles) উপর দাঁড় করিয়ে দেন, কিংবা মণ্ডলীর অবস্থার উপযোগী মনভোলানো ভাষায়, অথবা নানা ফন্দির ভিতর দিয়ে সত্যের আকারে প্রচার করেন।

## ধর্মের নামে নির্যাতন ও নরহত্যা

অধিকাংশ লোককেই এই সব নেতারা তাঁদের দিকে এমনভাবে আকর্ষণ করেছেন যে, ওই অসহায় মানুষগুলি বাধ্যতা ও দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, এবং তাদের দেখবার চোখ ও বুঝবার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে। তাই নেতাদের হুকুম তামিল করবার সময় তারা সত্যিকার মঙ্গল ও সুস্পষ্ট পাপের মধ্যে প্রভেদ করাকেও অপরাধ বলে মনে করে। এবং যদিও মানুষ হিসাবে তারা মূলত একই বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা মাত্র, তবু শুধু তাদের মতবাদের জন্য ও সম্প্রদায়ের খাতিরে অন্যকে বধ করা বা নির্যাতন করা বিশেষ পুণ্য কাজ বলেই মনে করে। মিথ্যাচার, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার প্রভৃতি নিকৃষ্টতম দুষ্কার্য—যা আত্মার পক্ষে পারত্রিক অমঙ্গলজনক এবং মানব সাধারণের পক্ষে ঐহিক অনিষ্টকর—এই প্রকার পাপ হ'তে তারা শুধু তাদের নেতাদের উপর অবিচলিত বিশ্বাস রাখলেই মুক্তি পাবে বলে মনে করে। মানুষ তাদের অমূল্য সময় এমন সব পুরাণ

কাহিনি পাঠ করে কাটায় যেগুলো বিশ্বাস করাও কঠিন। অথচ এতেই প্রাচীন ও নবীন নেতাদের উপর তাদের বিশ্বাস যেন আরও দৃঢ় হয়।

## বিচার বুদ্ধি কি শয়তানের প্ররোচনা?

তবে তাদের মধ্যে যদি একটি চিন্তাশীল ব্যক্তিও হঠাৎ ওই মত ও বিশ্বাসের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করবার একটু আগ্রহ দেখায়, তাহলে সেই ধর্মাবলম্বীরা সাধারণত এরূপ প্রচেষ্টাকে শয়তানের প্ররোচনা বলেই ধরে নেয়। এতে তাঁর সাংসারিক বা ধর্মজীবনের বিনাশ অনিবার্য বলে তারা মনে করে। তাই সে অচিরে সেই সন্ধানের পথ থেকে ফিরে আসে।

## সামাজিক শিক্ষা ও সত্যবোধ

অপরিণত বয়সে যখন মানুষের বৃত্তিগুলি নমনীয় থাকে, সেই সময় নানাভাব তার মনে সহজে ছাপ ফেলতে পারে। তখন যদি সে তার পূর্বপুরুষদের যত আজগুবি ও আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা অনবরত শুনতে থাকে, এবং যে সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষ জন্মে বেড়ে উঠেছে সেই সম্প্রদায়ের মতে বিশ্বাস করলে যে কত সুফল পাওয়া যায়, এ সম্বন্ধে নানা প্রশংসার কথা যখন তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর মুখে সর্বদা শুনতে পায়, তখন সেই সব মতের সত্যতা সম্বন্ধে তার মনে এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায় যে সে তার ওই নবগৃহীত মতে অনেক ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও অন্যমত অপেক্ষা নিজ গোষ্ঠির মতকেই অধিক মূল্য দেয়। এবং দিনে দিনে ওই মতেই নূতন নূতন আসক্তি ও বিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে এরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে কোনো বিশেষ ধর্মমত আঁকড়ে ধরার পর, এবং সেই মতের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোনো অনুসন্ধান না করে নির্বিচারে বহু বৎসর বিশ্বাস করবার পর, সেই সব ধর্মমতের সত্যিকার প্রকৃতি নির্ণয় করতে মানুষ সাবালক হয়েও সক্ষম হয় না।

## সাধারণ মানুষের উপর ধর্মগুরুদের প্রভাব

বরং সেই মানুষ 'মুজ্‌তাহিদ্‌' বা বরণীয় ধর্মগুরু হবার আশায় তার মামুলি ধর্মমতকে আরও জোরালো করে তোলবার জন্য কত সেকেলে ও আধুনিক যুক্তিপূর্ণ তর্কজালের উদ্ভাবন করতে লেগে যায়। আর সেই ধর্মকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে যে সকল 'মুকাল্লিদ্‌' বা সাধারণ লোক,—যারা সব সময়ই "পাগলকে খেপা'তে এক 'হু'ই যথেষ্ট" এই প্রবাদ অনুসারে অন্তরে অন্তরে তাদের ধর্মকে অন্য ধর্মের চাইতে উন্নততর বলে মেনে নেয়, এবং নিজেদের উদ্ভাবিত যত গিল্টিকরা যুক্তিগুলিকেই মতানৈক্যের হেতু করে তোলে—তারা নিজের বিশ্বাসকেই শ্রেষ্ঠ বোধ করে, এবং অন্যের ধর্মের নিন্দা করে। যদি হঠাৎ কখনও কেউ অসাবধানতা বশত মামুলি ধর্মমতের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করে, তাহলে তার সমধর্মাবলম্বীরা শক্তিশালী হলে, সেই অনভিজ্ঞ, আনাড়ি লোকটিকে হয় শূলে চড়ায় অর্থাৎ মেরে ফেলে, কিংবা ততটা সাহস বা সুযোগ না থাকলে বাক্যবাণে জর্জরিত করে। এই সব গুরুদের চেলার উপর এমনই প্রভাব, ও চেলাদের বশ্যতাও এমন বিষম যে কেউ কেউ তাদের গুরুদের কথামতো একটা পাথর কিংবা উদ্ভিদ, কিংবা জন্তু-জানোয়ারকেই

প্রকৃত উপাস্য দেবতা মনে করে। এ সকল উপাস্য বস্তু কেউ নষ্ট করতে চাইলে কিংবা তাদের অপমান করলে, তার বিরুদ্ধে অন্যের রক্তপাত করা, কিংবা নিজের জীবন উৎসর্গ করা, ইহলোকের গৌরব ও পরলোকের মুক্তির উপায় বলে মানুষ মনে করে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'মুজতাহিদ্‌রা' অন্যান্য ধর্মনেতাদের অনুকরণে ন্যায় ও সততাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ ধর্মমতের স্বপক্ষে এমন সব বচন যুক্তির মুখোশ পরিয়ে খাড়া করে, যা স্পষ্টত যুক্তিশূন্য ও অর্থহীন। আর তাই দিয়েই অন্তর্দৃষ্টি বা ভালোমন্দ বিচারশক্তিহীন সাধারণ লোকদের অন্ধ বিশ্বাসকে আরও কঠিন বা দৃঢ় করে তুলতে চেষ্টা করে।

"আমাদের নিকৃষ্টসত্তার এই সব প্রলোভন ও দুষ্কর্মজনিত অপরাধ হতে রক্ষা পাবার জন্য ঈশ্বরের শরণ মাগি।" (কোরান)

## স্বার্থ ও পরার্থ : সমাজ-চেতনা

এ কথা অস্বীকার করা যায় না বটে যে মানুষের সামাজিক (social instinct) প্রবৃত্তি অনুসারে স্ব স্ব শ্রেণির জীব তাদের জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় একত্রে বসবাসের জন্য কতকগুলি স্থায়ী নিয়ম গড়ে তুলবে। কিন্তু সামাজিক আইন নির্ভর করে পরস্পরের মতামত বুঝে চলার উপর। যাতে একের সম্পত্তি অন্যের থেকে পৃথক, এ বোধটা থাকে, এবং একজন অন্যজনের উপর নির্যাতন করলে তা বন্ধ করা যায়, এমন কতকগুলি নিয়মের উপর সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। এইগুলিকে ভিত্তি করেই কী সুদূর দ্বীপবাসী, কী সমুন্নত পর্বতবাসী, সকল দেশের লোকরাই তাঁদের নিজ নিজ উৎকর্ষ ও বুদ্ধি অনুসারে আপন আপন ধর্মের অর্থ ও উৎপত্তি সূচক পদাবলি সৃষ্টি করেছে। এবং তার উপরই বর্তমান জগতের নানা রাষ্ট্র ও শাসন প্রণালি গড়ে উঠেছে।

## আত্মা ও পরকাল

ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি রয়েছে দুইটি সত্যের উপর, (১) আত্মার বর্তমানতার সত্যতার উপর,—যে আত্মা এই দেহ পরিচালনার কারণ, আর (২) পরকালের উপর—যে পরকাল দেহমুক্ত আত্মার ইহলোকের সুকৃতি দুষ্কৃতির দণ্ড পুরস্কারের স্থল। সুতরাং মানুষ ক্ষমার্হ এইজন্য যে, তারা লোকসমাজের হিতের (Welfare of society) জন্য আত্মা ও পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করে ও শিক্ষা দেয় (তাদের প্রকৃত রহস্য যতই গুহ্য থাকুক না কেন)। কারণ মানুষ তো শুধু পরলোকের দণ্ডের ভয়ে, এবং ইহলোকের শাসকদের শাস্তির ভয়েই বে-আইনি অপরাধ থেকে বিরত থাকে।

## নিরর্থক বিধি নিষেধ

কিন্তু এই দুটি অপরিহার্য বিশ্বাসের সঙ্গে যে আবার পানাহার শৌচাশৌচ এবং শুভাশুভ ব্যাপার নিয়ে শতশত কষ্টকর ও নিরর্থক বিধি নিষেধ লেজুড়ের মতো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর এগুলোই সমাজের উন্নতি না করে অনিষ্টের কারণ হয়েছে, এবং সামাজিক উন্নতি না করে সাধারণ লোকেদের উদ্‌ভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করেছে।

হে ঈশ্বর! 'মুজ্‌তাহিদ্‌' বা ধর্মগুরুদের আদেশে অবিচলিত আস্থা থাকা সত্ত্বেও মানুষের প্রকৃতিতে এমন একটা স্বাভাবিক বৃত্তি রয়েছে যে যদি কোনো সুস্থ মনের লোকে একটি বিশেষ ধর্মমত গ্রহণ করবার আগেই হোক কি পরেই হোক্‌, বিভিন্ন জাতির ধর্মমতের উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধান করে, তবে খুবই আশা করা যায় যে অসত্য থেকে সত্যকে, ও ভ্রান্তমত থেকে সত্যমত বেছে নিতে পারবে। সেই সব ধর্মের যে সকল অসার বিধি নিষেধ আছে—যা সময় সময় একের বিরুদ্ধে অন্যের কুসংস্কারের এবং শারীরিক ও মানসিক অশান্তির কারণ হয়, সেগুলি থেকে মুক্ত হয়ে, পরমেশ্বর যে বিশ্বের সকল সুসঙ্গত ব্যবস্থার উৎস, তাঁরই দিকে মানুষ মুখ ফিরাবে, ও সমাজের কল্যাণে মনোনিবেশ করবে।

"যাকে ঈশ্বর সুপথে নিয়ে যান, তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না, যাকে তিনি বিপথে নেন, তার পথপ্রদর্শক আর কেউ নেই।" (কোরান)

## পৃথিবীর মানুষের সাধারণ অধিকার

প্রত্যেক ধর্মই দেখি দাবি করে যে, সৃষ্টিকর্তা বুঝি একমাত্র সেই ধর্মেরই মতগুলি পালন করেই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, এবং যে অন্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের মত মানে না, তারা ভবিষ্যৎ জীবনে শাস্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজেদের কাজের সুফল ও অন্যদলের কাজের কুফল প্রত্যাশা করে মৃত্যুর পর। তাই কেউই ইহলোকে অন্যের শাস্ত্রবাক্য খণ্ডন করতে পারে না। সেইজন্য পবিত্রতা ও সরলতার পরিবর্তে কেবলমাত্র পক্ষপাত ও অপ্রেমের বীজই তাঁদের অন্তরে বপন করে, এবং অন্যেরা পরলোকের কোনো সুবিধাই পাবে না একথা কল্পনা করে। অথচ এটা খুবই স্পষ্ট যে তারা সকলেই, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের অনুবর্তী না হয়েও ইহলোকে যেমন জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আলোক, বসন্তের আনন্দ, বর্ষার বৃষ্টিধারা, শারীরিক স্বাস্থ্য ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, দেহ ও মনের সৌন্দর্য প্রভৃতি এই পৃথিবীতে প্রাপ্য সব স্বর্গীয় আশীর্বাদই সমভাবে সম্ভোগ করছে, তেমনি মানুষ সর্ব-ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে একই রকম অসুবিধা, যন্ত্রণা, অন্ধকার ও শীতের প্রকোপ, মানসিক ব্যাধি, আর্থিক অবস্থার দৈন্য, দেহ ও মনের বিকৃতি ইত্যাদি অবস্থাও সমান ভাবেই সহ্য করে এই পৃথিবীতে বাস করছে।

## প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কার—সৃষ্টি ও স্রষ্টা

প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই অন্য কারও শিক্ষা বা নির্দেশ না নিয়েও প্রকৃতির রহস্য বুঝতে পারা সম্ভব। কেবলমাত্র গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি দ্বারা মানুষ প্রকৃতির নানা রহস্য,—যথা ভিন্ন ভিন্ন জীবের ও উদ্ভিদের জন্য বিভিন্ন জীবনযাত্রা প্রণালি ও বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা, গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধির নিয়ম, প্রতিদানের কোনো প্রত্যাশা না করেও প্রাণীদের স্বাভাবিক সন্তান বাৎসল্য, খনিজ, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের কারণ প্রভৃতি আবিষ্কার করতে পারে। এ সকল বিষয় জানবার যেমন একটা স্বাভাবিক মনোবৃত্তি মানুষের আছে, তেমনি সে অনুমান করে নিতে পারে যে, তার উপর এক পরমসত্তা আছেন, যিনি তাঁর দিব্যজ্ঞানে এই বিশ্বকে পরিচালনা করেন।

তবু মানুষ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বেড়ে উঠে তারই অনুকরণে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বিধান গুলিকেই চিরন্তন সত্য বলে বিশ্বাস করে। যেমন কেউ বিশ্বাস করে তার ন্যায়-বান ঈশ্বর মানুষের মতোই, রাগ, দয়া, ঘৃণা বা ভালোবাসার আধার। কেউ বিশ্বাস করে তিনি প্রকৃতির মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন। কারও বা নাস্তিক্যবাদের দিকে ঝোঁক (অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব না মেনেও প্রকৃতির মধ্যেই বিশ্বসৃষ্টির মূল খুঁজে পাওয়া যায়); কেউ-বা সৃষ্ট কোনো বিরাট বিরাট প্রাণীদের ঈশ্বর ভেবে তাদেরই পূজা করে। এরা দুটি জিনিস পৃথক করে দেখতে পারে না,—এক, বিশেষ শিক্ষা ও অভ্যাসজাত বিশেষ সংস্কার, এবং অন্যটি সৃষ্টির আদি কারণে যে-মানুষের নির্বিশেষ (absolute) স্থির বিশ্বাস। এ দুটোর মধ্যে কোনো প্রভেদ তারা দেখতে পায় না। কার্য ও কারণের ক্রমপরম্পরার অনুসন্ধানে অভ্যস্ত না থাকাতে তারা কোনোও বিশেষ নদীতে স্নান করা কিংবা কোনো গাছ বা পাথর পূজা জপ তপ এবং পুরুতদের কাছ থেকে অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত মার্জনাদি কাঞ্চনমূল্যে কিনে নেওয়াকে (বিভিন্ন ধর্মের বিশেষত্ব অনুসারে) সারা জীবনের পাপক্ষালনের ও মুক্তির উপায় বলে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে যে এই বিশুদ্ধীকরণ তাদের বিশ্বাসের আধারের গুণে এবং পুরুতদের অলৌকিকতার জন্যই হয়, কিন্তু এতে তাদের নিজেদের দায়িত্ব কিছুই নাই। আর যারা তাদের সঙ্গে এই বিশ্বাসে একমত নয় তাদের উপর আর কোনো ফল হয় না। এই কাল্পনিক বস্তুগুলির যদি সত্যিকার কোনো গুণ থাকত, তবে তা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সকল জাতের লোকের উপরই সমভাবে ফলপ্রসূ হত, কোনো বিশেষ জাতের বিশ্বাস ও অভ্যাসের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত না। কারণ যদিও ফলের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন লোকের সামর্থ্যের তারতম্যের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তা' বলে কোনো বিশেষ মতাবলম্বীর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। দেখতে পাও না কি, যে কেউ যদি মিষ্টি মনে করে বিষ খায়, তবে বিষেরই ক্রিয়া হয়, আর তাতে প্রাণ যায়? "হে ঈশ্বর আমাকে 'অভ্যাস' ও 'স্বভাবের' পার্থক্য বুঝবার শক্তি দাও।"

## অলৌকিকত্ব (Miracle)

বিশেষ বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থানীয় নেতারা (অথবা বিভিন্ন ধর্মমতের প্রবর্তকরা) অলৌকিকত্বের (miracle) এমন ব্যাখ্যা করেছেন যে, তারাই যেন ভক্তহৃদয়ে ছাড়পত্রের (passport) মালিক। তার ফলে সাধারণ লোকের বিশ্বাস ধর্মগুরুদের প্রতি বেড়েই চলেছে।

সাধারণ লোক প্রচলিত মতের দ্বারাই অভিভূত হয়। তাদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক যে যখন তারা এমন কোনো কিছু দেখতে পায়, যার রহস্য তাদের বুদ্ধির অগম্য অথবা যার কোনো কারণ দেখতে পায় না, তখন তারা ইহা এক অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া বলে বর্ণনা করে। এর রহস্য আসলে এই যে জগতের যাবতীয় বস্তুর বর্তমানতাই কোনো না কোনো আপাত কারণের এবং বিভিন্ন অবস্থার (conditions) ও ন্যায় বিধির (modes of justice) উপর নির্ভর করে। সুতরাং আমরা যদি কোনো বস্তুর ভালো ও মন্দের মুখ্য এবং গৌণ কারণ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করে দেখি, তবেই আমরা বলতে পারি যে ওই বস্তুর সত্তার সঙ্গে সমস্ত বিশ্বই অঙ্গাঙ্গীভাবে

সংযুক্ত। কিন্তু, যখন অভিজ্ঞতার অভাবে এবং মতের সংকীর্ণতার জন্য কোনো কিছুর কারণ কারও নিকট অপ্রকাশিত থাকে, তখন তার সুযোগ নিয়ে অন্য যে কোনো মতলবি মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সব ঘটনাকে নিজের অলৌকিক শক্তি বলে বর্ণনা করে তার দলেই লোককে আকর্ষণ করে।

## বর্তমান ভারতে অতিপ্রাকৃত প্রভাব

ভারতের বর্তমান যুগের অলৌকিক (miraculous) ও অতিপ্রাকৃতিক (supernatural) বস্তুতে বিশ্বাস এত বেড়েছে যে লোকে যখনই কোনো আশ্চর্য বস্তু দেখে, তখনই সেটি তাদের পৌরাণিক যুগের বীরগণের কিংবা বর্তমানের সাধু সন্ন্যাসীদের ওপর আরোপ করে, এবং তার সুস্পষ্ট কারণ বর্তমান থাকলেও সেটা অগ্রাহ্য করে। কিন্তু তার কারণ তো যাদের সুস্থ মন, ও যারা ন্যায়ানুরাগী তাদের কাছে প্রচ্ছন্ন থাকে না। ইউরোপের লোকদের অনেক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার, বাজিকরের হাত সাফ্ ও নৈপুণ্য প্রভৃতি এমন অনেক জিনিস আছে, যার কারণ দৃশ্যত যেন অজ্ঞাত এবং মানববোধ-শক্তির বহির্ভূত বলেই মনে হয়; কিন্তু বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাজাত তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যদি দেখা যায় তা হলেই এই আপাত গুহ্য কারণগুলি বেশ সন্তোষজনক ভাবেই জানা যায়। এই সন্ধান পেলে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনায় বিশ্বাসীর দ্বারা বুদ্ধিমান লোকেরা আর প্রতারিত হবেন না। তবে এ বিষয়ে আমরা বড়ো জোর এই বলতে পারি যে কোনো কোনো ব্যাপারে, তীক্ষ্ণ গভীর অনুসন্ধান সত্ত্বেও অনেক আশ্চর্য ঘটনার কারণটা লোকের অজ্ঞাত থেকেই যায়। সে সব ক্ষেত্রে আমাদের সুযুক্তির উপর নির্ভর করা উচিত; এবং নিজেকে এই প্রশ্নই করা উচিত যে এর কারণটার জন্য আমাদের বুঝবার বর্তমান অক্ষমতাই আসলে দায়ি, না, প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত অসম্ভব কোনো মাধ্যমের উপর আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত। আমি মনে করি যে, আমাদের সুযুক্তি প্রথমোক্ত পন্থা বেছে নেবে। তাছাড়া শত শত বছর আগে কোনো মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে, বা কেউ স্বর্গারোহণ করেছে, ইত্যাদি অসম্ভব ও অযৌক্তিক ব্যাপারের তথ্যানুসন্ধান করবার এমন কী দরকার পড়েছে?

## যুক্তিবাদের সার্থকতা

সাংসারিক ব্যাপারে এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ না জানলে মানুষ একটাকে কারণ ও অন্যটাকে তার ফল বলে মেনে নিতে রাজি নয়, কিন্তু যখন ধর্মের বা ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব এসে পড়ে, তখন যেখানে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই, সেখানেও একটাকে কারণ ও অন্যটাকে কার্য বলে স্বীকার করতে মানুষ দ্বিধা বোধ করে না। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যে, কোনো সংগ্রাম না করে, অথবা কোনো রকম প্রতিকারের চেষ্টা না করেই কেবল প্রার্থনার জোরে দুর্গতি দূর হয়েছে বা অসুখ সেরেছে—এসবের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। এই সকল রহস্যজনক ব্যাপারের আপাত কারণগুলো মানুষের যুক্তি মেনে নিতে ইতস্তত করে, অথচ সে সব বিষয়ের রহস্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গেলে ধর্মনেতারা তাদের চেলাদের সন্তোষের জন্য এমন ব্যাখ্যা করেন, যেন ধর্ম ও বিশ্বাসের ব্যাপারে যুক্তি-তর্কের কোনো স্থান নেই, এবং ধর্মের ব্যাপারে শুধু বিশ্বাস

ও ঈশ্বরের কৃপাই একমাত্র নির্ভর। যে বিষয়ের কোনো প্রমাণ নেই, যা যুক্তি-বিরুদ্ধ, তা একজন যুক্তিবাদী কি করে গ্রহণ বা স্বীকার করতে পারেন? "যাদের চোখ আছে, তারা এ থেকেই সাবধান হও।" (কোরান)

## সম্ভব ও অসম্ভব তর্ক

যারা তর্কশাস্ত্রে খুব ব্যুৎপন্ন, তাদের মধ্যে সময় সময় দেখি তার্কিকরা তর্ক শুরু করে দেন যে, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা যদি একেবারে শূন্য থেকেই এই বিশ্বসৃষ্টি করতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে মৃতদেহে দ্বিতীয়বার জীবন সঞ্চার করা কিংবা জাগতিক কোনো বস্তুতে আলোর গুণ সঞ্চার করা, অথবা দূর দূরান্তরে যাতায়াতের জন্য বায়ুর শক্তি প্রয়োগ করা এমন কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু এই তর্ক এরূপ কিছু ঘটবার সম্ভাবনা ছাড়া তার বেশি কিছুই প্রমাণ করে না। এর উপর তার্কিকদের প্রমাণ করতে হবে যে তাদের প্রাচীন বা নবীন ধর্ম-নেতাদের জীবনে তথাকথিত অলৌকিক ক্রিয়া বাস্তবিক সংঘটিত হয়েছিল। তার অভাবে বুদ্ধিমানদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এই ধরনের যুক্তিতে কোনো 'তাকুরিব্' বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য নেই।

তাছাড়া এই মতই যদি স্বীকার করে নেওয়া হয়, তা হলে তো আলোচনার সময় তর্কের (munazara) মধ্যে কোনো পরিগৃহীত উক্তির সত্যতায় আপত্তি (mana) উত্থাপন করাই চলে না, এবং কিংবদন্তি বাতিল করবার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। কারণ যে কেউ কোনো একটা অসম্ভব কিছু প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে গিয়ে এই ধরনের যুক্তির অবতারণা করতে পারেন। সুতরাং 'সম্ভব' ও 'অসম্ভবের' অর্থের মধ্যে কোনো তফাতই থাকবে না। ফলে তর্কের ও ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত ভিত্তিই নষ্ট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সকল জ্ঞানী ব্যক্তিই স্বীকার করেন যে সৃষ্টিকর্তা অসম্ভব কিছু সম্ভব করেন না। যেমন পরমেশ্বরের ভাগীদার সৃষ্টি, কিংবা ঈশ্বরের বিনষ্টি, অথবা চিরবিরুদ্ধ মতের ঐক্যীকরণ প্রভৃতি অসম্ভব কিছু করতে পারেন না।

"৭২টি সম্প্রদায়ের বিবাদ সহ্য করতে হবে, কারণ তারা সত্য না জেনে আজগুবি অর্থহীন গালগল্পের পথ মাড়িয়ে চলেছে।" (হাফিজ)

## অতীত কালের ঐতিহ্য ও আধুনিক প্রমাণ

অপরদিকে দেখি বিভিন্ন প্রাচীন ধর্ম-সম্প্রদায়ের নেতাদের অতিমানবীয় ক্ষমতা অনেক দিনের আগের ব্যাপার বলে বহিরিন্দ্রিয়ের জ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা অসম্ভব, এবং আমি মনে করি যে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই বহিরিন্দ্রিয়ের জ্ঞানই অনেকটা নিশ্চিত জ্ঞান (positive knowledge)। বিভিন্ন মতের পণ্ডিতেরা তাঁদের শিষ্যদের বিশ্বাসপ্রবণতার উপর নির্ভর করে 'তাওয়াতুরে'র (অর্থাৎ সাধারণ বিবরণ থেকে সংকলিত "কিংবদন্তি") সাহায্যে এরূপ অনেক অদ্ভুত কথা প্রমাণের চেষ্টা করে গিয়েছেন। পক্ষান্তরে যে 'তাওয়াতুর্' নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মায়, আর যে 'তাওয়াতুর' শুধু ধর্মমতের বাহন, এই দুইপ্রকার ঐতিহ্যের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে যদি একটু চিন্তা করা যায়, তা হলেই এই অসংগত যুক্তির (fallacy) ঘোমটা খসে পড়ে। কারণ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মতে 'তাওয়াতুর্' হচ্ছে এমন সব

লোকের বর্ণিত বিবরণ, যাদের মিথ্যাবাদী বলে কোনো সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু তেমন লোক প্রাচীনকালে কতজন ছিলেন, বর্তমান সময়ের সাধারণ লোকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানে বা অভিজ্ঞতায় সেটা জানবার উপায় নেই। বরং তা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও সন্দেহ-সংকুল। তা ছাড়া, প্রত্যেক প্রাচীন ধর্মনেতাদের কিংবদন্তিতে বহু অসামঞ্জস্য তাদের কথার অসারতাই প্রমাণ করে। যদি বলা যায় যে, প্রথম যারা তাদের নেতাদের অলৌকিকত্বের বিষয় নিজ চোখে দেখেছেন বলে বিবরণ দিয়েছেন, সেই বিবরণের সত্যতা তাদের সমসাময়িক আর একদল লোকের উক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায়, তাহলে ওই দ্বিতীয়দলের লোকের উক্তি আবার তাদের সমসাময়িক আর একটি (তৃতীয়) দলের লোকের উক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হয়। কারণ দ্বিতীয় দলের লোকের উক্তির সত্যতাও বিশ্বাস এবং প্রমাণ-সাপেক্ষ। এমনি করে তৃতীয় দলের উক্তির সত্যতা প্রমাণের জন্য চতুর্থ আর এক দলকে আনতে হয়। এবং এইভাবে ক্রমশ বর্তমান কালের লোক পর্যন্ত এসে পৌঁছানো যায়। সুতরাং প্রমাণের পর প্রমাণের জের বংশ-পরম্পরা অনুসারে টেনে ভবিষ্যতেও চালিয়ে দিতে পারা যায়। এ থেকে পরিষ্কারই বোঝা যায়, সুস্থ মনের লোক মাত্রেই এ কথা মেনে নিতে ইতস্তত করবেন যে, তাদের সমসাময়িক একদল লোক বিশেষ করে ধর্মের ব্যাপারে মোটেই মিথ্যা বলে না। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মের নেতাদের গুণাবলির ও ভবিষ্যদ্বাণীর নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তা সম্বন্ধেও অনেক মতদ্বৈধ রয়েছে দেখা যায়। এবং এই বিপরীত উক্তির বিবরণও আবার ওই রকম ঐতিহ্য বা "তাওয়াতুর্" দ্বারাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক দলের উক্তির সত্যতা মেনে নিলে দুটি বিরুদ্ধ মতকেই স্বীকার করে নিতে হয়। আর, কোনো যুক্তি না দিয়ে একদলের উক্তির চাইতে অন্যদলের উক্তির অধিক মূল্য দিলে সেটা অকারণেই অধিক মূল্য দেওয়া হয়। কারণ প্রত্যেক দলেরই নিজ নিজ পূর্বপুরুষদের উক্তির সত্যতায় ও মহত্ত্বে সমান দাবি করবার আছে। আসল কথা এই যে, যে-ঐতিহ্য বা জনশ্রুতি (তাওয়াতুর্) লোকের যুক্তিসংগত উক্তি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, ও যার কোনো প্রতিবাদ হয়নি, সেই সব জনশ্রুতিই বিশ্বাসের প্রমাণরূপে গৃহীত হতে পারে। কিন্তু এরূপ নির্ভরযোগ্য ঐতিহ্য বা জনশ্রুতি যুক্তিবিরুদ্ধ ও অসংলগ্ন বিবরণ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

## ধর্মগ্রন্থের কিংবদন্তি ও ঐতিহাসিক সমালোচনা

এই সিদ্ধান্ত থেকে (ধর্মনেতাদের প্রদর্শিত) নিম্নলিখিত যুক্তিটি সহজেই খণ্ডন করা যায়। তাঁরা বলেন,—প্রথমত, যে সকল লোক প্রাচীনকালের রাজাদের ইতিহাস বর্ণিত কথা কিংবা কিংবদন্তি হিসাবে প্রচলিত কথায় বিশ্বাস করেন, তাঁরা কী করে প্রাচীন পুস্তকে লিখিত বিভিন্ন ধর্মের নেতাদের অলৌকিক কাজের বিবরণে, কিংবা বহুদিন ধরে প্রচলিত কিংবদন্তিতে অবিশ্বাস ও তা বর্জন করতে পারেন? দ্বিতীয়ত, মানব-সন্তানদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে প্রভেদ সত্ত্বেও, এবং তাদের জন্ম-রহস্য অজ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, যখন কেবলমাত্র একটি সাধারণ কিংবদন্তির (তাওয়াতুর্) উপর নির্ভর করে মানুষ তাদের জন্ম ও বংশাবলির কথা বিশ্বাস করে, তখন তারা কী করে প্রাচীন 'মুজতাহিদ্‌দের' (ধর্মগুরুদের) যে সকল অলৌকিকতা ও পবিত্রতার কথা ঠিক এমনি জনশ্রুতির (তাওয়াতুর) ভিতর দিয়ে পাওয়া গেছে তাতে বিশ্বাস করতে ইতস্তত করতে পারে?

অতীতের রাজাদের সিংহাসনে আরোহণ বা কোনো শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপার এমনই যে তা তখনই লোকে একবাক্যে বিশ্বাসযোগ্য বলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু অলৌকিক ঘটনাদির বর্ণনা অত্যাশ্চর্য তো বটেই, এবং তার প্রতিবাদও হয়েছে অনেক। যেমন কোনো প্রাণীর জন্ম যে তার পিতামাতা থেকে হয়, তা দেখা জিনিস, কিন্তু বাপ মা ছাড়া সন্তানের জন্মলাভ সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ। "একটার সঙ্গে অন্যটার কত তফাত দেখ।"

তাছাড়া অতীতের রাজাদের বংশাবলি বা ঘটনাবলির মধ্যে অনুমানের ক্ষেত্র উন্মুক্ত আছে। কিন্তু কোনো ধর্মে বিশ্বাস সেই ধর্মের মতানুসারে একটি সুনিশ্চিত ব্যাপার। সুতরাং এই অতিবাস্তব পার্থক্যের জন্য একটার সঙ্গে অন্যটার তুলনা চলে না। আবার, অতীতের রাজাদের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনায় বা তাদের বংশানুক্রম ইত্যাদিতে কোনো সন্দেহ উপস্থিত হলে, সে সব বৃত্তান্ত বর্জন করা এবং অবিশ্বাস্য বলে দূরে ফেলে দেওয়া হয়। যেমন আলেকজান্ডারের চীন বিজয় ও তার অদ্ভুত জন্ম কাহিনি সম্বন্ধে গ্রিস বা পারস্যের ঐতিহাসিকরা প্রতিবাদ করেছেন। সেজন্য ওই কাহিনিগুলোকে ঐতিহাসিকেরা সত্য বলে গ্রহণ করেননি।

### অদ্বিতীয় ঈশ্বর ও মধ্যবর্তী মতবাদ

কোনো কোনো লোক এইভাবে তর্ক করেন যে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ধর্মগুরু বা ভবিষ্যদ্বক্তার সাহায্যে মরজগতের লোকের চলার পথ খুলে দিয়েছেন। এটা স্পষ্টতই অর্থহীন। কারণ সেই সব লোকই আবার বিশ্বাস করে যে জগতের ভালোমন্দ সব রকমের সৃষ্টবস্তুই কোনো "মধ্যবর্তীর" (Intermediate agency) ভিতর দিয়ে না এসে স্বয়ং মহান্ সৃষ্টিকর্তা দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে; এবং এই সৃষ্টির দৃশ্যত কারণ বলে যা মনে হয় তা প্রকৃতপক্ষে তাদের বর্তমানতার ও তদবস্থাপ্রাপ্তির উপায় মাত্র। সুতরাং এটা দেখা দরকার যে, পয়গম্বর (prophet) পাঠানো ও তাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী (revelation) প্রকাশ সোজা তাঁর কাছ থেকে হয়, না কোনও "মধ্যবর্তীর" সাহায্যে হয়। প্রথমটা সত্য হলে, মুক্তির পথ দেখাবার জন্য কোনো মধ্যবর্তীর দরকার হয় না। এবং পয়গম্বরের কিছু করবার বা বাণী দেবারও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আর দ্বিতীয়টা হলে তো একটার পর একটা করে বহু "মধ্যবর্তীর" দরকার হয়। সুতরাং এই পয়গম্বরের আবির্ভাবের এবং বাণী প্রকাশের সঙ্গে অন্যান্য বহির্জগতের বস্তুর মতই ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক নাই, সেগুলি কোনো আবিষ্কারকের (inventor) আবিষ্কার বলে ধরে নিতে পারা যায়। পয়গম্বর বা অন্য কাউকেই ধর্মমতের সঙ্গে জড়ানো উচিত নয়। তাছাড়া এক জাতি যাকে সত্যধর্মের একমাত্র পথ প্রদর্শক বলে বলে থাকে, অন্য জাতি তাকেই ভুল পথের নির্দেশক বলে।

### ঈশ্বর ও রাজা

কেউ কেউ এই বলে তর্ক করেন যে বিভিন্ন ধর্মমতের অমিল কোনো ধর্মকেই ভুল বলে প্রতিপন্ন করে না। পৃথিবীতে রাজাদের সেকালের আইনের সঙ্গে একালের আইনের যেমন প্রভেদ, এই ধর্মগত প্রভেদকেও সেইভাবে গ্রহণ করা উচিত। বর্তমান কালের রাজারা প্রাচীন আইন সময়োপযোগী করে বদলে থাকেন। এবং এক আইন বদলিয়ে আর

এক আইন প্রবর্তন করা সত্ত্বেও লোকে এই আইন সত্যি বলে মানে এবং উপযুক্ত রাজশক্তি থেকেই হচ্ছে বলে জানে। সেই রকম নানা ধর্মপ্রণালি ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপযোগী করে ঈশ্বরই তৈরি করেছেন, এবং তাঁরই ইচ্ছায় একটার বদলে আর একটার ব্যবস্থা হয়েছে।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে আমার এই উত্তর যে, রাজায় ও ঈশ্বরে তুলনা হতে পারে না। যিনি ঈশ্বর সকল ধর্মাবলম্বীর কাছেই তিনি প্রতিটি অণু-পরমাণুর খবর জানেন বলে স্বীকৃত। তিনি সর্বজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সবই তাঁর কাছে সমান পরিজ্ঞাত আছে। তিনি তাঁর অসীম শক্তিতে মানব অন্তরে ইচ্ছামত পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বস্তুরই কারণ। তিনি সকল স্বার্থ ও খেয়ালের ঊর্ধ্বে। এই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পাশে যে মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, যে-মানুষ সকল কাজের পরিণতি জানতে অক্ষম, যার ভুল-ভ্রান্তি হবার সম্ভাবনা অনেক, যার কাজে স্বার্থপরতা, প্রতারণা বা ভণ্ডামি রয়েছে, তার তুলনা করাই চলে না। যে দুই বস্তুর মধ্যে বিশেষ গুণ-বৈষম্য আছে তাদের পরস্পরের সঙ্গে তুলনার মতো এটা নয় কি? তাছাড়া এই ধরনের মত পোষণ করায় অনেক প্রবল আপত্তি।

## ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইস্‌লাম

ব্রাহ্মণদের একটা বিশ্বাস যে তাঁরা ঈশ্বরের কাছ থেকে অমোঘ আদেশ পেয়েছেন যে তাঁরাই সব ক্রিয়াকলাপ বরাবর করে যাবেন, এবং তাঁরাই ধর্মকে চিরকাল ধরে থাকবেন। সংস্কৃত ভাষায় এ বিষয় এমন অনেক দৈবী অনুশাসন রয়েছে। আমার মতো ঈশ্বরের এই দীনতম জীবটি ওই ব্রাহ্মণ বংশেই জন্মগ্রহণ করেছি, ওই ভাষা শিখেছি, ও ওই সব অনুশাসন কণ্ঠস্থ করেছি। ওই সব দৈবী নির্দেশে আস্থা রাখার জন্য ইস্‌লাম ধর্মীয়রা ব্রাহ্মণ জাতির অনেক ক্ষতি করেছে, ও তাদের উপর অনেক নির্যাতন করেছে এমন কি মৃত্যু ভয়ও দেখিয়েছে, তবু তারা ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারেনি। ইস্‌লামানুবর্তীরা কোরানের পবিত্র শ্লোকের মর্মানুসারে (যথা :—পৌত্তলিকদের যেখানে পাও বধ করো, ও অবিশ্বাসীদের ধর্মযুদ্ধ করে বেঁধে আনো, এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে মুক্ত করে দাও, বা বশ্যতা স্বীকার করাও) এগুলি ঈশ্বরের নির্দেশ বলে উল্লেখ করে, যেন পৌত্তলিকদের বধ করা ও তাদের নানাভাবে নির্যাতন করা ঈশ্বরাদেশে অবশ্য কর্তব্য। মুসলমানদের মতে ওই পৌত্তলিকদের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই সব চেয়ে পৌত্তলিক। সেই জন্যই ইস্‌লামানুবর্তীরা সর্বদাই ধর্মোন্মাদে মত্ত হয়ে, এবং তাদের ঈশ্বরের আদেশ মানবার উৎসাহে "বহু-দেববাদিদের" ও শেষ পয়গম্বরের ধর্মপ্রচারে "অবিশ্বাসীদের" বধ করতে ত্রুটি করেনি।

এখন প্রশ্ন এই যে যিনি স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, দয়ালু, বদান্য এবং অনাসক্ত, সেই ভগবানের পক্ষে বিরুদ্ধ মতের উপদেশ ও আদেশ দেওয়া কি সম্ভব? অথবা এসবই কি ধর্মানুবর্তীদের মনগড়া জিনিস? আমার তো মনে হয় যে সুস্থ মনের লোক কেউই শেষেরটি মানতে ইতস্তত করবে না। তারপর একথা ভেবে দেখা দরকার যে, এ দুই-এর মধ্যে কোন্‌টা যুক্তিসংগত। অর্থাৎ এই আদেশ ঈশ্বরের বলে মানা উচিত, না, এই পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রবাদ একেবারে বাতিল করে দেওয়া উচিত। একদল তাদের শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলে যে পয়গম্বরি উদ্দেশ্য তাদের নেতার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। আর একদল দাবি

করেন যে, ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে এই উদ্দেশ্য ডেভিডের বংশে গিয়ে শেষ হবে। এই দুইটি উক্তিই বস্তুত প্রবাদ মাত্র বা ভবিষ্যদ্বাণী; কিন্তু এমন কোনো আইনের কথা নয় যে তা আবার বদলাবে। কারণ একটাকে সত্যি মানলে অন্যটা মিথ্যা হবেই। সুতরাং পরিবর্তন বা বিকৃতির সম্ভাবনা দুটোতেই প্রযোজ্য।

হয়তো শুনে মানুষ অবাক হবে যে, যে সকল ধর্মগুরুদের সঙ্গে সঙ্গে পয়গম্বরি উদ্দেশ্য শেষ হয়ে গেছে বলে কথিত আছে, তাঁদের সময়ের শত শত বৎসর পরেও ভারতে ও অন্যান্য দেশে নানক এবং অপরাপর সন্ত সাধুরা অভিনব ধর্মপ্রবর্তনের (prophetic mission) পতাকা তুলেছেন ও বহুলোক তাঁদের অনুবর্তী হয়েছে। ধর্মশিক্ষা ব্যাপারে স্বার্থসিদ্ধির দরজা পল্লবগ্রাহী ও অনভিজ্ঞদের জন্য চিরকালই খোলা থাকবে। এবং প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে যে শত শত লোক কোনো বিশেষ সম্মান লাভের জন্য, কিংবা সামান্য প্রাপ্তির আশায়, কতরকম অনশন উপবাস, একটা হাত অনড় করে রাখা, শরীর পুড়িয়ে ফেলা প্রভৃতি নানা রকম দৈহিক নির্যাতন ও কষ্টভোগ করে থাকে। সুতরাং এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে সেকালে কোনো অত্যুৎসাহী লোক জনসাধারণের গুরু হবার আশায়, কিংবা নিজেকে লোকের ভক্তির পাত্র করে তোলবার লোভে অনেক সাময়িক দুঃখ বিপদ বরণ করবে।

## হয় সত্য, নয় মিথ্যা

একটা কথা প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাচার্যদের মুখে শোনা যায়, এবং কথাটা তাঁরা তাঁদের নিজেদের মতে জোর দেবার জন্যই বলে থাকেন। প্রত্যেকেই বলেন যে, মৃত্যুর পর ভবিষ্যতে পুরস্কার বা শাস্তির বিধান যা তাদের ধর্মে দিয়েছে, তা হয় সত্যি, নয়তো মিথ্যা। যদি মিথ্যা হয় এবং ভবিষ্যতে কোনো পুরস্কার বা শাস্তি না থাকে, তাহলে এ কথা সত্যি বলে বিশ্বাস করতে কোনো ক্ষতি নাই। কিন্তু যদি সত্যি হয়, তাহলে অবিশ্বাসীর মহাবিপদ। যে সকল বেচারারা এই সব ধর্মের উক্তির ব্যাখ্যাতাদের মেনে চলে, যারা তাদের গুরুদের উক্তি অকাট্য যুক্তি বলেই ধরে নেয়,—তারা আবার এ নিয়ে মহা গৌরবও করে। আসল কথা, অভ্যাস ও দলগত শিক্ষা মানুষকে তাদের চোখ-কান থাকা সত্ত্বেও অন্ধ ও বধির করে।

উপরের তর্কের ভ্রম দুরকমে সংশোধন করা যায়। প্রথমত তারা যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (অর্থাৎ মিথ্যা হলে) কোনো ক্ষতি নেই বলে, তা স্বীকার করা যায় না। কারণ কোনো বস্তুর সত্যতায় বিশ্বাস মানুষ সেই বস্তুর বর্তমানতায় বিশ্বাস করেই লাভ করে। এবং যে বস্তু যুক্তির বহুদূরে, এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গেও মোটেই খাপ খায় না (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিকূল), এমন বস্তুর বর্তমানতায় বিশ্বাস যে কোনো বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে অসম্ভব। দ্বিতীয়ত ওই সকল বস্তুতে বিশ্বাস থাকা মূর্খতা ও অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ এবং গোঁড়ামি প্রতারণা প্রভৃতির জন্য নানারকম ক্ষতিকর কষ্টদায়ক ও নীতিবিগর্হিত ব্যাপারের কারণ হয়। যাই হোক, এ যুক্তি সত্য বলে ধরে নিলে, এই থেকেই সকল রকমের ধর্মের আপেক্ষিক সত্যতা প্রমাণ করা দরকার হয়। কারণ প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই সেই একই যুক্তি দেখাতে পারে। সেই জন্য একজন লোকের পক্ষে সব ধর্মই সত্য বলে বিশ্বাস করা, অথবা একটা গ্রহণ করা বা অন্যটা বর্জন করা, এক মহা গোলমেলে

ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং প্রথমটা যেমন অসম্ভব, দ্বিতীয়টাও তেমনি অসম্ভব। এবং এ ক্ষেত্রে আবার তাকে নানা ধর্মের আপেক্ষিক সত্যতা ও অসত্যতার বিচারে প্রবৃত্ত হতে হয়।

এই হল আমার আলোচনার প্রধান কারণ। মানুষে আর একটা যুক্তি দেখায় যে, পূর্ব-পুরুষদের আচার ও রীতিনীতির সত্যতা ও অসত্যতার সন্ধান না করেই অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিত। সে সকল আচার-আচরণে ঘৃণা করলে, অবহেলা করলে, বা তার একটু এদিক-ওদিক করলে ঐহিক ও আধ্যাত্মিক অকল্যাণ আনে। এবং এরূপ বিচার-মুখী আচরণ প্রকৃত পক্ষে আমাদের পূর্বপুরুষদের ঘৃণা বা অপমান করারই সামিল। যারা পূর্ব-পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা ও উচ্চধারণা পোষণ করেন, এরূপ লোকের মনে এই ভ্রমাত্মক যুক্তি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এবং এর ফলে সত্যানুসন্ধানে ও সত্যপথ গ্রহণে বিষম প্রতিবন্ধক জন্মে।

একটু ভাবলেই সকলের কাছেই এই যুক্তির ভ্রম পরিস্ফুট হয়। কারণ প্রথমত, যাঁরা কোনো নূতন ধর্মস্থাপন করে লোককে তাঁদের দিকে আকর্ষণ করেছেন, তাঁদের প্রতি এ যেমন প্রযোজ্য দ্বিতীয়ত, যাঁরা গুরুর কাছ থেকে নতুন মত গ্রহণ করে নিজেদের পূর্বপুরুষদের প্রাচীন পন্থা পরিত্যাগ করেছেন, এবং সে সকল পূর্বপুরুষদের মতের ভিত্তি ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য। এই অপবাদ থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র সহজ উপায় হয়, মানুষ যদি তার নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও আবিষ্কার সবই ঈশ্বরের উপর নিবেদন করে দেয়। আসল কথা এই যে, প্রাচীনদের সময়ে সাধারণ এক ধর্মমত ছেড়ে অন্য আর একটা মত গ্রহণ এই প্রমাণ করে যে, ধর্মান্তর গ্রহণ মানুষের প্রকৃতিগত। তাছাড়া, প্রত্যেক মানুষকে যে ঈশ্বর বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েছেন তার মধ্যে এই ভাব নিহিত যে, অন্য নিম্নস্তরের জীবের মতো স্বজাতীয়ের দৃষ্টান্ত চরম অনুকরণ করা উচিত নয়। পরন্তু নিজের বুদ্ধি ও অর্জিত জ্ঞান দিয়ে ভালোমন্দ এরূপভাবে বিচার করা চাই যাতে ঈশ্বরদত্ত এই মহামূল্য দান যেন অকেজো করে ফেলা না হয়।

## একেশ্বরবাদের ভিত্তি শুধু সংখ্যায় নয়, সত্যে

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা পৃথিবীতে এক ঈশ্বরের বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা কম দেখে মাঝে মাঝে এই বলে গর্ব করেন যে তাঁরাই দলে ভারী। কিন্তু এটাও দেখা দরকার যে, একটা উক্তির সত্যতা শুধু উক্তির পরিপোষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে না। তেমনি কোনো উক্তির অবিশ্বাস্যতা শুধু অল্প সংখ্যক লোকের উক্তি বলেই জন্মাতে পারে না। কারণ সত্যানুসন্ধিৎসুদের দ্বারা এ কথা স্বীকৃত হয়েছে যে, একমাত্র সত্যই সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতের বিরুদ্ধে হলেও পালনীয়। তাছাড়া কম লোকে বললেই কথাটা অবিশ্বাস্য হয়ে যায়,—এই যুক্তি যদি সর্বাবস্থায় সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়, তা হলে সকল ধর্মের মূলেই বিষম আঘাত করা হবে। কারণ প্রত্যেক ধর্মেরই গোড়ার দিকে তার পৃষ্ঠপোষক কম থাকেন,—যেমন শুধু সেই সেই ধর্মের প্রবর্তক, এবং তার অল্পসংখ্যক সরল অনুবর্তী, যাঁরা তাঁর মতে পূর্ণ বিশ্বাস করেন। তারপর তাঁদের প্রচারের ফলে, খড়ের উপর পর্বত তৈরির মত, হাজার হাজার বড়ো বড়ো গ্রন্থ ও নানা যুক্তিপূর্ণ নিবন্ধ লিখিত হয়। কিন্তু

সর্বশক্তিমান একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসই প্রত্যেক ধর্মের মূলসূত্র। জাতি বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় পরস্পরের প্রতি প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে জয় করাই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয় বিশুদ্ধ পূজা। এই হৃদয় জয়ের চেষ্টা না করে যারা ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাভাবিক ও সহজ প্রেরণার চাইতে তথাকথিত মনগড়া যে প্রত্যাদেশ—যা শুধু তাদের সমজাতীয় জীবের সামাজিক জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে,—সেই প্রত্যাদেশেরই অধিক মূল্য দেয়, তারা কোনো বিশেষ তন্ত্র মন্ত্র বা যোগাদি অঙ্গচালনাকেই মোক্ষের কারণ, এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কার লাভের উপায় মনে করে। প্রকৃতপক্ষে তারা যেন তাদের দেবতাতেই একটা পরিবর্তন আনার ভাণ করে, এবং মনে করে যেন তাদের বাহ্যিক প্রক্রিয়া ও মানসিক উচ্ছ্বাসের প্রভাবে অপরিবর্তনশীল ঈশ্বরের মধ্যেও পরিবর্তন আনতে পারে। আমাদের তুচ্ছ প্রচেষ্টা কিছুতেই ঈশ্বরের রাগ প্রশমনের, কিংবা তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভের কারণ হতে পারে না। একটু চিন্তা করলেই এই ঘৃণ্য মতের (heresy) অসারতা ধরা পড়বে।

## চরম উপদেশ—"বিশ্বমানবকে শান্তি দাও"

"ধর্মগুরু 'সেখের' বহু ভণ্ডামিপূর্ণ কাজের কোনো মূল্যই নাই। লোকের অন্তরে শান্তি দাও, ইহাই একমাত্র পারমার্থিক উপদেশ।"

সংক্ষেপত মানব জাতির সাধারণ লোকদের প্রতারক, প্রতারিত, ও তদতিরিক্ত আরো দুটি অর্থাৎ চারি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা ঃ—

১ম। এক শ্রেণির লোককে প্রতারক বলা যায়, যারা লোককে তাদের দলে টানবার জন্য ইচ্ছামত নানা মতবাদ, ধর্মমত ও বিশ্বাস প্রভৃতি বানিয়ে প্রচার করে, লোককে কষ্ট দেয়, ও তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

২য়। আর এক শ্রেণির লোককে প্রতারিত বলা যায়, যারা কোনো সত্য খবর না করেই অন্যের দলে যোগ দেয়।

৩য়। এক শ্রেণির লোক—যারা প্রতারক এবং প্রতারিত। তারা অন্যের উক্তিকে বিশ্বাস করে, এবং অপরকেও তা আঁকড়ে ধরতে প্ররোচিত করে।

৪র্থ। যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রতারকও নয়, প্রতারিতও নয়।

"কারও অনিষ্টের চেষ্টা কোরো না, আর যা' খুশি তাই করো। কারণ অন্যের অনিষ্ট করা ভিন্ন আমাদের কাছে আর কোনো পাপ নাই"। (হাফেজ)

এই দীনতম ঈশ্বর-বিশ্বাসীর এই কয়েকটি ছোটো ও প্রয়োজনীয় কথা কোনো লোকের পক্ষপাত বা ধর্মান্ধতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শুধু এই আশায় লিখিত হল যে, সুস্থ মনের লোকেরা এ দিকে সত্য ও শুদ্ধ দৃষ্টি দেবেন। আমার আর একটি রচনা "মানাজাবু তুল্ আদিয়ান" বা "নানা ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা" নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

'একেশ্বরবাদীদের উপহার' গ্রন্থ এখানেই শেষ হল।

অনুবাদক
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস

ফারসি ভাষায় প্রথম প্রকাশ ১৮০৪, বঙ্গানুবাদ প্রকাশ ১৯৪৯

# হিন্দু-মুসলমান বিরোধের গোড়ার কথা

## নীরদচন্দ্র চৌধুরী

১

একটা সহজ উপমা দিয়াই আরম্ভ করিব। পিতামাতা ও শিশু পুত্রকন্যা লইয়া একটি সংসার। মনকষাকষি, মান, অভিমান, নালিশ ও ঝগড়া, এমনকি অল্পস্বল্প মারামারিও যে নাই তাহা নয়। তবু পরিবার এক, কারণ উহার কেন্দ্র এক। ঝোঁকের মাথায় যে যাহাই করুক না কেন অবশেষে সকলকেই পথে ফিরিয়া আসিতে হইবে। সৌরজগতে যেমন সকল গ্রহ-উপগ্রহেরই একটা বাঁধা পথ আছে, যাহার বাহিরে যাওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়, তা সে সূর্য হইতে যতই দূরে থাকুক না কেন, আমাদের কল্পিত পরিবারেও তেমনই প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই একটি নির্দিষ্ট স্থান ও পথ আছে; এই স্থান ও পথ ছাড়িয়া কেহই থাকিতে বা চলিতে পারে না, কারণ এই পরিবারের জীবিকার সংস্থান, ধ্যানধারণা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, রীতিপদ্ধতি সবই যে ব্যক্তিতে কেন্দ্রীভূত সে ব্যক্তি একক ও শ্রেষ্ঠ, সে ব্যক্তি পিতা।

ক্রমে ছেলেরা বড়ো হইতে লাগিল ও বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে লাগিল। তখন আর পিতামাতার সহিত সকল বিষয়ে মেলে না। দেখিতে পায়, তাঁহারা যাহা দিয়াছেন তাহার বাহিরেও বিরাট একটা জগৎ আছে, তাঁহারা যে ধ্যানধারণা বহিয়া আসিয়াছেন পৃথিবীতে তাহা ছাড়াও কাম্য জিনিষ আছে; সেগুলিও উপেক্ষার বস্তু নয়। ধীরে ধীরে পিতা ও পুত্রের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়, পুত্রের পরিণত জীবনের কেন্দ্র বাল্যজীবনের কেন্দ্র হইতে সরিয়া আসিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায়, বুদ্ধিমান হইলে পিতামাতা পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ নীতি অনুসরণ করেন, না হইলে পুত্রের স্বাতন্ত্র্যলাভের ইচ্ছায় বাধা দিবার চেষ্টা কবিয়া নিজের ও অপরের অশান্তি ডাকিয়া আনেন।

তার পর ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক হইবার পালা। যাহারা একই পিতামাতার সন্তান, আবাল্য একসঙ্গে রহিয়াছে, একসময়ে হয়তো বা একজন অপর জনকে মুহূর্তের জন্যও না দেখিতে পাইলে অস্থির হইয়া উঠিত, তাহাদের এই মর্মান্তিক ছাড়াছাড়ির কারণ হিসাবে দুইটি জিনিস প্রায় জনপ্রবাদে পরিণত হইয়া গিয়াছে। উহাদের একটি টাকা অপরটি স্ত্রী। কিন্তু এ-দুটির কোনোটিকেই ভ্রাতৃবিচ্ছেদের মূল হেতু বলা চলে না। উহারা

উপলক্ষ মাত্র। স্ত্রী যাহাকে প্ররোচনা করিবে অথবা অর্থ যাহাকে প্রলুব্ধ করিবে তাহার নিজের মনে যদি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহা হইলে শুধু বাহিরেরই চাপে জন্মগত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইবার নয়। তাই যে স্বাতন্ত্র্যের ইচ্ছা পিতা ও পুত্রের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে উহাই ভাই ও ভাইয়ের মধ্যেও বিরোধের সৃষ্টি করে বলিতে হইবে। জগতের অধিকাংশ লোক পার্থিব ব্যাপার লইয়াই মত্ত। সেজন্য এই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘর্ষ সাধারণত আর্থিক বিবাদের রূপ ধরিয়াই দেখা দেয়। কিন্তু তাই বলিয়া অর্থকেই উহার মূল মনে করিবার কোনো হেতু নাই; অর্থ অবলম্বন মাত্র; মূল মানবমনের সেই বিশিষ্ট ধর্ম যাহা আমাদিগকে যুগে যুগে কালে কালে কি পার্থিব কি অপার্থিব ব্যাপারে পরধর্ম ভয়াবহ বলিয়া স্বধর্মে নিধনকেও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে প্রণোদিত করিয়া আসিয়াছে।

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূলেও আছে এই স্বাতন্ত্র্য-ভোগের ইচ্ছা। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন এই স্বাতন্ত্র্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়, দুইটি বিরাট সম্প্রদায়ের। আজ জাতীয় জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রই ধরি না কেন, তাহাতে সব চেয়ে বড়ো যে জিনিসটা পাই তাহা হিন্দুর হিন্দুত্ব ও মুসলমানের মুসলমানত্ব বজায় রাখিবার ইচ্ছা। হিন্দুরা অবশ্য এ-কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা যে আদর্শ ধরিয়াছেন উহা জাতীয় আদর্শ, মুসলমানরা বিদেশ হইতে গৃহীত আদর্শের মোহে আচ্ছন্ন রহিয়াছেন বলিয়াই ভারতবর্ষকে চিনিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এই কথা বলিলেই বিবাদ মিটিবে না। যে রীতিনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে মুসলমানরা ধরিয়া আছেন, বিদেশীই হউক কিংবা স্বদেশীই হউক তাহাকে তাঁহারা নিজস্ব বলিয়া মনে করেন। সহস্র যুক্তিতেও তাঁহারা এই আদর্শকে ছাড়িয়া অন্য আদর্শ অবলম্বন করিবেন না। পক্ষান্তরে হিন্দুরাও নিজেদের আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারা বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর। ইহাই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের একেবারে গোড়ার কথা। এই বিরোধে কার দাবি কতটা যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন তাহা নয়। বিরোধটা যে জাজ্বল্যমান ও উহা যে দুইটি সমাজের ধর্ম ও ব্যক্তিত্বের সংঘাত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তবু আরও একটি যুক্তি দিয়া ব্যাপারটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ধরা যাক, আজ ভারতীয় ঐক্যের কথা মনে করিয়া হিন্দুরা মুসলমানদিগের চাকুরির সমস্ত দাবি মিটাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেই কি মুসলমানরা রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, ধর্মে, আচার-ব্যবহারে মুসলমান বলিয়া স্বতন্ত্র থাকিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিবেন? ইহাই যদি হইত, তাহা হইলে পাঠ্যপুস্তকে রামায়ণ বা মহাভারতের গল্প সম্বন্ধে তাঁহারা এত আপত্তি করিতেছেন কেন? সেখানে তো পার্থিব স্বার্থের কোনো বিরোধ নাই। আর হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ সকল নেতারাই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে রফার কথা বলিতেছেন কেন? দুইটি পক্ষকে স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরোধী বলিয়া স্বীকার করিয়া না লইলে তো রফার কোনো কথাই উঠিতে পারে না। সুতরাং আসল ব্যাপারটা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে আজ ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ যে বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছে তাহা দুইটি পূর্ণবিকশিত স্বাতন্ত্র্যবোধের সংঘাত। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় পক্ষেরই এই স্বাতন্ত্র্যবোধকে বিনষ্ট না করিতে পারিলে শুধু রফা করিয়া ভারতীয় ঐক্যের কোনো আশাই নাই।

কিন্তু বিনষ্ট করিতে হইবে বলিলেই স্বাতন্ত্র্যবোধ লোপ পাইবে না। জানা প্রয়োজন এই স্বাতন্ত্র্যবোধের মূলে কী আছে। আমরা অবশ্য বলি, তৃতীয় পক্ষের জন্যই হিন্দুমুসলমানের বিরোধ মিটিতেছে না, এবং এই তৃতীয় পক্ষ না থাকিলে উভয়ের বিরোধ এত উগ্র হইয়া উঠিত না। ইহার অর্থ যদি এই হয় যে হিন্দুমুসলমানের পরস্পর অবিশ্বাস ও অমিল বজায় রাখা ইংরেজশাসকদের স্বার্থ এবং এই মনোমালিন্য থাকাতে তাঁহারা যথেষ্ট লাভবান হইতেছেন, তাহা হইলে এই উক্তি সম্বন্ধে আপত্তির কোনো কারণ হইতে পারে না। কিন্তু আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া কেহ যদি বলিয়া বসেন, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ষোলো আনা বা বারো আনা ইংরেজদেরই সৃষ্ট তাহা হইলে ইতিহাস তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে না। ইংরেজ শাসনের পূর্বেও হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বর্তমান ছিল এবং ইংরেজরাজত্বের প্রথম দিকে, যখন কোম্পানি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই—তখনও মুসলমানদের দ্বারা দেবদেবীর প্রতিমা ইত্যাদি ভাঙ্গা ও ব্যাপকভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না।* সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশের জন্য কেবলমাত্র ইংরেজশাসনকে দায়ি না করিয়া অন্য কারণও খুঁজিতে হইবে। এই কারণগুলিকে কালানুক্রমিক ভাবে সাজাইতে গেলে কি ফল পাওয়া যায় তাহাই দেখা যাক।

প্রথমেই চোখে পড়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীয় বিধান। এই বিধান অনুসারে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই নিজেদের ঐক্য সম্বন্ধে অতিশয় সজ্ঞান ও অপরের সম্বন্ধে অত্যন্ত অসহিষ্ণু। হিন্দুসমাজকে অসহিষ্ণু বা অনুদার বলিলে বোধ করি অনেকের নিকট আশ্চর্য ঠেকিবে। কিন্তু ইহা কাল্পনিক অভিযোগ নয়। হিন্দুরা গায়ে পড়িয়া অন্যধর্মাবলম্বী লোককে আক্রমণ না করিলেও নিজেদের জাত বাঁচাইবার জন্য যে বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন

* ইহার দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ—

১ কলিকাতা, ১৮২০ সন। "গত দুর্গোৎসবে হিন্দুরা সপ্তমী পূজা দিবসে প্রাতঃকালে নবপত্রিকা স্নান করাইতে গঙ্গাতীরে আনিয়াছিল। পরে স্নান করাইয়া বাদ্যাদি সমেত বাটী যাইতেছিল। যখন তাহারা চকচাঁদনীতে পঁহুছিল তখন অনেক মুসলমান সেস্থানে একত্র তাহারদিগের সহিত কলহ করিল ও তাহারদিগের সহিত মারিপিট করিল এবং ঢোল প্রভৃতি সকল ভাঙ্গিল ও নবপত্রিকার কলার গাছ কাটিল। তখন হিন্দুলোকেরা থানাতে সমাচার দিলে সেখানকার ববকন্দাজ আসিয়া যত যত মুসলমানেরদিগকে পাইল সে সকলকে বাঁধিয়া পুলিশে চালান কবিল। সেখানকার বিচারে অপরাধবিশেষে কাহারও তিনমাস কাহারও পাঁচ মাস মেয়াদে কয়েদের আজ্ঞা হইল এবং সংভ্রান্ত মুসলমান যে যে ছিল তাহারদিগের ভারি জরিপনা হইল এবং সেই সময়ে আজ্ঞা হইল যে কলিকাতার গোঁয়ারা বাহিরে যাইতে পারিবে না এবং বাহিরের গোঁয়ারা কলিকাতার মধ্যে আসিতে পারিবে না।" (সমাচার দর্পণ, ২৮শে অক্টোবর, ১৮২০)

২ কাশী, ১৮০৯ সন। "দশ বৎসর হইল কাশীতে হিন্দু ও মুসলমানের বড়ো বিরোধ হইয়াছিল। মুসলমানেরা হিন্দুরদের দেবালয়ে গোহত্যা করিল তাহাতে হিন্দুরা কোপাবিষ্ট হইয়া মুসলমানেরদের এক প্রধান মসজিদ ইদগা সেখানে এক শূকরকে মারিয়া ফেলিল তাহারদের মিম্বর ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও তাহারদের কোরাণ ছিঁড়িয়া আপন আপন পায়ের নীচে রাখিল। মুসলমানেরা ইহাতে আরও কুদ্ধ হইয়া হিন্দুরদের প্রধান মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও কালভৈরবের জাঁতা ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও পুনর্বার সেখানে গোহত্যা করিল ও রক্ত সর্বত্র ছিটাইল ও মৃত গো এক পবিত্র পুষ্করিণীতে ফেলিল। পরে হিন্দুরা অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া আপনারদের শক্তি পর্যন্ত মুসলমানেরদিগকে মারিল।

তাহাতেই মানবজাতির অহিন্দু অংশের চূড়ান্ত অপমান করা হইয়াছে। ইহার উত্তরে হয়ত অনেকে বলিবেন, হিন্দু তো অন্য জাতির আচার বা ধর্মের নিন্দা করে না, শুধু জাতিতে জাতিতে ধর্মে ধর্মে ও আচারে আচারে পার্থক্য আছে বলিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতে চায়। এই ধরণের যুক্তি শুনিলে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতদ্বেষী নেতাদের কথা মনে পড়িয়া যায়। তাঁহারা প্রথমে নেটাল, কেপ প্রভিন্স বা ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতবাসীকে কুলিস্তানে স্বতন্ত্র বাসস্থান, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, যানবাহন ইত্যাদি ব্যবহার করিতে বলিতেন। আজকাল ওইরূপ কথা বলিলে অনেক ঝগড়াবিবাদের সম্ভাবনা আছে বলিয়া নূতন সুর ধরিয়াছেন। এখন তাঁহারা বলেন, ভারতবাসীকে কৃষ্ণাঙ্গ বলিয়া তাঁহারা মোটেই ঘৃণা করেন না; ভারতবাসীরা অতিপ্রাচীন ও সভ্য জাতি, তবে ভারতীয় সভ্যতা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সভ্যতা বিভিন্ন ধরনের বলিয়া এ-দুয়ের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

সুতরাং নিজেদের অপমানের কথা স্মরণ করিয়া তর্ক করিবার চেষ্টা না করিয়া আমাদের স্বীকার করা উচিত হিন্দুর শাস্ত্রে অন্যের ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা না থাকিলেও অন্য ধর্মাবলম্বী লোকের প্রতি অনুদারতার অভাব নাই। মুসলমানের অসহিষ্ণুতা ঠিক ইহার উলটা। হিন্দুর ঘৃণা অহিন্দু মানুষকে, মুসলমানের ঘৃণা অমুসলমান ধর্মবিশ্বাসকে। আমরা অহিন্দুর হিন্দু হইবার পথ রাখি নাই, তবু তাহাদিগকে অহিন্দু বলিয়াই অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখিয়াছি। মুসলমানরা অন্য ধর্মবিশ্বাসকে, বিশেষ করিয়া পৌত্তলিকতাকে দ্বেষ করেন বলিয়াই সকলের মুসলমান হইবার পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। মোটের উপর হিন্দুর অনুদারতাকে 'প্যাসিভ' ও মুসলমানের অনুদারতাকে 'অ্যাকটিভ' বলা যাইতে পারে।

তাহাতে ইংলণ্ডীয় সেনাপতিরা অন্য কোনো উপায় না দেখিয়া আপনারদের সৈন্যদ্বারা উভয় পক্ষে বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন।" (সমাচার দর্পণ, ২৪শে জুলাই, ১৮১৯। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তৃতীয় খণ্ড, ১৫২ পৃ.।)

৩ ঢাকা ও ফরিদপুর, ১৮৩৭ সন। "ইদানীং জিলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুর গ্রামে সরিতুল্লা নামক এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক ১২০০০ জোলা ও মোসলমান দলবদ্দ করিয়া...তৎচতুর্দিগস্থ হিন্দুদিগের বাটী চড়াও হইয়া দেবদেবীর পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে এবং এই জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মলকতগঞ্জ থানার সরহদ্দে রাজনগরনিবাসি দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়াছে এবং ওই থানার সরহদ্দে পোড়াগাছা গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাটীতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্বস্ব হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভস্মরাশি হওয়াতে একজন জবন ধৃত হইয়া ঢাকার দওরায় অর্পিত হইয়াছে। আর শ্রুত হওয়া গেল সরিতুল্লার দলভুক্ত দুষ্ট জবনেরা ঐ ফবিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিণীচরণ মজুমদারের প্রতি নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাঁহার বাটীতে দেবদেবী পূজার আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার বাবু জবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া ঐ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্বক কএক জন জবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। হে সম্পাদক মহাশয় দুষ্ট জবনেরা মফঃস্বলে এ সকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচারগৃহে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।....আমি বোধ করি সরিতুল্লা যবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর উত্তর প্রবল হইতেছে অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লার জোটপাটের শত অংশের এক অংশ তীতুমির করিয়া ছিল না। অতএব আমরা শ্রীলশ্রীযুতের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তিনি হিন্দু ধর্ম ও দেশ রক্ষার নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তির দলভঙ্গের বিহিত আজ্ঞা করুন। ইতি সন ১২৪৩ সাল তারিখ ২৪ চৈত্র। জিলা ঢাকা নিবাসি দুঃখি তাপিগণস্য।" (সমাচার দর্পণ, ২২শে এপ্রিল ১৮৩৭। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তৃতীয় খণ্ড, ৩১২ পৃ.।)

কিন্তু অনুদারতার প্রকৃতি যাহাই হউক উহার ফল উভয় পক্ষেই এক দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু যেমন হিন্দুর সামাজিক বিধান অনুসারে সকল হিন্দুকে আপন ও সকল মুসলমানকে পর বলিয়া জ্ঞান করিতে বাধ্য, মুসলিম ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী মুসলমানও তেমনই সকল মুসলমানকে আপন ও সকল হিন্দুকে পর মনে করিতে বাধ্য। বরঞ্চ মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীণ সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের জন্য অমুসলমান সম্বন্ধে তাঁহারা আরও বেশি সজ্ঞান। মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ মতো মুসলিম মাত্রেরই নিকট পৃথিবী দুইভাগে বিভক্ত—(১) দার-অল্-ইস্লাম; (২) দার-অল্-হর্ব। দার-অল্-ইস্লামের অর্থ ইসলামের দেশ, অর্থাৎ যে দেশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী শাসক কর্তৃক অধিকৃত ও শাসিত। দার-অল্-হর্বের অর্থ যুদ্ধের দেশ, যে দেশে যুদ্ধ করিয়া ইসলামের প্রাধান্য স্থাপন করিতে হইবে। ইসলামের বিধান অনুসারে কোনো মুসলমান অমুসলমানের অধীন থাকতে পারেন না। শুধু তাই নয়, অমুসলমান জগৎ ও মুসলমান জগতের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ। এই জন্যই অমুসলমান জগতের নামকরণ হইয়াছে দার-অল্-হর্ব, যুদ্ধের দেশ। এই নির্দেশের জন্য অমুসলমান ও মুসলমান রাজ্যের মধ্যে কোনো মৈত্রী হইতে পারে না; যতদিন পর্যন্ত না দার-অল্-হর্ব দার-অল্-ইসলামে পরিণত হইবে ততদিন পর্যন্ত বিশ্বাসী মুসলমান মাত্রকেই জিহাদ বা ধর্ম যুদ্ধ চালাইতে হইবে। জিহাদের নিয়ম অনুযায়ী অবিশ্বাসীকে হয় (১) মুসলমান হইতে হইবে, কিংবা (২) মুসলমানের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ও জিজিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া আশ্রিত (ধিম্মী) হইয়া থাকিতে হইবে, কিংবা (৩) যুদ্ধ করিতে হইবে। ইসলামের বিধান মানিলে এই তিন পথের এক পথ ভিন্ন মুসলমানের অমুসলমানের নিকট যাইবার চতুর্থ আর কোনো পথ নাই।*

৩

পৃথিবীকে দার-অল্-ইস্লাম ও দার-অল্-হর্বে বিভাগ আমাদিগকে ট্রটস্কি প্রভৃতির স্থায়ী বিপ্লব (পার্মানেন্ট রিভলিউশ্যন) থিওরী ও কমিন্টার্নের কার্যকলাপের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।' গোঁড়া কম্যুনিস্টের নিকট পৃথিবীর সমস্ত লোক যেমন দুইটি পরস্পর বিরোধী

* জিহাদের বিধান অবশ্য ইসলামে একদিনেই প্রবর্তিত হয় নাই। মহম্মদের মদিনা প্রয়াণের পূর্বে আদেশ ছিল, অবিশ্বাসীরা অত্যাচার করিলেও প্রতিশোধের চেষ্টা করিবে না। কিন্তু হিজিরার পর হইতেই একটা নূতন ধারা দেখা দেয় ও ক্রমে ক্রমে তিনটি ধাপে জিহাদের নির্দেশ ধর্মশাস্ত্রের বিধান বলিয়া স্বীকৃত হয়। এই ধাপগুলি এই—(১) বিশ্বাসীরা আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে। (কোরান, ২২।৩৯-৪২)। (২) যুদ্ধ মুসলিমের কর্তব্য (কোরান, ২।২১২-২১৩)। "The strife is prescribed for you")। (৩) অবিশ্বাসী মাত্রকেই ইসলামে দীক্ষিত করিতে হইবে। এই শেষ নির্দেশ ইসলামের দিগ্বিজয়ের যুগে প্রবর্তিত হয় ও বুখারি, মুসলিম প্রভৃতি ধৃত হদিসে পূর্ণবিকশিত রূপে দেখা যায়। তখন মহম্মদের মুখে এই ধরনের বাণী দেওয়া হইয়াছে—ইসলামকে স্বীকার না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে হইবে। ('I am commanded to fight against men until they bear witness that there is no God but Allah, and that Muhammad is God's messenger : only by pronouncing these words can they make their property and blood secure from me')

' এই প্রসঙ্গে কম্যুনিস্ট নেতাদের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে, "Sheep must protect themselves against the wolves. It is absurd to suppose that you can secure a common sheep-wolve's will. There must be either a wolves' will or a sheep's will. In the same way, there can not be a common capitalistic-labour will." "The communist revolution can be victorious only as a world revolution." "The permanent revolution in Russia grows into a European revolution of the proletariat." "The proletariat of Russia never thought or creating an isolated socialist state. A self-sufficient 'socialist' state is a petty-bourgeois ideal,"

শ্রেণিতে বিভক্ত, বিশ্বাসী মুসলমানের নিকটও তেমনই মুসলমান ও অমুসলমানের পার্থক্য ও বিরোধ অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু এখানে একটি আপত্তি উঠিতে পারে। যদি ইহাই সত্য হয় যে এক মুসলমান ধর্ম অবলম্বন ভিন্ন ইসলামের বিধান অনুসারে মুসলমান ও অমুসলমানের প্রকৃত সমন্বয়ের কোনো উপায় নাই, তাহা হইলে ভারতবর্ষে এতদিন ধরিয়া হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করিল কী করিয়া, এবং মুসলমান আধিপত্যের সময়েও কী সামাজিক আচারে, কী সাহিত্যে ও কলায়, এমনকি ধর্মবিশ্বাসেও উভয়ের আংশিক মিলন হইল কী করিয়া? ইহার প্রথম উত্তর এই যে, কোনো সমাজ বা ধর্মবিপ্লবের প্রারম্ভে যে উগ্রতা থাকে তাহা চিরকাল স্থায়ী হয় না। রুশিয়ার যে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রতন্ত্রের কথা এই মাত্র বলা হইল, তাহা এখন পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের আশা ছাড়িয়া দিয়া ধনিক গভর্নমেন্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতেছে, ধনিক সমাজও এখন আর তাহাকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করিতেছে না। ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তনের গোড়ার দিকে ব্রাহ্মরা নিজেদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে ঘৃণাই বোধ করিতেন, এখন বরঞ্চ তাঁহারা হিন্দুনামে একটু গৌরবই অনুভব করেন। তেমনই মুসলমান সমাজেও অমুসলমান সম্বন্ধে প্রথমে যে তীব্র অসহিষ্ণুতা ছিল তাহা অবস্থাচক্রে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল।* অন্য ব্যাপারেও আমরা এই জিনিসটা লক্ষ করি। চিত্রাঙ্কন ও কুশীদ গ্রহণ দুই-ই মুসলমান ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী নিষিদ্ধ। অথচ মুসলমান চিত্রকলা পৃথিবীর একটা বড়ো সম্পদ এবং সুদ লওয়া সম্বন্ধে স্পষ্ট বিধান আরবদেশেও লঙ্ঘিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের পাশাপাশি বাসের ও ভাব আদান-প্রদানের আর একটা বড়ো কারণও আছে। এদেশের মুসলমানরা গতানুগতিক প্রথা অনুযায়ী শেখ সৈয়দ মোগল পাঠান এই চারি শ্রেণিতে বিভক্ত। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহাদের বারো আনাই ভারতবর্ষের পুরাতন অধিবাসী। পঞ্জাবের গ্রাম্য মুসলমানকে জাতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে এখনও সে আমি জাঠ, কিংবা রাজপুত, কিংবা আবন, গাক্কার ইত্যাদি বলিয়াই পরিচয় দেয়, ধর্মের উল্লেখ করে না। ভারতবর্ষের অন্যত্র যে মুসলমান আছে তাহাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার লক্ষ করিলেও দেখা যায়, উহারা কোথাও ইসলামের বিধিনিষেধ একেবারে নিখুঁতভাবে পালন করিতে পারে নাই; ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও লোকাচারে, দৈনন্দিন জীবনে, উৎসবে-আমোদে, এমন কি পূজাপার্বণেও হিন্দু হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই।

এই তো গেল মুসলমান পক্ষের কথা। মুসলমান আধিপত্যের যুগে হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন দেখিতে পাওয়া যায় তাহার একটা হিন্দুর দিকও আছে। তখন সাধারণ মুসলমান যেমন ষোলো আনা গোঁড়া মুসলমান ছিল না সাধারণ হিন্দুও তেমনই ষোলো আনা গোঁড়া হিন্দু ছিল না। এই যুগে হিন্দু সভ্যতার প্রাচীন গৌরবের কোনো স্মৃতি ছিল না। সুতরাং হিন্দুর সংস্কৃতি লোপ পাইবে এই আশঙ্কা করিয়া সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের আচার, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি ধর্মবিশ্বাসও গ্রহণ করিতে সংকোচ বোধ করিত না।

* স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মহম্মদ ও তাঁহার অনুচরবর্গের প্রতি অন্য আরবদের অত্যাচার ও আক্রমণের জন্যই প্রথমে এই অসহিষ্ণুতার উদ্ভব হয়।

এই কারণে তখন দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকের মধ্যে সৌহার্দ্য থাকাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতে হইবে। বিবাদ হইলেই বরঞ্চ আশ্চর্য হইবার কথা ছিল।

কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কাহিনি বলিতে গিয়া সম্প্রদায়ের অন্য একটা স্তরও যে ছিল তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। সেই স্তরে হিন্দু যেমন হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা সম্বন্ধে সজ্ঞান মুসলমানও তেমনই ইসলামের বিশুদ্ধ ধারা প্রচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। এই দ্বন্দ্বের নেতা একদিকে মুসলমান উলেমা ও অন্যদিকে হিন্দু পণ্ডিত। উহাদের একপক্ষ যেমন হিন্দুকে 'যবন দোষ' হইতে রক্ষা করিবার জন্য কঠিন বিধান সৃষ্টি করিতেছিলেন, আর একপক্ষও তেমনই মুসলমানধর্ম বিস্তার এবং ইসলামের প্রকৃত অনুশাসন প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। এই বিবাদের মধ্যে মাঝে মাঝে মুসলমান সুলতান ও বাদশাহরা আসিয়া পড়িয়াছেন, হিন্দু রাজারাও আসিয়াছেন। কিন্তু সেকালে এ-যুগের মতো জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার উপায় ছিল না বলিয়া উহাদের প্রচেষ্টা মাঝে মাঝে সফল হইলেও সমগ্র দেশব্যাপী হিন্দু-মুসলমান বিরোধে পরিণত হইতে পারে নাই।

৪

এইবার ঊনবিংশ শতাব্দীতে নামিয়া আসা যাক। ভারতবর্ষে ইংরেজরাজত্ব প্রতিষ্ঠা হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন একদিকে মুসলমানের আধিপত্য ও অন্যদিকে হিন্দুপদ পাদশাহির স্বপ্ন ঘুচিয়া গেল; যখন একদিকে হিন্দুত্বের অবলম্বন মারাঠা, রাজপুত ও জাঠ সামন্তগণ ও অন্যদিকে মুসলমানত্বের অবলম্বন মোগল পাঠান অভিজাতবর্গ হতবল হইলেন, তখন উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকে মিলিয়া, সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা সামাজিক আচার-ব্যবহার ও আর্থিক ব্যাপারে যে ঐক্যবন্ধন বহুকাল ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকে দৃঢ়তর করিয়া ইংরেজবিরোধী একটা জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করিল না কেন? বরঞ্চ একই পরাধীনতা সত্ত্বেও ইংরেজশাসনকালেই উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যবোধ আরও উগ্র হইয়া উঠিল কেন?

এই ব্যাপারটা বুঝিতে হইলে সকলের আগে আমাদের জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি কী তাহা আবিষ্কার করা প্রয়োজন। ইংরেজশাসনের প্রথম একশত বৎসর ধরিয়া যাহারা ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল তাহাদের সকলেই ভারতবর্ষের পুরাতন হিন্দু-মুসলিম রাষ্ট্রতন্ত্রের উত্তরাধিকারী অথবা সেই পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্রের পুনরুত্থানকামী। ইহাদের শেষ চেষ্টা সিপাহিবিদ্রোহ। এই সমুদয় চেষ্টার মধ্যেই হিন্দু-মুসলমানের মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষা আজিকার জাতীয় আন্দোলনের মূলে তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যাঁহারা উহার প্রবর্তক ও পুরোধা তাঁহারা যে কেবলমাত্র ইউরোপীয় 'ন্যাশনালিজ্‌ম' দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহাই নয়, এ-দেশের পুরাতন শাসকদের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষে ইংরেজের পক্ষসমর্থকও ছিলেন। রামমোহন রায়ের সহিত বর্তমান যুগের জাতীয় আন্দোলনের সম্পর্ক সর্বজনবিদিত। তিনি ১৮২৯ সনে এক জন ফরাসি পর্যটককে বলেন, "যখন বিজয়ী জাতি বিজিত জাতির তুলনায় অধিক সভ্য, তখন পরাধীনতাকে দুয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ভিন্ন সাধারণভাবে অনিষ্টকর বলা যাইতে পারে না,

কারণ বিজয়ী জাতির সভ্যতার উৎকর্ষদ্বারা বিজিত জাতি উপকৃত হয়। যদি আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া অন্য অনেক বিষয়েই ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে চাই তাহা হইলে ভারতবর্ষে ইংরেজশাসন আরও বহু বৎসর স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন।"* বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন, ইংরেজরা আমাদিগকে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বঙ্কিম সম্বন্ধে আর একটি গল্পও আছে। তিনি যখন ডেপুটিগিরির জন্য প্রার্থী হন, তখনও সিপাহি-বিদ্রোহের জের চলিতেছে। যে পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর নিকট তিনি গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। বঙ্কিম উত্তর দিলেন, ইংরেজের জয় সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকিলে তিনি চাকুরির জন্য আসিতেন না।

জাতীয় স্বাধীনতার জন্য একান্ত আগ্রহশীল, অথচ যাহারা এই স্বাধীনতা রক্ষা ও লাভের জন্য প্রাণ দিয়া চেষ্টা করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ, এই ব্যাপারটা অনেকের নিকট, বিশেষ করিয়া অন্য দেশের জাতীয়তাবাদীদের নিকট, বড়ো আশ্চর্য ঠেকিবে। কিন্তু আমাদের জাতীয় জাগরণের নেতারা সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় এই পথ ধরিয়াছিলেন।† শুধু তাহাই নয়, তাঁহারা বিশেষ করিয়া যে জাতীয় পুনরভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা হিন্দুর প্রাচীন গৌরব, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় শক্তি ফিরাইয়া আনিবার স্বপ্ন। রিনেসেন্সের সময়ে ইউরোপীয় জাতিরা যেমন নূতন করিয়া গ্রিস ও রোমের সভ্যতার সন্ধান পান, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার ফলে ভারতবর্ষের হিন্দুরাও তেমনই তাঁহাদের প্রাচীন কীর্তির সন্ধান পান। রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, টিলক প্রভৃতি সকলেই এই প্রাচীন হিন্দুধারার প্রচারক। তাঁহারা একদিকে সংস্কারক, অপরদিকে জাতীয়তাবাদী। ইঁহাদের সকলেই প্রচলিত হিন্দু আচারকে বিনাবিচারে গ্রহণ না করিয়া প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার আদর্শের মধ্যে প্রেরণা খুঁজিয়াছিলেন। তাই ইঁহাদের শিক্ষায় ভারতবর্ষের জাতীয় অভ্যুত্থানের যে ধারণা শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে গড়িয়া উঠিল তাহা সম্পূর্ণ হিন্দুভাবাপন্ন। কি রাষ্ট্রে কি সংস্কৃতিতে উহার দুইটি দিক দেখিতে পাওয়া যায়। উহা একদিকে যেমন ইংরেজবিরোধী, আর একদিকে তেমনই মুসলমানবিরোধীও বটে।

যে কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের হিন্দুরা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠেন, ঠিক সেই কারণেই ভারতবর্ষের মুসলমানরাও এই যুগে অনেক বেশি ইসলামিভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেবলমাত্র এদেশেই যে মুসলমানের

* "La conquete est bien rarement un mal, quand le peuple conquerant est plus civilise que le peuple conquis, parce qu'elle apporte a celui-ci les beins de la civilisation. It faut a l'Inde bien des annees de domination anglaise pour qu'elle puisse ne pas perdre beaucomp en ressaisissant son independance politique." (Victor Jacquemont—*Journal*. Tome I, pp. 186-187.)

† পরবর্তীযুগে অবশ্য এই মনোভাবের পরিবর্তন হয়। বিনায়ক দামোদর সাভারকর '১৮৫৭ সনের ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ' এই নাম দিয়া সিপাহিবিদ্রোহের ইতিহাস লেখেন, মেজর বামনদাস বসু ওয়ারেন হেস্টিংস, ওয়েলেসলি, ড্যালহাউসী প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং অন্যান্য বহু লেখক শিখ, মারাঠা, মোগল, সিরাজউদ্দৌল্লা, এমন কি নন্দকুমারের পর্যন্ত পক্ষ সমর্থন করিয়া পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু তখন মৌখিক সহানুভূতি ভিন্ন অন্য কোনরূপ সহায়তা করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বোধ করি কার্যক্ষেত্রে কিছু করিবার ছিল না বলিয়াই সহানুভূতির উদ্ভব হইয়াছিল।

আধিপত্য ও গৌরব লুপ্ত হয় তাহাই নয়, পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা এবং পূর্ব ইউরোপেও তাঁহাদের ক্ষমতা হ্রাস হইতে আরম্ভ করে। আলজিরিয়া ফরাসিরা দখল করেন, মিশরে ও সুদানে ইংরেজের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। গ্রিক সার্ব বুলগেরিয়ান রুমানীয়ান প্রভৃতি জাতির বিদ্রোহে তুর্কির সুলতানের সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হয়, ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তুর্কির আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন ও রুশিয়ার চাপে পারস্যে ও মধ্য এশিয়ার মুসলমান আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়। ইসলামের এই সর্বব্যাপী দুরবস্থার সময়ে জগতের সমস্ত মুসলমানকে একছত্রের নীচে সমবেত করিয়া, ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্ন লইয়া এক সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। ইঁহার নাম সৈয়দ জামাল-উদ্দীন অল্-আফঘানী।

পাশ্চাত্ত্য জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে মাৎসিনির যে স্থান ইসলামজগতে জামালউদ্দীন নিঃসন্দেহে সেই স্থান অধিকার করিতে পারেন। কী পাণ্ডিত্যে, কী বাগ্মিতায়, কী কর্মে, কী রাষ্ট্রনীতিবিজ্ঞানে, কী আদর্শপরায়ণতায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করেন নাই। মিশরের 'গ্র্যাণ্ড মুফ্‌তি' শেখ মুহম্মদ আবদু সর্বত্র অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া স্বীকৃত। তিনিও জামাল-উদ্দীনকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তুর্কি পারস্য প্রভৃতি স্বাধীন মুসলমান দেশকে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের হাত হইতে বাঁচাইয়া পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানকে এক খলিফার নেতৃত্বে একত্র করাই তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ছিল। ইহার জন্য তিনি পার্থিব ভোগসুখ তুচ্ছ করিয়া কৌমার্য ও দারিদ্র্য বরণ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে আফগানিস্থান, পারস্য, তুর্কি, মিশর, ফ্রান্স এমনকি আমেরিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারকার্যে মুসলমানজগতে একটা নবজাগরণের সূচনা হয়। সকল বিষয়ে তাঁহার কার্যকলাপ ও মতামতের সমর্থক না হইলেও, এমনকি সময়ে সময়ে তাঁহাকে উৎপীড়ন করিলেও পারস্যের নসরুদ্দিন শাহ্ ও তুর্কির সুলতান আবদুল হামিদ তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিশরে আরাবি পাশার নেতৃত্বে স্বাধীনতালাভের চেষ্টাও তাঁহারই শিক্ষার ফলে ঘটে।*

সে-যুগের স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের নৃপতিরা যদি আরও আদর্শপরায়ণ ও চক্ষুষ্মান হইতেন, এবং কেবল নিজেদের বংশ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ না রাখিয়া ইসলামের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হইতেন, তাহা হইলে জামাল-উদ্দীনের শিক্ষা হয়ত আরও অনেক বেশি ফলপ্রসূ হইত। কিন্তু এই সকল বাধা সত্ত্বেও তাঁহার প্রচার ও আন্দোলনে সমগ্র মুসলমানজগতে ইসলামের পূর্ব গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে ও মুসলিম সমাজের ঐক্যের ধারণা আরও অধিক বদ্ধমূল হয়। এই কারণেই সুলতান আবদুল হামিদ জামাল-উদ্দীন সম্বন্ধে সকল বিষয়ে একমত ও নিঃসংশয় না হইলেও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্যান-ইসলামিজ্‌ম্ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তখন ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তুর্কির শাসনতন্ত্র সংস্কার করিবার জন্য ও খ্রিস্টান প্রজাদিগকে স্থানীয় স্বরাজ দিবার জন্য তাঁহার উপর চাপ দিতেছিল। তিনি দেখিলেন, ইহার উত্তরে যদি তিনি ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মুসলমান প্রজাদিগের মধ্যে একটা উত্তেজনা ও বিদ্রোহের ভাবের সৃষ্টি করিতে পারেন,

* 'মস্তা-হিরুশ-শর্কে'র লেখক একজন সিরীয় খ্রিস্টান। তিনি বলেন, "He raised up a living spirit in the hearts of his friends and disciples which stirred their energies and sharpened their pens, and the East profited and will profit by them." (ব্রাউন-কৃত ইংরেজি অনুবাদ)। জামালউদ্দীনের জন্ম ১৮৩৮-৩৯ সনে ও মৃত্যু ১৮৯৭ সনে হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এডোয়ার্ড জি ব্রাউন প্রণীত *The Persion Revolution of 1905-09*-এর প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তাহা হইলে বিপর্যস্ত ইংরেজ ফরাসি রুশিরা হয়ত তাহাকে নিরুপদ্রবে থাকিতে দিতে পারে। ঠিক এই কারণেই আবদুল হামিদের রাজ্যচ্যুতির পর নব্যতুর্ক দলও প্যান-ইসলামিজ্‌মের পোষক হইলেন। ইঁহাদের অনেকেই ইউরোপে বা ইউরোপীয় ধরনে শিক্ষালাভ করিয়া খিলাফতে বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। তবুও তাঁহারা জানিতেন, ইউরোপীয় শক্তিবর্গের হাত হইতে বাঁচিতে হইলে সমগ্র মুসলমান সমাজকে প্রবুদ্ধ না করিলে চলিবে না। তাই তাঁহারাও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ও মহাযুদ্ধের সময়ে মুসলমানদিগকে ইসলামের নীতি ও ইসলামের ঐক্য সম্বন্ধে সদাজাগ্রত রাখিবার চেষ্টা করেন।

এই প্যান-ইসলামিক আন্দোলনের প্রভাব ১৮৮০ সনের পর হইতে ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যেও বিস্তারলাভ করিতে আরম্ভ করে। জামাল-উদ্দীন নিজে কলিকাতা পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। ১৮৮৩ সনে উইল্‌ফ্রিড ব্লাউন্ট যখন কলিকাতায় আসেন তখন তিনি পুরাতন ও নূতন, উভয় মতাবলম্বী মুসলমানদের মধ্যেই জামাল-উদ্দীনের প্রতি শ্রদ্ধার যথেষ্ট পরিচয় পান, জামাল-উদ্দীনের শিক্ষার ফলও স্পষ্ট লক্ষ করেন। বাংলার জাতীয় আন্দোলনের সুবিখ্যাত নেতা ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রচারক বিপিনচন্দ্র পালও লিখিয়াছেন,—

"He [Jamal-ud-din] passed through India inoculating many a leader of Mahomedan thought in Calcutta and Bombay and other cities with this new virus. As a messenger of this gospel, Jamal-ud-din went from India to Egypt and Turkey. But the seed that he had sown among us grew in secret for over a quarter of a century. Its only outer manifestation was seen in a new self-consciousness of our Moslem neighbours, a new conceit of separate communal interests, and a new desire to revive, in the name of purity, the old iconoclastic spirit of the Islamic faith and thereby to work a new religious cleavage between the Mahomedans and their Hindu neighbours."*

স্বদেশীযুগের হিন্দু নেতারা মুসলমান-জাগরণের প্রতি কি মনোভাব পোষণ করিতেন, পালমহাশয়ের এই উক্তিতে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর পক্ষে হিন্দু সভ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা যদি 'virus' না হয়, তাহা হইলে মুসলমানের পক্ষে ইসলামের হৃতপ্রায় গৌরব ফিরাইয়া আনিবার আকাঙ্ক্ষাই 'virus' বলিয়া অভিহিত হইবে কেন? তাহা ছাড়া, পালমহাশয় জামাল-উদ্দীনের প্রতি একটি অবিচার করিয়াছেন। জামাল-উদ্দীনের ইসলাম প্রেম প্রধানত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী ছিল বলিয়া তিনি ভারতবর্ষের হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু এই সকল তর্ক এখানে তুলিবার প্রয়োজন নাই। ভারতীয় মুসলমানদের আত্মচৈতন্যের জাগৃতি ভালো হউক মন্দ হউক, উহা যে প্যান-ইস্‌লামিজ্‌ম্‌-এর প্রভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়, মাত্র ইহাই বর্তমানে আমার প্রতিপাদ্য।

অবশ্য ইহার পূর্বে ওয়াহাবি সম্প্রদায়ও এদেশের মুসলমানদিগকে আরও খাঁটি মুসলমান করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন।† কিন্তু তাঁহাদের মুখ ছিল সম্পূর্ণ অতীতের দিকে।

* Bipin Chandra Pal—*Nationality and Empire*. 1916. p. 370

† ১৮২০ সনের কাছাকাছি রায়-বেরেলির সৈয়দ আহমদ ভারতবর্ষে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। বাংলাদেশের তিতুমির তাঁহারই শিষ্য ছিলেন।। ১৮৬০-৭০ সনের মধ্যে ওয়াহাবি আন্দোলন আরও প্রসার লাভ করে।

ধর্মসভার নিছক্ রক্ষণশীল আন্দোলন যেমন হিন্দুদের উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, ষোলো আনা পুরাতনপন্থী ওয়াহাবি নীতিও তেমনি বর্তমান যুগের মুস্‌লমানদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু নূতন প্যানইসলামিজ্‌ম্, নূতন হিন্দু জাতীয়তাবাদের মতো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রণ বলিয়া ভবিষ্যৎমুখীন যুবক ও শিক্ষিত সমাজকে অনুপ্রাণিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ হিসাবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এ-যুগের ভারতবর্ষীয় নব্য মুসলমানদের যাঁহারা নেতা, তাঁহাদের সকলেই, স্যর সৈয়দ আমির আলি প্রভৃতি, এমন কি স্যর সৈয়দ আহ্মদ্ পর্যন্ত, প্যান-ইসলামিজ্‌মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।*

৬

জাতীয় জাগরণের ফলে হিন্দুরা ও প্যান-ইসলামিজ্‌মের ফলে মুসলমানরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বিশ-ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে আত্মানুভূতি লাভ করিতেছিলেন। এ-দুয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিল ১৯০৬-১৯০৭ সনে স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে। ইহার বহু পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষের মুসলমানরা হিন্দুদের সর্ববিষয়ে উন্নতির তুলনায় নিজেদের দুরবস্থা লক্ষ করিয়া বিশেষ ক্ষোভ অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু যুগোপযোগী শিক্ষার অভাবে ও ইংরেজ গভর্ণমেন্টের সহিত বিরোধ থাকায় কী করিয়া ইহার প্রতিকার করা যায় তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এই দুই বাধা দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় মুসলমান সমাজকে নূতন পথ নির্দেশ করেন সর্বাগ্রে স্যর সৈয়দ আহমদ ও তিনি যে ধারার প্রবর্তন করেন তাহার পরিণতি হয় স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। তখন মুসলমানরা দুইটি জিনিস উপলব্ধি করেন। প্রথমত তাঁহারা দেখেন, সংঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করিয়া হিন্দুরা রাষ্ট্রতন্ত্রে নিজেদের অধিকার স্থাপন করিতে চাহিতেছেন ও অনেকটা কৃতকার্যও হইতে চলিয়াছেন; দ্বিতীয়ত তাঁহারা অনুমান করেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করিতে পারিলে হিন্দুরা দেশে যে ধারার প্রবর্তন করিবেন তাহা তাঁহাদের বিশিষ্ট হিন্দুজাতীয়তার ধারা। মুসলমানদের এই শেষোক্ত ধারণা যে অমূলক নয়, তাহা হিন্দু নেতারাও স্বীকার করিয়াছেন। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলেন,—

* ভারতবর্ষে প্যান-ইসলামিজ্‌ম্-এর প্রসার সম্বন্ধে ব্রিটিশ ও রুশীয় গভর্নমেন্টও যে সচেতন ছিলেন, তাহার কয়েকটি প্রমাণ এস্থলে দেওয়া যাইতে পারে। ১৯১০ সনের ১৫ই ডিসেম্বর ব্রিটিশ দূত স্যর জর্জ বুকাননের সহিত জারের এ-বিষয়ে যে কথাবার্তা হয়, স্যর জর্জ তাহার নিম্নোদ্ধৃত চুম্বক দিয়াছেন, "His Majesty continued.. Great Britain had of late experienced considerable troubles in India, and Russia was likely soon to be confronted with similar difficulties in Turkestan. An active propaganda was being carried there by the Mullahs, and His Majesty feared that we were both threatened with a serious Pan-Islamistic movement. I observed that it was rather with the Hindus that with the Mahommedans that our troubles in India had originated, but that many atributed to the young Turks the desire to encourage such a movement as that of which His Majesty had spoken. (Sir George Buchanan to Sir E. Grey, dtd. Dec. 15, 1910)

ইহার কয়েকদিন পরে জার ও স্টলিপিনের সহিত স্যর জর্জ বুকাননের আবার এই বিষয়ে কথাবার্তা হয় ও এই কথোপকথনের মর্ম স্যর জর্জ পররাষ্ট্রবিভাগকে জানান। তাহার উত্তরে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রবিভাগের পার্মানেন্ট আন্ডার-সেক্রেটারি স্যর আর্থার নিকলসন লেখেন, "I do not quite see how we can utilize the risks of the Pan-Islamic movement. There is no doubt that the Russians are becoming uneasy in regard

"Nor can the Indian nationalists absolutely absolve themselves of all responsibility for this unfortunate state of things. If the Moslem leaders tried to wipe out the memories of the Sikhs and the Mahrattas, the Hindu nationalists leaders also sought to revive them. It was no doubt a supreme psychological need of the nationalist propaganda; and so far as these memories were revived to recreate the self-confidence of a people suffering from a state of hopeless and listless inertia, they did only good and no harm. But the effect of this revival did not stop here. It gradually awoke, at least in a section of the nationalists, the foolish and suicidal ambition of once more re-establishing either a single Hindu State or a confederacy of Hindu States in India. Some people, thus secretly interpreted Swaraj as a Hindu Raj. And this folly is also to some extent responsible for the antagonism, in any case, of the soberer section of our Moslem felow-countrymen towards our nationalist ideals and activities; and thus it lent, unconciously, considerable support to the Pan-Islamic propaganda among almost all classes of educated Mahomedans.*

এই বিশ্লেষণ যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হিন্দু জাতীয়ত্বের প্রতিযোগিতায় মুসলমানত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এই আশঙ্কা হইতে ও স্বদেশী আন্দোলনের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের মুসলমানদের মনে সর্বপ্রথমে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও ইসলামীয় আদর্শ অনুসরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। তাহা না হইলে কেবলমাত্র ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্ররোচনায় মোসলেম লিগ ও কম্যুনাল ইলেক্টরেটের প্রবর্তন হইত কিনা সন্দেহ।

৭

হিন্দুর জাতীয়তা ও মুসলমানের মুসলিমত্বের মধ্যে যে সংঘাত স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে প্রথমে প্রকট হয়, তাহা হয়ত কয়েক বৎসরের মধ্যেই পূর্ণপরিণতি লাভ করিত। কিন্তু কতকগুলি কারণে করে নাই। প্রথমত, ১৯১১-১২ সনে একদিকে রুশিয়া পারস্যের উত্তরার্ধ গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন ও অন্যদিকে ইটালি ত্রিপলিতে তুর্ক সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করিলেন। স্বাধীন মুসলমান রাজ্য দুইটির এই বিপদে ইংরেজরা উহাদের সহায়তা করিবেন,

to this movement, and Benckendorff left with me the other day a series of questions which I have passed to the India Office, as to what steps we were taking in India towards controlling and influencing the instruction which was given in our Moslem schools. When I was in Russia, I ascertained that the young Turks were carrying on a fairly active propaganda in the south of Russia and in Turkestan, and it is possible that they may extend their activity to India." (Sir Arthur Nicolson to Sir G. Buchanan, dtd. Jan. 3, 1911).

ইহার বৎসর দেড়েক পরে রুশিয়ার পররাষ্ট্রসচিব মসিয় সাজোনভ আবার স্যার এডোয়ার্ড গ্রের নিকট এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। আফগানিস্থানে তুর্ক সামরিক কর্মচারীদের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "Ces instructeurs s'occupent en meme temps de propagande pan-islamique, egalement dangereuse an point de vue des interets anglais et russes. Gagnant du terrain dans les domaines de l'Emir et excitant le fanatisme des populations afghanes, cette progaganda penetre de plus en plus dans les regions limitrophes de la Russie et des pays qui se trouvent sous son protectorat." (Memorandum communicated by Sazonov, Sept. 24, 1912)

* Pal—"Nationality and Empire". pp. 388-389.

ভারতবর্ষের মুসলমানরা এই আশা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আশা পূর্ণ হয় নাই। একদিকে 'ট্রিপল এলায়েন্স' হইতে ইটালিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবার প্রলোভনে পড়িয়া ও অন্যদিকে 'ট্রিপল্ আঁতাঁত'-এর ঐক্য বজায় রাখিবার গুরুতর প্রয়োজন বুঝিয়া ইংলণ্ড, ইটালি বা রুশিয়া কাহারও বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করিলেন না। বাল্কান যুদ্ধেও ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটিল।[+] ইহার অল্পদিন পরেই আসিল ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে তুর্কি ও ইংলণ্ড বিরুদ্ধপক্ষে যোগ দিলেন; ইংরেজদের সাহায্যে ও মন্ত্রণায় হেজাজের আমির হুসেন তাঁহার পুত্র পরিজনসহ তুর্কির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন। ক্রমশ তুর্কির পরাজয়, মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল্ অধিকার, সেভর্-এর সন্ধি ও গ্রিক সেনাকর্তৃক এশিয়া মাইনর আক্রমণ সকলই ঘটিল। এই সকল ব্যাপারে ১৯১১ সন হইতে লোজানের সন্ধি (১৯২৩ সন) পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদিগের মন গ্রেট-ব্রিটেনের প্রতি এত বিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইংরেজকে বাধা দিবার জন্য হিন্দুদের সহযোগিতা পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই নূতন ধারার সূত্রপাত হয় ১৯১১-১২ সনে, যখন মোসলেম লীগ সর্বপ্রথমে কংগ্রেসের সহিত একমত হইয়া স্বায়ত্তশাসনকে মুসলিম সম্প্রদায়েরও লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার পর ঘটনাচক্রে উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে ও অবশেষে ১৯২০-২২ সনে কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটির একাত্মতায় পরিণতি লাভ করে। কিন্তু তুর্কি যেমনই আবার বিজয়ী হইয়া জাতীয় স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইলেন, তখনই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ঘুচিয়া গেল, হিন্দুর হিন্দুত্ব ও মুসলমানের মুসলমানত্বের মধ্যে পুনরায় সংঘাত বাধিয়া উঠিল। এই সংঘাতই নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রের উপলক্ষ্য পাইয়া বর্তমানে পূর্ণ-কলেবর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আজ 'কম্যুনাল এওয়ার্ড' বা সম্প্রাদয়িক ভাগবাঁটোয়ারার ফলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রতন্ত্রে হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের প্রাধান্য বেশি হইতে চলিয়াছে। ইহাতে ১৯০৭ সনে মুসলমান সম্প্রদায় যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, ১৯৩৬ সনে হিন্দুদের অবস্থা ঠিক তাহাই দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে পাইয়াই মুসলমানরা কী শিক্ষায়, কী সাহিত্যে বাঙালি হিন্দুর গৌরবের বস্তু, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট সংস্কৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। এই আশঙ্কা অমূলকও নয়, অন্যায়ও নয়। পক্ষান্তরে

[+] বাল্কান যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের সমস্যার উদাহরণ হিসাবে স্যর জর্জ বুকাননের একটি পত্র হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। স্যর জর্জ লেখেন, "But the position of His Majesty's Government will be a very difficult one Their attitude will be watched with jealous apprehensions both by His Majesty's Mahommedan subjects in India and by the Russian public. The former will expect them to throw the weight of their influence into the scale in favour of their co-religionists in Turkey, while the latter will look to England, as a member of the Triple Entente, to support Russia in advocating the cause of the Balkan Slavs." (Letter dtd. Oct. 12, 1912 to Sir E Grey.) কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এ-ব্যাপারে মুসলমানদের ইচ্ছা পূর্ণ করা সম্ভব মনে করেন নাই। স্যর আর্থার নিকলসন লেখেন, মুসলমানরা তুর্কির সাহায্য করিতে অভিলাষী হইলেও রাষ্ট্রনীতি ও জনমত উভয়ের জন্যই গ্রেট-ব্রিটেনের পক্ষে তাহা করা সম্ভব নয় (which neither public opinion nor our own just policy would justify us in doing.)

সেই সময়ে স্যর আর্থার নিকলসন বড়লাট লর্ড হার্ডিংকেও লেখেন, "I need not say that we have always kept most carefully in view the necessity of us doing as little as possible to arouse

মুসলমানরা যদি বাংলাদেশের সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মুসলিম ছাঁচে ঢালিতে চান তাহাও তাঁহাদের পক্ষে অন্যায় হইবে না। বাইশ শত বৎসর পূর্বে এরিস্টটল্ বলিয়াছিলেন, 'প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষেই তাহার উপযোগী একটা শিক্ষাপদ্ধতি অবশ্য প্রয়োজনীয়।' এই নীতি অনুসরণ করিয়াই জগতের সমস্ত রাষ্ট্র শিক্ষাপদ্ধতিতে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন ও রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন।* রুশিয়ার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সোভিয়েট নীতি ভিন্ন অন্য শিক্ষার স্থান নাই; ইটালিতে ফাশিস্ত শিক্ষা ভিন্ন অন্য শিক্ষা দেওয়া হয় না; জার্মেনিতে নাৎসিগণ তাঁহাদের আদর্শ অনুযায়ী পাঠ্য পুস্তক রচনা করাইতেছেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে আসিলে বাংলাদেশের মুসলমানরাও হয়ত তাহাই করিবেন। হিন্দুরাও যে ইহা না করিতেন তাহা নয়। বর্তমান জগতে 'টোটালিটারিয়ান স্টেট' বা অখণ্ড রাষ্ট্রের আদর্শ যে-ভাবে প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাতে এই ধারা দিনে দিনে আরও বদ্ধমূল হইবে। হিন্দু বা মুসলমান কাহারও পক্ষে ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবার উপায় নাই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে কাহার দিকে কতটুকু ন্যায়, কাহার দিকে কতটুকু অন্যায় সে-বিচার সম্পূর্ণ অবান্তর। স্বীকার করা প্রয়োজন, বাংলাদেশ[1] দ্বি-কেন্দ্র হইয়াছে; বাংলা দেশের হিন্দু ও মুসলমান ভাই হইলেও প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া নিজের নিজের ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাইয়া আপনার পথ ধরিতে চাহিতেছে।

শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৩

উৎস · আমার দেশ আমার শতক, ১৯৯৬

Moslem feeling, as we know very well the effect which would be produced amongst our Musulmans in India I am afraid, however, that careful as we are, an attack by Christian Powers on Turkey will create a good deal of trouble in your dominations, and I dare say we shall be reproached for not having put our foot down and averted the conflict. You know just as well as I do that we are perfectly unable to take such steps"

* এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়ার একজন লেখকের উক্তি সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। ইনি বলিতেছেন,—

"The teacher works in a particular society and for a particular society His activity is directed by the demands of the class or classes which at the moment rule the State. Education is the preparation of future as well as present citizens for social life. Therefore, schools, elementary as well as higher, never were and never will be free from politics as long as the State exists."

[1] এই বাংলাদেশ বর্তমান বাংলাদেশ নয়। ইহা দেশভাগ ও স্বাধীনতা পূর্বের অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রদেশ বাংলা।

# হিন্দুমুসলমান

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল সমাজের ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত এক মহাজাতিকে জাগিয়ে তুলে তার একচ্ছত্র আসন রচনা করব বলে দেশনেতারা পণ করেছেন।

ওই আসন জিনিসটা, অর্থাৎ যাকে বলে কন্‌স্টিট্যুশ্যন, ওটা বাইরের, রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থায় আমাদের পরস্পরের অধিকার-নির্ণয় দিয়ে সেটা গড়েপিটে তুলতে হবে। তার নানা রকমের নমুনা নানা দেশের ইতিহাসে দেখেছি, তারই থেকে যাচাই বাছাই করে প্ল্যান ঠিক করা চলছে। এই ধারণা ছিল, ওটাকে পাকা করে খাড়া করবার বাধা বাইরে, অর্থাৎ বর্তমান কর্তৃপক্ষদের ইচ্ছার মধ্যে। তারই সঙ্গে রফা করবার, তক্‌রার করবার কাজে কিছুকাল থেকে আমরা উঠে পড়ে লেগেছি।

যখন মনে হল কাজ এগিয়েছে, হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে দেখি, মস্ত বাধা নিজেদের মধ্যেই। গাড়িটাকে তীর্থে পৌঁছে দেবার প্রস্তাবে সারথি যদি-বা আধ-রাজি হল ওটাকে আস্তাবল থেকে ঠেলে বের করবার সময় হুঁশ হল, এক্কা গাড়িটার দুই চাকায় বিপরীত রকমের অমিল, চালাতে গেলেই উলটে পড়বার জো হয়।

যে বিরুদ্ধ মানুষটার সঙ্গে আমাদের বাইরের সম্বন্ধ, বিবাদ করে একদিন তাকে হটিয়ে বাহির করে দেওয়া দুঃসাধ্য হলেও নিতান্ত অসাধ্য নয়, সেখানে আমাদের হারজিতের মামলা। কিন্তু ভিতরের লোকের বিবাদে কোনো এক পক্ষ জিতলেও মোটের উপর সেটা হার, আর হারলেও শান্তি নেই। কোনো পক্ষকে বাদ দেবারও জো নেই, আবার দাবিয়ে রাখতে গেলেও উৎপাতকে চিরকাল উত্তেজিত করে রাখাই হবে। ডান পাশের দাঁত বাঁ পাশের দাঁতকে নড়িয়ে দিয়ে যদি বড়াই করতে চায় তবে অবশেষে নিজে অনড় থাকবে না।

এতদিন রাষ্ট্রসভায় বরসজ্জাটার 'পরেই একান্ত মন দিয়েছিলুম, আসনটা কেমন হবে এই কথা ভেবেই মুগ্ধ। ওটা মহামূল্য ও লোভনীয়। প্রতিবেশীরা যারা কিংখাবের আসন বানিয়েছে তাদের আসরের ঘটা দেখে ঈর্ষা হয়। কিন্তু হায় রে, স্বয়ং বরকে বরণ করবার আন্তরিক আয়োজন বহুকাল থেকে ভুলেই আছি। আজ তাই পণ নিয়ে বরযাত্রীদের লড়াই বাধে। শুভকর্মে অশুভ গ্রহের শান্তির কথাটায় প্রথম থেকেই মন দিই নি, কেবল আসনটার মালমশলার ফর্দ নিয়ে বেলা বইয়ে দিয়েছি।

রাষ্ট্রিক মহাসন-নির্মাণের চেয়ে রাষ্ট্রিক মহাজাতি-সৃষ্টির প্রয়োজন আমাদের দেশে অনেক বড়ো, এ কথা বলা বাহুল্য। সমাজে ধর্মে ভাষায় আচারে আমাদের বিভাগের অন্ত নেই। এই বিদীর্ণতা আমাদের রাষ্ট্রিক সম্পূর্ণতার বিরোধী; কিন্তু তার চেয়ে অশুভের কারণ এই যে, এই বিচ্ছেদে আমাদের মনুষ্যত্ব-সাধনার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে; মানুষে মানুষে কাছাকাছি বাস করে তবু কিছুতে মনের মিল হয় না, কাজের যোগ থাকে না, প্রত্যেক পদে মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়, এটা বর্বরতার লক্ষণ। অথচ আমরা যে আত্মশাসনের দাবি করছি সেটা তো বর্বরের প্রাপ্য নয়। যাদের ধর্মে সমাজে প্রথায়, যাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে, এমন একটা মজ্জাগত জোড়-ভাঙানো দুর্যোগ আছে যে তারা কথায় কথায় একখানাকে সাতখানা করে ফেলে, সেই ছত্রভঙ্গের দল ঐকরাষ্ট্রিক সত্তাকে উদ্ভাবিত করবে কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে।

যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে।

ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেছে, যখন কোনো মহাজাতি নবজীবনের প্রেরণায় রাষ্ট্রবিপ্লব প্রবর্তন করেছে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার ধর্মবিদ্বেষ। দেড়শত বৎসর পূর্বকার ফরাসি বিপ্লবে তার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সোভিয়েট রাশিয়া প্রচলিত ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর। সম্প্রতি স্পেনেও এই ধর্মহননের আগুন উদ্দীপ্ত। মেক্সিকোয় বিদ্রোহ বারে বারে রোমক চার্চকে আঘাত করতে উদ্যত।

নব্য তুর্কি যদিও প্রচলিত ধর্মকে উন্‌মূলিত করেনি, কিন্তু বলপূর্বক তার শক্তি হ্রাস করেছে। এর ভিতরকার কথাটা এই যে, বিশেষ ধর্মের আদিপ্রবর্তকগণ দেবতার নামে মানুষকে মেলাবার জন্যে, তাকে লোভ দ্বেষ অহংকার থেকে মুক্তি দেবার জন্যে উপদেশ দিয়েছিলেন। তার পরে সম্প্রদায়ের লোক মহাপুরুষদের বাণীকে সংঘবদ্ধ করে বিকৃত করেছে, সংকীর্ণ করেছে; সেই ধর্ম দিয়ে মানুষকে তারা যেমন ভীষণ মার মেরেছে এমন বিষয়বুদ্ধি দিয়েও নয়; মেরেছে প্রাণে মানে বুদ্ধিতে শক্তিতে, মানুষের মহোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যকে ছারখার করেছে। ধর্মের নামে পুরাতন মেক্সিকোয় স্পেনীয় খ্রিস্টানদের অকথ্য নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই। পৃথিবীতে অপ্রতিহত প্রভুত্ব নিয়ে রাজা যেমন কতবার দুর্দান্ত অরাজকতায় মত্ত হয়েছে, প্রজার রক্ষাকর্তা নাম নিয়ে প্রজার সর্বনাশ করতে কুণ্ঠিত হয়নি, এবং অবশেষে সেই কারণেই আজকের ইতিহাসে রাজা থেকে রাজার কেবলই বিলুপ্তি ঘটছে, ধর্ম সম্বন্ধেও অনেক স্থলে সেই একই কারণে ধর্মতন্ত্রের নিদারুণ অধার্মিকতা দমন করবার জন্যে, মানুষকে ধর্মপীড়া থেকে বাঁচাবার জন্যে অনেকবার চেষ্টা দেখা গেল। আজ সেই সেই দেশেই প্রজা যথার্থ স্বাধীনতা পেয়েছে যে দেশে ধর্মমোহ মানুষের চিত্তকে অভিভূত করে এক-দেশ-বাসীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঔদাসীন্য বা বিরোধকে নানা আকারে ব্যাপ্ত করে না রেখেছে।

হিন্দুসমাজে আচার নিয়েছে ধর্মের নাম। এই কারণে আচারের পার্থক্যে পরস্পরের মধ্যে কঠিন বিচ্ছেদ ঘটায়। মৎস্যাশী বাঙালিকে নিরামিষ প্রদেশের প্রতিবেশী আপন বলে মনে করতে কঠিন বাধা পায়। সাধারণত বাঙালি অন্য প্রদেশে গিয়ে অভ্যস্ত আচারের ব্যতিক্রম উপলক্ষে অবজ্ঞা মনের মধ্যে পোষণ করে। যে চিত্তবৃত্তি বাহ্য আচারকে অত্যন্ত

বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে তার মমত্ববোধ সংকীর্ণ হতে বাধ্য। রাষ্ট্রসম্মিলনীতেও এই অভাব কথায় কথায় ধরা পড়ে এবং দেখা যায়, আমরা যে অলক্ষ্য ব্যবধান সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াই তা সংস্কারগত, অতি সূক্ষ্ম এবং সেইজন্য অতি দুর্লঙ্ঘ্য। আমরা যখন মুখে তাকে অস্বীকার করি তখনও নিজের অগোচরেও সেটা অন্তঃকরণের মধ্যে থেকে যায়। ধর্ম আমাদের মেলাতে পারেনি, বরঞ্চ হাজারখানা বেড়া গড়ে তুলে সেই বাধাগুলোকে ইতিহাসের অতীত শাশ্বত বলে পাকা করে দিয়েছে। ইংরেজ নিজের জাতকে ইংরেজ বলেই পরিচয় দেয়। যদি বলত খ্রিস্টান তা হলে যে ইংরেজ বৌদ্ধ বা মুসলমান বা নাস্তিক তাকে নিয়ে রাষ্ট্রগঠনে মাথা ঠোকাঠুকি বেধে যেত। আমাদের প্রধান পরিচয় হিন্দু বা মুসলমান। এক দলকে বিশেষ পরিচয় কালে বলি বটে হিন্দুস্থানি, কিন্তু তাদের হিন্দুস্থান বাংলার বাইরে।

কয়েক বছর পূর্বে আমার ইংরেজ বন্ধু অ্যান্ড্রুজকে নিয়ে মালাবারে ভ্রমণ করছিলুম। ব্রাহ্মণপল্লির সীমানায় পা বাড়াতেই টিয়া-সমাজ-ভুক্ত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে দৌড় দিলেন। অ্যান্ড্রুজ বিস্মিত হয়ে তাঁকে গিয়ে ধরলেন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে জানলেন, এ পাড়ায় তাঁদের জাতের প্রবেশনিষেধ। বলা বাহুল্য, হিন্দুসমাজবিধি-অনুসারে অ্যান্ড্রুজের আচারবিচার টিয়া-ভদ্রলোকের চেয়ে অনেক গুণে অশাস্ত্রীয়। শাসনকর্তার জাত বলে তাঁর জোর আছে, কিন্তু হিন্দু বলে হিন্দুর কাছে আত্মীয়তার জোর নেই। তার সম্বন্ধে হিন্দুর দেবতা পর্যন্ত জাত বাঁচিয়ে চলেন, স্বয়ং জগন্নাথ পর্যন্ত প্রত্যক্ষদর্শনীয় নন। বৈমাত্র সন্তানও মাতার কোলের অংশ দাবি করতে পারে—ভারতে বিশ্বমাতার কোলে এত ভাগ কেন। অনাত্মীয়তাকে অস্থিমজ্জায় আমরা সংস্কারগত করে রেখেছি, অথচ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাদের আত্মীয়তা না পেলে আমরা বিস্মিত হই। শোনা গিয়েছে, এবার পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও হিন্দুর প্রতি উৎপাতে নমশূদ্ররা নির্দয়ভাবে মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ভাবতে হবে না কি, ওদের দরদ হল না কেন, আত্মীয়তার দায়িত্বে বাধা পড়ল কোথায়।

এই অনাত্মীয়তার অসংখ্য অন্তরাল বহু যুগ ধরে প্রকাশ্যে আমাদের রাষ্ট্রভাগ্যকে ব্যর্থ করেছে এবং আজও ভিতরে ভিতরে আমাদের দুঃখ ঘটাচ্ছে। জোর গলায় যেখানে বলছি আমরা এক, সূক্ষ্ম সুরে সেখানে অন্তর্যামী আমাদের মর্মস্থানে বসে বলছেন, 'ধর্মে-কর্মে আচারে-বিচারে এক হবার মতো ঔদার্য তোমাদের নেই।' এর ফল ফলছে—আর রাগ করছি ফলের উপরে, বীজবপনের উপরে নয়।

যখন বঙ্গবিভাগের সাংঘাতিক প্রস্তাব নিয়ে বাঙালির চিত্ত বিক্ষুব্ধ তখন বাঙালি অগত্যা বয়কট-নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছিল। বাংলার সেই দুর্দিনের সুযোগে বোম্বাই-মিলওয়ালা নির্মমভাবে তাঁদের মুনফার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টাকে প্রতিহত করতে কুণ্ঠিত হননি। সেই সঙ্গে দেখা গেল, বাঙালি মুসলমান সেদিন আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। সেই যুগেই বাংলাদেশে হিন্দুমুসলমানে লজ্জাজনক কুৎসিত কাণ্ডের সূত্রপাত হল। অপরাধটা প্রধানত কোন্ পক্ষের এবং এই উপদ্রব অকস্মাৎ কোথা থেকে উৎসাহ পেলে, সে তর্কে প্রয়োজন নেই। আমাদের চিন্তা করবার বিষয়টা হচ্ছে এই যে, বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলে বাঙালিজাতের মধ্যে যে পঙ্গুতার সৃষ্টি হত সেটা বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের এবং বস্তুত সমস্ত ভারতবর্ষেরই পক্ষে অকল্যাণকর, এটা যথার্থ দরদ দিয়ে বোঝবার মতো একাত্মতা আমাদের নেই বলে সেদিন বাঙালি হিন্দুর বিরুদ্ধে অনাত্মীয়

অসহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্রপ্রতিমার কাঠামো গড়বার সময় এ কথাটা মনে রাখা দরকার। নিজেকে ভোলানোর ছলে বিধাতাকে ভোলাতে পারব না।

এই ব্যাপারে সেদিন অনেকেই রাগারাগি করেছিলেন। কিন্তু ফুটো কলসিতে জল তুলতে গেলে জল যে পড়ে যায়, তা নিয়ে জলের উপরে বা কলসির উপরে চোখ রাঙিয়ে লাভ কী। গরজ আমাদের যতই থাক, ছিদ্রটা স্বভাবত ছিদ্রের মতোই ব্যবহার করবে। কলঙ্ক আমাদেরই আর সে কলঙ্ক যথাসময়ে ধরা পড়বেই, দৈবের কৃপায় লজ্জা-নিবারণ হবে না।

কথা হয়েছে, ভারতবর্ষে একরাষ্ট্রশাসন না হয়ে যুক্তরাষ্ট্রশাসননীতির প্রবর্তন হওয়া চাই। অর্থাৎ একেবারে জোড়ের চিহ্ন থাকবে না এতটা দূর মিলে যাবার মতো ঐক্য আমাদের দেশে নেই, এ কথাটা মেনে নিতে হয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রসমস্যার এ একটা কেজো রকমের নিষ্পত্তি বলে ধরে নেওয়া যাক। কিন্তু তবু একটা কঠিন গ্রন্থি রয়ে গেল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ ও বিরোধ। এই বিচ্ছেদটা নানা কারণে আন্তরিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে রাষ্ট্রনৈতিক প্রলেপ দিয়ে এর ফাটল নিবারণ করা চলবে না; কোনো কারণে একটু তাপ বেড়ে উঠলেই আবার ফাটল ধরবে।

যেখানে নিজেদের মধ্যে সত্যকার ভেদ সেখানেই রাষ্ট্রিক ক্ষমতার হিস্‌সা নিয়ে স্বতন্ত্র কোঠায় স্বতন্ত্র হিসাব চলতে থাকে। সেখানে রাষ্ট্রিক সম্পদে সকলেরই অখণ্ড স্বার্থের কথাটা স্বভাবতই মনে থাকে না। এমন দুর্গ্রহে একই গাড়িকে দুটো ঘোড়া দু দিকে টানবার মুশকিল বাধায়। এখন থেকেই অধিকারের ভাগ-বখরা নিয়ে হট্টগোল জেগেছে। রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়বুদ্ধির যোগে গোল-টেবিল পেরিয়েও এই গোল উত্তরোত্তর বাড়বে বই কমবে এমন আশা আছে কি। বিষয়বুদ্ধির আমলে সহোদর ভাইদের মধ্যেও বচসা বেধে যায়। শেষকালে গুন্ডাদের হাতেই লাঠিসড়কির যোগে যমের দ্বারে চরম নিষ্পত্তির ভার পড়ে।

একদল মুসলমান সম্মিলিত নির্বাচনের বিরুদ্ধে, তাঁরা স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতি দাবি করেন এবং তাঁদের পক্ষের ওজন ভারী করবার জন্যে নানা বিশেষ সুযোগের বাটখারা বাড়িয়ে নিতে চান। যদি মুসলমানদের সবাই বা অধিকাংশ একমত হয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতির দাবি করেন এবং নিজেদের পক্ষের ওজন বাড়িয়ে নিতে চান, তা হলে এমনতরো দাবি মেনে নিয়েও আপোষ করতে মহাত্মাজি রাজি আছেন বলে বোধ হল। তা যদি হয়, তাঁর প্রস্তাব মাথা পেতে নেওয়াই ভালো। কেননা, ভারতবর্ষের তরফে রাষ্ট্রিক যে অধিকার আমাদের জয় করে নিতে হবে তার সুস্পষ্ট মূর্তি এবং সাধনার প্রণালি সমগ্রভাবে তাঁরই মনে আছে। এপর্যন্ত একমাত্র তিনিই সমস্ত ব্যাপারটাকে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে প্রবল বাধার বিরুদ্ধে অগ্রসর করে এনেছেন। কাজ-উদ্ধারের দিকে দৃষ্টি রাখলে শেষ পর্যন্ত তাঁরই হাতে সারথ্যভার দেওয়া সংগত। তবু, একজনের বা এক দলের ব্যক্তিগত সহিষ্ণুতার প্রতি নির্ভর করে এ কথা ভুললে চলবে না যে, অধিকার পরিবেশনে কোনো এক পক্ষের প্রতি যদি পক্ষপাত করা হয় তবে সাধারণ মানবপ্রকৃতিতে সেই অবিচার সইবে না, এই নিয়ে একটা অশান্তি নিয়তই মারমুখো হয়ে থেকে যাবে। বস্তুত এটা পরস্পরের বিবাদ মেটাবার পন্থা নয়। সকলেই যদি এক জোট হয়ে প্রসন্নমনে একঝোঁকা আপোষ করতে রাজি হয় তা হলে ভাবনা নেই। কিন্তু মানুষের মন! তার কোনো-একটা তারে যদি অত্যন্ত বেশি টান পড়ে তবে সুর যায় বিগড়ে, তখন সংগীতের দোহাই পাড়লেও সংগত মাটি হয়। ঠিক জানি না

কী ভাবে মহাত্মাজি এ সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। হয়তো গোল-টেবিল-বৈঠকে আমাদের সম্মিলিত দাবির জোর অক্ষুণ্ণ রাখাই আপাতত সবচেয়ে গুরুতর প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হতে পারে। দুই পক্ষই আপন আপন জিদে সমান অটল হয়ে বসলে কাজ এগোবে না, এ কথা সত্য। এ ক্ষেত্রে এক পক্ষে ত্যাগ স্বীকার করে মিটমাট হয়ে গেলে উপস্থিত রক্ষা হয়। একেই বলে ডিপ্লোম্যাসি। পলিটিক্‌সে প্রথম থেকেই ষোলো-আনা প্রাপ্যের উপর চেপে বসলে ষোলো-আনাই খোয়াতে হয়। যারা অদূরদর্শী কৃপণের মতো অত্যন্ত বেশি টানাটানি না করে আপোষ করতে জানে তারাই জেতে। ইংরেজের এই গুণ আছে, নৌকোডুবি বাঁচাতে গিয়ে অনেকটা মাল ইংরেজ জলে ফেলে দিতে পারে। আমার নিজের বিশ্বাস, বর্তমান আপোষের প্রস্তাবে ইংরেজের কাছে আমরা যে প্রকাণ্ড ক্ষতি-স্বীকার দাবি করছি সেটা য়ুরোপের আর-কোনো জাতির কাছে একেবারেই খাটত না—তারা আগাগোড়াই ঘুষি উঁচিয়ে কথাটা সম্পূর্ণ চাপা দেবার চেষ্টা করত। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে ইংরেজের সুবুদ্ধি বিখ্যাত; ইংরেজ সবখানির দিকে তাকিয়ে অনেকখানি সহ্য করতে পারে। এই বুদ্ধির প্রয়োজন যে আমাদের নেই, এ কথা গোঁয়ারের কথা; আখেরে গোঁয়ারের হার হয়ে থাকে। রাষ্ট্রিক অধিকার সম্বন্ধে একগুঁয়ে ভাবে দর-কষাকষি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে মন-কষাকষিকে অত্যন্ত বেশিদূর এগোতে দেওয়া শত্রুপক্ষের আনন্দবর্ধনের প্রধান উপায়।

আমার বক্তব্য এই যে, উপস্থিত কাজ-উদ্ধারের খাতিরে আপাতত নিজের দাবি খাটো করেও একটা মিটমাট করা সম্ভব হয় তো হোক, কিন্তু তবু আসল কথাটাই বাকি রইল। পলিটিক্‌সের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যেটুকু তালি-দেওয়া মিল হতে পারে সে মিলে আমাদের চিরকালের প্রয়োজন টিকবে না। এমন-কি পলিটিক্‌সেও এ তালিটুকু বরাবর অটুট থাকবে এমন আশা নেই, ওই ফাঁকির জোড়টার কাছে বারে বারেই টান পড়বে। যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব। আমাদের মিলতে হবে সেই গোড়ায়, নইলে কিছুতে কল্যাণ নেই।

এতদিন সেই গোড়ার দিকে একরকমের মিল ছিল। পরস্পরের তফাত মেনেও আমরা পরস্পর কাছাকাছি ছিলুম। সম্প্রদায়ের গণ্ডির উপর ঠোকর খেয়ে পড়তে হত না, সেটা পেরিয়েও মানুষে মানুষে মিলের যথেষ্ট জায়গা ছিল। হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল, দুই পক্ষই আপন ধর্মের অভিমানকে উঁচিয়ে তুলতে লেগেছে। যতদিন আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ সহজ ছিল ততদিন গোঁড়ামি থাকা সত্ত্বেও কোনো হাঙ্গাম বাধেনি। কিন্তু, এক সময়ে যে কারণেই হোক, ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করলে। আমরাও মসজিদের সামনে দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময় কিছু অতিরিক্ত জিদের সঙ্গে ঢাকে কাঠি দিলুম, অপর পক্ষেও কোর্‌বানির উৎসাহ পূর্বের চেয়ে কোমর বেঁধে বাড়িয়ে তুললে, সেটা আপন আপন ধর্মের দাবি মেটাবার খাতির নিয়ে নয়, পরস্পরের ধর্মের অভিমানকে আঘাত দেবার স্পর্ধা নিয়ে। এই-সমস্ত উৎপাতের শুরু হয়েছে শহরে, যেখানে মানুষে মানুষে প্রকৃত মেলামেশা নেই বলেই পরস্পরের প্রতি দরদ থাকে না।

ধর্মমত ও সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে, এ কথা মানতেই হবে। অতএব আমাদের সাধনার বিষয় হচ্ছে, তৎসত্ত্বেও ভালোরকম করে মেলা চাই। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ আমাদের না হলে নয়। কিন্তু এর একান্ত আবশ্যকতার

কথা আমাদের সমস্ত হৃদয়মন দিয়ে আজও ভাবতে আরম্ভ করিনি। একদা খিলাফতের সমর্থন করে মহাত্মাজি মিলনের সেতু নির্মাণ করতে পারবেন মনে করেছিলেন। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। এটা গোড়াকার কথা নয়, এই খেলাফত সম্বন্ধে মতভেদ থাকা অন্যায় মনে করি নে, এমন-কি, মুসলমানদের মধ্যেই যে থাকতে পারে তার প্রমাণ হয়েছে।

নানা উপলক্ষে এবং বিনা উপলক্ষে সর্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ-আলাপ চাই। যদি আমরা পাশাপাশি চলি, কাছাকাছি আসি, তা হলেই দেখতে পাব, মানুষ বলেই মানুষকে আপন বলে মনে করা সহজ। যাদের সঙ্গে মেলামেশা নেই তাদের সম্বন্ধেই মত প্রভৃতির অনৈক্য অত্যন্ত কড়া হয়ে ওঠে, বড়ো হয়ে দেখা দেয়। যখনই পরস্পর কাছাকাছি আনাগোনার চর্চা হতে থাকে তখনই মত পিছিয়ে পড়ে, মানুষ সামনে এগিয়ে আসে। শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষক এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো প্রভেদ অনুভব করিনি এবং সখ্য ও স্নেহসম্বন্ধ-স্থাপনে লেশমাত্র বাধা ঘটেনি। যে-সকল গ্রামের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধ তার মধ্যে মুসলমান গ্রাম আছে। যখন কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা দূত-সহযোগে কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে চলেছে তখন বোলপুর অঞ্চলে মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করা হয়েছিল যে, হিন্দুরা মসজিদ ভেঙে দেবার সংকল্প করছে, এই সঙ্গে কলকাতা থেকে গুন্ডার আমদানিও হয়েছিল। কিন্তু, স্থানীয় মুসলমানদের শান্ত রাখতে আমাদের কোনো কষ্ট পেতে হয়নি, কেননা তারা নিশ্চিত জানত আমরা তাদের অকৃত্রিম বন্ধু।

আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোর্‌বানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত বলে মনে করিনি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে তারা তখনই তা মেনে নিলে। আমাদের সেখানে এ পর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটেনি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন।

এ কথা আশা করাই চলে না যে, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্মকর্মের মতবিশ্বাসের ভেদ একেবারেই ঘুচতে পারে। তবুও মনুষ্যত্বের খাতিরে আশা করতেই হবে আমাদের মধ্যে মিল হবে। পরস্পরকে দূরে না রাখলেই সে মিল আপনিই সহজ হতে পারবে। সঙ্গের দিক থেকে আজকাল হিন্দু-মুসলমান পৃথক হয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে বাড়িয়ে তুলেছে, মনুষ্যত্বের মিলটাকে দিয়েছে চাপা। আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলছি, মুসলমানের ত্রুটিবিচারটা থাক—আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্যে যেন লজ্জা স্বীকার করি। অল্পবয়সে যখন প্রথম জমিদারি সেরেস্তা দেখতে গিয়েছিলুম তখন দেখলুম, আমাদের ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে তক্তপোষে গদিতে বসে দরবার করেন সেখানে এক ধারে জাজিম তোলা, সেই জায়গাটা মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্যে; আর জাজিমের উপর বসে হিন্দু প্রজারা। এইটে দেখে আমার ধিক্কার জন্মেছিল। অথচ এই ম্যানেজার আধুনিক দেশাত্মবোধী দলের। ইংরেজরাজের দরবারে ভারতীয়ের অসম্মান নিয়ে কটুভাষা-ব্যবহার তিনি উপভোগ করে থাকেন, তবু স্বদেশীয়কে ভদ্রোচিত সম্মান দেবার বেলা এত কৃপণ। এই কৃপণতা সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে অনেক দূর পর্যন্ত

প্রবেশ করেছে; অবশেষে এমন হয়েছে যেখানে হিন্দু সেখানে মুসলমানের দ্বার সংকীর্ণ, যেখানে মুসলমান সেখানে হিন্দুর বাধা বিস্তর। এই আন্তরিক বিচ্ছেদ যতদিন থাকবে ততদিন স্বার্থের ভেদ ঘুচবে না এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক পক্ষের কল্যাণভার অপর পক্ষের হাতে দিতে সংকোচ অনিবার্য হয়ে উঠবে। আজ সম্মিলিত নির্বাচন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব বেধে গেছে তার মুল তো এইখানেই। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে যখন আমরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠি তখন এর স্বাভাবিক কারণটার কথা ভেবে দেখি না কেন।

ইতিমধ্যে বাংলা দেশে অকথ্য বর্বরতা বারে বারে আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। জার-শাসনের আমলে এইরকম অত্যাচার রাশিয়ায় প্রায় ঘটত। বর্তমান বিপ্লবপ্রবণ পলিটিক্যাল যুগের পূর্বে আমাদের দেশে এরকম দানবিক কাণ্ড কখনও শোনা যায়নি। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে বহু গৌরবের law and order পদার্থটা বড়ো বড়ো শহরে পুলিস-পাহারার জাগ্রত দৃষ্টির সামনে স্পর্ধাসহকারে উপরি উপরি অবমানিত হতে লাগল ঠিক এই বিশেষ সময়টাতেই। মারের দুঃখ কেবল আমাদের পিঠের উপর দিয়েই গেল না, ওটা প্রবেশ করেছে বুকের ভিতরে। এটা এমন সময়ে ঘটল ঠিক যখন হিন্দু-মুসলমানে কণ্ঠ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারলে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হত, বিশ্বসভার কাছে আমাদের মাথা হেঁট হত না। এইরকমের অমানুষিক ঘটনায় লোকস্মৃতিকে চিরদিনের মতো বিষাক্ত করে তোলে, দেশের ডান হাতে বাঁ হাতে মিল করিয়ে ইতিহাস গড়ে তোলা দুঃসাধ্য হয়। কিন্তু, তাই বলেই তো হাল ছেড়ে দেওয়া চলে না; গ্রন্থি জটিল হয়ে পাকিয়ে উঠেছে বলে ক্রোধের বেগে সেটাকে টানাটানি করে আরও আঁট করে তোলা মূঢ়তা। বর্তমানের ঝাঁজে ভবিষ্যতের বীজটাকে পর্যন্ত অফলা করে ফেলা স্বাজাতিক আত্মহত্যার প্রণালী। নানা আশু ও সুদূর কারণে, অনেক দিনের পুঞ্জিত অপরাধে হিন্দু-মুসলমানের মিলনসমস্যা কঠিন হয়েছে, সেইজন্যেই অবিলম্বে এবং দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তার সমাধানে প্রবৃত্ত হতে হবে। অপ্রসন্ন ভাগ্যের উপর রাগ করে তাকে দ্বিগুণ হন্যে করে তোলা চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো।

বর্তমান রাষ্ট্রিক উদ্‌যোগে বোম্বাই প্রদেশে অন্দোলনের কাজটা সবচেয়ে সবেগে চলতে পেরেছিল তার অন্যতম কারণ, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বাধিয়ে দেবার উপকরণ যথেষ্ট ছিল না। পার্সিতে হিন্দুতে দুই পক্ষ খাড়া করে তোলা সহজ হয়নি। কারণ, পার্সি সমাজ সাধারণত শিক্ষিতসমাজ, স্বদেশের কল্যাণ সম্বন্ধে পার্সিরা বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করতে জানে, তা ছাড়া তাদের মধ্যে ধর্মোন্মত্ততা নেই। বাংলা দেশে আমরা আছি জতুগৃহে, আগুন লাগাতে বেশিক্ষণ লাগে না। বাংলা দেশে পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যখনই নামি ঠিক সেই সময়টাতেই নিজের ঘর সামলানো অসাধ্য হয়ে ওঠে। এই দুর্যোগের কারণটা আমাদের এখানে গভীর করে শিকড় গেড়েছে, একথাটা মেনে নিতেই হবে। এ অবস্থায় শান্তমনে বুদ্ধিপূর্বক পরস্পরের মধ্যে সন্ধি-স্থাপনের উপায় উদ্‌ভাবনে যদি আমরা অক্ষম হই, বাঙালি-প্রকৃতি-সুলভ হৃদয়াবেগের ঝোঁকে যদি কেবলই জেদ জাগিয়ে স্পর্ধা পাকিয়ে তুলি, তা হলে আমাদের দুঃখের অন্ত থাকবে না এবং স্বাজাতিক কল্যাণের পথ একান্ত দুর্গম হয়ে উঠবে।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ চোখ বুজে বলেন, সবই সহজ হয়ে যাবে যখন দেশটাকে নিজের হাতে পাব। অর্থাৎ, নিজের বোঝাকে অবস্থাপরিবর্তনের কাঁধে চাপাতে পারব এই ভরসায় নিশ্চেষ্ট থাকবার এই ছুতো। কথাটা একটু বিচার করে দেখা যাক।

ধরে নেওয়া গেল গোল-বৈঠকের পরে দেশের শাসনভার আমরাই পাব। কিন্তু, দেশটাকে হাত-ফেরাফেরি করবার মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ সন্ধিক্ষণ আছে। সিভিলসার্ভিসের মেয়াদ কিছুকাল টিঁকে থাকতে বাধ্য। কিন্তু, সেইদিনকার সিভিল-সার্ভিস হবে ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো। মন তার গরম হয়ে থাকবার কথা। সেই সময় টুকুর মধ্যে দেশের লোক এবং বিদেশের লোকের কাছে কথাটা দেগে দেগে দেওয়া তার পক্ষে দরকার হবে যে, ব্রিটিশরাজের পাহারা আলগা হবা-মাত্রই অরাজকতার কালসাপ নানা গর্ত থেকে বেরিয়ে চারি দিকেই ফণা তুলে আছে, তাই আমরা স্বদেশের দায়িত্বভার নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাদের আপন লোকদেরকে দিয়েও এ কথা কবুল করিয়ে নেবার ইচ্ছা তার স্বভাবতই হবে যে, আগেকার আমলে অবস্থা ছিল ভালো। সেই যুগান্তরের সময়ে যে যে গুহায় আমাদের আত্মীয়বিদ্বেষের মারগুলো লুকিয়ে আছে সেই সেই খানে খুব করেই খোঁচা খাবে। সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।

উৎস : কালান্তর, শ্রাবণ ১৩৩৮

# ভেদ-বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা ঃ অতীত ও বর্তমান

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্

তখনও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হইনি। বলতে কি সংস্রবেও আসিনি। কৈশোর থেকে যৌবনের পথে পা বাড়িয়েছি মাত্র। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অভিজ্ঞতা স্কুলে বাড়িতে আত্মীয় গুরুজনদের নিকট তাঁদের বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত যাঁরা আসতেন তাঁদের সংস্পর্শে আর বাড়িতে যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের সঙেগ মেলমেশায়। চাষবাসের ও গো-পালনের কাজে ছিলেন দুজন তফশিলি সম্প্রদায়ের, আর কর্মচারী ছিলেন ব্রাহ্মণ। তিনি নিজের পৃথক বাসাতেই থাকতেন। কাজের জন্য দৈনন্দিন আসা-যাওয়া করতেন। তফশিলি যে দুজন ছিলেন, তাঁদের জন্য সকালেই কুলোয় করে দুজনকে আলাদা আলাদা সিধে দিয়ে দেওয়া হত। এই রীতিটাই প্রথম দুই সম্প্রদায়ের পাথর্ক্য ও ব্যবধান সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়। উভয়েরই আমাদের ছেলেদের উপর স্নেহ-মমতা বেশ ছিল। বাড়িতে মুসলমান সম্প্রদায়ের কৃষি কাজের জন্য লোকেরাও ছিলেন। তাঁদের তো রান্নার সমস্যা ছিল না, বাড়িতেই খেতেন। সুতরাং এই পার্থক্যটা শিশুমনেও নজরে পড়ার মতো। এদিকে বাড়িতে আবহাওয়া ছিল অনেক বিষয়ে সুস্থ সংস্কৃতিসম্পন্ন। বাড়ির কর্তারা মেয়ে-পুরুষ উভয়েই ব্যবধানটা ছেলেদের মনে না ঢোকে তার চেষ্টা করতেন। বাড়িতে সিন্ধু মাসি গোয়ালিনি দুধ দিতে আসত এবং মা ও দাদির (ঠাকুরমা) কাছে বসে গল্পসল্প করে যেত। তখন আমার পাঁচ বছর বয়সও হয়নি। আমি মায়ের পিছন দিক থেকে কাঁধে মাথা রেখে মাকে চুপে চুপে জিজ্ঞেস করলাম, "সিন্ধু মাসি কি হিন্দু?" মা বললেন, "চুপ, ও কথা বলতে নেই।" মাসি কাছেই ছিল সেজন্য চুপ করিয়ে দিলেন। মাসি চলে যাবার পর মা-দাদি উভয়েই বোঝালেন, 'মাসি তো মাসিই, অন্য কিছু তুমি শুনো না।'

স্কুলে গিয়ে প্রথম ব্যবধানটা রূঢ় ভাষায় শুনলাম। পরবর্তীকালে আমার যৌবনে শ্রদ্ধেয় ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র কাছে শুনেছিলাম। বৌদ্ধশ্রমণদের 'নেড়ে' বলত, যেহেতু তাঁরা নেড়া থাকতেন। পরে যখন বৌদ্ধরা মুসলমান হলেন, এই আখ্যানটা তাঁদেরও (মুসলমানদের) ভূষণ হল। মুসলমানদের মধ্যেও 'নেড়া' হওয়ার রীতি ছিল। পরে চর্যাপদ থেকে উদ্ধৃতি করে বললেন, "নগর বাহিরে, তুইরে বেদিনি ব্রাহ্মণও নাড়িয়া।" কিন্তু স্কুলে যখন মুসলমানদের উল্লেখ করে কেউ 'নেড়ে' বলেই ফেলত, বলা বাহুল্য তা মিষ্ট সম্ভাষণে হত না। এইভাবে ছোটোবেলা থেকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ব্যাপারে দুটো আলাদা আচরণ আর তার

প্রভাব মনে থাকত। অবশ্য এ কথা বলতে হবে ওইরূপ উক্তি সচরাচর শোনা যেত না, আর সীমিতও ছিল দু-একজন কটুভাষী ছেলেদের মধ্যে। সুতরাং স্কুল সম্বন্ধে সাধারণ অভিজ্ঞতায় মনের ছাপ ভালোই থাকত। ভাব-ভালোবাসায় বিঘ্ন ঘটত খুব কম।

একটা সুবিধে ছিল পুরোনো কালে মানুষ ধর্মের আচার-আচরণ নিয়ে থাকত বটে—নামাজ পড়ত, রোজা রাখত, পূজো-পার্বণ করত, কিন্তু ধর্ম নিয়ে মাতামাতি ছিল না। এই মাতামাতি শুরু হল রাজনীতির পথ ধরে। ইংরেজ খলিফার সাম্রাজ্য দখল করল। এর জন্য রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার তীব্রতার চেয়ে প্রচার হতে লাগল ধর্মীয় উন্মাদনা। গান্ধিজির আশীর্বাদ নিয়ে একটি উক্তি বলা হতে লাগল, "হিন্দু ভালো করে হিন্দু হলে, মুসলমান ভালো করে মুসলমান হলে এক হয়ে যাবে; আর ইংরেজ চাটিবাটি গুটিয়ে চলে যাবে।" কিন্তু গান্ধিজি ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। মানুষের হাতে যা থাকল তা হল ধর্মীয় উন্মাদনা।

এর বিষময় ফল হতে দেরি হল না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হতে লাগল। পত্রিকাগুলির উৎকট সাম্প্রদায়িক প্রচারে কান পাতা যেত না। নজরুল ইসলাম ঠিকই লিখেছিলেন,

"মাতালদের এই ভাঁটিশালায়
নটিনী আজ বীণাপাণি।"

১৯২৬-২৭ পর্যন্ত ঘটনার স্রোত এইরকম। যদিচ উভয় সম্প্রদায়ের সুস্থ মনেও অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগের সুর থেকে যাচ্ছিল, তবু সব মানুষই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল। বেশ কিছু মানুষের মনে সুস্থ চিন্তার অনুসন্ধান চলছিল। কম বয়সের ছেলেদের মনে এই সুস্থ চিন্তার প্রভাব বেশি হল।

একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। বয়স তখন ১৮ বছর হবে। ১৯৩১ সাল। একদিন এক কাজে সমবয়স্ক নিকট আত্মীয়কে নিয়ে মেমারি গেছি। তখন আমরা বাইরে বেরোলেই শিরওয়ানি পরতে অভ্যস্ত ছিলাম। উভয়ের পরিধানেই ওই পোশাক ছিল। মেমারিতে ঘণ্টাখানেক থাকার পর ক্ষুধার উদ্রেক হল। সামনে এক মিষ্টি ও খাবারের দোকানে কিছু খাবার ও মিষ্টির জন্য দাঁড়ালাম। দুজনার হাতে দুই ঠোঙা দিয়ে দোকানদার একটু উঁচু থেকে খাবার ঠোঙা নিক্ষেপ করে দিচ্ছিলেন। আত্মীয়টি বরাবর শহরে থাকেন, খুব অমর্যাদা বোধ করলেন। রুষ্টও হয়ে গেলেন। বললেন, "পয়সা দিয়েছ তো কী হবে, ফেলে দাও, খেতে হবে না।" আমি বললাম, "রেগে লাভ কী, এ বেচারা তো অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ।" দোকান থেকে খাবার নিয়ে সরে আসার পর বললাম, "আমাদের ভাগ্যে তো এই দেশটাই পড়েছে, একেই গড়ে-পিটে নিতে হবে। ফ্রান্স ইংল্যাণ্ডে তো আমাদের জন্ম নয়। সুতরাং ভাবতে হবে কোন্ পথে গেলে আমরা কাজটা করতে পারব। রাগ-অভিমানে কোনো কাজ হবে না।"

এই রকমই কথা বলতে হয়েছিল আমাকে কুমিল্লায়, হাসনাবাদে। তখন বাংলা দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সাম্প্রদায়িকতার বিষের ছড়াছড়ি। অন্যদিকে বাংলা দেশে শান্তিকামী মানুষের শক্তি যে অপরাজেয় তা দেশের মানুষ বার বার দেখিয়ে দিয়েছে। নোয়াখালি-কুমিল্লার কমরেডদের সাহায্য করার জন্য আমরা গিয়েছিলাম সেখানে পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকের নির্দেশে। কলকাতার এক মুসলমান কমরেড এবং আমার খাওয়া-দাওয়ার

ব্যবস্থা হয়েছিল এক ব্রাহ্মণ বাড়িতে। বড়ো পরিবার, গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রী, তিন-চারজন পুত্র এবং পুত্রবধূ ও তাঁদেরও ছেলেপিলে। গৃহকর্তার বড়ো ছেলে আমাদের সঙ্গে এসে দেখা করলেন। বললেন, "বলতে খুব লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু গ্রাম দেশ তো। এখানে আমাদের অনেক কিছু মেনে চলতে হয়, যা না মানাই উচিত। আপনারা যে মুসলমান তা বাড়িশুদ্ধ সবাই জানেন, বাবাও জানেন, কেবল মা জানেন না। তিনি অত্যন্ত গোঁড়া ও রক্ষণশীলা। আপনারা একটু সহযোগিতা করে চেপে গেলে আমাদের খুব সুবিধা হয়।" আমি তখনই সম্মতি প্রকাশ করলাম। কলকাতার কমরেড বললেন, "এটা তো আমি অপমান মনে করি।" আমি বললাম, "তাহলে তো আপনার ভারতে থাকা চলবে না, ইউরোপে যেতে হবে।" আমাদের নিজেদের মিথ্যা পরিচয় দিতে হচ্ছে না, এই যথেষ্ট। দায়িত্ব নিচ্ছেন খোদ গৃহকর্তা, সন্তান ও বধূরা। ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম। তারপর আচারের পার্থক্য টুকিটাকি বুঝিয়ে দিলাম যাতে গৃহকর্ত্রীর কাছে ধরা না পড়ি। বারবার বলে দিলাম, 'গ্লাস ডান হাতে ধরবে।' আমাদের প্রথামতো বাঁহাতে ধরলে শক্‌রি হয়ে যাবে।

মুসলমানদের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির কোনো ব্যাপার ছিল না বটে, তা বলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ভেদাভেদ ছিল না এমন নয়। তথাকথিত উচ্চশ্রেণি এবং সাধারণ শ্রেণির এক পঙ্‌ক্তিতে খাওয়া হত না। অবশ্য দু-একটি পরিবার, যেমন আমাদের পরিবারে এই পঙ্‌ক্তিভেদ চলত না। কিন্তু সে ব্যতিক্রম মাত্র। অসহযোগ আন্দোলনের পর আমাদের ছেলেবেলা থেকে শুরু করে এই পঙ্‌ক্তিভেদ তুলতে হয়েছে। তথাকথিত সাধারণ শ্রেণির যাঁরা, তাঁরাও অসম আচরণ মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। জমিদারি প্রথা এবং সামন্তবাদী বন্ধনের কারণেই টিকে ছিল। প্রজাস্বত্বের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এই সামাজিক বৈষম্য তুলে দেওয়ার আন্দোলনে জোর পেল। একবার আমি এক গ্রামে এক মুসলমান বাড়ির বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। বিবাহ সম্পাদনের অনুষ্ঠানকে "আকদ্" বলে। সামান্য কয়েক মিনিটের অনুষ্ঠান। তার পরেই মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। জমায়েত মানুষের মধ্যে হঠাৎ এক গুঞ্জরণ উঠল। শেষে তা একটি উত্তপ্ত ঝড়ে পরিণত হল। দেখা গেল উত্তাপের কারণ একটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু বৈষম্য। আশরাফ্‌দিগকে অর্থাৎ তথাকথিত উচ্চশ্রেণির লোকদের পরিবারে দেওয়া হচ্ছে মাথাপিছু চারটে করে, আর আতরাফ্‌গণের পরিবারে মাথাপিছু দুটো করে মিষ্টি। সৌভাগ্যবশত অপরাধটা গৃহকর্তার নয়, তিনি যাঁকে ভার দিয়েছিলেন তাঁর। গৃহকর্তা খুব জনপ্রিয় মানুষ তাই তাড়াতাড়ি মিটে গেল। ১৯২৯ সালে 'শবেবরাতের' সময় এক গ্রামে গেছি, এই 'পরবে' হালুয়া-রুটি করা হয় এবং পাড়া-পড়শি বন্ধু-বান্ধবদের ঘরে 'হিস্‌সা' পাঠানো হয়। পুরাতন রেওয়াজ অনুসারে 'হিস্‌সা' বয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়ত সেই পরিবারের অধীন নির্দিষ্ট কিছু পরিবারের উপর। মিঞা সাহেবরা জানতেন না যে সব পরিবার হিস্‌সা বইতেন, তাঁরা ঠিক করেছেন তাঁরা আর হিস্‌সা বইবেন না। কিছু বচসা হল কিন্তু শেষে মেনে নিতে হল। কারণ তথাকথিত উচ্চশ্রেণির অতীতের সেই আধিপত্যের অবস্থা আর ছিল না। নিজেদেরই বইতে হল।

এইরকম বাধ্যতামূলক কাজের রেওয়াজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিন্দু সমাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে হচ্ছিল। আমার জানা একটা গ্রামে পুজোর সময় নিয়ম ছিল বিসর্জনের কালে ঠাকুর বইতে হবে 'ব্যগ্রক্ষত্রিয়' দিগকে অর্থাৎ বাগ্‌দিদিগকে। সেবার তাঁরা অস্বীকার করলেন। তাঁরা বললেন, ঠাকুর যখন সকলেরই পূজ্য, তখন সকলকেই বইতে হবে। অবশ্য শেষে

মিটে গিয়েছিল, একথা আমার মনে আছে কিন্তু সমাধানটা কী হয়েছিল এখন আমার মনে নেই। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দিলাম। উদ্দেশ্য কত ছোটো-খাটো জিনিস নিয়ে আমাদের দেশের সমাজে ব্যবধান ও ভেদাভেদ ছিল বা এখনো হয়তো অনেক জায়গায় আছে তা দেখানো।

এই রকম ভেদাভেদ যে দেশে ছিল এবং এখনও আছে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, বর্ণে বর্ণে এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে, সে দেশ পরাধীন হতে বিলম্ব হবে কেন? কে উপরে কে নীচে এরূপ থাকবন্দির ব্যাপার নিয়ে তখনকার মানুষ নিযুক্ত থাকতেন। আসল কথাটা হল বিচ্ছিন্নতা। ব্রাহ্মণকে তিনি নিজে কিংবা অপরে উচ্চ ভাবতে পারেন কিন্তু সবচেয়ে বড়ো সত্য যে, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় যেমন অন্য বর্ণের সম্প্রদায়ও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। উৎপীড়ক এক সম্প্রদায়ের গায়ে ঘা দিলে, অন্য সম্প্রদায় আতঙ্কিত হতেন কিন্তু সমবেত হয়ে তাঁকে উৎপীড়কের হাত থেকে বাঁচাবার কথা ভাবতেই পারতেন না। এই দুর্বলতাই বিদেশীর অনুপ্রবেশের পথ করে দিয়েছে। তাই এঙেগলস্ বলেছিলেন, "The East fell to the west, because of segregation of man from man"—প্রাচ্য প্রতীচ্যের কাছে অবনত হওয়ার হেতু মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা। বিচ্ছিন্নতার দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথও তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। তাই বলেছিলেন, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছো অপমান/অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।' কিন্তু দুঃখের বিষয় অপমানে সমান হলেও কবি যে চেতনা কাম্য মনে করেছিলেন তা এখনও সম্পূর্ণভাবে হচ্ছে না। প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে ধনতন্ত্র, আর পুরাতন জমিদারি প্রথা ও সামন্তবাদের সঙেগ তার গাঁটবন্ধন। এ দুয়ের ফলে সাম্রাজ্যবাদ আসর জাঁকিয়ে বসেছিল। গরিব যত গরিব হতে লাগল এক অদৃশ্য বন্ধন তাদের মধ্যে মিলন ঘটাতে লাগল। অভাব ছিল তার সচেতনভাবে সংগঠিত হওয়ার। ইউরোপের সঙেগ সংস্রব হওয়ায় প্রথম এসেছিল জাতিবোধ, স্বাধীনতার কামনা এবং তার লক্ষ্য সাধনায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা। কিন্তু ইউরোপে তো শুধু বুর্জোয়াশ্রেণির প্রাদুর্ভাব হয়নি, তার সঙেগ সঙেগই হয়েছিল প্রলেতারিয়েতের উদ্ভব। সুতরাং প্রলেতারিয়েত ও সর্বহারার চিন্তাধারাও ভারতবর্ষে আসতে লাগল। গরিবের ঐক্যের প্রয়াসের সংগঠন শুরু হয়ে গেল। রাশিয়ার বিপ্লবের সংবাদ ভারতে যেন না পৌঁছায় ইংরেজ তার চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ধীরে ধীরে তা প্রবেশ করল। নবচেতনালব্ধ সংগঠিত শক্তি জন্ম নিল, তার প্রসারও হতে লাগল।

এই নবলব্ধ চেতনার প্রসারের প্রতিবন্ধক ছিল শুধু সাম্রাজ্যবাদ তা নয়, দেশের মধ্যেই ছিল শোষকের নিষ্পেষণ। তা আবার নানান থাক্ ও শ্রেণিতে খণ্ডিত। ফলে চেতনাও তেমনি স্বচ্ছতায় বিঘ্নিত। অনেক পশ্চাৎপদ অভ্যেস ও চিন্তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীকে আশ্রয় করে আটকে ছিল। আমরা কল্পনা করতে পারি 'গফুর' হয়তো চটকলের শ্রমিক হয়ে ট্রেড ইউনিয়নের ঝান্ডা নিয়ে জোলুসে বেরিয়েছে আর তার পাশের গাঁয়ের গরিব বামুনের ছেলেরা কী করছে? দু-একজন হয়তো সংগঠক হয়ে জোলুসের সঙেগ স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু যে চিন্তাধারা তাদের আজ উদ্দীপিত করেছে তার খবর হয়তো গ্রামের অন্য মানুষের কাছে পৌঁছায়নি বা পৌঁছালেও আস্থা আনতে পারেনি। এইরূপ চেতনা ও আস্থার সূচনা হতে কয়েক বছর লেগেছে। আর গফুরের কন্যা 'আমিনা' হয়তো 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির' জোলুসের সঙেগ মিলিত হয়ে শহরের পথে বেরিয়েছে। এরূপ

ঘটনা ঘটতে আরও কয়েক বছর লেগেছে। যা এতদিন অচল অনড় ছিল ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ তা সবকে নাড়া দিয়ে পথে বার করল। কেউ মরণমুখে কাতর কণ্ঠে বললে, 'একটু ফেন দাও', আর কেউ জোলুসের সঙ্গে মুষ্টিবদ্ধ দৃঢ় হস্ত তুলে স্লোগানে যোগ দিল, রিলিফ চাই, সস্তাদরে রেশন চাই, জনগণের খাদ্য কমিটির দাবি মানতে হবে। এই পরিণতি এমনি হয়নি, সচেতন অগ্রগামী শক্তিকে সংগঠনে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

এ হল একদিককার ছবি। অন্যদিকে ভেদ-বিভেদের যে ছক সমাজকে বিভক্ত করে রেখেছিল তার সুযোগ নেবার চক্রান্ত করার শক্তির অভাব ছিল না। প্রথম ছিল সাম্রাজ্যবাদ আর তার সংগৃহীত সহায়ক শক্তি, তারপর ছিল ধনিক ও জমিদাররা। তারা একদিকে শ্রমিক-কৃষকের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায় করে নেবার চেষ্টা করত, সমগ্র দেশের স্বার্থের কথা ভাবত না। এদের পশ্চাৎপদ অংশ সহজেই ইংরেজ কর্তৃক ভেদ-বিভেদের চক্রান্ত সৃষ্টির ক্রীড়নক হত। এদের মধ্যে যারা এগিয়েছিল তাদের এগোনটাও বেশি নয়। পশ্চাৎপদ অংশের টানে এদের পিছপা হতে বিলম্ব হত না।

সংস্কৃতির দিক থেকে দেশের পুরাতন আচার-বিচারের অনুগামীদের ফারাক অনেক বেশি। তাদের আচার-বিচারে ভেদ-বিভেদ থাকলেও বিষ ছিল না। আমাদের ছোটোবেলায় গ্রামে সম্পন্ন গৃহস্থ হিন্দু বা মুসলমানের বাড়িতে বিবাহাদি শুভকার্যে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই নিমন্ত্রিত হতেন, কেবল খাওয়া-দাওয়া এবং খাওয়া-দাওয়া সংক্রান্ত সংবর্ধনার ব্যবস্থা ছিল আলাদা। কোনো তিক্ততা ছিল না বা জ্বালা ছিল না। সব পক্ষই বেশ আনন্দের সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন এবং সবকিছু আনন্দেই সম্পাদিত হত।

অবশ্য কখনো কিছু খিঁচ লাগত না এমন বলব না। এক ব্রাহ্মণ কন্যার বিয়েতে আমি এবং আমার এক গুরুজন আত্মীয় নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। এই আত্মীয় ছিলেন সদয় প্রকৃতির এবং দান-খয়রাতি করতেন। তাঁর যে গ্রামে বাড়ি তার নিকটবর্তী কোনো গ্রামের পণ্ডিত মশাইয়ের তিনি ছিলেন শুভার্থী। ছেলেদের লেখাপড়ায় তিনি (আত্মীয়) বরাবর আর্থিক সাহায্য দিয়ে গেছেন। মেয়ের বিবাহেও সাহায্য দিয়েছেন। ছেলেদের মধ্যে একজন আমার সহপাঠী। সেই সূত্রেই বোনের বিবাহে আমি নিমন্ত্রিত। আমার বন্ধুটির অনুরোধে বিবাহ আসরের জন্য সতরঞ্চি, চাদর, বালিশ, জাজিম ইত্যাদি আমাদের বাড়ি থেকে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের দুজনকে বসার জন্য একটি বেঞ্চি দেওয়া হয়েছিল। আমরা সে বেঞ্চিতে বসলাম। কিন্তু পা তো সতরঞ্চিতে ঠেকছিল। ওই সতরঞ্চি পরে গোবর দিয়ে লেপে বরযাত্রীদের খাওয়াবার জায়গা করা হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর গ্রামের একটি সমবয়স্ক ছেলে এসে বলল, 'চলুন আমরা অন্যত্র যাই। এখানে থেকে কী করবেন? আমরা তার নির্দেশমতো তার সঙ্গে গ্রামের এক বৈঠকখানায় গেলাম। আমরা জানি প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আমাদের খাবার ব্যবস্থা আলাদাই হবে। কিন্তু খাবার সময় দেখলাম গ্রামের কিছু জোয়ান ছেলে এবং দু-চারজন বয়স্ক লোক আমাদের সঙ্গে বসে পড়লেন। একটি জোয়ান ছেলে উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'গ্রামের মেয়ের বিয়ে, তা না হলে আজ দেখিয়ে দিতাম।' পরে ব্যাখ্যায় শুনলাম খাবার জায়গার পাশেই বিবাহের আসরের সতরঞ্চি, সেই সতরঞ্চির বিপরীত প্রান্তে আমাদের পা স্পর্শ করেছে। সুতরাং আমাদের সঙ্গে খাওয়ার দোষ হয়ে পড়ছে। এই জন্যই যুবকদের রেগে আমাদের সঙ্গে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা এবং কিছু আত্মীয় গুরুজনদেরও তাতে যোগদান। আমাদের সরাবার সময় আমরা কিন্তু এসব টের পাইনি। লক্ষ করার বিষয় এই, যে ঘটনা

ঘটল এর মধ্যে কোনো তিক্ততা ছিল না, যদিচ আচারনিষ্ঠতা ছিল। যুবকদের রোষ আধুনিক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের একটা কথা মনে পড়ে যায়—"ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে—ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয় আচারে প্রবল, আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্যপক্ষের সেদিকে দ্বাররুদ্ধ।" (হিন্দু-মুসলমান)

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই ধরেছেন। এই দ্বন্দ্ব বরাবরই থেকেছে, এক সম্প্রদায়ের মানুষ আর এক সম্প্রদায়ের স্পর্শকাতরতা কোন বিষয়ে সেটা জানত বলে পরস্পরের সেন্টিমেন্টে যাতে আঘাত না পড়ে নিজেদের আচরণ সেইরূপ নিয়ন্ত্রিত করত। ফলে আর কিছু না হোক অন্তত শান্তিটা বজায় থাকত। ইরান থেকে সুফিরা এসে কাজটা আরও সরল করে দিলেন। এক সম্প্রদায়ের মানুষ মূর্তিপূজা করেন আর এক সম্প্রদায়ের মানুষ এটাকে মহাপাপ বলে মনে করেন। এই দ্বন্দ্ব বিরোধিতাকে এড়াতে তাঁরা আচারকে সরিয়ে মানুষে মানুষে ভালোবাসার বন্ধনকেই তুলে ধরলেন। ভালোবাসার বাণীকেই ঘরে ঘরে নিয়ে যেতে হবে, এই ছিল তাঁদের বক্তব্য। মানুষে মানুষে প্রীতির সম্পর্কের উপরই তাঁরা জোর দিলেন। উপাস্যকে উপাসকের প্রার্থনার মাধ্যম কী হবে তা তাঁরা এড়িয়ে গেলেন। ফলে গোটা মধ্যযুগ ধরে সাহিত্যে ও কাব্যে ভালোবাসার সূত্রই দাঁড়িয়ে গেল। এই যে ধারা শুরু হল প্রদেশে প্রদেশে স্থানীয় ভাষায় তা অভিব্যক্তি পেতে লাগল। মানুষে মানুষে ভালোবাসার প্রধান বাধা, মানুষের উপর মানুষের উৎপীড়ন। সুতরাং সেই উৎপীড়নকে মানুষের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। রামমোহন রায় উদ্ধৃত হাফেজের সে প্রসিদ্ধ উক্তিটি মনে পড়ে—

"মুবাশ্ দর্ পা-এ আজার ও হরচে খাহি কুন্
কে দর্ শরিয়তে মাহীচ্ আজদ গুণানীস্ত"—

অত্যাচারীর অনুসরণকারী হয়ো না, আর যা ইচ্ছা কর, কারণ আমাদের শরিয়তে এছাড়া আর পাপ নাই (হাফেজের জন্ম ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, মৃত্যু চতুর্দশ শতাব্দীতে)। মানুষের প্রতি ভালোবাসার আবেদনে সাদির লেখা অনেক। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব শতকে' এর কিছু অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ হয়েছে। মাত্র দুটি উদ্ধৃতি আমি এখানে দিয়ে যাব।

"তরীক্ত বজুজ্ খিদ্মতে খল্ক্ নীস্ত
ব্তস্বীহ্ ও সজ্জাদা দল্ক্ নীস্ত"—

মানুষের সেবা ছাড়া কোনো সাধন পদ্ধতি নেই, জপমালাতেও নেই, নামাজ পাটিতেও নেই আর রুক্ষ দরবেশি পোশাকেও নেই।)

"বন্ঈ আদম্ আজা-এ এক্দীগর্ অস্ত্
কে দর্ আফরী নাস্ত জা-এ এক্ জওহর অন্দ্
চুঁ আজুয়ে বদর্দ্ আওয়ার্দ্ রোজ্গার্
দীগর্ আজুহারা নামান্দ্ করার্
তু কজ্ মেহনতে দীগরান্ বে-গামী
নেশা'য়েদ কে নামাত নেহান্দ্ আদ্মী।"

[ মানব সন্তান একে অপরের অঙ্গ কারণ সকলের জন্ম একই জড় থেকে (একই আদম্ থেকে)। কোনো একটি অঙ্গে যদি ব্যথাবেদনা হয়, অন্যান্য অঙ্গেও শান্তি থাকে না। তুমি যদি অনেক কষ্ট ও ব্যথাতে দুঃখিত না হও তোমার নাম কোনো মানুষের নেওয়া উচিত নয়। ] এরই সাড়া পড়ে গিয়েছিল বৈষ্ণব সাহিত্যে। ছোট্ট একটি উক্তিতেই মানব-প্রেমের এই আহ্বান এসে পৌঁছেছিল—

"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

এই প্রভাব আমাদের স্থায়ী সম্পদ হয়ে রয়ে গেছে। রামমোহন রায়ের লেখায় সুফিদের একাধিক উক্তি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতেও এইরূপ এই প্রভাবের পরিচয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর পিতার সম্বন্ধে লিখেছেন, "তিনি গ্রামে যাঁরা উচ্চশ্রেণি বলে বিবেচিত তাঁদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি কারণ তাঁর মন হাফেজ, সাদি ও শেক্সপিয়ারে মার্জিত। তিনি গ্রামের এই মানুষদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবেন কীরূপে?"

পরবর্তী যুগে ফারসি ভাষা যতই অজানিত হতে লাগল, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের নিবিড়তা ততই শিথিল ও ক্ষীণ হতে লাগল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশলই ছিল এই। ভেদ-বিভেদের আচার যা দেশে ছিল তাকেই ভিত্তি করে দ্বেষ-বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার এক কাঠামো খাড়া হতে লাগল, যা ইংরেজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার আগে কেউ ভাবতেই পারত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখছেন—"অনেক ইংরেজ গ্রন্থকার, কখনো স্পষ্টাক্ষরে, কখনো ইঙ্গিতক্রমে, অনুক্ষণই বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানেরা যখন দেশে রাজা ছিল, তখন হিন্দুদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার সমস্ত করিয়াছিল। ইংরাজ, গ্রন্থকারেরা এইরূপে হিন্দুদিগের মনোমধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি একটি গূঢ় বিদ্বেষ বীজ বপন করিয়া দিতেছেন। আধুনিক ইংরাজি শিক্ষিত যুবকদিগের হৃদয়ে মুসলমান জাতি এবং মুসলমান ধর্মের প্রতি যতটা বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে, পূর্বকালের পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত, সদাচারসম্পন্ন সদ্‌ব্রাহ্মণদিগেরও মনে তাহার অর্ধাংশ দেখা যাইত না।"—প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত "ভূদেব রচনাসম্ভার" পৃষ্ঠা—১৩।

ভূদেব যখন লিখছেন তখনও ফারসি কাব্যের চর্চা শিক্ষিত হিন্দুর বৈঠকখানায় লুপ্ত হয়নি। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে আরামকেদারায় বসতেন, তার ডানপাশে হাফেজের একখণ্ড কবিতা সংগ্রহ রাখা থাকত।" স্বামী বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্তের বৈঠকখানায় ফারসি কবিতার চর্চা হত। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা জন্মেজয় মিত্রের বাড়িতে ফারসি ও উর্দু কবিতার আলোচনা হত। তাঁর নিজের রচিত উর্দু কবিতার সংকলন পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। হয়তো ফারসি কবিতার প্রচেষ্টাও ছিল, তা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা আমি জানি না। শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে পরস্পরের পরিচয় নিবিড় থাকার ফলে বিষের উদ্গার হয়নি।

ইংরেজের কৌশলের প্রভাব শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে তারা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার আগেই। ভারতচন্দ্রের মানসিংহ কাব্যে 'মানসিংহ' কাব্যটি খুলে দেখলে এর অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। 'মানসিংহ' হতে গোটা চারেক লাইন 'নন্দনে' ইতিপূর্বে প্রকাশিত

প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছিলাম। কবির যা মনোভাব এখানে প্রকাশ হয়েছে তা তখনও দেশের মানুষের মধ্যে গেড়ে বসেনি। কবি লিখছেন—

"যবনেরে কত ভালো ফিরিঙ্গির মত
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত।।
শৌচে আচমন নাহি যাহা পায় খায়
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়।"

আচারকে ধরে শুধু ভিন্ন সম্প্রদায়ের সমালোচনা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিঙ্গিদিগকে তুলে ধরা হচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া ওঠা-বসায় হিন্দুর যে ভেদাভেদ সাম্যের দৃষ্টিতে তার সমালোচনা এক জিনিস কিন্তু ফিরিঙ্গির একসঙ্গে খাওয়া-ওঠা-বসা কত ভালো সেটা দাঁড়ায় অন্য কথা। এইভাবে ফিরিঙ্গি তোষণে জন্মায় সাম্প্রদায়িকতা। আচার বিরোধিতা যা নিয়ে এতদিন কোনো বাক্‌বিতণ্ডা ছিল না। এ বিষয়ে পরস্পরের সমালোচনা সবাই এড়িয়ে যেত, সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করত। এখন যদি ফিরিঙ্গিকে তোষণ করার কাজে এক সম্প্রদায়কে ছোটো করার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহলেই বুঝতে হবে বর্তমানের সাম্প্রদায়িকতার সূচনা এইভাবেই শুরু হয়েছিল। এই সূচনা বাড়তে বাড়তে শাখা-প্রশাখায় অনেকদূর এগিয়ে গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বা সিপাহি বিদ্রোহের সময় কলকাতায় মুসলমানদের মধ্যে সমর্থনসূচক চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজের হয়ে এদের কটু ভাষায় সমালোচনা করলেন এবং এদের এই নিমকহারামি বা বিশ্বস্ততার অভাবের জন্য এদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ইংরেজকে আহ্বান করেন। ইংরেজও মওকা খুঁজছিল। সুতরাং বেশ আনন্দের সঙ্গেই এই বিভেদকে কাজে লাগাতে লাগল। বাংলা দেশে তখন কৃষকদের মধ্যে খুবই বিক্ষোভ এবং মাঝে মাঝে তা কৃষক বিদ্রোহে পরিণত হচ্ছে। এইসব বিক্ষোভ ও বিদ্রোহে যাঁরা অংশগ্রহণ করছেন ও নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের অনেকেই মুসলমান। সুতরাং বাংলা দেশে তখন ইংরেজের রাগ ও সন্দেহ প্রধানত মুসলমানের উপর। চাকরিতে মুসলমানদের নেওয়া হত না। গেজেটে চাকরির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হত কেবল হিন্দুদের দরখাস্তই বিবেচ্য হবে (যেমন উল্টোটা হল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে)। বাংলা দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকে যখন বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনে ভারতবর্ষে আই সি এস পরীক্ষা গ্রহণ করার দাবি উঠল তখন ভারতের বড়োলাট লর্ড নর্থক্লিফ্ ভারত-সচিব লর্ড সল্‌স্‌বারিকে লিখলেন যোগ্য ভারতীয় কর্মচারীদিগকে যদি পদোন্নতি দেওয়া যায় তাহলে ভারতে আই সি এস পরীক্ষার দাবি ইত্যাদি উঠবে না। তখন তাঁর জবাবে লর্ড সল্‌স্‌বারি লিখলেন, "সর্বনাশ, এদের মধ্যে অনেকে মুসলমান এসে যেতে পারে। উচ্চপদে মুসলমানদিগকে অধিষ্ঠিত করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।" এই সময় যেন ইংরেজের সঙ্গে সায় দিয়েই 'যবন' ও নেড়ের উপর কটূক্তি বর্ষণ করে বের হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'। এইভাবে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ সাহিত্যে ভালোভাবে অনুপ্রবেশ করল। বঙ্কিমের লেখায় অনেক কিছু ভালো আছে একথা বলাই বাহুল্য, তিনি আমাদের সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা। কিন্তু ভালো যাই থাকুক এই বিদ্বেষের ভাব স্থায়ীভাবে সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে ভালো কিছু করেননি। ক্ষতিই করেছেন।

এদিকে সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকেই চাকরি বঞ্চিত হীনবল মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষোভ হতে লাগল। বাংলা সাহিত্যে এর নিদর্শন পাওয়া কঠিন। কারণ মুসলমানদের

মধ্যে তখন সাহিত্য অনুশীলন বিশেষ দেখা দেয়নি। মুসলমানদের মধ্যে বেশির ভাগ যা প্রচলিত ছিল, তা সাধারণ 'পুথি', যাতে থাকত অতীতের পীর, পয়গম্বর, সোনাভান বিবি ও রুস্তম পাহ্‌লোয়ানের কাহিনী। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উর্দু সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। প্রথমদিকে এতে সাম্প্রদায়িকতার কিছু ছিল না। আলোচ্য সময়ে সত্তর দশকে এবং আশি দশকে ''শিকওয়া' রূপে সাম্প্রদায়িক বিলাপের এক সুর দেখা দিতে আরম্ভ করল। এতে থাকত মুসলমানদের ভাগ্যহত হওয়ার বর্ণনা এবং অঙ্গুলি সঙ্কেত করা হত অন্য সম্প্রদায়ের উন্নয়নের উপর। হালির কবিতা অবশ্য নিছক আত্মোন্নয়নের আবেদন। এতে দোষ ধরার কিছু নাই, যদি না পরবর্তীকালে এই ধরনের লেখায় একটা তিক্ততা এসে পড়ত (হালির 'শিকওয়ায়ে হিন্দ্' দ্রষ্টব্য)। এরপর এইদিক থেকে সমালোচনা দৃষ্টি পড়ে ইকবালের উপর। তাঁর কিছু কবিতায় দেশের প্রশংসা আছে। সেসব কবিতা ভাষা, রচনা ও ভাবসম্পদ অতি উচ্চস্তরের কিন্তু এই কয়টি বাদ দিলে বাকি যা আছে রিভাইভ্যালিজম্।

সম্প্রদায়কে অগ্রগতির ডাক এবং তার মধ্যে তীব্র জঙ্গি সুর বেশ কিছু অংশে এরই প্রাধান্য। অবশ্য দার্শনিক কবিতাও আছে, কিন্তু তাদের চরিত্র যা পড়াশুনা মানুষের কাছে শুনি 'রিভাইভ্যালিজম্'-এর সঙ্গেই মেলে (এ সম্বন্ধে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইস্‌লামিক্ স্টাডিজ্ ইনস্টিটিউট-এর পত্রিকা দ্রষ্টব্য)। ইকবাল অবশ্য পরিষ্কার বলে দিয়েছেন তাঁর নিবেদন শুধু মুসলমানদের কাছে, তাঁদের কান পর্যন্ত পৌঁছালেই যথেষ্ট 'আওর্ ব্যস্'। অবশ্য উর্দু ভাষায় মার্জিত রিফাইন্‌মেন্টের মান থেকে কোনো বিচ্যুতি হয়নি এবং অন্য সম্প্রদায়কে গালিগালাজের ভাষা নেই। তাহলেও ইসলামের ঝান্ডাকে যে জঙ্গিভাবে তোলা হয়েছে তা মোটেই মেনে নেওয়া যায় না। এ ছাড়া সুলতান মামুদ গজনবিকে পর পর কবিতায় যেভাবে উচ্চমার্গে তোলা হয়েছে তাও সুরুচিতে বাধে।

এদিকে আগেও একবার বলেছি, ১৯২৪ সাল থেকে রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা বেশ জোরদার হয়ে উঠল. এমনকি গান্ধিজিও রাখা ঢাকা না করে পরিষ্কার গো-হত্যার বিরুদ্ধে ঘোষিতভাবে প্রচারে লিপ্ত হলেন। খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম নায়ক মৌলানা মহম্মদ আলিও ধর্মীয় উন্মাদনায় অংশগ্রহণ করতে লাগলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবিয়া, ডাঃ মুঞ্জে প্রমুখ মুসলিম বিদ্বেষে আকাশ-বাতাস ভরে দিলেন। এত কথা বললাম শুধু আবহাওয়াটা স্মরণ করার জন্যে।

এত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও শেষকালে জাতি মোড় ঘুরাতে সক্ষম হল। আবার ইংরেজের বিরুদ্ধে বিপুল উদ্যমে গণ-আন্দোলন শুরু হল। এখানে আর বেশি বিবরণের প্রয়োজন নাই, আমাদের আন্দোলনের অনেক পুস্তকে এসব বিবৃত।

সুখের কথা দেশের অনেক কুসংস্কার ভেঙেছে, পূর্বের চেয়ে অনেক ভেদ-বিভেদ কমেছে, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায়। জরাজীর্ণ কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থায় প্রায় প্রতিটি কংগ্রেসশাসিত রাজ্যে নানান রকম অসন্তোষ জমে উঠেছে, তাকে বিপথে চালিত করার জন্য নানান রকমে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সক্রিয় হয়েছে।

বৈদেশিক শক্তির সহযোগিতায় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা দেশের সীমান্ত অঞ্চলের প্রায় সব রাজ্যেই কিছু না কিছু গণ্ডগোল বাধিয়ে চলেছে। পাঞ্জাবে তারা প্রথমেই কংগ্রেস (আই)

নেতাদের সাহায্যের সুযোগ নিয়ে এক ধাপ দুই ধাপ করে এগোতে লাগল। কত নিরীহ মানুষের প্রাণ গেল এবং এখনও যাচ্ছে। ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট গভর্নমেন্টকে বিপর্যস্ত করার জন্য কংগ্রেস (আই) নানান রকম ছলা-কলা করে, কখনও পর্দার আড়ালে গোপন মন্ত্রণা করে, আবার কখনও সীমান্ত রক্ষায় যথেষ্ট শক্তি নিয়োগ না করে প্রকারান্তরে দেশদ্রোহীদের সমর্থন করেই যাচ্ছে। আসামে যাদের স্বদেশী বলে গ্রহণ করা হয়েছে ব্যবহারিক জগতে তাদেরও বিদেশী বলে আখ্যা দিয়ে প্ররোচনার অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। গবেষকের ভূমিকায় ও ছলনায় কীভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের চররা গোড়া থেকেই বিভেদ ও বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়েছে তা আমরা দেখেছি। একই উদ্দেশ্যে ভিন্ন পোশাকের আচ্ছাদনে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা গুজরাটে কীভাবে ভেদ-বিভেদের বিষ ছড়িয়েছে তাও আমরা দেখছি।

পশ্চিমবাংলায় বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সহায়কেরা থই পাচ্ছে না। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা দাঁত বসাতে পারছে না। 'গোর্খাল্যান্ড ন্যাশানাল লিবারেশন্ ফ্রন্ট'-এর আবির্ভাবে দিল্লির কংগ্রেস (আই) নেতাদের মুখে হাসি ফুটল। কমরেড সরোজ মুখার্জি ঠিকই বলেছেন, "সংবিধানের অষ্টম তফসিলিতে নেপালি ভাষার অন্তর্ভুক্তির দাবিতে ডাঃ বিধান রায়ের আমলে বিধানসভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এরপরে এ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের মধ্য থেকে দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকায় স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়ে রাজ্য বিধানসভায় দু-দুবার সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। গত তিন দশক ধরে যেহেতু কংগ্রেস হাইকম্যান্ড একটানা এসব দাবি অস্বীকার করে আসছেন, কাজেই বিভেদকামী শক্তিকে উৎসাহিত করার সমস্ত দায়-দায়িত্ব বর্তায় কংগ্রেস (আই)-র ওপর। এই বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রকৃত তথ্যকে অস্বীকার করাটা চূড়ান্ত রকমের রাজনৈতিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। সংসদে এ প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য যদি কেউ খতিয়ে দেখেন, তাহলে সহজেই দেখতে পাবেন কংগ্রেস কীভাবে এই প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ত এবং কীভাবে বিভেদকামী শক্তির সঙ্গে তারা আপসের নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করছে।" পশ্চিম-বাংলার জনমতের চাপে কংগ্রেসকে পিছাতে হয়েছে এবং দ্বিধাচিত্ততা ও কুটিল কৌশলের আচ্ছাদন ছেড়ে সোজাসুজি জি এন এল এফ-এর দাবির বিরুদ্ধে বলতে হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্য প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দিয়েছে।

আজ বিশ্বব্যাপী প্রগতিশীল মানুষের ঐক্য বেড়ে চলেছে। শান্তি-যোদ্ধাদের অবিচলিত অভিযান, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিদের ঐক্যবদ্ধ অগ্রগতি সমস্ত দুনিয়ার সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করছে। ভারতের মানুষ আজ এই অগ্রগতির সামনের সারিতে। সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দেশের মধ্যে ভেদ-বিভেদের সব অপপ্রয়াস পরাজিত ও ব্যর্থ হবে।

উৎস : নন্দন, শারদীয়, ১৯৮৭

# বাঙালি মুসলমান ও মুসলিম কালচার

গোপাল হালদার

তীক্ষ্ণবুদ্ধি একটি মুসলমান যুবকের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল, বাঙালি মুসলমান কী করে সংস্কৃতিক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবেন, তা নিয়ে। যুবক বন্ধু ইংরেজ কবি টি. এস. এলিয়টের আলোচনা থেকে আভাস সংগ্রহ করে নিয়ে যা বললেন তা সংক্ষেপে এই ঃ "বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতির উৎস মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারা থেকে উজ্জীবিত হবে। বর্তমান পাশ্চাত্য (বা খ্রিস্টান) সংস্কৃতির প্রাণ যেমন, এলিয়ট বলেছেন, ক্যাথোলিক চার্চ ও ক্যাথোলিক সংস্কৃতি, মুসলমানের সংস্কৃতিরও প্রাণ তেমনি সেই মুসলিম আরবি কালচার।"

এলিয়টের এসব মতবাদ নিয়ে আলোচনা এখানে নিরর্থক। কঠিন বাস্তব ইতিমধ্যেই তাঁর সাধের মুসোলিনি-হিটলারদের প্রতিক্রিয়ামূলক প্রয়াসকে চুকিয়ে দিয়েছে। সমস্ত পাশ্চাত্যদেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি মধ্যযুগের ক্যাথোলিক খাদে ফিরে না গিয়ে বরং এগিয়ে চলেছে; নিজ নিজ খাদেই তা চলেছে; আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ও সংগঠনে বিপুলতর হয়েছে,—বিশ্বসংস্কৃতির সাগরসঙ্গমের দিকে তার গতি। এসব আমরা বুঝি। কিন্তু আমাদের পক্ষে ভেবে দেখা দরকার 'মুসলিম সংস্কৃতি' সম্বন্ধে আমাদের মুসলিম বন্ধুর এই ধারণা। হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই তা সমভাবে বুঝবার জিনিস। অবশ্য এ আলোচনায় হিন্দুদের পক্ষে বাধা আছে। আমাদের জ্ঞানেরও অভাব থাকে, আবার মুসলমানদের দ্বারা ভুল বোঝারও আশঙ্কা থাকে। তবু বিষয়টি হিন্দু-মুসলমান আমাদের সকলেরই আলোচনার যোগ্য; কারণ, এলিয়টের দৃষ্টান্তটা বিশেষ কিছু নয়। মুসলমান বন্ধুর মতবাদের যুক্তি এলিয়ট থেকে সংগহ করা বটে, কিন্তু তাঁর মতবাদের শক্তি আসলে আমদের শিক্ষিত মুসলমান বন্ধুদের এক মনোভাব। সৃষ্টির ক্ষেত্রে এদেশে তাঁরা এখনও অনগ্রসর, তাই তাঁদের মনে একটা আশঙ্কা ও ব্যর্থতাবোধ আছে। তা থেকেই তাঁরা ধাবিত হন এলিয়টের মতোই সুদূর অতীতের উৎসের দিকে—এমনকি, মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমান বা ভারতীয় মুসলমানের সৃষ্টিও ততটা আপনার বা ততটা কার্যকরী 'ঐতিহাসিক ধারা' বলে তাঁদের মনে হয় না। তাঁরা মুসলিম কালচার বলে অর্ধেক কল্পনা ও অর্ধেক সত্য একটি সৃষ্টি-উৎসের দিকে তাকিয়ে থাকেন। 'মুসলিম কালচার' কথাটার অর্থ তাঁরাও হয়তো পরিষ্কার

করে বলেন না, আমরাও পরিষ্কার করে বুঝি না। তাই তার রূপ বোঝা আমাদের ও তাদের সমান দরকার।

## 'মুসলিম কালচার' কি এক?

গোড়াতেই অবশ্যই সংশয় জাগে, 'মুসলিম কালচার', 'খ্রিস্টান কালচার' এসব কথা কতটা ঠিক। সত্যই এসব কথা বড়ো ঝাপসা। 'খ্রিস্টান সভ্যতা'র তো বলতে গেলে খ্রিস্টের সঙ্গেই সম্পর্ক ক্ষীণ; তার গৌণ সম্পর্ক বিভিন্ন চার্চের সঙ্গে ক্যাথোলিক, অ্যাংগ্লিকান্, গ্রিক অর্থোডকস ইত্যাদি। এমনকী প্রাচীন সিরীয় খ্রিস্টান মতবাদ আমাদের দেশে কেরলে এদেশের একটা কেরলি রূপ গ্রহণ করেছে। অথচ 'খ্রিস্টান সিভিলিজেশন' দিয়ে পোপ-ফ্রাংকো-হ্যালিফ্যাক্স্-আর্চবিশপরা সাধারণত বোঝান ইউরোপ-আমেরিকার পাশ্চাত্য সভ্যতা। 'খ্রিস্টান সভ্যতা'র মুখ্য সর্ম্পক সেই পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে। ইসলাম ধর্ম অবশ্য সেরূপ অস্পষ্ট মতবাদ নয়। শিয়া-সুন্নি কলহ আছে; শাফেয়ি-হানাফি তফাৎ আছে; সুফি, দরবেশ, পিরদেরও বিভিন্ন সাধনাপদ্ধতি রয়েছে; নতুন নতুন মতবাদ ও সাধনাধারা এখনো মুসলিম সমাজে জন্মাচ্ছে। তবু মুসলিম ধর্মমত খুব পরিষ্কার, সুস্পষ্ট, তার নড়চড় হওয়াও শক্ত। মুসলিম ধর্মমত অনেকাংশেই অবশ্য একরূপ রয়েছে। কিন্তু কথা হল—মুসলিম কালচার কি তেমনি একরঙা একটা জিনিস? তা হলে 'মুসলিম কালচার'-এর অর্থ শুধু মুসলিম তত্ত্ববিদ্যা, বড়োজোর তার আনুষ্ঠানিক জীবনযাত্রা (রোজা নমাজ প্রভৃতি পাঁচ ইমান)। অনেকে হয়ত বলবেন—হাঁ, তাই। অনেকে বলবেন—না, আরও আছে। সাধারণভাবে 'মুসলিম কালচার' বলতে আমরা বোঝাই মুসলিম-জগতের এই ধর্মমত, জীবনযাত্রা (আচার-অনুষ্ঠান) ও তাঁদের নানা সৃষ্টি (চারুশিল্প, কারুকলা, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি)। কিন্তু চিন, জাভা, মালয় থেকে বোখারা, মরক্কো, ইস্তাম্বুল, আলবেনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত 'মুসলিম জগতে' যে একই জীবনযাত্রা ও সৃষ্টিধারা অব্যাহত নেই, অব্যাহত হয়নি, তা স্পষ্ট। এমন কি খাঁটি আরবেও তা বরাবর এক থাকেনি। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আরব সমাজের ও তখনকার আরব সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলিম ধর্মমতের ছিল প্রাণের যোগ, কিন্তু সেই সপ্তম শতাব্দীর আরব সংস্কৃতি আজ কোথাও অব্যাহত নেই—সৌদি আরবে সেই বিশুদ্ধ ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অনেকটা চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু এ-কালের সভ্যতার বৈজ্ঞানিক দান, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিয়ো, এরোপ্লেন সবই তাদেরও মেনে নিতে হয়। আজ 'কলে কথা কয়', 'মানুষ ওড়ে'—সপ্তম শতাব্দীর ইসলামের দৃষ্টিতে এ যে 'গজবের দিন'।

আসলে, কালগতিতে কালচার বদলায়, ধর্মমতও বদলে যায়। আবার দেশভেদেও কালচার, এমন-কি ধর্মের অনুশাসনও কিছু-না-কিছু বদলায়। সেই প্রথম দিককার খাঁটি ইসলাম যখন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে তখনো ইসলামি আরব সংস্কৃতি এক-এক নতুন দেশে পদার্পণ করেই আবার কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। কালক্রমে সেই পরিবর্তন আরও বেড়ে গেল। দেশকাল ব্যতীত শ্রেণিভেদেও যে কালচার বিভিন্ন হয়, তাও স্মরণীয়। ধর্মমতে ইসলাম সমদর্শী; কিন্তু মুসলমান চাষি ও শোষিত মুসলমান আর শোষণবাদী মুসলমান আমির-ওমরাহের জীবনযাত্রাও এক নয়, উভয়ের কালচারও কোথাও এক নয়।

প্রকাণ্ড 'মুসলিম জগতের' পরস্পরের মধ্যে যে মিল সে মিল প্রধানত এক কালচারের নয়, এক রিলিজিয়নের। সে মিল ইসলামের—ও ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু কিছু নিয়মনীতির।

## রিলিজিয়ন ও কালচার

এই কথাটিই প্রথম বোঝা দরকার—কালচার ও রিলিজিয়ন এক নয়; বরং সম্পর্কিত হলেও দুটি ভিন্ন প্রকৃতির জিনিস। বিভিন্ন অর্থে আমরা কালচার (বা তার অনুবাদে 'সংস্কৃতি') শব্দটি প্রয়োগ করি। কিন্তু কালচার চিরপরিবর্তনীয়, চিরবিকাশশীল। কালচারের প্রকৃতিই হল গতি। জীবিকার তাগিয়ে মানুষ হাতিয়ার তৈরির আর বাক্যরচনার আশ্রয় নিয়ে প্রথম এ পথে নিজেরই অজ্ঞাতে পা বাড়ায়। হাতিয়ার শক্তি বাড়ায় হাতের, আর বাক্‌কৌশল আরো শক্ত করে সামাজিক বন্ধন; প্রকৃতির হাতের পুতুল না থেকে এভাবেই মানুষ করতে থাকে জীবিকার্জন। তারপর সেই সংগ্রামের প্রয়াসের সূত্রে নানা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জীবনযাত্রার নানা স্তর পেরিয়ে সে চলেছে—বন্য অবস্থা থেকে পৌঁছোল সভ্যতার ক্ষেত্রে, সভ্যতার ক্ষেত্রেও কৃষি আর পশুপালনের বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক স্তর পেরিয়ে আজ সে এসে পৌঁছেছে শিল্পপ্রধান সভ্যতার স্তরে। সবখানে অবশ্য সব মানুষ একতালে এগোয়নি—কেউ আজও প্রায় সভ্যতার প্রথম স্তরে, কেউ এখনও কৃষিপশুচারণার স্তরে। কিন্তু শিল্পী-জীবনের ক্ষেত্রেও অনেকেই এসে পৌঁছেছে—আর তারাই দুনিয়ায় প্রধান। অন্যদের জীবনযাত্রার মুখ সেদিকে—প্রত্যেকেরই কালচার বিকাশ-পথে। এই হল তাই কালচারের মূল কথা ঃ কালচার সর্বব্যাপক—তার বনিয়াদ বাস্তবক্ষেত্রে জীবনযাত্রায়; সেই জীবনের তাগিদেই সে আচার-অনুষ্ঠান গড়ে, ভাঙে, বদলায়, সে মানবসম্পদও রচনা করে, বর্জন করে, সৃষ্টি করে। অর্থাৎ কালচার সর্বব্যাপক (all comprehensive), গতিধর্মী (dynamic) এবং সৃষ্টিশীল (creative)।

'রিলিজিয়ন'-এর (যাকে 'ধর্ম' বলা ঠিক সঙ্গত নয়, তবু তা বলেই আমরা কাজ চালাব) প্রকৃতি কিন্তু ভিন্নরূপ। 'রিলিজিয়ন' অবশ্য কালচারের একাংশ। মানুষের জগৎ ও জীবনবোধ হল তার ইডিয়লজি। সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে যে জিজ্ঞাসা মানুষের মনে জাগে, মোটামুটি তারই নাম হল 'রিলিজিয়ন'; খানিকটা তা তার ইডিয়লজির অন্তর্গত, খানিকটা আচারগত। এই উত্তরে থাকে তাই সমসাময়িক জগৎ ও জীবন-চেতনানুযায়ী তত্ত্বাংশ (জ্ঞানকান্ড, creed, theology), থাকে সমসাময়িক শ্রেণি-সমাজের উপযোগী আচার-অনুষ্ঠান (কর্মকাণ্ড, rites, rituals) সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা (অর্থাৎ laws, socio-political ও personal) ইত্যাদি। এ-সবের সহায়ে সমাজের তখনকার মত বিকাশ সুস্থির ও সুচিন্তিত হয়, প্রায়ই তা দেখা যায়।

কিন্তু জগৎ ও জীবন-জিজ্ঞাসা কালে-কালে বদলায়, সঙ্গে সঙ্গে বদলায় সৃষ্টি সম্বন্ধে ধারণা। সভ্যতার এক স্তরে যা নিয়ে মানুষের প্রশ্নের ও বিস্ময়ের সীমা থাকে না, অন্য স্তরে পৌঁছে দেখা গেল তা আর বিস্ময়ের নেই। একদিন জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে

যা জ্ঞান ছিল তাতে মনে করতাম—সূর্যই বুঝি স্রষ্টা, নদী বুঝি দেবী। আবার, পিতৃতান্ত্রিক কোনো কৌমতন্ত্রে হয়তো সকলেই একসময়ে বুঝতেন—স্ত্রীলোক তুচ্ছ পদার্থ, পুরুষের একখানা হাড় দিয়ে সে গড়া; কিংবা, গাছ-লতার বুঝি প্রাণ নেই। সভ্যতার সেরূপ এক স্তরে তাই সূর্যবন্দনাই ধর্ম, নদীপূজাই ধর্ম। স্ত্রীলোকের যখন 'রুহ্' নেই তখন সে 'নাপাক' বলেই গণ্য। তেমনি কোনো স্তরে প্রাণী আঁকা বা রূপায়ণ করা যখন হারাম বলে গণ্য তখনও গাছ-লতা-পাতা আঁকাও ইসলামের পক্ষে নিষিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টার বিষয়ে ধারণা বা 'রিলিজিয়ন' জীবনযাত্রার বা কালচারের এক-একটা স্তরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা; এমনকি, বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক ও মানবীয় পরিবেশের দ্বারাও প্রভাবিত। অবশ্য সভ্যতার সে-স্তর উত্তীর্ণ হলে তার ইডিয়লজি বা জগৎ-ও-জীবনবোধও ক্রমশ বদলে যেতে বাধ্য—কালচারের তাই তাগিদ। কিন্তু 'রিলিজিয়ন' চায় সেই বিশেষ এক স্তরের জগৎ ও জীবনবোধকে চিরন্তন করে রাখতে। কালচারের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার রিলিজিয়ন নামক এই অংশের ঝোঁকটা হল কালচারেরই গতিকে অস্বীকার করে একটা বিশেষ জগৎ-ও-জীবনবোধকে 'শাশ্বত', 'সনাতন', 'ধ্রুব সত্য' বলে আঁকড়ে থাকা। কোনো একটা অতীন্দ্রিয় বা অ-পার্থিব 'সত্যের' নামে রিলিজিয়ন তাই সমসাময়িক কালচারের ধারাকে চায় নিয়ম-কানুন (codification) দিয়ে বাঁধতে।

রিলিজিয়নের লক্ষ্য হল তাই সৃষ্টি নয়, স্থায়িত্ব (conservation); রিলিজিয়ন হল স্থিতিধর্মী (static)। রিলিজিয়ন এই উদ্দেশ্যে জগৎ-চিত্র তৈরি করে, নিয়ম-নীতি রচনা করে, 'কোড' বানায়, সমাজকে সেই বনিয়াদে বেঁধে স্থাণু করতে চায়—যেন কিছুতেই মানুষ 'সনাতন সত্য' থেকে ভ্রষ্ট না হয়। কিন্তু কালচার তার এই প্রয়াসকে অস্বীকার করে এগিয়ে চলে। ফলে এক যুগের রিলিজিয়ন পরবর্তী যুগের কালচারকে চায় বাধা দিতে, ঠেকিয়ে রাখতে। কিন্তু জীবিকা ও জীবন-যাত্রার তাগিদে জগৎ ও জীবন-চেতনা নতুন হয়, কালচার এগিয়ে চলে—খানিকটা হয়তো রিলিজিয়নকে পাশ কাটিয়ে যায়, ফাঁকি দিয়েও চলে। কিন্তু মোটের উপর সমাজ কোনো স্তরে স্থির হয়ে থাকে না। বরং রিলিজিয়নের পক্ষেই তার সেই বাঁধা কোড, বাঁধা জগৎ-চিত্র, বাঁধা জীবনযাত্রা বদলাতে হয় বেশি। নানাভাবে জীবন্তকালের সঙ্গে তাল রেখে রিলিজিয়ন নিজের পুরোনো কথাকে ব্যাখ্যার জোরে টিকিয়ে রাখতে চায়—এভাবেই হাদিস্ তৈরি হয়, এটাই স্মৃতিকারদের কাজ, এতেই তাদের বাহাদুরি—অচল কোডকে ব্যাখ্যার জোরে টেনেবুনে চালিয়ে-বানিয়ে নেয়া। বিশেষ করে যে রিলিজিয়ন যত বেশি স্পষ্ট সে তত বেশিই কোড-বাঁধা জিনিস, তার সঙ্গে কালচারেরও তত বাধে দ্বন্দ্ব। তাই যে-ধর্ম আসলে রিলিজিয়ন নয়;—যেমন হিন্দুধর্ম, মূলত তা ভারত বিকশিত বিবিধ ধারার কালচারের একটা সম্মিলিত নাম—তার এদিকে স্থিতিস্থাপকতা বেশি। কিন্তু তবু তার মধ্যেও যে কতটা গতিবিমুখিতা আছে তা আমরা বেশ জানি।

তাই যা আমাদের স্মরণীয়, তা এই—রিলিজিয়ন ও কালচারের মধ্যে একটা মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে। রিলিজিয়ন অপরিবর্তনীয়, আর কালচার হল বিকাশশীল।

অতএব অস্বীকার করে লাভ নেই, রিলিজিয়ন দিয়ে কোনো কালচারের নামকরণ ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নয়।

যে-অর্থেই কালচার কথাটির প্রয়োগ করি, একটা কথা আমরা দেখতে পাব যে, তা আর্থিক, রাষ্ট্রিক প্রভৃতি বাস্তব পরিবেশের তাগিদে চিরদিনই পরিবর্তমান। আরব দেশের কথাই ধরা যাক। আরবের বিশেষ পরিবেশে ইসলামের উদ্ভব। সেই আরবি সংস্কৃতির ইসলামের প্রেরণায় অভূতপূর্ব বিকাশলাভ করে। শুধু আরবজাতির অভ্যুদয় দিয়েও যদি ইসলামের প্রাণশক্তির বিচার করা যায়, তা হলেও বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ খ্রি) একশো বৎসরের মধ্যে পূর্বে ও পশ্চিমে আরব বিজয়ের ঢেউ যেভাবে সমস্ত রাজা, রাজ্য, সভ্যতাকে ভাসিয়ে দেয়, পৃথিবীতে তার তুলনা কম মিলে। নিশ্চয়ই ইসলাম সপ্তম শতাব্দীতে আরবি কৌমগুলোকে একত্র করে নতুন প্রেরণা দেয়, তার সংগঠন জোগায়, প্রগতির দুয়ার আরব-সমাজের পক্ষে উন্মুক্ত করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে করতে পারে—ইসলামেরও এই উৎপত্তির ও প্রসারেরও যথেষ্ট বাস্তব কারণ সেই সময়কার সেই সমাজের অবস্থাতেই ছিল। অবশ্যই ইসলামের একেশ্বরবাদের উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব পড়েছিল আরবের হানিফদের, সেম-জাতীয় ইহুদিধর্মের, আর তখনকার খ্রিস্টধর্মেরও। কিন্তু ইসলামের বাস্তব পরিবেশও স্মরণীয়। স্মরণীয়—দক্ষিণ-আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ও বিকাশ। তীর্থযাত্রীর ও বাণিজ্যের কেন্দ্র মক্কা ও মদিনার প্রভাব। নিকট-প্রাচ্যে গ্রিক ও রোমক শাসনপদ্ধতির চরম দুর্বলতা; সেই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরব ও অন্যান্য জাতির বিক্ষোভ (আরব-অভ্যুদয়ে তাই এক নিমেষে সেই সাম্রাজ্য গুঁড়িয়ে গেল) ইত্যাদি। তাছাড়া, এই ইসলামের ক্রমরূপায়ণের পক্ষে শা'ম ও ফিলিস্তিনের সঙ্গে মক্কা-মদিনার বাণিজ্যসম্পর্ক; আরব কৌমদের (যেমন কোরেশদের) কৌমি নিয়ম-কানুন, স্বজনবাৎসল্য প্রভৃতিও হজরতের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। আর যুদ্ধবিগ্রহ যখন বাধল তখন উন্নত সামরিক বিদ্যা ও সংগঠন গ্রহণ করতে তিনি একটুও বিলম্ব করেননি—দুর্গ বা কেল্লা গঠন আরবেরাও সেই প্রথম তখন শুরু করে। চিন ও পারস্যের থেকে যুদ্ধে অশ্বারোহী সেনার প্রয়োজন বুঝে তিনি সওয়ার-বাহিনীর উন্নতি করলেন। আর সব থেকে বড়ো তাঁর দান হল—ইসলামিক সংগঠনের জোরে তিনি এই দুর্ধর্ষ বেদুইন দস্যুদের সুশৃঙ্খলিত ও সুগঠিত সৈন্যে পরিণত করতে পারলেন। অর্থাৎ ইসলাম আল্লার নিকট আত্মনিবেদন তাঁর প্রেরণা ছিল, সঙ্গে সঙ্গে he kept his gunpowder dry। [দ্রষ্টব্য : The Material Bases of Islam. The Social Relations of Science—J. G. Crowther.] কিন্তু আমাদের এখানে যা লক্ষণীয় তা এই—এই যে ইসলামের বাস্তব ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ, আরব-অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমেই যেমন বদলে যেতে লাগল তখনকার নতুন দীক্ষিত মুসলিম-সমাজেরও সেই পরিবর্তন মেনে নিতে হল, এমন-কি ইসলামকেও তদনুযায়ী রীতি-নিয়ম ছেঁটে কেটে নিতে হল। মরুভূমির বিজেতা আরবেরা শুধু ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্ম নয়, নানা জাতির সম্পর্কে এল। গ্রিক-রোমক সভ্যতার সমৃদ্ধি ও সুলভ্য পৌর জীবন-যাত্রার সৌন্দর্য দেখতে পেল, শহুরে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজ পেল; এসব শহর ও সভ্যতার মারফত পেল সেদিনের ইরানি ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতারও দান, এমন-কি, পেল ভারতবর্ষেরও শিল্প ও বিজ্ঞানের খোঁজ।

ফলে, মরুভূমির সংগ্রামী ইসলাম তত উগ্র রইল না, অনেকটা পরমতসহিষ্ণু হয়ে উঠল। বিজিত-বৈভব হাতে পেয়ে আরব রাষ্ট্র নতুন পথঘাট, প্রাসাদ প্রস্তুত করতে লাগল; নতুন বিজয়ের উপযোগী রাষ্ট্র ও শাসনপদ্ধতিও (Polity) প্রণয়ন করে চলল। হাদিসের ব্যাখ্যায় ইসলামের এরূপ রূপায়ণ বা রূপান্তর তখনই শুরু হয়ে গেছল—কালচারের তাগিদে রিলিজিয়ন নিজের নিয়ম-কানুনও তখনি সংশোধন করতে থাকে। তবু তো তখন পর্যন্ত (৬৬১ খ্রি—৭৬১ খ্রি) আরবজগতের কেন্দ্র ছিল দামস্কাস্।

৭৬২ থেকে মনসুরের আমলে যখন বোগদাদে আরবীয় রাজধানী স্থাপিত হল তখন তো আরবীয় সভ্যতার আর-এক জীবন আরম্ভ হল। তখন শুরু হয় মুসলমানের বিজ্ঞান-বিজয়। তার অর্থ, ইসলাম-ধর্মাবলম্বী আরবদের-ই বিজ্ঞান-অনুশীলন। আব্বাসি আরবদের এই সভ্যতার নিকট পৃথিবী এত ঋণী, আর সে-ঋণ এতভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, আমরা সকলেই তা ইংরেজি লেখার মারফতেও কিছু কিছু জানি (যেমন, *The Cambridge Medieval History* Vol, II. Chaps. XI—XII; *The Legacy of Islam*, ed. Sir Thomas Arnold, ও Alfred Guillaume; এবং Amir Ali'র *History of the Saracens* প্রভৃতি)। তখন সেখানে ইহুদি, মুশা, আল্লাহ্, ইরানি জ্যোতির্বিদ নওবক্স্ ও ভারতীয় জ্যোতির্বিদ মামকা প্রভৃতি সাদরে সংবর্ধিত হন। রোজা-নমাজের নিয়ম রাখতে গিয়ে, চান্দ্র মাস ও সৌর বৎসরের মধ্যে খাপ খাওয়াতে গিয়ে জ্যোতির্বিদ্যা ও মানমন্দিরের প্রসার আরব-জগতে বাড়ে। রোগ-পীড়া, ব্যাবসা-বাণিজ্য, জমি-জমা, হিসাব-পত্র এ-সব নিতান্ত বাস্তব কারণেই তখন বিজ্ঞানের উন্নতি হয়—য়ুনানির (হেকিমির) ঔষধ, ভেষজ, পীড়া, নিদান, এমন-কি, চক্ষু-বিজ্ঞানের পর্যন্ত চর্চা চলল। অ্যালজেবরা বা বীজগণিত প্রণীত হতে লাগল। জ্যামিতি ত্রিকোণমিতি প্রভৃতির প্রসার হল। আলকেমি বা রসায়নের পরীক্ষা চলল (বিশেষ করে এ বিদ্যার পেছনে স্বর্ণের লোভ ও আয়ুর লোভ Transmutation ও Elixir ছিল বড়ো তাগিদ)। পূর্তবিদ্যায়, স্থাপত্যে, পুর-নির্মাণে সাম্রাজ্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং ঐশ্বর্য ব্যয়িত হতে লাগল। ভূগোল ও ইতিহাসের আদর হল। আর বিস্ময়কর উন্নতি হতে লাগল গণিতের (বোগদাদের প্রধান পন্ডিত আবুল খোয়াবিজিনি ভারতবর্ষ পর্যন্ত ভ্রমণ করে গিয়েছিলেন—ব্রহ্মগুপ্তের সময়ে ৮৩০ খ্রি-র কাছাকাছি)। মুসলিম উত্তরাধিকারের বাঁটোয়ারার সমস্যা আর টাকাকড়ি, জমিজমার মাপজোখ ও ব্যাবসা-বাণিজ্যের হিসাবই ছিল গণিতচর্চার এক প্রধান ব্যাবহারিক কারণ। 'অত্যন্ত কাজের কথা' তাদের ভাবতে হত যেমন, "৩০০ দরহম মূল্যের একটি বাঁদিকে একজন নিজের রোগশয্যায় দান করলে অন্যকে, আরও ১০০ দরহম সে বাঁদির পণ। গ্রহীতার সঙ্গে বাঁদি সহবাস করে; পরে গ্রহীতার পীড়া হলে গ্রহীতা আবার বাঁদিকে দান করলে দাতার নিকটে। দাতাও তার সঙ্গে সহবাস করছে। কিন্তু এই বাঁদির সঙ্গে কত দরহম তখন সেই দাতা ফিরে পাবে, কতটা ফিরে পাবে না?" গণিতের সূত্র কষে দেখা গেল—আরবি আইনে দাতা গ্রহীতাকে দেবে ১০২ দরহম, আর গ্রহীতা দাতাকে ২১ দরহম। [এ-রকম প্রয়োজনের স্বীকৃতি ভাস্করাচার্যের (১২শ খ্রি) গণিতেও পাওয়া যায়। যেমন "দাসীর মূল্য ষোড়শ বর্ষেই সর্বাধিক"। তারপর তার বয়স যেমন বৃদ্ধি পায় তার মূল্য সেই অনুপাতে হ্রাস পায়। ষোড়শ বৎসরে তার মূল্য ছিল ২ বৎসরের ৮টি বলদ,—সঙ্গে সঙ্গে কষতে হয়েছে খাদ্য

ও পারিশ্রমিকের হিসাব; জানা যায় তখন সুদ ছিল শতকরা ২ থেকে ৩½ গুণ হারে। এভাবেই আরব-সভ্যতায় ব্যাবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক, হুন্ডি, চেক প্রভৃতি প্রচলিত হয়, যৌথ কারবার দেখা দেয়। এরূপেই আর্থিক প্রয়োজনে আরব-জগতে বিজ্ঞানানুশীলন এগিয়ে যায়।

রিলিজিয়ন হিসাবেও ইসলামের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, অনেক রিলিজিয়নের মতো এরূপ বিজ্ঞানচর্চায়, বাস্তব জীবনের বিকাশে সমাজকে ইসলাম তখন বাধা দেয়নি। তবু ইসলামও বিজ্ঞানের সর্বব্যাপী বিকাশের সহায়ক তখন হয়নি। আরবীয় কালচার তখনও সেই আরবীয় রিলিজিয়নের থেকে বাধাও পেয়েছে। ইসলামের 'তাবু' (taboo) ছিল শরীর-ব্যবচ্ছেদে, প্রাণী-চিত্রাঙ্কনে বা মূর্তি-নির্মাণে। তাই শারীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞানের গবেষণা আরব সমাজে প্রায় হয়নি। আর চিত্রে, স্থাপত্যে আরব-জগৎ, দরিদ্র হয়ে রইল (ইরানি, তুর্কি, মুঘল শিল্পীরাই মাত্র তসবির ও পট আঁকতে সাহসী হন)। তা ছাড়া, আরব সাম্রাজ্য পূর্বেকার রোমের মতো ক্রমেই ক্রীতদাসের উপর বনিয়াদ স্থাপন করলে, আর ক্রমেই 'সভ্য' আরবদের বিরাগ জন্মাতে লাগল কায়িক পরিশ্রমের উপর, হাতের কাজের উপর। অন্যদিকে একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগ না থাকায় ব্যাবসা-বাণিজ্য ও সৃষ্টিতে উদ্যোগী পুরুষের সমাদর ও স্থান রইল না। এমন-কি মোটের উপর এই কথাটা সত্য যে, সভ্যতার ক্ষেত্রে আরবরা ছিল মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী মাত্র—পূর্ব ও পশ্চিমের সভ্যতার তারা আড়তদারি করেছে, সৃষ্টি বেশি করেনি; সেদিকে তাদের উদ্যোগ ছিল কম।

## মুসলিম জগতে আরবি সভ্যতার প্রভাব

বোগদাদের এই আরব সভ্যতাও অবশ্য নিছক আরবি নয়—কোনো সভ্যতাই তেমন 'নিছক' কোনো জাতির নয় তা মনে রেখে বলতে পারি, আমরা এই বোগদাদি সভ্যতার ভাবনা-কল্পনার এক ছবি দেখতে পাই 'আরব্য উপন্যাস' থেকে। তা ছাড়া নানাদিকে দেখতে পারি, বোগদাদের উপরে প্লেটো বা আফ্লাতুন ও গ্রিকো-রোমক জগৎ, ইরান-ব্যাবিলনের দর্শন ও চিন্তার দান কেমন ভিড় করে আসছিল। মুসলিম আরব-সভ্যতাও যে স্থাণু ছিল না, তা এসব থেকে আমরা বুঝতে পারি।

প্রধানত এই আরবি কালচারই আরবি ভাষার মারফত নানা দেশের মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করে—অবশ্য আরব কালচারের অন্য কেন্দ্র ছিল স্পেনে (কর্দোভা-গ্রানাডা), সিরিয়ায়, মিশরে, এবং পরবর্তীকালে নানা ছোটো-বড়ো কেন্দ্রেও যে তার অন্যান্য রূপ বিকশিত হয়, তা আমরা জানি। এই কথা আমরা বুঝি, ভারতবর্ষের মুসলমানরা এই 'নিছক' আরবি কালচারের উত্তরাধিকার পাননি, ইরানি ও তুর্কি জাতিদের হাতে কিছুটা ইরানি-তুরানি মিশ্রিত হয়ে সেই ইসলামি আরব-সভ্যতা মিশে তরঙ্গের পর তরঙ্গে নানা পরিবর্তিত রূপে ভারতবর্ষে এসেছিল। তারপর এ-দেশের বিবিধ ক্ষেত্রে তা বিবিধ স্থানীয় দানকেও গ্রহণ করেছে, আবার যুগে যুগেও পরিবর্তিত হয়েছে। ভারতীয় মুসলমানদের দরবারি কালচারের রূপটিও ছিল এরূপ আরবি-ইরানি-তুর্কি মিশ্রিত ভারতীয়

রূপ—প্রধানত তা ফার্সি। আর তার লৌকিক রূপ ছিল আরও সহজ, এবং ভারতের প্রত্যেক ভাষা ও প্রদেশের ছাঁচে আরও বেশি ঢালা। তার একদিকে ছিল সুফি ও সাধকদের অধ্যাত্মপ্রভাব, অন্যদিকে জীবনের দশ আনা জুড়েই ছিল গতানুগতিক লোক-জীবনের আচার-নিয়ম-অনুষ্ঠানের চিরাগত ধারা—যাতে পিতৃপূজা হয়ে উঠে স্তূপ-পূজা, আর স্তূপ হয়ে থাকে পিরের দরগা; যাতে সত্যপির আর সত্যনারায়ণ মিলে যান; কালুরায় ও দক্ষিণরায় পূজা পান; মুসলমান এসে দেয় গাছতলায় তেল-সিঁন্দুর, আর হিন্দু এসে নেয় মসজিদের জলপড়া; ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সেখানে লৌকিক হিন্দুধর্মে ও লৌকিক ইসলাম ধর্মে তফাত ছিল কতটুকু?

কিন্তু বহিরাগত মুসলমানের মারফত ভারতীয় সমাজ কি অধ্যাত্ম বা বাস্তব সম্পদ লাভ করে, কিংবা এই বহিরাগত ইসলাম ধর্ম ভারতের প্রান্তে প্রান্তে কি নতুন নতুন রূপ গ্রহণ করল, এখানে তার বিশ্লেষণ বা বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। আমার বক্তব্য শুধু এই—সেই তথাকথিত 'মুসলিম কালচার' স্থান ও কালভেদে নানা দেশে নানারূপে বিকাশ পেয়েছে। আরব জাতিদের মধ্যেও তা পেয়েছে, ভারতীয় জাতিদের মধ্যেও পেয়েছে। আরব জাতিদের মধ্যেও বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে আরবি ভাষার বন্ধনে তাদের একটা সুদৃঢ় বন্ধন ছিল; তাই মোটামুটি বোগদাদ, কায়রো কি সুদূর মরক্কো বা প্রাচীন স্পেনের কালচারকে একই আরবি কালচারের বিভিন্ন শাখা ও বিভিন্ন স্তর বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। মুসলিম জগতের পশ্চিমভাগে মোটামুটি এই আরবিমণ্ডলের ছায়া এখনো অটুট আছে অনেকাংশেই আরবি ভাষার মূলবন্ধনে।

অবশ্য ইসলামের সূত্রে সেই আরবি কালচারের প্রভাব মুসলিম-জগতের অন্যান্য দেশের মুসলমানদের উপরও পড়েছে—ইসলামের সঙ্গে সঙ্গে লেগেছে আরবীয় সভ্যতার ছাপ। তবু বলা উচিত, মুসলিম-ইরানের কালচারই মুসলিম-জগতের মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণাংশে ব্যাপ্ত হয়—সেদিকটা তার ইরানিমণ্ডল। নিশ্চয়ই মুসলিম ইরানের কালচার আরবি কালচার থেকে স্বতন্ত্র—তা ফিরদৌসির পাতা থেকেও বুঝতে পারা যায়; ইরানমণ্ডলের চিত্রকলার ও ললিতকলার বিকাশ থেকেও উপলব্ধি করা যায়; আর 'শিয়া' মতবাদকে কেন্দ্র করে বা সুফিসাধনাকে আশ্রয় করে যে ইরানি সভ্যতা গড়ে উঠে তার থেকেও আমরা বেশ প্রত্যক্ষ করতে পারি। সমস্ত মধ্য-প্রাচ্যের তুর্কিস্থানে তুর্কিজাতিক পাঠান-মুগলদের মধ্যে এই ইরানি ভাষার ও ইরানি কালচারের প্রসারই মধ্যযুগে বাড়ে, তুর্ক আজার-বাইজানের নিজামি এই ভাষাতেই লেখেন তাঁর কাব্য। এই মধ্যপ্রাচ্যকে সে-যুগের কালচারের ইরানিমণ্ডল বললেও তাই অন্যায় হবে না। কিন্তু আরবি ও ইরানি এই দুই মণ্ডলেরই অনেকাংশে বাইরে, তবু যবদ্বীপের, মালয়ের, চিনের মুসলমান-জীবন, তাও স্মরণীয়। বলা বাহুল্য, ইস্তাম্বুলকে কেন্দ্র করে তুর্কিরা আরবি-ছোপানো ইরানি-প্রভাবিত কালচার নিয়ে বহু বৎসরের মত ঘোরপাক খায়। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগে সেই আরবি-ইরানি কালচারের উত্তরাধিকার গিয়ে পড়েছিল 'রুমের' এই তুর্কভাষী ওস্‌মান-আলি খলিফাদের হাতে। এই ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে মধ্যযুগীয় আর্থিক-মানসিক গণ্ডিতে আবদ্ধ সে কালচার স্বভাবতই আধুনিক সভ্যতার সম্মুখে ক্রমেই স্তিমিত হয়ে এল। যা-কিছু তার বিকাশ একালে ঘটে, প্রধানত তা ঘটে আরবিভাষী জগতে—মিশরে এবং আংশিকভাবে সিরিয়ায়। আরবি-ইরানির বিকাশ ঘটে ইরানে, তুর্কিস্থানে, এমন-কি ভারতেও মুগলযুগে।

# আধুনিক মুসলিম সংস্কৃতি

মধ্যযুগ পর্যন্ত সমাজে রিলিজিয়নের প্রাধান্য থাকে। মধ্যযুগ শেষ হয় জাতীয় চেতনা জাগলে। তখন ধর্মগত কালচার ছেড়ে জাতিগত কালচারেরই বিকাশ আরম্ভ হয়। অথচ তুর্কিতে তুর্কের স্বকীয় কালচার এই ধর্মগত কালচারের আওতায়,—সেই ভাব-সংকটে,—তুর্ক জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তুর্করা সৃষ্টি করতে বিশেষ পারেনি—ইসলামের মাধ্যমে তৈরি আরবি-ইরানি ভাব-নিগড়ে তাদের মন তখনও নিবদ্ধ। মধ্যযুগের সেই 'মুসলিম কালচারের' সেই মোহপাশ কাটিয়ে কামালের নতুন তুর্কি আধুনিককালের উপযোগী তুর্ক-কালচারের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করতে আজ চেষ্টা করছে। আধুনিককালের এই স্তরে প্রায় প্রত্যেক মুসলিম জাতিই তার স্ব-স্ব জাতিগত কালচারের বনিয়াদ নতুন করে স্থাপিত করছে—মিশর-মরক্কো থেকে ইরান পর্যন্ত এটাই ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মুসলিম-জগতের মুসলিম কালচারের সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ—সচেতনভাবে জাতির বনিয়াদে আরবি-ইরানি-তুরানি প্রভৃতি জাতির নিজ নিজ নতুন সংস্কৃতি সংগঠনের প্রয়াস।

সে লক্ষণ বেশি প্রস্ফুট হতে পেরেছে মধ্য-এশিয়ার তুর্ক ও ফারসিভাষী জাতিদের সোভিয়েট বিপ্লবের ফলে স্বাধীনতালাভে, আত্মপ্রতিষ্ঠায়। তাতার-উজবেক-কাজাক, আজারবাইজানি এমন-কি তাজিক, তুর্কমেন, কিরঘিজ, দাগিস্তানি প্রভৃতি মুসলমান জাতিরা নিজেদের ভাষার মারফত নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের তখন সুযোগ লাভ করলে; আর নিজ নিজ জাতীয় সংস্কৃতি তারা গড়তে পারলে আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞানের বনিয়াদের উপরে, বিজ্ঞানসম্মত সমাজ-ব্যবস্থার আওতায়। 'মুসলিম কালচারের' সবচেয়ে সম্ভাবনাময় নির্দেশ ও সত্যকার সাক্ষ্য মুসলিম জগৎ দেখতে পায় আজ সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার এসব মুসলমান জাতির জীবন ও এদের বিকাশের ধারা থেকে—সে ইঙ্গিত যে মুসলিম জাতিদের চক্ষে বৃথা হয়নি তারই প্রমাণ দেখছি ইরানের আজারবাইজানি ও মধ্যপ্রাচ্যের কুর্দিস্তানের কুর্দদের বর্তমান জাগরণ থেকে।

রিলিজিয়ন ও কালচারের মুলগত সম্পর্ক ও বিরোধ, মধ্যযুগের বিভিন্ন মুসলিম কেন্দ্রের বিভিন্ন কালচারের সাক্ষ্য, এবং মুসলিম জাতিসমূহের এই বর্তমান গতি-লক্ষণ, এসব দেখে নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারি ভারতবর্ষেও বাঙালি মুসলমানের তাহলে নিজস্ব কালচার কী,—তা আরবীয় কালচারও নয়, উর্দু কালচারও নয়। তা এই বাংলা কালচার—তার মধ্য দিয়েই বাঙালি মুসলমান আপনাকে বিকাশ করতে পারবেন, আর তাকে বিকশিত করে তোলা তাঁরও দায়িত্ব—যেমন দায়িত্ব তা বাঙালি হিন্দুরও।

যে কারণে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম-দেশের সামাজিক অগ্রগতির দৃষ্টান্ত ভারতীয় মুসলমান-বন্ধুদের উদ্‌বুদ্ধ করলেও এ-দেশে তাঁদের কর্মে সে সামাজিক বিপ্লবী শিক্ষা প্রযোজ্য হয়ে ওঠে না, আমি তা বিস্মৃত হইনি। কারণ, ইরানে, তুর্কিস্তানে, মিশরে মুসলিম-ধর্মীরাই প্রায় শতকরা পঁচানব্বই জন; কিন্তু ভারতবর্ষে সাত শত বৎসরেও ইসলাম হিন্দুধর্মীদের সংখ্যা বা প্রভাব খর্ব করতে পারেনি। এখানকার মুসলমান বন্ধুরা সেই আশঙ্কার বশেই,—"ফিয়ার কমপ্লেক্স"-এর প্রভাবে, হিন্দুদের আর্থিক মানসিক প্রভাব-প্রতিপত্তির ভয়ে—ইসলাম বা 'মুসলিম কালচারের' উপর অতটা জোর দেন—নিতান্ত

আত্মরক্ষার দায়ে, আশঙ্কার বশে। এজন্যই তাঁদের সংস্কৃতি-সংকট আরো জটিল হয়ে উঠেছে। তাঁরা একই-কালে মধ্যযুগের আরবীয়-সভ্যতাকে গ্রহণ করতে চান, ইরানি-সভ্যতাকেও গ্রহণ করতে চান, ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রে মুসলমান শাসনে ভারত-সভ্যতা যে বিভিন্ন বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে তাও গ্রহণ করতে চান—আবার সেই সময়েই গ্রহণ করতে চান ইউরোপের বুর্জোয়া জ্ঞানবিজ্ঞান। কিন্তু এ-কথাই বা তাঁরা অস্বীকার করবেন কী করে যে, বাঙালি-মুসলমান বাঙালির কালচারেরই উত্তরাধিকারী, তারই ধারক, তারই বাহক—তারই স্রষ্টা সে ছিল কালও, থাকবে আগামীকালও।

## মুসলমান বাঙালির কালচার

সাতশ বৎসর হল ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশে এসেছে। তখন থেকেই বাংলার ইতিহাসে মধ্যযুগ শুরু হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, বিজয়ীর ধর্ম হিসাবে এলেও বিজয়ী বিদেশীরা সংখ্যায় নিশ্চয় মুষ্টিমেয় ছিলেন। আসলে বাঙালি মুসলমান বাংলাদেশেরই মানুষ; যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তাদের সন্তানসন্ততি। নানা কারণেই বাঙালি জনসাধারণের এক বৃহদংশ এ ধর্ম প্রথমাবধি গ্রহণ করেন। সেসব কারণের কিছু কিছু প্রমাণ আমরা পাই পুরোনো পুঁথিপত্র থেকে, যেমন, শূন্যপুরাণে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'। মোটামুটি বুঝতে পারি—বিজেতার ধর্মের স্বাভাবিক মর্যাদা দরিদ্রদের আকৃষ্ট করেছে; তখনকার হিন্দু অভিজাতদের আধিপত্য ও হিন্দু সমাজের উৎপীড়ন থেকে দরিদ্র নিপীড়িতরা এই রাজধর্ম গ্রহণ করে মুক্তিপথ খুঁজেছেন। বিশেষত, ধর্ম হিসাবে ইসলাম সাম্যের পক্ষপাতী; অন্যদিকে হিন্দুধর্ম বৈষম্য ও অধিকারভেদের উপর গঠিত। কিন্তু তখনকার হিন্দু সামন্ত অভিজাতরা কিছু কিছু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে থাকবেন। তার প্রমাণও আছে। ইসলাম তখন রাজধর্ম-জায়গিরদার, আমির-ওমরাহের ধর্ম; মুসলমান অভিজাতদের সঙ্গে অভিজাতদের হিন্দু শ্রেণিগত মিল ও একত্ব ক্রমেই তাদের পরস্পরের নিকট করে তোলে; ধর্মগত ভেদ এই উভয় জাতির অভিজাতদের পরস্পরের নিকট মোটেই দুস্তর মনে হয়নি।

### মধ্যযুগের বাঙালি শ্রেণি-বিন্যাস

ইসলাম সেদিন মুসলমান মাত্রকেই কতকগুলো খাওয়া-পরার আচার-বিচারের কড়াকড়ি (টোটেম, তাবু) থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং ধর্মের খাস জমায়েতে সকল মুসলমানকে সমতা দিয়েছে। "সব্বই জুঠ জব্বেই খাই" ('কীর্তিলতা') দেখে বিদ্যাপতি নিশ্চয় ঘৃণা বোধ করেন। "এক রুটি পাইলে হাজার মিঞা খায়" এ দৃশ্য দেখতে দেখতে বোধ হয় রূপরাম (১৭শ শতকে) একটু হিংসাই করতেন। কিন্তু ইসলাম সুলতান, জায়গিরদার, আমির-ওমরাহের ধর্ম যতই ধর্মক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানকে সমান দেখুক, বৈষয়িক ব্যাপারে দরিদ্র মুসলমানদের রক্ষার বিশেষ উপায় তা করেনি। তাই জীবনযাত্রায় মুসলমান নিম্নশ্রেণি

হিন্দু নিম্নশ্রেণির মতই নিচের তলায় পড়ে থাকত, মুসলমান অভিজাত যেমন থাকত হিন্দু অভিজাতেরও একধাপ বেশি উপরতলায়।

আর একটা কথাও বোধ হয় সত্য। বাঙালি মুসলমান সমাজে একদিকে ছিল এই সামন্ত অভিজাতরা, অন্যদিকে ছিল এই সাধারণ মুসলমানরা। এদের মধ্যখানে মধ্যবিত্ত মুসলমান বোধ হয় বেশি বিস্তারলাভ করতে পারেনি। হয়ত হিন্দু সমাজের মধ্যে সে তুলনায় মধ্যবিত্তের সংখ্যা ও প্রভাব সে যুগেও বেশি ছিল। কারণ, মুসলিম কোনো কারণে (যেমন রাজকার্যের, বিচার, দপ্তর, ফৌজের ছোটো আমলা হয়ে, ব্যাবসাসূত্রে) মধ্যবিত্তের কোঠায় উঠলে সহজেই অভিজাতের পদবিতেও উঠে যেতে পারত। হিন্দু ছোটো কর্মচারী বা বৃত্তিধারীরা (দোকানি, পসারি ও কবিরাজ, পণ্ডিত, ছোটো মুনশি, কেরানি 'কায়স্থ' প্রভৃতি) অত সহজে সে পর্যায়ে উঠতে পারত না। দ্বিতীয়ত, মুসলমান উত্তরাধিকার আইন ও অনেকাংশে মুসলমানি জীবনযাত্রা পদ্ধতি, আয়েসি মনোভাব ও অভ্যাস সহজেই অবস্থাপন্ন মুসলমান মধ্যবিত্তকে টেনে নিচে নামিয়ে আনত। এই মধ্যবিত্ত মুসলমান যাঁরা থাকতেন, তাঁরাও ফারসি চর্চা করতেন। তাই মধ্যবিত্ত মুসলমানের অভাবেই (মুকুন্দরাম থেকে ভারতচন্দ্র, ঘনরাম থেকে কাশীরাম দাস পর্যন্ত হিন্দুদের মধ্যে যাদের দেখতে পাই) বাঙালি মুসলমানের মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতিতেও প্রাধান্য লাভ না করার একটি বড়ো কারণ।

আসল কথা বাঙালি মুসলমান সমাজেরও মোটামুটি রূপটি ছিল এরূপ—প্রধানত অভিজাত ও জনগণ, শাসক ও শাসিত নিয়েই সে সমাজ। মধ্যযুগের সকল শাসিতের মতো মুসলমান জনগণেরও অত্যাচার সইতেই হত। উপরতলার শাসকরা তো ছিলেনই, এমন-কি, তাঁদের অনুচর ও সহচররাও ছিল। যেমন দেখি, তুরুক সওয়ার "চলল হাট ভমি ফের মাঙগই" ('কীর্তিলতা')—হাটে এসে ঘুরে ঘুরে তোলা তোলে; দরবেশরা 'দোয়া' জানায়, তার বদলে ভেট না পেলেই গাল দিয়ে যায় ('কীর্তিলতা'), ইত্যাদি।

## বাঙালি জীবনযাত্রায় মুসলমানের স্থান

সমাজের আর্থিক কাঠামো তখন এরূপ। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে উৎপাদক হিসাবে শ্রমসাধ্য অনেক কাজেই তখনো সম্ভবত এই মুসলমান জনগণ অগ্রগণ্য ছিলেন। পূর্ববর্তী হিন্দুযুগেও হিন্দু নিম্নবর্ণ বা বৌদ্ধ নিম্নবর্ণ হিসাবে তাঁরাই সমাজের এ ভার বইতেন, মুসলমান আমলেও তাঁরাই সে ভার বহন করতেন। বরং মুসলমানরা কোনো কোনো নতুন কারিগরি কাজ যা প্রচলিত করেন (যেমন দর্জির? সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের?) তাতে এই পরিশ্রমী সাধারণ মুসলমানই (জোলা, রাজমিস্ত্রি, খালাসি, সূচিশিল্পী ইত্যাদি) নিজেদের শ্রম ও দক্ষতার পরিচয় দিতেন। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, অনেক শিল্প ও কারুকার্য আবার হিন্দু (যেমন তাঁতি, কামার, মিস্ত্রি, কাঁসারি, শাঁখারি ইত্যাদি) কারিগরদেরই একচেটিয়া থেকে যায়।

তবু বাস্তব ধনসৃষ্টির ক্ষেত্রে, কৃষি ও কারুশিল্পে, শ্রমসাধ্য কর্মে মুসলমান জনগণ এখন বাংলার জীবনে মুখ্যস্থান জুড়ে আছেন। মধ্যযুগেও সম্ভবত শ্রমসাধ্য কারুশিল্পে তাঁরা

প্রধান ছিলেন। কিন্তু মানস-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সাহিত্য ও চারুশিল্পে বাঙালি হিন্দু যতটা প্রাধান্য অর্জন করেন বাঙালি মুসলমান মধ্যযুগেও ততটা প্রাধান্য অর্জন করতে পারেননি, এরূপই মনে হয়। তার কারণ, তখনকার দিনে মুসলমান জ্ঞানী ও গুণীরা আরবি-ফারসিরই বেশি চর্চা করতেন। আরবির থেকেও ফারসিরই চর্চা বেশি হত; বিশেষ করে ফারসির মারফতই তাঁরা রসিক সমাজে নিজেদের পরিচয় দিতে চাইতেন। কিন্তু এ কথা গুণী ও 'দানেশমন্দ' এবং অভিজাত মুসলমানদের সম্বন্ধেই সত্য। পরবর্তী সময়ে উচ্চশ্রেণির হিন্দুরাও ফারসি চর্চা করতেন, যেমন মালাধর বসু, রূপ সনাতন। তবু তাঁরা যেমন বাংলা লিখতেন তেমনি আলাওল, দৌলত কাজি প্রভৃতিও বাংলা লিখেছেন,—তাও স্মরণীয়। তখন জানি ব্রাহ্মণেও দাড়ি রাখছে, ফারসি পড়ছে, মোজা পায়ে দেয়, কামান ধরে, কেউ বা মস্‌নবিও আবৃত্তি করে (জয়ানন্দ)। অর্থাৎ অভিজাতদের জীবনযাত্রা যেমন আসলে একই ধরনের হয়ে ওঠে, শাসিত ও শোষিতের জীবনযাত্রাও তেমনি আবার একই পল্লিসভ্যতায়, কৃষি-জীবনের কারুকর্মে ব্যাবসায়ে আসলে একই ধরনের হয়ে উঠত। নিশ্চয়ই পির, কাজি, মওলবি, দরবেশদের চেষ্টায় এরূপ সাধারণ মুসলমানও ইসলামের মূলতত্ত্বে খানিকটা অধিগত হতেন; তাঁরা ক্রমেই বেশি করে সে তত্ত্ব অবগতও হচ্ছিলেন। অবশ্য শিক্ষাদীক্ষায় ইসলামের যে ভাষ্য তারা বেশি পেত—হানিফি সুন্নি হলেও, সে ভাষ্য হচ্ছে ইরানি বা ফারসি-ইসলামের ভাষ্য। কিন্তু জীবনযাত্রায়, আগেকার পার্বণের, উৎসবের অনুষ্ঠানের মায়া তাঁরা একবারে কাটাতে পারেননি; এমন-কি মুসলমান অভিজাতরাও তা খানিকটা মানতেন। 'আদর্শ' মুসলমান গ্রামের চিত্র মুকুন্দরাম অঙ্কিত করেছেন, কিন্তু সে হচ্ছে আদর্শ হিন্দু গ্রামের মতই 'আদর্শ'। কারণ, সাধারণ মুসলমান 'অন্‌দিন কোরান পড়ত' না, সকলেই 'বড়ই দানেশমন্দ' যে ছিল তাও না, তা বলাই বাহুল্য। তাঁরাও সাধারণ হিন্দুর মতো ছিলেন নিরক্ষর, অত্যাচারিত; গাইতেন জারি, সারি, ভাসান, কীর্তন প্রভৃতি।

## মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতি

মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতির মোট রূপটা এখন লক্ষ করি। প্রথম কথা, তখনকার বাঙালি সমাজ ছিল কৃষিজীবী, পল্লিসমাজ—ভারতবর্ষের একটি প্রাদেশিক 'কৃষ্টির' অধিকারীমাত্র। (১) স্থাপত্যে তার দান গৌড়-পাণ্ডুয়ার পরে আর মুসলমান রাজশক্তিও বেশি রেখে যাননি। (২) ভাস্কর্যে, চিত্রকলায় মুসলমানি যুগে ইসলামের প্রতিকূলতায় স্বভাবতই রূপ-অনুশীলনে মন্দা দেখা যায়। (৩) সংগীতে-নৃত্যেও (এক বিষ্ণুপুরে ছাড়া) বাংলায় কোনো বৃহৎ কিছু গড়ে ওঠেনি। ইসলামের প্রভাব এদিকে বাঙালি সংগীত ও বাঙালি নৃত্যকলার পক্ষে বাধাই হয়ে থাকত—যদিও লোক-সঙ্গীত ও লোক-নৃত্য লোকসমাজে চলছিল; কীর্তন বৈষ্ণব সমাজে প্রসার লাভ করছিল। (৪) বাংলা সাহিত্যেই আসলে মধ্যযুগের বাঙালি মানসসৃষ্টির বেশি পবিচয় পাওয়া যায়। সেখানে দেখি যে, এ সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানে বেশি পার্থক্য নেই। সাধারণত এই সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে হিন্দুরাই অগ্রণী। কিন্তু লোকসাহিত্যে মুসলমানরা প্রধান, আর আউল-বাউলের অধ্যাত্ম সংগীতেও তাঁদের দান প্রচুর। (৫) জ্ঞান-বিজ্ঞানে অন্য চর্চায় বাঙালি জাত তখনও মুখ্য কিছু করেনি—হিন্দুদের

মধ্যে সংস্কৃতের মারফত ন্যায়ের চর্চা হত, স্মৃতির তর্ক হত, জ্যোতিষ-ব্যাকরণও ছিল। মুসলমানদের মধ্যেও আরবি-ফারসির মারফত কোরান, হাদিস, ধর্মতত্ত্ব, তাদের দর্শন, তাদের ইতিহাস, এ-সবের চর্চা হত। কিন্তু ফারসি সভ্যতার ঐতিহ্য নিয়েই যা কিছু চর্চা হত, আরব সভ্যতার সেই বিজ্ঞানানুশীলনের ঐতিহ্য কিংবা ভূগোলের, ইতিহাসের জ্ঞানসংগ্রহের চেষ্টা বাংলাদেশে তখন কতটা বা কোথায় ছিল?

## মধ্যযুগের বাংলায় মুসলমানের দান

মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতির প্রধানতম সৃষ্টি পাই সে-যুগের বাংলা সাহিত্যে। তার প্রধান ক্ষেত্র ছিল তিনটি : (১) স্বভাবতই সে-যুগে ফারসিনবিশ ও ফারসি কলাকৌশল ফারসি-জানা গুণীজনদের আদরণীয় হত। দরবারেও এ সবেরই ছিল প্রসার। কিন্তু মুসলমান দরবারি কেন্দ্র থেকে বাংলা অনেক দূর; দিল্লি, জৌনপুরের হাওয়াও এখানে অনেক দেরিতে পৌঁছত। বাংলার সুলতান আমির ওমরাহদেরও তাই বাঙালি বনে যেতে হত। তাই গৌড়ের দরবারে, রোসাঙ্গের রাজসভায়, লস্কর পরাগল খাঁর বৈঠকে মুসলমান শাসকও এ দেশের মহাভারত, রামায়ণ ও নানা পুরাণ ইতিহাসের চর্চায় উৎসাহ দিতেন। হিন্দু গুণীরা তাতে যোগ দিলেন, মুসলমান গুণীরাও তা উপেক্ষা করলেন না। অবশ্য দু'-এক জনই তেমন গুণী ও দরবারি লোক বাংলা ভাষারও এরূপ চর্চা করেছেন, যেমন দৌলত কাজি, আলাওল, সৈয়দ সুলতান, মোহম্মদ খান ইত্যাদি। তাঁদের কল্পনা ফারসি জিন-পরিদেরও ক্রমে ক্রমে এ দেশের দেবদেবীর মত স্বচ্ছন্দ করে তুলল। এঁরা বাংলা সাহিত্যের নমস্য লোক। এঁদের কাব্য মধ্যযুগের কাব্যের সুরে বাঁধা—হিন্দু বা মুসলমানি বলে বিশেষ আখ্যা সে মধ্যযুগের কাব্যকে দেওয়া নিরর্থক। তেমনি এই দরবারি সাহিত্যসেবীদের ছাড়াও নানা অদ্ভুত বীরত্ব ও রোমান্সকে কেন্দ্র করে চলে পুঁথি-সাহিত্য। ক্রমশই তাও বড়ো হয়েছে। (২) দ্বিতীয়ত, কবিসাধকদেরও সৃষ্ট একটা কাব্যধারা ছিল। তাঁরা সুফিবাদ থেকে প্রেরণা নিচ্ছিলেন। আরবি-ফারসি-সুফি কবিতার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকার কথা। আবার অনেকের যে এ-দেশীয় রহস্যবাদের (শৈব ও বৈষ্ণবতন্ত্র সহজিয়া) ও যোগরহস্যের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা ছিল তাও স্পষ্ট। যেমন, সৈয়দ মুর্তজা, আলি রাজা প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত মনে রাখতে পারি—মধ্যযুগেই ইউরোপ-এশিয়ার বহু দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষরা পৃথিবীর অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে স্বভাবতই এই আধ্যাত্মিক পথে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সন্ধান করতেন। সেদিনের বাস্তব দুঃখের বিরুদ্ধে এই ছিল মানব-চিত্তের একমাত্র পরিচিত ও স্বাভাবিক প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পথ। খ্রিস্টান মিস্টিক, মুসলমান সুফি আর ভারতের নানক, কবির থেকে বৈষ্ণব আউল, বাউল দরবেশ প্রভৃতি সকলে আসলে সমস্ত মধ্যযুগের ভেতরকার বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ। এঁরা প্রত্যেক 'অর্থোডক্স্' রিলিজিয়ন-এরই বিরুদ্ধেও বিদ্রোহী—আধ্যাত্মিকতার কারণেই। সুফিবাদ সেই ইসলাম-বিদ্রোহী মানুষেরই দান। তাঁদের এই ইরানি-হিন্দি ধারা এসে মেশে এ-দেশের পুরোনো সহজিয়া (বৌদ্ধ, শাক্ত ও বৈষ্ণব) ঐতিহ্যের সঙ্গে। বাংলার মধ্যযুগের কবিতায় একটি প্রধান দানই এঁদের—আর এঁদেরও অনেকেই মুসলমান, লালন শাহ থেকে মদন বাউল

পর্যন্ত। মধ্যযুগের এই কবি-সাধকদের ধারায়ও হিন্দু-মুসলমান ভেদ করতে যাওয়া অসম্ভব। (৩) এ ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের একটি ক্ষেত্র ছিল লৌকিক গান, কবিতা, ছড়া। বলা বাহুল্য, এই হিন্দু-মুসলমান জনগণ লৌকিক জীবনযাত্রায় এতই অভিন্ন ছিলেন যে, এসব ব্যালাড, বা সারি, জারি, ভাটিয়ালি প্রভৃতি রচনার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান বলে কোনো তফাত করা যায় না। বরং যতদূর মনে হয়—জনসাধারণ যখন প্রধানত মুসলমানই ছিলেন (হঠাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাংলায় মুসলমান সংখ্যায় বেড়ে যায়নি নিশ্চয়ই) তখন এই লোক-কাব্য, লোক-সংগীত ও লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই তাঁদেরই হাত থাকত বেশি—এখনও তাই আছে অনেকখানে, অনেক দিকে।

## মধ্যযুগের ত্রিধারা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি হিন্দু মুসলমানের দানে মোটামুটি যে রূপ গ্রহণ করেছিল এবার তা স্মরণ করতে পারি ঃ (১) হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সৃষ্টিতে বাঙালি সংস্কৃতি গঠিত, বিকশিত; মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতির প্রধানাংশ তাই যৌথ সৃষ্টি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এরই দুটি গৌণ ধারাও আছে; (২) যেমন, একদিকে "মুসলিম ঐতিহ্যের" ধারা। কোরান ও হাদিস নিয়ে এবং আরবি-ইরানি-তুরানি প্রভৃতি মিশ্রিত ধর্মকাহিনি নিয়ে এই ঐতিহ্য। তবে বিশেষ করে ইসলাম, শরিয়ত তার আচার-বিচার সম্পর্কিত কথাই তাতে প্রধান। (৩) আবার যৌথ সংস্কৃতির অন্যপার্শ্বে তেমনি ছিল "হিন্দু ঐতিহ্যের ধারা"ও। হিন্দু দর্শন, পুরাণ, আচার-বিচার প্রভৃতি নিয়ে এই ঐতিহ্য গঠিত। কিন্তু প্রধান কথা এই ঃ মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতির প্রধান ও প্রশস্ত কোঠাটি সমস্ত বাঙালির যৌথ সৃষ্টি; তার বনিয়াদ সমস্ত বাঙালি জনতার যৌথ-জীবন।

বাংলার এই মধ্যযুগ শেষ হয়ে গেল ইংরেজ-বিজয়ে; সঙ্গে সঙ্গে এই বাঙালি সংস্কৃতিরও প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। এই যৌথ-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার যা, তা অবজ্ঞাত হল; বৃদ্ধি পেল আপাতদৃষ্টিতে শুধুমাত্র হিন্দু ঐতিহ্যের সংকীর্ণ ধারা। আসলে বিচার করলে দেখব, তাও সত্যই বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু তার পূর্বে বুঝা দরকার—ইংরেজ-বিষয়ে ও ইংরেজ-শাসনের সময়ে বাংলার সমাজযাত্রায় কী পরিবর্তন ঘটল। তাই আধুনিক বাঙালি কালচারের জন্ম-বিচার। এখানে সংক্ষেপে তার জন্মপত্রিকার চিত্রটুকু দিলেই যথেষ্ট হবে।

## ইংরেজ শাসন ও মুসলমান বিক্ষোভ

প্রথমত, নবাবি আমল যখন শেষ হয়ে গেল তখন মুসলমান-মাত্রই আহত হয়েছেন ও ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পোষণ করেছেন। সে-ক্ষোভের বৈষয়িক কারণও ছিল; নবাবি আমলের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান অভিজাতের এক বৃহদংশের সৌভাগ্য শেষ হল; মুসলমান কাজী-মোল্লা প্রভৃতি ধর্ম-নেতাদেরও প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হল। ১৭৯৩ সালে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সুস্থির হল তখন পুরোনো মুসলমান অভিজাত প্রায় দেউলে হয়ে গেল। হিন্দু

দেওয়ান-মুনশিরা তখন নতুন জমিদার হয়ে বসলেন। ১৮৩৩ (?) সালে আয়মা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ঐতিহ্যের ভার বহন করবার মতো বৈষয়িক বনিয়াদ আর মুসলমান সমাজের রইল না। ভাগ্যবানদের এই ভাগ্য-বিপর্যয়ে মুসলমান জনগণও এই সব কারণে ক্ষুব্ধ হল। অবশ্য মধ্যযুগের জমিদার-জায়গিরদারের হাতে বিশেষ কোনো সুবিধাই তারা পায়নি; তবু নবাবি আমলকে তারা কোম্পানির আমলের থেকে নিজেদের বেশি আপনার বলে ভাবতে লাগল। যতই কোম্পানির শোষণ বাড়ল—আর 'নবাবি আমল' অতীত হয়ে গেল—আর ইংরেজের কৃপায় হিন্দুর সৌভাগ্য বাড়ল, ততই এই নবাবি আমলের সম্বন্ধে মোহ তাদের বৃদ্ধি পেল। অর্থাৎ ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছিল সমস্ত বাঙালি মুসলমান সমাজেই পরিব্যাপ্ত।

অপরপক্ষে হিন্দু অভিজাত বা নবাবের ফারসিনবিশ হিন্দু আমলা-মুনশিরা ইংরেজ আমলে ততটা ক্ষুব্ধ হল না; তারা ইংরেজকেও পাঠান-মোগলের মতই মেনে নিলে। ইংরেজ বণিকের দেওয়ান-মুনশি হিসাবে সৌভাগ্যলাভ করে, পরে তার তৈরি জমিদার হয়ে, তারা বরং ইংরেজ আমলের ভক্তই হল। হিন্দু মধ্যবিত্ত তাই এ সময়ে বৈষয়িক কারণেই ইংরেজি শিখতে গেল; শিখতে গিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার শক্তি ও ইংরেজের শক্তিরও মূল কারণ বুঝতে পারল। তখন ঊনবিংশ শতকে ইংরেজের ভাষা ও জীবনকে আশ্রয় করে বুর্জোয়া সভ্যতা দ্রুতগতিতে মধ্যাহ্নদীপ্তিতে বিকশিত হচ্ছে—কী আশ্চর্য তার তেজ, দীপ্তি, মহিমা! বাঙালি হিন্দু এই ইংরেজ শাসন ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানব-সভ্যতার সৌন্দর্য ও শক্তিরও সন্ধানলাভ করলে। এক নতুন শক্তি, নতুন কল্পনায় সে উদ্বুদ্ধ হল, মাতাল হয়ে উঠল। উনিশ শতকের বাঙালি জীবন তার এই নতুন জাগরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি তখন শুধু ইংরেজের চাকরি ও ইংরেজের জমিদারি পেয়েই খুশি রইল না—নতুন কিছু সৃষ্টি করতে কোমর বেঁধে লাগল।

## উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান

কিন্তু উনিশ শতকের মুসলমান বাঙালির অবস্থা কী? একমাত্র ওদিকে শেষদিকে নবাব আবদুল লতিফের নাম চোখে পড়ে। তার পূর্বে কী হয়েছিল তা জানতে হলে জানতে হবে হান্টারের "দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্" থেকে; আর বুঝতে হবে বিংশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজের অবস্থার দিকে তাকিয়ে। সেই যে মুসলমান সমাজ রাজ্য হারিয়ে আহত ক্ষুব্ধ হয়ে রইল তারপরে সে হল বিদ্রোহী—শুধু বিধর্মীর শাসনের বিরুদ্ধে নয়, সমস্ত পরধর্মের বিরুদ্ধেও শুধু নয়—একেবারে কালধর্মের বিরুদ্ধেই সে বিদ্রোহী হল। পরাজিত মুসলমান নেতারা ভাবলেন, পরাজয়ের কারণ—তাঁরা সত্যকার ইসলামকে জীবনে যথার্থভাবে রূপ দেননি, তাই তাঁদের পতন ঘটেছে। অতএব, বিশুদ্ধ ইসলাম, বিশেষ করে, ওহাবি পিউরিটানিক মতবাদ হল তাঁদের তখনকার জীবনের আদর্শ। এই দৃষ্টিতে দেখলে শুধু প্রথম দিককার উম্মাইয়া আরবদের ইসলামই ইসলাম। অন্য সব হচ্ছে ভ্রষ্টাচার। বিশেষ করে ফারসি সংস্কৃতির মারফত পাওয়া ইসলাম অগ্রাহ্য। ওহাবি প্রেরণা রাজনীতি-ক্ষেত্রে কী ঝড় তুলল তা প্রমাণ হান্টারের রিপোর্টে আছে। বিদ্রোহ হিসাবে সে

এক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সম্প্রদায়ের গৌরবের কথা। পরবর্তী সময়ে আমির খাঁর ওহাবি মামলা সেদিনকার ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদেরও স্বাধীনতা-স্পৃহাকেও প্রেরণা দেয়, হিন্দুর মনেও ইংরেজ-বিরোধ বাড়িয়ে তোলে। আর্থিক ক্ষেত্রেও বাংলার ওহাবি আন্দোলন দেশের অত্যাচারিত প্রজা-রায়তের, সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের সহায়তা পেয়েছিল। কিন্তু কথা হচ্ছে তার সামাজিক সাংস্কৃতিক ফলাফল নিয়ে।

এদিকে বাঙালি মুসলমানের পক্ষে ওহাবি মনোভাব মারাত্মক দূর্ভাগ্যের কারণ হল—আর আরও দূর্ভাগ্যের কারণ হল সমস্ত বাঙালির ও বাংলার সংস্কৃতির পক্ষে। কী করে, তা বলছি।

ওহাবি জীবনাদর্শ সপ্তম শতাব্দীর ইসলামকে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের জীবনে মূর্ত করতে চাইল। এমনিতেই আমরা জানি তা কত অসম্ভব। রিলিজিয়ন-এর ঝোঁক স্থাণুত্বের দিকে, প্রতিক্রিয়াপরায়ণতার দিকে। কালচারের প্রকৃতি গতিশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা। কাজেই ধর্মের পুনরুজ্জীবনে অনেক ক্ষেত্রে কালচারের গতি বন্ধ হয়। এই ওহাবি দৃষ্টিভঙ্গিতে আবার শুধু সপ্তম শতাব্দীর আরব ঐতিহ্যই পবিত্র ও গ্রাহ্য; অন্য সব প্রায় দাহ্য—ইংরেজি সভ্যতা শাসন তো নিশ্চয়ই, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিও, এমন কি, ফার্সি-সভ্যতা এবং ভারতীয় মুসলমানের অনেক সৃষ্টিও অগ্রাহ্য। এই দৃষ্টিতে মধ্যযুগের বাঙালি 'হিন্দু ঐতিহ্যের' কোঠা তো অপবিত্রই, এমন-কি, বাঙালির যৌথ-সংস্কৃতিও বর্জনীয় হল। যেটুকু বাঙালির 'মুসলিম ঐতিহ্যের' ক্ষেত্র তাও অনেকাংশে, পরিত্যাজ্য হয়ে থাকে; তার উপরে চাপানো দরকার হল ওহাবি-পরিশোধিত সেই বিশুদ্ধ ইসলামের তত্ত্ব, নিয়ম-কানুন, আচার-বিচার।

এ কথা ঠিক, বাংলার ওহাবি-নেতা হাজি শরিয়তুল্লাহ্ (ফরিদপুরের) বা তাঁর ছেলে দুধু মিয়া কিংবা ওহাবি বিদ্রোহী তিতু মিয়া (২৪ পরগণার) বাঙালি মুসলমান সমাজের ধর্মগত নেতৃত্ব লাভ করতে পারেননি—'ফরাজ্জিদের' সঙ্গে পুরোনো মওলবি-মোল্লার ফতোয়ামতো সাধারণ মুসলমান একসঙ্গে নমাজ পড়তেও অস্বীকার করতেন। কাজেই মতবাদ হিসাবে ওহাবি মতবাদ বাংলায় মোটেই সর্বগ্রাহ্য হয়নি। কিন্তু এই মতবাদকে ঠেকাতে গিয়েও পুরাতন মওলবী-মোল্লাদের পক্ষে কোরান, হাদিস ও শরিয়তি বিধি-বিধানের উপরই জোর দিতে হয়, মুসলমান সাধারণকে বলতে হয়—শরিয়তি ইসলাম থেকে বিচ্যুতিই এ-দেশের ও সকল দেশের মুসলমানের পতনের কারণ। অতএব, কার্যক্ষেত্রে আসলে ওহাবি মতবাদ যে-মনোভাবকে বাড়িয়ে তোলে ওহাবি-বিরোধী মওলবিরাও সাধারণ মুসলমানের সেই মনোভাবকেই প্রশ্রয় দেয়—'ফিরে চল বিশুদ্ধ ইসলামে'—পাশ্চাত্য সভ্যতা ও স্কুল-কলেজ, শিক্ষা-দীক্ষা নয়; ভারতীয় বা বাঙালি যৌথ উত্তরাধিকার (common inheritance) বা সংস্কৃতির অনুশীলনও আর নয়; এমন-কি, সংশোধন করে না নিলে 'বাঙালি মুসলমান ঐতিহ্যও' (typical Muslim tradition) নিয়ো না। বলা বাহুল্য মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতির প্রায় বারো আনা উত্তরাধিকারই এভাবে অবহেলিত হল। আর অন্যদিকে বাংলার মুসলিম সমাজের তখন থেকেই আসলে শরিয়তি ইসলামের উপর ঝোঁক বাড়ল। এখানে-ওখানে মাদ্রাসা-মক্তব পত্তন হল, ইসলামি নিয়মকানুন আদব-কায়দার সঙ্গে সাধারণ মুসলমানের পরিচয় সাধিত হতে লাগল। উনিশ শতকে বাঙালি

মুসলমান প্রথম "খাঁটি মুসলমান" হয়ে উঠতে লাগলেন। কিন্তু তা হয়ে উঠতে লাগলেন বাঙালির ধারাবাহিক যৌথ সংস্কৃতিকে পাশে সরিয়ে রেখে, নতুন কালের বুর্জোয়া সংস্কৃতিকেও একেবারে অস্বীকার করে।

অবশ্য দুটি অত্যন্ত বাস্তব কারণও সাধারণ মুসলমানের ইংরেজি শিক্ষা বর্জনের কারণ হয়েছিল। বাংলাদেশে মুসলমান পল্লিবাসী। প্রথম যুগে ইংরেজি বিদ্যালয় কলেজ পশ্চিম বাংলার বড়ো বড়ো শহরেই আবদ্ধ ছিল—কাজেই পল্লিবাসীর পক্ষে এ-শিক্ষা দুর্ঘট ছিল। তাই আবদুল লতিফ বা আমির আলি যদি বা সুযোগ পেলেন, মুসলমান সাধারণের পক্ষে এ-সুযোগ দুর্লভ হত। তা ছাড়া, অধিকাংশ মুসলমান বরাবরই আবার দরিদ্র ও শোষিত শ্রেণির; মধ্যবিত্ত মুসলমানও ছিলেন প্রায় নগণ্য। অথচ ইংরেজি শিক্ষা ব্যয়সাধ্য, এই সব কারণে মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষিতরা ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচারে আরও বেশি সুযোগ লাভ করলেন।

একই কালে বাঙালি মুসলমান এসব কারণে মিলে বিদ্রোহ করলেন তার অতীতের বিরুদ্ধে আর সমাগত যুগধর্মের বিরুদ্ধে, গ্রহণ করতে গেলেন সপ্তম শতকের আরবি প্রেরণা ও ব্যবস্থাকে—যার অনেকাংশই একালের সৃষ্টির পক্ষে আর তাকে উজ্জীবিত করতে পারে না। কাজেই উনিশ শতকের মুসলমান জীবন অভিমানে বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহে উদ্দীপ্ত, ধর্মান্দোলনে আলোড়িত—আর সৃষ্টি-চেতনায় তা এমন বন্ধ্যা হয়ে রইল। সমস্ত বাংলা দেশে উনিশ শতকের জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামাজিক সংস্কারে, আর প্রগতিমূলক জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানের তাই কোনো দান নেই। উত্তরভারতে স্যার সৈয়দ আহমেদের অভ্যুত্থানে যে "মুসলিম জাগরণ" এল তার বাহন হয় উর্দু, তার সৃষ্টি-কেন্দ্র উত্তর-ভারত। বাঙালি মুসলমান প্রত্যক্ষভাবে সেই 'জাগরণেরও" সুযোগ পায়নি।

## হিন্দুর সৃষ্টি ও হিন্দুর ভুল

মুসলিম-জীবনের এই বিদ্রোহী ধারা হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সাধারণের নিকট পর্যন্ত দুর্জ্ঞেয় দুর্বোধ্য হয়ে রইল। মুসলমান কোনো নেতা তা ইংরাজি বা বাংলায় ব্যাখ্যাও করলেন না। তাই হিন্দু ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করলে; জমিদারি প্রথা চাকরি-বাকরির মারফত হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ জীবন-যাত্রায় একটা বড়ো স্থান অধিকার করলে; আর এই শিক্ষিত হিন্দু-সাধারণই নতুন জাতীয়তাবাদে উদ্‌বুদ্ধ হতে হতে উনিশ শতকে ধরে নেন—ভারতীয় মুসলমান এদেশের শিক্ষা-সভ্যতা ও অতীতকে শ্রদ্ধা করেন না; এদেশের সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আপনার বলে মনে করেন না; এ দেশকেই তাঁরা মনে করেন না নিজেদের 'স্বদেশ'। কাজেই ইসলাম ধর্ম যেমন বিদেশীয়, মুসলমানকেও হিন্দুরা মনে করে নিলেন বিদেশীয়; এবং হিন্দুত্ব ও হিন্দু রীতিনীতিকে সহজভাবে মনে হল "জাতীয়" ধারা। এ এক শোচনীয় ভুল। মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালিরা হিন্দু-মুসলমান জনগণের থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন বলেই এ ভুল হল। সমস্ত উনিশ শতকের নবজাগ্রত প্রগতি আন্দোলন এই মারাত্মক ভুলের বশে এক 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের' আশ্রয় গ্রহণ করলে। আর হিন্দু শিক্ষিত সাধারণ, আমাদেরই কবি, ঔপন্যাসিক সকলেই তখন 'হিন্দু ঐতিহ্যের' কাঠামোকে আশ্রয় করে

সৃষ্টিতে অগ্রসর হলেন—তাঁদের নিকটেও হিন্দু-মুসলমান বাঙালির যৌথ সংস্কৃতি বেশি মর্যাদা পেল না। মর্যাদা পেল বরং তাঁর পার্শ্ববর্তী সেই "হিন্দু ঐতিহ্যের" অংশ। বাঙালি হিন্দুর সেই সংকীর্ণ কাঠামোকে অবশ্য ভারতীয় দর্শন, চিন্তা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিসরে ফেলে তাঁরা এ সময়ে বড়ো করে নিলেন—নতুন বেদ-বেদান্ত উপনিষদ চর্চায়, দর্শনের অনুশীলনে, সংস্কৃত শাস্ত্র প্রকাশে স্মার্ত ও নৈয়ায়িক বাঙালি হিন্দুর মনের কাঠামো প্রশস্ত হল। রামমোহন রায় থেকে রাজনারায়ণ, বঙ্কিম-বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলেই সর্বভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যের প্রবল ধারাকে বাঙালি হিন্দু ঐতিহ্যের খাতে বহাতে সাহায্য করেছেন, তাও উল্লেখযোগ্য।

অবশ্য একটি বিশেষ সত্য লক্ষণীয়। এই উনিশ শতকের বাংলা সংস্কৃতির কাঠামোই হিন্দু, তার প্রাণ কিন্তু বুর্জোয়া সংস্কৃতির। মাইকেলের তো কথাই নেই, বঙ্কিমও দেখি প্রাণপণে চাইছেন মিল, স্পেন্সার, কোঁৎ-এর বাণীকে এই স্বদেশীয় কাঠামোতে রূপ দিতে। এই বুর্জোয়া সভ্যতার মূল সত্য হল মানবতাবাদ—হিউম্যানিজম্; অনুশীলন ও ধর্মতত্ত্বের তাই লক্ষ্য। বঙ্কিম উপন্যাসে, প্রবন্ধে চেয়েছেন এই সত্যকে—বুর্জোয়া প্রাণশক্তিকে এই "হিন্দু কাঠামোতে" পুরতে। ব্রাহ্ম ও 'উদারনৈতিক" সংস্কারবাদীরা এ-কাঠামোকেও এতটা গুরুত্ব দিতেন না। তাঁদের ধর্মান্দোলনে ও কর্মান্দোলনে তা স্পষ্ট। কিন্তু "জাতীয়তাবাদীরা" চাইতেন সেই জাতীয় আধারে অর্থাৎ হিন্দু আধারে, নতুন প্রাণ সঞ্জীবিত করতে।

কিন্তু যা প্রধান কথা তা এই : বাঙালির যৌথ-সংস্কৃতি ইংরেজ-শাসনের কালে মুসলমানের দ্বারাও অবহেলিত হয়, হিন্দুর দ্বারাও অবহেলিত হয়। আর এইটিই এ-কালের বাঙালি জীবনের ও সংস্কৃতির ট্র্যাজিডি। তারই জন্য বর্তমান বাংলার সংস্কৃতিকে মুসলমান বাঙালি আপনার বলে মানতে এত ইতস্তত করেন। কারণ, তাঁর চক্ষে এ যে শুধু 'হিন্দু ঐতিহ্যে'র উপর গঠিত বাঙালি সংস্কৃতি।

## বাঙালি কালচারের ভাবী ভিত্তি

অপরপক্ষে এ কথাও সত্য যে, সেই উনিশ শতকের হিন্দু জাগরণের হিন্দু কাঠামো তখনি ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। কারণ মানবতাবাদ হিন্দুত্বের কাঠামোয় বাঁধা পড়ে না; এবং "মুসলমান সন্দেহের" আবহাওয়ায়ও নিশ্বাস টানতে পারে না। এমন-কি এই "বাবু কালচারের" বাবুদের চক্ষেও তার সংকীর্ণতা ও দুর্বলতা গোপন রইল না। দিনের পর দিন বাঙালি সংস্কৃতি তাই সচেতন হচ্ছে তার সেই উনিশ শতকের ত্রুটি সম্বন্ধে, বুঝছে দুটি সত্য—এই সংস্কৃতি সমস্ত বাঙালির সংস্কৃতি নয়, শুধুমাত্র শতকরা পাঁচজন বাবুর সংস্কৃতি হয়েছে—"ভদ্র সংস্কৃতি" হয়েছে, বাঙালির লোক-জীবনের থেকে তা বিচ্ছিন্ন। বাঙালি সংস্কৃতির আসল কাঠামো (form) হওয়া চাই বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সেই যৌথ সংস্কৃতি; বাঙালি হিন্দু-মুসলমান জনগণের সমসূত্রে গাঁথা লোক-জীবন ও লোক-সংস্কৃতি হওয়া চাই তার ভিত্তি; আধুনিককালের জাগ্রত জীবন হবে তার উপকরণ (content) আর এই নতুন বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ হবে—শুধু বুর্জোয়া মানবতাবাদ নয়—আধুনিক বিপ্লবী মানবতাবাদের নতুন প্রেরণা ও সত্য।

এখানেই বাঙালি মুসলমানের দানের সে প্রতীক্ষা করবে। আবার সমস্ত বাঙালির যৌথ সংস্কৃতি গঠন করতে হবে, নতুন মানবতার সাধনায় হিন্দু-মুসলমান একত্র হতে হবে। বাঙালি মুসলমানেরও সেই সাধনায় সে দান আজ জোগাতে হবে। ঊনবিংশ শতকের উগ্র ও সংকীর্ণ ওহাবি প্রেরণায় তা সৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হয়ে রয়েছে। বিংশ শতকে এখনও তার জের চলেছে। যেমন দেখি—মুসলমান বাঙালি তার আপন সংস্কৃতিক্ষেত্রের সন্ধান না পেয়ে, শক্তিকেন্দ্র না বুঝে, বাংলার মুসলমান জনগণের লোক-গীতি, লোক-নৃত্য প্রভৃতি অনেক প্রয়াসকে "অনৈসলামিক" বলে এই শতকেও চাপা দিচ্ছেন। সেই ওহাবি ঝোঁক তার কেটে যায়নি; হিন্দুর সাংস্কৃতিক প্রতিপত্তি দেখে বরং তা বেড়েছে। এবং অকস্মাৎ রাজনৈতিক শক্তির সহায়তালাভে এই দেশের আজ বাঙালি মুসলমান সমাজেও "শিক্ষিত মধ্যবিত্তের" উদয় হচ্ছে। তালকানা হয়ে উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দুর মতো তারা "মুসলিম ঐতিহ্যের" কাঠামোতে আরবি-ফারসির ধারায় নতুন সংস্কৃতি গড়বারও কল্পনা করছেন। "বাবু কালচারের" পালটা তাঁরা গড়তে চান "মিঞা কালচার"। বলা বাহুল্য, উনিশ শতকেই যা হিন্দুর ভুল ছিল বিংশ শতকে তা মুসলমানের পক্ষে হবে আরও মারাত্মক। হিন্দুর সেই ভুল দেখে বরং বাঙালি মুসলমানের বোঝা উচিত—তাঁকে আপনার সংস্কৃতি গড়তে হবে, গড়তে হবে বাঙালি যৌথ-সংস্কৃতির কাঠামো (form) নিয়ে বাঙালি গণ-জীবনের ভিত্তিতে (base) আর তা গড়তে হবে বিপ্লবী মানবতার বাণী ও প্রেরণাকে প্রাণস্বরূপ ভাব-বস্তু রূপে (content) গ্রহণ করে।

তা হলেই হিন্দু-মুসলমান বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বরাজলাভ সম্ভব।*

*১৯৪৬ সনের ২রা মার্চ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের মুসলমান ছাত্রদের ছাত্রনিবাস জিন্নাহ্ হলে, তাদের একটি সম্মেলনে 'মুসলিম কালচার' বিষয়ক বক্তৃতা থেকে 'বাঙালি মুসলমান ও মুসলিম কালচার' ও 'মুসলমান বাঙালির কালচার'—এই প্রবন্ধ দুটি ১৯৪৬-এর জুলাই মাসে লিখিত হয়। কলিকাতার দাঙগার পরে (১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬) গত (১৩৫২-এর) শারদীয় সংখ্যা 'বসুমতী' ও 'যুগান্তরে' বর্তমানাকারে লেখা দুটি প্রকাশিত হয় এবং নোয়াখালির শোচনীয় ঘটনাবলীর পরে 'শনিবারের চিঠির' সুযোগ্য সম্পাদকেব কাছ থেকে অপ্রাসঙিগকভাবেই এই মন্তব্যটুকু লাভ করে : যখন অবাধ তাণ্ডব চলিয়াছে "তখন নোয়াখালির শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের মতো মন এমন শক্ত করিতে পারি নাই যে, মুসলিম কালচার ও সংস্কৃতি লইয়া পাঁচ ঘাটে পাঁচটি প্রবন্ধের তরণী ভাসাইব।" সুযোগ্য সম্পাদকের অবশ্য অজানা ছিল না যে, দেহ শক্ত করতে না পারায় নোয়াখালির-ফেরত "নোয়াখালির গোপাল হালদার" তখন নিতান্তই অশক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

# সে কাল আর এ কাল

## রাজনারায়ণ বসু

আমাদিগের সমাজ এখনও প্রকৃতরূপে সংগঠিত হয় নাই। তাহার একটি সামান্য প্রমাণ দিতেছি। প্রত্যেক জাতিরই একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ আছে; সেইরূপ পরিচ্ছদ সেই জাতীয় সকল ব্যক্তিই পরিধান করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের বাঙ্গালি জাতির একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ নাই। কোনো মজলিসে যাউন, একশত প্রকার পরিচ্ছদ দেখিবেন; পরিচ্ছদের কিছুমাত্র সমানতা নাই। ইহাতে এক এক বার বোধ হয়, আমাদিগের কিছুমাত্র জাতিত্ব নাই। বস্তুত ঐক্য না থাকিলে প্রকৃত জাতিত্ব কীরূপে সংগঠিত হইবে? আমাদিগের কোনো বিষয়ে ঐক্য নাই। ইহার উপর আমরা আবার অনুকরণ-প্রিয়। বাঙ্গালি জাতি অত্যন্ত অনুকরণ-প্রিয়; আমরা সকল বিষয়েই সাহেবদের অনুকরণ করিতে ভালোবাসি। কিন্তু বিবেচনা করি না যে, সে অনুকরণ আমাদের দেশের উপযোগী কি না, আর তদ্দ্বারা আমাদিগের দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে কি না? সাহেবেরা পর্যন্ত যে সাহেবি প্রথা এ দেশের উপযোগী নহে মনে করেন, তাহাও আমরা অবলম্বন করিতে সংকুচিত হই না। সাহেবেরা নিজে বলিয়া থাকেন, সাহেবি পোশাগ এ দেশের কোনো মতে উপযুক্ত নয়, কিন্তু আমাদিগের দেশের কোনো কোনো ব্যক্তি ঐ পোশাগ ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। আমাদিগের দেশের কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি ভূতপূর্ব লেপ্‌টেনেন্ট গবর্নর বিডন সাহেবের সহিত ধুতি চাদর পরিয়া দেখা করিতে যাইতেন, তাহাতে গবর্ণর সাহেব বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। একবার গ্রীষ্মের সময় দেখা করিতে গিয়াছেন, গিয়া দেখেন যে, গবর্ণর সাহেব ঢিলে পাজামা ও পাতলা কামিজ পরিয়া বসিয়া আছেন। আমাদিগের বন্ধুকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন,—"তোমাকে দেখিয়া আমার হিংসা হচ্ছে, ইচ্ছা করে তোমাদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিয়া থাকি।" আমাদিগের বন্ধু উত্তর করিলেন,—"তাই কেন করুন না?" বিডন সাহেব বলিলেন,—"ওরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করা আমাদিগের দেশাচার-বিরুদ্ধ, সুতরাং কেমন করে করি?" আমাদিগের বন্ধু উত্তর করিলেন,—"আপনাদিগের বেলা দেশাচার বলবৎ, আর আমাদিগের বেলা তাহা কিছুই নহে, আপনারা এরূপ বিবেচনা করেন কেন?" চতুর্দিকে হীন অনুকরণের প্রবলতা দৃষ্ট হইতেছে। প্রতি পদেই অনুকরণ, ইহাতে আন্তরিক সারবত্তার হানি হইতেছে, বীর্যের হানি হইতেছে, আমরা অন্য সমাজীয়দের ক্রীতদাস হইয়া পড়িতেছি। কী আশ্চর্য! সাহেবেরা যাহা করিবেন, তাহাই ভালো, আর সব মন্দ। এ উপলক্ষে

একটা গল্প মনে পড়িল। কতকগুলি লোক এক বাসায় থাকিত। তাহারা এক দিন একটা কাঁঠাল ক্রয় করিল। তাহাদের মধ্যে একজন বড়ো ইংরাজভক্ত এবং কাঁঠালভক্তও ছিলেন; আর আর সঙ্গীদিগের ইচ্ছা হইল যে, তাঁহাকে কাঁঠালের ভাগ ফাঁকি দেয়। একজন উহার মধ্যে বলিয়া উঠিল, "ইংরাজেরা কাঁঠাল খায় না।" তিনি অমনি কাঁঠাল ভক্ষণে বিরত হইলেন, আর আর বন্ধুরা সমুদয় কাঁঠাল খাইয়া ফেলিল। ইংরাজেরা না থাকিলে কোনো সভা জাঁকে না। ইংরাজেরা ভালো না বলিলে কোনো কার্যের মূল্য হয় না। সকল কাজেই রাঙ্গামুখের বার্নিশ চাই। এ বিষয়ে আর একটা গল্প মনে হইল। এক বার এক ব্যক্তি আর একজনকে বলিতেছিল, "ওদের বাটীতে পূজার বড়ো ধুম, গোরায় লুচি ভাজ্‌ছে।" যে কার্য গোরায় করে, তাহার ভারি মূল্য। এখন আমাদের সকল কার্যেই গোরার দ্বারা লুচি ভাজান চাই! সামাজিক বিষয়েতেও সাহেবদিগের সাহায্য চাই। সাহেবরা হিন্দুসমাজ সম্বন্ধীয় বিষয়ে যেরূপ বিজ্ঞতা ফলান, তাহা দেখিলে আমার হাসি উপস্থিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে বঙ্গদূত নামক একখানি সংবাদ পত্র ছিল।* তাহার সহিত সংবাদ প্রভাকরের ঝগড়া হইয়াছিল। আপনারা জানেন, সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা কিরূপ বিবাদপ্রিয়। তাঁহাদের ঝগড়া দেখিয়া ফ্রেন্ড অব্ ইন্ডিয়া সম্পাদক তাহার মধ্যস্থতা করিতে গেলেন। বঙ্গদূত বলিল, "হচ্ছিল ভোলা ময়রা ও নীলু রামপ্রসাদে, এ আবার আন্টুনি ফিরিঙ্গি কোথা থেকে এল?" সেই অবধি দুর্ধর্ষ ফ্রেন্ড একেবারে চুপ। এইরূপ অনেক সময় হিন্দুসমাজের আন্দোলনে সাহেবদিগের বিজ্ঞতা ফলান দেখিয়া আমরাও বলিতে বাধ্য হই যে, "হচ্ছিল ভোলা ময়রা ও নীলু রামপ্রসাদে, আবার আন্টুনি ফিরিঙ্গি কোথা হতে এলো?" আমাদের অর্থ সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় বিলাতে আপিল হয়, এখন সামাজিক বিষয়েতেও বিলাতে আপিল হইতেছে! সম্প্রতি এক বাঙ্গালি ধর্মসম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে সামাজিক কোনো বিষয়† লইয়া বিবাদ হইতেছিল। দুই পক্ষ বিলাতের লোকদিগের নিকট আপিল করিলেন, তাঁহারা এক পক্ষে ডিক্রি দিলেন। যে পক্ষ জিতিলেন, তাঁহাদের কতই বা আনন্দ! যে পক্ষ হারিলেন, তাঁহাদের কতই বা বিষাদ! যাঁহারা বিলাতে যান নাই, তাঁহারা বিলাতের এইরূপ পক্ষপাতী। যাঁহারা বিলাতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের তো কথাই নাই। বাঙ্গালিরা এখন ক্রমাগত বিলাতে যাইতেছে। যেমন কাশীতে ও প্রয়াগে বাঙ্গালিপাড়া হইয়াছে, তেমনি লন্ডনে এক বাঙ্গালিপাড়া না হইয়া উঠে। লোকে যেমন কাশীতে মরিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, তেমনি সম্প্রতি বিলাতের ফেরত একজন যুবক ডাক্তার অত্যন্ত পীড়িত হইয়া লন্ডনে মরিবার ইচ্ছা করিয়া বিলাতে গিয়াছিলেন। তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল; তিনি যেমন কাশীধামে পৌঁছিলেন, অমনি তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। পূর্বে যেমন যুবকেরা পশ্চিমে পলাইত, এক্ষণে তেমনি তাহারা বিলাতে পলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সকল যুবক কোমলস্বভাব এবং এরূপ ভীরু যে, অন্ধকারে এ ঘর হইতে ও ঘরে একেলা যাইতে অক্ষম, তাহারা পর্যন্ত বিলাতে যাইতেছে। যেমন কুলকামিনীদিগের উপর জগন্নাথের ডোর নামিলে তাহারা পুরী যাইতে

---

* বাবু নীলরত্ন হালদার বঙ্গদূত-সম্পাদক ছিলেন। ইনি নানা ভাষায় পণ্ডিত ও সুকবি ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন, এবং অতি সুপুরুষ ছিলেন। ইনি চুঁচুড়ানিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু বাবু নীলমণি হালদার মহাশয়ের পুত্র। তৎকালে তাঁহার পিতার ন্যায় কেহ বাবু ছিল না। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর টরেন্স সাহেবের আমলে নীলরত্ন বাবু সল্ট বোর্ডের দেওয়ান হইয়াছিলেন।

† সে বিষয় উপাসনালয়ে প্রকাশ্য স্থানে স্ত্রীলোক বসিবে কি না।—গ্রন্থকার।

কোনো বাধা বিঘ্ন মানে না, ইঁহারাও সেইরূপ বিলাতে যাইতে কোনো বাধা বিঘ্ন মানেন না; এঁদের উপর বোধ হয়, বলরামের ডোর নামে। বলরামের সহিত ইংরাজদিগের তিন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। প্রথম,—বর্ণ বিষয়ে, দ্বিতীয়,—বল বিষয়ে, তৃতীয়,—মদ্যপান বিষয়ে। মহাভারতে উক্ত আছে, অর্জুন অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত দেবলোকে গিয়াছিলেন। এক্ষণে আমাদিগের দেবলোক বিলাত। এক্ষণে বাঙগালিরা বিলাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যান। শ্রুত হওয়া যায়, এই দেবলোকে দেবকন্যারা না কি মোহিনী মন্ত্র জানেন। তাঁহারা বাঙগালিদের ভুলাইয়া রাখেন। এই জন্য পিতার সর্বদা ভয়, পাছে দেবকন্যাদিগের অনুরাগপ্রভাবে পুত্রের মন হইতে মানবকন্যার প্রতি অনুরাগ তিরোহিত হইয়া যায়। আমি বিলাতে যাইবার প্রতিপক্ষ নহি। বিলাতে যাইলে অনেক উপকার আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা বিলাত হইতে ফিরিয়া আইসেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের সহিত একেবারে সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা এক্ষণে বিলাত হইতে ফিরিয়া আইসেন, হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে নোকসানের খাতায় লিখিতে বাধ্য হয়েন। বাবু বিলাত হইতে সাহেব সাজিয়া ফিরিয়া আসিলেন, না কাহারও সঙ্গে পোশাগে মিলে, না কাহারও সঙ্গে ব্যবহারে মিলে। কোথায় তাঁহারা যে জ্ঞানোপার্জন করিয়া আইলেন, সেই জ্ঞানালোকে স্বদেশীয়দিগকে বিভূষিত করিবেন, না একবারে সমাজছাড়া হয়ে বস্‌লেন। তাঁহারা উভয় দলের ত্যাজ্য হয়েন। বাঙগালিদিগের সঙ্গে তো তাঁহাদিগের মিলে না, ইংরাজেরাও তাঁহাদিগকে অনুকরণকারী শাখামৃগ বলিয়া ঘৃণা করে। কেন যে আমাদিগের দেশের লোক ইংরাজদিগের এত গোঁড়া হয়েন, কিছু বুঝিতে পারা যায় না। কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যক্ষ বিজ্ঞবর লব সাহেব বলেন, "আমাদের রীতিনীতি এমন দোষাশ্রিত যে, দিন দিন তাহার পরিবর্তন ও সংশোধন আবশ্যক হইতেছে। বাঙগালিরা কেন সে সকল নির্দোষ মনে করিয়া নির্বিকারচিত্তে তাহার অনুকরণ করে, বুঝিতে পারি না।" এই ইংরাজি অনুকরণের দরুন সমাজসংস্কারের গতি বিপথগামী হইতেছে। প্রকৃত গতিতে যদি সমাজসংস্কারের স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহা হইলে সমাজসংস্কার কার্য এত দিনে যে কত অগ্রসর হইত, তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশের সমাজসংস্কারকেরা যদি স্বদেশীয় ভাবকে পত্তনভূমি করিয়া সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে কৃতকার্য হইতে পারেন সন্দেহ নাই। মহাত্মা রামমোহন রায়, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইঁহারা এই ভাবে সমাজসংস্কার আরম্ভ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছেন। বিজাতীয় ভাষা, বিজাতীয় ভাব, বিজাতীয় ধর্ম কখনো এদেশে স্থায়ী হইবে না, এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নাম "অধিকারতত্ত্ব।" সেই গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিতেছি।

'ইংরাজদিগের রীতি, নীতি, ভাবভঙ্গী অনুকরণ করার ইচ্ছা আমাদিগের যুবকগণের মনে বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অনর্থক কতিপয় ভাবভঙ্গী রীতিনীতির অনুকরণ করা কেবল হীনতা মাত্র। তাহাকে উদ্ধার বলে না, তাহা হীন অনুকরণ শব্দের বাচ্য। ইংরাজি বিদ্যার যোগে এ দেশে যাহা আসিতেছে, অনেকে তাহাই অনুকরণ করিতেছেন। ইংরাজেরা শিক্ষা দিলেন, ভূত প্রেত নাই, তাহারাও ভূত প্রেত মানিলেন না; পশ্চাৎ ইংরাজি পুস্তকে লিখিল, ভূত প্রেত আছে, আবার মানিলেন। এ দেশের লোক মদ্যপায়ী ছিল না, যুবা পুরুষেরা ইংরাজদিগের অনুকরণে পান করিতে শিখিলেন; পশ্চাৎ ইংরাজেরা সুরাপান-নিবারণী সভা করিতেছেন, দেখিয়া তাঁহারাও সভা করিলেন। একেশ্বরবাদী খ্রিস্টানগণ কহিলেন

যে, যিশুকে মানবধর্মের আদর্শস্বরূপ গ্রহণ না করিলে মুক্তি নাই; তাঁহারাও যিশুকে অবলম্বন করিলেন। আবার যদি ইংরাজেরা কহেন, যিশুকে ধর্মের মধ্যে রাখা উচিত নহে, তখন তাঁহারাও যিশুকে ত্যাগ করিবেন। হিন্দু শাসনকালে আমাদের দেশের স্ত্রীগণ এখনকার ন্যায় গৃহে রুদ্ধা থাকিতেন না। মুসলমানদিগের অনুকরণে বা ভয়ে আমাদের বর্তমান অবরোধ প্রণালি অবলম্বিত হইল। এখন ইংরাজের রাজ্য, অতএব আমাদের যুবাগণ আপনাপন স্ত্রীদিগকে বিবিদিগের ন্যায় সভা মজলিশে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পশ্চাৎ যদি ইংরাজেরা অতিরিক্ত স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন,* তখন এ দেশের লোকেরা আপনাদের স্ত্রীদিগকে গৃহে প্রবেশ করাইতে পথ পাইবেন না। দেশীয় লোকেরা শাস্ত্রকথা শুনিবার বা শাস্ত্র পড়িবার অনুরোধ করিলে কেহ তাহা গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু ইংরাজেরা হিন্দুশাস্ত্র পড়েন, দেখিয়া অনেকে পড়িতে যান। বাঙগালা সংবাদপত্র বা পুস্তক পড়িতে ভালো লাগে না, কেবল ইংরাজি পুস্তক ও সংবাদপত্র পড়িতেই ভালো লাগে। ইংরাজি ঔষধ ভালো, বাঙগালা ঔষধ মন্দ; ইংরাজি খাদ্য ভালো, বাঙগালা খাদ্য মন্দ; ইংরাজি পাদরি ভালো, বাঙগালা পাদরি মন্দ; ইংরাজি বাইবেল ভালো, হিন্দুশাস্ত্র মন্দ; ইংরাজি সব ভালো, দেশীয় সব মন্দ।

"কিন্তু হে স্বদেশ-হিতৈষি! তুমি এমন মনে করিও না যে, সমুদায় ভারতবর্ষ এরূপ ইংরাজি ভাবে অনুবাদিত হইয়াছে। * * * * স্বজাতীয় ভাবে মানবের স্বাভাবিক অধিকার। সে অধিকার হইতে স্বভাবত কেহই ভ্রষ্ট হইবেক না। যদি ইংরাজেরা ঋণকৃত স্বজাতীয় ধর্মাধিকার হইতে ভ্রষ্ট না হন, তবে আমরাই কি এত হীন হইয়াছি যে, ভারতমৃত্তিকার উৎপন্ন ধর্মভাব হইতে পরিভ্রষ্ট হইব? যদি ইংরাজেরা স্থূলধর্মপ্রতিপাদক বাইবেল ত্যাগ না করেন, তবে আমরাই কি এত মূঢ় হইয়াছি যে, ভারতমৃত্তিকার মঙ্গলপ্রসূনস্বরূপ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদ বেদান্ত উপনিষদাদি শাস্ত্র ত্যাগ করিব? এই সকল ধর্মভাব, এই সকল ব্রহ্মজ্ঞানশাস্ত্র, যাহার গুরু ভাবের সহিত শতকোটি বাইবেল, ইঞ্জিল, তওরেৎ, জবুর, কোরান ও আবেস্তা এবং পার্‌কর্‌, নিউম্যান, কান্ট, কুজিন প্রভৃতির স্তূপায়মান গ্রন্থসমূহ সমতুল্য হয় না, তাহাতে আমাদের যে আত্মীয় ও স্বজাতীয় এই দ্বিবিধ অধিকার যুগপৎ আছে, তাহা মনে করিলেও পিতামহ পুরাণ পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়।"

উল্লিখিত মহাশাস্ত্র সকলকে মূল করিয়া ধর্মসংস্কার কার্যে আমাদিগের প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের এমন একটি কার্য নাই, উহার সম্বন্ধীয় এমন একটি বিশুদ্ধ মত নাই, যাহার প্রমাণ আমাদিগের শাস্ত্রে না পাওয়া যায়। ধর্ম বিষয়ে এমন একটি সদুপদেশ নাই, যাহা আমাদিগের ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না; সমাজ সম্বন্ধে এমন একটি সুরীতি নাই, যাহা প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না, এবং যাহা এক্ষণে হিন্দুভাবে প্রচার না করা যাইতে পারে। হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া আমরা ধর্ম ও সমাজসংস্কার কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, আমরা ওই কার্যে সুসিদ্ধ হইতে পারি।

---

* "এই বর্তমান সময়েই সাহেবেরা তাঁহাদের অতিরিক্ত স্ত্রীস্বাধীনতায় বিরক্ত হইয়া প্রাচীন কালের শাসনপ্রণালীর পুনরাগমন প্রার্থনা করিতেছেন।—*Saturday Review, vide Englishman*, 6th May, 1871."—(অধিকারতত্ত্ব প্রণেতার নিজের নোট।)

চরিত্র বিষয়ে এ কালে দুইটি বিষয়ে উন্নতি দেখা যাইতেছে। এক উৎকোচ গ্রহণে বিরতি, আর এক স্বদেশপ্রিয়তা। সে কালে ঘুষ লওয়া একটা বড়ো দোষ বলিয়া গণ্য হইত না। কারণ বড়ো ছোটো প্রায় সকল লোকেই উহাতে কিছু না কিছু লিপ্ত থাকিতেন। এখন সুশিক্ষিত দলের মধ্যে ঘুষ লওয়া বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। সে কালের লোকদিগের স্বদেশের প্রতি একটা কর্তব্যবোধ ছিল না; এখন ক্রমে ক্রমে লোকের মনে সে কর্তব্যবোধ জন্মিতেছে, বলিতে হইবে। চরিত্র সম্বন্ধে যেমন দুই একটি বিষয়ে উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে, তেমনি তৎসম্বন্ধে অনেক দোষ জন্মিতেছে। তাহা অতি শোচনীয়।

চরিত্র সম্বন্ধে এক্ষণকার লোকের প্রথম দোষ, পিতৃভক্তির হ্রাস। নিজ কর্মস্থলে বৃদ্ধ পিতা আসিলে তাঁহাকে পিতা বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে বাবু লজ্জিত হয়েন ও কোনো কোনো বাবু বাবার পরিবার অর্থাৎ মাকে খেতে দিতে হয় বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করেন, এইরূপ গল্প সকল শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল গল্প সম্পূর্ণরূপে সত্য না হউক, তথাপি এই সকল গল্প উঠা এক্ষণকার লোকের মনের ভাবের পরিচয় প্রদান করে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বৃদ্ধ পিতা হৃষ্টচিত্তে তাঁহার এক বৃদ্ধ বন্ধুকে স্বীয় উপযুক্ত কীর্তিমান্ পুত্রের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিবার জন্য লইয়া গেলেন; পিতা ও তাঁহার বন্ধু গদির নীচে বসিলেন, আর পুত্র গদির উপর বসিয়া রহিলেন। চাণক্যশ্লোকে উক্ত আছে যে,—"পুত্র ষোড়শ বৎসর প্রাপ্ত হইলে তাহার সঙ্গে বন্ধুবৎ ব্যবহার করিবে।" উপযুক্ত পুত্রের সহিত পিতার এইরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য; কিন্তু পুত্রের উচিত হয় না যে, পিতার প্রতি কোনো অসম্মানের চিহ্ন প্রদর্শন করেন। কিন্তু পিতার প্রতি অসম্মানের চিহ্ন প্রকাশ করিতে এক্ষণে অনেক যুবককে দৃষ্টি করা যায়।

এক্ষণকার লোক পানাসক্ত ও পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বেশ্যাসক্ত· মদ্যপান যে আমাদের বর্তমান সমাজে অতি ভীষণ অনিষ্টপাতের কারণ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন, পরিমিত মদ্যপানে দোষ নাই। কিন্তু ইহা যে কুদৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া কত অনিষ্ট সাধন করে, তাহার অন্ত নাই। পিতা কিংবা শিক্ষক পরিমিত মদ্যপায়ী হইলেও বাবা কিংবা মাস্টার মদ খান তো আমি খাব না কেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যুবকেরা মদ্যপানে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু তিনি যে পরিমিতরূপ পান করেন, তাহা বিবেচনা না করিয়া আশু অপরিমিত পানে প্রবৃত্ত হয়। এ বিষয়ে বাবা ও মাস্টারেরও অধিক দিন সাবধান থাকা কঠিন। তাঁহারাও অধিক দিন মিতপায়ী থাকিতে পারেন না। পরিমিত মদ্যপান কেমন, না,—বাঁধে একটি ছিদ্র রাখা। সেই ছিদ্র দিয়া জল প্রবেশ করিয়া ক্রমে বাঁধ যেমন নষ্ট করে, সেইরূপ পানদোষ পরিমিত পানরূপ ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া ক্রমশ বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে মনুষ্যের সর্বনাশ করে। আমি শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, পূর্বে কালেজের ছাত্রেরা এই দোষে যেরূপ লিপ্ত ছিলেন, এক্ষণকার ছাত্রেরা সেরূপ লিপ্ত নহেন। যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি হইতেছে। সে কালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত; এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রচ্ছন্নভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। বেশ্যাগমন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ বেশ্যাসংখ্যার বৃদ্ধি। পূর্বে গ্রামের প্রান্তে দুই এক ঘর বেশ্যা দৃষ্ট হইত; এক্ষণে পল্লিগ্রামে বেশ্যার সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। এমনকি, স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও এই পাপ প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমন বেশ্যাগমনও

বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা কিন্তু সভ্যতার চিহ্ন। যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, ততই পানদোষ, লাম্পট্য ও প্রবঞ্চনা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইতে থাকে।

এক্ষণকার লোকেরা পূর্বকার লোক অপেক্ষা অধিক অসরল। এখন পদে পদে খলতা, অসরলতা; এখন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া শীঘ্র বুঝিবার যো নাই যে, তাহার মনের ভাব কি? এখন বাহিরে, ''আসিতে আজ্ঞা হউক,'' ''ভাল আছেন,'' ''মহাশয়'' ইত্যাদি দাঁত বাহির করা সভ্যতা, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পরস্পর এমনি কৌশল চলিতেছে যে, তুমি যদি ''বেড়াও ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়।'' এক্ষণে ছদ্ম ব্যবহার অতিশয় প্রবল। এ বিষয়ে বহরমপুর-নিবাসী সুকবি রামদাস সেন এক্ষণকার লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খুব সত্য।

''কত ভাবে ভ্রম তুমি কত সাজ পর।<br>
বঙ্গ-রঙ্গ-আগারেতে অভিনয় কর।।<br>
দেশের হিতের জন্য করি প্রাণপণ।<br>
এখানে সেখানে ফের মহাব্যস্ত মন।।<br>
পীযূষ বর্ষণ মুখে হৃদে ক্ষুরধার।<br>
মরি কী বঙ্গের সুত চরিত্র তোমার!।।''

এক্ষণে প্রতারণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্বে এক ধর্মসাক্ষী অথবা সূর্যসাক্ষী তমঃসুকে কাজ চলিত, বোধ হয় কোনো কোনো পুরাতন বাড়ির পুরাতন কাগজপত্র খুঁজিলে তাহার মধ্যে এরূপ তমঃসুক এখনো পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে চারি দিকে আঁটাআঁটি করিলেও লোকের প্রতারণা নিবারিত হয় না।

এখনকার লোকদিগের স্বার্থপরতা বড়ো প্রবল। এ কাল অপেক্ষা সে কালে পল্লির লোকদিগের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি অধিক ছিল। পূর্বে গ্রামসম্পর্ক পাতান হইত ও যাহার সহিত যেরূপ সম্পর্ক পাতান হইত, তাহার প্রতি লোকে তদনুরূপ ব্যবহার করিত; তাঁহারা ''দেহসম্বন্ধ হতে গ্রামসম্বন্ধ সাঁচা''* জ্ঞান করিতেন। এমন কি, ইতর লোকের সহিত ওইরূপ সম্বন্ধ পাতান হইত ও ওইরূপ সম্বন্ধানুসারে ব্যবহারের সময় অনেক পরিমাণে জাতিভেদের নিয়ম পালন করা হইত না। বাটীতে কোনো কার্য উপস্থিত হইলে পাড়ার লোকে আসিয়া সমস্ত কার্য নির্বাহ করিত; এমন কি, গৃহমার্জনী পর্যন্ত লইয়া গৃহমার্জন করিত। পূর্বকার লোকেরা আপদ্ বিপদে পাড়ার লোকসকলের বিশেষ সহায়তা করিতেন, এখন তেমন দেখা যায় না। দূরস্থ পল্লিগ্রামে সে কালের ভাব এখনও দৃষ্ট হয়। সে কালে কলিকাতার নিকটস্থ কোনো গ্রামে এক সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ছাতি হাতে করিয়া বাড়ি বাড়ি ভ্রমণ করিয়া কে কেমন আছে, কাহার কী হইয়াছে, এই সব তত্ত্ব লইতেন।* সে গ্রামের যে সকল চাকুরে লোকদিগকে সর্বদা বিদেশে থাকিতে হইত, তাঁহার উপরে তাহারা স্বগৃহের আবশ্যক কর্মের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। তিনি তাহা সুন্দররূপে

* চৈতন্যচরিতামৃত।

* প্রসিদ্ধ রামদুলাল সরকার মহাশয় প্রতিদিন প্রাতঃকালে আপনার পল্লিমধ্যে প্রত্যেক বাটীতে যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। যাহার বাটীতে যে দিন অন্নের অসংস্থান থাকিত, সেই দিন তাহার বাটীতে মাসাধিক চলে, এমন তণ্ডুলাদি পাঠাইয়া দিতেন। তন্নিমিত্ত তিনি স্বীয় পল্লিমধ্যে কর্তা উপাধি প্রাপ্ত হন।

নির্বাহ করিতেন। এমন কি, কাহারো বাড়িতে পুষ্করিণী খনন হইতেছে, বাড়ির কর্তা বিদেশে, তিনি রৌদ্রের সময় ছাতি ঘাড়ে করিয়া বসিয়া খনন কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাঁহার বাড়িতে এক স্বপ্নাদ্য ঔষধ ছিল; দেশ বিদেশ হইতে রোগী সকল তাহা লইতে আসিত। তিনি কখনও কখনও তাহাদের মল-মূত্র পর্যন্ত স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। এমন পরহিতৈষিতা এখন কোথায় দেখা যায়? এক্ষণে আতিথেয়তা ধর্মেরও হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সে কালের এমন সকল গল্প শুনা আছে যে, এক এক লোকের বাড়িতে রাশীকৃত অন্ন পাক হইত; সেই রাশীকৃত অন্নের উপর ঘি ঢালিয়া দেওয়া হইত। কেবল বাড়ির কর্তা যিনি, তিনিই ঘি খাবেন, এ বড়ো খারাপ কথা, সেই সঘৃত অন্ন অতিথি অভ্যাগত সমুদায় লোককে ভোজন করান হইত। এখন এমনি হইয়া উঠিয়াছে, বাগান হইতে আম্র আইলে তাহার মধ্যে হিসাব মতো কয়েকটা রেখে বাকি বাজারে বিক্রয় করিতে দেওয়া হয়। পূর্বে বাটীতে লোক আইলে তিনি যাহাতে অধিক দিন থাকেন, লোকে এমন আগ্রহ প্রকাশ করিত, পূর্বে ঘটি বাঁধা দিয়া লোকে অতিথিসেবার ব্যয় নির্বাহ করিত, এক্ষণে অতিথি বাটী হইতে বেরুতে পারিলে বাঁচে। এখনও কলিকাতা অপেক্ষা পল্লিগ্রামে অধিক আতিথেয়তা আছে। যেমন অন্যদেশীয় লোক অপেক্ষা স্বদেশীয় লোক নিকটতর, তেমনি অন্য স্বদেশীয় লোক অপেক্ষা আত্মীয় কুটুম্ব নিকটতর। এই নিকটতর সম্পর্কবোধ ক্রমে হ্রাস হইতেছে। পূর্বকার লোকেরা আত্মীয় স্বজনের যেমন সংবাদ লইতেন, এক্ষণকার লোকে তেমন লয় না। বদান্যতা বিষয়েও এ কালের লোকদিগের হীনতা দৃষ্ট হয়। এক্ষণকার বদান্যতা চাঁদাপুস্তকগত বদান্যতা, আন্তরিক বদান্যতা নহে। পূর্বকার বদান্যতা আড়ম্বরশূন্য ছিল; এক্ষণকার বদান্যতা সাড়ম্বর। এখনও পল্লিগ্রামে অনেক আড়ম্বরশূন্য বদান্যতার কার্য হইয়া থাকে; তাহা সাহেবদের গোচর হয় না। তাঁহারা অনুমান করেন যে, বাঙালিদিগের বদান্যতা নাই। যাহা হউক, গড়ে এ কালে স্বার্থপরতার অতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে সন্দেহ নাই। বর্তমান সভ্যতার অপর নাম স্বার্থপরতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্বে যে ব্যক্তি পনেঁরো টাকা মাসে উপার্জন করিত, সে আট টাকা পরিবার প্রতিপালনে ব্যয় করিয়া বাকি সাত টাকা পরোপকারে ব্যয় করিতে সমর্থ হইত, এক্ষণে সে সেই সাত টাকা সভ্যতার অনুরোধে বিলাসের দ্রব্যে ব্যয় করিতে বাধ্য হয়।

কৃতজ্ঞতাধর্মেও এক্ষণকার লোকদিগকে পূর্বকার লোক অপেক্ষা হীন দেখা যায়। পূর্বকার লোকে যেমন সরলতাপূর্বক উপকার স্বীকার করিতেন, এক্ষণকার লোকে সেরূপ করে না। স্বকীয় গৌরব নাশের আশঙ্কায় তাহারা তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করে। এক্ষণকার একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তি বলেন যে, তিনি যাহার যত উপকার করিয়াছেন, তিনি তাহা হইতে তত অনিষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছেন; এক্ষণে তিনি স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের উপর একবারে এমনি চটিয়া গিয়াছেন যে, কাহারও উপকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। এরূপ চটিয়া বসিয়া থাকা অন্যায় কিন্তু এরূপ চটিবার বিশেষ কারণ আছে, তাহাও অস্বীকার করা যাইতে পারে না। আমরা যে বিখ্যাত ব্যক্তির কথা বলিতেছি, তিনি বস্তুত চটিয়া বসিয়া থাকেন না, তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে চটিয়া থাকিতে দেয় না।

এক্ষণে সুখপ্রিয়তা, বিলাসপরায়ণতা ও বাবুগিরির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন শুনা গিয়াছে, পূর্বকালের কোনো দেওয়ান নৌকা হইতে উঠিয়া বাড়ি যাইবেন; যেখানে নৌকা হইতে নামিলেন, সেখান হইতে তাঁহার বাটী ১০।১২ ক্রোশ দূর। পালকি আসিয়া

পৌঁছে নাই; তিনি হাঁটিয়াই চলিয়া গেলেন। এখন দু পা হাঁটিতে হইলে সম্পন্ন লোকে বিপদ্ জ্ঞান করে। সেতুবন্ধ রামেশ্বরের লোকেরা বাবুকে "জবড়জঙ্গ্" বলিয়া ডাকে; বাবুর এমন উপযুক্ত আখ্যা আর কোনোখানে শুনি নাই। দেওয়ান বাটীতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃবধূর প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়াছে; সূতিকাগৃহের জন্য কাষ্ঠ চাই। কিন্তু দেখেন, ভৃত্যেরা কোনো কারণবশত কেহ উপস্থিত নাই; কি করেন, নিজেই কাঠ চেলা করিতে আরম্ভ করিলেন। এক্ষণকার লোকে এরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতে অত্যন্ত বিমুখ। এখন লেখাপড়া শিখিলেই কেবল বাবু হইবার চেষ্টা। কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি, তিনি স্বীয় গ্রামের কৃষকদিগের নিমিত্ত নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিলেন, তাহাতে উল্টা ফল উৎপত্তি হইতে লাগিল। ছেলেদের পিতারা বলিতে লাগিল, "মহাশয়! আমার ছেলেকে আর পড়িতে দেওয়া হবে না। আমাদের বাপ পিতামহের প্রথা চাষবাস করা, ছেলেরা তাহাতে সাহায্য করিয়া থাকে। এখন স্কুলে দেওয়া অবধি আমার ছেলে এমনি বাবু হয়ে পড়েছে যে, কেবল মোজা আর ইংরাজি জুতা পরিবার জন্য ব্যগ্র; আমার কোনো কর্মেই সে সাহায্য করে না।" এই কথা অনেক স্থলে নাইটস্কুলের ছাত্রদিগের পক্ষে খাটে।

চরিত্র বিষয়ে বর্তমান বঙ্গসমাজের আর এক অবনতির চিহ্ন যুবকদিগের অশিষ্ট ব্যবহার। সে কালে যেমন প্রবীণ ব্যক্তির সম্মান ছিল, যেমন প্রত্যেক পাড়ায় এক জন করিয়া কর্তা থাকিতেন, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত, সকলেই তাঁহার বশংবদ থাকিত, সেরূপ ভাব এখন দৃষ্ট হয় না। এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহাকে মানে না, কেহ কাহার তোয়াক্কা রাখে না। স্বাধীনতার ভাব ভালো ভাব, কিন্তু বয়সের প্রতি, বিজ্ঞতার প্রতি উপযুক্ত সম্মান করা কর্তব্য। ঔদ্ধত্য কখনোই প্রশংসনীয় হইতে পারে না। যুবকেরা অত্যন্ত মান্য ব্যক্তির বিষয়েও কথোপকথনের সময়—"তিনি" শব্দ ব্যবহার না করিয়া "সে" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে; "করিয়াছেন" শব্দ ব্যবহার না করিয়া "করিয়াছে" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে; নিউটন ও বেকনও এই অশিষ্টাচার হইতে অব্যাহতি পান না। কিন্তু আপনার স্ত্রীর প্রতি তাহাদিগকে এরূপ অসম্মান প্রকাশ করিতে কখনো দৃষ্ট হয় না। পায়ে পা ঠেকিয়াছে, হয় ইংরাজি শিষ্টাচার অনুসারে "বেগ ইওর পার্ডন" বল, অথবা বাঙালি প্রথা অনুসারে "নমস্কার" কর, ইহার কিছুই করে না। রাস্তায় মান্য ব্যক্তির সহিত দেখা হইলে, হয় ইংরাজি প্রথানুসারে মাথা নোয়াও অথবা বাঙালি প্রথা অনুসারে নমস্কার কর, কিন্তু কিছুই করা হয় না। তাঁহার প্রতি এমনি ব্যবহার করা হয়, যেন তাঁহার সঙ্গে কোনো কালে আলাপ নাই। কোনো কোনো যুবককে গুরুতর ব্যক্তি যে কেদারায় বসিয়া আছেন, তাহার উপর ইংরেজি কেতা অনুসারে পা রাখিতে দৃষ্ট হয়। অশিষ্টতা ইহা অপেক্ষা অধিক গমন করিতে পারে না।

এই তো পুরুষদিগের কথা গেল। এক্ষণে এ কালের স্ত্রীলোকদিগের কথা কিছু বলিতে চাই। সে কালের স্ত্রীলোকেরা এ কালের স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক শ্রমশীলা ছিলেন। এক্ষণে সম্পন্ন মানুষের বাটীতে স্ত্রীলোকেরা যেমন দাস-দাসী ও পাচক-পাচিকার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, স্বহস্তে গৃহকার্য করিতে বিমুখ, সে কালের স্ত্রীলোকেরা সেরূপ ছিলেন না। সে কালের বড়ো বাড়ির স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত অনেক পরিমাণে গৃহকার্য নিজ হস্তে সম্পাদন করিতেন। বর্তমান সময়ে আমাদিগের দেশের শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য করিতে, শারীরিক

পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছু। এ বিষয়ে বিলাতের শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের নিকট উপদেশ গ্রহণ করা তাঁহাদিগের কর্তব্য। তাঁহারা এরূপ বাবু নহেন।* এক্ষণকার ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্ত্রীদিগের ন্যায় সে কালের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্ত্রীরা স্বহস্তে পাক করা অসম্মানের কার্য মনে করিতেন না। বিলাতে মধ্যে সম্পন্ন লোকের স্ত্রীরা পাকক্রিয়ার প্রতি অত্যন্ত অমনোযোগী হইয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহারা তজ্জন্য অনুতাপ করিতেছেন। এক্ষণে মহা প্রদর্শনের স্ফাটিক গৃহে** একজন সূপশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তি ওই শাস্ত্র বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন; অনেক বিবি তাহা শুনিতে যান। এক্ষণে পাকক্রিয়ার উন্নতি সাধন জন্য স্ত্রীলোকদিগের একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই সভার কর্ত্রী মহারানির এক কন্যা। আমাদিগের দেশ এক্ষণে সকল বিষয়ে বিলাতের অনুবর্তী। যখন বিলাতে এ বিষয়ে মনোযোগ প্রদত্ত হইতেছে, তখন ভরসা হইতেছে, এখানেও ওই বিষয়ে মনোযোগ প্রদত্ত হইবে। সম্প্রতি বিলাতের একটি বিবি বাঙগালি দ্বারা সম্পাদিত কোনো ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদককে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকেরা চিরকাল পাকক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ জন্য বিখ্যাত; এ বিষয়ে তাঁহাদিগের মনোযোগ যেন ন্যূন না হয়; তাহা হইলে তজ্জন্য বিলাতের বিবিরা এক্ষণে যেমন অনুতাপ করিতেছেন, সেইরূপ অনুতাপ করিতে হইবে। সে কালের স্ত্রীলোকেরা এক্ষণকার স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক আত্মনির্ভর-শালিনী ছিলেন। তাঁহারা শিশু সন্তানের সামান্য সামান্য রোগে চিকিৎসকের উপর এত নির্ভর করিতেন না, নিজে চিকিৎসা করিতেন। এ বিষয়ে সে কালের স্ত্রীলোকদিগের যে জ্ঞান ছিল, তাহা অবজ্ঞা করা আমাদের উচিত হয় না। এখনও সে কালের যে সকল গিন্নিবান্নি জীবিত আছেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে ওই সকল ঔষধ জানিয়া লইয়া তদ্বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রকাশ করা কর্তব্য। শিশু সন্তানদিগের প্রতি তেজস্কর বিদেশীয় ঔষধ প্রয়োগ করা তাহাদিগের রুগ্ণ প্রকৃতি ও দৌর্বল্যের প্রধান কারণ। সে কালের স্ত্রীলোকেরা এক্ষণকার স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক স্নেহশীলা ও দয়াশীলা ছিলেন। স্বামীর ও পুত্রের প্রতি স্ত্রীলোকের তো স্বভাবত স্নেহ হইয়া থাকে। স্বামী ও পুত্র ব্যতীত অপরের প্রতি দয়া ও স্নেহ করাই ধর্ম। সে কালের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্ত্রীরা বাটীস্থ আত্মীয় পরিজন ভৃত্য সকলের ভালো করিয়া আহার হইল কি না, তাহা নিজে সম্পূর্ণ মনোযোগপূর্বক দেখিতেন। এক্ষণে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্ত্রীরা সেরূপ দেখেন না। পতিভক্তি ও পতিনিষ্ঠা আমাদিগের হিন্দু স্ত্রীদিগের প্রধান গৌরবস্থল। এ বিষয়েও এ কালে স্ত্রীলোকদিগের হীনতা দৃষ্ট হইতেছে।

উপরে ভদ্র স্ত্রীপুরুষদিগের চিত্র প্রদর্শিত হইল। যখন ভদ্রলোকেরা এরূপ, তখন ছোটো লোকেরা ভালো থাকিবে, ইহা কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? আমাদিগের দেশের ছোটো লোকেরা অন্যান্য দেশের ছোটো লোক অপেক্ষা ধীর, সৎ, বিশ্বাসী ও ধর্মভীরু। ইউরোপ খণ্ডের ছোটো লোকেরা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পশুবিশেষ বলিলে হয়। ইহার প্রমাণ জাহাজি ও সৈনিক গোরাদিগের আচরণ। আমাদিগের দেশের ছোটো লোকেরা এরূপ নহে। ইহার প্রধান কারণ পূর্বকার ভদ্র লোকদিগের দৃষ্টান্ত এবং রামায়ণ ও মহাভারতের

* "বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানেন, নৈসর্গিক নিয়ম কখনো কালমাহাত্ম্যে পরিবর্তিত হয় না। যদি আধুনিক বাঙগালিরা বহুরোগী এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে, তবে তাহার অবশ্য নৈসর্গিক কারণ আছে, সন্দেহ নাই। আধুনিক প্রসূতিগণের শ্রমবিরতিই সেই সকল নৈসর্গিক কারণের মধ্যে অগ্রগণ্য।"—'বঙ্গদর্শন,' বৈশাখ, ১২৮১।

** সমকালীন লন্ডনে একটি বড়ো এগজিবিশনের উল্লেখ করছেন রাজনারায়ণ (সম্পাদক)।

নীতিগর্ভ কথা সর্বদা শ্রবণ। কিন্তু এক্ষণকার ভদ্রলোকদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে ছোটো লোকদিগের মধ্যে পানদোষ ও অসৎ ব্যবহার ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে এক্ষণে সেরূপ সততা ও ধর্মভীরুতা দৃষ্ট হয় না। পূর্বে প্রভু ভৃত্যের মধ্যে যেরূপ একটি স্নেহভাব দৃষ্ট হইত, এক্ষণে তাহারও হ্রাস হইয়া আসিতেছে। প্রভুদিগের ব্যবহার ইহার একটি প্রধান কারণ বলিতে হইবে। তাঁহারা ভৃত্যদিগের প্রতি সে কালের লোকের মতো সদয় ব্যবহার করেন না, ইংরাজি চলনে চলেন। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে ভৃত্যদিগের প্রতি যেরূপ নির্মায়িক ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইঁহারাও সেইরূপ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের স্বরণ করা কর্তব্য "সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে" অর্থাৎ সুখ দুঃখ আপনার যেমন, পরেরও সেইরূপ। সাহেব তাঁহাদিগকে অপমান করিলে তাঁহাদিগেব মনে যেরূপ গ্লানি উপস্থিত হয়, তাঁহাদিগের ভৃত্যদিগকে অপমান করিলেও তাহাদিগেরও সেইরূপ হইয়া থাকে।

উপরে প্রদর্শিত চিত্র অবলোকন করিলে প্রতীতি হইবেক যে, চরিত্র বিষয়ে আমাদিগের সমাজ ক্রমে অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা আমাদের পুরাতন গুণগুলি হারাইতেছি, অথচ ইংরাজদিগের সদ্‌গুণ সকল অনুকরণ করিতেছি না। বিলাতের অনেক ভদ্র ইংরাজেরা চরিত্র বিষয়ে আমাদিগের অনুকরণস্থল হইতে পারেন। এমন শুনা গিয়াছে, তাঁহারা ব্রান্ডি পান করেন না, তাঁহারা ব্রান্ডির নাম পর্যন্ত ভদ্রলোকের নিকট উচ্চারণ করা অশিষ্টাচার জ্ঞান করেন। তাঁহাদের স্বার্থপরতা অল্প, আতিথেয়তা বিলক্ষণ আছে, সরলতা বিলক্ষণ আছে, কৃতজ্ঞতাও বিলক্ষণ আছে। কই, বিলাতের ভদ্র ইংরাজদিগের এই সকল ভদ্র গুণ তো আমরা অনুকরণ করি না? কই, সাধারণ ইংরাজবর্গের সাহস, অধ্যবসায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা ও শ্রমশীলতা তো আমরা অনুকরণ করি না? তাঁহাদের যত মন্দ গুণ, তাই অনুকরণ করি। এদিকে এই অধম প্রবৃত্তি, ও দিকে সমস্ত হিন্দু আচার ব্যবহারের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা, এই দুইটি একত্র মিলিত হইয়া যে কী অনিষ্ট সম্পাদন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তালরস বৃক্ষের অভ্যন্তরে থাকিয়া নৈসর্গিক নিয়মানুসারে পরিমিত সূর্যকিরণ সেবনে মধুর গুণ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহা বহির্গত করাইয়া অনৈসর্গিকরূপে অপরিমিত সূর্যকিরণ সেবন করাইলে, তাড়িতে পরিণত হয়। সেইরূপ যদি হিন্দু সমাজ আপনাতে আপনি থাকিয়া অর্থাৎ আপনার মর্যাদা না হারাইয়া স্বীয় আচার ব্যবহার সকলকে পাশ্চাত্য আলোক স্বাভাবিক ক্রমে সেবন করায়, তাহা হইলে তাহা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া, উহা আপনাতে আপনি থাকিয়া, ওই সকল আচার ব্যবহারকে ওই আলোক অস্বাভাবিক আতিশয্যের সহিত সেবন করাইতেছে; ইহাতে কেবল এই ফল হইতেছে যে, উক্ত সমাজ গাঁজিয়া উঠিয়া ভ্রষ্টাচাররূপ জঘন্য তাড়ি উৎপন্ন করিতেছে। আবার, যাঁহারা এই জঘন্য তাড়ি পান করেন, তাঁহাদের মত্ততাই বা কত!

চরিত্র বিষয়ে দেশস্থ লোকের অবনতির কারণ তাহাদিগের ধর্ম বিষয়ে অবনতি। ধর্মের প্রধান উপাদান ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও পরকালের ভয়। সে কালের লোকের বিশ্বাস যেরূপ থাকুক না কেন, ঈশ্বরের প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং পরকালের ভয় ছিল; এক্ষণকার লোকদিগের সেরূপ দৃষ্ট হয় না। বিদ্যানুশীলনের প্রাদুর্ভাববশত ধর্ম বিষয়ে সত্যজ্ঞান প্রচারিত হইতেছে বটে, কিন্তু ধর্মের প্রধান উপাদান শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পরকালের ভয়, সে সকল ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। এক্ষণকার সাকার উপাসকদিগের আপনাদিগের উপাসিত দেব দেবীতে তত বিশ্বাস নাই; তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম এক্ষণে কেবল তামসিক

ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণকার নিরাকার উপাসকদিগকে জিজ্ঞাস্য এই যে, সরলচিত্ত বিশ্বাসী সাকার উপাসকেরা যেমন তাঁহাদের দেবতাকে সাক্ষাৎ দেখেন, তাঁহারা কি নিরাকার ঈশ্বরকে সেইরূপ সাক্ষাৎ দেখিয়া তাঁহার উপাসনা করেন? সে কালের পৌত্তলিকেরা যেরূপ তাঁহাদিগের ধর্মের নিয়ম সকল পালন করিতেন, তাঁহারা কি তাঁহাদের ধর্মের নিয়ম, বিশেষত উপাসনার নিয়ম সেইরূপ পালন করিয়া থাকেন? পূর্বকালের লোকেরা যেমন সকল কার্যে পরকালের ভয় করিতেন, তাঁহারা কি সেইরূপ করিয়া থাকেন? সে কালের লোকেরা যেরূপ ধর্মভীরু, সরল, স্নেহশীল ও দয়াশীল ছিলেন, তাঁহারা কি সেইরূপ ধর্মভীরু, স্নেহশীল ও দয়াশীল? এক্ষণে সভা, বক্তৃতা, উৎসবরূপ ধর্মামোদের প্রতি লোকের অধিক দৃষ্টি; ধর্ম সাধনের প্রতি তত দৃষ্টি নাই। এক্ষণে ধর্মবিষয়ে উপদেশের আলঙ্কারিক সৌন্দর্যের প্রতি লোকের অধিক দৃষ্টি; সেই উপদেশানুসারে কার্যের প্রতি তত দৃষ্টি নাই। লোকে ধর্মোপদেশ শুনিয়া বলে, "বেস বক্তৃতা করিয়াছে,—বেস্ বক্তৃতা করিয়াছে।" কিন্তু যে উপদেশ শুনা হয়, তাহা কার্যে পরিণত করিতে অতি অল্প লোকেই চেষ্টিত হয়। এই অবস্থায় যে এক্ষণে এই দেশে কেবল ধর্মোদাসীনের দল,—কেবল ধর্মশূন্য লোকের দল বাড়িবে, তাহার সন্দেহ কী? ধর্ম সমাজ-রক্ষার পত্তন ভূমি। যে সমাজের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সে সমাজের কি উন্নতির আশা করা যাইতে পারে? নাস্তিকতা ও তজ্জনিত পাপাচরণ জন্য অত বড়ো ফ্রান্সের কী দুর্দশাই না হইল? যেখানে ধর্ম নাই, সেখানে ওইরূপ দুর্দশাই ঘটে।

বর্তমান বঙ্গসমাজের রাজ্যবিষয়ক অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। আমরা নিশ্চয় জানি যে, আমরা আত্মশাসনে অক্ষম। আমাদিগকে এক্ষণে অনেক দিন পরাধীন হইয়া থাকিতে হইবে। এক প্রভু গিয়া আর এক প্রভু হইতে পারে, কিন্তু হয়ত সেই প্রভু, আমাদিগের বর্তমান প্রভুরা যত ভালো, তত ভালো না হইতেও পারেন। অতএব এতদ্দেশে ইংরাজদিগের রাজত্ব স্থায়ী হয়, আমরা ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষেরা আমাদিগের ন্যায্য আশা পূরণ করেন না। পূর্বে সাহেবেরা এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে প্রায় সেরূপ ব্যবহার করেন না। এক্ষণে ইংলণ্ড গমনের সুবিধা হওয়াতে এ দেশের প্রতি সাহেবদিগের পূর্বাপেক্ষা মমতা কমিয়া গিয়াছে, আর সেরূপ বাঙগালি কর্মচারীর বাড়িতে গিয়া কোনো সাহেব তাহাব কুশল জিজ্ঞাসা করেন না এবং তাহার সন্তানদিগকে আদর করেন না। সে কালের বাঙগালিরা তাঁহাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা তত ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিতেন না, তাঁহারা রাজ্যতত্ত্ব তত সূক্ষ্মরূপে বুঝিতেন না, আর সাহেবেরাও তাঁহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। এই সকল কারণে তাঁহারা তাঁহাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতেন। এক্ষণে নানা কারণে চতুর্দিকে অসন্তোষ বৃদ্ধি হইতেছে। ইংরাজি শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে উচ্চ উচ্চ বাসনার উদ্রেক হইতেছে, কিন্তু রাজপুরুষেরা আমাদিগের সেই সকল বাসনা পূর্ণ করিতেছেন না। আমরা গবর্ণমেন্টের দোষসকল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদিগের হাত পা বাঁধা, সে সকল দোষ সংশোধন বিষয়ে আমাদিগের কোনো কথাই চলে না। গ্রিক পুরাণে লিখিত আছে যে, ট্যাণ্টেলস্ নামক এক ব্যক্তি নরকে একটি অদ্ভুত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। পিপাসায় আকুল, কিন্তু যেমন সে স্রোতের জল পান করিতে যায়, তেমনি জল তার ওষ্ঠদ্বয় হইতে পলায়ন করে। আমাদিগের দশা সেইরূপ হইয়াছে। আমরা যখন মনে করি যে, রাজ্য সম্বন্ধীয় কোনো সুখ লাভ

করিলাম, অমনি সেই সুখ আমাদিগের নিকট হইতে পলায়ন করে। আমরা ইংরাজি শিক্ষা না করিতাম; এ বিড়ম্বনা অপেক্ষা সে বরং ভালো ছিল। কোনো ইংরাজি কবি বলিয়াছেন ঃ--

"Where ignorance is bliss,
'Tis folly to be wise."

"যখন অজ্ঞতায় সুখ, তখন বিজ্ঞ হওয়া অজ্ঞতার কর্ম।"

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করুন,—যখন আমরা শারীরিক বলবীর্য হারাইতেছি,—যখন দেশীয় সুমহৎ সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের চর্চা হ্রাস হইতেছে,—যখন দেশীয় সাহিত্য ইংরেজি অনুকরণে পরিপূর্ণ,—যখন দেশের শিক্ষাপ্রণালী এত অপকৃষ্ট যে, তদ্দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হইয়া কেবল স্মৃতিশক্তির বিকাশ হইতেছে,—যখন বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে না,—যখন স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত,—যখন উপজীবিকার আহরণের বিশিষ্ট উপায় সকল অবলম্বিত হইতেছে না,—যখন সমাজসংস্কারে আমরা যথোচিত কৃতকার্য হইতে পারিতেছি না,—যখন চতুর্দিকে পানদোষ, অসরলতা, স্বার্থপরতা ও সুখপ্রিয়তা প্রবল,—যখন আমাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থা শোচনীয়,—বিশেষত যখন ধর্মের অবস্থা অত্যন্ত হীন,—তখন গড়ে আমাদিগের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, তাহা মহাশয়েরা বিবেচনা করুন।

কিন্তু আমাদিগের নিরাশ হওয়া কর্তব্য নহে। আশা অবলম্বন করিয়া থাকিতেই হইবে, যে হেতু আশাই সকল উন্নতির মূল। যখন বাঙ্গালি দ্বারা কোনো কালে অনেক কার্য সাধিত হইয়াছিল, তখন এমত আশা করা যাইতে পারে যে, সেই বাঙ্গালি দ্বারা পুনরায় অনেক কার্য সাধিত হইবে। সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন প্রভৃতি রাজারা, যাঁহারা পাণ্ডবদিগের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালি ছিলেন। রাজকুমার বিজয়সিংহ, যিনি পিতা কর্তৃক স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া কতকগুলি অনুচরের সহিত সমুদ্রপোতে আরোহণপূর্বক সিংহলে গমন করিয়া উক্ত উপদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন এবং যাঁহার সিংহ উপাধি হইতে ঐ উপদ্বীপ সিংহল নামে আখ্যাত হইয়াছে, তিনি একজন বাঙ্গালি ছিলেন। চাঁদ, ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর, যাঁহারা সমুদ্রে গমনাগমনপূর্বক বাণিজ্য কার্য সমাধা করিতেন, তাঁহারা বাঙ্গালি ছিলেন। দেবপাল, ভূপাল, মহীপাল প্রভৃতি সার্বভৌম সম্রাট্, যাঁহারা কর্ণাট হইতে তিব্বত পর্যন্ত দেশ সকলকে করপ্রদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালি ছিলেন।

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ"

যিনি জাহাঙ্গির বাদ্‌শার সেনাপতিদিগকে হিম্‌সিম্ খাওয়াইয়াছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালি ছিলেন। বাঙ্গালিদিগের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত হীন; কিন্তু যখন এই বর্তমান হীন অবস্থাতেও তাহারা কিছু কিছু কার্য করিতে সমর্থ হইতেছে, তখন এমন আশা করা যাইতে পারে যে, ভবিষ্যতে তাহারা অধিক কার্য করিতে সমর্থ হইবে। বর্তমান কালের একজন বাঙ্গালি সাহেবদিগের মধ্যে "Fighting Moonsiff" অর্থাৎ "যুদ্ধ-কুশল মুন্সেফ" নাম লাভ করিয়াছিলেন এবং সিপাহিদিগের বিদ্রোহের সময়, ইংরাজ রাজপুরুষদিগের পক্ষে যুদ্ধ করাতে গবর্ণমেন্ট হইতে জায়গির প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালিরা এক্ষণে ভীষণ সমুদ্র-তরঙ্গ পার হইয়া ইংলন্ডে গমনপূর্বক তথায় মহা সম্মান প্রাপ্ত হইতেছে। বাঙ্গালিরা এক্ষণে সিবিল

সর্বিসের পরীক্ষা দিয়া কলির ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে। ভারতবর্ষে যেখানে বাঙগালিরা গমন করিতেছে, সেইখানে একটা কারখানা করিয়া তুলিতেছে। যথা,—অযোধ্যায়, জয়পুরে, কাশ্মীরে। বাঙগালিরা এক্ষণে ধর্ম ও রাজ্য বিষয়ক আন্দোলনে ভারতবর্ষে অগ্রবর্তী স্থান অধিকার করিতেছে। অতএব বাঙগালি দ্বারা যখন এতটুকু হইয়াছে, তখন যে অধিক হইবে না, ইহা কী প্রকারে বলা যাইতে পারে? ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি নীচকে উচ্চ করিতে পারেন ও উচ্চকে নীচ করিতে পারেন। এই বাঙগালি জাতি এক্ষণে সকলের নিকট ঘৃণিত; কিন্তু হয়ত এই বাঙগালি জাতি যাহা করিবে, ভারতবর্ষের আর কোনো জাতি তাহা করিতে সমর্থ হইবে না। হয়ত এই দুর্বল বাঙগালি জাতি ভবিষ্যতে পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান জাতি হইয়া উঠিবে। ঈশ্বর সেই দিন শীঘ্র আনয়ন করুন!

উৎস : সে কাল আর এ কাল

# ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান

## শিবনাথ শাস্ত্রী

এক্ষণে ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত এই কালের মধ্যে বঙ্গ-সমাজে যে যে বিশেষ আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহার কিছু কিছু নির্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বলিতে গেলে রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়, হিন্দুকালেজের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের আবির্ভাব, মধুসূদন দত্তের প্রভাব প্রভৃতি ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা বঙ্গসমাজে যে নব আকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, তাহা এই কয়েক বৎসর আপনার কাজ করিয়া আসিতেছিল। এই ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে তাহা আরও ঘনীভূত আকারে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল। এই কালের মধ্যে নববঙ্গের কয়েকজন নূতন নেতা দেখা দিয়াছিলেন এবং বঙ্গবাসীর চিত্ত ও চিন্তাকে নূতন পথে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন।

এই কালের প্রথম ভাগে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় নবোদীয়মান রবির ন্যায় বঙ্গাকাশে উঠিতে লাগিলেন; এবং তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মসমাজও সূর্যমণ্ডলের ন্যায় মানব-চক্ষুর গোচর হইল। ১৮৫৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ধ্যান ধারণাতে বিশেষভাবে কিছুকাল যাপন করিবার আশয়ে শহর ত্যাগ করিয়া হিমালয় শিখরে গমন করেন। ১৮৫৮ সালের শেষভাগে তিনি শহরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি কেশবকে আপনার প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে গ্রহণ করিলেন। উভয়ের যোগ মণি-কাঞ্চনের যোগের ন্যায় হইল। উভয়ে মিলিত হইয়া নব নব কার্যে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন।

১৮৫৯ সাল হইতে ব্রাহ্মসমাজে নব শক্তির সঞ্চার দেখা গেল। এক দিকে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার শৈলবাসকালের সাধনার চরম ফল সকল তাঁহার চিরস্মরণীয় উপদেশগুলির মধ্যে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার মানুষ অধ্যাত্মতত্ত্বের এরূপ ব্যাখ্যা পূর্বে কখনও শোনে নাই। সুতরাং শহরে ত্বরায় এই জনরব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গিরিশৃঙ্গ হইতে নামিয়া ব্রাহ্মসমাজকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন। এই সংবাদে নানাশ্রেণির লোক ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার দিনে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। একদিনের উপদেশ শুনিয়া আমরা সাতদিন মন স্থির রাখিতে পারিতাম না। হৃদয়ে কী নব ভাব জাগিত! চক্ষে কী নূতন জগৎ

আসিত। এই সকল উপদেশ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়া বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি-রূপে রহিয়াছে। আজ তাহাদের আদর না হউক একদিন হইবেই হইবে। এমন সুন্দর ভাষায় এরূপ উচ্চ সত্য সকল যে ব্যক্ত হইতে পারে, ইহাই বঙ্গভাষার অসীম স্থিতিস্থাপকতার নিদর্শন। কিছু না হইলে ভাষার দিক দিয়া এই উপদেশগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবীর পাঠ্য।

অপরদিকে যুবক কেশবচন্দ্রের উৎসাহাগ্নি সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি একাকী ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন না। তাঁহার পদবির অনুসরণ করিয়া তাঁহার যৌবন-সুহৃদগণের অনেকে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। ইঁহাদের প্রেমোজ্জ্বল হৃদয়ের সংস্পর্শে ব্রাহ্ম-সমাজে এক প্রকার নবশক্তির সঞ্চার হইল। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র মিলিত হইয়া এই সময়ে কয়েক প্রকার কার্যের আয়োজন করিলেন। প্রথম যুবকগণের ধর্ম শিক্ষার্থ ব্রহ্মবিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। প্রতি রবিবার প্রাতে ওই বিদ্যালয়ের অধিবেশন হইত; তাহাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালাতে এবং কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজিতে উপদেশ দিতেন। ওই সকল উপদেশ দ্বারা অনেক শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারী যুবকগণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংসৃষ্ট হওয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং তদগ্রেই যাঁহারা কেশবচন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া কেশব এক সুহৃদগোষ্ঠী স্থাপন করিলেন; সপ্তাহের মধ্যে একদিন নিজভবনে তাঁহাদের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপের জন্য বসিতেন। সেখানে সর্বপ্রকার ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে কথাবার্তা হইত। দেবেন্দ্রনাথ পঞ্জাবিদিগের সুহৃদগোষ্ঠীর সংগত সভা নাম দেখিয়া ইহার নাম সংগত সভা রাখিলেন। এই সংগত সভা ব্রাহ্মসমাজের নবশক্তির অদ্ভুত উৎসস্বরূপ হইল। যুবকসভ্যগণ সর্বান্তঃকরণের সহিত আত্মোন্নতি প্রার্থী হইয়া সংগতের আলোচনাতে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করিতেন এবং যাহা কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইত, তাহা সর্বতোভাবে আচরণ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিতেন। এক এক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যাইত; তাঁহাদের জ্ঞান থাকিত না; রাত্রি ৯টার সময়ে বসিয়া হয়ত ২টার সময়ে সভাভঙ্গ হইত; কোথা দিয়া যে সময় যাইত কেহই বুঝিতে পারিত না। এরূপ আত্মোন্নতির জন্য ব্যাকুলতা, এরূপ কর্তব্যসাধনে দৃঢ় নিষ্ঠা, এরূপ সত্যানুসরণে চিত্তের একাগ্রতা, এরূপ হৃদয়স্থ বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ, এরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর সচরাচর দেখা যায় না। অল্পদিনের মধ্যেই কেশবকে বেষ্টন করিয়া এক ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী সৃষ্ট হইল। ১৮৬১ সালে কেশবচন্দ্র বিষয়কর্ম হইতে অবসৃত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলে ইঁহাদের অনেকে তাঁহার অনুসরণ করিয়া চিরদারিদ্র্যে ঝাঁপ দিয়াছিলেন এবং এখনও ইঁহাদের অনেকে ব্রাহ্মধর্মপ্রচার কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের শক্তির উৎসস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন।

সংগত সভার সভ্যগণ যে নবভাবে দীক্ষিত হইলেন তাহা এই যে, হৃদয়ের বিশ্বাসকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে, তদ্ব্যতীত ধর্ম হয় না। এই ভাব অন্তরে প্রবল হওয়াতে ১৮৬১ সাল হইতে ব্রাহ্মধর্মকে অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য ব্যগ্রতা দৃষ্ট হইতে লাগিল। ওই সালে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি অনুসারে দিলেন। এদিকে যুবক ব্রাহ্মদলে অনেক ব্রাহ্মণের সন্তান জাতিভেদের চিহ্নস্বরূপ উপবীত পরিত্যাগ করিয়া নানা প্রকার সামাজিক নিগ্রহ ও নির্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন। দেশমধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

নবীন ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের কার্যক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। প্রধানত মনোমোহন ঘোষ ও কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে ও দেবেন্দ্রনাথেব অর্থসাহায্যে "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইল; কলিকাতা কালেজ নামে এক উচ্চশ্রেণির বিদ্যালয় স্থাপিত হইল; তাহা নবীন ব্রাহ্মদলের এক প্রধান আড্ডা হইয়া দাঁড়াইল; এবং সর্ববিধ সদালোচনার জন্য ব্রাহ্মবন্ধু সভা নামে এক সভা স্থাপিত হইল। এই সময়ে অগ্রসর ব্রাহ্মদল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজ সংস্কার বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইলেই নারীজাতির উন্নতির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে। সংগতের অবলম্বিত প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে নারীজাতির উন্নতিসাধনের চেষ্টা একটি প্রতিজ্ঞারূপে অবলম্বিত হয়। তদনুসারে নবীন ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয় ভবনে, স্বীয় স্বীয় পত্নী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির শিক্ষাবিধানে মনোযোগী হন। অনেকে সমস্ত দিন আফিসে গুরুতর শ্রম করিয়া আসিয়া সায়ংকালে স্বীয় স্বীয় পত্নী বা ভগিনীর শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হইতেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মবন্ধু সভার সংশ্রবে একটি স্ত্রীশিক্ষা বিভাগ স্থাপন করিয়া অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের নানা উপায় অবলম্বন করেন; এবং তাঁহাদের কয়েকজনে মিলিত হইয়া "বামাবোধিনী পত্রিকা" নামে স্ত্রীপাঠ্য একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। সে পত্রিকা অদ্যাপি রহিয়াছে। প্রথম সম্পাদকের পরিবারগণ এখনও তাহাকে রক্ষা করিতেছেন।

১৮৬৪ সালে ব্রাহ্মিকা-সমাজ নামে নারীগণের জন্য একটি স্বতন্ত্র উপাসনা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং কেশবচন্দ্র তাহার আচার্যের কার্য করিতে থাকেন। ক্রমে নবীন ব্রাহ্মদলের মধ্যে এক অত্যগ্রসর দল দেখা দিলেন; তাঁহারা নারীজাতির উন্নতির জন্য পূর্বোক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট রহিলেন না; কিন্তু আপনাপন পত্নীকে নববেশে সজ্জিত করিয়া প্রকাশ্যস্থানে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন: তাহা লইয়া চারিদিকে মহা সমালোচনা আরম্ভ হইল। এই কালের শেষভাগে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আপনার পত্নীকে লইয়া গবর্নর জেনেরালের বাড়িতে বন্ধু-সম্মিলনে যান, তাহাতেও স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ক আন্দোলনকে দেশমধ্যে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল।

যাহা হউক প্রাচীন দলের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও যুবকদলের নেতা কেশবচন্দ্র সেন, ইঁহাদের মধ্যে পরামর্শ ও কার্যের একতা বহুদিন রহিল না। নবীন ব্রাহ্মগণ অধিক দিন মুখে জাতিভেদের নিন্দা করিয়া এবং কার্যত উপবীত ত্যাগ করিয়া এবং সকল জাতি মিলিয়া একত্র পান ভোজন করিয়াও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ১৮৬৪ সাল হইতেই তাঁহারা বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই ধুয়া ধরিলেন যে, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আচার্যগণ বেদিতে বসিলে তাঁহারা উপাসনাতে যোগ দিতে পারেন না। দেবেন্দ্রনাথ এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি প্রথম প্রথম উপবীতত্যাগী উপাচার্য নিযুক্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু নবীন ব্রাহ্মগণ যখন বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন এ পথে ইহারা কতদূর যাইতে পারে ভাবিয়া চমকিয়া গেলেন। তাঁহার রক্ষণশীল প্রকৃতি আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। এই স্থলে প্রাচীন ও নবীন ব্রাহ্মদলে বিচ্ছেদ ঘটিল। অগ্রসর ব্রাহ্মদল স্বতন্ত্র কার্যক্ষেত্র করিলেন; "ধর্মতত্ত্ব" নামে মাসিক পত্রিকা বাহির করিলেন এবং ১৮৬৬ সালের নবেম্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথের সমাজ ত্যাগ করিয়া 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'

নামে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। তদবধি দেবেন্দ্রনাথের সমাজের নাম 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' হইল।

১৮৬৬ হইতে ১৮৭০ পর্যন্ত কালের মধ্যে অগ্রসর ব্রাহ্মদল মহোৎসাহে ব্রাহ্মধর্মের বার্তা ভারতে নানা প্রদেশে প্রচার করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সর্বত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। কেশবচন্দ্র সেন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চিন্তার ও চর্চার অনেক অংশ অধিকার করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান দ্বারা বঙ্গসমাজে যখন আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে নবশক্তির আর্বিভাব দেখা গেল। ইহার কিছু পূর্বে নীলের হাঙ্গামা, নীলকরের অত্যাচার, প্রজাদের কষ্ট প্রভৃতি হিন্দু পেট্রিয়ট ও অপরাপর পত্রের দ্বারা আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। সে হাঙ্গামার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। আমাদের মন যখন অল্পাধিক পরিমাণে উত্তেজিত, তখন ১৮৬০ সালের শেষভাগে "নীলদর্পণ" নাটক প্রকাশিত হইল। হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ ক্ষেত্রে উল্কাপাত হইল; এ নাটক কোথা হইতে কে প্রকাশ করিল, কিছুই জানা গেল না। এ নাটক প্রাচীন নাটকের চিরাবলম্বিত রীতি রক্ষা করিল কি না, সে বিচার করিবার সময় রহিল না; ঘটনা সকল সত্য কি না অনুসন্ধান করিবার সময় পাওয়া গেল না; নীলদর্পণ আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল; তোরাপ আমাদের ভালবাসা কাড়িয়া লইল; ক্ষেত্রমণির দুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল; মনে হইতে লাগিল রোগ সাহেবকে যদি একবার পাই, অন্য অস্ত্র না পাইলে যেন দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তাঁহার নাটকসকলে চিরন্তন রীতি ত্যাগ করিয়া যে নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, দীনবন্ধু সেই পথে আরও অগ্রসর হইলেন। এই নূতন রীতি ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে অতীব স্পৃহণীয় হইল। মিত্র মহাশয় কর্মসূত্রে নানা দেশে, নানা জেলাতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আর কেহ তাঁহার ন্যায় নানা স্থানে নানা শ্রেণির মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁহার এই ভূয়োদর্শন তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রসকল সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

দীনবন্ধু যেমন তাঁহার নাটকগুলির দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যে নবভাব ও বাঙ্গালির মনে নবশক্তির সঞ্চার করিলেন, তেমনি এই কালের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে আর এক প্রতিভাশালী পুরুষ দেখা দিলেন;—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গের অমরকবি মধুসূদন যেমন চিরাগত রীতি-পাশ ছিন্ন করত বঙ্গীয় পদ্যসাহিত্যকে স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এক নব স্বাধীনতা, নব চিন্তা, নব আকাঙ্ক্ষা ও নব শক্তির অবতারণা করিলেন, গদ্য সাহিত্যে সেই কার্য করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় হইল। তৎপূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে বাঙ্গালা গদ্য সংস্কৃত-বহুল ও সংস্কৃত ব্যাকরণের রীত্যনুসারী হইয়া ধনীগৃহের রমণীগণের ন্যায় অলঙ্কারভারে প্রপীড়িতা হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্বেও একদল ইংরাজি শিক্ষিত কাব্যানুরাগী লোক এই সংস্কৃত ভাষাভারে পীড়িতা বঙ্গভাষাকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন এবং তাঁহারা আলালি ভাষা নামে একপ্রকার তাজা তাজা বাংলা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার এই নব ভাষার জন্মদাতা ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রকাশিত "মাসিক পত্রিকা" এই ভাষার ভেরিনিনাদ ছিল। কিন্তু ওই "আলালি" ভাষা

গ্রাম্যতা দোষে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় দূষিত ছিল। যথা "টক্ টক্ পটাস্ পটাস্ মিয়াজান গাড়োয়ান এক এক বার গান করিতেছে—টিটকারি দিতেছে, হাঃ শালার গরু বলিয়া লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে।" ইত্যাদি ভাষা যে গ্রন্থে বা পত্রিকাতে মুদ্রিত হইলে গ্রাম্যতা দোষ ঘটে তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। সুতরাং এই আলালি ভাষা বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের সম্পূর্ণ ভালো লাগিত না।

ইহার পরে হুতোমের নকশা প্রকাশিত হয়। তাহাও প্রায় এই আলালী ভাষাতে লিখিত। কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোমের নকশা লিখিয়া অমর হইয়াছেন। তাহার জীবন্ত হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গালা আমাদিগকে বড়োই প্রীত করিয়াছিল। কিন্তু তাহাও গ্রাম্যতা দোষের উপরে উঠিতে পারে নাই।

সন্ধিস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পদ্যরচনাতে সিদ্ধহস্ততা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু মধুসূদনের দীপ্ত প্রভাতে আপনাকে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সে পথ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি শুভক্ষণে গদ্যরচনাতে লেখনী নিয়োগ করিলেন। অচিরকালের মধ্যে বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় বঙ্কিম দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বঙ্গবাসীর চিন্তা ও চিত্তের উন্মেষ পক্ষে যত লোক সহায়তা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।

এইকালের মধ্যে নাটক ও উপন্যাস রচনা দ্বারা বঙ্গসমাজে যে পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল তাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়া আর এক সুমহৎ বিপ্লবের বিষয় উল্লেখ করিতে যাইতেছি। তাহা বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে "সোমপ্রকাশের" অভ্যুদয়। সংবাদপত্র প্রথমে ইংরাজদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ তাঁহাদের দর্পণ নামক পত্রের সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালা সংবাদপত্রের পথ খুলিয়া দেন। কিন্তু "দর্পণ" ইংরাজদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত এবং তাহার ভাষা ইংরাজ-লিখিত বাঙ্গালা হইত। প্রকৃতপক্ষে রাজা রামমোহন রায় এ দেশীয় দ্বারা লিখিত বাঙ্গালা সংবাদপত্রের পথ-প্রদর্শক। তিনিই ১৮২১ সালে "সংবাদ কৌমুদী" নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ওই "কৌমুদীতে" জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক থাকিত। ইহা লোক-শিক্ষার একটি প্রধান উপায় স্বরূপ ছিল। তৎপরে সতীদাহ নিবারণ লইয়া হিন্দু সমাজের সহিত যখন রাজার বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন হিন্দুধর্মের পক্ষগণ "চন্দ্রিকা"* নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া স্বধর্ম রক্ষাতে ও সংস্কারার্থীদিগের সহিত বাকযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কৌমুদী রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন ছিল। চন্দ্রিকা তৎপরেও বহুকাল জীবিত ছিল। চন্দ্রিকার আবির্ভাবের অল্পকাল পরেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "প্রভাকর"** প্রকাশিত হয়। প্রভাকরের রাজত্ব যখন মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান, তখন ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী বঙ্গীয় পাঠকগণকে গম্ভীর জ্ঞানের বিষয়সকলের আলোচনাতে প্রবৃত্ত করে; এবং তদ্দ্বারা বঙ্গসমাজে এক মহৎ পরিবর্তন আনয়ন করে। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী

*সমাচার-চন্দ্রিকা
**সংবাদ প্রভাকর

ঠিক সংবাদপত্র ছিল না। ধর্মতত্ত্বের আলোচনাই তাহার মুখ্য কার্য ছিল। দৈনিক সংবাদ জোগাইবার ভার "প্রভাকর", "ভাস্কর" প্রভৃতি পত্রসকল গ্রহণ করিয়াছিল। 'ভাস্কর' গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য বা গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত হইত। এতদ্ব্যতীত সেই সময়ে আরও অনেকগুলি সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে মুদ্রিত এক তালিকা হইতে নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায়;—যথা, মহাজন দর্পণ, চন্দ্রোদয়, রসরাজ, জ্ঞান দর্পণ, বঙ্গদূত, সাধুরঞ্জন, জ্ঞানসঞ্চারিণী, রসসাগর, রঙ্গপুর বার্তাবহ, রসমুদ্গর, নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা ও দুর্জন দমন, মহা-নবমী।

ইহাদের অধিকাংশ পরস্পরের প্রতি অভদ্র গালাগালিতে পূর্ণ হইত। প্রভাকরে ও ভাস্করে এরূপ অভদ্র কটূক্তি চলিত যে, তাহা শুনিলে কানে হাত দিতে হয়। প্রভাকর ও ভাস্করের পদবির অনুসরণ করিয়া "রসরাজ" ও "যেমন কর্ম তেমনি ফল" প্রভৃতি কতিপয় পত্রে এরূপ কবির লড়াই আরম্ভ করিল যে, তাহার বর্ণনা অসাধ্য। সুখের বিষয় অচির কালের মধ্যে দেশের লোকের নিন্দার বাণী উত্থিত হইল। চারিদিকে ছি ছি রব উঠিয়া গেল। কবির লড়াইও থামিয়া গেল।

বোধ হয় এই ছি ছি রবটা হৃদয়ে থাকাতেই এ সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা সংবাদপত্র পড়িতে বা বাঙ্গালা লিখিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। তাহাদের মধ্যে যে কেহ সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে চাহিতেন, তিনি ইংরাজিতেই করিতেন। এই সকল ইংরাজি পত্রের মদ্যে হরিশের *Hindoo Patriot,* রামগোপাল ঘোষের *Bengal Spectator,* কাশীপ্রসাদ ঘোষের *Hindu Intelligencer,* কিশোরীচাঁদ মিত্রের *Indian Field* সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়ের সময়েও এই ছি ছি রবটা প্রবল ছিল। আমার বোধ হয় এই ছি ছি রবটা নিবারণ করাই সোমপ্রকাশের জন্মের অন্যতম কারণ ছিল। ১৮৫০ হইতে ১৮৫৮ সালের মধ্যে এই ছি ছি রব নিবারণের আরও চেষ্টা হইয়াছিল। কয়েকখানি উৎকৃষ্ট শ্রেণির বাঙ্গালা সাময়িকপত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। তন্মধ্যে সুবিখ্যাত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" ও তৎপরে পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত "রহস্য-সন্দর্ভ" বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তাহা যদিও ঠিক সংবাদপত্র ছিল না বটে, তথাপি মিত্রজ মহাশয় উক্ত পত্রে গম্ভীর ভাষায় যে সকল মহামূল্য জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠকগণের গোচর করিতেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ উপকৃত হইতাম। সে প্রবন্ধগুলি চিরদিন আমাদের স্মৃতিতে বহিয়াছে।

সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালেই প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের "মাসিক পত্রিকা"* প্রকাশিত হয়। তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিত বটে, কিন্তু তাহা "আলালি ভাষাতে" লিখিত হইত, ইহা অগ্রেই বলিয়াছি। এই ক্ষেত্রে সোমপ্রকাশের আবির্ভাব। সে দিনের কথা আমাদের বেশ স্মরণ আছে। এ কাগজ কে বাহির করিল, এ কাগজ কে বাহির করিল, বলিয়া একটা রব উঠিয়া গেল। যেমন ভাষার লালিত্য, তেমনি বিষয়ের গাম্ভীর্য। সংবাদপত্রের এক নূতন পথ, বঙ্গসাহিত্যের এক নূতন যুগ প্রকাশ পাইল। বিদ্যাভূষণ জানিতেন তাঁহার উক্তির মূল্য কত। কাগজ সাপ্তাহিক হইল. কিন্তু মূল্য হইল

*১৮৫৪

বার্ষিক দশ টাকা; তাহাও অগ্রিম দেয়। ইহাতেও সোমপ্রকাশ দেখিতে দেখিতে উঠিয়া গেল। ১৫৫৮ সালে প্রকাশিত হইলেও ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে সোমপ্রকাশের প্রভাব মাধ্যন্দিন রেখাকে অতিক্রম করিয়াছিল। সেই কারণেই এই কালের মধ্যে তাহার উল্লেখ করিলাম।

সোমপ্রকাশের পর আরও অনেক বাঙগালা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে; ভাষার চটক ও রচনায় নিপুণতা আরও বাড়িয়াছে; রাজনীতির চর্চা বহুগুণ বাড়িয়াছে; কিন্তু তদানীন্তন সোমপ্রকাশের স্থান কেহই অধিকার করিতে পারেন নাই। ভিতরকার কথাটা এই, লিখিবার শক্তির উপর সংবাদপত্রের প্রভাব নির্ভর করে না, পশ্চাতে যে মানুষটা থাকে তাহারই উপরে অধিকাংশত নির্ভর করে। সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূল ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। সেই তেজস্বিতা, সেই মনুষ্যত্ব, সেই ঐকান্তিকতা, সেই কর্তব্যপরায়ণতা, সেই সত্যনিষ্ঠা পশ্চাতে ছিল বলিয়াই সোমপ্রকাশের প্রভাব দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

তৎপরে উল্লেখযোগ্য সামাজিক ঘটনা হোমিওপ্যাথি রাজ্যে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পদার্পণ ও তজ্জনিত আন্দোলন। ডাক্তার বেরিনি সাহেবকে অবলম্বন করিয়া রাজাবাবু কার্যক্ষেত্রে প্রায় একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছিলেন। তাঁহারই সংশ্রবে আসিয়া অনেকগুলি যুবক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপ্রণালি অবলম্বন করিতেছিলেন। ইঁহাদের অনেকে পরে যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দেশ বিদেশে হোমিওপ্যাথির বার্তা লইয়া যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজকে প্রবলরূপে আলোড়িত করিল; এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথির পতাকাকে সর্বজনের চক্ষের সমক্ষে উড্ডীন করিল। তাহা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি প্রণালি অবলম্বন। এলোপ্যাথির সহিত তুলনায় হোমিওপ্যাথি উৎকৃষ্টতর—লোকের এ সংস্কার যে জন্মিল তাহা নহে, কিন্তু মত পরিবর্তনের সময় ডাক্তার সরকারের যে তেজ, যে সত্যনিষ্ঠা, যে মনুষ্যত্ব লোকে দেখিল, তাহাই সকলের চিত্তকে বিশেষরূপে উত্তেজিত করিয়াছিল; এবং বঙগবাসীর মনে এক নব ভাব আনিয়া দিয়াছিল।

তিনি ১৮৬৩ সালে কলিকাতা মেডিকেল কালেজ হইতে এম. ডি. পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া শহরের অগ্রগণ্য চিকিৎসকদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হন। ওই সালেই প্রধানত প্রসিদ্ধ ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তীর প্রযত্নে, ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের বঙগদেশীয় শাখা নামে একটি শাখা সভা স্থাপিত হয়। ওই সভার প্রতিষ্ঠার দিনে মহেন্দ্রলাল একটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে হোমিওপ্যাথির নিন্দা করেন। ওই নিন্দাবাদ রাজাবাবুর চক্ষে পড়িলে, তিনি মহেন্দ্রলালের সহিত বিচার করিতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে একজন বন্ধু ইণ্ডিয়ান ফিল্ড নামক কাগজের জন্য মহেন্দ্রলালকে (Morgan) মর্গান সাহেবের লিখিত হোমিওপ্যাথি বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা লিখিতে অনুরোধ করেন। সমালোচনার্থ ওই গ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়াই মহেন্দ্রলালের মনে হয় যে, কার্যত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কীরূপ তাহা না দেখিয়া সমালোচনা করা তাঁহার পক্ষে কর্তব্য নহে। অতএব তিনি রাজাবাবুর সহিত তাঁহার কতকগুলি রোগীর চিকিৎসা দেখিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে এবং চিকিৎসা দেখিতে দেখিতে সরকার মহাশয়ের মত পরিবর্তিত হইয়া গেল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালিই উৎকৃষ্টতর প্রণালি বলিয়া মনে হইল। ১৮৬৬ সালের মধ্যে এই পরিবর্তন

ঘটিল। যখন তিনি মত পরিবর্তনের বিশিষ্ট কারণ পাইলেন তখন শহরের এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদলে তাহার বার্তা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিলেন না। ১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি দিবসে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের চতুর্থ সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইল। তাহাতে ডাক্তার সরকার এক বক্তৃতা পাঠ করিলেন, তাহাতে প্রচলিত চিকিৎসা প্রণালির অনির্দিষ্টতা দোষ প্রদর্শন করিয়া হানিম্যান প্রদর্শিত প্রণালি উৎকৃষ্টতর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আর কোথায় যায়! সাপের লেজে যেন পা পড়িল! ডাক্তার ওয়ালার নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার বলিলেন, "ডাক্তার সরকার থাম থাম, আর একটি কথা বলিলে তোমাকে এ ঘর হতে বাহির করে দেব।" তৎপরে শহরের অ্যালোপ্যাথি দল ডাক্তার সরকারকে এক ঘরে করিল; তিনি চিকিৎসক সভা কর্তৃক বর্জিত হইলেন, তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। কলিকাতা তোলপাড় হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু বঙ্গভূমি যেন এই বীরের পদভরে কাঁপিতে লাগিল। বাস্তবিক তাঁহার সত্যপ্রিয়তা ও মনুষ্যত্ব তখন আমাদের মনকে অনেক উচ্চে তুলিয়াছিল। বিশ্বাস কর, বাঙ্গালি যে ভারতের সকল প্রদেশের মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছে, তাহা এই সকল সত্যপ্রিয় তেজীয়ান বীরপ্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষের গুণে।

মহেন্দ্রলাল সরকার স্বীয় চরিত্রের প্রভাবে হোমিওপ্যাথিকে কিরূপ উঁচু করিয়া উঠাইলেন, তাহা সুপ্রসিদ্ধ বেরিনি সাহেবের একটি কথাতেই প্রকাশ। তিনি যখন এদেশ পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহার হোমিওপ্যাথ বন্ধুগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এক সভা করিয়াছিলেন। উক্ত সভাতে ডাক্তার বেরিনি, অপরাপর কথা বলিয়া শেষে বলিলেন, "আমার আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। সূর্য যখন উদিত হয় তখন চন্দ্রের অস্তগমনই শোভা পায়। মহেন্দ্র বঙ্গাকাশে উদিত হইয়াছেন, এখন আমার অস্তগমনের সময়!" অতএব অপরাপর নেতাদিগের ন্যায় মহেন্দ্রলাল সরকারও সে সময়ে কলিকাতাবাসীর ও সেই সঙ্গে সমগ্র বঙ্গবাসীর চিত্তকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলে এই কালের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আর এক কার্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়াছিল। তাহা "ন্যাশনাল পেপার" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত, 'জাতীয় মেলা' নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণির নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ। বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা; কারণ সেই যে বাঙ্গালির মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।

নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের হৃদয় স্বদেশ-প্রেমে পূর্ণ ছিল। তিনি বহুদিন হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন যে, দেশের লোকের দৃষ্টিকে বিদেশীয় রাজাদিগের প্রসাদলাভের দিক হইতে ফিরাইয়া জাতীয় স্বাবলম্বনের দিকে আনা কর্তব্য। লোকে কথায় কথায় গবর্নমেন্টের দ্বারস্থ হয়, ইহা তাঁহার সহ্য হইত না। এজন্য তিনি নিজ প্রচারিত সংবাদ পত্রে দুঃখ প্রকাশ করিতেন; বন্ধু-বান্ধবের নিকটে ক্ষোভ করিতেন; এবং কী উপায়ে দেশের লোকের মনে জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি প্রবল হয় সেই চিন্তা করিতেন। এই

চিন্তার ফলস্বরূপ ১৭৮৮ শকের (১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের) চৈত্র সংক্রান্তিতে হিন্দুমেলার অধিবেশন হইল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র মহাশয় সরকারি সম্পাদক হইলেন। মেলার অধ্যক্ষগণ স্বদেশীয় উন্নতি, স্বদেশীয় সাহিত্যের বিকাশ, স্বদেশীয় সংগীতাদির চর্চা, স্বদেশীয় কুস্তি প্রভৃতির পুনর্বিকাশ প্রভৃতির উৎসাহ দান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। বর্ষে বর্ষে চৈত্র সংক্রান্তিতে একটি মেলা খোলা স্থির হইল। দেশের অনেক মান্য গণ্য ব্যক্তি এই জন্য অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু কাশীশ্বর মিত্র, বাবু দুর্গাচরণ লাহা, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু কৃষ্ণদাস পাল, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতির নামের উল্লেখ দেখা যায়। অতএব উদ্যোগকর্তৃগণ সকল বিভাগের মানুষকে সম্মিলিত করিতে ত্রুটি করেন নাই।

১৮৬৮ সালে বেলগাছিয়ার সাতপুকুরের বাগানে মহাসমারোহে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেইদিন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীত "গাও ভারতের জয়" সুগায়কদিগের দ্বারা গীত হয়; আমরা কয়েকজন জাতীয় ভাবের উদ্দীপক কবিতা পাঠ করি; গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র মহাশয় মেলার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন; এবং স্বজাতি-প্রেমিক সাহিত্যজগতে সুপরিচিত মনোমোহন বসু মহাশয় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা পাঠ করেন। মেলার প্রথম সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মেলার উদ্দেশ্য এই ভাবে বর্ণন করেন—"ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কার্যেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়! কেন, আমরা কি মনুষ্য নহি?* * * অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।" সংক্ষেপে বলিতে গেলে জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করাই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল। সুখের বিষয় এই মেলার আয়োজনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সাধিত হইয়াছে। ইহার পরে মনোমোহন বসু প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিতে লাগিলেন; আমরা জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা রচনা করিতে লাগিলাম; বিক্রমপুর হইতে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসিয়া আমাদের জাতীয় ভাবে যোগ দিলেন; এবং আগ্রার আনন্দচন্দ্র রায়, সঙ্গীত রচনা করিয়া দুঃখ করিলেন;—

কত কাল পরে বল ভারত রে!
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে; ইত্যাদি।

দেখিতে দেখিতে স্বদেশপ্রেম সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ১৮৬৮ সালের পরেও হিন্দুমেলার কাজ অনেক দিন চলিয়াছিল। নবগোপাল বাবু ইহাকে জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রমে তাহা উঠিয়া যায়।

এই ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে কেবল যে কলিকাতা সমাজ নানা তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল তাহা নহে। বঙ্গদেশের অপরাপর প্রধান প্রধান স্থানেও আন্দোলন চলিতেছিল। তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গের প্রধান স্থান ঢাকা সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। বলিতে গেলে পূর্ববঙ্গের সামাজিক আন্দোলন বহু পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। কলিকাতাতে হিন্দুকালেজের

প্রতিষ্ঠা ও ডিরোজিওর শিষ্যদলের অভ্যুদয় দ্বারা সমাজক্ষেত্রে যেমন একদল প্রাচীনবিদ্বেষী শিক্ষিত যুরককে আবির্ভূত করিয়াছিল সেইরূপ ঢাকাতেও শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে এক সংস্কারার্থী দল দেখা দিয়াছিল। কলিকাতাতে যেমন প্রথম শিক্ষিত দলের অগ্রণীগণ কে মুসলমানের দোকানে প্রবেশ করিয়া রুটি আনিতে ও খাইতে পারে তাহা দেখিবার চেষ্টা করিতেন, তেমনি ঢাকাতেও প্রথম শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অগ্রণীগণ এই পরীক্ষা করিতেন যে, কে মুসলমানের রুটি খাইতে পারে বা কে চর্মপাদুকার উপরে সন্দেশ রাখিয়া সর্বাগ্রে তুলিয়া খাইতে পারে।

ক্রমে ঢাকা কালেজ স্থাপিত হইয়া শিক্ষিতদলের সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল এবং কলিকাতার আন্দোলনের তরঙ্গ সকল যতই পূর্ববঙ্গে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, ততই ঢাকা শহরে নব নব কার্যের সূত্রপাত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, বিধবা বিবাহের আন্দোলন প্রভৃতি সকল আন্দোলনই ক্রমে ক্রমে দেখা দিল।

এই প্রথম শিক্ষিত উৎসাহী যুবকবৃন্দের মধ্যে পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামশঙ্কর সেন, ভগবানচন্দ্র বসু, অভয়াচরণ দাস, ঈশ্বরচন্দ্র সেন, অভয়াকুমার দত্ত, স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর দীননাথ সেন ও পরবর্তী সময়ের কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে সর্বাপেক্ষা একাগ্রতা দেখাইয়াছিলেন, দুই ব্যক্তি। প্রথম ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকর্তা ব্রজসুন্দর মিত্র, দ্বিতীয় কৌলীন্যপ্রথার সংস্কার প্রয়াসী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় ১৮৪৭ সালে নিজে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়া নিজ ভবনে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন; এবং অপরেরা অগ্রসর হইয়া তাহার ভার আপনাদের হস্তে গ্রহণ না করা পর্যন্ত নিজেই তাহার ভার বহন করেন। এই কালের মধ্যে ঢাকাতেও ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে সর্ববিধ সামাজিক উন্নতি বিষয়ক বিষয়ের আন্দোলন দৃষ্ট হইয়াছিল; এবং অভয়াচরণ দাস, দীননাথ সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি স্বদেশের উন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজই সে সময়ে প্রবল সামাজিক শক্তির উৎসস্বরূপ হইয়াছিল।

উৎস : রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

# বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক আন্দোলন

নির্মলকুমার বসু

**যোগীজাতি**

যোগী জাতির সংখ্যা বাংলা দেশে প্রায় চার লক্ষের কাছাকাছি হইবে। ১৯৩১ সালে তাহার মধ্যে ত্রিপুরায় শতকরা ২২.০৮, নোয়াখালিতে ১৭.১০, মৈমনসিংহে ১১.৮৩, চট্টগ্রামে ৯.৮২, বাখরগঞ্জে ৫.৭৪, ঢাকাতে ৫.৫৫, এবং খুলনায় ৩.২৩ জনের বাস। অবশিষ্ট শতকরা প্রায় ২৫ জন বাংলা দেশের অন্যান্য জেলায় ছড়াইয়া আছেন। যোগীদের মধ্যে তাঁতের ব্যবসায় স্ববৃত্তিতে বলিয়া পরিগণিত হয়। ইতিপূর্বে যোগীদের সম্পর্কে যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্ববৃত্তিতে অধিষ্ঠিত যোগীর সংখ্যা ১৯০১এ শতকরা ৫৩.৮৮, ১৯১১এ ৩৬.০৯, ১৯২১এ ৩৬.২৫ এবং ১৯৩১ সালে ৪০.৮২ দাঁড়ায়। চাষের দিকে অথবা অন্যান্য বৃত্তির অভিমুখে সংখ্যার দিক দিয়া যোগীদের জাতিতে আভ্যন্তরীণ সামাজিক আন্দোলনের ধারা কোন দিকে প্রবাহিত হইতেছে, উহা বিশ্লেষণ করিলে আমরা অনেক শিক্ষণীয় বিষয় পাই।

যোগীজাতির মধ্যে বর্তমানকালে সামাজিক চেতনার প্রমাণ সন ১২৭৯ (খ্রিঃ ১৮৭২) সালে প্রথম পাওয়া যায়। সেই সময়ে কলিকাতার নিকটে আন্দুল-মৌড়ী গ্রামে কয়েকজন কৈবর্ত যোগীদের বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করায় জাতিচ্যুত হন। ইহার ফলে যোগীদের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হয় এবং তাঁহারা সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত সমাজের নিকট প্রশ্ন করেন, 'যোগী জাতি পবিত্র কি অপবিত্র এবং তাহাদিগের ব্যবহার কিরূপ?' যোগীজাতিকে পণ্ডিত সমাজ 'সদ্ব্যবহার'যুক্ত বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহার পরে যোগীদের মধ্যে কেহ কেহ উপবীত ধারণ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু সে আন্দোলন বিশেষ বিস্তারলাভ করে নাই। যোগীসখা পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩১৩) প্রকাশ যে, ১২৮৪ বং (খ্রিঃ ১৮৭৭)-তে ফাল্গুন মাসে লোনসিংহ গ্রামে ৭ জন উপবীত ধারণ করেন; চৈত্র মাসে রাজনগরে ২৪ জন এবং পরবর্তী বৎসর রাজগঞ্জে মাত্র ৭ জন ওই পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। সন ১২৮৭তে (খ্রিঃ ১৮৮০) ভারতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক লিখিত 'যোগী সংস্কার' নামে একখানি বই প্রকাশিত হয়।

১৯০১ সালের আদমসুমারিতে প্রথম বিস্তৃতভাবে হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতিগুলির পৃথকভাবে গণনা করা হয়। তাহার পর ১৯০৯ সালে মিন্টো-মরলি শাসন সংস্কার

প্রবর্তিত হইল, সে সময়েও বিভিন্ন জাতি স্বীয় রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে পৃথকভাবে অতিমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিলেন। ইহার প্রমাণ আমরা ১৯০১ সাল হইতে পরবর্তীকালের ইতিহাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়া থাকি।

১৮৯১ সালে রিজলি *ট্রাইব্‌স্ এন্ড কাস্ট্‌স্ অব বেঙ্গল* গ্রন্থে যোগীদের উদ্ভব সম্বন্ধে যে অসম্পূর্ণ মত প্রকাশ করেন, তাহার প্রতিবাদস্বরূপ যোগীসমাজের পক্ষ হইতে রিজলি সাহেবকে একখানি পত্র লেখা হইয়াছিল। ১৯০১এর আদমসুমারির পরে যোগী হিতৈষিণী সভা স্থাপিত হয়; কিন্তু কিছুদিন চলার পর উহা বন্ধ হইয়া যায়। *যোগীসখা* পত্রিকাখানি খ্রিঃ ১৯০৫ সালে আরম্ভ হয় (বৈশাখ, ১৩১১); ইহার প্রবন্ধাবলি পাঠ করিলে যোগীসমাজ কোন্ মুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহার আভাস এবং প্রমাণ পাওয়া যায়। *যোগীসখার* উদ্দেশ্য হইল, যোগীসমাজের বিভিন্ন উপশাখার উচ্ছেদসাধন করিয়া জাতির মধ্যে একতার প্রতিষ্ঠা, জাতির সামাজিক মর্যাদার বৃদ্ধিসাধন এবং শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করা। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে তাঁতশিল্পের দিকে দেশের মন যায় এবং যোগীজাতিও ইহাতে স্বীয় আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা দেখিতে পান (*যোগীসখা,* আশ্বিন, ১৩১৩)। ওই সম্পর্কে আরও কিছু কিছু প্রবন্ধও প্রকাশিত হইতে থাকে, যথা 'শিল্প শিক্ষা' (অগ্রহায়ণ, ১৩১২), 'আমাদের উন্নতির মূলে কি কি আবশ্যক' (বৈশাখ, ১৩১৩)।

১৯০৯ সালে মিন্টো-মরলি শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার সময়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে উন্নতির সম্ভাবনা ও আশা বিভিন্নভাবে দেখা দেয়। *যোগীসখা,* ভাদ্র, ১৩১৫ (খ্রিঃ ১৯০৮)-এ দেখা যায়, জনৈক লেখক মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন ঃ 'জাতীয় উন্নতিতে এখন স্বার্থপর ব্রাহ্মণের একাধিপত্য নাই; পাশ্চাত্য উদারতা উপযুক্ততার পুরস্কার দিতেছে।' শ্রাবণ, ১৩১৮ (খ্রিঃ ১৯১১) সালে যোগীজাতির পক্ষ হইতে চাকুরি এবং ছাত্রবৃত্তির জন্য বিশেষ একটি আবেদন করা হয়। গভর্ণমেন্টের নিকট বিশেষ প্রসাদলাভের প্রয়াস থাকার ফলে ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধিবামাত্র *যোগীসখায়* একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (ভাদ্র, ১৩২১—খ্রিঃ ১৯১৪)। তাহাতে লেখা ছিল ঃ 'আমরা এই ঘোর দুর্দিনে পিতৃস্বরূপ রাজার কার্যে সকলে আত্মদান করিতে পারিব না, কিন্তু যাঁহারা প্রাণ দিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের সাহায্য করা কর্তব্য। গভর্ণমেন্ট জানেন, আমরা অতি নিরীহ রাজভক্ত। রাজভক্তি প্রকাশের এমন সুবিধা আর হইবে না।' আবার জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩২২ (খ্রিঃ ১৯১৫)তে লেখা হয়, 'দরিদ্র যোগীজাতি চিরকাল রাজভক্ত, রাজার মঙ্গলকামনাই আমাদের মূলমন্ত্র....আমরা ইংরাজের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।'

ইংরাজের প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য স্বীকারের মূলে ছিল, কিছু রাজনৈতিক অধিকারলাভ এবং চাকুরি প্রভৃতির দ্বারা আর্থিক উন্নতির কিছু সম্ভাবনা। ইস্কুল কলেজের শিক্ষা বিস্তারের দিকে যোগীজাতির ঝোঁক বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আশ্বিন, ১৩১২ (খ্রিঃ ১৯০৫) সালে 'সামাজিক স্বাতন্ত্র্য'' নামক প্রবন্ধে যোগীজাতির অবনত অবস্থার জন্য শিক্ষার অভাবকে বিশেষভাবে দায়ি করা হয়। কয়েকটি প্রবন্ধের শিরোনাম হইতে এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। 'বিদ্যাশিক্ষা ও একতার অভাব' (মাঘ, ১৩১২), 'শিক্ষা' (ফাল্গুন, ১৩১২), 'শিক্ষাই জাতীয় উন্নতির প্রধান সোপান' (ভাদ্র, ১৩১৩), 'আগে সাধনা পরে সিদ্ধি' (কার্তিক, ১৩১৪), 'শিক্ষা' (পৌষ, ১৩১৫)।

যোগী সম্মিলনী নামক প্রতিষ্ঠান গভর্ণমেন্টের নিকট বৃত্তির জন্য আবেদন জানান (যোগীসখা, শ্রাবণ, ১৩১৮—খ্রিঃ ১৯১১); মৈমনসিংহে একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হয় (অগ্রহায়ণ, ১৩২১—খ্রিঃ ১৯১৪)। ছাত্রদের সাহায্যার্থ কিছু চাঁদাও সংগ্রহ করা হইয়াছিল। হয়তো এই সকল কারণেই জাতির মধ্যে শিক্ষার অনুপাত কিয়দংশে বৃদ্ধি পায়।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৯০১ | ... | ... | ... | ৭.৬১ |
| ১৯১১ | ... | ... | ... | ১২.৯৭ |
| ১৯২১ | ... | ... | ... | ১৫.৪৪ |
| ১৯৩১ | ... | ... | ... | ১১.৩৬ |

কলেজি শিক্ষা এবং চাকুরির দিকে গতি কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যোগীসমাজে স্বভাবতই আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়। যোগীজাতির প্রাচীন ইতিহাস লইয়া গবেষণা আরম্ভ হয় এবং ১৯১১ সালের আদমসুমারির পূর্বে সেনসাস কমিশনার সাহেবের জন্য শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ প্রণীত *বঙ্গীয় যোগীজাতি* নামক একখানি পুস্তক উপহার প্রেরিত হয়। *যোগীসখাতেও* নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে।

'প্রত্নতত্ত্ব'—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র, ১৩১২

'যোগীজাতির ঐতিহাসিকতা'—আশ্বিন, ১৩২৭, কার্তিক, ১৩২৮

'আলোক রশ্মি'—বৈশাখ, ১৩৩০

'তোমরা কে'—মাঘ, ১৩১৭

'অধঃপতন ও প্রতিকার'—ভাদ্র, ১৩২৭

১৯২১ সালে আদমসুমারির সময়ে যোগীজাতির পুরোহিতগণ ব্রাহ্মণবর্ণে গণ্য হইবার দাবি পেশ করেন; ১৯৩১ সালে সমগ্র যোগীজাতি ব্রাহ্মণত্বের দাবি জানান।

যোগী সম্মিলনীর আন্দোলনের ফলে উপবীত ধারণ কিয়দংশে সার্থক হয়, কিন্তু উহা আশানুরূপ বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই।

সামাজিক মর্যাদার দাবির সঙ্গে সঙ্গে যোগীসমাজে আভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্যও চেষ্টা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। *যোগীসখায়* 'উপনয়ন সংস্কার' (ভাদ্র, ১৩২১), 'উপবীত প্রচলন' (বৈশাখ, ১৩২৮) প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বৈশাখ, ১৩১৮ এবং জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০তে যোগীদের মধ্যে পুরোহিতগণ যাহাতে সত্যই শিক্ষালাভ করেন এবং স্ববৃত্তির জন্য যোগ্যতা অর্জন করেন, তাহার বিষয় লেখা হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে যোগীদের মধ্যে উপজাতিগুলি তুলিয়া দিবার জন্য আবেদন প্রকাশিত হইতে থাকে এবং বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার বিষয়েও জনমত গঠনের চেষ্টা চলিতে থাকে। ('পরিণয় সংস্কার'—আশ্বিন, ১৩৩৮; 'বাল্যবিবাহ'—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২)। স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়।

'স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য'—অগ্রহায়ণ, ১৩২৭।

'স্ত্রী-শিক্ষা'—মাঘ, ১৩২৭।

'ভগ্নীবৃন্দের প্রতি নিবেদন'—মাঘ, ১৩২৭।

'মেয়েরা কি মানুষ হবে না'—ভাদ্র, ১৩৩০।

'নারী সমস্যা'—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।

বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা, এই প্রশ্ন লইয়া দুইটি মত দেখা দেয়। তাহার মধ্যে প্রাচীনপন্থীগণের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও অগ্রগামী সমাজ কিছু বিধবার পরিণয়দানে সক্ষম হন।

উপরে যোগীসমাজের মধ্যে যে গতির পরিচয় আমরা পাইলাম, তাহার মধ্যে শিল্পে উন্নতি অপেক্ষা গভর্ণমেন্টের নিকট অন্যান্য জাতির সহিত চাকুরি প্রভৃতিতে অধিকারের ব্যাপারই সমধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টার মধ্যে এইটুকু দেখা যায়, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ ইতিমধ্যে যে পথে চলিয়াছিলেন, যোগীগণ সেই দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যোগী সম্প্রদায়ের বৃত্তি বস্ত্রশিল্প হইলেও সে বিষয়ে উন্নতির আভাস অল্পই পাওয়া যায়। কেবল স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ক্ষণিকের আলোর মতো জাতির মধ্যে বয়ন শিল্পের দ্বারা আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিলেও যোগীজাতি স্থায়ীভাবে তাহার উপরে যেন নির্ভর করিতে পারিতেছিলেন না।

বৈশাখ, ১৩১৩ (খ্রিঃ ১৯০৬) সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেখা হইয়াছিল ঃ 'স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে দিশী বস্ত্রের আদর হইয়াছে। ইহার অবলম্বনে আর্থিক উন্নতিসাধন করিতে হইবে। হ্যান্ডলুম ও ফ্লাই-শাটল প্রভৃতি যে সকল কলের তাঁত আমদানি হইয়াছে, তাহার দ্বারা কাজ করিতে শিক্ষা করিলে অতি অল্প সময়ে সুন্দর সুন্দর বস্ত্র বয়ন করা যাইতে পারিবে।'

কিন্তু হয়তো তাঁত শিল্পের উত্থান-পতন অতি অনিশ্চিত হওয়ায় অন্যদিকেও যোগীজাতিকে পথের সন্ধান করিতে হইতেছিল। যোগীসখা, বৈশাখ, ১৩২১ (খ্রিঃ ১৯১৪)-এ প্রশ্ন করা হয়, যাহারা উপবীত গ্রহণ করিতেছে, তাহাদের দ্বারা চাষ কি সম্ভব হইবে? উত্তরে প্রকাশ যে, যে-কোনও শিল্পে বা ব্যবসায়ে লাভ হওয়া সম্ভব, সেই দিকেই সকলের অগ্রসর হওয়া উচিত।

যোগীজাতির আধুনিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, স্ববৃত্তিতে অনেকে নিয়োজিত থাকিলেও অধিকতর উন্নতির আশায় এবং সামাজিক মর্যাদার উৎকর্ষের জন্য এই শিল্পী-জাতিটি কিরূপে স্বীয় সমাজসংস্কারের চেষ্টার ভিতর দিয়া ক্রমশ মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ সমাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে যোগীদের মধ্যে সামাজিক উপজাতিগুলির সংশ্লেষ ঘটাইয়া ঐক্যবদ্ধ যোগীজাতি গঠনের চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ করিবার বিষয় যে, দেশের শাসনব্যবস্থার মধ্যে হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির জন্য অধিকারের কিছু তারতম্য সৃজন করিবার ফলে ১৯০৯ সালে শাসন সংস্কারের পূর্বে জাতিকে আশ্রয় করিয়া যে চেতনা অস্পষ্টভাবে ছিল, তাহাই যেন পরবর্তীকালে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

**নমঃশূদ্র**

বাংলা দেশে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে, যেখানে নদী অথবা খালবিলের প্রাদুর্ভাব, নমঃশূদ্র জাতির প্রাদুর্ভাব সেই সকল জায়গায় বেশি। হিন্দু সমাজ চিরদিন এই কৃষিজীবী জাতিকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, এমনকি অস্পৃশ্য বলিয়া গ্রামের প্রান্তে ভিন্ন পল্লিতে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছে। নমঃশূদ্রগণের স্ববৃত্তি বলিতে কৃষি ভিন্ন নৌকাচালনাকেও বুঝায়।

যোগীজাতির স্ববৃত্তি অনেকাংশে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু নমঃশূদ্রগণের স্ববৃত্তি অত অধিক পরিবর্তত হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যেও শিক্ষা অতি অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সামাজিক মর্যাদালাভের আকাঙ্ক্ষা স্বভাবত দেখা দিয়াছে। কিন্তু যোগীজাতির মধ্যে যাহা ঘটে নাই, নমঃশূদ্রদের মধ্যে সেইরূপ একটি পরিণতির লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করিল। নমঃশূদ্র জাতির সংখ্যা অল্প নহে এবং ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলার এক এক বৃহৎ অংশে ইঁহাদের বিস্তৃত বসতি আছে। কতকটা এই কারণে এবং কতকটা শিক্ষালাভের পরে বর্ণহিন্দুদের নিকট অপমানের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নমঃশূদ্রগণ হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক জাতি এবং গভর্ণমেন্টের বিশেষভাবে অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া দাবি জানান। নমঃশূদ্রগণের মধ্যে 'নমঃশূদ্র হিতৈষিণী সমিতি' নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে, অথবা *পতাকা, নমঃশূদ্র সুহৃদ* প্রভৃতি যে সকল পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেগুলি বিবেচনা না করিয়া আমরা কেবল একটি বিষয়ে লক্ষ নিবদ্ধ করিব।

শ্রীরাইচরণ বিশ্বাস নামে জনৈক লেখক *নমঃশূদ্র সুহৃদ* (জানুয়ারি, খ্রিঃ ১৯০৮) পত্রিকায় লেখেন ঃ

> আমরা ব্রাহ্মণের জাতি, হিংসা হেতু হউক বা ক্রোধবশত হউক, আমাদিগকে অনেকে না ভালবাসিতে পারেন, কিন্তু যুগান্তর ধরিয়া আমাদের ব্রাহ্মণোচিত আচার-ব্যবহার দেখিয়া সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, নমঃশূদ্র জাতি প্রাচীন মুনিঋষির অর্থাৎ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সন্তান। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় আর্য কৃষিকার্য, সেই প্রাচীন ও বর্তমান সময়ের মহাগৌরবের ব্যবসায়।

*জাতিতত্ত্ব ও নমস্য কুলদর্পণ* নামক একটি গ্রন্থে অনুরূপ মত প্রকাশিত হয়। নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে পূর্বে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের দাবির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বিধবা বিবাহ নিরোধের জন্য একটি আন্দোলনও দেখা দিল।

শিক্ষার দাবি নমঃশূদ্রগণের পক্ষ হইতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এপ্রিল, ১৯১৬ মাসের *পতাকা* পত্রিকায় লেখা হয় ঃ

> ব্রিটিশ রাজের কৃপায় যাহা একটু জ্ঞানকণা লাভ করিয়াছি, তাহার দ্বারাই এখন জানিতে সমর্থ হইয়াছি—আমরা কি ও আমাদের শক্তি কতটুকু। ২৫ লক্ষ লোক লইয়া যে সমাজ গঠিত, সে সমাজ কখনোই চিরকাল ঘুমাইয়া থাকিতে পারে না। হিন্দু সমাজের অন্ধ হিন্দু রাজের কৃপায় আমরা এতদিন ঘুমাইয়া ছিলাম। এখন জাতিভেদজ্ঞানশূন্য সমদর্শী বিপুল শক্তিশালী ব্রিটিশের কৃপায় জাগিলাম। ক্ষুদ্রচিত্ত ব্রাহ্মণকৃত আইনের শাসনে বাধ্য হইয়া আমাদের বাণী মন্দিরের চতুঃসীমানায়ও যাইতে দিতেন না। তোমার চিন্তা করিবার কি আছে? স্বয়ং ব্রিটিশরাজ অশিক্ষিতের বন্ধু, দরিদ্রের চিরসহায়, অনুন্নত জাতিসমূহের আশা ভরসা তোমার সহায় হইবেন।

ঢাকা জেলার গেজেটিয়ারে দেখা যায়, হিন্দু সমাজের প্রতি বিরূপ হওয়ার ফলে এবং ইংরেজ সরকারের প্রদত্ত শিক্ষাদানের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নমঃশূদ্র জাতি ১৯০৫

সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। নগরবাসী মজুমদার এবং রঘুনাথ সরকার নামে বিক্রমপুরের অধিবাসী দুই ভদ্রলোক পূর্ববঙ্গ ও আসামের তদানীন্তন ছোটোলাট বাহাদুরকে জানান যে, নমঃশূদ্রগণ ব্রিটিশের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেন এবং সরকারের পক্ষেও তাঁহাদের জন্য শিক্ষা ও চাকুরি বিষয়ে বিশেষ দাবিগুলি স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। অক্টোবর, ১৯০৭ সালের *নমঃশূদ্র সুহৃদ* পাঠে জানিতে পারা যায় যে, নমঃশূদ্র জাতির পক্ষ হইতে প্রতিনিধিবর্গ ছোটো লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের চিরস্থায়িত্বের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

**মুসলমানের জাতিভেদ**

হিন্দু সমাজে শিল্পী বা অনুন্নত শ্রেণির মধ্যে আমরা যে সকল সামাজিক গতি লক্ষ করি, স্বভাবত উচ্চবর্ণের মধ্যে তদনুরূপ বিশেষ কিছু আন্দোলন দেখা যায় না। তবে একেবারে যায় নাই, ইহাও বলা চলে না। কায়স্থগণ স্বীয় ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্য এক সময়ে চেষ্টা করেন, বৈদ্য জাতিও ব্রাহ্মণত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান হন। কিন্তু অজলচল অথবা অস্পৃশ্য জাতিবৃন্দের মধ্যে সামাজিক সংস্কারের জন্য যে উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক, মর্যাদাশীল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থের মধ্যে অনুরূপ সংস্কারের তীব্রতা দেখা যায় না। তথাকথিত নিম্ন জাতিগুলি হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকিয়া উচ্চবর্ণের সামাজিক রীতিনীতি অনুকরণের দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল; অপর পক্ষে ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে জাতীয় ঐক্য বা ন্যাশানালিজমের তাগিদে জাতিগত বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল হইতে লাগিল। পূর্বে অসবর্ণ বিবাহে সমাজে যে উত্তেজনার সঞ্চার হইত স্বাধীনতার যজ্ঞে যখন দেশ উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন উচ্চবর্ণের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে মনোভাবও আংশিকভাবে শিথিল হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে কিন্তু বাংলা দেশের হিন্দু সমাজের মতো মুসলমান সমাজেও বিচিত্র কতকগুলি গতি পরিলক্ষিত হয়। সন ১৩৩৪ সালে (খ্রিঃ ১৯২৭) রাজারামপুর হাইস্কুলের ভূতপূর্ব হেডমাস্টার মোহম্মদ ইয়াকুব আলী বি এ *মুসলমানের জাতিভেদ* নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন পত্রিকায় ইহার সমালোচনা পাঠ করিয়া মনে হয়, বইখানি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। বস্তুত ইহা সমাদরের যোগ্যও বটে। সেই পুস্তক হইতে বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিব। পাঠকও উপলব্ধি করিতে পারিবেন, নমঃশূদ্রগণের মধ্যে যে স্বতন্ত্রতার দাবি অস্ফুট আকারে দেখা দিয়াছিল, তাহা মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে আরও তীব্র আকার ধারণ করিয়া ভারতের উদীয়মান জাতীয় ঐক্যকে পঙ্গু করিবার সম্ভাবনা দেখা দিল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে ন্যাশনালিজমের তাগিদে জাতিগত ভেদ দূর করিবার যে ক্ষীণ সংস্কার চেষ্টা চলিতেছিল, ইংরেজ শাসনের আওতায় পুষ্ট ভেদমূলক আন্দোলনগুলি সেই ঐক্যচেষ্টাকে কতকাংশে পঙ্গু করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মুসলমানের জাতিভেদ গ্রন্থের সমালোচনায় সওগাত পত্রিকা বলেন ঃ

> ইসলাম সাম্য—বিশ্বভ্রাতৃত্ববাদের ধর্ম। *মানবশ্রেণীর* মধ্যে জাতিভেদের প্রাচীর তুলিয়া উচ্চনীচের তারতম্য নির্দেশ করা ইসলাম সমর্থন তো করেই না। উপরন্তু জাতিভেদের ধ্বংসের উপরেই ইসলামের

বুনিয়াদ গঠিত হইয়াছিল। ইসলাম অধ্যুষিত অন্য কোনো দেশেই ইসলামপ্রচারিত এই সাম্যবাদের ব্যতিক্রম বড়ো হয় নাই। কিন্তু ভারতীয় মুসলমান সমাজের অবস্থা স্বতন্ত্র। এখানে হিন্দু প্রতিবেশীর প্রভাব প্রবল; ফলে হিন্দুদের দেখাদেখি এদেশের মুসলমান সমাজেও জাতিভেদের তারতম্য ঢুকিয়া পড়িয়াছে। হিন্দুদের ছোঁয়াছুঁয়ির কদর্যতম দিকটা এখনো মুসলমান সমাজে আমল না পাইলেও তাহাদের প্রাচীনত্বের কৌলীন্য গর্ব এবং ব্যবসাতে উচ্চ-নীচ বিভাগটা বেশ ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কাপড় বোনার ব্যবসা করিয়া তাঁতীগণ, মাছের ব্যবসা করিয়া নিকারিগণ এবং এইরূপ আরও অনেক ব্যবসায়ী মুসলমানগণ নিতান্ত অকারণে সমাজে নিগৃহীত অবস্থায় রহিয়াছেন। ফলে সাম্যবাদী মুসলমান সমাজেও আশরাফ—আত্‌রাফ নামক দুইটা শ্রেণীর সৃষ্টি করা হইয়াছে।

মূল পুস্তকখানিতে জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী লিখিতেছেন ঃ

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আদম সুমারী বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গদেশীয় কর্তৃপক্ষ মুসলমানদিগকে শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ ৮০ প্রকার জাতিতে বিভক্ত করিয়া ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসংখ্যা ও তাহাদের জাতি নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু এদেশে মুসলমানগণের এই প্রকার জাতিভেদ এক অভূতপূর্ব ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, পৃথিবীপৃষ্ঠে অপর কোনো দেশে মুসলমান সমাজে এরূপ জাতিভেদ প্রচলিত নাই।—পৃ. ১

পরিশিষ্ট হইতে তালিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ (১) আবদাল, (২) আজলাফ, (৩) আখুঞ্জি, (৪) বেদিয়া, (৫) বেহারা, (৬) বেলদার, (৭) ভাট, (৮) ভাটিয়া, (৯) চাটুয়া, (১০) চুরিহর, (১১) দফাদর, (১২) দাই, (১৩) দর্জি, (১৪) দেওয়ান, (১৫) ধাওয়া, (১৬) ধোবা, (১৭) ধুনিয়া বা ধুনকার, (১৮) ফকির, (১৯) গাইন, (২০) হাজ্জাম, (২১) জোলা, (২২) কাগাজি, (২৩) কালান, (২৪) কান, (২৫) কাস্‌বি, (২৬) কসাই, (২৭) কাজি, (২৮) খাঁ, (২৯) খোন্দকার, (৩০) কলু, (৩১) কুমার, (৩২) কুঁজরা, (৩৩) লালবেগী, (৩৪) মাহিফেরুশ, (৩৫) মাহিমল, (৩৬) মাল্লাহ্‌, (৩৭) মল্লিক, (৩৮) মসাল্‌চি, (৩৯) মেহ্‌তর, (৪০) মীর, (৪১) মির্জা, (৪২) মুচি, (৪৩) মোগল, (৪৪) নগর্চি, (৪৫) ননিয়া বা ননুয়া, (৪৬) নাস্যা, (৪৭) নাট, (৪৮) নিকারী, (৪৯) পাঠান, (৫০) পাওয়াবিয়া, (৫১) পীরকোদালী, (৫২) রাসুয়া, (৫৩) সৈয়দ, (৫৪) শেখ, (৫৫) সোনার, (৫৬) অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতি ঃ—(ক) আফগান, (খ) আশরাফ, (গ) বাকলি, (ঘ) বাখো, (ঙ) বাড়ি, (চ) ভুঁইয়া, (ছ) চৌধুরী, (জ) চুণারী, (ঝ) দফালি, (ঞ) গাড্ডি, (ট) গোলাম, (ঠ) হালালখোর, (ড) হিজরা, (ঢ) হোসেনী, (ণ) খরাদি, (ত) কোরেশী, (থ) লাহেরী, (দ) মাংটা, (ধ) মেহানা, (ন) মীরদেহ্‌, (প) মিরিয়াসিন, (ফ) মিঞা, (ব) নওমোস্‌লেম, (ভ) পাটেয়া, (ম) সুন্নি। —পৃ. ৫৯।

মুসলমান সমাজে জাতি-গণনার তীব্র সমালোচনার পর লেখক বলিতেছেন ঃ

> কিন্তু এ দেশে মুসলমানের জাতিভেদ প্রকরণে কেবলমাত্র সেন্সাস কর্তৃপক্ষের দোষ নির্ণয়ে একদেশদর্শিতা প্রকাশ পাইবে। এ দেশীয় অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত মুসলমানগণও প্রতিবেশী হিন্দুর জাতিভেদের অনুকরণে আপনাদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রচলনে চেষ্টিত দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ এই যে বহু শতাব্দী যাবৎ হিন্দুর সহিত একত্র বসবাস করিয়া হিন্দুর প্রভাব মুসলমানের সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অপরদিকে মুসলমানগণ সাধারণত অশিক্ষিত বলিয়া ইসলামী আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে।.... অধিকন্তু যাঁহারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া স্বল্পকাল মুসলমান সমাজভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বংশ পরম্পরাগত জাতিভেদ সংস্কার প্রভাবে সাম্যবাদী মুসলমান সমাজেও জাতিভেদ প্রচলনে চেষ্টিত রহিয়াছেন। সুতরাং মুসলমান সমাজের অপরিচিত এই ভেদনীতি মূলে ভারতীয় মুসলমান সমাজে হিন্দু প্রভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।—পৃ. ১৬।

ভেদনীতির কুফল বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন ঃ

সাম্যবাদী মুসলমান সমাজে অমুসলমানী প্রথায় জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইলে মুসলমানগণ হিংসা বিদ্বেষবশে পরস্পর কলহ বিবাদে লিপ্ত হইয়া পড়িবে এবং এই সামাজিক কলহের ফলে মুসলমানদিগের একতা লুপ্ত হইয়া তাহারা দুর্বল ও হীনবীর্য হইয়া পড়িবে। মুসলমানদিগের বর্তমান অবনতির দিনে তাঁহারা ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে নিতান্ত নিম্ন স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন এবং মাত্র দেড় শত বৎসর ভারতের সিংহাসনচ্যুত হইয়াই তাঁহারা তাহাদের ভূতপূর্ব প্রজা সাধারণ কর্তৃক নিবৃত্তিশয় নগণ্য ও হেয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক বিচ্ছেদ সংঘটিত হইলে তাঁহারা নিতান্ত নিঃসহায় হইয়া তাঁহাদের ধ্বংসকামী সবলের কবলে পতিত ও নিপীড়িত হইবেন; এবং তদবস্থায় তাঁহাদিগকে ফেরাউনের হস্তে বন্দি ইসরাইলের ভাগ্য বরণ করিয়া লইতে হইবে।—পৃ. ১৯

বঙ্গদেশে মৎস্য ব্যবসায়ী দীক্ষিত মুসলমানগণ মধ্যে যেরূপ হিন্দু জাতীয় নিকারী আখ্যা প্রচলিত আছে, সেইরূপ অন্যান্য দীক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে বিশ্বাস, মণ্ডল, প্রামাণিক প্রভৃতি হিন্দু আখ্যারও প্রচলন রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল মুসলমান এ সম্বন্ধে ইসলামের বিধান সম্যক অবগত হইতে পারে নাই বলিয়া বর্তমান অবধি তাহাদের মধ্যে এই সকল হিন্দু আখ্যার বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।...... জোলা, কলু, চাষা প্রভৃতি ব্যবসায়মূলক আখ্যাও বিধর্মীর হীন জাত্যার্থে মুসলমান সমাজে ব্যবহৃত হইতেছে; সুতরাং এ সকল আখ্যার প্রচলনও রহিত হওয়া কর্তব্য।—পৃ. ৩৭

বর্তমান কালে হিন্দুগণ শিক্ষাদিতে উন্নত হইয়া বর্ণাশ্রমের গণ্ডিতে পদাঘাত পূর্বক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চতম হিন্দুগণ মৎস্য ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছেন। এবং সাম্যবাদী মুসলমানগণের কতকাংশ অশিক্ষার অন্ধকার কূপে পতিত হইয়া কোর্‌আন প্রশংসিত মৎস্য ব্যবসায় হেয় ভাবিয়া মৎস্য ব্যবসায়ী মুসলমানদিগের সহিত সামাজিক করণাদি বন্ধ করিতেছেন।—পৃ. ৩৪

আজকাল অনেক হিন্দু-ঘেঁষা অজ্ঞ মুসলমান কৃষি শিল্প ব্যবসায়জীবী মুসলমানদিগের সহিত সমাজ করিতে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। এবং হিন্দুর বর্ণভেদ প্রথার অনুকরণে ওই সকল মুসলমানের সহিত পানাহার করিতে বা একাসনে উপবেশন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কোনো কোনো স্থলে ইহাও পরিলক্ষিত হয় যে, বংশাভিমানী মুসলমানগণ বিদ্যাশিক্ষার্থী মুসলমান ছাত্রদিগকে জায়গীর দান করিয়া কালক্রমে তাহাদিগকে চাষা, নিকারী, কলু বা জোলার সন্তান জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া আপনাপন বংশগৌরব বা শরাফত রক্ষা করিয়াছে! শুধু তাহাই নহে, যে আলেমগণ নবি করিমের খলিফা বলিয়া হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছেন, সেই আলেমগণ কৃষি শিল্প ব্যবসায়জীবীর বংশসম্ভূত হওয়ায় তাহারা তাঁহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িতেও অসম্মত হয়! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, বাংলার এই ভুঁইফোড় আশরাফগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ সন্তান নয় কি? ভণ্ডামির নীচতা বোধ হয় আর ইহা অপেক্ষা নীচে নামিতে পারে না। মূর্খগণ কোর্আন হাদিস খুলিয়া দেখুক, যে মুসলমান সমাজে তাহাদের এই ভণ্ডামিপূর্ণ শরাফতের স্থান নাই।—পৃ. ৩৯

সুখের বিষয় ১৯৪৬ সালের হিন্দু মুসলমান বিরোধের পর হইতে শোনা যাইতেছে যে পূর্ববঙ্গে মুসলমানেরা মাছ ধরা, পানের চাষ করা, ক্ষৌরকর্ম বা রজকের কাজ প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি অনুসরণ করিতেন না, এইবার স্বীয় সম্প্রদায়ের ঐক্য এবং উন্নতি বিধানের জন্য সে সকল বৃত্তি গ্রহণ করিতেছেন।

অর্থাৎ, যে বৃত্তিবিভাগ কুলগত করিয়া ভারতবর্ষ এক সময়ে শিল্প বাণিজ্যে উন্নত হইয়াছিল এবং মুসলমান শাসন প্রবর্তনের পরেও যাহা শহরে আংশিক আঘাতপ্রাপ্ত হইলেও গ্রামদেশে টিকিয়া গিয়াছিল, কিন্তু যাহা ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের আঘাতে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য হিন্দু সমাজের মধ্যে জাতিভেদের সংস্কার চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই। মুসলমান সমাজের মধ্যেও তেমনি তাহার নাগপাশ হইতে মুক্তির একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়। সকলেই বৃত্তিতে কুলগত অধিকার ভাঙিয়া স্বাধীনতা আনিবার চেষ্টা করিতেছে, সকলেই কুলগত বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার তারতম্য সমূলে বিনাশ করিয়া উচ্চতম জাতি যে মর্যাদা অধিকার করিয়া আসিতেছিল, তাহাই আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

উৎস : হিন্দু সমাজের গড়ন, লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা ১৩৫৬

# এদেশের ভিখারি সম্প্রদায়

## অদ্বৈত মল্লবর্মন

শৈশবে আমরা প্রথম পাঠ আরম্ভ করিয়া 'গুরুজনে মানিয়া চল', 'চেঁচাইয়া কথা কহিয়ো না'র সঙ্গে সঙ্গে 'ভিখারিকে ভিক্ষা দিবে' কথাটাও মুখস্থ করিয়া রাখি এবং পরে বড়ো হইয়াও আমাদের, ভিখারি মাত্রকেই ভিক্ষা দিবার প্রবৃত্তি একটা সংস্কারের মধ্যে পরিগণিত হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ছাড়াও, ত্যাগ বা দয়ার আতিশয্যের আমাদের মধ্যে আরও কারণ আছে : আমরা ঋষির বংশধর, আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিরা সংসারের টাকা পয়সার লেনদেনের ব্যাপার নিয়া কখনো মাথা ঘামাইতেন না,—অর্থমনর্থম্ বলিয়া ইহার সংশ্রব একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া তপোবনে বৃক্ষতলে বা কুটীরে বসিয়া সোমরস পানে মাতোয়ারা হইয়া সামগানে দিঙ্‌মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিতেন—ইহার প্রতিটি কথায়, সুরের প্রতিটি স্পন্দনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত কেবল ত্যাগের সুর, দিত জগদ্বাসীকে ত্যাগের প্রেরণা। সেই ত্যাগের সুরই এখন পর্যন্ত আমাদের শিরা উপশিরায় এবং প্রত্যেকটি রক্তকণিকায় অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। এইজন্যই পরের দুঃখে বিগলিত হওয়া আমাদের আজন্ম সংস্কার। ভিখারি-দেখিয়া দান না করিয়া আমরা পারি না। মানবতা এবং চিত্তের কমনীয়তার দিক দিয়া এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না যে এই প্রকার দানের প্রবৃত্তিই মানুষকে ক্রমশ ভগবানের কাছে টানিয়া নেয়। বিরুদ্ধ যুক্তি দিয়া ইহার বিচার চলে না, ভাষা দিয়া ইহার সমালোচনা চলে না ইহা শুধু মনের জিনিস ঃ আমি ভিখারিকে দান করিয়া তৃপ্তি পাই, আপনি কেন বাধা দিতে চান! কিন্তু জগতের অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইহার বিচার চলে।

পৌরাণিক যুগে অতিথিবৎসলতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অতিথি ও ভিখারি এক না হইলেও অনেক রকমে ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। অতিথি যেমন আকস্মিকভাবে আসিয়া থাকে, ভিখারিও তদ্রূপ। অতিথি অসময়ে (বিশেষত দুপুরে বা রাত্রে) আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করে এবং রাত্রিবাস করিয়া চলিয়া যায়, ভিখারি ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াই চলিয়া যায়। বিশেষ দায়ে পড়িয়া অতিথি গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, আর ভিখারির পেশাই ভিক্ষা, আজ এ-পাড়া, কাল ও-পাড়া এই রকম করিয়া তাহার দিন গুজরায়। পৌরাণিক যুগে আমরা অতিথির কথাই জানিতে পাই, তথাকথিত ভিখারির স্বরূপ বিশেষ খুঁজিয়া পাই না। তখনকার অতিথিদের বেশির ভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তাঁহারা ছিলেন দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কাজেই একথা বলিলে অন্যায় বলা হইবে না যে

ইঁহারা পরোক্ষভাবে ছিলেন ভিখারিই। ভিক্ষা কথাটা তখনো বিশেষ উপহাসাস্পদ ছিল না বলিয়াই বোধহয় তাঁদের ঐ ভিখারি জীবনটাকে অতিথি (সৎকার) বলিয়া লিখিয়া গিয়াছে।

তখনকার যুগে লোকে অতিথি সেবার জন্য সর্বক্ষণের জন্য নিজেরা প্রস্তুত থাকিত, দ্বিপ্রহরে রন্ধনের পর সহজে নিজেরা আহার করিতে চাহিত না, তটস্থ হইয়া বসিয়া থাকিত, রুদ্ধনিশ্বাসে পথ পানে চাহিয়া থাকিত, তাহাদিগকে কৃতার্থ করিতে কোনো অতিথি তথা ভিখারি আসে কি না। কিন্তু এত যে অতিথি তথা ভিখারি সৎকারের আয়োজন, ইহা শুধু দান করিবার প্রবৃত্তির জন্যই নয়, নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া কাঙাল সাজা নয়—ইহার পেছনে ছিল একটা ভয়ানক স্বার্থপরতা। কথাটা একটু বুঝাইয়া বলিতে হয়। তখনকার ভগবানের কী যে বদখেয়াল ছিল, তখন তিনি সময়ে অসময়ে প্রায়ই লোকদিগকে পরীক্ষা করিতে আসিতেন এবং আসিতেন অতিথি তথা ভিখারির বেশে, আসিতেন দরিদ্র আর্ত ব্রাহ্মণের বেশে। তখনকার লোকেরা ইহা মনে প্রাণেই জানিত। তা ছাড়া তিনি কখন যে কার ঘরে আসিয়া 'সেবা' চাহিয়া এবং গৃহীর হাড়ভাঙা খাটুনির দ্বারা উপার্জিত অন্নের বেশিরভাগ দ্বারা উদর পূরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া গৃহীর সগুষ্ঠি বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি ঘটাইতেন তা তো বলা যায় না, তাই তারা সর্বক্ষণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখিত—'ভিখারির বেশে এই বুঝি আসে মনচোর, শুনি তার নূপুরের ধ্বনি রিনি ঝিনি—কতদূর ওগো কতদূর!' এই জন্য বলিতে ছিলাম সে যুগের অতিথিপরায়ণতার উদ্দেশ্যেই ছিল নিজেদের স্বার্থোদ্ধার—অতিথিকে দুটি খুঁদ-কুড়া খাওয়াইয়া একেবারে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি! তখনকার অতিথি পরায়ণতার সময় সময় বেশ একটু মারাত্মক গোছের হইয়া দাঁড়াইত, অতিথির যাচ্ঞাও বেশ রকমের আরামসূচক ছিল না। যেমন ধরুন কর্ণের কথা; তিনি আপনার ছেলে বৃষকেতুর মাংস দিয়া মাংসাশী দরিদ্র ব্রাহ্মণরূপী অতিথি তথা ভিখারিকে পরিতোষ করাইয়াছেন। তারপর দ্রোণের স্ত্রী ধরা; তিনি নিজের স্তন কাটিয়া দিয়া দোকানির নিকট হইতে চাউল-ডাইল আনিয়া একবার অতিথি তথা ভিখারিরূপী ভগবানের সর্বনাশা উদরটিকে পরিপূর্ণ করাইয়াছিলেন। ওইসব অতিথিরাই ছিলেন তখনকার ভিখারি এবং এই 'অতিথি তথা ভিখারির বেশে কখন যে কে আসেন বলা যায় না'—এই ভাবটিই এখন পর্যন্ত আমাদের হিন্দু সমাজকে ভিখারিমাত্রকেই খুশিভাবে ভিক্ষাদান ব্যাপারে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া আসিতেছে।

## ফকির-বোষ্টম ও মহাপ্রভুর ভেক

আসিল মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের যুগ। তিনি 'প্রেমিক গোরা' রূপে আসিয়া প্রেমের বন্যায় হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পরিপ্লাবিত করিলেন, করিলেন পাষণ্ড দলন, করিলেন হরিনামে সবাইকে মাতোয়ারা। কিন্তু তাহার তিরোধানের পর তাহার এমন মধুময় ধর্ম অবিকৃত রহিল না। একদিকে যেমন বহু 'পামর ব্যক্তি' প্রেমাস্বাদে মাতোয়ারা হইয়া পাপতাপময় সংসারে নিজেদের মনের মধ্যে 'নিত্য বৃন্দাবন' সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অপরদিকে তেমনি, তাহার প্রেমের সুযোগে সমাজে সৃষ্টি হইল কতকগুলি ভিক্ষোপজীবী পরগাছা, আর কতকগুলি অনাচারী সহজিয়া বা পরকীয়া ভজনকারী মুখোশপরা লম্পট! মহাপ্রভুর 'ভেক' নেওয়া কী চিজ তাহা অনেকেই জানেন। প্রকৃত ধর্মপ্রেরণায় শত শত লোক 'ভেক' গ্রহণ করিতেছেন একথা সত্য; কিন্তু ইহার আরও একটা দিক আছে।

মহাপ্রভুর ‘ভেক’ গ্রহণ করিলে কোনো শ্রমসাধ্য কাজ করিতে হইবে না, লোকের দশ দুয়ারে মাগিয়া খাইয়া জীবনটা চালাইয়া নিতে পারা যাইবে। এই প্রেরণা হইতেও শত শত লোক এই ‘ভেক’ গ্রহণ করিতেছে। এইভাবে সমাজে বৈষ্ণব বা বোষ্টম বা বৈরাগী নামে আর এক শ্রেণির ভিক্ষোপজীবীর উদ্ভব হইয়াছে। আউল-বাউল নামে ইহাদের আবার শাখাও আছে।

## নানা রকম ভিখারি

হিন্দু সমাজের বৈষ্ণব, বোষ্টম ও বৈরাগী শ্রেণির ভিখারি সম্প্রদায়ের কথা আগেই বলিয়াছি, ইহারা ছাড়া আরও এক শ্রেণির সম্প্রদায় হিন্দু সমাজে আছে। গেরুয়া বা হলদে রঙের কাপড় বা কৌপিন পরিয়া, গায়ে একটা সেই রঙের ঢিলা আলখাল্লা লটকাইয়া আর এক হাতে এক একটা ঠাকুরের ছোটখাট মূর্তি লইয়া পাড়ায় পাড়ায় ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। কেউ শনির মূর্তি, কেউ লক্ষ্মীর আবার কেউ বা সুবচনী বা নারায়ণের মূর্তি লইয়া বাহির হয়। সেই সেই দেবতার পূজারি সাজিয়া দেবতার দোহাই দিয়া ইহারা এক একটি পয়সা করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ি হইতে মাগিয়া নেয়।

মুসলমানদের মধ্যে ফকির জাতীয় ভিখারি সম্প্রদায়টাই সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। আমাদের সমাজে বৈরাগী বলিতে যাহা বুঝায় ফকিরও অনেকটা তাই। এক একটা ‘দরগা’কে কেন্দ্র করিয়া ছোটখাট এক একটা পাড়ায় ফকিরদের বাস।

এই ফকিরদের সংখ্যা এত অধিক যে পল্লির হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই ইহাদের জ্বালায় যার-পর-নাই অস্থির হইতে হয়। ইহারা গৃহস্থগণকে কত যে বিরক্ত করিয়া মারে তাহা ভুক্তভোগী পল্লিবাসী মাত্রেই স্বীকার করিবে। সাধারণ পল্লিবাসীদিগকে ইহারা প্রায় জ্বালাইয়া মারে। বয়স্ক বা অসমর্থদের তো কথাই নাই, বলিষ্ঠ জোয়ান যারা, যারা খাটিয়া খাইতে পারে, কর্মানুরাগী ভগবান কর্ম করিবার জন্য যাদের প্রচুর স্বাস্থ্য দিয়াছেন তারাও এইভাবে পল্লির প্রতিটি গৃহস্থকে বিরক্ত করিয়া ভিক্ষাস্বরূপ চাউল বা পয়সা আদায় করিয়া তবে ছাড়ে। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কোনো গৃহী ভিক্ষা দিতে অশক্ত হইলে বা বিরক্ত বোধে বিমুখ করিলে ফকিরেরা নানা প্রকার শাপমন্যি করিতে আরম্ভ করে। তাই নিজেদের এবং প্রতিবেশীর মঙ্গলার্থেও গৃহী তাহাদিগকে ভিক্ষা প্রদান করিতে বাধ্য হয়। এই সম্প্রদায়টি ছাড়া মুসলমান সমাজে আরও যে একটা ভিখারি সম্প্রদায় আছে, সেটা আরও মারাত্মক। যাহারা পল্লিগ্রামের ছোটো-বড়ো হাটগুলি দেখিয়াছেন তাহারা অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন, সেখানকার হাটের গলিতে গলিতে প্রায়ই দুই চারটে অঙ্গহীন লোক পিণ্ডবৎ পড়িয়া থাকে। কেউ হস্তপদহীন, কেউ চোখে দেখে না। কারও দেহগঠন ভগবানের রাজ্যে নিতান্ত অস্বাভাবিক। ভগবানের শাপে এমন অবস্থায় পতিত দুনিয়ার এই শ্রেণির হতভাগ্যদের জন্য করুণা হওয়া স্বাভাবিক। মানুষ এতটা হীন নয় যে, এই দুর্ভাগাদের দেখিয়া নিজের আড়ালেও অন্তত একটা ব্যথার নিশ্বাস ফেলিবে না। কিন্তু ইহাদের লইয়া পুরা একটা সম্প্রদায় বাঁচিয়া রহিয়াছে ভিক্ষা-উপজীবিকাকে অবলম্বন করিয়া। ইহাদের এক একটাকে বাঁশের মাচায় সাজাইয়া গুছাইয়া লইয়া দুই তিনজনে কাঁধের উপর তুলিয়া পল্লীর জমজমাট হাটগুলিতে বিনাইয়া বিনাইয়া দুঃখের কেচ্ছা

গাহিয়া ইহারা কেবল পয়সা আদায় করে না, হাটের পসারি ও অন্যান্য লোকেদেরও করে অসুবিধার সৃষ্টি। লোকে করুণায় বিগলিত হইয়া পয়সা দেয়, সেই পয়সায় অভাগাদের কতটুকু উপকার হয় জানি না। তবে ওই পয়সা দ্বারা এই অভাগ্যদের অন্তরালে থাকিয়া অনেকগুলি নিষ্কর্মা লোক যে সংসারে প্রশ্রয় পাইতেছে একথা সত্য।

## আদর্শ বৈষ্ণব

মোটামুটিভাবে সম্প্রদায়গত কতকগুলি ভিক্ষোপজীবীর বিষয় উল্লেখ করলাম, এখন দেখিতে হইবে যে এই প্রকার ঘৃণিত ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া ইহারা অন্য কোনো কাজ করিয়া খাইতে পারে কিনা।

বৈষ্ণব, বোষ্টম বা বৈরাগীদের কথা আমরা আগেই বলিয়াছি। মহাপ্রভুর 'ভেক' গ্রহণ করিলে সংসারের প্রতি কোনো আসক্তি রাখা যায় না, পরের দুয়ার হইতে মাগিয়া দুটো 'প্রসাদ' তৈয়ার করিয়া শ্রীগোবিন্দের নামে নিবেদন দিয়া উদরস্থ করিতে হয়—ইহাই এই সমাজের একটি সাধারণ প্রথা। ইহাতে দোষের কিছু নাই, যেহেতু মহাপ্রভু নিজে ভিক্ষা করিতেন। এই ভিক্ষা গ্রহণের স্বরূপ তখন পরের ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙাই ছিল না, ইহার অন্য স্বরূপ ছিল। সংযম ও নিবৃত্তি মার্গে অগ্রসর হইবার উদ্দেশ্যে তখন মাত্র দু-এক মুষ্টি ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলেই দিন গুজরান করিতে হইত। এই জন্যই বোধহয় তখন, কেহ কেহ বলিয়া থাকে, সন্ন্যাসী বা মহাপ্রভুর ভেকধারীদিগকে দিনে মাত্র তিনটি ঘর হইতে তিন মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু আজ এমন নয়। আজ প্রশ্রয় পাইয়া বহু নরনারী যত না যথার্থ ধর্মপ্রেরণায় তার চেয়ে বেশি খাটিয়া খাওয়ার ভয়ে দলে দলে বোষ্টম ধর্ম গ্রহণ করিয়া ভিখারীর সংখ্যা বাড়াইতেছে। নিরক্ষর হিন্দু সমাজে অনেক স্থলেই দেখা যায় অসহায় বিধবাদের মধ্যে অনেকেই আবার অন্য কোনো পথ না পাইয়া মহাপ্রভুর ভেক গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে।

তারপর পুরুষ বোষ্টমদের কথা। আমি এক ভেকধারী বোষ্টমকে জানিতাম। মহাপ্রভু ভেক গ্রহণের পর স্বতন্ত্র জায়গায় এক আখড়া পাতিয়া সে থাকিত। তাহাদের ধর্মের সনাতন রীতি অনুযায়ী ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারাই তার ঘরে স্থাপিত রাধামাধব জীউর ছোটোখাটো বিগ্রহের ভোগ্য প্রদান করিত। কিন্তু একদিন ভিক্ষা করিতে যাইয়া কোনও ভিক্ষাদাতার একটি মাত্র শ্লেষপূর্ণ কথায় তার চৈতন্যের উদয় হয়। ইহার পর সে আর ভিক্ষায় যায় নাই। তাহার আখড়ায় রাধা-মাধবজীর কুটীরের এখানে সেখানে লাউ কুমড়া শিম গাছ রোপণ করিল। লতাইয়া লতাইয়া সেগুলি ঠাকুর ঘর ঘিরিয়া ফেলিল। পরে সত্যি তার আর পরের দুয়ারে ভিক্ষা মাগিবার প্রয়োজন হয় নাই। সে ছাগল পুষিত, তাহার দুধ বাজারে যাইয়া বিক্রয় করিত। কয়েকটা আম গাছ তাহার ছিল, আম বিক্রয় করিত। এমন কি আম গাছের খোপ হইতে শালিক আর দোয়েল পাখির ছানা পর্যন্ত বিক্রয় করিত। করিয়া সেই পয়সায় কেনা চাউল দাইল রান্না করিয়া বিগ্রহের ভোগ লাগাইত। এই সকল ধর্মবহির্ভূত কাজ করার দরুণ আশেপাশের বৈষ্ণব সমাজে স্বভাবতই তাহার পাত উঠিল। আমাদের দেশের তথাকথিত ভিখারী বৈষ্ণবগুলিকে যদি আমার চেনা বৈষ্ণবটির পন্থা অনুসরণ করিতে বলি তবে তারা নাক সিঁটকাইয়া বলিবে, সংসার ছেড়েছি কি সংসারে

আবার জড়াবার জন্যে। কিন্তু কর্মহীন অলস জীবনযাত্রায় আর আত্মার এবং দেহের অবমাননাকর ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে ভগবানের কোন সত্তাই যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না একথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবার দিন আজ আসিয়াছে। নিজের শ্রমদ্বারা অর্জিত অন্নদ্বারা ঠাকুরের ভোগ লাগাইলে ঠাকুর যে তাহা অধিকতর পরিতৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক আমার সে বৈষ্ণবটি আর ভিক্ষাবৃত্তি করে নাই। তাহার সমাজের অন্যান্য বৈষ্ণবদের পীড়াপীড়াতে মাঝে মাঝে তাহাকে ভিক্ষায় বাহির হইতে হইত সত্য কিন্তু সরাসরিভাবি চাহিয়া কাহারও নিকট হইতে সে কিছু গ্রহণ করিত না। সে বেশ গান গাহিতে পারিত। গোপীযন্ত্র, খঞ্জনী বা রসমাধুরী বাজাইয়া বাড়ি বাড়ি গান গাহিয়া সে লোককে মুগ্ধ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা গ্রহণ করিত তাহাকে সে ভিক্ষা বলিয়া মনে করিত না, মনে করিত পরিশ্রম দ্বারা লব্ধ।

ফল কথা প্রত্যেক পল্লিতে সহজসাধ্য কুটীর শিল্পাদির প্রবর্তন করিতে পারিলে এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করিতে শিখাইলে ইহাদের সংখ্যা কমিতে পারে। আর কমিতে পারে ইহাদিগকে অনাসক্তির মোহ কাটাইয়া নাম-সন্ধ্যা-মালা-জপের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক খাটুনিতে প্রলুব্ধ করিলে; নিষ্প্রাণ ঠাকুর বিগ্রহদেবের সেবার সঙ্গে সঙ্গে কর্মময় বাস্তব অনুভূতির সৃষ্টি করিলে।

এবার ফকির ভিখারি সম্প্রদায়ের কথা। এদেশের মুসলমানগণই সাধারণত কৃষিজীবী। ফকিরদের সংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করিয়া ছোটখাট কৃষিকাজগুলিতে লাগাইলে এদের দ্বারা বেশ কাজ হইতে পারে। এ স্থলে বিচার্য যে দরগার চারিপাশে আড্ডা গাড়িয়া ধর্ম সাধনার চাইতে খাটুনি হইতে শরীরকে বাঁচাইয়া 'সুখের ভাত' খাওয়াই অনেক স্থলে ইহাদের লক্ষ্য। ভিক্ষার আকাল পড়িলে অনেক সময় ইহারা গুণ্ডামির আশ্রয় নেয়। ইহাদের অনেকেই আবার রাত্রিতে জাঁকালো ফকিরি স্টাইলের পোষাক পরিয়া পঞ্চ প্রদীপ সাজাইয়া বড়ো বড়ো হাঁকডাক দিয়া ধর্মভীরু পল্লিবাসীদিগকে চমকাইয়া দিয়া পয়সা আদায় করিতেও দেখা যায়। এই সকল ব্যাপার নিশ্চয়ই খাঁটি ধর্মের বিশিষ্ট অঙ্গ নয়।

পল্লিবাসীরা ধর্মভীরু, তারা সরলপ্রাণ, তারা খাটিয়া খাইতে জানে। কর্মবিমুখতা এখনও তাদের মধ্যে দেখা দেয় নাই। এই কথাটি তাদের অনেকেরই জপমালা—

সোনা রূপার দুখানা হাত
যেখানে লড়িবে সেখানে ভাত।

ভগবান হাত দিয়াছেন কাজ করিবার জন্য, ভগবানের আশিস রূপ এই দুইখানা হাত দিয়াই মানুষ কত বড়ো বড়ো কাজ করিতেছে। ইহাকে কাজে না লাগাইয়া নিতান্ত অপমানিতভাবে পরের দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া এই সংসারে বাঁচিয়া থাকিবার কারও অধিকার নাই!

এই কয় বৎসরের অর্থ কষ্টের ফলে দেশে অনেকগুলি নূতন ভিখারির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের ভিক্ষার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে পাষাণও বুঝি গলিয়া যায়। কারও উপুসি ছেলের মুখে দিবার একটু ভাতের মাড় মিলে না, কারও পরিবারে সব কয়টি প্রাণী পাঁচদিন ছ'দিন ধরিয়া উপবাসী এইসব। এরা নাকি আর কোনো উপায় খুঁজিয়া পায় না বলিয়াই গলায় গামছা জড়াইয়া ভিক্ষায় বাহির হয়। কিন্তু সত্যই কি ভিখারিদের কোনো উপায় নাই, বা করিবার তারা কিছু পায় না? এমন অনেক কাজ নিশ্চয়ই আছে যে, লোকে করিতে সাধারণত কুণ্ঠাবোধ করিবে। কিন্তু এক

চুরি করা ছাড়া যে কোনো কাজ মাত্রই ভিক্ষা করার চাইতে ভালো। আপাতদৃষ্টিতে এগুলি অসম্মানজনক মনে হইতে পারে, কিন্তু ভিক্ষার অপমান এতে নাই।

## এরা কি করিতে পারে

পল্লিতে বারো মাসে তেরো পার্বণ হয়। এক এক সময়ে একটা না একটা লাগিয়া থাকে, তাতে ভিখারিরও আমদানি হইয়া থাকে। তারা ভিক্ষা হিসাবে এক পেট খাবার না খাইয়া, উৎসব বাড়ির অনেকগুলি খুঁটিনাটি কাজের কিছু কিছু করিয়া দিয়াও খাইতে পারে। এ খাওয়াকে ভিক্ষা বলিলে সত্যি ভুল বলা হবে।

পল্লির গ্রামে গ্রামে শত শত হাট-বাজার আছে, কোনটা সপ্তাহে দুইবার তিনবার করিয়া কোনটা বা প্রতিদিন করিয়া বসিয়া থাকে। যে কেউ দেখিয়াছেন তিনিই জানেন হাট-বাজার বসিবার জায়গাগুলি কত অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন। এতে কত রোগের বীজাণু উৎপন্ন হইয়া থাকে, কত দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে এবং হাটের পসারিদের অসুবিধা ও স্বাস্থ্য হানির কারণ ঘটাইয়া থাকে। ভিখারিরা হাট বসিবার আগে অনায়াসেই ঝাঁটা হাতে করিয়া সে সব জায়গা পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে করিয়া রাখিতে পারে। এতে পসারীদের কত আনন্দের কারণ হয়। তখন তাদের কাছে শ্রমের মূল্য স্বরূপ কলাটা মূলোটা চাহিলে সেটা ভিক্ষা করা হইবে না। তারাও সানন্দে উহা দিতে ইতস্তত করিবে না।

পল্লিতে রাস্তাঘাট পরিষ্কার ও আবর্জনা দূর করিবার কোনো বন্দোবস্ত নাই। ভিক্ষা ভিন্ন যাদের গত্যন্তর নাই তারা সেই সব পরিস্কার করিয়া অল্পায়াসে পড়ার লোকেদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে। ভিক্ষা না করিয়া মরশুমের সময় গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ধান ভানিয়া বা নালিতার মরশুমে নালিতা ছাড়াইয়া দু'মুঠোর জোগাড় করিতে পারে। চেষ্টা করিলে ছোটোখাটো কুটীরশিল্প সংক্রান্ত কাজগুলি তারা অনায়াসে করিতে পারে। সস্তা দরে বাঁশ কিনিয়া চুপড়ি ঝাঁপি প্রভৃতি জিনিস অনায়াসে তৈরি করা যায়। এসব কাজ আজকাল লাভজনক না হইলেও ভিক্ষার চাইতে শতগুণে ভালো। নিতান্ত ভিখারি হইলেও মাথা গুঁজিবার মতো একখণ্ড ভূমি নিশ্চয়ই তাদের থাকে। মাটিতে পরিশ্রমীর জন্য ভগবান সোনা লুকাইয়া রাখিয়াছেন। কষ্ট করিয়া মাটি কোপাইয়া লাউ-কুমড়া শিমের গাছ ইচ্ছা মাত্রই করিতে পারে। অথচ এগুলি বাজারে কত চড়া দামে বিক্রয় হয়। আরো কত কাজ আছে যা নাকি ঘৃণিত ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে অনায়াসে করিয়া ভাতের জোগাড় করা যায়। তবে চাই সেই অনুপাতে মনোবৃত্তি। 'মাগিয়া খাইব না' বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প থাকিলে এবং শরীরে এতটুকু শক্তি থাকিলে মানুষ উপোসে মরিবে না, একথা সত্য।

যাদের জন্য এত কথা বলিলাম তারা হয়তো এসব বুঝিবে না। কখনও এ লেখা তাদের হাতে পড়িবে না। এ লেখা সদ্ব্যবহার করিতে হইবে আমাদেরই। তাহাদিগকে কাজের কথা দেখাইয়া হীন ভিক্ষামনোবৃত্তি তাদের দূর করিতেই হইবে। তাদের বুঝাইয়া বলিতে হইবে, তুমি ধর্মার্থী সাধু সন্ন্যাসী আর ফকির বাবাজি যাই হও না কেন, কাজ করিয়া খাও, পরের শ্রমের অন্নে ভাগ বসাইবার তোমার কোনো অধিকার নাই। নির্ঝঞ্ঝাটে ভগবৎ আরাধনা করিতে চাও, বেশ তো কর না, কিন্তু পরের নিকট ভিক্ষা চাহিয়া করিও না। নিজের শ্রমের দ্বারা পেট চালাও, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম উপাসনা যাহা করিতে হয় কর।

উৎস : অদ্বৈত রচনা সমগ্র

# মানবতন্ত্র

## আবুল ফজল

জাতীয় আদর্শের ধারণা সকলের এক নয়। সাহিত্যিকের কাছে সত্যই বড়ো কথা। সত্যের সঙ্গে যদি জাতীয় আদর্শ, ধর্ম বা শাস্ত্রের বিরোধ ঘটে নিঃসন্দেহে বিনা দ্বিধায় সাহিত্যিক সত্যের পক্ষাবলম্বন করবে। সাহিত্যিকের যদি কোনো আল্লাহকে মানতে হয় তা হলে সে আল্লাহ হচ্ছেন—'আল হক্‌কুন' অর্থাৎ যিনি হক বা সত্য। প্রচলিত অর্থে আল্লাহর গুণাবলি নিরানব্বই হোক কি তেত্রিশ কোটি হোক তাতে কিছু এসে যায় না—তা যে হক্ বা সত্যের রকমফের, এ উপলব্ধি যার নেই তার পক্ষে মুখে আল্লাহর নাম নেওয়া শয়তানের ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তিরই সমতুল্য। সত্যের এ বোধটুকু না থাকলে সাহিত্যিক যেমন হওয়া যায় না তেমনি হওয়া যায় না সাহিত্যের বিচারক বা সমজদার। প্রসঙ্গত বলতেই হচ্ছে আমার 'রাঙ্গা প্রভাত' নামক উপন্যাস পড়ে জনৈক অধ্যাপক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে জাতীয় আদর্শবিরোধী, পাকিস্তানবিরোধী, ইসলামবিরোধী ইত্যাকার বহু সাংঘাতিক অভিযোগে বইটাকে সংবাদপত্রের পাতায় অভিযুক্ত করেও ক্ষান্ত হতে পারেননি। শুনেছি, এ বিষয়ে তিনি প্রদেশের স্বরাষ্ট্র বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করবারও চেষ্টা করেছেন। জাতীয় আদর্শ খুব একটা মস্ত বড়ো বস্তু যদি হয়, তা হলেও জিজ্ঞাসা করা যায় তা রক্ষা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব কি স্বরাষ্ট্র বিভাগের? ওই বিভাগের কর্মচারীদের ওই সম্পর্কে জ্ঞানের বা মূল্যায়নের দৌড়ই বা কতটুকু? সাহিত্য বিচারের ভার শেষ পর্যন্ত যদি স্বরাষ্ট্র বিভাগের ওপরই ন্যস্ত হয় তা হলে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হওয়ার কারণ ঘটে না কি? আশ্চর্য, সাহিত্য-শিল্পের ওপর স্বরাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় বলে, এরাই আবার সোভিয়েট রাশিয়ার নিন্দায় পঞ্চমুখ। এদের মতে, বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের যে ধর্ম মানবতার চেয়ে তা বড়ো। এ মত আমি বিশ্বাস করি না, মানিও না। কথাটা হয়তো 'রাঙ্গা প্রভাত'-এ কিছুটা সোচ্চার হয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি জায়গায় যে অমানুষিক কাণ্ড ঘটে গেল তাতে আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে। এ সবে যারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধার্মিকের অভাব ছিল না—এদের অনেকে হাতের ধারালো ছোরাটা উদ্যত করেছে ঈশ্বর ও আল্লাহর নাম নিয়েই। ঈশ্বর ও আল্লাহর পরিবর্তে এদের দিলে যদি কণামাত্রও মানবতার ছোঁয়া লাগত তা হলে এমন কাজ তাদের দ্বারা কখনো সম্ভব হত না। এদের সম্বন্ধেই বানার্ড শ'র বিখ্যাত উক্তি Beware of that

man whose God is in heaven একটু বদলিয়ে বললে কথাটা আরও প্রত্যক্ষ হয়; যাদের আল্লাহ শুধু ঠোঁটে আর তসবিতে তাদের থেকে সাবধান।

ধর্ম আর সেক্যুলারিজম আজ স্রেফ মুখের বুলিতে পর্যবসিত। ধার্মিক না হয়েও ধর্মের নামে গদগদ হওয়া আর মনে সেক্যুলার না হয়েও সেক্যুলারিজমের নামে মুক্তকচ্ছ হওয়া তেমন কোনো বিরল দৃশ্য নয়। আজকের দিনে যদিও সেক্যুলারিজমের অর্থ করা হয় 'ধর্মনিরপেক্ষতা'—আসলে ওটাও একটা পোশাকি ধর্ম—সাম্প্রদায়িকতার আর একটি নতুন নাম। এও এক রকম 'মিটিং কা কাপড়া'। রাজনৈতিক বদলের বেশি এর কোনো মূল্য নেই। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ কি খুলনায় যারা অশান্তি ঘটিয়েছে তারাও তো ইসলাম ধর্মাবলম্বী, যে ইসলামের অর্থ শান্তি। ধর্মকে এ স্ববিরোধিতার হাত থেকে বাঁচাতে হলে মানুষের দৃষ্টি ধর্মের দিক থেকে মনুষ্যত্বের দিকে ফেরাতে হবে। কোনো রকম ধর্মতন্ত্র নয়, মানবতন্ত্রকেই করতে হবে আজ সব দেশের ও সব রাষ্ট্রের আদর্শ। ব্যক্তি বা সমাজজীবনেও এর থেকে বড়ো আদর্শ আমার মনের দিগন্তে আমি খুঁজে পাই না।

খাঁটি অর্থে কোনো ধর্মের পক্ষেই আজ তার নিষ্কলুষ আদি স্বরূপ রক্ষা করা সম্ভব নয়—সম্ভব নয় সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া—বিশেষ করে পাকিস্তান-হিন্দুস্থানে। না পাওয়ার একটা বড়ো কারণ রাজনীতি আর ধর্ম আমাদের দুই দেশে আজ এক। রাজনীতিবিদের মুখে এখন ধর্মের যত বুলি শোনা যায় স্বয়ং ধর্ম-প্রবর্তকদের মুখেও কোনো দিন তত ধর্মবুলি শোনা যায়নি। কারণ, তাঁরা বুলির চেয়ে ধর্ম পালনে ছিলেন অধিকতর বিশ্বাসী। এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। বিজ্ঞানের অগ্রগতিও হয়তো অন্যতম কারণ। ধর্মের অনেক বিশ্বাস, যার সঙ্গে নৈতিক বোধ ও সমাজিক ন্যায়-চেতনা জড়িত তা আজ এক রকম ধূলিসাৎ। যা সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ নয়, তা আর মানুষকে প্রভাবিত করতে পারছে না। তাই সব রকম ধর্মীয় নীতিবোধ আজ শিথিল—ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন থেকে বিযুক্ত। ফলে যে কোনো শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোক এখন দোজখের জল্লাদ থেকে তাঁর এলাকার থানার দারোগাকে অনেক বেশি ভয় করে থাকেন।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে এটা খুব ভালোভাবেই দেখা গেছে যে, ধর্ম বা সেক্যুলারিজম কোনোটাই মানুষকে বাঁচাতে পারে না, পারে নি। কাজেই ধর্ম নয়, সেক্যুলারিজমও নয়, একমাত্র মানবতার ওপরই দিতে হবে জোর। ধর্মের কথা বললেই অনিবার্যভাবে অন্য ধর্মের কথা এসে পড়ে। সেক্যুলারিজমের সঙ্গেও বৈপরীত্যের কল্পনা অবিচ্ছিন্ন। যারা সেক্যুলার নয় তাদের শত্রু ভাবতে সেক্যুলারিজম বিশ্বাসীর মোটেও বাধে না। বামপন্থীদের কণ্ঠস্বরও আজ কিছুমাত্র আশাপ্রদ নয়। সম্প্রতি ভারতীয় লোকসভা ও পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় যে বিতর্ক দেখা গেল তা রীতিমত আতঙ্কজনক।

কাজেই মানুষকে অমানুষিকতার হাত থেকে বাঁচাতে হলে মানবতাকেই করতে হবে একমাত্র অবলম্বন। কথা আছে, বাঘ বাঘের মাংস খায় না—কথাটা সত্য। বাঘও বাঘের বেলায় নিজেদের সাধারণ ব্যাঘ্রত্ব সম্বন্ধে সচেতন। ব্যাঘ্রত্বে পরস্পর অভিন্ন। অতএব অবধ্য। মানুষকেও সচেতন করে তুলতে হবে সাধারণ মানবতা সম্বন্ধে। এখন ধর্ম আর সেক্যুলারিজমের ওপর জোর দিতে গিয়ে আমরা সাধারণ মানবতাকে শুধু খাটো নয়, প্রায় মুছে ফেলেছি আমাদের জীবন থেকে। আমরা নির্ভেজাল মুসলমান বা নির্ভেজাল হিন্দু কি না এ দাবিই আজ সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ। পাশাপাশি দুই দেশের দুই বৃহত্তর সমাজে আজ এ দাবিই সবচেয়ে

উদগ্র। নির্ভেজাল মানুষ হোক—এ স্বাভাবিক দাবি কোথাও শোনা যায় না—পরিবারে, সমাজে রাষ্ট্র সর্বত্র এ দাবি অনুপস্থিতিতেই বিশিষ্ট।

অন্য মানুষটাও আমার মতই মানুষ—এ বোধ ও চেতনাকে ব্যাপক ও ব্যাবহারিক করে তুলতে না পারলে মানুষের রক্ষা নেই। ধর্ম বা সেক্যুলারিজম মানবতার স্থান নিতে পারে না। প্রাণপণে দুই বিপরীত ধর্ম পালন করে কোথাও মিল হয়েছে—এমন নজির আমার জানা নেই। দুই ধর্মের দুই ধার্মিকের সত্যকার সখ্য বা আন্তরিকতাও বিরল ঘটনা—আত্মীয়তা তো অবিশ্বাস্য। হিন্দু মহাসভা আর জমা'আতে ইসলাম একই মঞ্চে মিলিত হয়ে একই কর্মসূচিতে হাত মেলাবে এ কল্পনার বাইরে। শুভ বুদ্ধিওয়ালা কেউ কেউ যে বলে থাকেন, মুসলমান খাঁটি মুসলমান আর হিন্দু খাঁটি হিন্দু হলেই মিলন সহজ হবে—একথা আমার কাছে সোনার পাথরবাটি; বরং মানুষ যখন এবং যেখানে প্রচলিত মুসলমানিত্ব ও হিন্দুয়ানিকে ছাড়িয়ে গেছে সেখানে মিলন সহজ ও অবাধ হয়েছে। হিন্দু মুসলমানে যে কয়টা বৈবাহিক সম্পর্ক হয়েছে তাও এ দৃষ্টিভঙ্গির ফল। এটা মানবতার দিকেরই ইঙ্গিত। এ মনোভাব বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হলে মিলন ও সহযোগিতার দিগন্ত বেড়ে যাবে। সযত্নে নিজের মুসলমানিত্ব কি হিন্দুয়ানিও রক্ষা করব এবং সঙ্গে সঙ্গে 'মানুষ' হিসেবেও বড়ো ও মহৎ হব—এ হয় না, যেমন হয় না নিজ নিজ পুকুরে গোসল করে সমুদ্র স্নানের স্বাদ পাওয়া। সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক ধর্মে আনুষ্ঠানিকতার বহর অনেক বেশি। ধর্মে ধর্মে বিরোধও সবচেয়ে বেশি এ আনুষ্ঠানিকতায়। অথচ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া ধর্মের স্বরূপ জনসাধারণের কাছে অবোধ্য। নিরাকার ঈশ্বরের মতো ধর্মের বৃহত্তর আদর্শ বা আবেদনও থেকে যায় ওদের কাছে তাই অনুপলব্ধ। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাই কে হিন্দু আর কে মুসলমান এ বোধটাকে খুব বড়ো করে তোলে। এর ফলে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মৃত্যু ঘটেনি এবং সব রকম আনুকূল্য সত্ত্বেও কোনো রাষ্ট্রেই একটা সুসংহত জাতীয়তা গড়ে ওঠেনি। বলা বাহুল্য সাধারণ মানুষের কাছে অনুষ্ঠানই ধর্ম। ফলে যে-কোনো অজুহাতে এরা যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে বা এদের উত্তেজিত করে তোলা হয় তখন ধর্মের নামে মানুষ হত্যায়ও এরা মনের দিক থেকে আর কোনো বাধা পায় না।

একবার এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : ধার্মিক আর সাহিত্যিকের পার্থক্যটা কোথায়?

উত্তরে বলেছিলাম, ধর্মগ্রন্থে যদি নির্দেশ দেওয়া থাকে যে, বিধর্মীকে কতল করলে তোমার জন্য বেহেস্তে সর্বোত্তম কামরাটি খাস রাখা হবে আর দেওয়া হবে তোমাকে সত্তর হাজার হুর (সংখ্যাটা কাল্পনিক নয়, এক ওয়াজের মজলিসে শুনেছিলাম), তাহলে ধার্মিকজন সুযোগ পেলে এ নির্দেশ পালন করতে কিছুমাত্র ইতস্তত করবে না। ইতস্তত করার বা পালন না করতে পারার একমাত্র অন্তরায় পার্থিব আইন—অধিকতর ও প্রত্যক্ষ পুলিশ। কিন্তু সাহিত্যিক এমন নির্দেশ শুধু যে পালন করবেন না তা নয়, বরং অবিশ্বাস্য বলে এমন নির্দেশকে তিনি তুড়ি মেড়ে উড়িয়ে দেবেন। মানুষ মেরে বেহেস্তে যাওয়ার কল্পনাই তাঁর চিন্তার বাইরে। স্বয়ং ঈশ্বর নেমে এসেও যদি তাঁকে এমন নির্দেশ দেন, সাহিত্যিক তেমন ঈশ্বরকেও নিজের লেখন কক্ষ থেকে বের করে দিতে দ্বিধা করবেন না। ঈশ্বর নামধেয় কারও পক্ষে এমন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব—এ কথাটাই সাহিত্যিকের কাছে অবিশ্বাস্য। কিন্তু ধার্মিক তো সম্ভব-অসম্ভবের বিচার করে না। কারণ, ধর্ম আর শাস্ত্রীয় ব্যাপার নিয়ে বিচার

করাটাই তার কাছে অধর্ম। তার একমাত্র অবলম্বন অন্ধ বিশ্বাস আর অন্ধ অনুসরণ। একজনের জন্য সত্তর হাজার হুর সম্ভব কি অসম্ভব, সম্ভব হলেও একত্রে অতগুলি হুর দিয়ে সে কী করবে—এ সব অতি স্বাভাবিক ও সংগত প্রশ্নও তার মনে উদয় হয় না—হলেও উত্তর সন্ধানে সে নিস্পৃহ অথবা শঙ্কিত। সে উত্তর যতই লজিক্যাল বা যুক্তিসংগত হোক না কেন, তার কাল্পনিক পরিণাম ভেবে সে আরও বেশি ভীত। যে মানুষ লজিক বা যুক্তির সম্মুখীন হতে ভয় পায়, তার কাছে মননশীলতা বা মুক্তবুদ্ধির চর্চা এক নিষিদ্ধ ব্যাপার। এমন মানুষকে সত্তর হাজারের পরিবর্তে সত্তর লক্ষ বললেও সে বিশ্বাস করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। হয়তো ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে আরও বেশি উৎফুল্ল, আরও বেশি বেপরোয়া ধার্মিক হয়ে উঠবে। যে মানুষ জীবনে একটা হুর সামলাতেই গলদঘর্ম, মৃত্যুর পর সে সত্তর হাজার সামলাবার অলৌকিক শক্তির অধিকারী হবে—এমনতর অদ্ভুত বিশ্বাসই সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ ও সম্মোহিত করে রাখে।

বলা বাহুল্য, সংসারে বা সমাজে অর্থাৎ জীবিতলোকে অলৌকিকতার বিন্দু-বিসর্গ মূল্যও নেই—এখানে যা কিছু মূল্য তা বাস্তব আর প্রত্যক্ষের। তাই যে-অলৌকিকতার ওপর ধর্ম আর তার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলি দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে মানুষের মন ফিরিয়ে তাকে মানবতার দিকে—যে—মানবতা বাস্তব, প্রত্যক্ষ, সামাজিক, ব্যাবহারিক ও যুক্তিনির্ভর সে দিকে ফেরাতে হবে। মানবজাতির শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করছে এ সাধনা আর এর সাফল্যের ওপর। ব্যক্তিজীবনে মানুষ ইচ্ছা মতো নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠান পালন করুক তাতে কারো লাভ-লোকসান ঘটে না। কিন্তু বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাকে বড়ো করে তুললেই ঘটে মুশকিল, তখন এমন সব সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যার সমাধান এক কথায় 'বন্যহংস'। আজ পাকিস্তান আর হিন্দুস্থান-এ 'বন্যহংস' ধরার প্রতিযোগিতাই চলেছে। স্বাধীনতার পর এ দুই দেশে ধর্মানুষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি মশার বংশবৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে। অথচ এ দুই দেশে নৈতিক মান সব রকম পূর্বতন রেকর্ড ভঙ্গ করে অধঃপতনের পাতালপুরীর দিকেই আজ দ্রুতগতিতে ধাবমান। জীবনবিচ্ছিন্ন ধর্মচর্চার এ এক শোচনীয় পরিণতি। আমার বিশ্বাস ধর্ম সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। ধর্ম আজ অনেকের জীবনে অন্য পাঁচটা বৈষয়িক বস্তুর সামিল—পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার। অথচ এরা বাস্তব ও পার্থিব যুক্তি-বিচারের কষ্টিপাথরে ধর্মকে যাচাই করতে নারাজ। ধর্ম আর ঈশ্বর সম্বন্ধীয় শব্দ ও নানা উক্তি বহু ব্যবহারে আজ এমন একটা নির্জীব অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তা মনে আর কোনো আবেদন বা উপলব্ধিরই চমক লাগায় না। চরিত্র ও নীতিবোধের পরিবর্তে তসবির জনপ্রিয়তা, মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা বৃদ্ধি বা হরি সংকীর্তনে কণ্ঠস্বরের প্রতিযোগিতা মোটেও সামাজিক অগ্রগতির দিগ্‌দর্শন নয়। বরং এ যুগে ওটাও এক রকম Playing to the gallery। ওতে খেলায় জেতা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, মন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। আজ মন্ত্র পাঠ বা তস্‌বিহ্ তেলাওয়াত মননশীলতার সঙ্গে সম্পর্কহীন এক জড় ব্যাপারে পরিণত। মুখে আরবি বা সংস্কৃত বুলি যতই উচ্চারিত হোক তার অর্থ কী, জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কতটুকু (জীবন মানে শুধু ব্যক্তিগত জীবন নয়, অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে যে-জীবন) এ সব জিজ্ঞাসা যদি মনে কোনো ভাবনার সৃষ্টি না করে, ভেতরটা যদি কোনো নতুন তরঙ্গে সাড়া না দেয় তাহলে অমন উচ্চারণ অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও নির্ভুল হলেও নিষ্ফল শ্রম ছাড়া কিছুই না।

পৃথিবীর এখন বয়স হয়েছে, সভ্যতা সংস্কৃতিরও বয়স কম নয়, লিপিবদ্ধ ধর্মের আয়ুও কয়েক হাজার বছর। প্রাথমিক স্তরে জীবনধারণ বা সভ্যতার জন্য যেসব উপকরণ অত্যাবশ্যক বিবেচিত হত, আজ তার অনেক কিছু অকেজো বলে পরিত্যক্ত। সভ্য জীবন যাপনের জন্য তা আর অপরিহার্য মনে করা হয় না। তেমনি ধর্মেরও প্রাথমিক স্তরের অনেক কিছুই আজ জীবনের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে। ধর্ম-জীবনও যে সামাজিক জীবন, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই তার যা কিছু মূল্য—এ বোধ না থাকলে ধর্ম জীবনবিমুখ হয়ে পড়তে বাধ্য। যেমন এখন হয়েছে। ব্যক্তিবিশেষ মৃত্যুর পর স্বর্গে গেল কি নরকে গেল তা মানবজাতির কিছুমাত্র দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। কিন্তু মৃত্যুর আগে লোকটা সৎ ও সামাজিক ছিল কিনা তা সব মানুষেরই ভাবনার বিষয়। কারণ, তার এ জীবনের সঙ্গে বহু মানুষের সুখ-দুঃখ জড়িত—জড়িত সামাজিক স্বাস্থ্য, শান্তি, নিরাপত্তা ও ভারসাম্য। স্বর্গের বা নরকের জীবন ব্যক্তিগত ও একক—ওই দুজায়গায় কোনো সামাজিক জীবন আছে বা থাকবে তেমন কথা কোনো ধর্মগ্রন্থেই উল্লেখিত হয়নি। কিন্তু এখানকার যে—জীবন তা পুরোপুরি সামাজিক ও সমষ্টিগত। এ সামাজিক সমষ্টিগত জীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই তেমন অশরীরী ব্যাপারকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিলে, আদর্শ ও লক্ষ্য করে তুললে বিভ্রান্তি ঘটাই স্বাভাবিক। জীবনে যারা জীবনকে ভালোবাসে না, ভালোবাসে মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবনকে, বলা বাহুল্য, এ হুর-পরিবর্জিত, দুধের নদ-নদীশূন্য পৃথিবী তাদের জন্য খুব উপযুক্ত বাসস্থান নয়। এ জন্যেই বলছি—যা পরকালের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ ধর্ম, তার ওপর জোর না দিয়ে যা এ জীবনের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ মানবতার ওপর জোর দেওয়া উচিত। মানুষের কল্যাণ এ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে জড়িত।

ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সামাজিকভাবে ধার্মিক হওয়ার যে আমি বিরুদ্ধে তা নয়। ধর্ম যদি মনুষ্যত্বের পরিপূরক বা নামান্তর না হয় তাহলে ধর্মে আর মনুষ্যত্বে পদে পদে সংঘর্ষ অনিবার্য। আমার বিশ্বাস, খাঁটি অর্থে যারা ধার্মিক তারা কখনও নিজের কি অপরের মনুষ্যত্বকে আঘাত হানতে পারে না—পারে না মানবতাকে কিছুমাত্র খাটো করতে। আমার বক্তব্য, নিছক আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের দ্বারা কেউ ধার্মিক হতে পারে না। যেমন, হতে পারে না খাঁটি সাহিত্যিক স্রেফ পেশাদারি অধ্যাপনা করে। জীবনের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিটাই আলাদা হওয়া চাই—আর তা হওয়া চাই ব্যক্তির সমস্ত সত্তার সঙ্গে জড়িত। ভেতরে ধর্মবোধ না থাকলে আর বহু সাধনায় তাকে অন্তরঙ্গ করে তুলতে না পারলে সত্যিকার ধার্মিক হওয়া অসম্ভব বলেই আমার বিশ্বাস। ধর্মজীবনের ব্যাপ্তি সামাজিক জীবনে ছড়িয়ে না পড়লে তার মূল্যই বা কতটুকু? ব্যক্তিগতভাবে কোনো মানুষের কাছে যদি কোটি টাকাও থাকে তাতে সমাজের কী এসে যায়, যদি তার এক ভগ্নাংশও সমাজদেহে স্বাস্থ্য সঞ্চারে সহায়তা না করে? সমাজের দিক থেকে এর চেয়ে স্তূপীকৃত মৃত্তিকাখণ্ডের মূল্য অনেক বেশি। ঘরে বসে কোটিবার তসবিহ্ জপা আর কোটি টাকা সিন্দুকে বন্ধ করে রাখা ব্যাবহারিক দিক থেকে একই ব্যাপার—এ দুয়ের কিছুমাত্র সামাজিক মূল্য নেই। কোটি টাকা বা কোটি পুণ্যও তাই—সামাজিক মূল্যই এ দুয়ের মূল্য। আগেই একবার বলেছি, ব্যক্তিবিশেষ স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে তার আগাম দুশ্চিন্তায় কারও পক্ষে ব্লাড প্রেসার বাড়ানোর কোনো মানে হয় না।

মন্দিরে মসজিদে গির্জায় কে কী রকম আচরণ করে, সেজদায় গিয়ে কে দীর্ঘতর সময় কাটায় তা মোটেও বড়ো কথা নয়। কোনো মানুষ বত্রিশ আনা হিন্দু বা চৌষট্টি আনা মুসলমান কি খ্রিষ্টান হলেও পৃথিবীর কোনো লাভ-লোকসান ঘটে না। কিন্তু বাইরে, অর্থাৎ সমাজে এবং পরিবারেরও যদি আট আনা মানুষও হয় তাহলেই পৃথিবী বেঁচে যায়। আজ পৃথিবী এমন মানুষের প্রতীক্ষায়—যে মানুষের একমাত্র অভীপ্সা মানুষ হওয়ার—মানুষের মতো আচরণ করার।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর তাবৎ পৃথিবীর মালিক। এসব কথা সমাজিক দিক থেকে স্রেফ হাওয়ায় বেলুন ওড়ানো। এর কোনো সামাজিক মূল্যই নেই। এতে কোনো সামাজিক তথা মানবীয় সমস্যারই সমাধান হয় না। এসব ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের অঙ্গ হতে পারে। কিন্তু কোনো বিশ্বাসই সামাজিক শান্তি বা শৃঙ্খলা আনতে সক্ষম নয়। তার এক বড়ো প্রমাণ, কোথাও শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিলে লোকে পুলিশ ডাকে, আল্লাহ বা ভগবান ডাকে না।

ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে আইনের শাসনে শৃঙ্খলাবদ্ধ না করলে তা সহজে পরস্বাপহরণের অজুহাত হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

একটা গল্প শুনেছিলাম।

এক ব্যক্তি প্রায়ই মসজিদ থেকে কোরান শরিফ চুরি করত আর চুরি করার সময় এভাবে সাফাই দিত আল্লাহর কাছে : আল্ আব্‌দু আবদুল্লাহ্, আল্ বায়তু বায়তুল্লাহ্ আল্ কালামু কালামুল্লাহ্ অর্থাৎ এ বান্দাও আল্লার বান্দা, এ ঘরও আল্লার ঘর, এ কোরানও আল্লার কালাম। অতএব (তার মতে) এতে কোনো অন্যায় বা পাপ নেই। অধিকতর সেয়ানা আর এক ব্যক্তি এটা টের পেয়ে একদিন লাঠি হাতে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখে শুনে স্পাজদ্যরবো জরবোল্লাহ্ অর্থাৎ মারটাও আল্লার মার বলে চোরটাকে বেদম লাঠি পেটা করে ছাড়ল।

মনে হচ্ছে, এ চোর এবং দণ্ডদাতা উভয়ে আল্লার সার্বভৌমত্বেই বিশ্বাসী। একই বিশ্বাসের লজিক বা যুক্তি দুজন মানুষকে কেমন পরস্পরবিরোধী কার্যকলাপে অনুপ্রাণিত করেছে তা দেখে রীতিমতো অবাক হতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লার সার্বভৌমত্বের এমনধারা ধারণা যদি সামাজিক ও নাগরিক জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে, তাহলে অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? জগৎ সংসারের ওপর আল্লার সার্বভৌমত্বে যদি ভাবলোকে অর্থাৎ থিওরেটিকেলি স্বীকার করা হয় আর ব্যাবহারিক জীবনে করা হয় সম্পূর্ণ অস্বীকার, তাহলে পদে পদে আত্মপ্রবঞ্চনা করাই হবে মানুষের নিয়তি। ব্যাবহারিক জীবনে স্বীকার করা হলে কী দশা ঘটে তার নজির ওপরে উল্লেখিত চোর ও তার দণ্ডদাতা। মসজিদ বা কোরানের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে অথবা একটা চোর ও একজন দণ্ডদাতার সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে এ ধারণা ও বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করলে আমার বিশ্বাস, সামাজিক জীবন আর জঙ্গলজীবনে কোনো পার্থক্যই থাকবে না। গৃহস্থ ও চোর উভয়েই যদি অন্তরের সঙ্গে পার্থিব ব্যাপারেও আল্লার সার্বভৌমত্ব মেনে নেয় আর তা প্রাত্যহিক জীবনে পরীক্ষা করতে শুরু করে, তাহলে অবস্থাটা যা দাঁড়াবে তা কল্পনা করতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন আইন বলে যদি কিছু থাকে তা একই সঙ্গে গৃহস্থ এবং চোর উভয়ে নিজ নিজ স্বার্থানুসারে নিজ নিজ হাতে তুলে নিতে

এক মুহূর্তও দ্বিধা করবে না। যেমন ওপরে বর্ণিত চোর ও দণ্ডদাতা করেনি। পার্থিব ব্যাপারে আল্লাহ ও ধর্মকে টেনে আনলে তা এমনি দুধারী করাত হয়ে উঠবে।

আমার বক্তব্য : যা অপার্থিব তাকে অপার্থিব থাকতে দিন—যা পার্থিব তাকে সর্বতোভাবে পার্থিবের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ রাখুন। অপার্থিবের তথা আধ্যাত্মিকের প্রেরণা ও তৃষ্ণা মানুষ যে একেবারে অনুভব করে না বা তার কোনো প্রয়োজন নেই তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, তা ব্যক্তিগত সাধনা ও উপলব্ধির ব্যাপার। তাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে টেনে আনায় আমার আপত্তি, টেনে আনলে শুধু সামাজিক জীবন নয়, আধ্যাত্মিক জীবনও নাজেহাল হয়। সামাজিক জীবন সম্পূর্ণ পার্থিব ব্যাপার—যে মানুষ নিয়ে সমাজ সে মানুষও আগাগোড়া পার্থিব। কাজেই অপার্থিবের দোহাই দিয়ে এমন সমাজকে শাসন পরিচালনা করতে গেলে তা ব্যর্থ হবেই। এ ব্যর্থতার নজির আজ সর্বত্র। কেতাবের ইসলাম আর জীবনের ইসলামের মাঝখানে আজ বিরাজ করছে এক প্রশান্ত মহাসাগর। সব ধর্মের বেলায় এ কথা সত্য।

মানুষের মধ্যে একটা সনাতন মেষ-বৃত্তি আছে। জিজ্ঞাসা ও মননশীলতার অভাব ঘটলে মনের সে মেষ-প্রবৃত্তিটাই একক হয়ে ওঠে। তখন গতানুগতিকতা আর অন্ধ অনুসরণই চরম মোক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। গত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণ করেছে, ধর্ম মানুষকে মানুষের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি। ধর্মযুদ্ধ কথাটাই একটা স্ববিরোধী উক্তি। ধর্মকে মানবতার ওপর স্থান দিতে গিয়েই মানুষ এ ধরনের বহু স্ববিরোধিতার শিকার হয়েছে। যার ফলে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে অপরিমেয় ধ্বংস নেমে এসেছে। আর এ ধ্বংসের পেছনে এক বড়ো ভূমিকা নিয়েছে পরকাল—সে পরকাল অদৃশ্য, অপ্রামাণ্য ও সম্পূর্ণ অপার্থিবকে পার্থিবের এলাকায় টেনে আনলে বিভ্রান্তি অনিবার্য। আল্লার সার্বভৌমত্বকে জাগতিক ব্যাপারে টেনে আনলে যে গোলোকধাঁধার সৃষ্টি হয় তাতে প্রবেশের পথ পাওয়া গেলেও বের হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিজ্ঞান বা বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করে বিশ্ব ও মানবসৃষ্টি সম্বন্ধে যদি ধর্মীয় মতবাদও মেনে নেওয়া যায়, তাহলেও জাগতিক ব্যাপারে আল্লার সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ার বিপদ অনেক, যেমন অনেক বিপদ সন্তানের ওপর পিতা-মাতার সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ার। তাই কোনো ইসলামি রাষ্ট্রেও শেষোক্ত সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি পায়নি। স্বয়ং ইসলামের নবিও ওই ধরনের সার্বভৌমত্ব নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তাঁর নবি জীবনের শুরুতে। অথচ আল্লার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের চেয়ে পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক অধিকতর প্রত্যক্ষ ও অধিকতর বাস্তব।

যে-ধর্ম ইহকালে মানুষকে রক্ষা করতে পারেনি, পারছে না—সে ধর্ম পরকালে মানুষকে রক্ষা করবে এমন অলৌকিক বিশ্বাসে কেউ যদি স্বস্তিবোধ করেন তাতে আপত্তি করার কোনো কারণ নেই; কিন্তু আমার আপত্তি হচ্ছে অলৌকিককে লৌকিক ব্যাপারে টেনে আনায়। বলা বাহুল্য, দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র—এ সবই লৌকিক ব্যাপার।

আর পরলোকে যদি কোনো 'প্রবেশিকা' পরীক্ষা হয় তা হলে মানুষের জন্য মনুষ্যত্বের পরীক্ষা না হয়ে ধর্মের তথা ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের পরীক্ষা হবে, তেমন বিশ্বাস মানববুদ্ধির অপমান। ঈশ্বরের অপমান আরও বেশি—কারণ তখন তাঁকে খাটো করে টেনে এনে বসানো হয় সুপরিচিত গুরুমশায়ের আসনে।

পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের আয় দায় অর্থাৎ assets and liabilities ভাগ-বাটোয়ারার সময় আল্লাহ নাকি পাকিস্তানের ভাগেই পড়েছেন। তবে তখন তা আয় না দায় ভালো করে বোঝা যায় নি। এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে, পাকিস্তানের এ এক মস্ত বড়ো দায়। দোহাই—কথাটি আমার নয়, আমি মরহুম জাস্টিস কায়ানির ভাষণ থেকেই চুরি করেছি। প্রমাণ হিসাবে এ প্রসঙ্গে তাঁর শেষ মন্তব্যটাও উদ্ধৃত করছি :

> "Undoubtedly the Lord God is an asset when the nation is going to run, but in the name of the Lord God, the Beneficent, the Merciful, some of us are apt to develop a narrow pseudo-religious outlook as though the Lord God belonged to us only, and were not the Lord of the Universe, which is the true meaning of Rabbul Alamin. And that is how He is made a liability".

(Vide : *Not the Whole Truth* : Page-186)

বলা বাহুল্য, এ বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন স্বয়ং পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট। শুধু ভূমিকা নয়—কায়ানির কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন তিনি। এ liability বা দায় আমাদের শাসনতন্ত্রে শুধু নয়, সমাজের প্রতিস্তরেও অনুপ্রবেশ করে কী রকম আত্মপ্রবঞ্চনা ও বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠেছে, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি · মাত্র কয়েক বছর আগেকার ঘটনা। পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির বার্ষিক সভা। ওই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি চট্টগ্রামের প্রাক্তন কমিশনার মি. এন. এম. খান আই. সি. এস। কী কারণে সেবার তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। সভাপতিত্ব করছেন সহ-সভাপতি পূর্ব পাকিস্তানের জনৈক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। সভার কাজ যথারীতি শুরু হয়েছে—কিছুদূর এগিয়েও গেছে। হঠাৎ একজন মুসল্লি মোত্তকি সদস্য বলে উঠলেন : স্যার, কোরান তেলাওয়াত হয়নি, কোরান তেলাওয়াতের পর সভার কাজ শুরু হওয়া উচিত।

সভাপতি বেকায়দায় পড়ে ইতস্তত করতে লাগলেন। সভার কাজ শুরু হয়ে গেছে, এখন হ্যাঁ করা মানে কেঁচে গণ্ডূষ করা, না করা তো এক রকম অসম্ভব। কায়ানি সাহেব যে দায়ের কথা বলেছেন সে দায় রক্ষা না করে উপায় নেই। অগত্যা সভাপতি আমতা আমতা করে বললেন : আচ্ছা তেলাওয়াত করুন, আপনিই করুন। কয়েক মিনিটের জন্য কর্মসূচি মুলতবি রেখে তাই করা হল।

পরের বৎসর আবার সে একই প্রতিষ্ঠানের একই বার্ষিক সভা—একই স্থানে উপস্থিত সদস্য—শ্রোতারাও, একই মুসল্লি মোত্তকি সদস্যরাও সদলবলে হাজির। কিন্তু ঘটনাচক্রে এবার স্থায়ী সভাপতি স্বয়ং এন. এম. খান উপস্থিত—তিনিই সভাপতিত্ব করছেন। এন. এম. খান দুর্দান্ত অফিসার—এ খবর সবারই জানা। পরিচিতদের সঙ্গে কুশল জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করে তিনি সভার কাজ শুরু করে দিলেন বিনা তেলাওয়াতে, বিনা ভূমিকায়। কেউ টুঁ শব্দটিও করলেন না। সে মুসল্লি মোত্তকি সদস্যটিও কোরান তেলাওয়াতের কথা এবার ভুলে রইলেন বেমালুম। নাচ গানে ভরপুর বিচিত্রানুষ্ঠানও কোরান তেলাওয়াত করে শুরু হতে দেখেছি। অকারণে ধর্মকে কোথায় টেনে আনা হচ্ছে এসব তারই দৃষ্টান্ত।

পাকিস্তানের অন্যতম চিন্তাবিদ মি. এ. কে. ব্রোহী তাঁর 'Religion and Freedom' প্রবন্ধটি শেষ করেছেন রবীন্দ্রনাথের এ বিখ্যাত উক্তি দিয়ে : 'I love God, because he

has given me freedom to deny him' যে ঈশ্বর বা আল্লাহ্ গুরুমশায়ের প্রতীক সে ঈশ্বর থেকে এ ঈশ্বরের ধারণা ও উপলব্ধি কি অনেক বড়ো ও মহত্তর নয়? আল্লাহ্র এ মহত্ত্বের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত কম্যুনিস্ট দেশগুলি। ওরা তো ঈশ্বর, আল্লাহ্, গড কিছুই মানে না। তবুও আল্লাহ্ তাদের ক্রমোন্নতি আর সুখ সমৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করেছেন অথবা ওই সব দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের দেশ থেকে বেশি তেমন কথা এ যাবত শোনা যায় নি। যদি বলেন ওরা মজাটা টের পাবে পরকালে গিয়ে তাহলে অবশ্যই নিরুত্তর থাকতে হয়।

সব রকম অলৌকিকতার অস্তিত্ব মানুষের ধারণা ও উপলব্ধির ওপর নির্ভরশীল—ঈশ্বর এবং পরকালও। যা কিছু মানুষের ধারণা ও উপলব্ধির বাইরে তা শুধু অস্তিত্বহীন তা নয়, মানুষের জীবনে তার কোনো দামও নেই। যে ঈশ্বর তাকে শুদ্ধ না মানবার স্বাধীনতা মানুষ দিয়েছেন, সে ঈশ্বরের conception বা উপলব্ধি মানুষের প্রত্যয় ও আত্মমর্যাদার দিগন্তরেখা যে শুধু অবারিত করে দেয় তা নয়, মানুষকে নবতর চেতনা আর জিজ্ঞাসায়ও করে তোলে উদ্‌বুদ্ধ। এভাবে নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে এলেই মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বের শাসন তথা মানবতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে সহজ। ধর্মের ওপর জোর দিতে গেলেই ঈশ্বরের আবির্ভাব অনিবার্য। আর ঈশ্বর মানে সাম্প্রদায়িক ঈশ্বর—পশ্চিমের বেলায় জাতীয় ঈশ্বর। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এক হলেও আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলের মতো আল্লাহ্, ঈশ্বর এবং গড নিয়েও কারও সঙ্গে কারও মিল নেই, মিল হবেও না। মুসলমানের আল্লাহ আর হিন্দুর ঈশ্বর এক নয়, তেমনি হিন্দুর ঈশ্বর আর খ্রিস্টানের গডও এক নয়—বুদ্ধ মানুষ হয়েও কোটি কোটি মানুষের আরাধ্য। এভাবে যেখানে মূলের পার্থক্য, সেখানে ব্যাখ্যা আর উপলব্ধিতে তারতম্য ঘটবেই। ফলে আচার-অনুষ্ঠানেও শুধু তারতম্য নয়—বিরোধও অনিবার্য। আর দেখা গেছে, অতি সহজে এ বিরোধ হয়ে ওঠে বারুদ। নীতিহীন, মনুষ্যত্বহীন রাজনীতি এ বারুদে অগ্নিসংযোগ করতে এক মুহূর্তও ইতস্তত করে না। ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের এটাই তো পটভূমি। কিন্তু মনুষ্যত্বের ব্যাপারে এ বিরোধ ও উপলব্ধির দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্য নেই বলে সহজে ওটাকে মানুষের স্থির মিলন-কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এ করে তোলার দায়িত্ব আমাদের দু দেশের শুধু নয়—পৃথিবীর তাবৎ বুদ্ধিজীবীদের বলেই আমার বিশ্বাস।

উৎস : নির্বাচিত প্রবন্ধ। মাহবুবুল হক (সম্পাদিত), ২০০১, ঢাকা, সময় প্রকাশন।

# রামমোহনের আমলে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাবিষয়ক বিতর্ক

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১

রামমোহনের আবির্ভাবকালে, অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা দখলের সময়ে, বাংলাদেশের শিক্ষার কী অবস্থা ছিল তা আমরা এখন কল্পনাও করতে পারি না। মোটামুটিভাবে শিক্ষা ছিল তিন ধরনের—গ্রাম্য পাঠশালা, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী বা টোল আর মুসলমানি মকতব। প্রথমটিতে বাংলা লেখা, অঙ্ক ও শুভংকরী শেখানো হত; পড়বার বই ছিল না, মুখে মুখে চলত শিক্ষা। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, ধনীর দালানে অথবা দোকানের বারান্দায় 'গুরুমশায়'রা পড়াতেন। গুরুমশায়দের বিদ্যাবুদ্ধিও যে খুব বেশি ছিল তা নয়। সেই সময়ের পাঠশালার বর্ণনা পাই দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 'আত্মজীবনচরিতে', শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের রচনায় এবং আরও নানা জায়গায় কিছু কিছু। আমরা যাকে জনতার সাক্ষরীশিক্ষা বলি তা তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; কারণ সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিতরণ করতে হবে এ কথা তখন, এ দেশে কেন, সব দেশেই অজ্ঞাত। তা ছাড়া বাংলাদেশে মুদ্রিত বই তো ছিল না—সুতরাং কী দিয়ে বা কী নিয়ে পড়াবে? আর যাঁরা গুরুমশায়দের কাছে 'শিক্ষিত' হতেন, তাঁদের এবং তাঁদের গুরুমশায়দেরও বাংলা বানান-বোধ ও বাংলা ভাষা-বোধের নমুনা যা পাই তা দেখে অবাক হয়ে ভাবি—এঁরাই ছিলেন বাঙালির সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

টোল বা চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ-স্মৃতি-ন্যায়-কাব্যই প্রধানত অধ্যাপিত হত। অবশ্য সংস্কৃত-চর্চা ছিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমিত। 'স্মৃতি'টাই কাজে লাগত বেশি, কারণ হিন্দুর দশকর্মের বিধানের জন্য জনতা ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হতেন। বেন্টিংক-এর আদেশে অ্যাডাম সাহেব বাংলাদেশের শিক্ষা-অবস্থার একটা রিপোর্ট লেখেন। তার থেকে জানা যায় সংস্কৃতের চর্চাটা ভালোই ছিল। নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ফরিদপুরের বহু টোলে বহু শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। একটা টোল থেকেই বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার মতো সংখ্যার অধ্যাপক সংগ্রহ করা যেত। এই পণ্ডিতরা বাংলার চর্চা করতেন না এবং পুথির বাইরের দুনিয়ার কোনো সংবাদ তাঁরা রাখতেন না। অথচ এই পণ্ডিতরাই ছিলেন হিন্দু-সমাজের স্তম্ভ!

মুসলমানরা মৌলবির কাছে দরগা-তলায় বা মসজিদ-প্রাঙ্গণে অথবা তাঁর নিজের বাড়িতে উর্দু ফার্সি শিখতেন, আর আরবি-কোরানের খানিকটা মুখস্থ করা ছিল মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার আবশ্যিক অংশ। ফার্সি তখন রাজভাষা, অর্থাৎ আদালতের ভাষা। ওয়ারেন হেস্টিংস দেখলেন, হিন্দুদের সংস্কৃত-চর্চার ব্যবস্থা বেশ ভালোই আছে, কিন্তু মুসলমানি শাস্ত্র শেখাবার জন্যে উত্তম মৌলবি প্রস্তুত হতে পারে এমন বিদ্যালয় বাংলাদেশে নেই। তাই ১৭৮১ অব্দে তিনি কলকাতায় নিজব্যয়ে 'মাদ্রাসা' স্থাপন করলেন। মুসলমানি শাস্ত্র ও উর্দু ফার্সি আরবি শেখবার আসল কেন্দ্র তখন পূর্ব ভারতের পাটনা। কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপনের এগারো বছর পর বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় ইংরেজ রেসিডেন্ট জোনাথান ডানকানের প্রচেষ্টায়।

বলা বাহুল্য, এই সংস্কৃত ও ফার্সি শিক্ষা বহু শতাব্দী ধরে একইভাবে চলে আসছিল। আমরা যাকে আজ 'জনতা' বা 'সাধারণ' লোক বলি তাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কথা তখনো ভদ্রদের মনোগত হয়নি। সে চেষ্টায় প্রথম মনোযোগ দেন খ্রিস্টান সাহেবরা। কেরি সাহেব এ বিষয়ে পথ প্রদর্শক। মালদহে মদনাবাটী গ্রামে আশ্রয় পাবার অনতিকাল-মধ্যে চারদিকের চাষীবাসীদের শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি বিদ্যালয় খুলেছিলেন। ইউরোপীয় মতে শিক্ষা দেবার চেষ্টা ইতিপূর্বে সামান্যভাবে শুরু করেছিলেন জন্ এলারটন নামে আর-এক নীলকর সাহেব মালদহেরই এক গ্রামে। নীল ও রেশমের জন্য তখন বহু সাহেব সে দিকে যান—মালদহের অপর নামই হয় ইংরেজ-বাজার। এই বাংলা বিদ্যালয়ে কেরি যে কেবল বর্ণমালা শিক্ষা দিতেন তা নয়, ভারতীয় টোল চতুষ্পাঠীর পরম্পরাগত রীতি-অনুসারে তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের ছেলেদের অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। শিক্ষণীয় বিষয় ছিল সংস্কৃত ও বাংলা, এবং ফার্সি ভাষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিতরণ করা হত, যেমন আমাদের ছেলেবেলায় সব জ্ঞান ইংরেজির মাধ্যমে পেতাম। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে কেরি 'নিউ টেস্টামেন্ট'-এর বাংলা তর্জমা করতে আরম্ভ করলেন।

মদনাবাটী থেকে ছাপাখানা নিয়ে কেরি শ্রীরামপুরে এসে মার্শম্যানদের সঙ্গে মিলিত হলেন ও ১৮০০ অব্দে সেখানে এক দেশীয় পাঠশালা স্থাপন করে বালকদিগকে বাংলাভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেন। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে বাঙালির ভাষা শুদ্ধ করে বাঙালিকে শেখাবার আয়োজন করলেন খ্রিস্টান বিদেশী পাদরিরা! পাদরি কেরি বাংলাভাষার জন্যে যা করেছেন তা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর ঘটনা রূপে লিপিবদ্ধ থেকে যাবে, নানা গ্রন্থে সে বিষয়ে ভূরি আলোচনা হয়েছে।

২

ইতিমধ্যে ১৭৮৪ অব্দে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারক সার উইলিয়াম জোন্স্ প্রমুখ ব্রিটিশ ভদ্রদের চেষ্টায় Asiatic Society স্থাপিত হয়েছে। জোন্স্ প্রমুখ ইংরেজ ভদ্ররা সংস্কৃতভাষা-অভিজ্ঞ ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাশীল। তাঁরা ভারতের সংস্কৃত-সাহিত্য-মন্থনে মন দিলেন। এই জ্ঞানান্বেষী ইংরেজদের মধ্যে জোনাথান ডানকান বারাণসীতে রেসিডেন্ট হয়ে যাবার পর সেখানে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন (১৭৯২)। পরে সেটার নাম হয় কুইন্স্ কলেজ—বর্তমান বারাণসী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়।

শিক্ষাবিস্তারের জন্য লর্ড ওয়েলেস্‌লি কলকাতায় যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন তা সাধারণের বিদ্যালয় ছিল না—বাঙালি ছাত্রদের শিক্ষার সঙ্গে তার কোনো যোগ ছিল না। এটি বিলাত থেকে আনীত সিবিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেবার জন্যেই স্থাপিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের দানের কথা অবিস্মরণীয় ঘটনা হয়ে রয়েছে, কিন্তু বৃহত্তর বাঙালি-সমাজের উপর তাদের প্রভাব কখনো পড়েনি।

১৭৯৩ অব্দে প্রথম খ্রিস্টান পাদরি কেরি ভারতে এসে ধর্মপ্রচারে অনেক বাধা পেয়েছিলেন। কিন্তু ১৮১৩ অব্দে বিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাসে এমনই ওলট-পালট হয়ে গেল যে, একটা কোম্পানির মুষ্টিমেয় অংশীদারদের ধনস্বার্থ কায়েম হয়ে থাকা আর সম্ভব হল না। ব্যবসাবাণিজ্য সর্বদ্বারী হল; যুগপৎ ধর্ম সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়াতে নানা সম্প্রদায়ের খ্রিস্টান পাদরি আসতে আরম্ভ করে—তাদের আগমনের পরই শিক্ষা বিস্তার-লাভ করতে থাকে।

ভারতের শিক্ষা-সংস্কারের কথা ১৮১৩ সালের সনন্দ গ্রহণের সময় উঠেছিল। সংস্কৃতজ্ঞ কোলব্রুক সাহেব[১] তৎকালীন বড়োলাট লর্ড মিন্টোকে অনুরোধ করলেন—বিলাতে ডিরেক্‌টরদের কাছে এই বলে যেন তিনি সুপারিশ করেন যে এ দেশে স্থানে স্থানে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। ১৭৯৫ সালে মির্জাপুরে অবস্থানকালে কোলব্রুক কাশীর সংস্কৃত কলেজের (১৭৯২) সংস্পর্শে আসেন। তখন থেকেই বাংলাদেশে একটি উচ্চশ্রেণির সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা তাঁর মনে জাগে। কলিকাতায় বদলি হয়ে আসেন প্রধান বিচারালয়ে জজের পদ পেয়ে। তখন ওয়েলেস্‌লি বড়োলাট; তাঁকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবার জন্যে কোলব্রুক অনুরোধ জানান, কিন্তু ওয়েলেস্‌লি তখন নানা যুদ্ধে জড়িত, এ দিকে মন দেবার অবসর ছিল কম। যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেছেন সিবিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য, ডিরেক্‌টররা সে কাজটাকে আদৌ পছন্দ করছেন না—আবার সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের কথা।

অতঃপর ১৮১৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তৃতীয় বার সনন্দ পরিবর্তনের সময় পার্লামেন্ট ভারত-সরকারকে জানালেন যে, প্রতি বছর ন্যূনপক্ষে একলক্ষ টাকা সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও উন্নতির, ও দেশীয় পণ্ডিতদের উৎসাহ দেবার জন্য এবং ব্রিটিশ এলাকার মধ্যে বিজ্ঞান-বিষয়ে জ্ঞান-প্রচারের জন্য ব্যয়িত হবে : "That a sum of not less than a lakh of rupees in each year shall be set apart, and applied to the revival and improvement of literature, and the encouragement and promotion of a knowledge of the sciences among the British territories of India." কিন্তু বহু বছর এ টাকার কোনো সদ্‌ব্যবহার হয়নি। ১৮২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজ কলকাতায় স্থাপন-কালে এই টাকা ব্যয়িত হল। রামমোহন রায় এই সময়ে ভারতের ভাবী শিক্ষা কী হওয়া বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধে তৎকালীন বড়োলাট লর্ড আমহার্স্টকে পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিনি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের যৌক্তিকতা সমর্থন করেননি। লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত সেই পত্রাংশের বাংলা অনুবাদ আমরা উদ্‌ধৃত করছি :

---

[১] দ্রষ্টব্য, "হেনরি টমাস কোলব্রুক", সাহিত্যের খবর, কার্তিক ১৩৬৭, পৃ. ২০-৩১। মুরারি ঘোষ লিখিত প্রবন্ধ।

"যদি ইংরাজ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ রাখা উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে প্রাচীন স্কুলমেনদিগের অসার বিদ্যার পরিবর্তে বেকনের প্রবর্তিত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত হইতে না দিলেই হইত, কারণ প্রাচীন জ্ঞানই অজ্ঞতাকে বাহাল রাখিত। সেইরূপ এদেশীয়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখা যদি গবর্নমেন্টের আকাঙ্ক্ষা ও নীতি হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় তাহার উৎকৃষ্টতর উপায় আর নাই। তৎপরিবর্তে এদেশীয়দিগের উন্নতিবিধান যখন গবর্নমেন্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা বিষয়ে উন্নত ও উদারনীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যদ্দ্বারা অপরাপর বিষয়ের সহিত গণিত, জড় ও জীব বিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীর-স্থানবিদ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে অর্থ এখন প্রস্তাবিত কার্যে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে তদ্দ্বারা ইউরোপে-শিক্ষিত কতিপয় প্রতিভাশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে ও ইংরাজি শিক্ষার একটি কলেজ স্থাপন করিলে ও তৎসঙ্গে পুস্তকালয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল দিলেই পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।"[১]

রামমোহনের ন্যায় সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি কেন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরোধিতা করেছিলেন তার নির্গলিত অর্থ বর্তমানে কোনো কোনো প্রতিক্রিয়াপন্থী লেখক আবিষ্কার করেছেন।

"লর্ড আমহার্স্টের শাসনকালে ইংরাজশাসকগোষ্ঠী যখন প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রচর্চাকে উৎসাহিত করিবার জন্য কলিকাতায় সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্ররূপে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করেন, তখন আমাদের দিক হইতেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা হইয়াছিল। এবং বিরোধিতা করিয়াছিলেন স্বয়ং রাজা রামমোহন রায়।" রামমোহন-লিখিত পত্র থেকে কয়েক পংক্তি উদ্‌ধৃত করে লেখক মন্তব্য করেছেন : "এমন-কি, তিনি এ পর্যন্ত বলিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না যে সংস্কৃতশিক্ষাকে জীয়াইয়া রাখিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসিগণকে চিরকালের জন্য অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে চান।" লেখক অতঃপর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে লিখছেন, "কিন্তু রামমোহন রায়ের এই বিরোধিতা সত্ত্বেও General Committee of Public Instruction তাঁহার স্মারকলিপি নীরবে উপেক্ষা করিলেন এবং ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি সংস্কৃত কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইল।"[২]

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, একটি কৃত্রিম অতি-ব্যাকরণ-পিষ্ট ও অনয়িম বা আর্ষপ্রয়োগ-কণ্টকিত ভাষা কি কখনো দেশব্যাপী হতে পারে? রামমোহনের বাস্তববোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল বলেই, সংস্কৃতজ্ঞ হয়েও তিনি ইংরেজিভাষা প্রচলনের জন্য সুপারিশ করেন। তিনি জানতেন, ভাষার মাধ্যমেই আসবে পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞান-দর্শনের ঐশ্বর্য। আমাদের মনের মুক্তি না হলে দেশের মুক্তি পাওয়া কঠিন। পৃথিবীর সমস্ত পিছিয়ে-পড়া জাতি আজ যে স্বাধীনতা লাভ করছে, তার পিছনে আছে এই ইউরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা—যা তারা আয়ত্ত করেছে কোনো-একটা ইউরোপীয় ভাষার মাধ্যমে—তা সে ইংরেজি হোক, ফরাসি হোক, আর রুশীয়ই হোক।

[১] শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ৮২।

[২] শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, "সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ", বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭০।

আমরা রামমোহনের রচনা থেকে এ সম্বন্ধে কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্‌ধৃত করছি :

"We understand that the Government in England had ordered a considerable sum of money to be annually devoted to the instruction of Indian subjects. We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European Gentlemen of talents and education to instruct the natives of India in Mathematics, Natural Philosophy [Physics], Chemistry, Anatomy and other useful sciences, which the nations of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world." (11 Dec. 1823)

৩

রামমোহন ১৮১৫ সালে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আসেন; তার পূর্বেই শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বেসরকারি ও ব্যক্তিগত প্রয়াস আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। শ্রীরামপুরে মিশনারিরা যে স্কুল স্থাপন করেছিলেন ১৮০০ অব্দে, সে সম্বন্ধে এক পত্রে তাঁরা বিলাতে জানাচ্ছিলেন—"Commerce has raised new thoughts and awakened new energies so that hundreds, if we could skilfully teach them gratis, would crowd to learn the English Language."[১]

১৮১৪ সালে ভূকৈলাসের জয়নারায়ণ ঘোষাল ২০ হাজার টাকা দান করেন ইংরেজি শিক্ষা-প্রচারের জন্য—সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য নয়। এই সময়ে ডেভিড হেয়ার কলকাতায় এসেছেন ও ইংরেজি শিক্ষা-প্রসারের জন্য সহায় ও সম্বল খুঁজছেন। ১৮১৭ অব্দের ২০ জানুয়ারি কলকাতার ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজের মুখ্যব্যক্তিগণ মিলিত হয়ে 'হিন্দু কলেজ' স্থাপন করেন। এই বছরের আর-একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য; কলকাতায় 'স্কুল বুক সোসাইটি' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। বালকদের জন্য পাঠ্যপুস্তক লিখিয়ে প্রকাশ করা ছিল এই সমিতির প্রধান কাজ। বলা বাহুল্য, শ্রীরামপুরের পাদরিদের এর মধ্যেও নিতে হয়, কারণ বাংলাভাষা সম্বন্ধে তাঁদেরই উৎসাহ বেশি। ১৮১৮ অব্দে খানিকটা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' নামে আর-একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়—বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন ছিল তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ইংরেজি শিখবার জন্য ছাত্রদের সবিশেষ আগ্রহ—হিন্দু কলেজে সকলের স্থান সংকুলান হয় না, তাই কলকাতার নানা পাড়ায় 'ইংরেজি বিদ্যালয়' স্থাপিত হতে চলল। এতৎসত্ত্বেও ইংরেজি স্কুল স্থাপন ও ইংরেজি ভাষা চর্চা ও প্রসার বিষয়ে দেশ-মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল।

ইংরেজি শিক্ষা বনাম সংস্কৃত-আরবি শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশে—আসলে কলকাতায়—দুটো পক্ষ হয়ে যায়। প্রাচীন ভাষা স্থায়ী করে রাখবার পক্ষে নামজাদা সংস্কৃতজ্ঞ সাহেব-পণ্ডিতরা ছিলেন, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সতীদাহ নিবারণ করা সম্বন্ধে গবর্মেন্টের মতের বিরোধিতাও করেন। পণ্ডিতদের মধ্যেও crank থাকে; এখনো সে শ্রেণির লোকের অভাব নেই। সাহেব হলেই তাদের সকল মত অভ্রান্ত বলে মানবার দুর্বলতা এখনো দূর

[১] J. C. Marshman, *History of the Serampore Mission*, 1859 Vol I, p 131.

হয় নি। আমাদের আলোচ্য পর্বে তরুণ বাংলা এই প্রাচ্য-পণ্ডিতদের মতবাদের ঘোর বিরোধী। সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হবার পর থেকে (ফেব্রুয়ারি ১৮২৪) দুই দলের মসীযুদ্ধ চলে দশ বৎসর কাল।[১]

সাহিত্য ও শিক্ষার খাতে প্রদত্ত টাকার কী অপব্যবহার হত তার একটা উদাহরণ দিই। ১৮১৩ সালের মঞ্জুরি অর্থ থেকে আরবি ভাষার এক কিতাব ছাপা হয়; মুসলমান ছাত্ররা আরবি ভাষা জানে না, তাই তার তর্জমা উর্দুতে ছাপা হল। কিন্তু বিপদ কাটল না; পড়াবার সময় জানা গেল যে উর্দুও বাঙালি মুসলমান ছাত্ররা বুঝতে পারছে না। তখন কী করা যায়? সেই অনুবাদক মৌলবিকেই তিন শো টাকা মাসিক বেতন দিয়ে রাখা হল নিজ তর্জমা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার জন্যে।

বহু বছর ধরে দুইদলের বাক্‌ ও মসী যুদ্ধ চলে, কিন্তু গবর্মেন্ট কোনো নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করতে পারেননি। লর্ড মেকলে ১৮৩৩ সালের নূতন সনন্দ অনুসারে আইন-সদস্য-রূপে ভারতে এলেন। উভয় দলই ১৮৩৫ অব্দের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে নিজ নিজ পক্ষের যুক্তি দিয়ে দরখাস্ত পেশ করলেন। মেকলে Anglicistদের পক্ষে তাঁর মত দিয়ে মন্তব্য লিখে পাঠিয়ে দিলেন; ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ গবর্মেন্ট তাঁর মত গ্রহণ করে ইংরেজি ভাষা রাজভাষা হবে বলে ঘোষণা করলেন। রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে যে আবেদন করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর দেড় বছর পর ইংরেজ গবর্মেন্ট সেটা মেনে নিয়ে চালু করলেন। বলা বাহুল্য, এই বারো বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা বাঙালিদের নিজ চেষ্টায় বহুলভাবে প্রসারলাভ করেছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা এখন যুবক—তাঁরা উগ্রভাবে 'পাশ্চাত্য' হয়ে উঠেছিলেন, দেশের মধ্যে তাঁরাও এই মত প্রচারে প্রচুর সহায়তা দান করেছেন।

পাঠকদের স্মরণ আছে, ১৮১৭ সালে যখন 'হিন্দু কলেজ' কলকাতায় স্থাপিত হয় তখন হিন্দুরা রামমোহনকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে চান নি। যখন তাঁরা খ্রিস্টান ইংরেজ জজ-সাহেবদের কাছ থেকে চাঁদা চাইতে গিয়েছেন, তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছেন রামমোহন কী দিয়েছেন; উত্তরে হিন্দু কর্মকর্তারা বলেছিলেন, রামমোহন হিন্দুধর্মের নিন্দুক; তাঁর কাছ থেকে দান তাঁরা চান না। রামমোহন নিজেই বিদ্যালয় স্থাপন করে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন; পরে পাদরি আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতায় এসে স্কুল স্থাপন করতে চাইলে রামমোহনই তাঁকে বাসা ভাড়া পাবার ব্যবস্থা করে দেন এবং ছাত্র-সংগ্রহেও সাহায্য করেন। খ্রিস্টানি স্কুলে যেতে ও সেখানে গিয়ে বাইবেল পড়তে তখন হিন্দুদের ঘোর আপত্তি ছিল। রামমোহন অভিভাবকদের বললেন যে, তিনিও তো বাইবেল পড়েছেন কিন্তু খ্রিস্টান তো হননি। এইভাবে ইংরেজিশিক্ষা-প্রসারে রামমোহন সহায়তা করেছিলেন।

[১] "The Orientalists were for the continuation of the old system of stipends, tenable for twelve or fifteen years, to students of Arabic and Sanskirt, and for liberal expenditure on the publication of works in these languages. The other half, called the 'Anglicists', desired to reduce the expenditure on stipends held by 'lazy and stupid school boys of 30 and 35 years of age', and to cut down the sums lavished on Sanskrit and Arabic printing."

আজ দেড় শো বছর পরে ভারতে ইংরেজি ভাষা শেখা ও না-শেখা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। একদল বলছেন, ইংরেজি ভাষা কিছুতেই রাখা হবে না, ইংরেজ যখন গিয়েছে তখন তার ভাষা ও সাহিত্যকেও দেশ ছাড়া করতে হবে। অপর দল তেমনি জোর দিয়ে বলছেন, যদি মূঢ়তার মধ্যে আবার যেতে চাও তা হলে ও-ভাষা ত্যাগ করো! ইংরেজি ভাষা আমাদের কাশ্মীর থেকে কেরল ও সিন্ধু থেকে আসামকে এক করেছে। আজ সেই ভাষা-বরবাদি প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে, বিচ্ছিন্ন জাতি ও ভাষাভাষীদের মধ্যে বিরোধের যে রূপ দেখা দিয়েছে, তার পরিণাম হিন্দু মুসলমানদের ধর্মীয় বিবাদ অপেক্ষা কম মারাত্মক নয়, তার প্রমাণ সকল রাষ্ট্রেই স্ফুট হয়েছে। তবে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য-চর্চার সঙ্গে সম্প্রতি যে ইংরেজি তথা ইয়াঙ্কিয়ানা 'সংস্কৃতি'র নামে দেশ-মধ্যে সর্বব্যাপী হতে চলেছে সেটা দুর্লক্ষণ।

উৎস : রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

# স্ত্রী-শিক্ষা

## স্বামী বিবেকানন্দ

### প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শিখিবার কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোমরা লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতেছ, কিন্তু যাহারা তোমাদের সুখদুঃখের ভাগী—সকল সময়ে প্রাণ দিয়া সেবা করে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে, তাহাদিগকে উন্নত করিতে তোমরা কী করিতেছ? তোমাদের ধর্মানুশাসনে, তোমাদের দেশের রীতিনীতি-অনুযায়ী কোথায় কটা স্কুল হইয়াছে? দেশের পুরুষদের মধ্যেই তেমন শিক্ষার বিস্তার নাই, তা আবার মেয়েদের ভিতর! গভর্নমেন্টের সংখ্যাসূচক তালিকায় (Statistics) দেখা যায়, ভারতবর্ষে শতকরা ১০/১২ জন মাত্র শিক্ষিত, বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে শতকরা একজনও হইবে না। এইরূপ না হইলে কি দেশের এমন দুর্দশা হয়? শিক্ষার বিস্তার, জ্ঞানের উন্মেষ—এইসব না হইলে দেশের উন্নতি কী করিয়া হইবে? তোমরা দেশে যে কয়জন লেখাপড়া শিখিয়াছ—দেশের ভাবী আশার স্থল—সেই কয়জনের ভিতরেও ওই বিষয়ে কোনো চেষ্টা, উদ্যম দেখিতে পাই না। কিন্তু জানিও, সাধারণের ভিতর আর মেয়েদের ভিতর শিক্ষাবিস্তার না হইলে কিছুই হইবার উপায় নাই। বিভিন্ন যুগে যে অনেক অসভ্য জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, প্রধানত তাহার জন্যই ভারতমহিলা এত অনুন্নত। কতকটা ভারতবাসীর নিজের দোষ। সেই শত শত যুগব্যাপী মানসিক, দৈহিক ও নৈতিক অত্যাচারের কথা, যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দভ এবং ভগবতীর প্রতিমারূপা রমণীকে সন্তান উৎপাদন করিবার দাসীস্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কথা তাহাদের স্বপ্নেও উদিত হয় না।

আমাদের ধর্ম স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে মোটেই বাধা দেয় না। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—ঠিক এইভাবে বালিকাদেরও পালিত এবং শিক্ষিত হওয়া উচিত। প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যায়, পূর্বে বালক এবং বালিকা উভয়েরই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সমস্ত জাতির শিক্ষা উপেক্ষিত হইয়াছিল।

# আমেরিকার মহিলা

আমেরিকা একটি অদ্ভুত দেশ। দরিদ্র ও স্ত্রী-জাতির পক্ষে ওই দেশ নন্দনকাননস্বরূপ। সেই দেশে দরিদ্র একরূপ নাই বলিলেই চলে এবং অন্য কোথাও মেয়েরা ওই দেশের মেয়েদের মতো স্বাধীন, শিক্ষিত ও উন্নত নহে। ইহাদের রমণীগণ সকল স্থানের রমণীগণ অপেক্ষা উন্নত; আবার সাধারণত আমেরিকান নারী আমেরিকান পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ও উন্নত। মহিলাগণ সমুদয় জাতীয় উন্নতির প্রতিনিধিস্বরূপ। পুরুষেরা কার্যে অতিশয় ব্যস্ত বলিয়া শিক্ষায় তত মনোযোগ দিতে পারে না। মহিলাগণ প্রত্যেক বড়ো বড়ো কার্যের জীবনস্বরূপ। সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু সেই দেশের মেয়েদের মতো মেয়ে বড়োই কম। "যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু"[১]—যে দেবী সুকৃতি পুরুষের গৃহে স্বয়ং রূপে বিরাজমানা—একথা বড়োই সত্য। তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখিয়াছি। সকল কাজ তাহারাই করে। স্কুল, কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়েদের পথ চলিবার উপায় নাই। আর তাহাদের মেয়েরা কী পবিত্র! ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কম কাহারও বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজারহাট, রোজগার, দোকান, কলেজ, প্রফেসর—সব কাজ করে, অথচ কী পবিত্র! আর ওদের কত দয়া! যাহাদের পয়সা আছে, তাহারা দিনরাত গরীবদের উপকারে ব্যস্ত। "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" (যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজিতা হন, দেবতারাও তথায় আনন্দ করেন)—বৃদ্ধ মনু বলিয়াছেন। আর আমরা কী করি? আমার মেয়ের ১১ বৎসরে বিবাহ না হইলে খারাপ হইয়া যাইবে। আমরা কি মানুষ? আমরা মহাপাপী; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্য কীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলিয়া বলিয়া অধোগতি হইয়াছে। প্রভু বলিয়াছেন, "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।"[২]—(তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই বালক ও তুমিই বালিকা) ইত্যাদি। আর আমরা বলিতেছি—"দূরমপসর রে চণ্ডাল" (ওরে চণ্ডাল, দূরে সরিয়া যাও)। মনু বলিয়াছেন, ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করিয়া বিদ্যাশিক্ষা হইবে, তেমনই মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কী করিতেছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পার? তবে আশা আছে, নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না। তাহারা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—সাক্ষাৎ জগদম্বা; তাহাদের পূজা করিলে সর্বসিদ্ধিলাভ হয়। এই রকম মা জগদম্বা যদি ১০০০ এক হাজার আমাদের দেশে তৈয়ার করিয়া মরিতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া মরিব। তবে তোমাদের দেশের লোক মানুষ হইবে।

শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ ভাঙগ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলিয়া জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। আমেরিকানরা তাহাই দেখে; এবং মনু মহারাজ বলিয়াছেন—যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহা কৃপা। তাহারা তাহাই করে। আর তাহারা সেইজন্য সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা-হেয়, অপবিত্র বলি। তাহার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।

(১) চণ্ডী, ৪/৫

(২) শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ

## বৈদিক যুগ ও বর্তমান

এই দেশে পুরুষ ও মেয়েতে এতটা তফাত কেন করিয়াছে তাহা বুঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করেন। তোমরা মেয়েদের নিন্দাই কর; কিন্তু তাহাদের উন্নতির জন্য কী করিয়াছ বল দেখি? স্মৃতি-ফৃতি লিখিয়া, নিয়ম-নীতিতে বদ্ধ করিয়া এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে পুত্র-উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র করিয়া তুলিয়াছে। মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এই সকল মেয়েদের না তুলিলে বুঝি তোমাদের আর উপায়ান্তর আছে? ভারতের অধঃপতন হইল, ভট্টাচার্য-ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণেতর জাতিকে যখন বেদপাঠের অনধিকারী বলিয়া নির্দেশ করিলেন, সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকার কাড়িয়া লইলেন। নতুবা বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে দেখিতে পাইবে মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্ম-বিচারে ঋষিস্থানীয়া হইয়া রহিয়াছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্ম-বিচারে আহ্বান করিয়াছিলেন। এইসব আদর্শস্থানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল, তখন এখনই বা মেয়েদের সে অধিকার থাকিবে না কেন? একবার যাহা ঘটিয়াছে তাহা আবার অবশ্য ঘটিতে পারে, ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্যকে জনকরাজার সভায় কীরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ আছে তো? তাঁহার প্রধান প্রশ্নকর্তা ছিলেন বাক্‌পটু কুমারী বাচক্নবী—তখনকার দিনে ওইরূপ মহিলাদিগকে ব্রহ্মবাদিনী বলা হইত। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার এই প্রশ্নদ্বয় দক্ষ ধানুষ্কের হস্তস্থিত দুইটি শাণিত তিরের ন্যায়।' এইস্থলে তাঁহার নারীত্বসম্বন্ধে কোনোরূপ প্রসঙ্গ পর্যন্ত তোলা হয় নাই। আর আমাদের প্রাচীন আরণ্য শিক্ষাপরিষদসমূহে বালকবালিকার সমানাধিকার ছিল; তদপেক্ষা অধিকতর সাম্যভাব আর কী হইতে পারে? আমাদের সংস্কৃত নাটকগুলি পড়—শকুন্তলার উপ্যাখ্যান পড়, তাবপর দেখ—টেনিসনের 'প্রিন্সেস্' হইতে আর আমাদের নূতন কিছু শিখিবার আছে কিনা।

## জাতীয় জীবনের মানদণ্ড-নিরূপণ

ভালোমন্দ সকল স্থলেই আছে। আমেরিকায় কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দৃষ্টিগোচর করিয়াছি, কত শত জননী দেখিয়াছি যাঁহাদের নির্মল চরিত্রের, যাঁহাদের নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহের বর্ণনা করিবার ভাষা নাই, কত শত কন্যা ও কুমারী দেখিয়াছি যাহারা 'ডায়নাদেবীর ললাটস্থ তুষার-কণিকার ন্যায় নির্মল,' আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং সর্ববিধ মানসিক-ও আধ্যাত্মিক-উন্নতিসম্পন্না। কিন্তু যাহাদিগকে আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই অপোগণ্ডগুলির দ্বারা তৎসম্বন্ধে ধারণা করিলে চলিবে না, কারণ উহারা তো আগাছার মতো পশ্চাতে পড়িয়া থাকে; যাহা সৎ, উদার ও পবিত্র, তাহা দ্বারাই জাতির জীবনের নির্মল ও সতেজ প্রবাহ নিরূপিত হইয়া থাকে। একটি আপেল গাছ ও তাহার ফলের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে, যেসকল অপক্ক, অপরিণত, কীটদষ্ট ফল মাটিতে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে—তাহাদের সংখ্যা অধিক হইলেও তুমি কি তাহাদের সাহায্যে বিচার কর? যদি একটি সুপক্ক ও পরিপুষ্ট ফল পাওয়া যায় তবে সেই একটি দ্বারাই ওই আপেল গাছের শক্তি, সম্ভাবনা ও উদ্দেশ্য অনুমিত হয়—যেসব শত শত ফল অপরিণত, তাহাদের দ্বারা নহে।

প্রত্যেক জাতির এক একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেইখানটা হইতে সেই জাতির রীতিনীতি বিচার করিতে হইবে। তাহাদের চোখে তাহাদের দেখিতে হইবে। আমাদের চোখে ইহাদের দেখা, অথবা ইহাদের চোখে আমাদের দেখা—এই দুটিই ভুল। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গি অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। আমি জাতির দুইটি দিকই দেখিয়াছি, আর আমি জানি যে জাতি সীতা-চরিত্র প্রসব করিয়াছে, ওই চরিত্র যদি কেবল কাল্পনিকও হয়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে নারীজাতির উপর সেই জাতির যেরূপ শ্রদ্ধা, জগতে তাহার তুলনা নাই।

## আদর্শ-সীতাচরিত্র

ভারতীয় রমণীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ; রমণীচরিত্রের যতপ্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতা-চরিত্রেরই আশ্রিত; আর সমগ্র আর্যাবর্তভূমিতে এই সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া তিনি এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা স্বয়ং শুদ্ধা হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী নিত্যবিশুদ্ধস্বভাবা আদর্শপত্নী সীতা, সেই নরলোকের, এমনকি, দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শীভূতা মহনীয়-চরিত্রা সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন। আমরা সকলেই তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে জানি, সুতরাং উহার বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক করে না। আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এমনকি আমাদের বেদ পর্যন্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের সংস্কৃতভাষা পর্যন্ত চিরদিনের জন্য কালস্রোতে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু আমার বাক্য অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যতদিন পর্যন্ত ভারতে অতিশয় গ্রাম্যভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দুও থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সীতার উপাখ্যান থাকিবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন, প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা। আমরা সকলেই সীতার সন্তান। আমাদের নারীগণকে আধুনিকভাবে গঠিত করিবার যেসকল চেষ্টা হইতেছে, যদি সেসকল চেষ্টার মধ্যে তাহাদিগকে সীতাচরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে। আর প্রত্যহই ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি, ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আপনাদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।

ভারতের বালকবালিকাগণ, বিশেষত বালিকামাত্রেই সীতার পূজা করিয়া থাকে। ভারতীয় রমণীগণের সর্বাপেক্ষা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা—পরমবিশুদ্ধস্বভাবা, পতিপরায়ণা, সর্বংসহা সীতার ন্যায় হওয়া। সমগ্র ভারতবাসীর সমক্ষে সীতা যেন সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শরূপে বর্তমান রহিয়াছেন। সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধিস্বরূপা, যেন মূর্তিমতী ভারতমাতা। সীতাচরিত্রের আদর্শ যেমন সমগ্র ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, যেমন সমগ্র জাতির

জীবনে, সমগ্র জাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, যেমন উহা প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, অন্য কোনো পৌরাণিক উপাখ্যান তেমন করে নাই। সীতা নামটিও ভারতে যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু বিশুদ্ধ, যাহা কিছু পুণ্যময়, তাহারই পরিচায়ক। নারীগণের মধ্যে আমরা যে ভাবকে নারীজনোচিত বলিয়া শ্রদ্ধা ও আদর করিয়া থাকি, সীতা বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। সীতার কথা কী বলিব! তোমরা জগতের প্রাচীন সাহিত্যসমগ্র অধ্যয়ন করিয়া নিঃশেষ করিতে পার, আর আমি তোমাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, জগতের ভাবী সাহিত্যসমূহও নিঃশেষ করিতে পার, কিন্তু আর একটি সীতা-চরিত্র বাহির করিতে পারিবে না। সীতা-চরিত্র অসাধারণ; ওই চরিত্র ওই একবার মাত্রই চিত্রিত হইয়াছে। আর কখনও হয় নাই, হইবেও না।

## প্রকৃত শক্তিপূজা

আমাদের দেশ সকল দেশের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—এখানে শক্তির অবমাননা বলিয়া। শক্তির কৃপা না হইলে কিছুই হইবে না। আমেরিকায়, ইউরোপে কী দেখিয়াছি? —শক্তির পূজা; তবু ইহারা না জানিয়া পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যাহারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করিবে, তাহাদের কী কল্যাণ না হইবে? আমরা পাশ্চাত্যদেশে যে নারীপূজার কথা শুনিয়া থাকি, সাধারণত উহা নারীর সৌন্দর্য ও যৌবনের পূজা। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নারীপূজা বলিতে বুঝিতেন, সকল নারী সেই আনন্দময়ী মা ব্যতীত কিছুই নহেন—তাঁহারই পূজা। আমি নিজে দেখিয়াছি—সমাজ যাহাকে স্পর্শ করিবে না, তিনি এইরূপ স্ত্রীলোকের সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পদতলে পতিত হইয়া অর্ধবাহ্য অবস্থায় বলিতেছেন, "মা, একরূপে তুমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, আর একরূপে তুমি সমগ্র জগৎ হইয়াছ। আমি তোমাকে প্রণাম করি; মা, তোমাকে প্রণাম করি।" ভাবিয়া দেখ, সেই জীবন কীরূপ ধন্য, যাহা হইতে সর্ববিধ পশুভাব চলিয়া গিয়াছে, যিনি প্রত্যেক রমণীকে ভক্তিভাবে দর্শন করিতেছেন, যাঁহার নিকট সকল নারীর মুখ অন্য আকার ধারণ করিয়াছে, কেবল সেই আনন্দময়ী জগদ্ধাত্রীর মুখ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ইহাই আমাদের প্রয়োজন। মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড়ো হইয়াছে। যে দেশে, যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই, সে দেশ, সে জাতি কখনও বড়ো হইতে পারে নাই, কস্মিন্‌কালে পারিবেও না। তোমাদের জাতির যে এত অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই সব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা।

## জন্মগত শুভাশুভ সংস্কার

মাকে কেন এত শ্রদ্ধাভক্তি করিব? কারণ—আমাদের শাস্ত্র বলে জন্মগত শুভাশুভ সংস্কারই শিশুর জীবনে ভালোমন্দের প্রভাব বিস্তার করে। শত সহস্র কলেজেই যাও, লক্ষ লক্ষ বই-ই পড়, আর জগতের বড়ো বড়ো পণ্ডিতের সঙ্গেই মিশ, পরিণামে দেখিবে যে জন্মগত শুভ-সংস্কারই তোমার সাফল্যের যথার্থ কারণ। জন্ম হইতে তোমার সদসৎ অদৃষ্ট নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে—জন্ম হইতেই শিশু হয় দেব, না হয় দানব—ইহাই শাস্ত্রের মর্ম।

শিক্ষা ও অপরাপর জিনিস সব পরে আসে এবং তাহাদের প্রভাব অতি সামান্য। তুমি যেমন জন্ম পাইয়াছ, তেমনি থাকিবে। খারাপ স্বাস্থ্য লইয়া জন্মিয়াছ, এখন সমগ্র ঔষধালয় সেবন করিলেই কি তুমি সারাজীবনের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবে? দুর্বল, রুগ্ণ, দূষিতরক্ত পিতামাতা হইতে সুস্থ সবল কয়জন সন্তান জন্মাইতে পারে? বল—কয়জন?—একটিও নয়। সৎ বা অসৎ প্রবৃত্তির প্রবল সংস্কার লইয়া আমরা জগতে আসি। জন্ম হইতেই আমরা দেব বা দানব। আমাদের জীবনের উপর শিক্ষা বা অন্য কিছুর প্রভাব প্রকৃতপক্ষে অতি সামান্য। শাস্ত্রের বিধান—জন্মের প্রাক্‌কালীন প্রভাবসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। মাকে পূজা করিব কেন? কারণ তিনি পবিত্রা। কঠোর তপঃক্লেশ সহ্য করিয়া তিনি নিজেকে পুণ্যস্বরূপিণী করিয়াছেন।

## ব্রহ্মচর্য-আদর্শ

জাতির জীবনে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রথমত বৈবাহিক সম্বন্ধকে পবিত্র ও বিচ্ছেদহীন করিতে হইবে এবং তাহারই সাহায্য মাতৃপূজার উৎকর্ষ-সাধন করিতে হইবে। রোমান-ক্যাথলিক ও হিন্দুগণ বিবাহকে পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য করিয়া বহু শক্তিশালী স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন। আরবদের দৃষ্টিতে বিবাহ একটা চুক্তি, একটা বলপূর্বক অধিকারমাত্র—উহা ইচ্ছামত ভাঙিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং আমরা তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীর আদর্শ পাই না। বৌদ্ধধর্ম এমন কতকগুলি জাতির মধ্যে পড়িয়াছে, যাহাদের সমাজে এখনও বিবাহপ্রথার অভিব্যক্তি হয় নাই, সুতরাং ওইসব দেশে বৌদ্ধধর্মের নামে সন্ন্যাসের প্রহসন চলিতেছে। তোমাদের যেমন ধারণা যে ব্রহ্মচর্যই জীবনের পরম গৌরব, আমারও তেমনি এই একটি বিষয়ে চোখ খুলিয়া গিয়াছে যে, ওইরূপ শক্তিশালী আকুমার ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীর সৃষ্টির জন্য সর্বসাধারণের বৈবাহিক জীবনকে পুণ্যময় করিয়া তোলা আবশ্যক। এদেশে প্রত্যেক বালিকাকে সাবিত্রীর ন্যায় সতী হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে—মৃত্যুও তাঁহার প্রেমের নিকট পরাভূত হইয়াছিল। তিনি ঐকান্তিক প্রেম-বলে যমের নিকট হইতেও নিজ স্বামীর আত্মাকে ফিরাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ সীতা-সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখিলাম না। পাশ্চাত্যে মেয়েদের দেখিয়া আমার অনেক সময় স্ত্রীলোক বলিয়াই বোধ হইত না—ঠিক যেমন পুরুষ মানুষ! গাড়ি চালায়, আফিসে যায়, স্কুলে যায়, প্রফেসারি করে! একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা বিনয় দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পাইয়াও তোমরা ইহাদের উন্নত করিতে পারিলে না! ইহাদের ভিতর জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা করিলে না! ঠিক ঠিক শিক্ষা পাইলে ইহারা আদর্শ স্ত্রীলোক হইতে পারে।

## প্রকৃত শিক্ষা হইবে সমস্ত সমস্যার সমাধানকারী আর ধর্ম উহার কেন্দ্র

আমাদের রমণীগণের মীমাংসিতব্য অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড়ো গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নাই, 'শিক্ষা' এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে।

প্রকৃত শিক্ষার ধারণা কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে উদিত হয় নাই। শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দশিক্ষা নহে, আমাদের বৃত্তিগুলির, শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে। শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিসকলকে এমনভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহাদের ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়। এইরূপভাবে শিক্ষিতা হইলে আমাদের ভারতের কল্যাণসাধনে সমর্থা নির্ভীক-হৃদয়া মহীয়সী রমণীগণের অভ্যুদয় হইবে। তাহারা সঙ্ঘমিত্রা, লীলাবতী, অহল্যাবাই ও মীরাবাই-এর পদাঙ্কানুসরণে সমর্থা হইবে—তাহারা পবিত্রা স্বার্থগন্ধশূন্যা বীররমণী হইবে; ভগবানের পাদস্পর্শে যে বীর্যলাভ হয়, তাহারা সেই বীর্যশালিনী হইবে; সুতরাং তাহারা বীর-প্রসবিনী হইবার যোগ্যা হইবে।

কিন্তু নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত; নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ একার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য স্থানের নারীগণের ন্যায় আমাদের নারীগণও এ যোগ্যতালাভে সমর্থা। আমাকে বারংবার প্রশ্ন করা হইয়াছে—আপনি বিধবাদিগের ও সমগ্র রমণীজাতির উন্নতির উপায়সম্বন্ধে কী মনে করেন? আমি এই প্রশ্নের চরম উত্তর দিতেছি—আমি কি বিধবা যে আমাকে এই বাজে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি কি স্ত্রীলোক যে আমাকে বার বার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কে হে, গায়ে পড়িয়া নারীজাতির সমস্যা-সমাধানে আগুয়ান হইয়াছ—তুমি প্রত্যেক বিধবার ও প্রত্যেক রমণীর অর্ন্তযামী সাক্ষাৎ ভগবান নাকি? তফাত! উহারা আপনাদের সমস্যার সমাধান আপনারাই করিবে। আমি বলিতেছি না যে, আমাদের সমাজের নারীগণের বর্তমান অবস্থায় আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট; কিন্তু নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপের অধিকার তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত। শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও; তখন তাহারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা তোমাদিগকে বলিবে। তাহাদের ব্যাপারে তোমরা আবার কে? আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া সমাজকে 'এদিকে তোমায় চলিতে হইবে, ওদিকে নয়'—বলিয়া আদেশ করিতে সাহস করি না। জাতীয় জীবনের পুষ্টির জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তাহা উহাকে দিয়া দাও, কিন্তু উহা আপনার প্রকৃতি-অনুযায়ী আপনার দেহ গঠন করিয়া লইবে। আমাদের কার্য হইতেছে স্ত্রী পুরুষ সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া। সেই শিক্ষার ফলে তাহারা নিজেরাই কোনটি ভালো কোনটি মন্দ সব বুঝিতে পারিবে এবং আপনারা মন্দটা করা ছাড়িয়া দিবে। তখন আর জোর করিয়া সমাজের কোনো বিষয় ভাঙিতে গড়িতে হইবে না।

ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীরপালন—এই সকল বিষয়েই স্থূল স্থূল মর্মগুলিই মেয়েদের শিখানো উচিত। নভেল নাটক ছুঁইতে দেওয়া উচিত নয়। কেবল পূজাপদ্ধতি শিখাইলেই হইবে না, সব বিষয়ে চোখ ফুটাইয়া দিতে হইবে। আদর্শ নারী-চরিত্রসকল ছাত্রীদের সম্মুখে সর্বদা ধরিয়া উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাহাদের অনুরাগ জন্মাইয়া দিতে হইবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা—ইঁহাদের জীবন চরিত্র মেয়েদের বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের নিজেদের জীবন ওইরূপে গঠিত করিতে হইবে।

তবে কী জান, শিক্ষাই বল আর দীক্ষাই বল ধর্মহীন হইলে তাহাতে গলদ থাকিবেই থাকিবে। এখন ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া রাখিয়া স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার করিতে হইবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা গৌণ হইবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্য-ব্রতোদ্‌যাপন—এইজন্য শিক্ষার দরকার। বর্তমানকালে এ পর্যন্ত ভারতে যে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার হইয়াছে, তাহাতে ধর্মটাকেই গৌণ করিয়া রাখা হইয়াছে। সেইজন্যই তোমরা যেসব দোষের কথা বল, সেগুলি হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে স্ত্রীলোকদের কি দোষ বল? সংস্কারকেরা নিজে ব্রহ্মজ্ঞ না হইয়া স্ত্রী শিক্ষা দিতে অগ্রসর হওয়াতেই তাহাদের ওইরূপ বেচালে পা পড়িয়াছে। সকল সৎকার্যের প্রবর্তককেই অভীপ্সিত কার্যানুষ্ঠানের পূর্বে কঠোর তপস্যাসহায়ে আত্মজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। নতুবা তাহার কাজে গলদ বাহির হইবেই। আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়া মনে করি। আমার বিবেচনায় অন্যান্য বিষয়ে যেমন, এই বিষয়েও তদ্রূপ শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীর ভাব ও ধারণানুয়ায়ী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন এবং তাহাকে উন্নত করিবার এমন সহজ পথ দেখাইয়া দিবেন, যাহাতে তাহাকে খুব কম বাধা পাইতে হয়।

## আত্মরক্ষায় সমর্থা ও ত্যাগব্রতে দীক্ষিতা করা

যেরকম শিক্ষা চলিতেছে, সেরকম নহে। সত্যিকার কিছু শিখা চাই। খালি বইপড়া শিক্ষা হইলে চলিবে না, যাহাতে চরিত্র গঠিত হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে, এইরকম শিক্ষা চাই। ওই রকম শিক্ষা পাইলে মেয়েদের সমস্যা মেয়েরা আপনারাই সমাধান করিবে। আমাদের মেয়েরা বরাবর প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে। একটা কিছু হইলে কেবল কাঁদিতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শিখা দরকার। এ সময়ে তাহাদের মধ্যেও আত্মরক্ষা শিক্ষা করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। দেখ দেখি, ঝাঁসীর রানি কেমন ছিলেন! সেজন্য আমার ইচ্ছা আছে—কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈয়ার করিব। ব্রহ্মচারীরা কালে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে যাইয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নপর হইবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিবে। কিন্তু দেশী ধরনে ওই কাজ করিতে হইবে। পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি শিক্ষাকেন্দ্র করিতে হইবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র করিতে হইবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা ওই সকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার নিবে। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্রগঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হইবে। ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করিতে হইবে। কালে যাহাতে তাহারা ভালো গিন্নি তৈয়ারি হয়, তাহাই করিতে হইবে। এই সকল মেয়েদের সন্তান-সন্ততিগণ পরে ওই সকল বিষয়ে আরও উন্নতিলাভ করিতে পারিবে। যাহাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাহাদের ঘরেই বড়ো লোক জন্মায়। স্ত্রীলোক না হইলে কি ছাত্রীদের এমন করিয়া শিক্ষা দিতে পারে? শিক্ষিতা বিধবা ও ব্রহ্মচারিণীগণের উপরই স্কুলের শিক্ষার ভার সর্বদা রাখা উচিত। এই দেশে স্ত্রী-বিদ্যালয়ে পুরুষ-সংস্রব একেবারে না রাখাই ভালো। মেয়েদের তোমরা এখন যেন কতকগুলি Manufacturing machine (উৎপাদন-যন্ত্র) করিয়া তুলিয়াছ। রাম, রাম! এই কি তোমাদের শিক্ষার ফল হইল? মেয়েদের শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাহার

পর নিজেরাই ভাবিয়া চিন্তায় যাহা হয় করিবে। বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেও এইরূপে শিক্ষিতা মেয়েরা নিজ নিজ পতিকে উচ্চভাবের প্রেরণা দিবে এবং বীর পুত্রের জননী হইবে। তাহাদের দেখিয়া ও তাহাদের চেষ্টায় দেশটার আদর্শ উল্টাইয়া যাইবে। এখন ধরিয়া বিবাহ দিতে পারিলেই হইল। তাহা নয় বৎসরেই হউক, দশ বৎসরেই হউক। এখন এরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে তের বৎসরের মেয়ের সন্তান হইলে গুষ্টিসুদ্ধর আনন্দ কত! তাহার ধুমধামই বা দেখে কে! এই ভাবটা উল্টাইয়া গেলে ক্রমশ দেশে শ্রদ্ধাও আসিতে পারিবে। যাহারা ওইরকম ব্রহ্মচর্য পালন করিবে, তাহাদের তো কথাই নাই—কতটা শ্রদ্ধা, কতটা নিজেদের উপর বিশ্বাস তাহাদের হইবে, তাহা মুখে বলা যায় না।

ক্রমে সব হইবে। দেশে এমন শিক্ষিত লোক এখনও জন্মায় নাই, যাহারা সমাজ-শাসনের ভয়ে ভীত না হইয়া নিজের মেয়েদের অবিবাহিতা রাখিতে পারে। এই দেখ না—এখনও মেয়ে বার-তের বৎসর পার হইতে না হইতে লোকভয়ে, সমাজভয়ে বিবাহ দিয়া ফেলে। এই সেদিন 'সম্মতি-সূচক-আইন' করিবার সময় সমাজের নেতারা লক্ষ লোক জড়ো করিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন, 'আমরা আইন চাই না!'—অন্য দেশ হইলে সভা করিয়া চেঁচান দূরে থাকুক, লজ্জায় মাথা গুঁজিয়া লোক ঘরে বসিয়া থাকিত ও ভাবিত—'আমাদের সমাজে এখনও এহেন কলঙ্ক রহিয়াছে!' বাল্যবিবাহে মেয়েরা অকালে সন্তান প্রসব করিয়া অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণও ক্ষীণজীবী হইয়া দেশের ভিখারির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কারণ, পিতামাতার শরীর সম্পূর্ণ সমর্থ ও সবল না হইলে সবল ও নীরোগ সন্তান জন্মিবে কিরূপে? লেখাপড়া শিখাইয়া একটু বয়স হইলে বিবাহ দিলে সেই মেয়েদের যে সন্তান-সন্ততি জন্মিবে, তাহাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হইবে। তোমাদের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা তাহার কারণ হইতেছে—এই বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহ কমিয়া গেলে বিধবার সংখ্যাও কমিয়া যাইবে। আমার মত এই যে, বাল্যবিবাহের মূল তত্ত্বটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করিয়া মেয়ে পুরুষ সকলেরই বেশি বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই; তাহা না হইলে অনাচার ব্যাভিচার আরম্ভ হইবে।

ভালোমন্দ সব দেশেই আছে। আমার মতে সমাজ সকল দেশেই আপনা আপনি গড়ে। অতএব বাল্যবিবাহ তুলিয়া দেওয়া, বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মাথা না ঘামাইয়া আমাদের কর্তব্য হইতেছে স্ত্রীপুরুষ সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া; সেই শিক্ষার ফলে তাহারা নিজেরাই কোনটি ভালো কোনটি মন্দ সব বুঝিতে পারিবে এবং আপনারাই মন্দটা করা ছাড়িয়া দিবে। তখন আর জোর করিয়া সমাজের কোনো বিষয় ভাঙিতে গড়িতে হইবে না। আমাদের আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবা-বিবাহ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। অবশ্য সকল সংস্কারকার্যেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোনো জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে না—উহা নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর।

## চিন্তা ও কার্যে প্রতিবন্ধকহীনতার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা ও সংস্কৃতি (culture) পুরুষদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে, অর্থাৎ যেখানে পুরুষেরা

উচ্চশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরাও সেখানে উচ্চশিক্ষিতা। পরন্তু পুরুষেরা শিক্ষিত না হইলে স্ত্রীলোকেরাও হয় না। সামাজিক ব্যাধি-প্রতিকার বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। উন্নতির মুখ্য সহায়—স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়া-দাওয়া, পোশাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহা দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়। যদি তুমি কাহাকেও সিংহ হইতে না দাও, তাহা হইলে সে ধূর্ত শৃগাল হইয়া দাঁড়াইবে। স্ত্রীজাতি শক্তিস্বরূপিণী, কিন্তু এখন ওই শক্তি কেবল মন্দ বিষয়ে প্রযুক্ত হইতেছে, তাহার কারণ পুরুষে তাহার উপর অত্যাচার করিতেছে। এখন সে শৃগালীর মতো; কিন্তু যখন তাহার উপর আর অত্যাচার হইবে না, তখন সে সিংহী হইয়া দাঁড়াইবে। জোর করিয়া সংস্কারের চেষ্টার ফল এই যে তাহাতে সংস্কার বা উন্নতির গতিরোধ হয়। কাহাকেও বলিও না—'তুমি মন্দ।' বরং তাহাকে বল, 'তুমি ভালোই আছ, আরও ভালো হও।'

## সতীত্ব ও স্ত্রীজাতির অভ্যুদয়

মেয়েদের শিখাইতে হইবে, নিজেদেরও শিখিতে হইবে। খালি বাপ হইলেই তো হয় না, অনেক দায়িত্ব ঘাড়ে করিতে হয়। আমাদের মেয়েদের একটা শিক্ষা তো সহজে দেওয়া যাইতে পারে—হিন্দুর মেয়ে সতীত্ব কী জিনিস তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে; ইহাতে তাহারা পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত কিনা! প্রথমে সেই ভাবটাই তাহাদের মধ্যে উসকাইয়া দিয়া (উত্তেজিত করিয়া) তাহাদের চরিত্রগঠন করিতে হইবে—যাহাতে তাহারা, বিবাহিতা হউক, বা কুমারী থাকুক, সকল অবস্থাতেই সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে কাতর না হয়। কোনো একটা ভাবের জন্য প্রাণ দিতে পারাটা কি কম বীরত্ব? এখন যে রকম সময় পড়িয়াছে, তাহাতে তাহাদের ওই যে ভাবটা বহুকাল হইতে আছে, তাহারই বলে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি চিরকুমারী রাখিয়া ত্যাগধর্ম শিক্ষা দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানাদি অন্য সব শিক্ষা, যাহাতে তাহাদের নিজের ও অপরের কল্যাণ হইতে পারে, তাহাও শিখাইতে হইবে। তাহা হইলে তাহারা অতি সহজেই ওইসব শিখিতে পারিবে, ওইরূপ শিখিতে আনন্দও পাইবে। আমাদের দেশের যথার্থ কল্যাণের জন্য ওইরকম কতকগুলি পবিত্রজীবন ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী হওয়া দরকার হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে ভারতের কল্যাণ সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রী-গুরুগ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাবসাধন, সেই জন্যই মাতৃভাবপ্রচার, সেইজন্যই আমার স্ত্রীমঠস্থাপনের প্রথম উদ্যোগ। যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নাই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের—সে দেশের কখনও উন্নতির আশা নাই। এইজন্য ইহাদের আগে তুলিতে হইবে—ইহাদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করিতে হইবে।

## আদর্শ স্ত্রীমঠস্থাপন-পরিকল্পনা

গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি লওয়া হইবে। তাহাতে অবিবাহিতা কুমারীরা থাকিবে, আর বিধবা ব্রহ্মচারিণীরা থাকিবে; আর ভক্তিমতী গৃহস্থের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া

অবস্থান করিতে পারিবে। এই মঠে পুরুষদের কোনোরূপ সংস্রব থাকিবে না। পুরুষ-মঠের বয়োবৃদ্ধ সাধুরা দূর হইতে স্ত্রী-মঠের কার্যভার চালাইবে। স্ত্রী-মঠে মেয়েদের একটি স্কুল থাকিবে; তাহাতে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, এমন-কি অল্প-বিস্তর ইংরেজিও শিক্ষা দেওয়া হইবে। সেলাইয়ের কাজ, রান্না, গৃহকর্মের যাবতীয় বিধান এবং শিশুপালনের স্থূল বিষয়গুলিও শিখান হইবে। আর জপ, ধ্যান, পূজা—এইসব তো শিক্ষার অঙ্গ থাকিবেই। যাহারা বাড়ি ছাড়িয়া একেবারে এখানে থাকিতে পারিবে, তাহাদের অন্নবস্ত্র এই মঠ হইতে দেওয়া হইবে। যাহারা তাহা পারিবে না, তাহারা এই মঠে দৈনিক-ছাত্রীস্বরূপে আসিয়া পড়াশুনা করিতে পারিবে। এমনকি মঠাধ্যক্ষার অভিমতে মধ্যে মধ্যে এখানে থাকিতে এবং যতদিন থাকিবে খাইতেও পাইবে। মেয়েদের ব্রহ্মচর্যকল্পে এই মঠে বয়োবৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার লইবে। এই মঠে ৫/৭ বৎসর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাহাদের বিবাহ দিতে পারিবে। যোগ্যাধিকারিণী বলিয়া বিবেচিত হইলে অভিভাবকদের মত লইয়া ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারী-ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করিতে পারিবে। যাহারা চিরকুমারী-ব্রত অবলম্বন করিবে, তাহারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হইয়া দাঁড়াইবে এবং গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিবে। চরিত্রবতী, ধর্মভাবাপন্না ওইরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হইবে। স্ত্রী-মঠের সংস্রবে যতদিন থাকিবে ততদিন ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা এই মঠের ভিত্তিস্বরূপ হইবে। ধর্মপরতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলংকার হইবে; আর সেবাধর্ম তাহাদের জীবনব্রত হইবে। এইরূপ আদর্শ-জীবন দেখিলে কে তাহাদের না সম্মান করিবে—কেই বা তাহাদের অবিশ্বাস করিবে? দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইরূপে গঠিত হইলে তবে তো তোমাদের দেশে সীতা, সাবিত্রী, গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হইবে। দেশাচারের ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন, স্পন্দনহীন হইয়া তোমাদের মেয়েরা এখন কী যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা একবার পাশ্চাত্য দেশ দেখিয়া আসিলে বুঝিতে পারিতে। মেয়েদের ওই দুর্দশার জন্য তোমরাই দায়ী। আবার দেশের মেয়েদের পুনরায় জাগাইয়া তোলাও তোমাদের হাতে রহিয়াছে। সেই জন্যই বলি, কাজে লাগিয়া যাও। মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলিয়া তাহাদের মানুষ করিতে বলি। মেয়েরা মানুষ হইলে তবে তো কালে তাহাদের সন্তান-সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে—বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জাগিয়া উঠিবে।

আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, রমণীগণকেও ঠিক তাহাই বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা স্থাপন কর; তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধ; ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিতা না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর; আর স্মরণ রাখিও, আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে বটে, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের সহস্রগুণে অপরকে দিবার আছে। দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম প্রচার করিলে, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি এক মহান তরঙ্গ উঠিবে যাহা সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। এই মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী ও উভয়ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোনো নারীর এই সাহস হইবে না? প্রভু জানেন।

উৎস : 'শিক্ষাপ্রসঙ্গ', উদ্বোধন কার্যালয়, ৩য় সং (ভাদ্র ১৩৬৫)

# স্ত্রীশিক্ষায় বিদ্যাসাগর

## চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহোদয়ের সাহায্যে ও ভারতবন্ধু প্রাতঃস্মরণীয় জে. ই. ডি. বেথুন মহোদয়ের উদ্যোগে, কলিকাতা মহানগরীতে বর্তমান স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হইলেও, ইহার অনেক পূর্বে কলিকাতার নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত ও বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টে দেখা যায় যে, উক্ত বৎসরের পাঠশালার পরীক্ষা গ্রহণ কালে দরিদ্র পরিবারের প্রায় ৪০টি বালিকা পরীক্ষা দিয়া নানাবিধ পারিতোষিক পাইয়াছিল। বালিকাগণের পরীক্ষা গ্রহণে সন্তুষ্ট হইয়া হিন্দুপ্রধান রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর লিখিয়াছিলেন : 'মহিলা শিক্ষাসমিতি দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকাদিগকেও পরীক্ষা করা গেল, তাহাদের পড়া বানান অতিশয় সন্তোষজনক।'[১] ইহা হইতে বেশ জানা যাইতেছে যে, ঐ বৎসরের পূর্ব হইতে কলিকাতায় বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছিল। উক্ত বৎসরের সন্তোষজনক ফল দর্শনে উৎসাহিত হইয়া উক্ত সমিতির কর্তৃপক্ষ, শোভাবাজার, শ্যামবাজার, জানবাজার ও ইটিলিতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর উক্ত সমিতির হস্তে স্বরচিত 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি প্রদান করেন। স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা বুঝাইবার জন্য এবং উহা যে উচ্চশ্রেণির ভদ্রসন্তানদের রীতিনীতির সম্পূর্ণ অনুমোদিত ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি উক্ত প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয়া সুশিক্ষিতা আর্য মহিলাগণের নামোল্লেখ দ্বারা তিনি স্ত্রীশিক্ষার গৌরব বর্ধন করিয়া উক্ত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, এবং আরও বলিয়াছিলেন যে 'যদি এই স্ত্রীশিক্ষাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়, তবে ইহার দ্বারায় প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।'[২] আমরা এই 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি, এবং তাহা হইতে দুই-

১ Raja Radhacaunt in his Report says, 'Several native girls educated by the Female Society were also examined whose proficiency in reading and spelling gave great pleasure.' Biography of David Hare by Pyary Chand Mittra. Page. 53.

২ Raja Radhacaunt offered the Society, the manuscript of a pamphlet in Bengali the 'Stri Siksha Vidhayaka' on the subject of female education the object of which

একটি আধুনিক অত্যাশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না; 'আর এইক্ষণকার স্ত্রীদিগের মধ্যেও দেখ। মুরশিদাবাদে বারেন্দ্র শ্রেণি ব্রাহ্মণী রানি ভবানী ছিলেন, তিনি বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আপন রাজ্যের তাবৎ বিষয়কর্মের হিসাব আপনি দেখিয়া ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করিতেন।......আর রাঢ়ীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণকন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার নামে এক জন ছিলেন, তিনি বাল্যকালে নিজ গৃহকার্যের অবকাশে অধ্যয়নাদি করিয়া ক্রমে ক্রমে এমন পণ্ডিত হইলেন যে, সকল শাস্ত্রের পাঠ দিতেন। পরে তিনি কাশীতে বাস করিয়া গৌড়দেশীয় ও তদ্দেশীয় অনেক লোককে পড়াইতে পড়াইতে তাঁহার সুখ্যাতি দেদীপ্যমানা হইয়া সেখানকার সকলে তাহাকে অধ্যাপকের ন্যায় নিমন্ত্রণাদি করিতেন এবং তিনিও সভায় আসিয়া সকল পণ্ডিত লোকের সহিত বিচার করিতেন। এবং জেলা ফরিদপুরের কোটালিপাড়া গ্রামে শ্যামাসুন্দরী নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্যাকরণাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া ন্যায় দর্শনের শেষ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীও মহামহোপাধ্যায়। ইহা অনেকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। এবং কলিকাতার রাজবাটীর[৩] সকলেই প্রায় লেখাপড়া জানেন।'[৪] এইরূপ উৎসাহ পাইয়া তিন-চারি বৎসর এই মহিলা শিক্ষা-সমিতির কার্য বেশ চলিয়াছিল। অনেকগুলি বালিকা বাৎসরিক, ষাণ্মাষিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় রাজা রাধকান্ত দেবের বাটীতে উপস্থিত হইত। কিন্তু পরিশেষে এই শুভানুষ্ঠানের প্রথম অঙ্কুর অর্থাভাবের উত্তপ্তক্ষেত্রে পড়িয়া শুষ্ক হইয়া যায়। সকলের সমান আগ্রহ না থাকায় এবং যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে না পারায়, ইহা সূচনাতেই বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ইহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিসমাপিত হইলে পরবর্তী ২৫ বৎসর কাল ইহা শ্মশানভস্মরূপে জনসাধারণে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছিল। শাপগ্রস্তা অহল্যা যেমন যুগযুগান্তর ধরিয়া পাষাণ কলেবরে কালাতিপাত করিতে করিতে সহসা শ্রীরামচন্দ্রের চরণস্পর্শে স্বমূর্তি পরিগ্রহ করিল ও নিজ কর্তব্য সাধন মানসে আপনার পথে চলিয়া গেল, তেমনি মানব-কুলের মুকুটস্বরূপ দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন বেথুন-সমাগমে শ্মশানভস্মের-প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। নূতন উৎসাহে নূতন করিয়া স্ত্রীশিক্ষার সূচনা হইল। বেথুনের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না, তিনি কায়মনোবাক্যে বঙ্গীয় অবলাকুলের কল্যাণ সাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। যে কাজে যেমন গুরু, সেকাজে তেমনি শিষ্যও জুটিয়া থাকে। বেথুন বড়ো [লাটের] দরবারের ব্যবস্থাসচিব ছিলেন। বেতন পাইতেন অনেক টাকা। মান সম্ভ্রমে বড়ো লাটের প্রায় তুল্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু ব্যবহারে সরল অমায়িক লোক—বালকসদৃশ ছিলেন। তাঁহার নিকটস্থ হইলে তাঁহার সহিত কথা কহিলে বোধ হইত না যে, বড়ো লাটের বড়ো দরবারের ব্যবস্থা সচিবের নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছি, বোধ হইত যেন আপনাদের কোনো প্রবীণ আত্মীয় কিম্বা গুরুজনের সহিত আলাপ করিতেছি। এতদৃশ গুণসম্পন্ন মহাত্মা না হইলে কি এই নিগ্রহগ্রস্ত কৃষ্ণকায় জাতির প্রতি তাঁহার এমন গভীর

was to show that female education was customary among the higher classes of Hindus, that the names of many Hindu females celebreated for their attainments were known, and that female education, 'if encouraged will be productive of most beneficial effects.'' Page 55, Biography of David Hare.

৩ শোভাবাজার রাজবাটী।

৪ স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক, ১৫।১৬ পৃষ্ঠা।

প্রেমের সঞ্চার হইত? পরোপকারপরায়ণ বেথুন বঙ্গীয় ললনাগণের সুশিক্ষা সাধনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আর এক জন কৃষ্ণকায় মহাপুরুষ পশ্চাৎ হইতে বেথুন-হৃদয়কে বঙ্গীয় কুলকন্যাদের কল্যাণ সাধনে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন; ইনিই অমরকীর্তিসম্পন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়। এই সময়ে একবার হুগলি, ঢাকা, কৃষ্ণনগর ও হিন্দু কলেজের সিনিয়ার ডিপার্টমেন্টের ছাত্রগণের পরীক্ষায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা রচনার পরীক্ষক নিযুক্ত হন, তিনি স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, রচনার বিষয় নির্ধারিত করেন। পরীক্ষায় কৃষ্ণনগর কলেজের নীলকমল ভাদুড়ী সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া এক স্বর্ণ মেডেল প্রাপ্ত হন। উক্ত প্রবন্ধ সে সময়ের সংবাদ পত্রে ও শিক্ষা বিভাগীয় রিপোর্টে মুদ্রিত হইয়াছিল। পারিতোষিক বিতরণ সভায় স্ত্রীশিক্ষার পরম বন্ধু বেথুন উপস্থিত ছিলেন, এবং উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের সদুপায় অবলম্বনের জন্য এবং বঙ্গদেশের নানা স্থানে ইংরাজি ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বদাই বেথুন-ভবনে গমন করিতেন। এই যাতায়াতে পরস্পরের মধ্যে গভীর আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল।

বেথুন সে সময়কার শিক্ষা সমিতির সর্বাধ্যক্ষ বা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপূর্বে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনপূর্বক বিষয় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শেলি, ময়েট প্রভৃতি শিক্ষা বিভাগীয় সম্ভ্রান্ত কর্মচারীগণের এতই শ্রদ্ধা ও সমাদরের পাত্র হইয়াছিলেন যে, শিক্ষা বিভাগের কোনো কর্মই প্রায় তাহার পরামর্শ ব্যতীত সম্পন্ন হইত না। অতি অল্প দিনের মধ্যে বেথুন ও বিদ্যাসাগরের সহোদরাধিক ভ্রাতৃভাবের সূত্রপাত হইবার ইহাও একটি কারণ। ক্ষুদ্রকায়া তটিনী যেমন পর্বতদেহ অতিক্রম করিয়া নিম্ন দিকে অবতরণ করিতে করিতে বৃহদায়তনা হইয়া প্রবল আবর্তে সাগরাভিমুখে ধাবমানা হয়, বেথুন-বিদ্যাসাগর সৌহার্দও সেইরূপ ত্বরিতগতিসম্পন্না স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবলতর ও গভীরতর আকার ধারণ করিল, সেকালে বেথুন ও বিদ্যাসাগরের সখ্যই বঙ্গমহিলাগণের সৌভাগ্যাকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল, সেই বন্ধুতার ফলস্বরূপ স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সংসাধিত হইয়াছে। এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা এই, যেন সেই মণিকাঞ্চন-যোগ-প্রসূত অমৃতধারা চির-প্রবাহিত থাকিয়া বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহার সিদ্ধিকামনায় তিনি নিজের শরীর, মন, ধন, মান, সুখ ও সম্পদ—সকলেই উৎসর্গ করিতে সর্বদা মুক্তহস্তে অপেক্ষা করিতেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা, তাঁহার এতাদৃশ গুণাবলির চিরপক্ষপাতী ছিলেন। গুণময় বিদ্যাসাগর-বন্ধুমণ্ডলী শত শত বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া বেথুন-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অগ্রসর হইলেন। এই কার্যে সহায়তা করিতে গিয়া, সে সময় যাহারা সমাজকর্তৃক নিপীড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজা দক্ষিণারঞ্জন, ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ৺শম্ভুনাথ পণ্ডিত, ৺রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বহুসম্মানাস্পদ মহোদয়গণের নামাবলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা এরূপ ভাবে এই কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন যে, ইঁহারা প্রত্যেকেই বেথুন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ইঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার জন্য সে সময়ে ইঁহাদিগকে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা সে উপদ্রবকে উপদ্রব বলিয়া মনে করেন নাই। দৌরাত্ম্যের ভাগটা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপরেই কিছু অধিক হইয়াছিল। কারণ সকলের মধ্যে

তিনিই আবার তাঁহার ভুবনমালা ও কুন্দমালা নাম্নী কন্যাদ্বয়কে সর্বাগ্রে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এজন্য লোকের বিদ্বেষের পরিমাণটা তাঁহাকেই মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছিল। এ কার্যের জন্য উপরোক্ত ব্যক্তিগণের প্রত্যেককেই নানা প্রকারে ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল; এমন কি সে সময়ে সংবাদপত্র সকলও ইঁহাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

বেথুন, বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ও উন্নতি সাধনকল্পে আপনাকে নিযুক্ত করিলেন। বেথুন, বিদ্যাসাগর সমভিব্যবহারে সর্বদাই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসিতেন। ডেভিড্ হেয়ারের ন্যায় বেথুনও আসিবার সময়ে বালিকাদিগের জন্য নানা প্রকার খেলিবার দ্রব্য সঙ্গে লইয়া আসিতেন। বিদ্যালয়ে আসিয়া বালিকাদিগকে ওই সকল খেল্না দিতেন এবং বালক সাজিয়া তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতেন। প্রমাণ: 'তিনি প্রায়ই স্বভবন গমনকালে ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে উভয়কক্ষে ধারণ করিয়া স্বীয়াবাসে লইয়া যাইতেন। তাহাদের বালিকাসুলভ জুগুপ্সিত অত্যাচার সকল তিনি আহ্লাদপূর্বক সহ্য করিতেন। ভুবনমালা ও কুন্দমালা বেথুনের এতদূর স্নেহভাজন হওয়াতে লেডি ড্যাল্‌হাউসি প্রভৃতিও তাহাদিগকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন।'[৫] এইভাবে বিদ্যালয়ের কার্য বেশ সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। বেথুনের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে অল্প দিন মধ্যে বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ হইতে লাগিল। এত দিন বিদ্যালয়ের পৃথক আলয় ছিল না। বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্যোগী দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্থানাভাব নিবন্ধন কিছুদিন পরে, সেখান হইতে গোলদীঘির দক্ষিণপূর্ব কোণের বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের বাটী নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। বালিকাদিগকে বিনা বেতনে ও তৎপরে অল্প বেতনে পড়ানো হইত। শিক্ষকগণের বেতনের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হইত, তাহাও অধিকাংশ বেথুন আহ্লাদ সহকারে নিজ হইতে ব্যয় করিতেন। বালিকাদিগকে বাড়ি হইতে গাড়ি করিয়া আনিতে হইত, সেজন্যও মাসে মাসে অনেক অর্থ ব্যয় হইত। সমগ্র ব্যয়ের অধিকাংশই বেথুন সাহেব নিজে গ্রহণ করিয়া এই বালিকা বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকালে বেথুন গঙ্গার পরপারে প্রায় ৫।৬ ক্রোশ দূরবর্তী জনাই গ্রামের বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধে সেখানকার বিদ্যালয় পরিদর্শন মানসে গমন করিয়াছিলেন। পথে বহুক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও বহুদূরব্যাপী কর্দমময় পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া তিনি জনাই গ্রামে উপস্থিত হন। সহৃদয় বেথুন উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু সেই তাঁহার শেষ কার্য হইল; সহসা তাঁহার দুরারোগ্য জ্বরের সূচনা হইল, এবং তিনি সেই পীড়ায় লোকলীলা সংবরণ করিলেন। বেথুন-বিয়োগে বিদ্যাসাগর বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। ভারতের পরম বন্ধু বঙ্গমহিলাগণের চিরসুহৃদ বেথুনের লোকান্তর গমনে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুকাল ধরিয়া অতি বিষণ্ণভাবে কালাতিপাত করিয়াছিলেন

৫ বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'মদনমোহন তর্কালংকারের জীবন চরিত, ২৩ পৃষ্ঠা।

এবং তৎপরে বেথুন-প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অনেক চিন্তা ও অনেক অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। শেষে নানা প্রকার মতদ্বৈধ নিবন্ধন তিনি বেথুন-বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার পরিত্যাগ করেন। প্রতিষ্ঠার সময়ে বিদ্যালয়ের নাম ছিল হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়। বেথুন নিজের উইলের দ্বারা এই বিদ্যালয়ের জন্য অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই অর্থে বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ হয় এবং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাঁহারই নামে উক্ত বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছে।

বেথুনের লোকান্তর গমনে বিদ্যালয় লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিপন্ন হন, তখন প্রাতঃস্মরণীয় গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর পত্নী সদাশয়া লেডি ক্যানিং বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে অগ্রসর হন, এবং ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে অর্থ ও সামর্থ্যের দ্বারা প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। লেডি ক্যানিং-এর চেষ্টায় রাজসরকার হইতে বিদ্যালয় রক্ষার জন্য বিশিষ্টরূপ চেষ্টা হইয়াছিল। সেই জন্য পরবর্তী অনেক ঘটনাসূত্রে উক্ত বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক সময়ে বেথুনের নামের দোহাই দিয়া এবং লেডি ক্যানিং-এর সহকারিতার উল্লেখ করিয়া বিদ্যালয়ের জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সেকালে বেথুন বিদ্যালয়ের যে গাড়িতে বালিকারা পড়িতে আসিত, তাহার গাত্রে 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়তিযত্নতঃ' এই শাস্ত্রবচন লিখিত থাকিত। এরূপ লিখিয়া দিবার তাৎপর্য এই যে, লোকে বুঝিবে যে স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রসম্মত ও সদাচারানুমোদিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের লোক সহজে কিছু বুঝিতে চায় না, অনেক স্থলে বুঝিয়াও বুঝে না, ষোল আনা বুঝিলেও তদনুসারে কাজ করিতে পারে না। এই স্ত্রীশিক্ষার স্রোত এত মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়া আমাদের কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে। সে কালের স্ত্রীশিক্ষা প্রচার তর্কালংকার ও বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মহাত্মাদের সহায়তায় যেরূপ সম্ভ্রম লাভ করিয়াছিল, বর্তমান কালেও মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয়, রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর প্রভৃতি মহোদয়গণের সহায়তা ও সংশ্রবে যে যথাবিধি পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কী? কিন্তু এক শ্রেণির লোক চিরদিনই সকল প্রকার সদনুষ্ঠানকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে ও তাহার দোষ প্রচার করিতে নিত্য ব্যস্ত। অন্যে ভাল খাইলে, ভাল পরিলে, অন্যকে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে দেখিলে, যাহাদের চক্ষু টাটায়, সেরূপ উন্নতিকাতর লোকমণ্ডলী চিরদিনই কোনো প্রকার সদনুষ্ঠানের সূচনা হইতে না হইতেই, তাহার সর্বনাশ সাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকে। ছায়া যেমন মনুষ্যের চিরসঙ্গী হইয়া সর্বত্র সমভাবে বিরাজ করে, কোনো প্রকার শুভানুষ্ঠানের সূচনাতে বিরোধীদলের অভ্যুদয়ও চিরসহচররূপে বিরাজিত থাকা তদনুরূপ অপরিহার্য। স্ত্রীশিক্ষা প্রচার তো একটা অতি বৃহৎ ব্যাপার, গোল আলু প্রচলন সময়ে সুসভ্য ইংলণ্ড ও আয়ারলণ্ডে একটা ছোটো-খাটো যুদ্ধ হইয়াছিল। কয়েকটা লোক সে বিরাট ব্যাপারে প্রাণ হারাইয়াছিল, অনেকে জখমও হইয়াছিল। যে গোল আলু ভারতে নির্বিবাদে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারই প্রথম প্রচলনে যখন সুসভ্য ইংরাজমণ্ডলীর মধ্যে একটা বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল, তখন আর স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রচলনে কেন যে ভারতে কুরুক্ষেত্রের সমর-প্রাঙ্গণ প্রকটিত হইবে না, ইহা আমাদের বোধাতীত। তবে একটা কথা এই যে, যাঁহারা গোল করেন তাঁহারাই

আপনাদিগকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং মনে করেন তাঁহারাই যেন ভারতের সুপবিত্র নামের মাহাত্ম্য রক্ষা করিতেছেন। এতাদৃশ সুসন্তানগণ যদি স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে খড়্গহস্ত হন, তবে তাঁহারা তদ্দ্বারা আপনাদেরই অপদার্থতার পরিচয় দিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। খনা ও লীলাবতীর নামে, সীতা ও সাবিত্রীর নামে, পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর নামে গৌরবস্ফীত বক্ষে ও উচ্চকণ্ঠে আত্মপ্রশংসা করিয়া তাহাতে হাবুডুবু খাওয়া তাহাদের ভালো দেখায় না। যে-দেশ গার্গী ও আত্রেয়ীর নামে গৌরবান্বিত, যে-দেশের শাস্ত্রবিশেষের গঠনকার্য রমণীর মুখনিঃসৃত ও পবিত্র উক্তি সকলের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, যে-দেশে আধুনিক কালেও স্ত্রীলোক বিদ্যালঙ্কার উপাধি পাইয়া অধ্যাপকমণ্ডলীর সভায় সমাদৃত, সে দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ দেশে অধঃপতনের পরিচয়স্থল।

অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে, স্ত্রীশিক্ষা তো এক প্রকার প্রচলিত হইয়াছে, তবে আর এ সকল কথার অবতারণা কেন? অবতারণার কারণ এই যে, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পরমবন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুনাম ও প্রতিষ্ঠার প্রতি দেশের লোকের অবজ্ঞা জন্মাইবার জন্য স্ত্রীশিক্ষার সংস্রবে এখনও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হিন্দুবুদ্ধির বিপর্যয় ঘটিয়াছিল বলিয়াই তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, সত্য সত্যই কি স্ত্রীশিক্ষা ধর্মবিরুদ্ধ সংস্কার, না সাময়িক দেশাচারবিরুদ্ধ সংস্কার? হিন্দু সমাজের অভিভাবক স্থানীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' রচনা করিয়া তাহাতে বলিয়াছেন :

'অতএব তাহাদিগকে যেমন গৃহকার্যাদি শিক্ষা করান তেমন বাল্যকালে যাবৎ বয়ঃস্থা না হয় তাবৎ বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত হয়।.....আর দ্বিতীয়ত কোন শ্রুতি ও স্মৃতিতে স্ত্রীলোককে বিদ্যাভাস করিতে নিষেধ বচন লিখেন নাই।.....নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্ত্রীলোককে পুত্রের ন্যায় পালন ও শিক্ষা করাইবেক, ইহাতে স্ত্রীলোককে পাঠ করান অবশ্য কর্তব্য হয়।......এখন সকলের উচিত হয় যে আপন আপন পরিজনের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া কোন বিদ্যাবতী স্ত্রীকে আনাইয়া বাটীতে রাখিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করান এবং যাহারা নির্ধন তাহাদিগকে অনুমতি দিয়া যাবৎ বয়ঃস্থা না হয় তাবৎকাল পাঠশালায় পাঠান।'[৬] তাঁহার বেলায় 'সাত খুন মাপ'! যখন রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া স্ত্রীশিক্ষা পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, নিজে বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন দোষ হয় নাই; দোষ হইল, যখন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মজ্ঞ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য অনুভব করিয়া এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! এখন সেই চিরনীরব ও পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র নামে নিন্দা-দাগ পাড়িতে অগ্রসর হওয়া কি ভাল দেখায়? আমরা বুঝিতে পারি না দুরদৃষ্ট কোন্‌টি? আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের ওইরূপ অসঙ্গত সমালোচনা, না বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারে সহকারিতা? জনৈক বিদূষী বঙ্গমহিলার কাব্য-কানন পরিভ্রমণ উপলক্ষে হিন্দুপ্রধান মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন : 'এই রচনাগুলি দেখিয়া স্ত্রীশিক্ষার যে সুফল ফলিয়াছে,

৬ রাজা রাধাকান্ত দেব প্রণীত 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক', ১৮।২০।২১।২২ পৃষ্ঠা।

ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে।' আর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়াছেন : 'একটি খাঁটি মন, একটি ঋজু হৃদয়, একটি সত্ত্বগুণের মূর্তি দেখিলাম। .......মনে হইয়াছে আমাদের স্থূল প্রাণীকে নিষ্কাম বিশ্বজনীন ধর্মে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, এমন প্রাণীও দেশে এখনও আছে।'[৭] বর্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষাবিরোধীদলের অসার ও ভ্রান্ত মতের এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত প্রতিবাদ আর কী হইতে পারে?

নারিকেলের জল উত্তম বস্তু, কিন্তু কাংস্য পাত্রস্থ হইলে তাহার উৎকৃষ্টতা লোপ পায়—তাই বলিয়া কি ডাবের জল চিরনিষিদ্ধ, কেহ আর ডাবের জল পান করিবে না? পাত্রদোষে স্ত্রীশিক্ষার ফল মন্দ হইতে পারে, তাই বলিয়া জনসমাজের অর্ধাধিক লোককে নিরক্ষর করিয়া রাখাই কি বুদ্ধিমানের কাজ? সে হিসাবে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্বোধ লোক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁহারাই মনুষ্যোচিত কার্য করিয়া জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে যাঁহারা বেথুন-বিদ্যালয়ের সহিত সংসৃষ্ট আছেন, তাদৃশ কোনো ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বেথুন-স্কুলের সংবাদ লইতেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির বৎসরাধিককাল পূর্বে, একদিন, তাঁহার প্রাচীন বন্ধু বোলপুর নিবাসী ঁপ্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয় তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহের বিলাত যাওয়ার সম্ভাবনা নিবন্ধন পুত্রবধূ শ্রীমতী সুশীলাবালা সিংহকে বেথুন কলেজে স্থায়ীভাবে ভর্তি করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লেখেন, তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় হেমেন্দ্রবাবুর পত্নী সুশীলাবালাকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে গিয়া, বালিকা ও শিক্ষায়িত্রীদিগকে দেখিয়া আনন্দে অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন। আসিবার সময়ে সকলের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। সত্যযুগের একটি ঝি তখনও জীবিত থাকিয়া পুরাতন কীর্তি কাহিনীর স্মৃতি রক্ষা করিতেছিল, সে সম্মুখে আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে যখন প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল এবং সেই পুরাতন কথা সকল স্মরণ করাইতে লাগিল, তখন মধুর প্রকৃতি বিদ্যাসাগর-হৃদয় উথলিয়া উঠিল, সাগরে তুফান দেখা দিল, বানের জলের ন্যায় চক্ষু হইতে সবেগে জলধারা প্রবাহিত হইল। স্কুলের দালানে বেথুনের প্রস্তরমূর্তির সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বহুক্ষণ অশ্রুপাত করিলেন। সেই পুরাতন দাসীকে নূতন বস্ত্র দিয়া আর সকলের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া গৃহে আসিলেন। শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া, দালান হইতে প্রাঙ্গণে অবতরণ কালে দেখিলেন যে, ৩।৪টি শিক্ষক মাত্র তাঁহার স্নেহ প্রদর্শনে বঞ্চিত হন, তখন সঙ্গে পালকি বেহারাদের জন্য একটি টাকা ছিল, তাহাই তাঁহাদের একজনের হাতে দিয়া বলিলেন, 'এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে, তোমরাও এই যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিও, বাদ যাওয়া বিধেয় নহে।' গৃহে আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সুনির্মল নীলাকাশসদৃশ স্বচ্ছ হৃদয় বিষাদ মেঘে আবৃত হইল। তাঁহাকে অনেক সময়ে দেখিয়াছি, কিন্তু সে দিন সে মুখমণ্ডলে যে ঘোর বিষাদের ছায়া দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম[৮] সেরূপ অতি অল্পই দেখিয়াছি।

৭ শ্রীমতি মানকুমারী প্রণীত 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি'র সমালোচন-পুস্তিকা।

৮ তিনি বেথুন-স্কুল হইতে আসিয়া যখন একাকী কালাতিপাত করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম।

অতিমাত্র ব্যাগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার অসুখ কি খুব বাড়িয়াছে?' কোনো জবাব নাই। ক্ষণকাল পরে অঙ্গুলি সংকেত দ্বারা আমাকে সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিতে বলিলেন। আস্তে আস্তে বসিলাম। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, 'না আমার অসুখ বাড়ে নাই। যেমন তেমনি আছে, আমি বলিলাম, 'তবে আপনাকে এত কাতর দেখিতেছি কেন?' তিনি বলিলেন, 'বেথুন স্কুলে গিয়াছিলাম, সব দেখে শুনে বড়ই সুখ হইল।' আমি হতভাগ্য, সাগরের তরঙ্গভঙ্গির তলদেশে কী অমূল্য রত্ন লুক্কায়িত আছে, তাহা না বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাতে দুঃখ কী? সেই বীরপুরুষ বীরোচিত আগ্রহ সহকারে বলিলেন, 'এতগুলি মেয়ে লেখাপড়া শিখিতেছে, তারাই আবার সেই স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কার্য করিতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিল, সে দেখিল না। নিজের পদমর্যাদা ভুলিয়া যে ব্যক্তি বালিকাদের সঙ্গে খেলা করিত, আর নিজে ঘোড়া হইয়া, হামা দিয়া, বালিকাদিগকে পিঠে তুলিয়া ঘোড়ায় চড়াইত, যাহার পিঠের উপর বালিকারা বসিয়া খেলা করিত সে দেখিল না!' এই বলিতে বলিতে অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি নিজের পরিধেয় বস্ত্রে আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

পাঠককে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, বেথুন-স্মৃতিই বিদ্যাসাগরহৃদয়ে শোক-প্লাবন প্রবাহিত করিয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সন্দর্শনে তাঁহার উদার হৃদয়ে আনন্দের যে বিজলী-লীলা বিকশিত হইতেছিল সুহৃৎশোকজনিত ঘন অন্ধকারে তাহা অচিরে লুক্কায়িত হইল। তিনি গভীর বিষাদভরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'কী লোকই আসিয়াছিল!'

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কেবল কলিকাতার বেথুন-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন কার্যে সহায়তা করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। পূর্বে আমরা বলিয়াছি, ছোটোলাট হ্যালিডে সাহেবের বাচনিক আদেশে মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলি ও নদিয়া জেলার নানাস্থানে বহুসংখ্যক বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং সেই সকল বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লইয়াই শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত স্থায়ী মনান্তরের সূচনা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ওই সকল বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিতে ছোটোলাট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু সে অনুরোধ সম্বন্ধে কোনো সরকারি কাগজপত্র কিংবা লিখিত আদেশ ছিল না। কাজে কাজেই অনাত্মীয়তা স্থলে ইয়ং সাহেব বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন ও তাহার উন্নতিকল্পে অর্থব্যয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং সে চেষ্টায় কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। ওই চারি জেলার নানাস্থানে প্রায় পঞ্চাশটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সমুদায়-ব্যয়ভার নিজস্কন্ধে গ্রহণ করা বড়ো সহজ ব্যাপার ছিল না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে দুইজন পণ্ডিত ও একটি করিয়া দাসী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। ইহাদের বেতন ভিন্ন অন্য ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল; বালিকারা বিনা বেতনে পড়িত। তাহাদের পাঠ্যপুস্তক, লিখিবার কাগজ, শ্লেট, পেন্সিল, সমস্তই দিতে হইত। এই বৃহৎ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া কর্ম পরিত্যাগ করায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছিল।

বালিকাবিদ্যালয় বিষয়ক বিল মঞ্জুর না হওয়াতে, ছোটো লাট বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিজের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পরমার্শ দেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি কখনও কাহারও নামে নালিশ করি নাই, অতএব আপনার নামে কী প্রকারে অভিযোগ করিব, ওই টাকা আমি নিজে ঋণ

করিয়া পরিশোধ করিব।'[৯] বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কর্তৃপক্ষের এইরূপ আচরণে মর্মাহত হইয়া কেবল ঋণভার স্কন্ধে লইয়াছিলেন তাহা নহে, পাঁচশত টাকার চাকুরিটি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং ওই সকল বালিকাবিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব বিষয়েও তৎপরে বহুদিন পর্যন্ত আগ্রহসহকারে নিযুক্ত ছিলেন। এই কার্যে তাঁহার ইংরাজ বন্ধুদের কেহ কেহ মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। স্যার সিসিল বিডনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে স্যার সিসিল বিডন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে পত্র লিখেন, তাহার কিয়দংশ : 'প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়,.....এই বৎসরের এপ্রিল, মে, জুন এই তিন মাসের বালিকাবিদ্যালয়ের ফণ্ডের মাসিক চাঁদা হিসাবে, এতৎসহ ১৬৫ টাকার একখানি হুন্ডি পাঠাইতেছি।'[১০]

দার্জিলিং, ১৭ আগস্ট, ১৮৬৬

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা সমীপে

প্রিয় মহাশয়,

এক্ষণে আহ্লাদ সহকারে আমি বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য স্যার সিসিল বিডনের ১৮৬৬ সালের প্রথম অর্ধেকের মাসিক চাঁদা হিসাবে ৩৩০ টাকার একখানি হুন্ডি পাঠাইতেছি। চেক বইখানি কলিকাতায় ফেলিয়া আসায় এইরূপ বিলম্ব হইয়াছে।

আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন

(স্বাক্ষর) এইচ্ রাবান্

এই সকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলি বহুকাল জীবিত থাকিয়া বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের প্রচুর সহায়তা করিয়াছে। এই সমুদায় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামেও একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতের বেতন ও বালিকাদিগের পাঠ্যপুস্তকাদি হিসাবে মাসে মাসে অন্যূন ৩০ টাকা ব্যয় হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুকাল ধরিয়া এই ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্যার বার্টল ফ্রেয়ারকে যে সুবৃহৎ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করা গেল : ''আপনি নিশ্চয়ই শুনিয়া সুখী হইবেন যে মফঃস্বলের যে সকল বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে আপনি অনুগ্রহ করিয়া সাহায্য করিয়াছেন, সে সকল বিদ্যালয়ের কার্য বেশ চলিতেছে। কলিকাতার নিকটবর্তী জেলা সমূহে স্ত্রীশিক্ষার আদর ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে এবং এক একটি করিয়া বালিকাবিদ্যালয়ও সময়ে সময়ে স্থাপিত হইয়াছে।'

তিনি কোনো কার্যের ভার লইয়া প্রতিকূল ঘটনা নিবন্ধন তাহা ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। ধরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, করিতে বসিয়া না করা, আশ্বাস দিয়া নিরাশ করা,

৯ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জীবনচরিত, ১২৮ পৃষ্ঠা।

১০ My dear Pundit.......I enclose a cheque for Rs. 165 on account of my subscription to your Female School Fund for April, May & June 1863—Yours very truly, C Beadon

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। শত শত বাধা বিঘ্ন, অভাব ও অসুবিধায় পড়িয়াও যখন তিনি এইরূপে নিজ ব্যয়ে ও বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় ওই সকল বিদ্যালয়ের প্রাণ রক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে পরহিতৈষণাব্রতধারিণী কুমারী কার্পেন্টার ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। বালিকা কার্পেন্টার মহাত্মা রামমোহন রায়কে দেখিয়া অবধি ভারতবর্ষকে ভালোবাসিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলেন, 'রাজা রামমোহন রায়ই তাহার মনে ভারতের হিতসাধনেচ্ছা প্রথম উদ্দীপ্ত করিয়া দেন।'[১১] তিনি জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বক্তৃতা বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষবাসী নরনারীমণ্ডলীকে আরও অধিকতর স্নেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মিস্ কার্পেন্টারের শুভপদার্পণে ভারতের নানাস্থানে অভ্যর্থনা ও সমারোহের বহুবিধ আয়োজন হইয়াছিল। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী উপনগর সকলেও সেরূপ অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় নাই। বরাহনগর ও উত্তরপাড়ার অনুষ্ঠানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুমারী কার্পেন্টার কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া বেথুন-সুহৃদ্ ও অবলাবান্ধব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। তদনুসারে তদানীন্তন ডিরেক্টর অ্যাট্‌কিন্‌সন্ সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক পত্র লিখেন, সেই পত্র এই :

২৭শে নভেম্বর, ১৮৬৬

প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়,

মিস্ কার্পেন্টারের নাম অবশ্যই আপনি শুনিয়া থাকিবেন। তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও ভারতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিষয় আলাপ ও সে সম্বন্ধে তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে চাহেন। আপনি কি আগামী বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারটার সময় বেথুন স্কুলে আসিতে পারেন? আমি তাঁহাকে সেই সময়ে, বেথুন বিদ্যালয় প্রথম দেখাইবার জন্য লইয়া যাইব। একটু গোপনভাবেই যাওয়া হইবে, আমাদের সঙ্গে অপর কেহ থাকিবে না, সেই জন্য আপনার সহিত আলাপ করাইয়া দিবার বেশ সুবিধা হইবে। ইহার পর আর এক সময়ে বিদ্যালয়ের কমিটির সভ্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্ভবত তিনি খুব সম্মত। মিস্টার সিটন কার যতদিন কলকাতায় ফিরিয়া না আসেন, ততদিন ওইরূপ প্রকাশ্যভাবে সকলে সহিত আলাপ স্থগিত রাখাই ভালো।

একান্ত আপনারই
ডব্লিউ. এস. অ্যাট্‌কিন্‌সন্

মিস কার্পেন্টারের সহিত পরিচয় হইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রপাত হইল। আলাপ পরিচয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এমন কি মিস্ কার্পেন্টার যেখানে যখন যাইতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিতেন। সকল স্থানে না হইলেও কোনো কোনো স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয় মিস্ কার্পেন্টারের সঙ্গী হইতেন। উত্তরপাড়া বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় মিস্ কার্পেন্টারের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সঙ্গে গিয়াছিলেন। উড্রো ও অ্যাট্‌কিন্‌সন্ সাহেবও

১১ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, ২২২ পৃষ্ঠা।

সেই সঙ্গে ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি বগিগাড়িতে বালি স্টেশন হইতে উত্তরপাড়া যাইতেছিলেন, উত্তরপাড়ার অতি নিকটে পথে একস্থানে মোড় ফিরিবার সময়ে গাড়িখানি উলটাইয়া পড়ে, সেই পতনে বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ি হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হন। গুরুতর আঘাতে আহত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া রাজপথের অনতিদূরে তিনি একস্থানে পতিত হইলেন, ঘোড়াও গাড়ি সমেত অন্যত্র পতিত হইল। তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া পথের লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিতেছিল, কিন্তু কেহই তাঁহার সহায়তায় অগ্রসর হয় নাই। মিস্ কার্পেন্টারের গাড়ি আসিলে পর তিনি সেই লোকরণ্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ওইরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সত্বরপদে নিকটে গেলেন এবং তিনি সেই পথের পার্শ্বে নিম্নভূমিতে বিদ্যাসাগরকে ক্রোড়ে তুলিয়া বসিলেন এবং রুমাল দিয়ে মুখ মুছাইয়া দিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে আমাদিগকে বলিয়াছেন : 'যখন আমার চেতনা হইল, আমার বোধ হইল যেন আমার মাতৃদেবী আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছেন, আর স্নেহভরে পুত্রের সেবা করিতেছেন। স্বশরীরে সেই একবারে স্বর্গভোগ করিয়াছিলাম। সে দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও আমি মিস কার্পেন্টারের সেই স্নেহপূর্ণ বাৎসল্য লাভ করিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম।' বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন তখন তাঁহার মুখের ভাবে ও অশ্রুজলে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ গভীর ভক্তির চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছিল। এই শকট হইতে পতনই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুস্থ শরীরে রোগ, সবল শরীরে দুর্বলতা এবং শান্ত চিত্তে অশান্তির সূত্রপাত করিল। তাঁহার যকৃতে গুরুতর আঘাত লাগে। তাঁহার দেহ অপটু হইল, তাঁহার স্বাস্থ্য নাশ হইল। মধ্যাহ্ন সূর্যের তীক্ষ্ণ তেজ ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় পড়িয়া যাওয়াতে সে সময়ে চরিদিকে এক মহা হুলস্থূল পড়িয়াছিল এবং সে সময়ের সুবিখ্যাত গায়ক ধীরাজ এই ঘটনা অবলম্বনে এক গীত রচনা করিয়াছিলেন।

('বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর' গানের সুর)
অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে,
করে তুলেছে তোলাপাড়ি, এবার নাইকো ছাড়াছাড়ি,
মিস্ কার্পেন্টার সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে।
কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই সবই দেখেছে,
এখন এসে কলকেতাতে (এবার) বাঙালিদের নে' পড়েছে।
উত্তরপাড়া স্কুল যেতে, বড়ই রগড় হলো পথে,
এট্‌কিসন্ উড্রো আর সাগর সঙ্গেতে।
নাড়া চাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে,
গাড়ি উল্টে পল্লেন সাগর, অনেক পূণ্যে গেছেন বেঁচে।।[১২]

সেই পতনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যকৃতে এরূপ গুরুতর আঘাত লাগিয়েছিল যে, ওই স্থানের বেদনায় তাহাকে পুনঃ পুনঃ শয্যাশায়ী হইতে হইয়াছিল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল

---

১২ শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত বিদ্যাসাগর-বিষয়ক পুস্তিকা, ১৬ পৃষ্ঠা।

সরকার প্রভৃতি সুযোগ্য চিকিৎসকগণ যকৃত-স্ফোটক (লিবার অ্যাবসেস্) হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। মিস্ কার্পেন্টার দীর্ঘকাল কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন, এবং সর্বদা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংবাদ লইতেন। কলিকাতা ত্যাগের কিছু পূর্বে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা এই :

প্রিয় মহাশয়,—আপনি পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম; এবং সেই জন্য আমার ভয় হইতেছে যে, আগামী বুধবার প্রাতঃকালে আমার কলিকাতা ত্যাগের পূর্বে আপনার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না।

আমি আগামী কল্য অপরাহ্ণ চারিটার সময়, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য অনেকগুলি দেশীয় বন্ধুকে আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, সম্পূর্ণরূপে সুস্থ থাকিলে, আশা করি, আপনিও আসিবেন।

আপনার চিরবিশ্বাসভাজন,
মেরি কার্পেন্টার

বেথুন স্কুলে স্বতন্ত্রভাবে কতকগুলি মহিলাকে শিক্ষয়িত্রী হইবার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়, মিস্ কার্পেন্টারের এইরূপ ইচ্ছা ছিল, এবং যাহাতে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়, সে বিষয়েও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, চেষ্টা কার্যে পরিণত হইয়াও স্থায়ী হয় নাই। স্থায়ী হইলে ফল কীরূপ হইত বলা যায় না।

স্যার উইলিয়ম গ্রে, মিস্টার সিটনকার, মিস্টার অ্যাট্‌কিন্‌সন্ প্রভৃতি সাহেবগণ এবং বাঙালিদেরও কেহ কেহ মিস্ কার্পেন্টারের উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এই প্রস্তাবে বিরোধী হইয়াছিলেন। তাঁহার স্থায়ী সহানুভূতির অভাবেই, প্রধানত উক্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করার জন্য মিস্ কার্পেন্টারের প্রস্তাবমতো বেথুন বিদ্যালয়েই একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য স্যার উইলিয়ম গ্রে বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং সেই কার্যের ঔচিত্যানৌচিত্য অবধারণের জন্য ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর একখানি দীর্ঘ পত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। সে পত্রে তিনি শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করণের পক্ষ সমর্থন ও তদভাবে বেথুন বিদ্যালয়ে বহু অর্থ ব্যয় যে বৃথা হইতেছে, তাহার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে যুক্তি প্রণালী অবলম্বনে তাঁহার প্রত্যেক কথার প্রতিবাদ করিয়া নিজের মত প্রবল রাখেন এবং যে বৃহৎ পত্রখানির চাপে সে সময়ের সে প্রবল আয়োজন বিফল হইয়া গিয়াছিল, তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল। সেই পত্র পাঠে দেখা যায় যে, তিনি কেমন সুন্দর উপায়ে সকল দিক বজায় রাখিয়া উন্নতি সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা এত অধিক মাত্রায় অনুভব করিতেন বলিয়া, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের সেই প্রথম অবস্থায়—দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া অতিমাত্রায় অগ্রসর হওয়ায় পাছে সমূলে সর্বনাশ সাধন হয়, এই আশঙ্কায় সর্বদা সতর্ক হইতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সুবিবেচনা-পরিচালিত পথে স্ত্রীশিক্ষার শৈশবকাল কাটিয়াছিল বলিয়াই আজ স্ত্রীশিক্ষার স্রোত কথঞ্চিৎ প্রবল গতিতে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে। তিনি যে যুক্তিমার্গ অবলম্বনে উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পত্রে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই পত্রখানি এই ঃ

কলিকাতা
১লা অক্টোবর, ১৮৬৭

মাননীয় স্যার উইলিয়ম গ্রে
প্রিয় মহাশয়,

আপনার সহিত শেষ দেখা হওয়ার পর আমি বিশেষ সাবধানতা সহকারে অনুসন্ধান করিয়াছি, এবং বিশেষভাবে চিন্তাও করিয়াছি কিন্তু মিস্ কার্পেন্টারের প্রস্তাবিত হিন্দুসাধারণের গ্রহণোপযোগী একজন শিক্ষয়িত্রী, বেথুন স্কুলের হউক, বা অন্যত্রই হউক, প্রস্তুত করার পথে বিষম অন্তরায় রহিয়াছে বলিয়া আমার যে ধারণা আছে, সে ধারণার পরিবর্তন করিবার কোনো কারণ দেখিতেছি না। এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আমি যতই চিন্তা করিতেছি, ততই আমার দৃঢ়রূপে এই প্রত্যয় জন্মিতেছে যে, হিন্দুভাব ও হিন্দুসমাজের বর্তমান অবস্থা এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিরোধী; ইহার দ্বারা কোনো শুভফলের প্রত্যাশা নাই বলিয়াই, আমি গভর্ণমেন্টকে সাক্ষাৎভাবে এই কার্যের ভার লইতে ন্যায়ত কোনো পরামর্শ দিতে পারি না। আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, কোনো সম্ভ্রান্ত হিন্দু তাঁহার বয়ঃস্থা আত্মীয়াগণকে শিক্ষয়িত্রীর কার্যে রত হইতে দিবেন না। তাহারা বর্তমান সময়ের সামাজিক নিয়মের অধীন হইয়া ১০/১১ বৎসরের বিবাহিতা বালিকাদিগকেও অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে দেন না। একমাত্র আত্মীয়-স্বজনশূন্য অসহায়া বিধবাদিগকে এরূপ কার্যে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এদেশীয় পুরনারীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে উপযুক্ত কিনা, সে প্রশ্ন না তুলিয়া, আমি কেবল এই বলিতে চাই যে তাহারা অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিলেই লোকের মনে আপনা আপনি নানা প্রকার সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কারণ উপস্থিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা গভর্ণমেন্টের এই অনুষ্ঠানের সাধু উদ্দেশ্য সহজেই বিনষ্ট হইবে।

এই বিষয়ের সফলতা সাধনের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি সরকারি বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত হইয়াছে—এ বিষয়ে (Grant-in-aid) অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হওয়াই, লোকসাধারণের মনের ভাব বুঝিবার সুন্দর উপায় বলিয়াই বোধ হয়। যদি এদেশের লোক মিস্ কার্পেন্টারের প্রস্তাবিত স্ত্রীশিক্ষাপদ্ধতি পছন্দ করে, তাহা হইলে অর্থসাহায্য চাহিয়া আবেদন করিলে, গভর্ণমেন্ট প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া তখন তাহাদের কার্যের সহায়তা করিতে পারেন। যদিও আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, এদেশের অধিকাংশ লোকই ওইরূপ সাহায্যের প্রার্থী হইবে না, তথাপি যে সকল লোক ইহার সফলতায় অতিমাত্র আশা স্থাপন করিতেছেন, সত্য সত্যই যদি তাঁহাদের আগ্রহ ও অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, গভর্ণমেন্ট প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ করিয়া এ অনুষ্ঠানের ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন।

আমি স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতেছি যাঁহারা এই অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী তাহাদের কার্যে আমার বিশেষ আস্থা নাই। কিন্তু ভারত গভর্ণমেন্টের প্রচারিত নিয়ম বিদ্যমান থাকিতে তাঁহাদের আর অনুযোগ করিবার কোনো সুযোগ থাকিবে না।

বলা বাহুল্য যে আমি স্ত্রীজাতির সুশিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা ও গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকি এবং যদ্যপি আমার স্বদেশীয়দিগের সামাজিক

সংস্কার এরূপ দুরতিক্রমণীয় বাধারূপে না দাঁড়াইত, তাহা হইলে সকলের অগ্রে আমি এই কার্যের পোষকতা ও সহকারিতা করিতে অগ্রসর হইতাম। কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, কোনোমতেই এ কার্যে কৃতকার্য হওয়া সম্ভবপর নহে, এবং গভর্ণমেন্ট এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে আপনারাই অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অপদস্থ হইবেন, তখন আমি কোনোমতেই এ কার্যে সহকারিতা করিতে সম্মত নহি।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে বেথুন স্কুলের উন্নতিকল্পে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, ফল তাহার অনুরূপ হয় নাই। এ বিষয়ে আপনার সহিত আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলি যে, তাই বলিয়া বিদ্যালয়টি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া আমার মতে কোনো প্রকারেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। ভারতে স্ত্রীজাতির জ্ঞানোন্নতির চিহ্নরূপে, যে পরসেবাব্রতপরায়ণ মহাত্মার নামে উক্ত বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছে, তাহাতে আমার বিবেচনায় ওই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে গভর্ণমেন্টের সাহায্য করা নিতান্ত কর্তব্য। তৎপরে ইহাও বাঞ্ছনীয় যে, এদেশের রাজধানীতে একটি সুপরিচালিত বালিকাবিদ্যালয় বিদ্যমান থাকিয়া মফস্‌সলের নানাস্থানের বালিকাবিদ্যালয়সমূহের আদর্শরূপে কার্য করিতে পারে। হিন্দু সমাজের উপর বর্তমান বিদ্যালয়টির নৈতিক শক্তির প্রভাব অনেক। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিদ্যালয়টি ইহার নিকটবর্তী জেলাসমূহে স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সাধন করিয়াছে। এইজন্য আমার বিবেচনায় বৎসর বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই বিদ্যালয়টি রক্ষা করাতে যে-লাভ হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু বোধ হয় চেষ্টা করিলে ব্যয়সংকোচ ও উন্নতি সাধন উভয়ই করা যাইতে পারে। সুবিবেচনা সহকারে চেষ্টা করিলে বিদ্যালয়ের কোনো ক্ষতি না করিয়া বোধ হয় অর্ধেক ব্যয় কমানো যাইতে পারে।

আমি স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় দীর্ঘকালের জন্য উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাইবার মানস করিতেছি। যদি আপনি বেথুন স্কুলের নূতনরূপ ব্যবস্থা করিতে চান, আর সে বিষয়ে আমার মতামত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি আপনার কলিকাতায় ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে এবং এ বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে সানন্দে সম্মত আছি।

আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন
(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

সুন্দরবন, ১৪ই অক্টোবর, ১৮৬৭

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা সমীপে
প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১লা অক্টোবরের পত্র পাইয়া অত্যন্ত অনুগৃহীত হইলাম। পত্রখানি বহুবিধ জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, আশা করি, আপনি কোনো কারণেই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া স্থগিত রাখিবেন না। আমার বিশ্বাস এই যে স্থান পরিবর্তনে আপনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইবেন।

যদি আমি আর কয়েকদিন পরে কলিকাতা গিয়া আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি, বেথুন বিদ্যালয়ের নূতন সংস্কারকার্য বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করিয়া পরম

সুখী হইব, নতুবা আপনি অবসর মতো পত্রের দ্বারা আপনার অভিপ্রায় আমাকে উত্তরপশ্চিম অঞ্চল হইতে লিখিয়া জানাইবেন।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কোনো সাহেবসুবার নিকট পরিচয়-পত্রের প্রয়োজন হইলে আমি সেজন্য আপনার একটু প্রয়োজন সাধন করিয়া বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিব। ১৫ই হইতে আমি বেলভেডিয়ারে থাকিবে।

আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন

(স্বাক্ষর) ডব্লিউ. গ্রে

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এই বিষয় লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী তর্কবির্তকের পর শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করণের জন্য নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্য দান স্থির হইয়া যায়। প্রায় দুই বৎসর কাল ধরিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়া পড়িয়া থাকে। এক দিবস প্রয়োজনোপলক্ষে ভূতপূর্ব অবলা-বান্ধব-সম্পাদক বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তদানীন্তন ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, প্রসঙ্গক্রমে উক্ত রায় বাহাদুর মহাশয় 'স্ত্রী-শিক্ষায়িত্রী-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দুই বৎসর ধরিয়া মঞ্জুর হইয়া পড়িয়া আছে,' এই সংবাদ দিয়া বলিলেন, যদি সম্ভব হয়, এখনও চেষ্টা করিতে পারেন। দ্বারকাবাবু এই উপলক্ষে শিক্ষা বিভাগীয় ডাইরেক্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং নিজেই ছাত্রী সংগ্রহের ভার লইলেন। তাঁহারই সংগৃহীত ৫/৬টি ছাত্রী লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হয়। প্রায় দেড় বৎসরকাল এই বিদ্যালয়ের কার্য চলিয়াছিল। পরে সহসা সেই সময়ের বঙ্গীয় ছোটোলাট স্যার জর্জ ক্যাম্বেল বিদ্যালয় উঠাইয়া দেন। বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার কোনো বিশিষ্ট কারণের উল্লেখ নাই।[১৩] স্ত্রীশিক্ষা উন্নতিপথের এই অন্তরায় দূর হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। এখনও সে অভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই।

মতভেদ নিবন্ধন, বিশেষত তাঁহার স্বদেশীয় বন্ধুদের কাহারও কাহারও অত্যধিক উৎপীড়নে, শেষে বিরক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুন স্কুলের সহিত সাক্ষাৎ সংস্রব ত্যাগ করেন, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সাধনকল্পে যে সকল অনুষ্ঠান আয়োজন হইত, তাহাতে তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হৃদয়ের পূর্ণ যোগ ছিল। কোথাও ওইরূপ কার্যের অনুষ্ঠান হইলে, তাহাতে সাহায্য করিতে কখনও বিরত থাকিতেন না। পুরনারীগণের শিক্ষা দিবার জন্য বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় যে সকল স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়িনী সম্মিলনী স্থাপিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সাধন করিতেছে, সে সকলের প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল। উত্তরপাড়া হিতকারী, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ সম্মিলনী, ফরিদপুর সুহৃৎসভা, বাখরগঞ্জ হিতসাধিনী, বিক্রমপুর সম্মিলনী, মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনী প্রভৃতির কার্য-বিবরণ শুনিতে বড়ো ভালোবাসিতেন। আমরা কোনো সম্মিলনীর পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে তাঁহার নিকট পুস্তকাদি সাহায্য প্রার্থনার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া যাইতাম। সে সময়ে প্রসঙ্গক্রমে

১৩ স্ত্রীশিক্ষার চিরসুহৃদ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

এই সকল সম্মিলনীর বিষয় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। ওইরূপ কোনো সম্মিলনীর দ্বারা বিশেষভাবে স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা হইতে শুনিলে, গভীর আনন্দ প্রকাশ করিতেন। চলিত কথায় লোকে বলে, 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী', কিন্তু তিনি অল্প, অধিক সকল প্রকার বিদ্যারই উৎসাহদাতা ছিলেন। আজকাল মেয়েদের অল্প লেখা পড়া শিখায় বড়ো একটা আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষায় লোকের বিদ্রুপ ও বিদ্বেষ-বহ্নি অত্যধিক মাত্রায় জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু সকলে শুনিয়া অবাক হইবেন যে, বেথুন বিদ্যালয়ের বর্তমান কর্ত্রী শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু এম. এ. মহোদয়া যখন বর্তমান সময়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় গভীর আনন্দের পরিচায়ক এক প্রস্থ শেক্সপিয়ারের গ্রন্থাবলি[১৪] উপহারসহ তাঁহাকে যে সুন্দর পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আমরা সেই পত্রখানিকে সর্বাবয়বে অমর করিবার মানসে এখানে তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম। এবং উক্ত পারিতোষিকের প্রথম গ্রন্থে যেটুকু লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও যথাবৎ তুলিয়া দিলাম :

SRIMATI
KUMARI CHANDRAMUKHI BASU
The first Bengali Lady,
Who has obtained the Degree of Master of Arts,
OF THE CALCUTTA UNIVERSITY
From her sincere Well-wisher
ISVARACHANDRA SARMA

স্ত্রীশিক্ষা সংস্রবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ বঙ্গললনাগণ, সেই মহাপুরুষের স্বর্গারোহণের পর, সকলে সমবেত হইয়া ১৬৭০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ওই টাকা বেথুন বিদ্যালয়ের কমিটির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। হিন্দুগৃহের কোনো বালিকা তৃতীয় শ্রেণির পাঠ শেষ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে অগ্রসর হইলে, পরবর্তী দুই বৎসরের জন্য তাহাকে উক্ত সঞ্চিত অর্থের আয় হইতে একটি বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই অনুষ্ঠান যে সম্পূর্ণরূপে বঙ্গবাসিনী রমণীগণের উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কী? বিদ্যাসাগর মহাশয় নারীজাতির পরম সুহৃৎ; ভারতসন্তানদের মধ্যে বর্তমান যুগের প্রারম্ভে যুগপ্রবর্তক মহাত্মা রামমোহনের সহায়তা লাভ করিয়া যাহারা নানা বিপদে উদ্ধার যুগপ্রবর্তক মহাত্মা, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই ক্ষেত্রে, সেই পুণ্য

১৪ Cassel's Illustrated Shakespeare—Edited and Annotated by Charles and Mary Cobden Clarke.

কার্যে মহাত্মা রামমোহনের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদিগকে অধিকতর সুখের অবস্থায় স্থাপিত করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার নারীসেবার সুবৃহৎ কীর্তিস্তম্ভ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অবলা রমণীগণ যাহা করিয়াছেন, আপেক্ষের বিষয় যে শত প্রকারে উপকৃত সুশিক্ষিত বঙ্গসন্তানগণ তদনুরূপ কিছুই এ পর্যন্ত করিলেন না; বঙ্গরমণীগণ ধন্য! তাঁহারা দেবসুলভ গুণালঙ্কৃত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি বিন্দুপ্রমাণ কৃতজ্ঞতাও প্রদর্শন কবিতে সক্ষম হইয়াছেন।[১৫]

১৫ In the presence of His Excellency the Viceroy and Governor General of India—Lord Elgin, and many other notable European and Indian gentlemen—Bethune College—5th March 1894—Report......The Committee beg to announce that they have recently received the sum of Rs. 1,670 from the Secretary to the Ladies' Vidyasagar Memorial Committee in Calcutta. for the establishment of an annual Scholarship tenable for two years to be awarded to a Hindu girl who after passing the Annual Examination in the Third Class of the School, desires to prepare herself for the university Entrance Examination. The late Pundit Iswar Chandra Vidyasagar was the co-adjutor and fellow-worker of Mr. Bethune, when the School was founded and since then continued so long as he lived, to take the keenest interest in its welfare. It is therefore a source of great gratification to the committee to find that a body of Hundu Ladies in Calcutta should have interested themselves in this manner to perpetuate the memory of the late Pundit Vidyasagar, who during his life time, in addition to the philanthropic work to which he devoted his whole life, had done so much to promote Female Education in Bengal.

M. Ghose
*Secretary*

উৎস : প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা : বিমান বসু বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, কলকাতা ১৯৯১

# সামাজিক আন্দোলন ও বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন

## শিবনাথ শাস্ত্রী

১৮৪৬—১৮৫৩ পর্যন্ত

১৮৪৬ সালের ১লা জানুয়ারি মহাসমারোহ সহকারে কৃষ্ণনগর কালেজ খোলা হইল। কৃষ্ণনগরের পক্ষে সে দিন এক স্মরণীয় দিন। সে সময়ে শ্রীশচন্দ্র নদিয়ার রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই নব-প্রতিষ্ঠিত কালেজের উৎসাহদাতা হইলেন। তৎপূর্বে নদিয়ার রাজবংশের কোনও সন্তান সাধারণের সহিত এক সঙ্গে শিক্ষালাভ করে নাই। রাজারা নানা স্থান হইতে সুযোগ্য ওস্তাদ আনাইয়া স্বীয় পরিবারের বালকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। শ্রীশচন্দ্র সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া স্বীয় পুত্র সতীশচন্দ্রকে কালেজে পড়িতে দিবার সংকল্প করিলেন; এবং নিজে কালেজ কমিটির একজন সভ্য হইলেন। কেবল যে নামমাত্র সভ্য হইলেন তাহা নহে, কমিটির প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া কার্য-নির্বাহ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ ডি. এল. রিচার্ডসন সাহেব কালেজের প্রথম অধ্যক্ষ হইয়া গমন করিলেন: এবং লাহিড়ী মহাশয় একশত টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া গেলেন। সে সময়ে যাঁহারা কৃষ্ণনগর কালেজে লাহিড়ি মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন, তাঁহাদের মুখে যখন তাঁহার তৎকালীন উৎসাহ ও অনুরাগের কথা শুনি তখন চমৎকৃত হইয়া যাই। তিনি যখন পড়াইতে বসিতেন তখন দেখিলে বোধ হইত যেন পৃথিবীতে তাঁহার করিবার বা ভাবিবার অন্য কিছু নাই। সমগ্র দেহ-মন-প্রাণ তাহাতে ঢালিয়া দিতেন। তিনি স্বীয় কার্যে এমনি তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, এক এক দিন কালেজের অধ্যক্ষ বা হেড মাস্টার তাঁহাকে কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার ঘরে প্রবেশ কবিয়া পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া তাঁহার পড়ান শুনিতেন; একটু অবসর পাইলে কথা কহিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেন। তাঁহার পাঠনার রীতি এই ছিল যে, কোনও পাঠ্য বিষয়ের প্রসঙ্গে কোনও জ্ঞানের কথা পাইলে তিনি সে সম্বন্ধে বালকদিগের জ্ঞাতব্য যাহা কিছু আছে তাহা সমগ্রভাবে না বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। পড়াইতে পড়াইতে যদি আরবের নাম কোথাও পাইলেন তাহা হইলে আরবের প্রাকৃতিক অবস্থা, তাহার অধিবাসীদের স্বভাব ও প্রকৃতি, মহম্মদের

জন্ম ও ধর্ম প্রচারের বিবরণ প্রভৃতি বালকদিগকে না জানাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। এইরূপ অধ্যাপনায় পাঠ্যগ্রন্থগুলি পাঠের বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইত না বটে, কিন্তু বালকেরা যথার্থ জ্ঞান লাভ করিত; এবং তাহা অপেক্ষা অধিক প্রশংসার বিষয় এই যে, ইহা তাহাদের অন্তরে জ্ঞানানুরাগ উদ্দীপ্ত করিত। কেবল তাহা নহে তিনি কালেজের ছুটির পর ডিরোজিওর ন্যায় বালকদিগের সহিত কথাবার্তাতে অনেকক্ষণ যাপন করিতেন। অনেক সময়ে কালেজের মাঠে তাহাদের সঙ্গে খেলিতেন। এইভাবে তাঁহার কৃষ্ণনগরের শিক্ষকতার কার্য আরম্ভ হইল।

এই সময়ে দুই দিক হইতে দুই স্রোত আসিয়া ক্ষুদ্র কৃষ্ণনগর সমাজে মহা তরঙ্গ উত্থিত করিল।...

কলিকাতার অনুকরণে কৃষ্ণনগরে যে কেবল ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন উঠিয়াছিল তাহা নহে, ধর্মসভাও স্থাপিত হইয়াছিল; এবং প্রধান প্রধান ধনীগণ তাহার সারথি-স্বরূপ হইয়া নব্যদলের শাসনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র এই উভয়দলের মধ্যে দণ্ডায়মান; সমগ্র হিন্দুসমাজ এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার পশ্চাতে, সুতরাং তিনি পূর্ণমাত্রায় নবোত্থিত বেদান্তধর্মের মুখপাত্র হইতে পারিলেন না; কিন্তু উৎসাহদান, অনুরাগ, আদর, শ্রদ্ধা প্রভৃতির দ্বারা যতদূর হয় করিতে লাগিলেন। কেবল তাহা নহে, তিনি নবদ্বীপ হইতে বড়ো বড়ো পণ্ডিতদিগকে আনাইয়া তাঁহাদের সহিত বিচার উপস্থিত করিলেন—"কেন আপনারা বেদ-বিহিত বেদান্ত ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবেন না?"

যে সরল সত্য-প্রিয়তার ও উদারতার নিদর্শন লাহিড়ি মহাশয়ের জীবনে আমরা উত্তরকালে দেখিয়াছি, তাহা এই যৌবনের প্রথমোদ্যমেও দেখিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের লোক যতদিন মুখে বলিয়া কার্যে তাহা না করিতেন, ততদিন তিনি ইহার সঙ্গে যোগ দেন নাই,—উৎসাহ দিতেন, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত একীভূত হইতেন না। পরে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল দেখা দিলে তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

লাহিড়ি মহাশয় নবোদিত ব্রাহ্মধর্মের সহিত যোগ দিলেন না বটে কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবে ও তাঁহার সংশ্রবে কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে এক নবভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি শিক্ষাগুরু ডিরোজিওর নিকটে যে যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি প্রধান মন্ত্র এই ছিল যে, মানবের চিন্তা ও কার্যকে স্বাধীন রাখিতে হইবে। হিন্দু কালেজ কমিটি কালেজের ছাত্রদিগকে ডফ্ ও ডিএলট্রির বক্তৃতা শুনিতে যাইতে নিষেধ করিলে ডিরোজিও তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেই ভাব তাঁহার শিষ্যদলের মনে চিরদিন পূর্ণমাত্রায় কার্য করিয়াছে। তাঁহারা চিরদিন মানবের স্বাধীনতাকে পবিত্র পদার্থ মনে করিয়া আসিয়াছিলেন; কোনও কারণেই তাহাতে হস্তার্পণ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবনের পূর্ণ উৎসাহের মধ্যে সেই ভাব পূর্ণমাত্রায় কার্য করিতেছিল। তিনি শিক্ষকরূপে বালকদিগের মধ্যে বসিতেন বটে, কিন্তু অনেক সময়ে তাহাদের সহিত বয়স্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেন।...

এই সময়ে কিছুদিন ধরিয়া কৃষ্ণনগরে একটা বিষয়ের বিচার চলিতেছিল—তাহা বিধবা-বিবাহ। অনেকের সংস্কার আছে, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব-প্রথমে বঙ্গসমাজে বিধবা বিবাহের বিচার উপস্থিত করেন। কিন্তু বোধহয় তাহা ঠিক

নহে। ১৮৪২ সাল হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও শিষ্যগণ যে "বেঙ্গল স্পেক্টেটার" নামক কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে তাঁহারা বিধবা বিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার উপস্থিত করেন। কয়েক মাস ধরিয়া ওই পত্রে উক্ত বিচার চলিয়াছিল। এমনকী "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি যে পরাশর বচনের উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্বপ্রথমে উক্ত পত্রে বিচারের মধ্যে উদ্ধৃত করা হয়।

রাজা শ্রীশচন্দ্র নিজে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন। এরূপ আশা হইয়াছিল যে পণ্ডিতগণকে লওয়াইয়া তিনি কাজে কিছু করিলেও করিতে পারেন। যে কারণে তিনি সে বিষয়ে নিরুদ্যম হন, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। ক্ষিতীশবংশাবলি চরিতকার মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের কার্যকলাপের উল্লেখ করিতে গিয়া বলিতেছেন ঃ—

"রাজা বেদানুমোদিত পরব্রহ্মের আরাধনা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তথাপি বিধবা কামিনীদিগের অবস্থা একদিনের নিমিত্তও বিস্মৃত হন নাই। তিনি এই স্থির করিয়াছিলেন যে, এ-প্রদেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করা শাস্ত্রের সহায়তায় যতদূর হইবেক, কেবল যুক্তি অবলম্বন করিলে ততদূর হইবেক না; একারণ, যদ্যপিও এদেশস্থ পণ্ডিতগণ বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত স্বীকার করিয়াও তাহার ব্যবস্থা দিতে অসম্মত হন, তথাপি রাজা এই ব্যবস্থা পাইবার নিমিত্ত বিবিধ কৌশল অবলম্বন করেন। অবশেষে নবদ্বীপস্থ কয়েকজন পণ্ডিত পুরস্কার লাভাশয়ে ব্যবস্থা দিতে সম্মত হন। ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময়ে, নগরস্থ নব্যসম্প্রদায় সহসা এখানকার কালেজগৃহে এক সভা করিয়া স্বদেশের প্রচলিত রীতি-নীতির বহুবিধ নিন্দাবাদ করণান্তর বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বিরুদ্ধবাদিগণ, নবমতাবলম্বীরা কালেজে একত্র হইয়া স্বহস্তে গোহত্যা করিয়া, তাহার মাংস ভোজন ও মদিরা পান করিয়াছেন, এইরূপ অপবাদ সর্বত্র রটনা করিয়া দিলেন। এই অমূলক কথা দূর ও অদূরবর্তী নানাস্থানে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

ওই কালেজগৃহের সভার পূর্বে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে লাহিড়ি মহাশয়ের শিষ্যদলের ওই গোখাদক অপবাদ প্রবল হয়। সে ঘটনাটির বিবরণ দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয়ের লিখিত আত্মজীবন-চরিত হইতে উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—

"কলিকাতা হইতে বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র নামক আমাদের একজন সুবিজ্ঞ সুহৃদ্বর কৃষ্ণনগরে আসিলেন। তদীয় প্রীত্যর্থে তাঁহাকে লইয়া বাবু রামতনু লাহিড়ী, শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী, কালীচরণ লাহিড়ী, তারিণীচরণ রায়, বামাচরণ চৌধুরী প্রভৃতি দশ বারো জন আত্মীয় ও আমি কৃষ্ণনগরের দেড়ক্রোশ পূর্ব-দক্ষিণে আনন্দবাগ নামে উপবনে বনভোজন করিতে যাইতাম। তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে নৌকায় নৌকায় আমাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব হইল। অনেকেই ইহার অনুকূল প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু কার্যকালে সকলেই স্থির-প্রতিজ্ঞ থাকিবেন, ইহা আমার বিশ্বাস হইল না। কয়েক দিবস পরে কৃষ্ণনগর কালেজগৃহে এ বিষয়ের জন্য একটি সভা হইল। সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ কালেজের ও স্কুলের ছাত্র।"

"যে দিবস আমরা আনন্দবাগে বনভোজন করি, তাহার পরদিন কোনও হিংস্রক ও দুরাচারী লোক আমার গ্রামস্থ অনেকের নিকট ব্যক্ত করিল যে, আমাদের বাটীর সন্নিহিত কোনো স্থানে একটি গো-বৎসের মস্তক কতকগুলি ইষ্টকে আচ্ছাদিত রহিয়াছে ও মাথাটি দেখিয়াই বোধ হয় যেন তাহা অস্ত্র দ্বারা ছেদিত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ পরে রটনা করিল যে, কোনও ব্যক্তির এক গো-বৎস পাওয়া যাইতেছে না। পরদিবস কৃষ্ণনগরে কোনো স্থানে বন্ধুলোকের সমাগম দেখিয়া গো-বৎস বৃত্তান্ত আরও কিঞ্চিৎ রঞ্জিত করিয়া কহিল যে, কেহ কেহ বলিতেছে যে, আনন্দবাগের বনভোজন জন্য এই গো-হত্যাটি হইয়াছে। নগর মধ্যে এই বিষয়ের তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল।"

যখন কৃষ্ণনগরে পূর্বোক্ত ঘটনা সকল ঘটিতেছিল, তখন কলিকাতাতে একটি নূতন কার্যের সূত্রপাত হইতেছিল। এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি ও গবর্নর জেনেরালের মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন্ বা বেথুন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন। বিটন সাহেব ইংলন্ডের স্যালফোর্ড নামক স্থান-নিবাসী কর্ণেল জন ড্রিঙ্কওয়াটারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কর্ণেল ড্রিঙ্কওয়াটার জিব্রাল্টার দুর্গের অবরোধের ইতিবৃত্ত লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বিটন যৌবনে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া র‍্যাংলারের সম্মানিত পদ অধিকার করেন। তৎপরে আইন অধ্যয়ন করিয়া পার্লিয়ামেন্টের কাউন্সিলের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ হইতে তিনি গবর্নর জেনেরালের ব্যবস্থা-সচিবরূপে এদেশে প্রেরিত হন। তিনি বড়ো মাতৃভক্ত লোক ছিলেন; এবং এইরূপ কথিত আছে যে, মাতৃভক্তিই তাঁহার স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভারতীয় নারীগণের উন্নতি সাধনের ইচ্ছা সমুৎপন্ন করিয়াছিল।

তিনি এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তাঁহার স্বভাব-সুলভ সদাশয়তার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, এদেশীয়দিগের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে। এই পণ্ডিতদ্বয়ের সাহায্যে ও দেশের ভদ্রলোকদিগের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া তিনি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৯ সালের ৭ই মে দিবসে তন্নাম-প্রসিদ্ধ বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিটন এই কার্যে দেহ-মনঃপ্রাণ নিয়োগ করেন; হেয়ার যেমন বালকদিগের শিক্ষা লইয়া মাতিয়াছিলেন, বিটন তেমনি বালিকাদিগের শিক্ষা লইয়া একেবারে মাতিয়া যান। তিনি সর্বদাই তাঁহার নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন; আসিবার সময় বালিকাদিগের জন্য নানা উপহার লইয়া আসিতেন; মধ্যে মধ্যে বালিকাদিগকে নিজ ভবনে লইয়া গিয়া মূল্যবান উপহার সামগ্রী দিয়া গৃহে প্রেরণ করিতেন; কখনও কখনও চারি পায়ে ঘোড়া হইয়া শিশু বালিকাদিগকে পৃষ্ঠে তুলিয়া খেলা করিতেন। বলিতে কী যে সকল উদারমতি মানব-হিতৈষী ইংরাজ পুরুষের নাম এদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছে, এই মহাত্মা তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি নিজের নাম বঙ্গবাসীদিগের স্মৃতি ফলকে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক ইতিবৃত্তে ইঁহার নাম চিরদিন উজ্জ্বল তারকার ন্যায় জ্বলিবে।

কিন্তু ১৮৪৯ সালে মহাত্মা বিটন বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন বলিয়া এরূপ কেহ মনে করিবেন না যে, বঙ্গদেশে তাহাই স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রচলন। বহুকাল পূর্ব হইতে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দিতেছি ঃ—

১৮১৭ সালে স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হওয়া অবধি এই প্রশ্ন উঠে যে, বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগকেও শিক্ষা দেওয়া হইবে কি না? এই বিষয় লইয়া সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। রাধাকান্ত দেব উক্ত সোসাইটীর অন্যতর সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন; এবং স্কুল সোসাইটীর অধীনস্থ কোনও কোনও পাঠশালাতে বালকদিগের সহিত বালিকাদিগকেও শিক্ষা দিবার রীতি প্রবর্তিত করেন। সম্বৎসর পরে তাঁহার ভবনে স্কুল সোসাইটির পাঠশালা সকলের বালকদিগের যখন পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ হইত, তখন বালকদিগের সহিত বালিকারাও আসিয়া পুরস্কার লইয়া যাইত।

এইরূপ কয়েক বৎসর যায়। কিন্তু বালকদিগের সহিত বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া অনেক সভ্যের অভিপ্রেত হইল না। এই বিষয়ে যে বিচার উপস্থিত হইল, তাহার ফলস্বরূপ ১৮১৯ সালে বাপ্তিস্ত মিশন সোসাইটির একজন সভ্য ভারতীয় নারীগণের দুর্দশা ও শিক্ষার আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া এক নিবেদন-পত্র বাহির করিলেন। সেই নিবেদন-পত্রের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া Mr. Lowson and Pearce's Seminary নামক তৎকাল-প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের মহিলাগণ একত্র হইয়া ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য এক সভা স্থাপন করিলেন; তাহার নাম হইল—"Female Juvenile Society"। এই সভার মহিলা সভ্যগণ কলিকাতার নানাস্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাধাকান্ত দেব ইঁহাদের উৎসাহ-দাতা হইলেন; এবং নিজে "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়া তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর কার্য চলিল। ১৮২১ সালে স্কুল সোসাইটির কতিপয় মহিলা-সভ্যের প্ররোচনায় ইংলন্ডের British and Foreign School Society-র সভ্যগণ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কুমারী কুক (Miss Cooke) নাম্নী এক শিক্ষিতা মহিলাকে এদেশে প্রেরণ করিলেন। কুমারী কুক ১৮২১ সালে নবেম্বর মাসে এদেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, স্কুল সোসাইটীর সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে উক্ত সভা তাঁহার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণে অসমর্থ। এই বিপদে চার্চ মিশনারি সোসাইটির সভ্যগণ অগ্রসর হইয়া কুমারী কুকের ভার গ্রহণ করিলেন। উক্ত মিশনের অধীন থাকিয়া তিনি উৎসাহের সহিত স্বীয় অবলম্বিত কার্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি কার্যারম্ভ করিবার অগ্রে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাতে মনোনিবেশ করিলেন। যখন মনোযোগ সহকারে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, তখন একদিন শিশুদের বাঙ্গালা শুনিবার জন্য স্কুল সোসাইটির স্থাপিত কোনও পাঠশালাতে গিয়া দেখেন একটি বালিকা পাঠশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, গুরুমহাশয় তাহাকে বালকদিগের সহিত পড়িতে দিবেন না। অনুসন্ধানে জানিলেন সে বালিকাটির ভ্রাতা ঐ পাঠশালে পড়ে; শিশু বালিকাটি স্বীয় ভ্রাতার সহিত পড়িবার জন্য গুরু মহাশয়কে মাসাধিক কাল বিরক্ত করিতেছে। কুমারী কুক সেই বালিকার মাতার ও পাড়ার অপরাপর মহিলাদিগের সহিত দেখা করিলেন। অনেক কথোপকথনের পর সেই পাড়াতে বালিকা বিদ্যালয় খোলা স্থির হইল। অল্পদিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ১০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং ন্যূনাধিক ২৭৭টি বালিকা শিক্ষা করিতে লাগিল। কুমারী কুক দুই বৎসর এইভাবে কাজ করিলেন। অবশেষে তিনি (Mr. Wilson) উইলসন নামক একজন মিশনারি সাহেবের সহিত পরিণীতা হইলেন। বিবাহের

পরেও তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে রত রহিলেন বটে, কিন্তু আর পূর্বের ন্যায় সময় দিতে পারিতেন না। এই অভাব দূর করিবার জন্য কলিকাতার কতিপয় ভদ্র ইংরাজ-মহিলা সমবেত হইয়া তদানীন্তন গবর্নর জেনেরাল লর্ড আমহার্স্টের পত্নী লেডি আমহার্স্টকে আপনাদের অধিনেত্রী করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-বিধানার্থ বেঙ্গল লেডিস সোসাইটি (Bengal Ladies' Society) নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার মহিলাসভ্যগণের উৎসাহে ও যত্নে নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। অল্পকালের মধ্যেই ইঁহারা শহরের মধ্যস্থলে একটি প্রশস্ত স্কুলগৃহ নির্মাণ করিবার সংকল্প করিলেন। কিছুকাল পরে মহিলাগণ মহাসমারোহে গৃহের ভিত্তিস্থাপন পূর্বক গৃহনির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। ওই গৃহ নির্মাণকার্যের সাহায্যার্থ রাজা বৈদ্যনাথ বিংশতি সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণ, স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন বিষয়ে মহিলাগণ এদেশীয় অনেক ভদ্রলোকের উৎসাহ ও আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বেঙ্গল লেডিস সোসাইটি বহুবৎসর জীবিত থাকিয়া কার্য করিয়াছিল। এমনকি ১৮৫৪ সালে আডাম সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থা বিষয়ে যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে কলিকাতা ব্যতীত শ্রীরামপুর, বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মুরশিদাবাদ ও বীরভূম প্রভৃতি স্থানে ১৯টি বালিকা বিদ্যালয় ও প্রায় ৪৫০টি বালিকার উল্লেখ দেখা যায়; এবং ওই সকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলি লেডিস সোসাইটির সভ্য মহোদয়াগণের উৎসাহে স্থাপিত বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু এই সকল বালিকা বিদ্যালয়ের অধিকাংশ খ্রিস্টীয় মহিলাদিগের স্থাপিত ও খ্রিস্টীয় ধর্ম প্রচার কার্যের অঙ্গীভূত ছিল।

সাম্প্রদায়িক-ধর্ম-শিক্ষাবিহীন শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন বিটন সাহেব সর্বপ্রথমে করেন। সে কার্যের প্রতিষ্ঠা ১৮৪৯ সালে হয়; তাহার বিবরণ অগ্রে দিয়াছি। বিটনের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেই বারাসাত, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি মফঃস্বলেরও অনেক স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল।

এই স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন লইয়া কলিকাতার হিন্দু-সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রী-শিক্ষার বৈধতা প্রমাণ করিবার জন্য যে কেবল গ্রন্থ রচনা করিলেন তাহা নহে, স্বীয় কন্যাকে নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিলেন। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি লাহিড়ি মহাশয়ের যৌবন-সুহৃদগণ স্বীয় স্বীয় ভবনের বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। স্ত্রীশিক্ষা লইয়া সমাজ মধ্যে নানা আলোচনা উপস্থিত হইল। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" মহানির্বাণ তন্ত্রের এই বচনালঙ্কৃত নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের গাড়ি যখন রাজপথে বাহির হইত, তখন লোকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিত ও নানা কথা কহিত; এবং সুকুমারমতি শিশু বালিকাদিগকে উদ্দেশ করিয়া কত অভদ্র কথাই কহিত। লোকে বলিতে লাগিল—"এইবার কলির বাকি যা ছিল হইয়া গেল! মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না।" নাটুকে রামনারায়ণ রসিকতা করিয়া বাবুদের মজলিসে বলিতে লাগিলেন;—"বাপ্‌রে বাপ্ মেয়েছেলেকে লেখা পড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে! এক 'আন' শিখাইয়াই রক্ষা নাই! চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন করিয়া অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে!" লোকে শুনিয়া হা হা

করিয়া এক গাল হাসিতে লাগিল। বঙ্গের রসিক কবি ঈশ্বর গুপ্তও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন ঃ—

"যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে,
এ বি শিখে, বিবি সেজে, বিলাতি বোল কবেই কবে;
আর কিছু দিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগি, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

বিটনের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে যেমন সমাজমধ্যে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং বিটন দেশীয় শিক্ষিতদলের প্রিয় হইলেন, তেমনি রাজনীতি বিষয়ে এক মহা আন্দোলন উঠিল, তাহাতে তিনি তাঁহার স্বদেশীয়গণের অপ্রিয় হইয়া পড়িলেন। এই আন্দোলন অনেক পরিমাণে পরবর্তী সময়ের ইলবার্টবিলের আন্দোলনের অনুরূপ ছিল।

উৎস : রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

# ইংরাজি শিক্ষার পরিণাম

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

পুরাণ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, সে কালের তেজীয়ান মুনি-ঋষিগণের সন্তান-সন্ততি সকল সময়ে জন্মগ্রহণের জন্য প্রচলিত নিয়মানুসারে দশ মাস কাল গর্ভাবস্থানরূপ যাতনা ভোগের অপেক্ষা রাখিতেন না। দেশ কাল পাত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়াই যত্রতত্র অকস্মাৎ এক এক ঋষি-বংশধরের আবির্ভাব হইত, এবং তিনিও প্রায় ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ শাস্ত্রের উচ্চারণ আরম্ভ করিয়া একটা ভাবী বিপ্লবের সূচনা করিয়া ফেলিতেন।

ষাটি বৎসর পূর্বে সাব্যস্ত হইয়াছিল, ইংরাজি বিদ্যা না শিখিলে আমাদের মনুষ্যত্ব জন্মিবে না। সাব্যস্ত হইবামাত্র বিলাতি সরস্বতী দশ মাসের অপেক্ষা না রাখিয়া একেবারে কতকগুলি শ্মশ্রুগুম্ফধারী সুপক্ক সন্তান প্রসব করিলেন; এবং অকস্মাৎ দেশমধ্যে একটা হই-চই পড়িয়া গেল। কেহ আশা করিলেন, ভারতমাতা অচিরেই হিমাচলের উচ্চতম শিখরে উন্নীতা হইবেন; কেহ আশংকা করিলেন, এইবার ইহারা বুড়িকে ভারত সাগরে ডুবাইয়া মারিল।

তারপর ষাটি বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু ইহার মধ্যে ভারতের বিশেষ উন্নতির বা অধোগতির লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে আর এক তান উঠিয়াছে, ইংরাজি বিদ্যা এদেশের ক্ষেত্রে ফলিল না; বাংলার মাটিতে কি বিলাতি ওক্ গাছের বৃদ্ধি হয়। এদেশের মাটিতে বরং দেশী প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার চাষ আবাদ করিলে কিছু ফল পাওয়া যাইতে পারে। চেষ্টা করিলে মন্দ হয় না।

বিজ্ঞের দল স্মিতমুখে বলিতেছেন আমরা পূর্বেই জানিতাম, বিলাতি মালমাত্রই ভুয়া; কেবল বাহিরের চাক্‌চিক্য দেখিয়া তোমরা আহ্লাদে আটখানা হইয়া একটা প্রকাণ্ড গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়াছিলে; এখন ঠেকিয়া শেখ ও পথে এসো।

সুতরাং নব্য-প্রাচীন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্বদেশী-বিদেশী, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটা অতৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন দেখা যাইতেছে; একটা নূতন পন্থার আবিষ্কার ও অনুকরণ না করিলে ভারতবাসীর মানসিক উন্নতির আর উপায় নাই; সর্বত্র এইরূপ একটা ভাব অন্তরে অন্তরে খেলিয়া বেড়াইতেছে।

নানা জনে নানা কথা বলিতেছে। ত্রিশ বৎসরের বেশি হইল, ইংরাজি বিদ্যার বহুল প্রচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; বড়ো বড়ো অধ্যাপক বড়ো বড়ো জটিল শাস্ত্রের শিক্ষা দিয়া বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীর মরিচা ধরা মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া দিতেছেন, তথাপি এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে একটা নিউটন জন্মিল না, একটা ফ্যারাডে জন্মিল না। কী পরিতাপ! ভারতবাসীর মস্তিষ্কটারই বোধ হয় দোষ আছে। ডারউইনের মতানুসারে বানর ও মনুষ্যের মধ্যবর্তী পর্যায়ভুক্ত জীবের কিছুদিন হইতে অনুসন্ধান হইতেছে। বোধ হয়, ভারতবর্ষের লোক সেই জীব।

যাহাই হউক, সরস্বতী এ দেশে পদার্পণ করিয়া বন্ধ্যা হইলেন, অথবা কেবল অকাল প্রসূত দুর্বল জীবের সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন, এদেশের পক্ষে এ বড়ো দুর্নাম ও কলঙ্কের বিষয়। সুতরাং, এই কলঙ্ক রটনার ভিত্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক হইতেছে।

ফলে, কথাটা কতদূর সত্য, দেখা যাউক। বিলাতের মাটিতে নিউটন, ফ্যারাডের মতো লোক দুই দশটা করিয়া প্রতি বৎসর জন্মায়, এমন নহে, সুতরাং সে কথা বলিয়া হা-হুতাশ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। জাতীয় জীবনের পক্ষে ত্রিশ বৎসর কি ষাটি বৎসর এত অধিক সময় নহে যে, তাহার মধ্যে একটা প্রচণ্ড উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না বলিয়া হাল ছাড়িয়া বসিতে হইবে।

যাঁহারা এরূপ আশা করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহারা অন্য নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত হইতে পারেন; কিন্তু বুদ্ধি নামক গুণের জন্য তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে পারি না।

যাঁহারা পঞ্চাশ ষাটি বৎসর পূর্বে ইংরাজি শিক্ষার প্রথম আমদানির সময়ে একটা কুরুক্ষেত্র ব্যাপার ঘটাইয়া আঠারো দিনের মধ্যে ধর্মের রাজ্য সংস্থাপন করিয়া দিব স্থির করিয়াছিলেন, তাহাদের আস্ফালনেও কোনরূপ অধীর বা বিচলিত হইবার কারণ ছিল না। ফলে ইংরাজি শিক্ষার প্রচারে আমাদের প্রভূত উন্নতি হয় নাই বলিয়া শোক তাপের কোনও কারণ নাই।

কেহ কেহ হয়ত এই সময়ে চোক রাঙাইয়া বলিবেন, বাতুলের মতো একী কথা বলিতেছ, ইংরাজি শিক্ষায় কোন্ বিষয়ে আমাদের উন্নতি হয় নাই? যখন আমরা ইংরাজি বিদ্যার প্রভাবে স্পষ্টত অন্ধকার হইতে আলোকে উপনীত হইয়াছি, তখন এখনও আঁধার গেল না বলিয়া চিৎকার করা, এবং কেন আঁধার গেল না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বলা, কেবল অন্ধত্বেরই লক্ষণ। দেখ না, আমরা রেলওয়ে খুলিতেছি, সাহেব কান মলিয়া দিবামাত্র বিলাতে টেলিগ্রাফ্ পাঠাইতেছি, এমন কি, মদ্যপানের বিষয়ে ইংরাজের অনুকরণ অন্যায়, ইহাও বলিতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিতেছি। পুনশ্চ, দেখ, সেকালের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে, আমরা এখন পৃথিবীর গোলত্বের প্রতিপাদনার্থ জাহাজের মাস্তুল ঘটিত প্রমাণ এক নিঃশ্বাসে আওড়াইতে পারি; দধি, ক্ষীর অথবা অ্যালকোহলের সমুদ্রের কথা জানি না; কুশ, শাক, প্লক্ষ, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌নামীয় দ্বীপের অস্তিত্ব শুনিলে হাস্য করি। তেত্রিশ কোটি দেবতার স্থলে এক ঈশ্বরের অনুভব করি; এবং ইংরাজি শিক্ষার সহকারে ইংরাজের রাজনৈতিক ধাত লাভ করিয়া বড়ো চাকরির সহিত নির্বাচন প্রথাদিও চাহিয়া থাকি।

আমরাও বলি, ঠিক্ কথা। ইংরাজের প্রদত্ত শিক্ষা হইতে আমরা যে কিছুই লাভ করি নাই, এ একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা কথা।

যে ব্যক্তি ইংরাজি শিক্ষা একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে বলিতে চাহেন, আমরা তাহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত নহি। এবং আশা করি, ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে এইরূপ দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে কখনও পরাঙ্মুখ হইব না। কিন্তু তথাপি—অর্থাৎ কিনা, আমরা শিখিয়াছি অনেক, ও পাইয়াছি অনেক; কিন্তু তাহাতে আমাদের বাহ্য ব্যতীত আভ্যন্তরিক উন্নতি বিশেষ কিছু হয় নাই। আমাদের মজ্জা বা শোণিত শোধিত হয় নাই; আমাদের শরীরে বল জন্মায় নাই; আমাদের আত্মার পুষ্টি হয় নাই। এ যেন অস্থিচর্মসার চিররোগীকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখা হইয়াছে। অথবা গলিত নখদন্ত বৃদ্ধকে পরচুলা, রঙ ও কৃত্রিম দন্তের সাহায্যে যুবা সাজাইয়া রঙ্গমঞ্চে নামানো হইয়াছে। জীর্ণ, কণ্ঠাগতপ্রাণ রোগীকে ফোঁটাকতক ব্র্যাণ্ডি খাওয়াইয়া কিয়ৎকাল তাহার শরীরে অস্বাভাবিক বল সঞ্চয় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, বা তাহার হৃৎস্পন্দন পুনরানয়ন করিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য হিম অঙ্গে উষ্ণতার সঞ্চার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে স্থায়ী লাভ কিছুই হয় নাই। আমাদের পক্ষে এ কতকটা সেইরূপ। আজ যদি ইংরাজেরা চলিয়া যায়, আমরা বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হইয়া বেড়াইব, ছুঁচের অভাবে নরুণ বা কাঁটা ব্যবহার করিব, এবং পুনরায় শাকদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ আওড়াইতে থাকিব। এ সমুদয় সম্পূর্ণ সত্য কথা; সত্য কথা ও পুরাণ কথা সবিস্তার উল্লেখের প্রয়োজনাভাব।

আমরা জানিয়াছি অনেক ও শিখিয়াছি অনেক; কিন্তু কীরূপে জানিতে হয় ও কীরূপে শিখিতে হয়, তাহা শেখা আবশ্যক বোধ করি নাই। মনুষ্যজাতির জ্ঞানের রাজ্য আমাদের কর্তৃক এক কাঠা কি এক ছটাক পরিমাণেও বিস্তার লাভ করে নাই।

রাজ্যবিস্তার দূরের কথা; কীরূপে নিজের পরিচিত সীমানা পার হইয়া পা ফেলিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, আমাদের সাহসেও কুলায় না। রাজ্য অধিকারার্থ কী কী অস্ত্র ব্যবহার করিতে হয় তাহার কতকগুলার নাম কণ্ঠস্থ করিয়াছি বটে; কিন্তু কখনও তাহা চক্ষে দেখি নাই। আমাদিগকে না চালাইলে আমরা চলিতে পারি না, আমাদিগকে পথ না দেখাইয়া দিলে আমরা পথ চিনিয়া লইতে পারি না; আমাদের নিজের হাত পা'র উপর নিজের কর্তৃত্ব নাই; আমাদের জীবনী-শক্তির মাত্রা শূন্য। আমরা শোলার সিপাই; তার টানিলে আমাদের হাতের ঢাল তলোয়ার নড়িতে থাকে; আমরা ছেলেদের খেলনার ব্যাঙ্; পেট টিপিলে আমরা বক্‌বক্ করি।

অবশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা এক হিসাবে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি; কিন্তু একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিলে সেই বা কতটুকু, কতকটা আমরা একত্ব লাভ করিয়াছি, সন্দেহ নাই; কিছুদিন পূর্বে বাঙালি ও মান্দ্রাজি, মার্হাট্টা ও শিখ, এক কার্যের জন্য একাসনে বসিবে, ইহা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এখন সম্ভব হইয়াছে ইহা কতকটা ইংরাজি শিক্ষার গুণে সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেকটা আবার ইংরাজি শাসনের গুণে ও অন্য পাঁচটা কারণে। এবং এই একত্ব সাধনেও আমাদের চরিত্রের দুর্বলতা, লঘুতা, ও তন্তহীনতা অনেকটা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজি শিক্ষার গুণে আমরা এই জাতীয় চরিত্রের এই হীনতাটা দেখিতে শিখিয়াছি, এই পর্যন্ত বলতে পারি; কীরূপে হীনতা শোধন করিতে হইবে, তাহা শিখি নাই। তবে ভবিষ্যতে ইংরাজি শিক্ষা, ইংরাজের পায়ের বুট ও আমাদের বুগ্‌ণ প্লীহা, এতদুভয়ের সাহায্য লাভ করিয়া কতকটা চরিত্র শোধনের পথ দেখাইয়া দিতেও পারে।

আর জ্ঞানার্জনের কথা। পূর্বেই বলিয়াছি, আমরা শিখিয়াছি অনেক। টিটিকাকা টিম্বক্টুর ভৌগোলিক বৃত্তান্ত হইতে অক্সিজেন, ক্লোরিন, আর ইলেক্ট্রিসিটি ও ইথর, অনেক কথা শিখিয়াছি, যাহা পূর্বে জানিতাম না। আমরা বড়ো বড়ো আঁক কষিতে পারি, যাহা ভাস্করাচার্যের মাথায় কখনও আসে নাই; বায়ু মধ্যে শব্দের বেগ নির্ধারণ করিতে গিয়া নিউটন কিরূপে ভুল করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা অক্লেশে বলিয়া দিতে পারি। এমনকি, বোতলের ভিতর হাইড্রোজেন পুরিয়া নির্ভয়ে আওয়াজ করিতেও সমর্থ হইয়াছি।

সুতরাং আমরা ইংরাজের প্রসাদে, শিখিয়াছি যথেষ্ট; এমন কি, আমাদের শিখিবার শক্তি কত গভীর এ পর্যন্ত তাহা কেহ মানরজ্জু ফেলিয়া নির্ণয় করিতে পারিল না। কিন্তু হায়! আমাদের গড়িবার শক্তি কই, আমাদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় কোথায়! আমরা শোনা কথা ও শেখা কথা ভিন্ন জগতে নূতন কথা কী বলিলাম। উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় তো কিছুই দেখি না, এবং আর কিছুদিনের মধ্যে যে পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহার কোনো শুভ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না। ইংরাজি শিক্ষার কি এই পরিণাম?

আমরা গুরু উপদেশ গ্রহণে অতিশয় মজবুত; সে বিষয়ে আমাদের তুলনীয় কে আছে, জানি না। আমরা বালকের হাতে কর্দম; কাঠিন্য মাত্র বর্জিত! আমাদিগকে লইয়া যাহা গড়িবে, আমরা তাহাতেই পরিণত হইব। আমরা এক দিনের মধ্যে তেত্রিশকোটি দেবতা ভাঙিয়া একেশ্বরবাদী বা নাস্তিকবাদী হইয়া দাঁড়াই, আবার এক বক্তৃতায় আমাদিগকে থিয়সফিস্ট করিয়া তুলে। আমরা হাতচালা ও ভূত নামানো গল্প শুনিয়া উৎকট-হাস্যে গৃহপ্রাকার ধ্বনিত করি, আবার পরমুহূর্তে টেলিপ্যাথি বা সাইকিক ফোর্স শুনিলেই আত্মহারা হইয়া গলিয়া যাই।

আমরা বিজ্ঞান শিখিতেছি সত্য; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ধাতু আমাদের শোণিতে এখনও আসে নাই। বিজ্ঞানের নামে আমরা আটখানা হই; কিন্তু আমরা যাহা শিখি তাহা মোটের উপর উপবিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞান। মানুষের চুল তড়িতের পরিচালক নহে শুনিবামাত্র আমরা লম্বা লম্বা টিকি রাখিতে আরম্ভ করি; এবং চন্দ্রের অবস্থানভেদে জোয়ার ভাঁটা হয়, পাঠ করিবামাত্র কোষ্ঠী গণাইতে বসি। এমন শোচনীয় অবস্থা কি হয়?

বস্তুত, বিজ্ঞানের পদ্ধতি যে কী, তাহা আমরা জানি না ও জানা আবশ্যক বোধ করি না। মস্তিষ্কে কতকগুলা মশলা পুরিতে পারি, কিন্তু তাহা সাজাইয়া গোছাইয়া যথা বিন্যস্ত করিবার ক্ষমতা রাখি না। সমগ্রটা একেবারে নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া কেবল এক প্রদেশেই দেখিয়া থাকি, ও তাহা হইতে লম্বা চৌড়া সিদ্ধান্তের আবিষ্কার করি। খাইতে পারি, কিন্তু হজম করিবার শক্তি নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের অন্বেষণ করিতে গেলে আগে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া চোখের সমক্ষে দাঁড় করাইতে হয়, ও পরে সহস্র উপায়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ছেদ করিয়া, জোড়া লাগাইয়া ভাঙিয়া গড়িয়া, বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা এক লম্ফে সাগর পার হইতে চাই, সেতু বন্ধনের অপেক্ষা করিতে পারি না। ডিম হইতে বাহির হইবামাত্র উড়িতে চাই, পক্ষোদ্ভবের দেরি সহে না। উদ্যমও নাই, অধ্যবসায়ও নাই; ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া বর্হিজগতে প্রেরণ করিবার দরকার বোধ করি না; কেবল একবার চকিতের মতো দৃষ্টিপাত করিয়া, পরে

ধ্যানযোগে বিশাল বিশ্বের কার্য্যপ্রণালির সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করি। পাদরি সাহেব জাতিভেদের নিন্দা করিলেই আমরা পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলি, আবার রিস্‌লি সাহেব নাম মাপিয়া জাতিভেদের মূল আবিষ্কার করিয়াছেন শুনিলেই কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নেত্র বিস্ফারিত করিয়া থাকি। এমন স্নায়ুহীন পেশীহীন জীব কি আর আছে? ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের শতধা উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকতা জন্মিয়াছে স্বীকার করিতে পারি না। দেশী হউক আর বিলাতি হউক, গুরুবাক্য যতদিন আমরা দ্বিধাচিত্তে গ্রহণ করিব, ততদিন আমাদের বৈজ্ঞানিকতার উৎপত্তি সম্ভাবনা নাই।

বিজ্ঞান ছাড়িয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে বা অন্যত্রই আমরা কী করিয়াছি? কিছু দিন ইংরাজি ভাষায় টেকদার গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখিয়া বাহাদুরি লইবার তৃষ্ণা আমাদের শিক্ষিতদিগকে অভিভূত রাখিয়াছিল। সম্প্রতি সে ভ্রান্তি কতকটা গিয়াছে বলিতে হইবে। তবে আজিও অকারণে ইংরাজিভাষায় ব্যুৎপত্তি জাহির করিতে গেলে হাস্যাস্পদ ও অবজ্ঞাপদ হইতে হয় না। বাংলা সাহিত্য আমাদের সমাজ কতকটা সরগরম করিয়া রাখিতেছে সত্য। সুখের বিষয় ও আশার বিষয়। কিন্তু সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে আছে কী? উপন্যাস ও কাব্য? তাই বা কয়খানা? কাব্য-রস আস্বাদনের শক্তি আমাদের কতকটা আছে স্বীকার করি। সৌন্দর্য বোধ আমাদের পুরাতন জাতীয় সম্পত্তি। প্রকৃতিতে ও মানব চরিত্রে সৌন্দর্য অনুভব করিবার ক্ষমতায় আমরা কোনোকালে বঞ্চিত নাই। পূর্বেও ছিলাম না, এখনও নহি। ইংরাজি শিক্ষা যে এই অনুভূতির মাত্রা বা সূক্ষ্মতা বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ।

তবে ইংরাজি সাহিত্য ও ইংরাজের চরিত্র এবং পাশ্চাত্যগণের জাতীয় জীবনের ঘটনাবহুল বিচিত্র অদ্ভুত ইতিহাস অনেক অপরিচিত সুন্দর প্রদেশ আমাদের সম্মুখে আনিয়া দিয়াছে; আমরা এখন সেই নূতন ফুলের মধু আহরণে অধিকারী হইয়া কতকটা সৌভাগ্যবান্ হইয়াছি, এই পর্যন্ত।

ষাটি বৎসর ইংরাজি শিক্ষার ফলে আমরা ভাঙিতে শিখিয়াছি, গড়িতে শিখি নাই; আমাদের আহারের দ্রব্য বাড়িয়াছে, কিন্তু পরিপাকের শক্তি বাড়ে নাই; আমরা পরের কথার আবৃত্তি করিতে পারি, কিন্তু স্বয়ং বাক্য রচনা করিতে জানি না। আমাদের জ্ঞানজীবনে পরাধীনতা শোকাবহ। জ্ঞানালোচনায় আমাদের স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা নাই, আমরা আত্মনির্ভর ও আত্মমর্যাদা জানি না।

চিরদিনই কি এমনই ছিল? প্রকৃতই কি আমরা পিতৃপরম্পরাক্রমে পিতৃ-পিতামহ হইতে এই অস্থিহীন মাংসপিণ্ডবৎ কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছি? বস্তুতই কি আমাদের হীনতা ধাতুগত ও মস্তিষ্কগত? বস্তুতই কি আমরা মানুষ ও বানরের মধ্যগত পর্যায়ভুক্ত জীব?

অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়া নীরবে অশ্রুমোচন যাঁহার অভ্যাস আছে, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন—না। চিরদিন তো এমন ছিল না। গুরুবাক্যে ভারতবাসীর অমেয় শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে সত্য; এবং সেই আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা কখন কখন জ্ঞানবৃদ্ধির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাও সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন ভারতে জ্ঞানান্বেষণ ছিল না, এমন কথা বলিও না; তাহারা জ্ঞানের রাজ্য প্রসারিত করিতে জানিত না, অথবা পুরাতন পরিচিত পরিধির বাহিরে পদক্ষেপ করিতে সে কালের ভারতবাসী সাহস করিত না, এ

কথা বলিও না। কীরূপে প্রাচীনকে ধ্বংস করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, কীরূপে জীর্ণ কুটীর ভূমিসাৎ করিয়া অট্টালিকা গাঁথিতে হয়, কিরূপে সাহসের সহিত বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত করিয়া জ্ঞানবর্তিকা হস্তে করিয়া অজ্ঞানের তিমিররাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়, সে কালের লোকে জানিত। সাক্ষী—উপনিষদ্, সাংখ্য, বেদান্ত, দশমিকলিপি, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ, লীলাবতী, বীজগণিত ও গোলাধ্যায়; সাক্ষী—বুদ্ধ ও শঙ্কর, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্কর, গদাধর ও রঘুনাথ। কত নাম করিব? চক্ষে কি জল আইসে না? লেখনী কি সরে?

দধি সমুদ্র ও ইক্ষু সমুদ্রের কথা তুলিয়া হাসিয়ো না; 'তৈলে পাত্র কি পাত্রে তৈল' বিতর্কের কথা তুলিয়া বিদ্রূপ করিয়ো না; ঊনবিংশ শতাব্দীর উপার্জিত জ্ঞানের সহিত, সে কালের জ্ঞানের তুলনা করিয়া তাচ্ছিল্য দেখাইয়ো না। মনে রাখিয়ো, সে কোন্ কালের কথা; মনে রাখিও, তখন পৃথিবীর অবস্থা কী ছিল, তখন এ দেশেরই অবস্থা কীরূপ ছিল। নিউটন্ যাহা জানিতেন না, এখন তুমি জান; তথাপি তুমি নিউটনের চরণরেণুর যোগ্য নও, এ কথাও স্মরণ রাখিয়ো। তবে সে কালের মাহাত্ম্য বুঝিবে। অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণ লইয়া কথা নহে; জ্ঞানার্জনস্পৃহা ও জ্ঞানার্জনক্ষমতা লইয়া কথা। আমরা ইংরাজের নিকট শিখিতেছি; সে কালেও তাহারা পরের কাছে না শিখিত, এমন নহে। গ্রিকের নিকট জ্যোতিষশিক্ষা প্রমাণ। তবে বিদেশ হইতে বীজ আমদানি করিয়া তাহার চাষ করিতে জানিত, তাহা ফলাইতে পারিত; আমরা তাহা পারি না। আর যে জ্ঞান স্বাবলম্বনে নিজের চেষ্টায় উপার্জিত হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ ও মাত্রাই কি সামান্য? সে কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। সে কালের সহিত এ কালের তুলনা করিয়ো না।

পুরাকালের কাহিনি দূরের কথা, সে মুসলমানি আমলে আমাদের যা ছিল, এখনও তাই আছে কি? মুসলমান রাজার সময়ে আমাদের অবস্থা অতি নিকৃষ্ট ছিল, এখন বড়ো উন্নত হইয়াছে, এইরূপ একটা কথা গম্ভীরভাবে অনেকে যখনতখন বলিয়া থাকেন। ছি ছি! লোকে যখন কুর্নিশ করিয়া সাত পা পিছাইয়া কাজি সাহেবের সম্মুখে যাইত, যখন ভট্টাচার্য লম্বিত শিখাসহ টোলে ন্যায়শাস্ত্রের কচকচি লইয়া কাল কাটাইতেন ও গৃহস্থ ভদ্র পার্শির বয়েদ আবৃত্তি করিয়া মুনশিয়ানা জানাইত, এবং পাঠশালার গুরুমহাশয় পোড়োদের দ্বারা তামাক সাজাইয়া লইতেন ও উকুন তোলাইতেন, সে কালের অবস্থা মনে করিতেও আমাদের ঘৃণা আইসে। ছি, ছি, সে কালের কথা মুখে আনিও না।

আমরা লজ্জার মাথা খাইয়া তখনকার প্রসঙ্গও উত্থাপিত করিতে চাই, এবং তখনকার ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে চোখে হাত দিয়া থাকি। ভট্টাচার্যের টোলঘরের পার্শ্বস্থ গোশালা ও ইজার-পরিহিত কাজি সাহেবের মুখে পলাণ্ডুর গন্ধ ভুলিয়া যাই। প্রতাপ ও শিবাজি, নানক ও কবির, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান দেখিতে পাই। চতুষ্পাঠিমধ্যে গণিত ও জ্যোতিষ, বেদান্ত ও ন্যায়, কাব্য ও অলংকারের স্বাধীন আলোচনা মনে পড়ে। এ সকল সত্য কথা; ইতিহাসের অপলাপ করিও না। সে কালে যত দুর্দশাই থাক, সজীবতার লক্ষণ ছিল; শত্রুতেও আমাদের মর্যাদা করিত, ভয় করিত। এখন কি?

সুতরাং জ্ঞানার্জনে স্পৃহা ও ক্ষমতা আমাদের কোনোকালেও ছিল না এ কথা বলিলে সাজিবে না। ইংরাজি বিদ্যার কেহ দোষ দিবে না; সে কথা যে বলিবে, তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেল। তবে সম্প্রতি এ দুরবস্থার কারণ কী? কারণ অনুসন্ধেয়।

অদৃষ্ট দোষেই হউক আর শিক্ষা প্রণালির দোষেই হউক, ইংরাজি শিক্ষা ষাটি বৎসরে আমাদের দেশে ফলে নাই। বৎসর বৎসর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদানকালে প্রতিনিধি চ্যান্সেলারের মুখে এই আক্ষেপই শুনা যায়। আমাদের জ্ঞানার্জনে মতিগতি হইল না, জ্ঞানরসের প্রতি আমাদের তৃষ্ণা জন্মিল না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বৎসর বৎসর হাজার দরুনে গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করিতেছেন, কিন্তু একজনও একখান লাঙ্গল আনিয়া জ্ঞানরাজ্যের এক ছটাক জমিতে চাষ দিল না।

দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ততোধিক দুঃখের বিষয় আর একটা আছে। সরস্বতী যত্নের সহিত কোলে লইয়া তাঁহার বীণা পুস্তক তাঁহার সন্তানগণের হাতে দেন; কিন্তু কৃতী সন্তানেরা মায়ের কোল হইতে নামিবামাত্র বীণাটি ভাঙিগয়া ও পুস্তকখানি বেচিয়া মায়ের সপত্নী লক্ষ্মীদেবীর দাসত্বে নিযুক্ত হয়েন।

জ্ঞানার্জনের শক্তি নাই, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু অর্থোপার্জন জ্ঞানচর্যার একমাত্র উদ্দেশ্য, এ বড়ো ভয়ংকর ও লোমহর্ষক বাক্য। এবং সত্য বল দেখি ইংরাজি-শিক্ষা কি আমাদের সমাজে অর্থোপার্জনের ও জীবিকা অর্জনের সুগম উপায়মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে?

ইংরাজি-শিক্ষার প্রথম আবির্ভাবকালে যে সকল মহারত্ন সহসা আবির্ভূত হইয়া সমাজকে উলটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাদের হৃদয়ের উৎসাহবহ্নি শেষ পর্যন্ত হাকিমি, উকিলি, কেরানিগিরি প্রভৃতিতে কথঞ্চিৎ উপশমিত হয়। সেই অবধি আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষার বলে হাকিম ও উকিল ও কেরানিতে দেশটা প্লাবিত হইয়া গেল। ফলত মূষিক, অতি-বৃষ্টি প্রভৃতির ন্যায় গ্র্যাজুয়েটের অতি-সৃষ্টি রাষ্ট্রের পক্ষে একটা ইতিস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইতেছে। রাজা ব্যস্ত; ইহাদিগকে লইয়া কী করিবেন? সমাজ ব্যস্ত, কীরূপে ইহাদের খোরাক যোগাইবে; বিশ্ববিদ্যালয়-জননীও প্রসূত অপগণ্ডগুলির সংখ্যাধিক্যে, লজ্জিতা ও কাতরা। আমাদের মতো যাহারা বিশ্ববিদ্যালয় মাতার অকৃতী সন্তান তাহারাও ভ্রাতৃ-সংখ্যাধিক্যে ভীত হইয়া, সম্বোধন করিয়া ডাকিতেছে, 'সম্বর সুভগে, দিনকতক ক্ষান্তি দাও; এ যদুকুল আর বাড়াইয়া ফল কী! আমাদের খোরাকের কিছু আধার হউন! শেষে ভূভার-হরণের জন্য অবতারের প্রয়োজন যেন না হয়! জননী, উকিল প্রসবিনী, উকিলের আর স্থান নাই মা।'

অন্য দেশে কী অবস্থা, জানি-না; কিন্তু সম্প্রতি ভারতবর্ষে লোকে জীবিকার্জনের পন্থা শিখিবার জন্য বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ লাভ করে। এবং ইহাও একটা লোমহর্ষক সত্য কথা, যে ব্যক্তি বিদ্যামন্দির হইতে বাহির ইহয়া অর্থোপার্জনে সমর্থ না হইল, তাহার জীবন নিরর্থক বলিয়া বিবেচিত হয়।

সমাজ তাহাকে অবজ্ঞা করে, তাহার আত্মীয়-স্বজন তাহাকে টিটকারি দেয়; সে দুষ্কৃতকারীর মতো মুখ ঢাকিয়া লোকসমাজে বেড়ায়; তাহার জীবনে ভারবোধ হয়। সে অক্ষম ও ভাগ্যহীন, সংসার মধ্যে সে দয়ার পাত্র।

বিদ্যার এইরূপ লাঞ্ছন দেখিয়া গাত্রে লোমাঞ্চ জন্মে ভবিষ্যতের জন্য কোনো আশা থাকে না, সমাজের অধঃপতন দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইংরাজ অনেক আশায় ভারতবাসীর মূর্খত্ব অপনোদনের জন্য বিদ্যা বিতরণ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত অমূল্য রত্নের কি এই মূল্য? বানরের গলায় মুক্তার হার শোভা পায় না; ভারতবর্ষের বিদ্যা-মন্দিরগুলি ভাঙিগয়া ফেল।

ভারতবর্ষের অর্থাৎ যে দেশের মধ্যে এক সুবৃহৎ মানব-সম্প্রদায় অতি প্রাচীনকাল হইতে কেবল জ্ঞানার্জনের জন্য ধনলালসা ও ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া চিরজীবন পর্ণকুটীর ও শাকান্ন লইয়া তৃপ্ত থাকিত। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ভারতের ব্রাহ্মণের জীবনের ব্রত ছিল। তাহার কোশে অর্থ ছিল না; অধ্যয়ন ও অধ্যাপন মাত্র ব্রত করিয়া সে জীবনের সমুদয় ভোগাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়াছিল; এবং এই গরীয়ান্ স্বার্থ-সংহারের জন্য সমাজ তাহাকে শীর্ষস্থানে বসাইয়া পূজা করিত। অদ্যাপি চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ অধ্যাপক হিন্দু-সমাজে শীর্ষস্থানে দণ্ডায়মান আছেন; কোটিপতির মুকুট-মণ্ডিত মস্তক তাঁহার চরণরেণুর স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হয়।

এখনও সেই প্রাচীনকালের পদ্ধতির বিশুদ্ধ ধারার ক্ষীণস্রোত এদেশে বহিয়া আসিতেছে। এখনও নাকি সিন্ধুতীর ও কৃষ্ণাতীর শিক্ষার্থী নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে ভক্তিমাত্র দক্ষিণা ও উপহার লইয়া শিক্ষক-সমীপে উপস্থিত হয়।

তাহারা কী শেখে, কী না শেখে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। কী তাহাদের উদ্দেশ্য, কী তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, কীসে তাহাদের তৃপ্তি, কেবল তাহাই দেখিয়া নয়ন সার্থক করো।

ভারতবর্ষের অন্য জাতির কথা জানি না; কিন্তু হিন্দুজাতি জ্ঞানের মর্যাদা বুঝে না, ইহা তাহাদের জাতীয় অপকর্ষের পরিচয়, এ কথা কহিতে পারি না। তবে কেন এমন হয়?

কুক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট শিক্ষিতগণকে বড়ো চাকরিতে নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; এবং কুক্ষণে অর্থাগমের জন্য ইংরাজি জ্ঞানের দরকার হইয়াছিল। দরিদ্র অন্নার্থী ভারতবাসী অন্নাহরণের এমন সুগম পথ পাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সেই পথে ছুটিবে, বিচিত্র কী? তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। অন্নচিন্তা মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ; সে জন্য যে-দোষ তাহা দরিদ্র হিন্দু-যুবকের নহে; বিশেষত, মাসিপিসি ও পিসিত ভগিনীর বিধবা পুত্রবধুর অপোগণ্ড সন্তানগুলির সমবায়ভূত সুবৃহৎ ক্ষুধার্ত হিন্দু-পরিবার যখন সতৃষ্ণ ও সৌৎকণ্ঠভাবে কলেজ-যাতায়াতশীল যুবকের আগামী পরীক্ষায় পাশের জন্য ঊর্ধ্বমুখে তাকাইয়া থাকে। দেশশুদ্ধ সমুদয় লোককে যে অন্ন-চিন্তা ও বস্ত্র-চিন্তা ত্যাগ করিয়া বাগ্‌দেবীর আরাধনায় নিরত হইতে হইবে, এমন অসংগত প্রার্থনা করিতে পারি না, এবং কলেজ হইতে বাহির হইবামাত্র কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হিন্দু-যুবকের চক্ষের সম্মুখে অকস্মাৎ বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা মাতার শুষ্ক অক্ষম ও কঙ্কালাবশেষ শরীর শুশ্রূষার্থী হইয়া উপস্থিত হয়, ও বাল্যে বিবাহিত পত্নী তিন চারিটি শিশু-সন্তানসহ অনাথিনি হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিতে থাকে, এই ব্যাপারের জন্য মনুষ্য চরিত্র ও সমাজ চরিত্রকে দায়ী করিতে পার; হিন্দু যুবককে দায়ী করিতে গেলে বড়ো নিষ্ঠুরতা হইবে।

বিলাতি শিক্ষার সহকারে বিলাতি সভ্যতার নিয়ম এদেশে উপস্থিত হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংসার খরচের মাত্রাটা অযথা পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছে; সেটিও বিবেচনা করা উচিত। চটিজুতা ও তালপাতের ছাতা মাত্র লইয়া এমন কি সেনেট হাউসে পদার্পণ করাও বড়ো সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে; এবং উত্তরীয় মাত্র স্কন্ধে করিয়া সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে বেত্রাঘাতের আশঙ্কা থাকিয়া যায়। জলের গেলাস মুখে তুলিবার সময় ফিল্‌টার করা না থাকিলে ব্যাসিলাসের অবস্থিতির শঙ্কা জন্মে, এবং দেহে ব্যাধি ঘটিলে

কবিরাজ মহাশয়ের প্রাচীন কফপিত্তঘটিত প্যাথলজির আশ্রয় লইতে সাহস হয় না। সুতরাং জ্ঞান-স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী থাকিলেও কিঞ্চিৎ অর্থাগমের উপায় না দেখিলে চলে না; এবং ভিক্ষা ও চাকরি ভিন্ন অর্থাগমের তৃতীয় পন্থা এদেশে বর্তমান নাই!

একটা কথা উঠিয়াছে, ভালো ছেলেদের জন্য যদি বড়লোকে বৃত্তি সংস্থাপন করিয়া দেন, তাহা হইলে ভালো ভালো মাথা হাইকোর্টের গ্রানিট দেওয়ালের আশ্রয় লইতে না যাইতে পারে। উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নাই, কিন্তু যে পর্যন্ত লাটবাহাদুরগণের শুভ-বিদায় উপলক্ষে প্রস্তরমূর্তি স্থাপন দ্বারা পুণ্য সঞ্চয়ের সম্ভাবনা থাকিবে, ততদিন এ প্রস্তাব অরণ্যে রোদন মাত্র।

গবর্ণমেন্ট শিক্ষা বিভাগে দেশীয়দিগকে মোটা বেতনে চাকরি দেন না, এই একটা আক্ষেপ আছে। কথাটা ঠিক আমাদের মতো ভিক্ষোপজীবির উপযুক্ত, সুতরাং প্রথমে উপস্থিত করিতে লজ্জা হয়। কিন্তু অদৃষ্টবশে যখন ভিক্ষাবৃত্তি আমাদের উপজীব্য এবং ইংরাজি বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছে ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করিতেছি, তখন আর লজ্জা করিয়া কোনো লাভ নাই। গবর্ণমেন্টের উপর কতকটা দাবিও আছে।

*　　　*　　　*　　　*

আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষাপ্রণালীর মূলে দোষ বর্তমান আছে। এই মূলস্থ দোষের সংস্কার সাধন না হইলে কোনোরূপ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত শিক্ষার আশানুরূপ ফল লাভ না দেখিয়া প্রাচীনের দল পুনরায় টোলে প্রবেশ করিয়া অমরকোষ মুখস্থ করিতে উপদেশ দিতেছেন; এবং আমাদের ইংরাজ-মনিবেরা আমাদের জাতিগত হীনতাকেই কারণ স্থির করিয়া আমাদের মনুষ্যজাতীয়ত্বে কিছু সন্দিহান হইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় আমাদের জাতির মনুষ্যধর্মে সংশয় স্থাপনের সম্যক্ কারণ এখনও উপস্থিত হয় নাই; এবং দেশী পুথিগুলির বহুল প্রচারের জন্য ইংরাজি গ্রন্থগুলির উপর আমদানি মাশুল বসাইবার প্রস্তাবনা করিলেও ভবিষ্যতের আশা আছে। দোষ ইংরাজি বিদ্যার তো কখনোই নহে; এবং আমাদের জাতীয় চরিত্রেরও সম্পূর্ণ পরিমাণে নহে; বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রণালিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহাতে বিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সেই প্রণালীর সংস্কারের একবার চেষ্টা করা উচিত। কোন্‌দিকে সংস্কার চলিতে পারে, এ প্রবন্ধে উত্থাপন করিতে সাহসী হইলাম না। যদি কোনো পাঠক নিতান্ত করুণাপরবশ হইয়া বর্তমান প্রবন্ধের এতদূর পর্যন্ত পাঠ করিয়া থাকেন, তাহার সহিষ্ণুতাকে ধন্যবাদ দিয়া এই প্রবন্ধের এই স্থলে উপসংহার করিলাম।

উৎস : নানাকথা, ১৩০২, শ্রাবণ

# মাতৃভাষা এবং সাহিত্য

## শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভালো, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি যে সাহিত্যের সকল দিক ও বিভাগ লইয়া প্রকাণ্ড একটা কাণ্ড বাধাইয়া দিতে পারিব, আমার এমন কোনো মহৎ উদ্দেশ্য বা ভরসা নাই। তবে মাতৃভাষা এবং সাহিত্যের সাধারণ ধর্ম এবং প্রকৃতি এই ক্ষুদ্র স্থানে যতটা সম্ভব আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব মাত্র। আমার উদ্দেশ্য বৃহৎ নহে; অতএব যিনি বৃহৎ একটা আশা লইয়া আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পড়িতে বসিবেন, তাঁহার আশার তৃপ্তি সাধন করিতে আমি একান্ত অপারগ।

একটা কথা আমার অত্যন্ত দুঃখের সহিত মনে পড়িতেছে, আমার জীবনে আমি এমন দুই-একটি কৃতবিদ্য বাঙ্গালিকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিয়াছি, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলাই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও মাতৃভাষা জানা এবং না-জানার মধ্যে কোনো পার্থক্যই দেখিতে পাইতেন না। তাঁহারা সব-কটাই পাস করিয়াছেন এবং সরকারি চাকরিতে হাজার টাকা বেতন পাইতেছেন। অর্থাৎ যে-সব অদ্ভুত কাণ্ড করিতে পারিলে বাঙ্গালি সমাজে মানুষ প্রাতঃস্মরণীয় হয়, তাঁহারা সেই-সব করিয়াছেন। অথচ, বাঙ্গালায় একখানা চিঠি পর্যন্ত লিখিতে পারিতেন না। অবশ্য, না শিখিলে কিছুই পারা যায় না—ইহাতেও অত দুঃখের কথা নাই, কিন্তু বড়ো দুঃখের কথা এই যে, তাঁহারা নিজেদের এই অক্ষমতাটা বন্ধু-বান্ধবের কাছে আহ্লাদ করিয়া বলিতে ভালোবাসিতেন। লজ্জার পরিবর্তে শ্লাঘাবোধ করিতেন অর্থাৎ ভাবটা এই যে, এত ইংরাজি শিখিয়াছি যে, বাঙ্গালায় একখানা চিঠি লিখিবার বিদ্যাটুকু পর্যন্ত আয়ত্ত করিবার সময় পাই নাই। জানি না এ-রকম হাজার টাকার বাঙ্গালি আরও কত আছেন, কিন্তু এটা যদি তাঁহারা জানিতেন যে, মাতৃভাষা না শিখিয়াও ওই অতটা পর্যন্তই পারা যায়, কিন্তু, তার ঊর্ধ্বে যাওয়া যায় না, ওই চলা-বলা-খাওয়া-টাকারোজগার পর্যন্তই হয়, আর হয় না; যথার্থ বড়ো কাজ, যা করিলে মানুষ অমর হয়, যাঁর মৃত্যুতে দেশে হাহাকার উঠে, তেমন বড়ো কর্মী কিছুতেই হওয়া যায় না, তাহা হইলে নিজেদের ওই অক্ষমতার পরিচয় দিবার সময় অমন করিয়া হাসিয়া আকুল হইতে পারিতেন না।

তাই আজ আমি এই কথাটাই আপনাদিগকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইতে চাই যে যথার্থ স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার সাক্ষাৎ মাতৃভাষা ভিন্ন ঘটে না, যথার্থ বড়ো চিন্তার ফল সংগ্রহ করিবার পথ মাতৃগৃহদ্বারের ভিতর দিয়াই, বাঙ্গালি যখন বাঙ্গালি, সে যখন সাহেব নয়, তখন, বিলাতি ভাষার মস্তবড়ো ফাটকের সম্মুখে যুগযুগান্তর দাঁড়াইয়াও কোনোদিনই সে পথের সন্ধান পাইবে না।

এ কথা শুধু ইতিহাসের দিক দিয়াই সত্য নহে, মনোবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানের দিক দিয়াও সত্য।

কেন যে আজ পর্যন্ত জগতে, মানুষ যত-কিছু বড়ো চিন্তা করিয়া গিয়াছেন সে সমস্তই মাতৃভাষায়, বৈষয়িক উন্নতির অবনতির ফলে এক-একটা ভাষা সাময়িক প্রাধান্য এবং ব্যাপকতা লাভ করা সত্ত্বেও এবং সেই ভাষা সর্বতোভাবে আয়ত্তাধীন থাকা সত্ত্বেও কেন যে চিন্তাশীল ভাবুকেরা নামের লোভ ত্যাগ করিয়া নিজেদের অমূল্য চিন্তারাশি মাতৃভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কেন মাতৃভাষা ভিন্ন অপরের ভাষায় বড়ো চিন্তার অধিকার জন্মায় না, এই সত্যটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে গেলে, প্রথমত ভাষাবিজ্ঞানের দুটো মূল কথা মনে করিয়া লওয়া উচিত।

ব্রহ্মাণ্ডে আছে কী? আছে আমার চৈতন্য এবং তদ্বিষয়ীভূত যাবতীয় পদার্থ। অন্তর্জগৎ এবং বাহ্যজগৎ। উভয়ে কী সম্বন্ধ এবং সে সম্বন্ধ সত্য কিংবা অলীক, সে আলাদা কথা। কিন্তু এই যে পরিচয় গ্রহণ, একের উপরে অপরের কার্য, ইহাই মানবের ভাব এবং চিন্তা। এবং এই পদার্থ নিশ্চয়ই মানবের চিন্তার বিষয়। এমনি করিয়াই সমস্ত স্থূল বিশ্ব একে একে মানবের ভাব-রাজ্যের আয়ত্ত হইয়া পড়ে। ঘর-বাড়ি, সমাজ, দেশ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ এক-একটি চিন্তার জন্মদান করিয়া ইহারাই মানব-চিত্তে এক-একটি ভাব উৎপন্ন করে। অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ উভয়েই বিচিত্র তথ্য ও ঘটনায় ভরিয়া উঠে। উভয় জগতের এইসব তথ্য ও ঘটনা ছাড়া মানুষ ভাবিতেই পারে না। অর্থাৎ ইহাদের দ্বারাই মানবচিত্ত আন্দোলিত হইয়া ইহাতেই পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এক কথায় ইহারা ভাব ও ধারণার কারণও বটে, ইহারা তাহার বিষয়ও বটে।

এইবার মনের মধ্যে পদার্থের পরীক্ষা হইতে থাকে। ভাব ও চিন্তার কাছে তাহাদের প্রকৃতি ও স্বরূপ ধরা পড়ে, ধর্ম ও গুণের হিসাবে নানা লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া বাহ্যজগৎ এইবার ধীরে ধীরে সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট হইতে থাকে।

মানবের ভাব ও চিন্তাই যাবতীয় পদার্থে গুণের আরোপ করে। সে কি আর একটার সহিত তাহার কী প্রভেদ স্থির করিয়া দেয়। তারপর পদার্থের সহিত পদার্থের তুলনা করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লক্ষণ নির্ণয় করিয়া ধর্মবিশিষ্ট করিয়া আমরা তাহাদের ধারণা-কার্য সম্পূর্ণ করি।

বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সময়ের মানব-চিন্তা-প্রণালি পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায়, এই চিন্তা-প্রণালি কয়েকটা সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। একই নিয়মে মানবের চিন্তা-রাশি পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

যেমন বাহ্যজগতে দেখা যায়, কোনো দুটি বস্তু একই সময়ে একই স্থান অধিকার করিতে পারে না। অন্তর্জগতেও ঠিক তাই। সেখানেও কোনো দুটি বস্তু এক সঙ্গেই চিত্ত অধিকার করিতে পারে না। সেইজন্যই আমরা কোনোমতেই একসঙ্গে একই আয়াসে দুটি

বস্তুর পরিচয়-লাভ কিংবা একটি বস্তুর দুটি গুণনির্ণয় করিতে পারি না। আমরা বিষয় ভাগ করিয়া একটি একটি করিয়া লক্ষণ স্থির করি। অর্থাৎ চিন্তার কার্য ক্রমশ নিষ্পন্ন হয়। অন্তর্জগতে মন যেমন দুটি বস্তু বা দুটি গুণ এক সঙ্গে গ্রাহ্য করে না, বাহ্যজগতে পদার্থও তেমনি তাহার সব-কটা গুণই একই সময়ে মানব-চিত্তের কাছে প্রকাশ করে না। যুবতী রমণীর রূপ শিশুচিত্তের কাছে ধরা দেয় না। সে রূপের মূল্য উপলব্ধি করিবার জন্য শিশু-চিত্তকে একটা নির্দিষ্ট বয়সের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়।

এইজন্য ভাবের ক্রমিক বিকাশ, বয়োবৃদ্ধি ও ধারণা-শক্তির বিকাশের উপর নির্ভর করে। এবং তাহারি উপর ভাব ও চিন্তার সংখ্যাবৃদ্ধি হয়।

কিন্তু চিন্তা-পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা সাধারণ নিয়ম এই যে, পুরাতন ভাব ও ধারণার ভিত্তি অবলম্বন না করিয়া প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত চিন্তাস্রোতে গা ভাসান না দিয়া মানবচিত্ত কোনোমতেই নূতন ধারণা বা নূতন ভাব আয়ত্ত করিতে পারে না। জ্ঞাত ও সুনির্দিষ্ট পদার্থ নিয়ে অতীত দিনে যেভাবে চিত্তকে নাড়া দিয়া তাহার গুণ ও ধর্মের কাহিনি জানাইয়া দিয়া গিয়াছে অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে মনের মধ্যে যে জ্ঞান জন্মিয়া রহিয়াছে, সেই জ্ঞানের সহিত তুলনা না করিয়া, তাহাদিগকে ব্যবহার না করিয়া, কোনোমতেই মানুষ পদার্থের নূতন লক্ষণ ও ধর্মের পরিচয় পাইতে পারে না।

যেমন করিয়া এবং যে-যে উপায়ে শিশুচিত্তে প্রথম চৈতন্যের বিকাশ ঘটিয়াছিল, জানিয়া এবং না জানিয়া যে-সকল পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সেই তরুণ চিত্ত, ভাব, চিন্তা ও ধারণায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যে-সমস্ত জল, হাওয়া ও আলোক পাইয়া তাহার জ্ঞানের অঙ্কুর পল্লবিত হইয়া আজ শাখা-প্রশাখায় বড়ো হইয়াছে সেই জল হাওয়া, আলোককে বাদ দিয়া আর একটা অভিনব প্রণালিতে মানবচিত্ত কোনোমতেই নূতন জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। অর্থাৎ যেমন করিয়া সে মাতৃক্রোড়ে বসিয়া চিন্তা করিতে শিখিয়াছিল মরিবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সে সে-পথ ছাড়িয়া যাইতে পারে না—পুরাতন জ্ঞানকে অস্বীকার করিয়া পুরাতন পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া কাহারোই নূতন জ্ঞান, নূতন চিন্তা জন্মে না।

আরও একটা কথা। ভাব ও চিন্তা যেমন ভাষায় জন্মদান করে ভাষাও তেমনি চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত, সুসম্বদ্ধ ও শৃঙ্খলিত করে। ভাষা ভিন্ন ভাবা যায় না। একটুখানি অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে-কোনো একটা ভাষা মনে মনে আবৃত্তি করিয়াই চিন্তা করে—যেখানেই ভাষা নাই, সেখানে চিন্তাও নাই।

আবার এইমাত্র বলিয়াছি, পুরাতন নিয়মকে উপেক্ষা করিয়া, পুরাতনের উপর পা না ফেলিয়া নূতনকে পাওয়া যায় না—আবার ভাষা ছাড়া সুসম্বদ্ধ চিন্তাও হয় না—তাহা হইলে এই দাঁড়ায় বাঙ্গালি বাংলা ছাড়া চিন্তা করিতে পারে না, ইংরাজ ইংরাজি ছাড়া ভাবিতে পারে না। তাহার পক্ষে মাতৃভাষা ভিন্ন যথার্থ চিন্তা যেমন অসম্ভব, বাঙ্গালির পক্ষেও তেমনি। তা তিনি যত বড়ো ইংরাজি-জানা মানুষই হউন। বাংলা ভাষা ছাড়া স্বাধীন, মৌলিক বড়ো চিন্তা কোনোমতেই সম্ভব হইবে না।

এ-সব বিজ্ঞানের প্রমাণিত তথ্য। ইহার বিরুদ্ধে তর্ক চলে না; চলে শুধু গায়ের জোরে, আর কিছুতে না।

যে ভাষায় প্রথম মা বলিতে শিখিয়াছি, যে ভাষা দিয়া প্রথম এটা ওটা সেটা চিনিয়াছি, যে ভাষায় প্রথমে 'কেন' প্রশ্ন করিতে শিখিয়াছি, সেই ভাষার সাহায্য ভিন্ন

ভাবুক, চিন্তাশীল কর্মী হইবার আশা করা আর পাগলামি করা এক। তাই যে কথা পূর্বে বলিয়াছি তাহারি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি, পরভাষায় যত বড়ো দখলই থাক, তাহাতে ওই চলা-বলা-খাওয়া, নিমন্ত্রণ রক্ষা, টাকা রোজগার পর্যন্তই হয়, এর বেশি হয় না, হইতে পারে না।

তারপরে সাহিত্য। আমার মনে হয়, সর্বত্র এবং সকল সময়েই ভাষা ও সাহিত্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত। যেন পদার্থ ও তাহার ছায়া। অবশ্য প্রমাণ করিতে পারি না যে, পশুদের ভাষা আছে বলিয়া সাহিত্যও আছে। যাঁহারা 'নাই' বলেন, তাঁহাদের অস্বীকার খণ্ডন করিবার যুক্তি আমার নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে, ভাষা আছে কিন্তু সাহিত্য নাই।

ভাষা-বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, মানবের কোন অবস্থায় তাহার প্রথম সাহিত্য-সৃষ্টি তাহা বলিবার জো নাই, খুব সম্ভব, যেদিন হইতে তাহার ভাষা, সেই দিন হইতে তাহার সাহিত্য। যেদিন হইতে সে তাহার হত দলপতির বীরত্ব-কাহিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, যে দিন হইতে প্রণয়ীর মন পাইবার অভিপ্রায়ে সে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই তাহার সাহিত্য।

তাই যদি হয়, কে জোর করিয়া বলিতে পারে পশু-পক্ষীর ভাষা আছে অথচ সাহিত্য নাই? আমি নিজে অনেক রকমের পাখি পুষিয়াছি, অনেক বার দেখিয়াছি তাহারা প্রয়োজনের বেশি কথা কহে, গান গাহে। সে কথা, সে গান আর একটা পাখি মন দিয়া শুনে। আমার অনেক সময় মনে হইয়াছে, উভয়েই এমন করিয়া তৃপ্তির আস্বাদ উপভোগ করে, যাহা ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির অতিরিক্ত আর কিছু। তখন, কেমন করিয়া নিঃসংশয়ে বলিতে পারি ইহাদের ভাষা আছে, গান আছে কিন্তু সাহিত্য নাই? কথাটা হয়ত হাসির উদ্রেক করিতে পারে, পশু-পক্ষীর সাহিত্য! কিন্তু সেদিন পর্যন্ত কে ভাবিতে পারিয়াছিল গাছপালা সুখ-দুঃখ অনুভব করে? শুধু তাই নয়, সেটা প্রকাশও করে। তেমনি হয়ত, আমার কল্পনাটাও একদিন প্রমাণ হইয়া যাইতেও পারে।

যাক ও কথা। আমার বলিবার বিষয় শুধু এই যে, ভাষা থাকিলেই সাহিত্য থাকা সম্ভব; তা সে যাহারই হোক এবং যেখানেই হোক। অনুভূতির পরিণতি যেমন ভাব ও চিন্তা, ভাষার পরিণতিও তেমনি সাহিত্য। ভাব প্রকাশ করিবার উপায় যেমন ভাষা, চিন্তা প্রকাশ করিবার উপায়ও তেমনি সাহিত্য। জাতির সাহিত্যই শুধু জানাইয়া দিতে সক্ষম সে জাতির চিন্তাধারা কোন দিকে, কোথায় এবং কতদূরে গিয়া পৌঁছিয়াছে। দর্শন, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, এমন কি যুদ্ধবিদ্যার জ্ঞান ও চিন্তাও দেশের সাহিত্যই প্রকাশ করে।

একবার বলিয়াছি, ভাষা ছাড়া চিন্তা করা যায় না। তাই জগতে যাঁহারা চিন্তাশীল বলিয়া খ্যাত, তা সে চিন্তার যে-কোনো দিকই হউক, মাতৃভাষায় দেশের সাহিত্যে তাঁহারা ব্যুৎপন্ন এ কথা বোধ করি অসংশয়ে বলা যায়।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের প্রতি চোখ ফিরাইলে এই সত্য অতি সহজেই সপ্রমাণ হয়। তাঁহারা দর্শন বা বিজ্ঞান লইয়াই থাকেন, লোকে তাঁহাদের চিন্তার ওই দিকটার পরিচয় পায়, কিন্তু দৈবাৎ কোনো কারণ প্রকাশ পাইলে, বৈজ্ঞানিকের অসাধারণ সাহিত্য-ব্যুৎপত্তি দেখিয়া লোকে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যায়। বিলাতের হক্‌সলি, টিন্‌ডল, লজ, ওয়ালেস, হেল্‌মহোৎস, হেকেল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা খুব বড়ো সাহিত্যিক। আমাদের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রও কোনো খ্যাত সাহিত্যিক অপেক্ষা ছোটো নহেন।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় কিছুই থাকে না, যদি এই কথাটা মনে রাখা যায়। সাহিত্যকে বাদ দিয়া যাঁহারা বিজ্ঞান আলোচনা করেন, তাঁহারা বিজ্ঞানবিৎ হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু বাহিরের সংসার তাঁহাদের পরিচয় পায় না। কারণ, ভাষা সাহিত্যকে অবহেলা করার সঙ্গে সঙ্গেই, স্বাধীন চিন্তাশক্তিও অন্তর্ধান করে।

এইবার সাহিত্যের দ্বিতীয় অংশের কথা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিব। কিন্তু তাহার পূর্বে এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা কী? তাহা শুধু এই যে, মাতৃভাষা শিক্ষার যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। পরের ভাষায় সংসারের সাধারণ মামুলি কর্তব্যই করা যায়, কিন্তু বড়ো কাজ, বড়ো কর্তব্যের পথ মায়ের উঠানের উপর দিয়াই—তাহার আর কোনো পথ নাই। ইতিহাস ও বিজ্ঞান এই সত্যই প্রচার করে।

কিন্তু সাহিত্য বলিতে সাধারণত কাব্য ও উপন্যাসই বুঝায়। সে যে নিছক কাল্পনিক বস্তু। একশ্রেণির কাজের লোক আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস যাহা কল্পনা তাহাই মিথ্যা এবং মিথ্যা কোনোদিন কাজে লাগিতে পারে না। সেটা পড়িয়া নিশ্চয়ই জানিয়া রাখা উচিত, বিলাতের রাজা অত নম্বরের হেনরির কতগুলি ভার্যা ছিল এবং অমুক অমুক সালে, তাহাদের অমুক অমুক কারণে, অমুক অমুক দশা ঘটিয়াছিল। কারণ, কথাগুলি সত্য কথা এবং দশাগুলি সত্যই ঘটিয়াছিল। কিন্তু, কী হইবে জানিয়া বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথের ভার্যা সূর্যমুখীর কী দশা ঘটিয়াছিল এবং কেন ঘটিয়াছিল? তাহা তো সত্যই ঘটে নাই—লেখক বানাইয়া বলিয়াছেন মাত্র। বানানো কথা পড়িয়া বড়ো জোর সময়টাই কাটিতে পারে। কিন্তু, আর কোন্ কাজ হইবে? তাঁহাদের মতে যাহা ঘটিয়াছে তাহাই সত্য, কিন্তু যাহা হয়তো ঘটিলে ঘটিতে পারিত কিন্তু ঘটে নাই, তাহা মিথ্যা। কিন্তু বস্তুত তাই কী? এইখানে কবির অমর উক্তি উদ্ধৃত করি—

> ঘটে যা তা সব সত্য নয়, কবি তব মনোভূমি
> রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

বস্তুত ইহাই সত্য এবং বড়োরকমের সত্য। ইংরাজেরা যাহাকে 'এ হায়ার কাইন্ড অফ ট্রুথ' বলেন, ইহা তাহাই। সীতাদেবী যথার্থই শ্রীরামচন্দ্রকে অতখানি ভালোবাসিয়াছিলেন কিনা, ঠিক অমনি পতিগ্রতপ্রাণা ছিলেন কিনা, যথার্থই রাজপ্রাসাদ, রাজভোগ ত্যাগ করিয়া বনে-জঙ্গলে স্বামীকে অনুসরণ করিয়া ছিলেন কিনা, কিংবা ঐতিহাসিক প্রমাণে তাঁহাদের বাস্তব সত্তা কিছু ছিল কিনা, ইহাও তত বড়ো সত্য নয়, যত বড়ো সত্য কবির মনোভূমিতে জন্মিয়া রামায়ণের শ্লোকের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জানকী দেবী হউন, মানবী হউন, সত্য হউন, রূপক হউন, যাহা ইচ্ছা হউন; অত গভীর পতিপ্রেম তাঁহাতে সম্ভব অসম্ভব যাহাই হউক, কিছুমাত্র আসে যায় না; যখন, ওই গভীর দাম্পত্য-প্রেমের ছবি কবির হৃদয়ে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারিয়াছে এবং যুগ-যুগান্তর নর-নারীকে আদর্শ দাম্পত্য প্রেমে দীক্ষা দিয়া আসিয়াছে, ইহাই সত্য। সত্যকার অযোধ্যা সত্যকার রামসীতা অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে সত্য। অযোধ্যা হয়ত একটি রাম, একটি সীতাতে সত্য, কিন্তু কবির কল্পনায় যে রাম-সীতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, হয়ত তাহা আজ পর্যন্ত কোটি কোটি রাম-সীতাতে সত্য হইয়াছে।

সেদিন স্নেহলতার আত্মবিসর্জনকাহিনি সংবাদপত্রে পড়িয়াই মনে হইয়াছিল ঠিক এমনি করুণ, এমনি স্বার্থত্যাগের চিত্র কিছুদিন পূর্বে গল্প-সাহিত্যে পড়িয়াছিলাম। সে

মেয়েটিও দরিদ্র পিতাকে দুঃখ-কষ্ট হইতে অব্যাহতি দিবার জন্যই আত্মবিসর্জন করিয়াছিল। তাহারও বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইতেছিল এবং পাত্র পাওয়া যাইতেছিল না।

সংবাদপত্রের কাহিনি ওই একটি স্নেহলতাতেই সত্য, কিন্তু কবির কল্পনায় যে মেয়েটি আত্মহত্যা করিয়াছিল, তাহা হয়ত শত-সহস্রে সত্য।

স্নেহলতা শিক্ষিতা ছিলেন, কে জানে তিনি এই কাহিনি পড়িয়াছিলেন কি না, এবং স্বার্থত্যাগ-মন্ত্র ইহাতেই পাইয়াছিলেন কি না!

আমার বিশ্বাস কিন্তু এই। আমার নিশ্চয় মনে হয়, তিনি লেখাপড়া না জানিলে, সাহিত্যচর্চা না করিয়া থাকিলে কিছুতেই এ শক্তি, এ বল নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেন না। কবির কল্পনা এমনি করিয়াই সত্য হয়, কবির কল্পনা এমনি করিয়াই কাজ করে।

দেশের কল্পনায় দেশের সাহিত্য, দেশের ইতিহাস বড়ো হউক, জীবন্ত হউক, সত্য হউক, সুন্দর হউক, এই প্রার্থনাই আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করিতেছি। প্রত্যেক সুসন্তান অকপটে মাতৃভাষার সেবা করুন, এইটুকু মাত্র ভিক্ষা আপনাদের কাছে সবিনয়ে করিতেছি। কিন্তু কী করিলে সাহিত্য ঠিক অমনটি হইবে, সে পরামর্শ দিবার স্পর্ধা আমার নাই। শুধু এইটুকু মাত্র বলিতে পারি, যাহা সত্য বলিয়া মনে হইবে, অন্তরের সহিত যাহাকে সুন্দর বলিয়া বুঝিবেন, নিজের সাধ্যমত সেই পথ ধরিয়াই চলিবেন—তার পরে ফল ভবিষ্যতের হাতে।

যাঁহারা বড়ো সাহিত্যিক, বড়ো সমালোচক তাঁহারা পরামর্শ দিতেছেন, উপদেশ দিতেছেন ইংরাজি ভাব, ইংরাজি ভঙ্গি ত্যাগ করিয়া খাঁটি স্বদেশী হইতে; আমি নিজেও একজন অতি ক্ষুদ্র নগণ্য সাহিত্যসেবক, কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি, তাঁহাদের পরামর্শ, তাঁহাদের উপদেশ যে ঠিক কী, তাহা এখন পর্যন্ত বুঝি নাই।

কে কোথায় হ্রস্ব-ই-কার স্থানে ঈ দিয়াছেন, কে কোথায় 'অ'-কারের পরিবর্তে 'ও'-কার ব্যবহার করিয়া ভয়ানক অন্যায় করিয়াছেন, কে কোথায় কোন বিধবা বঙ্গনারীকে দিয়া এক মুমূর্ষ হতভাগ্য পরপুরুষের মুখে জল দিয়া সাহিত্যে বিষম কুরুচি টানিয়া আনিয়াছেন, এই-সব লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে মহা তোলপাড় হইতেছে, কেন হইতেছে, যথার্থ কী তাহাতে দোষ, কী হইলে ঠিকটি হইত, এ-সব খুঁটিনাটি আয়ত্ত করিয়া তাহাতে মতামত দিবার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি কিছুই আমার নাই।

কোনো সাহিত্য-সেবককেই আমি উপদেশ দিতে পারি না, এই করো কিংবা এই করা উচিত। শুধু এইটুকু বলি, হৃদয়ের মধ্যে এই সত্য জাগাইয়া রাখিয়া সাহিত্যসেবা করুন, যেন আপনার সেবা মাতৃভাষার দ্বার দিয়া স্বদেশবাসীকে কল্যাণের পথে লইয়া যায়। তখন কী উচিত, কী উচিত নয়, তাহা দেশের হৃদয় ও প্রাণই বলিয়া দেবে।

উৎস : শরৎ রচনাবলী ৫ম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

# সম্ভাষণ

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

**শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের সদস্যদের প্রতি**

আপনাদের এখানে আমি আহ্বান করেছি, দেখবার জন্য বোঝবার জন্য যে, আমি কী ভাবে এখানে দিন কাটাই। আমি এখানে কবি নই। এ কবির ক্ষেত্র নয়। সাহিত্য নিয়ে আমি এখানে কারবার করি নে। আমার এই কার্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যে বাণী এখানে প্রকাশ পেয়েছে, যে আলোকপ্রভা এখানে দীপ্তি দিয়েছে, তার ভিতর সমস্ত দেশের অভাব ও ভাবনার উত্তর রয়েছে। এখানে আমার সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা নয়, এখানে আমার কর্মই রূপ পেয়েছে। এখানে আমার এই কর্মের ক্ষেত্রে আমি এতদিন কী করেছি না করেছি তারই পরিচয় আপনারা পাবেন।

আমার গত জীবনের আনন্দ উৎসাহ সাহিত্য, সবই পল্লিজীবনের আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। আমার জীবনের অনেকদিন নগরের বাইরে পল্লিগ্রামের সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে, তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছি। যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকদের অভাব অভিযোগ, এবং কতবড়ো অভাগা যে তারা, তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল। এই-সব গ্রামবাসীরা যে কত অসহায় তা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। তখন পল্লিগ্রামের মানুষের জীবনের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে এই অনুভব করেছিলাম যে, আমাদের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লিতে। আমাদের দেশের মা, দেশের ধাত্রী, পল্লিজননীর স্তন্যরস শুকিয়ে গিয়েছে। গ্রামের লোকদের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায়ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। তাদের সেই বেদনা, সেই অসহায় ভাব আমার অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। তখন আমি আমার গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে সেই অসহায়দের সুখ দুঃখ ও বেদনার কথা এঁকে এঁকে প্রকাশ করেছিলাম। আমি এ কথা নিশ্চয় করেই বলতে পারি, তার আগে সাহিত্যে কেউ ওই পল্লির নিঃসহায় অধিবাসীদের বেদনার কথা, গ্রাম্য জীবনের কথা প্রকাশ করেন নি। তার অনেক পরিচয় আপনারা আমার গল্পে ও কবিতায় পেয়ে থাকবেন।

সে সময় থেকেই আমার মনে এই চিন্তা হয়েছিল, কেমন করে এই-সব অসহায় অভাগাদের প্রাণে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে পারি। এই-যে এরা মানুষের

শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষা হতে বঞ্চিত, এই-যে এরা খাদ্য হতে বঞ্চিত, এই-যে এরা একবিন্দু পানীয় জল হতে বঞ্চিত, এর কি প্রতিকারের কোনো উপায় নেই! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, পল্লিগ্রামের মেয়েরা ঘট কাঁখে করে তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়ে এক ক্রোশ দূরের জলাশয় হতে জল আনতে ছুটেছে। এই দুঃখদুর্দশার চিত্র আমি প্রত্যহ দেখতাম। এই বেদনা আমার চিত্তকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। কী ভাবে কেমন করে এদের এই মরণদশার হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায় সেই ভাবনা ও সেই চিন্তা আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল। তখন কেবলই মনে হত জনকতক ইংরাজি-জানা লোক ভারতবর্ষের উপর—যেখানে এত দুঃখ, এত দৈন্য, এত হাহাকার ও শিক্ষার অভাব সেখানে কেমন করে রাষ্ট্রীয় সৌধ নির্মাণ করবে। পল্লিজীবনকে উপেক্ষা করে এ কী করে সম্ভব হয় তা ভেবেই উঠতে পারি নি। সেবার পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে যখন দুই বিরুদ্ধ পক্ষের সৃষ্টি হল তখন আমাকে তাঁরা তাঁদের গোলযোগের মীমাংসার জন্য সভাপতির পদে বরণ করেছিলেন। আমার অভিভাষণ শুনে দুই পক্ষই আমার খুবই প্রশংসা করে বললেন, আপনি ঠিক আমাদেরই পক্ষের কথা বলেছেন; আমি কিন্তু জানতাম, আমি কারুর কথাই বলিনি। আমার জীবনের মধ্যে পল্লিগ্রামের দুঃখ-দুর্দশার যে চিত্রটি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল, বিচলিত করেছিল, আমার সেই হৃদয়ের কাজ সেখান হতেই শুরু করবার একটা উপলক্ষ পেয়েছিলাম।

আমার অন্তর্নিহিত গ্রামসংস্কারের আভাস সে সময় হতেই বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। নদীর তীরে সেই পল্লিবাসের সময়ে নৌকা যখন ভেসে চলত তখন দু ধারে দেখতাম পল্লিগ্রামের লোকের কত যে অভাব-অভিযোগ! সে শুধু অনুভব করেছি এবং বেদনায় চিত্ত ব্যথিত হয়েছে। ভেবেছি এই-যে আমাদের সম্মুখে অভাব ও অভিযোগের উত্তুঙ্গ শিখর দাঁড়িয়ে রয়েছে, একে কি আমাদের ভয়ের চক্ষেই কেবল দেখতে হবে। পারব না একে কখনো উত্তীর্ণ হতে? সে সময়ে দিনরাত স্বপ্নের মতো এই অভাব ও অভিযোগ দূর করবার জন্য আগ্রহ ও উত্তেজনা আমার চিত্তকে অধিকার করেছিল; যত বড়ো দায়িত্বই হোক-না কেন তাই গ্রহণ করব এই আনন্দেই অভিভূত হয়েছিলাম। আমার প্রজারা বিনা বাধায় আমার কাছে এসে তাদের অভাব-অভিযোগ জানাত, কোনো সংকোচ বা ভয় তারা করত না, আমি সে সময়ে প্রজাদের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করতে চেষ্টা করেছিলাম।

এমনি সময়ে আমার অন্তরের মধ্যে একটা প্রেরণা জেগে উঠল। নূতন একটা কর্মের দিকে আমার চিত্ত ধাবিত হল, মনে হল, শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমস্ত দেশের সেবা করব। এ বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। আমার ভাগ্যদেবতা কেবলই আমাকে ছলনা করেছেন, করুণা করেন নি, তাই তিনি আমাকে ছলনা করে নিয়ে এলেন শিক্ষাদানকার্যের ভিতর। আবার মনে হল মহর্ষির সাধনস্থল শান্তিনিকেতনে যদি ছাত্রদের এনে ফেলতে পারি তবে তাদের শিক্ষা দেওয়ার ভার তেমন কঠিন হয়তো হবে না। আমার ভাগ্যদেবতা বললেন—মুক্ত আলোকে প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের মধ্যে এদের নিয়ে যদি ছেড়ে দাও—এদের যদি খুশি করে দাও তবেই হবে, প্রকৃতিই উহাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে দেবে, কর্মসূচি করতে হবে না, কিছুই ভাবতে হবে না। আমার কবিচিত্ত এই নূতন প্রেরণা পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠল। প্রথমে পাঁচ-সাতটি ছাত্র নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলাম। শিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে কোনো যোগ ছিল না, কোনো ধারণাই ছিল না। আমি তাদের কাছে রামায়ণ-

মহাভারতের গল্প বলেছি, নানা গল্প ও কাহিনি রচনা করে হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি, তাদের চিত্তকে সরস করবার জন্য চেষ্টা করেছি। আমার যা-কিছু সামান্য সম্বল ছিল তাই নিয়ে এ কাজে নেমে পড়েছিলাম। তখন এমন কথা মনেও আসেনি যে, কত বড়ো দুর্গম পথে আমি অগ্রসর হয়েছি। ঈশ্বর যখন কাকেও কোনো কাজের ভার দেন তখন তাকে ছলনাই করেন, বুঝতে দেন না যে পরে কোথায় কোন্ পথে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। আমার ভাগ্যদেবতাও আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে ক্রমশ এমনভাবে আমাকে জড়িয়ে ফেললেন, এমন দুর্গম পথে আমাকে টেনে নিয়ে চললেন যে, আর সেখান থেকে ভীবুর মতো ফেরবার সম্ভাবনা রইল না। এখন আমাকে এই বিরাট এই বৃহৎ কর্মক্ষেত্রের ভার বহন করতে হচ্ছে। কোনো উপায় নেই আর তাকে অস্বীকার করবার।.....

আজ আপনারা সাহিত্যিকরা এখানে এসেছেন; আপনাদের সহজে ছাড়ছি নে—আপনাদের দেখে যেতে হবে আমাদের এই অনুষ্ঠান। দেখে যেতে হবে দেশের উপেক্ষিত এই গ্রাম, বাপ-মায়ের তাড়ানো সন্তানের মতো এই গ্রামবাসীদের, এই উপেক্ষিত হতভাগারা কেমন করে ছিন্ন বস্ত্র নিয়ে অর্ধাশনে দিন কাটায়। আপনাদের নিজের চোখে দেখতে হবে, কত বড়ো কর্তব্যের গুরুভার আমাদের ও আপনাদের উপর রয়েছে। এদের দাবি পূর্ণ করবার শক্তি নেই—আমাদের এর চেয়ে লজ্জা ও অপমানের কথা আর কী আছে! কোথায় আমাদের দেশের প্রাণ, সত্যিকার অভাব অভিযোগ কোথায়, তা আপনাদের দেখে যেতে হবে। আবার সত্যিকার কাজ কোথায় তাও আপনারা দেখে যান। আমি আমার জীবনে অনেক নিন্দা সয়েছি, অনেক নিন্দা এখনো আমার ভাগ্যে আছে। আমি ধনীসন্তান, দরিদ্রের অভাব জানি না, বুঝতে পারি না—এ অভিযোগ যে কত বড়ো মিথ্যা তা আপনারা আজ উপলব্ধি করুন। দরিদ্র-নারায়ণের সেবা তাঁরাই করেন যাঁরা খবরের কাগজে নাম প্রকাশ করেন। আমি গদ্যে পদ্যে ছন্দে অনেক-কিছু লিখেছি, তার কোনোটার মিল আছে, কোনোটার মিল নেই। সে-সব বেঁচে থাক্ বা না থাক্, তার বিচার ভবিষ্যতের হাতে। কিন্তু আমি ধনীর সন্তান, দরিদ্রের অভাব জানি নে, বুঝি নে, পল্লি-উন্নয়নের কোনো সন্ধানই জানি নে, এমন কথা আমি মেনে নিতে রাজি নই।

আমি ধনী নই, আমার যা সাধ্য ছিল, আমার যে সম্পত্তি ছিল, যে সামান্য সম্বল ছিল, আমি এই অপমানিতের জন্য তা দিয়েছি। আমি অভাজন, বক্তৃতা দিয়ে রাষ্ট্রমঞ্চে দাঁড়িয়ে গর্ব প্রকাশ করবার মতো আমার কিছুই নেই। একদিন সেই নদীপথে যেতে যেতে অসহায় গ্রামবাসীদের যে চেহারা দেখেছি তা আমি ভুলতে পারি নি, তাই আজ এখানে এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করেছি। তার পর এ কাজ একার নয়। এই কর্ম বহু লোককে নিয়ে। বহু লোককে নিয়ে একে গড়ে তুলতে হয়। সাহিত্য-রচনা একলার জিনিস, সমালোচনা তার দূর হতেও চলে। কিন্তু এই-যে ব্রত, এই-যে কর্মের অনুষ্ঠান, যা আমি গড়ে তুলছি, যে কাজের ভার আমি গ্রহণ করেছি—তার সমালোচনা দূর হতে চলে না। একে দরদ দিয়ে দেখতে হয়, অনুভব করতে হয়। আজ আপনারা কবি রবীন্দ্রনাথকে নয়, তার কর্মের অনুষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ করুন, দেখে লিখুন, সকলকে জানিয়ে দিন কত বড়ো দুঃসাধ্য কাজের ভিতর আমাকে জড়িয়ে ফেলতে হয়েছে।

আমি পল্লিপ্রকৃতির সৌন্দর্যের যে চিত্র এঁকেছি তা শুধু পল্লিপ্রকৃতির বাহিরের সৌন্দর্য; তার ভিতরকার সত্যরূপ যে কী শোচনীয়, কী দুর্দশাগ্রস্ত তা আজ আপনারা প্রত্যক্ষ

করুন। আমাকে এখানে আপনারা বিচার করবেন কবিরূপে নয়, কর্মীরূপে; এবং সে কর্মের পরিচয় আপনারা এখনই দেখতে পাবেন।

এই-যে কর্মের ধারা আমি এখানে প্রবর্তন করেছি, এই কার্যের, এই প্রতিষ্ঠানের ভার দেশের লোকের কি গ্রহণ করা উচিত নয়।..... আজ আপনাদের আমি আমার এই কর্মক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করে এনেছি, কবিতা শোনাবার জন্যে বা কাব্য-আলোচনার জন্যে নয়। আজ আপনারা দেখে যান এবং বুঝে যান বাংলার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র কোথায়। তাই এখানে আজ বার বার একই কথা বলেছি। আপনারা যদি আমার এই কর্মানুষ্ঠানকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারেন—তবেই হবে তার প্রকৃত সার্থকতা।

পল্লীপ্রকৃতি, ৩০ ফাল্গুন ১৩৪৩

# গণ-বিদ্রোহ

## ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

পলাশীর যুদ্ধের কিছুদিন পরে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গলার সর্বময় কর্তা হয় এবং নিরীহ বাঙ্গালি নীরবে বশ্যতা স্বীকার করে—ইহা সাধারণ বিশ্বাস। এই ভুল ধারণা ক্রমশ ভাঙছে। ভারত স্বাধীনরাষ্ট্ররূপে বিবর্তিত হওয়ার পর অনেক নূতন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য নিরঙ্কুশভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

আমরা জানি মিরকাসেম বঙ্গের কতকগুলি জেলার (যথা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর এবং বর্ধমান) দেওয়ানি ইংরেজ কোম্পানিকে প্রদান করেন। পরে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম সুবে বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি ইংরেজ কোম্পানির হাতে ন্যস্ত করেন। কোম্পানি নূতনভাবে শাসন-বিভাগ সংগঠিত করতে থাকেন। 'সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট' সেই নূতন সংগঠনের পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু এতেই আমরা যেন মনে না করি যে বাঙ্গলা অতি নির্বিঘ্নে আমলকবৎ ইংরেজের করতলগত হয়েছিল।

এই নূতন বন্দোবস্ত হওয়ার ফলে বাঙ্গলার অনেক অর্ধ-স্বাধীন ভূ-স্বামীদের ক্ষমতা খর্ব হয়। তাদের করদ-জমিদারে পরিণত করা হয়। প্রথমে বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের ভূইঞারাজদ্বয়কে ভুলক্রমে সাধারণ জমিদারের ন্যায় ভেবে তাদের রাজ্য নিলামে চড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়। অতঃপর এসব অর্ধস্বাধীন ভূস্বামীদের পাইক ঘাটোয়ালদের (militia) এই অজুহাত দেখিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয় যে কোম্পানি নিজেই শান্তিরক্ষা করবে। অতএব জমিদারদের পৃথকভাবে সৈন্য রাখার প্রয়োজন নেই। এই পাইকেরা নিষ্কর ভূমি ভোগ করত এবং দরকার পড়লে জমিদারদের কার্য করত। পশ্চিমবঙ্গের তখন ঘোর অশান্ত জীবন মেদিনীপুরের জঙ্গল মহালগুলিতে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। এস্থানের জমিদারেরা নিজেদের 'স্বাধীন রাজা' বলে ঘোষণা করতেন। তাঁদের পাইক ও স্থানীয় নিম্নশ্রেণির লোকেরা, যাঁদের ইংরেজরা 'চোয়াড়'[১] নামে অভিহিত করেছে, স্বীয় রাজাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নিষ্কর জমি ভোগ করত এবং প্রয়োজনের সময় রাজার হয়ে লড়ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব-দক্ষিণাংশের লোকেরা অশান্ত জীবনই কাটিয়েছে। মেদিনীপুরের জেলা-

১ Chuar Rebellion.

শাসক মিঃ প্রাইস্‌ তাঁহার পুস্তকাদিতে যে-চিত্র এঁকেছেন[২] তা পাঠ করলে আজকালকার বাঙালি মাত্রই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভাববেন এ কি বাঙলা দেশ? এরাই কি ইংরেজ কিংবদন্তির বাঙালি? বিষ্ণুপুর বীরভূম ও মেদিনীপুরে রাজাদের পরস্পরের ভিতর ঝগড়া, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি লেগেই ছিল (এসব ব্যাপারে জনৈক ইংরেজ কাপ্তেনের মুণ্ড উড়ে যায়)। এসব জমিদারগণ প্রায়ই স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতেন। অনেকেই কৌশলে মুগল সরকারকে দেয় খাজনা ফাঁকি দিত। তাদের ভীষণ দুর্দান্ত লাঠিয়ালেরা মুগল সরকারে প্রেরিত খাজনা রাস্তায় রাহাজানি করে কেড়ে নিয়ে নিজ জমিদারদের ফিরিয়ে দিত[৩]।

ইতিপূর্বেই উক্ত হয়েছে যে ইংরেজ কোম্পানি দেওয়ানি পেয়ে এসব রাজাদের খাজনা-প্রদানকারী বা করদ জমিদারে পরিণত করে। পশ্চিমবঙ্গের গৌরব মল্লভূমির অর্ধ-স্বাধীন ভুঁইয়া রাজার রাজত্ব খাজনার দায়ে নিলামে চড়লে বর্ধমানের ঠিকেদার খাজনা আদায়কারী জমিদার তাহা কিনে নেয়। এ প্রকারে বীরভূমের মুসলমানরাজ নিঃস্ব হয়ে গেল। হাণ্টার মহোদয় ইংরেজ কোম্পানির এ ভুলের বিষয় বিশেষ অনুযোগ করেছেন।

এর পরেই আসে মেদিনীপুরের পালা। জঙ্গল-মহলের অনেক রাজাদের ভূমি এবং তাদের পাইকদের নিষ্কর ভূমিও কেড়ে নেওয়া হল। ফলে উপস্থিত হল 'পাইক বিদ্রোহ'। সর্বস্বান্ত রাজাদের সঙ্গে তাঁদের একান্ত অনুগত পাইকগণ এবং 'অন্ত্যজ' জাতীয় প্রজারা মিলিত হয়ে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে! এই বিদ্রোহ জঙ্গলমহল ও মেদিনীপুর পরগণাতেই কেন্দ্র স্থাপন করে। ক্রমে ইহা মেদিনীপুর জিলার পূর্বদিকস্থ জগৎবল্লভপুর, দক্ষিণে নারায়ণগড়, পশ্চিমে রায়পুর (পূর্বে পুরুলিয়ার অন্তর্গত একটি পরগনা, বর্তমানে ইহা বাঁকুড়ার মধ্যে), মানভূমের পঞ্চকোট ও কাশীপুর পর্যন্ত পাইকদের বিদ্রোহ পরিব্যাপ্ত হয়। ইহারা বীরভূমেও অভিযান ক'রে রাজার জমিদারি এবং হুগলি জেলার ব্রাহ্মণ্যভূমিও দখল করে।

এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি। নাড়াজোলের রাজবংশীয় চুনিলাল খাঁও এই বিদ্রোহের সহিত যুক্ত ছিলেন। রায়পুরের রাজা দুর্জন সিংহ ও তাঁর পাইকেরা ইংরেজ তরফের জমিদারের নায়েব কিনু বক্সিকে যুদ্ধে মেরে ফেলে। যুদ্ধে দুর্জন সিংহ বন্দী হন। কিন্তু তাঁর পাইকেরা পরে পুনঃ তাঁকে মুক্ত করেন! বাগদিজাতীয় গোবর্ধন বাগপতি সেনাপতিত্ব করেন এবং চন্দ্রকোণাতে (তখন ইহা বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল) ভীষণ গোলযোগ সৃষ্টি করেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, ইংরেজ যে সব দেশীয় সিপাহি বিদ্রোহীদের বিপক্ষে পাঠাত তারা রাইতদের লুণ্ঠন করত। এ স্থলে ইহাই বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে দেশবাসীদের যোগাযোগ থাকত। ইংরেজ দখলীকৃত এলাকার লোকেরা সব সংবাদ বিদ্রোহীদের পাঠাত। মেদিনীপুর জেলায় বিদ্রোহীদের তিনটি বড়ো ঘাঁটি ছিল। বাহাদুরপুর, শালবনি ও কর্ণগড়। ইংরেজ কালেক্টরের রিপোর্ট এই যে, নাড়াজোল হতে বলদ-বাহিত চার গাড়ি অস্ত্র, বারুদ ও গোলা রানির কেল্লায় প্রেরিত হয়।

২ Price—Report on the Administration of Midnapore District (1880).

৩ ১৯০৫—৬ খ্রিঃ নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ মহাশয় লেখক এবং তাঁর বন্ধুদের কাছে এই গল্প বলেছিলেন যে এরকম লাঠিয়াল তাঁর এখনও একজন আছে।

এই বিদ্রোহী পাইকেরা স্বীয় নেতাদের প্রতি কত বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিল তাহা বক্ষ্যমাণ দৃষ্টান্ত থেকেই প্রমাণিত হয়। আনন্দপুর পাইকদের দ্বারা দখলীকৃত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর মোহনলাল নামীয় এক অশ্বারোহী সর্দার এসে তথায় উপস্থিত হয় এবং লুণ্ঠন কার্য বন্ধ রাখবার হুকুম দেন। ইংরেজ লেখক বলছেন ঃ নৈষ্ঠিকভাবেই হুকুম পালিত হয়। মোহনলাল তৎপর তার পতাকা সেই নগরে উড্ডীন করেন এবং অধিবাসীদের তাদের পরিবারবর্গকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার আজ্ঞা প্রদান করে বলেন যে যদি তাঁরা তাঁকে মানেন তাহলে কেহ তাঁদের গায়ে হাত দেবে না। কিন্তু তাঁর আদেশ অমান্য করলে অবশিষ্ট অধিবাসীদের তরবারির মুখে প্রাণ বিনষ্ট এবং নগরও ভস্মীভূত করা হবে।

১৭৯৯ খ্রি বিদ্রোহ চরমে উঠে। ইংরেজ কর্মচারীদের অনুমান যে, রানির জমিদারি এবং পাইকদের পাইকান ভূমি যাওয়ায় এরা ভেবেছিল যে একটা গোলযোগ সৃষ্টি করে নষ্ট-সম্পত্তি পুনরায় দখল করে নেবে। জঙ্গলমহলের "আদিবাসী" জাতীয় লোকসমূহও পাইকদের সঙ্গে যোগদান করে। সকল পাইকেরাই ইংরেজ কোম্পানিকে শান্তি স্থাপনে সহায়তা প্রদান না করে বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহীদের সঙ্গেই যোগদান করেছিল।

এ সময়ে ঘাটশিলার রাজাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁর মাটির কেল্লা ইংরেজ দখল করতে পারে নাই। সাধারণত লোকে ভরতপুরের মাটির কেল্লার যুদ্ধের কথাই জানে। কিন্তু বাঙ্গলায় তৎপূর্বেই সেই অভিনয় হয়ে গেছে! ইংরেজ যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম থেকে স্থানীয় লোক নিয়ে সৈন্যদল গঠন করবার জন্য হুকুম যায়। কিন্তু উত্তর আসে যে, স্থানীয় লোকদের সৈনিকের নির্দিষ্ট উচ্চতা নাই, অর্থাৎ তাঁহারা কিঞ্চিৎ খর্ব। পুনরায় ফোর্ট উইলিয়ম থেকে হুকুম যায় "কুছ্ পরোয়া নেই; ওখানকার লোকের মধ্য থেকেই সৈন্যদলে লোক সংগ্রহ কর।" অবশেষে কাঁথি ও জলেশ্বর হতে সাতশত লোক সংগ্রহ করে এবং তাদের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে ঘাটশিলার দুর্গ দখল করে রাজার শিরশ্ছেদ করা হয়[১]। অবশেষে ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ স্থানীয় লোকদ্বারা গঠিত সৈন্যদলের সাহায্য নিয়েই বিদ্রোহ দমন করে।

এ বিদ্রোহকে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা "চুয়াড় বিদ্রোহ" নাম দিয়ে সত্য তথ্য চাপবার চেষ্টা করেছে বটে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের ইহা "গণ-বিদ্রোহ"। 'চুয়াড়' নামে কোনো জাতি নাই। উক্ত নাম যাহাদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছে তাঁরা অন্ত্যজ বর্ণ হলেও বঙ্গভাষী বাঙ্গালি। পূর্বোক্ত পাইকেরাও বঙ্গভাষী বাঙ্গালি। এদের নেতৃত্ব করেন জনৈক বাগদিজাতীয় লোক। সর্বোপরি ছিলেন মেদিনীপুরের জমিদার-গৃহিণী, অর্থাৎ কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি। বিক্ষুব্ধ জমিদার ও সর্দারগণ এতে নায়কত্ব করেছিলেন। কাসিয়াড়ার রাজা সুন্দরনারায়ণ ও তাঁর জামাতা ছিলেন জনগণকে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করে তুলবার কার্যে অগ্রণী। স্থানীয় মারাঠা জমিদারেরাও যোগদান করেছিল এই গণ-বিদ্রোহে। ফলে অত্যন্ত ভীষণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল[২]। কিন্তু ভারতের গণ-বিদ্রোহে যে-দোষত্রুটি আমরা সিপাহি বিদ্রোহে দেখি তাহা এস্থলেও দেখা যায়—যথা কেন্দ্রীভূত কর্মপদ্ধতি

১ Price—Report on the Administration of the Midnapur District (1880).

২ (a) A. C. Mitra (i) Census 1951. West Bengal (ii) District Hand Book of Midnapur.
(b) Narendranath Das—(i) Paik Rebellion of 1799p. xxvii
(ii) the Resistance of the Chieftains, p xvii

ও একনায়কত্বের অভাব। অথচ মহাভারতে দৃষ্ট হয় বৃহস্পতি ও শুক্রনীতি অনুসারে একনায়কত্ব একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু জনগণ কালক্রমে তাহা ভুলে গিয়েছে।

যাহা হউক পরিশেষে রক্তপাত দ্বারা বিদ্রোহের দমন করা হয়। রানি শিরোমণি এবং চুনিলাল খাঁ[১] বন্দী হয়ে মেদিনীপুরে নীত হন। এঁদের ইহার পরবর্তী অবস্থা বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। তবে মেদিনীপুর অঞ্চলে কিংবদন্তি আছে যে রানিকে কলকাতার কেল্লায় নিয়ে আসা হয় এবং তথায়ই তিনি গতায়ু হন। কিন্তু চুয়াড়েরা পুনঃ অশান্তি সৃষ্টি করেন। তাঁরা ১৮০৬ খ্রি বগড়ি পরগনা পর্যন্ত হানা দেয়। তাঁরা স্বাধীনভাবেই কার্য করত; আর যারা বিপক্ষীয় ইংরেজদের সংবাদাদি সরবরাহ করত তাদের মেরে ফেলত। অবশ্য পরে ইহাও দমন করা হয়।

এস্থলে দুইটি ঘটনা আজকালকার ভীরুতা অপবাদগ্রস্ত বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ঃ (ক) আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট গভর্নমেন্টের চিঠি ছাপিয়ে প্রকাশ করেছেন যে বাঙ্গালি সিপাহি দ্বারা ঘাটশিলার দুর্গ জয় করা হয়। (খ) ডিসেম্বর ১৭৬৮ খ্রি এবং নভেম্বর ১৭৭০ খ্রি ঘাটশিলা এবং বরাহভূমের পার্বত্যাঞ্চলে চুয়াড় এবং পাইকেরা বিদ্রোহ করে; কিন্তু তাঁরা মেদিনীপুরে অভিযান করেননি। এ সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংস্ একটি বড়ো চালাকির চাল চালেন! এ অঞ্চলের সব জোয়ান ব্যক্তিদের কোম্পানির পল্টনে ভর্তি করে নেয় এবং তৎসঙ্গে তাদের পাইকান জমির স্বত্বও স্বীকার করা হয়। পরে তাদের দক্ষিণে পশ্চিমে এবং উত্তরে মহারাষ্ট্রীয়দের বিপক্ষে প্রেরণ করা হয়। শতাব্দীর শেষে ইংরেজ কোম্পানি নিজেকে মধ্য ও উত্তর ভারতে দৃঢ়ীভুত করেছে এবং ঘাটশিলার রাজাকে ধ্বংস করেছে। এক্ষণে কোম্পানির আর পাইকদের প্রয়োজন নেই। তাঁদের সৈন্য-শ্রেণি থেকে বিদায় করে দেওয়া হয় ও তৎসহ প্রদত্ত পাইকান জমিও কেড়ে নেওয়া হয়। এরই ফলে পাইক ও চুয়াড়েরা একত্রিতভাবে বিদ্রোহ করে। ইহার প্রথম প্রকাশ হয় এপ্রিল ১৭৯৮ খ্রি[২]।

এই কাহিনিতে আমরা দেখিতে পাই যে প্রয়োজন হওয়ায় ইংরেজ কোম্পানি বাঙ্গালি সিপাহি স্বীয় সৈন্যদলে নিয়ে যুদ্ধের কাজে লাগিয়েছে। তখন অ-সামরিক (non-martial) মত গড়ে ওঠেনি। পুনঃ সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে বগড়ি পরগনায় 'লায়েক বিদ্রোহ' উপস্থিত হয়। ইহাকে সাধারণত 'লায়েকালি' হাঙ্গামা বলা হয়[৩]। হয়ত উপরোক্ত সেন্সাস রিপোর্টার যাহাকে চুয়াড়দের ১৯০৬ খ্রি বিদ্রোহ বলেছেন, ইহা সেই পর্ব।

অতঃপর উত্তরবঙ্গে "গণ উত্থানের" পালা ১৭৭০ খ্রি (বাঙ্গলা ১১৭৬ সন) বাঙ্গলায় এক অতীব ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই সঙ্গে উত্তরবঙ্গে ইজারাদার দেবী সিংহ এবং খাজনা আদায়কারী গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অত্যাচরে 'গণ সাধারণ' ক্ষেপে গিয়ে বিদ্রোহ করে। প্রজাদের ঘর পোড়ানো, নারীধর্ষণ প্রভৃতির ন্যায় ভীতি ও নাশকতামূলক কার্য দ্বারা কোম্পানির খাজনা আদায় করা হত। এদের অত্যাচার এত তীব্র ও ভীষণ ছিল যে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচারকালে কর্মীপ্রবর বার্ক (Burke) তার উপরোক্ত অনুচরদের

১ কথিত আছে, ইনি বর্তমান নাড়াজোল রাজবংশের পূর্বপুরুষ।
২ Census of India, 1951
৩ মতিলাল শীল প্রণীত বকদ্বীপ দ্রষ্টব্য।

মানবাকৃতি শয়তান (devil in human form) আখ্যায় আখ্যায়িত করেছিলেন। অত্যাচারের বর্ণনা শুনে শ্রীমতী শেরিডন প্রমুখ অনেক ইংরেজ মহিলা মূর্চ্ছিতা হন। এই অত্যাচারের ফলে গণ-বিদ্রোহ সমুপস্থিত হয়। এ সময়ে উত্তরবঙ্গে এক রোমাঞ্চকারী নারীর উদয় হয়। তার নাম রানি চৌধুরানি। এঁর সঙ্গে বিদ্রোহীদের সংযোগ ছিল বলে অনুমান করা হয়। এঁর সেনাপতি ছিলেন ভবানী পাঠক নামীয় জনৈক মৈথিলী ব্রাহ্মণ। ইনি ইংরেজের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। রানি চৌধুরানির বজরায় বাস ও যুদ্ধাদি ইংরেজ লেখকগণ স্বীকার করে গিয়েছেন[১]।

এই রানি চৌধুরানিই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দেবী চৌধুরানি রূপে বর্ণিত হয়েছে। কথিত আছে, তিনি রঙ্গপুরের কোনো ব্রাহ্মণ জমিদার ঘরের মহিলা ছিলেন। রঙ্গপুরের জনৈক বৃদ্ধ জমিদার ১৯২৬ খ্রি লেখককে বলেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর এদের সেরেস্তার যে সব কাগজে জমিদার হরবল্লভ ও পুত্র ব্রজসুন্দরের নামোল্লেখ ছিল ওই সব নথিপত্র তাঁহারা গোপন করে ফেলেন। বঙ্কিম বর্ণিত দেবীর মাঠ প্রভৃতি এদেরই জমিদারির মধ্যে পড়ে। আশ্চর্যের কথা, উক্ত বংশ এই সম্বন্ধ অস্বীকার করেন এবং বলেন যে এ খবরের কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু এই বংশের বর্তমান জমিদারের পত্নী মহোদয়া ১৯৪৮ খ্রি লেখককে জানান যে দেবীর আসল নাম রানি চৌধুরানি। এঁদেরই জমিদারির মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এক কালীবাড়ি আছে। সেখানে হস্তাক্ষরে লিখিত রানি চৌধুরানির জীবনী পুস্তক আছে। বংশধরেরা এ বিষয়ে উদাসীন! যখন বাঙ্গলায় সকলে দেবী চৌধুরানির নামে গর্ব অনুভব করেন তখন তাদের লজ্জা বোধ করবার কোনো সংগত কারণ নেই। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ডাকাতি, খণ্ডযুদ্ধ, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি তো ভূস্বামীদের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। মহাভারতেও বর্ণিত আছে যে কুরুবংশের পিতামহ স্বয়ং বিরাট রাজার গোধন লুঠ করে আনবার জন্য গিয়েছিলেন। সেদিন পর্যন্তও কোনো কোনো জমিদার বংশের বদনাম ছিল যে, তারা পদ্মানদীতে নৌকায় আরোহীদের লুঠ করে তাদের নৌকা নদীতে ডুবিয়ে দিত। ইউরোপেও সামন্তযুগে পরের সম্পত্তি লুঠপাট করে নেওয়া বীরত্বের কার্য বলে বিবেচিত হত। রানি বা দেবী চৌধুরানি সম্বন্ধে সংবাদ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হলে ইতিহাসই উপকৃত হবে।

দক্ষিণ বাঙ্গলায় যখন গণ-বিদ্রোহ হয় তার পূর্বেই মেদিনীপুর জেলা নানাবিধ আক্রমণে প্রপীড়িত। এর মধ্যে ছিল সশস্ত্র সন্ন্যাসী ও ফকিরদের অত্যাচার। সন্ন্যাসীরা ছিল "নাগা" সম্প্রদায়ের লোক। তারা জোর করেই লোকের নিকট থেকে তোলা বা কর আদায় করত। লোকে এদের ভয়ে ভক্তি করত। পাইক বিদ্রোহের পূর্বে ১৭৭৬-৮০ খ্রি সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সশস্ত্রবাহিনী বাঙ্গলার সামাজিক ও রাজনীতিক আকাশে আবির্ভূত হয়। হালসিপুরের (হাতেয়া) রাজা নাগাদের সাহায্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইহার পূর্ব থেকেই উত্তর ভারতের অনেক দেশীয় নরপতির যথা, অযোধ্যা, জয়পুর, গোয়ালিয়র প্রভৃতির সৈন্যদলে "নাগা-ফৌজ" ভর্তি ছিল।

১ Hunter District Gazetteer

আকবরের সময় পর্যন্ত সশস্ত্র মুসলমান ফকিরেরা অহিংসবাদী হিন্দু সাধু ও সন্ন্যাসীদের উপর অত্যাচার করত, তাঁদের হত্যা পর্যন্ত করত। বারাণসীতে কেহ বৈকালে দেবদর্শনে বাহির হতে সাহস করত না। গঙ্গার জল হিন্দুব রক্তে লাল হয়ে যেত। এ অবস্থা দেখে সরস্বতী সম্প্রদায়ের সাধু মধুসূদন সরস্বতী[১] সম্রাট আকবরের নিকট থেকে এই মর্মে ইঙ্গিত পান যে হিন্দুরাও মুসলমানদের ন্যায় আত্মরক্ষা করতে পারে। এই হুকুম পেয়ে তিনি হিন্দু রাজাদের সিপাহিদিগকে গেরুয়া পোশাক পরিধান করিয়ে হিন্দু ও তাঁর ধর্মকে বাঁচাবার জন্য ধর্মযোদ্ধা (Knight Templers) সৃজন করেন। তাঁরা ধর্মান্ধ মুসলমান গাজিদের আক্রমণ প্রতিহত করেন[২]।

"দাবীস্তান" নামক ফার্সি পুস্তকে উল্লিখিত আছে, এই সন্ন্যাসীরা সর্বদাই যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত থাকত। উক্ত পুস্তকেই পুনঃ উল্লেখ আছে "মাদারিয়া ও জালালি" নামক সম্প্রদায় দুটির ধরন-ধারণ বাহ্যত নাগাদের ন্যায় ছিল। কিন্তু নাগাদের সহিত এদের যুদ্ধ লেগেই ছিল। ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকগণ বলেন, মুসলমান ফকিরদের স্পর্ধা অত্যধিক রকমের বেশি। তারা সাধারণ লোকের উপর জোর-জুলুম চালাত। কারণ তারা রাজার জাতের লোক। ইহারা সকলেই শাহ পদবি ব্যবহার করত। পুরাতন ইংরেজি সরকারি দলিল পত্রে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আক্রমণের কথা উল্লেখ আছে। উল্লিখিত আছে যে ইহারা বেশিরভাগ উত্তর ও পূর্ববঙ্গে যাতায়াত করত। বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্য হতে লোক নিয়েও এদের দল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ থেকেই 'ছেলেধরা' প্রবাদ বাংলায় প্রচলিত হয়েছিল। ১৭৭৩ খ্রি ফেব্রুয়ারি মাসে একদল সন্ন্যাসীকে ক্ষীরপাই-র (ঘাটাল মহকুমা) সন্নিকটে দেখা যায়। পুরী তাদের গন্তব্যস্থল ছিল। ইংরেজ সরকার তথাকার কর্মচারীকে ইহাদের বিনষ্ট করবার হুকুম দেয়। পুনঃ মার্চ মাসে এই দলের তিন হাজার লোক রায়পুরে আবির্ভূত হয়। কাপ্তেন ফরবেস তাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। কিন্তু তারা জঙ্গলমহল দিয়ে পালিয়ে যায়। জুন মাসে কাপ্তেন এডওয়ার্ডস তাদের দলকে আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হয়। আবার অন্যত্র উল্লিখিত হয়েছে নিহত হয়। আরেক জায়গায় ইহাও আবার উল্লেখ আছে, দুই জন অফিসার নিহত হয়। এই দল পরে প্রয়াগ অভিমুখে পালিয়ে যায়। রায় সাহেব শ্রী যামিনীমোহন ঘোষ মহোদয় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বাংলায় অভিযানের ব্যাপারে সরকারি কাগজপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সরকারি অফিস থেকে একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন[৩]। তিনি বলেছেন যে ফকিরেরা মজনুশার অধীনে মৈয়মনসিংহ জেলায় নানা প্রকারের নির্মম ও অকথ্য অত্যাচার করেছিল। স্বীয় সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার ভয়ে একটি মেয়ে নৃশংস অত্যাচারী ফকিরকে পিতা বলে সম্বোধন করেছে, তথাপি বলাৎকার করা হয়েছে ওই মেয়েটির উপর! উত্তর-পূর্বে যখন এ প্রকার ঘৃণ্য ও জঘন্য অত্যাচার চলছে তখন একটা অপ্রত্যাশিত

১ কোটালিপাড়ার ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব। ইনি শংকরাচার্যের মতকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এজন্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ পর্যন্তও তিনি খুব শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন।

২ J N. Farquhart (i) The Organisation of the Vedanta (*J. R. A. S.* of Great Britain and Ireland; July 1925).
(ii) The Fighting Monks of India in the *Journal of Anthropological Society* U.S.A.

৩ Jamini Mohan Ghose—*Sannyasi & Fakir Raider in Bengal* (C M. XXX).

আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। বগুড়া জেলার গেজেটিয়ার বলেছে যে মজনুশা বগুড়া জেলায় অবস্থান করছেন এমন সময় অকস্মাৎ উত্তর পশ্চিম থেকে আগত একদল নাগা সন্ন্যাসী আবির্ভূত হয়ে ফকিরদের উপর আক্রমণ করে।

ফকির নেতার কেবল শিশুপুত্র ছাড়া সকলেই নিহত হয়। লোকে ইহাকে ভগবৎ প্রেরিত দল বলেই বলাবলি করতে লাগল! এ ঘটনাকে লক্ষ করে সর্দার পাণিকর তাঁর পুস্তকে বলেছেন যে হিন্দুদের উপর ফকিরদের অত্যাচার দেখে মধুসূদন সরস্বতী কর্তৃক সৃষ্ট নাগা সন্ন্যাসীরা অত্যাচারীদের দমন করবার জন্যই বাঙ্গলায় গিয়েছিলেন[১]। কিন্তু ঘোষ মহাশয় বলেছেন যে পরে আবার নাগা ও ফকিরেরা মিলিত হয়ে কয়েক জায়গা থেকে টাকা আদায় করে।

বিভিন্ন রেকর্ড থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি পড়ে একথা বলা যায় না যে সন্ন্যাসীরা দেশপ্রেম ও স্বধর্ম প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে ফকিরদের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য বাঙ্গলায় শুভাগমন করেছিলেন। কেবল বগুড়ায় মজনুশার দলকে নিহত করা ব্যতীত আর কোথাও তাদের স্বজাতি বা স্বধর্ম প্রেম দেখা যায় নাই। অবশ্য ফকিরদের সঙ্গে প্রাচীন বৈরিতা ছিল। স্বধর্ম প্রেম বা স্বজাতি প্রেম তাদের সর্বত্র অনুপ্রাণিত করে নাই। ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ—অযোধ্যার নবাবের সৈন্যদলভুক্ত ১৪০০০ নাগা-সৈন্য বৃপনারায়ণ গোঁসাই-এর নেতৃত্বে ৩য় পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠা হিন্দুদের বিপক্ষে লড়িবার কাহিনি। কিন্তু যখন আফগানেরা মারাঠাদের কোতল করতে আরম্ভ করে তখন ভীত মারাঠা সৈন্যেরা নাগাদের তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তা পায়। আর মাবাঠা তাঁবু হতে লুণ্ঠিত রমণীদের নবাবকে ২২০০০ ভোমান দিয়ে খালাস করাতে বাধ্য করে[২]।

যাহা হউক বর্তমানে সংবাদের উপর নির্ভর করে আমরা নাগাদের বাঙ্গলায় অভিযান স্বধর্ম প্রেম বা স্বজাতি প্রেম প্রণোদিত বলতে পারি না। রঙ্গপুরে যুদ্ধ করে অবশ্য তারা কাপ্তেন টমাসকে নিহত কবেছিল কিন্তু উহা ইংরেজের সঙ্গে জাতীয় যুদ্ধ নহে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সকলে 'আনন্দমঠ' উপন্যাস পড়ে কল্পনা করেছিল সন্ন্যাসীরা "বন্দেমাতরম্" রণধ্বনি হাঁকত। আবার রং চড়িয়ে ঢাকার রমনার স্বামিজী বললেন, তারা 'ওঁ বন্দেমাতরম্' বলত!

এবার ইঙ্গ-বঙ্গের পালা। এবার অহিংস নীতি অনুসারে গণ-বিদ্রোহ হয়। ইহাকে 'নীলকর-বিদ্রোহ' নামেও অভিহিত করা যায়। ইংরেজ গভর্নমেন্টের সহায়তায় ইংরেজ মূলধনীরা মধ্য-বাঙ্গলায় নীলের চাষ আরম্ভ করে। তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও নীল উৎপন্ন হত না। ইংরেজ কারবারিরা জোর করে রায়তদের জমিতে নীল ছড়িয়ে তাদের তাহা বুনিতে বাধ্য করত। রায়তদের মারপিট ও তাদের উপর জুলুম বিশেষভাবেই হত। অবশেযে যশোরের ভৈরব বিশ্বাস এবং তাহার ভ্রাতা নীলকর চাষিদের নেতা হয়ে নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ (Passive Resistance) আরম্ভ করে[৩]। এ কাজে তাঁরাও নিতান্ত নিঃস্ব হয়ে পড়েন।

১ K. M. Pannikar—*A Survey of Indian History.*

২ Jadunath Sarkar—*The Last days of the Mughals.*

৩ Sisir Kumar Ghose—*Indian Sketches.*

চাষিরা বলে "প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই হাত আর নীল চাষ করবে না।" কলকাতায় হরিশ মুখোপাধ্যায় নামক একজন সংবাদপত্রসেবী তাঁদের বিষয় কাগজে আন্দোলন করতে লাগলেন। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার "নীল দর্পণ" নাটকে ইংরেজ নীল ব্যবসায়ীর অত্যাচারের বীভৎসতা প্রকাশ করেন। আমেরিকার টম কাকার কুটির (Uncle Tom's Cabin) নামক পুস্তকের ন্যায় উপরোক্ত পুস্তক নীলচাষের বীভৎসতার মুখোস খুলে দেয়।

এই পুস্তকখানা কবি মাইকেল দত্ত কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত হয়।[১] কিন্তু পাদরি লং সাহেবের প্রকাশ্যে নাম থাকাতে তাহার জেল হয়।

যশোর নদিয়া এবং পাবনায় এই গণ-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। নদিয়ার স্থানীয় এক ক্ষুদ্র জমিদার ইহার নেতা হন। ইংরেজের লাঠিয়ালদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য কৃষক স্বেচ্ছাসেবকগণ সংঘবদ্ধ হয়ে সদা সজাগ থাকতেন। তাদের সংগঠন ও প্রতিরোধ অদ্ভুত কৌশলপূর্ণ ছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ মহাশয় লেখকের জনৈক বন্ধুকে স্বদেশীযুগের প্রাক্কালে বলেছিলেন, "সেইরূপ বলিষ্ঠ শরীরের কৃষক আর দেখা যায় না।" কৃষকেরা অহিংসপন্থা অবলম্বন করেছিল।

যশোরে আর একবার নীলকর আন্দোলন হয়। উহার প্রধান কর্মী ছিলেন স্বামী কেশবানন্দ। বহু লেখালেখি ও কলিকাতার আন্দোলনের ফলে এই অত্যাচারের মূল কারণ অপসারিত হয়। শেষে জার্মানিতে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত হওয়ায় নীলের চাষ ভারত থেকে একেবারে উঠে যায়। কেবল কারখানাগুলির ভাঙা বাড়িসমূহ পড়ে থাকে।

স্বদেশীযুগের প্রাক্কালে নদিয়া জেলায় স্বদেশী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচারকার্যের সময়ে এক বৃদ্ধ মুসলমানের সহিত লেখকের আলাপ হয়। তিনি নীলকুঠির একজন পেয়াদা ছিলেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি সলজ্জভাবে বললেন "হাঁ বাবু, বড়ো অত্যাচার হত।"

এই প্রকারে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও তৃতীয় ভাগে বাঙ্গলায় গণ-বিদ্রোহ পুনঃপুন সংঘটিত হয়। অবশেষে নানা অত্যাচারে ঠগি ডাকাতি বন্ধের জন্য ওয়াকোপের আইন দ্বারা বলিষ্ঠ শরীরবিশিষ্ট গণশ্রেণীয় লোক দেখিলেই জেল দেওয়া প্রভৃতি বিবিধ কারণবশত পূর্বোক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় বর্ণিত গণশ্রেণীয় লোকের অন্তর্ধান হয় এবং তৎপরিবর্তে দুর্বল, ম্যালেরিয়া-রোগগ্রস্ত ক্ষীণ বাঙ্গালি কৃষকের আবির্ভাব ঘটে! তত্রাচ ১৯৩০-৪২ খ্রি পর্যন্ত মেদিনীপুরের কৃষক ও গণশ্রেণীয় লোকেরা ইংরেজ পুলিশের নির্মম অত্যাচারের প্রতিরোধের জন্য যে সব কার্য করেছে তাহার বিস্তৃত ইতিহাস আজও বাহির হয় নাই। এই উপলক্ষে শ্রীমতী মাতঙ্গিনী হাজরার নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখনীয়। তমলুক ও কাঁথি অঞ্চলে পুলিশের সন্ত্রাস প্রতিরোধ করণার্থ গণসাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল সন্ত্রাসবাদ (Counter terrorism) অবলম্বন করেন। এই আন্দোলনের কোনো কোনো নেতার সহিত লেখক ১৯৪৭ খ্রি কাঁথিতে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।

## প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গলা

ইংরেজ আমলের রাজকর্মচারী সি. ই. বাকল্যাণ্ড তাঁহার "লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নরদের অধীনে বাঙ্গলা" নামক পুস্তকে সিপাহি বিদ্রোহের আমলের প্রদেশপাল সার ফ্রেডারিক

১ একথা তথ্যসম্মত নয় (সম্পাদক)।

হ্যালিডে তৎকালীন বাঙ্গলা (বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যাসহ গঠিত) প্রদেশে সিপাহি বিদ্রোহের বিস্তার সম্বন্ধে যে সরকারি বিবরণ দাখিল করেন তাহা প্রকাশ করেছেন। ইহার মধ্যে খাস বাঙ্গলা সম্পর্কে অন্যান্য সংবাদাদির ভিতর নিম্নলিখিত বিবরণও প্রকাশিত হয়েছে।[১]

প্রদেশপাল স্যার হ্যালিডে তাঁর প্রদত্ত সরকারি বিবরণীতে বলেছেন যে বাঙ্গলা প্রদেশের বিহারের সাহাবাদ জিলায় কুমার সিংহের নেতৃত্বে বিরাট বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। ছোটোনাগপুর এবং কটক বিভাগে অবস্থা বিশেষ সঙ্গিন হয়ে উঠে। খাস বাঙ্গলাভাষী অধ্যুষিত বাঙ্গলার মধ্যে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, যেখানে হিন্দি-ভাষী উত্তর ভারতে সিপাহিদের ছাউনি ছিল সেখানেই বিদ্রোহ হয়েছে। উক্ত বিবরণীতে বলা হয়েছে, বাঙ্গলাভাষী লোকেরা সিপাহিদের সঙ্গে যোগদান করে নাই, বরং বিপক্ষতাচরণ করেছিল।

সাধারণত ইংরেজি শিক্ষিত বঙ্গবাসী বা ইংরেজ কোম্পানি-পুষ্ট শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্লুত ব্যক্তিরা এই সামন্ততান্ত্রিক প্রচেষ্টা সম্বলিত তথাকথিত সিপাহি বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই। ইহা কলিকাতার ইংরেজি শিক্ষিত বাবু এবং ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষপুট-পুষ্ট কেরানিবাবুদের মনোবৃত্তিসুলভ ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু জনশ্রুতি ও উপরোক্ত সরকারি বিবরণীর মধ্যে অনেক সংবাদ আছে যাহা এ ধারণার সমর্থনে যায় না।

উক্ত বিবরণী আরও বলছে, মানভূম জেলার পাঁচেটের (পঞ্চকোট) জমিদার রাজা নীলমণি সিংহদেব সিপাহিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে ধৃত ও বিচারাধীন হয়ে অন্তরীনে আটক হন।[২]

সিংভূমের লাউহাটের রাজা ইংরেজ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচারণ করেন।[৩] রাজা তাঁর দেওয়ান জগুর (Jaggoo) হস্তের ক্রীড়নক ছিলেন। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রাকালে দেওয়ান জগু ধৃত হয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। রাজা অর্জুন সিংহ জঙ্গলে পালিয়ে যান! এ সময়ে মানভূম ও সিংভূম জেলার বিভিন্ন কৌমদের মধ্যে এক বিশাল ব্যাপক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। পোড়াহাটের রাজা ও তাঁহার ভ্রাতা কোলদের ক্রমাগত উত্তেজিত করেছিলেন। রাজা তাঁর দেওয়ান রঘুদেও-এর প্ররোচনায় আত্মসমর্পণ করতে অসম্মত হন এবং রিপোর্ট লিখবার সময় পর্যন্ত জঙ্গলে লুক্কায়িত থাকেন।

আসাম বিভাগের জোড়হাটের রাজা কন্দর্প সিংহ সিপাহিদের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন। রাজা নাবালক ছিলেন এবং তাঁর দেওয়ান মণিরাম দত্তের হস্তের ক্রীড়নক ছিলেন। মণিরাম কলকাতায় থাকতেন। রাজার বাড়িতে খানাতল্লাশির ফলে মণিরাম দত্তের ষড়যন্ত্রমূলক চিঠিপত্র হস্তগত হয়। মণিরাম দত্তকে গ্রেপ্তার করে কিছুকাল আলিপুর জেলে আটক রাখার পর পুনঃ আসামে পাঠান হয়। বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়।[৪] তাঁর সঙ্গে

১। C. E Buckland—Bengal under the Lieutenant Governors Vol. I. chapter of Sir P. J. Halliday : Appendix pp. 65-162.

২—৩ Ibid. pp 193-204.

৪ তার সহিত শিক্ষিত বাঙালির যে যোগাযোগ ছিল তাহার সাক্ষ্য বাঙালি মধু মল্লিকের কার্যাবলীতেই প্রকাশ। মণিরাম দত্ত কর্তৃক মধু মল্লিক জোড়হাট প্রেরিত হন। কাপ্তেন চার্লস্ হল্‌রয়ডের (Charles

আরও চারজনকে ধরা হয়। তাঁদের এক জনের ফাঁসি, দুইজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, অপর একজনের ১৪ বৎসরের দ্বীপান্তর হয়। তরুণ রাজাকে আসাম থেকে এনে আলিপুর জেলে আটক রাখা হয়।

পুনঃ পূর্বাঞ্চলে মাসিয়া সর্দারদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। জয়ন্তিয়ার সিংহাসনচ্যুত রাজা চেরার সর্দারদের উত্তেজিত ও খেপাবার অপরাধে ধৃত হয়ে শ্রীহট্টে অন্তরীন হন। অন্যদিকে মণিপুরের জনকতক রাজকুমার ও তাদের সাঙেগাপাঙগ বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করেন।

আবার পূর্ববঙেগর অনেক অঞ্চলের মুসলমানেরা বিদ্রোহী সিপাহিদের নানাপ্রকারে সাহায্য করেন বলে জনশ্রুতি আছে। যশোরের ঝিকর-গাছির মহম্মদ আলি নামীয় এক পুলিশ জমাদার এক ধর্মের ফতোয়া জারি করে প্রচার করে যে 'শেষ বিচারের দিন (কেয়ামতের দিন) আসছে।' এ বিষয়ে গভর্নমেন্ট অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু বাকল্যাণ্ডের রিপোর্ট এ বিষয়ে নীরব!

কলকাতায় লোকের মধ্যে একটা অশান্তির ভাব সৃষ্টি হয়। গুজব রটে যে দেশীয় লোকেরা বিপুলভাবে অস্ত্রশস্ত্র কিনে গোপনে মজুত করে রাখছে। পুলিশের তদন্তে দেখা গেল যে যদিও দেশীয় লোকেরা কিছু অস্ত্রশস্ত্র কিনেছে তবু এই প্রচারে গুজবের ভাগই অত্যধিক বেশি। তথাপি পুলিশ আগামী মহরম পর্ব উপলক্ষে পাছে কোনো গোলমাল বাধে তাহার প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইহাতে মুসলমানদের মধ্যে ভয়ানক ত্রাসের সঞ্চার হয়। ম্যাজিস্ট্রেট বিশিষ্ট মুসলমান নেতাদের নিকট এই অমূলক ভয় ও ত্রাস নিরসনের জন্য অনুরোধ জানান! বক্‌রি ঈদ্ উৎসব শান্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইউরোপীয় দোকানদারেরা দেশীয়দের নিকট পিতলের টুপি ও বন্দুক বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেয় এই আশঙ্কায়, পাছে উহা উত্তর পশ্চিমের বিদ্রোহীদের নিকট পুনঃ চালান হয়ে যায়। অন্যদিকে বারাসত ও অন্যান্যস্থানে অযোধ্যার নবাবের দলের লোকদের গ্রেপ্তার ও আটক করে রাখা হয়। কলকাতায় চিতপুরের নবাবের বাড়িতে গোপন ও লুক্কায়িত অস্ত্রাদির সন্দেহে খানাতল্লাশি করা হয়।

পুনঃ ঢাকা জেলায় ফেরাজি সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়! অনেকে তাঁহাকে জোনপুরের ওই নামে পরিচিত এক খ্যাতনামা মোল্লার সহিত সনাক্ত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা প্রমাণিত হয়নি। চাঞ্চল্য প্রকাশ্য বিদ্রোহে পরিণত না হয়ে ঠান্ডা হয়ে যায়।

পশ্চিমবঙেগর বর্ধমান জেলায়ও বিপদ সৃষ্টির সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। কারণ দেশীয় পল্টনের উপর সন্দেহ ছিল এবং সাঁওতাল পরগনা ও ছোটোনাগপুরের গোলমালের ঢেউ আসতে পারে এ ভয়ও ছিল। মেদিনীপুরে এক পুলিশ বরকন্দাজ সিপাহিদের বিদ্রোহ করবার জন্য উত্তেজিত করছিল বলে ধরা পড়ে।

Holroyds) রিপোর্টেও রাজা কন্দর্পেশ্বর সিংহের জবানবন্দিতে প্রকাশ যে মধু মল্লিকই রাজাকে উত্তেজিত করার কাজে প্রধান পান্ডা ছিলেন। কাপ্তেন হল্‌রয়ড্ তাঁকে বন্দী করেন। মণিরাম দত্ত কলকাতার ছাতুবাবুর বাড়ি থেকে ধরা পড়েন। মধু মল্লিকের দ্বীপান্তর হয় এবং মণিরামের ফাঁসি হয়।

এসময়ে এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটে। হুগলি জেলার জমিদার ও অন্যান্যেরা গভর্নমেন্টের নিকট এক আবেদনে জানান যে পুলিশ বরকন্দাজরা অকর্মণ্য ও কাপুরুষ। তাদের বদলে লাঠিয়ালদের কার্যে নিযুক্ত করা হউক। তদনুসারে হুগলি সদর থানায় পরীক্ষামূলকভাবে তাদের (লাঠিয়াল) নিযুক্ত করা হয়। পরে হুগলির ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বহুসংখ্যক দেশীয় খ্রিস্টানদের উক্ত কর্মে নিয়োগ করা হয়। ইহারা ভালো এবং কর্মদক্ষ বলেও প্রমাণিত হয়।

ইহা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিপদের বেলায় বাঙ্গালি লাঠিয়াল এবং খ্রিস্টানদের সামরিক কার্যে ইংরেজ সরকার গ্রহণ করেছে। সুতরাং বাঙ্গালি 'সামরিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন' জাতি নয়, এই অপবাদ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারেনি!

ইতিমধ্যে কলকাতায় ইংরেজ সৈন্যদের দ্বারা নানা প্রকারের অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। ইংরেজ অধিবাসীরা সিপাহি বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

অন্যপক্ষে মণিরাম দত্ত কলিকাতায় গোপনে ষড়যন্ত্রের জাল বুনিতেছিল। ইহা অন্যান্য বঙ্গভাষী বাঙ্গালির সাহায্য ও সহায়তা ব্যতিরেকে কী প্রকারে সম্ভব হয়? এই দৃশ্যপটের পশ্চাতে নিশ্চয়ই একদল বাঙ্গালি ছিল। সুতরাং নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করতে বাধ্য যে ইংরেজ সরকারের পক্ষপুটে-পুষ্ট শ্রেণির বাহিরে বহু বাঙ্গালি ছিলেন যাঁরা সিপাহি বিদ্রোহের সহিত সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তজ্জন্য জীবন দানও করেছেন। এসব প্রমাণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও একথা বলে চলে না যে বাঙ্গালিরা "সিপাহি বিদ্রোহ" ব্যাপারে একেবারে উদাসীন এবং উহা হতে দূরে ছিল। সিপাহি বিদ্রোহ প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীয় মোরচা (Anti-Imperialist Front) রচনা করেছিল এবং পরবর্তীকালে উহা স্বাধীনতাকামীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

উৎস · বাঙ্গলার ইতিহাস

# বঙ্গ-সমাজের রূপান্তর ও নিরক্ষরের অধিকার

বিনয় সরকার

বিগত ছাব্বিশ সাতাশ বৎসরের ভিতর একটা নয়া বাঙ্গলা গড়িয়া উঠিয়াছে। চোখ খুলিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, বাঙ্গালি জাতি বাস্তবিক পক্ষে একটা গভীর রূপান্তর পাইয়া বসিয়াছে। এই রূপান্তর আজকাল আর তত বেশি অস্পষ্ট নয়। বাঙ্গলার নরনারী বলিলে ১৯০৫ সনের যুগে আমরা যে ধরনের লোকজন বুঝিতাম, ১৯৩২ সনে একমাত্র সেই ধরনের লোকজনই বুঝি না। নতুন নতুন রঙের, নতুন নতুন রূপের, নতুন নতুন নামের, নতুন নতুন ঢঙের নরনারী বাঙ্গালি জাতের অন্তর্গত,—একথা আমরা আজ বাঙ্গলা দেশের পল্লিতে পল্লিতে শহরে শহরে আর কলিকাতার মতন কেন্দ্রস্থলেও অহরহ বুঝিতেছি। সোজা কথায়, আমরা আমাদের চোখের সামনে বাঙ্গালির সামাজিক জীবনে একটা সুবিস্তৃত বিপ্লব দেখিতে পাইতেছি। এই সমাজ বিপ্লব আরও বাড়িয়া যাইবে, অতি অল্পকালের ভিতরই আরো গভীরতর রূপে বাঙ্গালিজাতের অলিতে গলিতে আত্মপ্রকাশ করিবে।

### বাঙ্গালি জগতে মুসলমান শক্তি

১৯০৫ সনের সম সম কালটা একবার কল্পনায় ফিরাইয়া আনা যাউক। দেখা যাউক তখনকার দিনে বাঙ্গালির সাহিত্যসভায় কোন শ্রেণির লোক, কোন নামের লোক, কোন রূপের লোক দেখা যাইত। শিক্ষার আন্দোলন বলিলে কীরূপ বাঙ্গালির কথা, কীরূপ বাঙ্গালির নাম শুনা যাইত? দেখা যাউক সেই যুগের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে যে সকল বাঙ্গালি যোগদান করিত তাহাদের হাড়, মাস, তাহাদের গোত্র, বংশ, তাহাদের পদবি, উপাধি কোন্ আকার প্রকারের ছিল। এই সকল প্রশ্ন একটু বেশ বস্তুনিষ্ঠভাবে তলাইয়া মজাইয়া আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। তাহা হইলেই বেশ মনে পড়িবে যে সেই ১৯০৫ সনের স্বদেশী যুগে আমাদের সাহিত্য সংক্রান্ত, শিক্ষা সংক্রান্ত, রাষ্ট্র সংক্রান্ত সকল প্রকার কর্মে প্রায় প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিই ছিল হিন্দু।

সে কালে মুসলমান বাঙ্গালি এই সকল আন্দোলনে পুরাপুরি না হইলেও প্রচুর পরিমাণেই অজ্ঞাত ছিল। বাঙ্গালির সার্বজনিক জীবন বলিলে সেকালে আমরা হিন্দু বাঙ্গালির

কর্মকথাই বুঝিতাম। মুসলমান বাঙ্গালিও যে বাঙ্গালি জাতের এক অঙ্গ সে কথা তখনকার দিনে আমরা বড়ো বেশি মনে রাখিতাম না। এমনকি তখনকার দিনে বাঙ্গালি বলিলে, বুঝিতাম একমাত্র হিন্দুকে। মুসলমান শব্দটা অন্তত বাঙ্গালি হিন্দুর মুখে যেন অ-বাঙ্গালিই বুঝাইত। আজ ১৯৩২ সনে ছাব্বিশ সাতাশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় বাঙ্গালি জাতটা কীরূপে দাঁড়াইয়া গিয়াছে? মুসলমানেরাও যে বাঙ্গালি তাহা আজকাল যখন তখন যেখানে সেখানে বিনা গবেষণায়, বিনা কষ্টকল্পনায় সকলেই বুঝিতে পারিতেছি। বাঙ্গালি জাতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে মুসলমানেরা আজকাল অন্যতম প্রবল শক্তি। ১৯৩০ সনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার ভিতর মুসলমান পুরুষ ও নারী অনেক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। মুসলমানেরা বাঙ্গালি সমাজকে রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে প্রচুর পরিমাণে ঐশ্বর্যশালী করিয়া তুলিয়াছে। আজকালকার সার্বজনিক সভাসমিতিতে হিন্দুর ডাইনে বাঁয়ে, হিন্দুর সম্মুখে পশ্চাতে দেখিতে পাই মুসলমান-যুবককে, মুসলমান-প্রবীণকে। যুবক মুসলমান বাঙ্গলা দেশকে বাঙ্গালি হিসাবে দুনিয়ার রাষ্ট্রক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। বাঙ্গলার মুসলমান বাঙ্গালি রাষ্ট্রবীর হিসাবে জগতে গৌরবান্বিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। মফস্‌সলের যে কোনো সংবাদপত্রই খুলি না কেন, আর কলিকাতার তো কথাই নাই, সর্বত্রই,—মুসলমান রাষ্ট্রকর্মীদের নাম হামেশা চোখে পড়ে। বাঙ্গালির রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন এই যুগে আর একমাত্র হিন্দুভাবাপন্ন নয়। বাঙ্গালির রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে মুসলমান প্রভাব হিন্দু-প্রভাবের প্রায় সমকক্ষরূপে মর্যাদা লাভ করিতেছে।

## পাঠশালায় মুসলমান

বাঙ্গলা দেশের গ্রাম্যপাঠশালাগুলির দিকে একবার নজর ফেলিয়া দেখি। জেলায় জেলায় যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে সেই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা ১৯০৫ সনের তুলনায় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্প্রতি আমি এই সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলিতে চাই না। বলিতে চাই এই যে—১৯০৫ সনের গ্রাম্য পাঠশালায় অথবা হাইস্কুলে যে সকল ছাত্রছাত্রী দেখিতাম তাহার অধিকাংশ হিন্দু। ইস্কুল বলিলে তখনকার দিনে যেন অনেকটা হিন্দু প্রতিষ্ঠানই বুঝা যাইত। আজ সে কথা আর বলা চলে না। ইস্কুলগুলি এক্ষণে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভাবে হিন্দু প্রাধান্য বর্জন করিয়াছে। তাহার পরিবর্তে দেখিতে পাই হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীর সখা মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী, মুসলমান ছাত্রের বন্ধু হিন্দু ছাত্র। আগেকার দিনেও ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানদের বন্ধুত্ব অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইত বটে কিন্তু তখনকার দিনে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা অল্প বলিয়া হিন্দুতে মুসলমানে বন্ধুত্বের সুযোগ সুবিস্তৃত ছিল না। আজকাল বহুসংখ্যক হিন্দু ছাত্র বহুসংখ্যক মুসলমান ছাত্রের সঙ্গে একত্রে গড়িয়া উঠিতেছে। একথা আজকাল কলেজ-জাতীয় উচ্চ শ্রেণির বিদ্যালয় সম্বন্ধেও খাটে। মফস্‌সলে অথবা কলিকাতায় যে সকল আই. এ., আই. এস. সি., বি. এ., বি. এস. সি., কলেজ আছে তাহাদের ভিতর মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়া আসিতেছে। একালের কলেজগুলি একমাত্র হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান একথা বলা চলে না। বাঙ্গালি জাতের সারস্বত আয়তনগুলি কী পল্লিগ্রামে কী শহরে,—সর্বত্রই মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর প্রভাবে নতুন গড়ন পাইতে বসিয়াছে। হিন্দুরা

একালে আর কোনো প্রকার বিদ্যালয়ে একচেটিয়া প্রভাব অথবা সুযোগ ভোগ করে না। এমন-কি চিকিৎসা বিদ্যালয়, টেকনিক্যাল, এঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য ব্যবসা সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও মুসলমানেরা অল্পে অল্পে হিন্দুদের সঙ্গে সাহচর্য করিতে অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গালি জাতের মুসলমান অঙ্গ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের মতো শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাহার ইজ্জত ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া চলিয়াছে।

## মুসলমানের বঙ্গসাহিত্য

এইবার বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা কিছু বলিব। ১৯০৫ সনের যুগে যে কয়জন বাঙ্গালি মুসলমান বাঙ্গলা ভাষায় গদ্য ও পদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করিত তাহাদের নাম আঙ্গুলে গোনা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু ছাব্বিশ সাতাশ বৎসরের ভিতর কী দেখিলাম? বাঙ্গলা দেশের মফস্সলে ও শহরে যে সকল দৈনিক কাগজ চলিতেছে তাহাদের সম্পাদক, সহযোগী, সাংবাদিক ও লেখকদের ভিতর মুসলমান আর নগণ্য নয়। মুসলমানেরা বাঙ্গলা সাহিত্যে হাত দেখাইবার দিকে বেশ একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্য মুসলমানদের কৃতিত্বে বৈচিত্র্য লাভ করিতেছে। মুসলমান মস্তিষ্কের দান পাইয়া বাঙ্গলা দেশের চিন্তা নানা তরফ হইতে বিস্তৃততর ও গভীরতর হইয়া উঠিতেছে। মুসলমানের বঙ্গসাহিত্য ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে। মফস্সলের বিভিন্ন জেলায় মুসলমান প্রবন্ধলেখক, মুসলমান কবি, মুসলমান গ্রন্থকার সাহিত্যে ইতিহাসে ও অন্যান্য বিভাগে বেশ উল্লেখযোগ্য রচনা সৃষ্টি করিয়াছে। বিগত ছাব্বিশ সাতাশ বৎসরের বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহারা ঐতিহাসিক গবেষণা করিবেন তাঁহারা একমাত্র হিন্দু লেখকদের রচনার তালিকা দিয়া আর তাঁহাদের কর্তব্য সমাধা করিতে পারিবেন না। তাঁহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান লেখকদের রচনাগুলিও তালিকাবদ্ধ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। দেখা যাইবে যে মুসলমান লেখকের সংখ্যা তো বাড়িয়াছেই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার রচনা কৌশল, চিন্তা প্রণালি আর দার্শনিক অথবা কর্তব্য প্রচার সংক্রান্ত মতামত সমূহও বাঙ্গালি জাতির আত্মিক উন্নতির সাক্ষী। বাঙ্গালি মুসলমানদের রচিত সাহিত্য বাদ দিলে একালের বাঙ্গলা সাহিত্য যারপর নাই দরিদ্র হইয়া থাকিবে। মুসলমানেরা ইতিমধ্যেই বাঙ্গলা সাহিত্যের ভিতর পল্লি কৃষাণের জীবন, মফস্সলের যথার্থ বাণী, জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষ যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠভাবে গোটা বাঙ্গালি জাতির নিকট খুলিয়া ধরিয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটা নবীন ভাবুকতা, একটা তাজা তেজস্বিতা, একটা সরস প্রাণবত্তা বাঙ্গালি জাতিকে চিন্তা ক্ষেত্রে এবং কর্মের আসরে উদ্‌বুদ্ধ করিতেছে। বাঙ্গালি জাতি মুসলমানদের নিকট এইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি পাইয়া বিশেষরূপে লাভবান হইয়াছে।

## কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে মুসলমান

এক্ষণে বাঙ্গালি জাতির আর্থিক জীবন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। এইক্ষেত্রে মুসলমানদের কৃতিত্ব বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালি চাষি বলিলে প্রধানত মুসলমানই বুঝায়। বিশেষত পূর্ববঙ্গে মুসলমানেরা তো চাষ আবাদে এক প্রকার একচেটিয়া স্থান অধিকার করে। চাষির জীবনধারণ বলিলে বাঙ্গলা দেশে আমরা মুসলমানদের আর্থিক

অবস্থাই বুঝিয়া থাকি। বাঙ্গালি জাতি যতই আর্থিক উন্নতির কথা ভাবিতে থাকিবে ততই তাহাকে বিশেষ করিয়া চাষিদের অর্থাৎ প্রকারান্তরে বাঙ্গালি-মুসলমানদের সুখ-দুঃখ, বাঙ্গালি মুসলমানদের স্বাস্থ্য, বাঙ্গালি মুসলমানদের ঘর বাড়ি ও শিক্ষাবিধান ইত্যাদির দিকেই নজর দিতে হইবে। বস্তুত বিগত ছাব্বিশ সাতাশ বৎসরের স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালি মুসলমানেরা চাষি হিসাবে বাঙ্গালি জাতির চিন্তা ও কর্মের ভিতর কেন্দ্রস্থল হইয়া রহিয়াছে। ১৯০৫ সনের যুগে এই সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তত নিবিড় ও স্পষ্ট ছিল না। আজ ক্রমশই বুঝিতে পারিতেছি যে, বাঙ্গালির আর্থিক উন্নতি বলিলে প্রধানত বাঙ্গালি চাষির উন্নতিই বুঝিতে হয়। আর বাঙ্গালি চাষির উন্নতির অর্থই হইতেছে বাঙ্গালি মুসলমানের আর্থিক স্বচ্ছলতা। সুতরাং বাঙ্গালি মুসলমানের প্রভাব বাঙ্গালি জাতির চিন্তায় অহরহ বিরাজ করিতেছে। তাহা ছাড়া জেলা হইতে জেলায় মাল আমদানি রপ্তানির কাজে মুসলমানেরা বেশ তৎপর অথবা অগ্রণী। এদিকে হিন্দু এবং মুসলমানের ভিতর কাহার কৃতিত্ব বেশি তাহা স্ট্যাটিসটিকসের সাহায্যে মাপিয়া জুকিয়া বলা সম্প্রতি কঠিন। অধিকন্তু কলিকাতা এবং মফস্সলের পাইকারি ও খুচরা দোকানদারের ভিতর মুসলমানদের ইজ্জত অনেক উঁচু। এই ক্ষেত্রেও হিন্দু আর মুসলমানদের ভিতর কে বড়ো তাহা মাপিয়া বলা সহজ নয়। বোধ হয় মুসলমানেরাই এই সকল আর্থিক কর্মক্ষেত্রে হিন্দুর চেয়ে বেশি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। তাহা ছাড়া ছোটো বড়ো মাঝারি শিল্পকর্ম, কুটির-শিল্প, কারখানা ইত্যাদির কাজেও মুসলমান পরিচালক, মুসলমান কর্মাধ্যক্ষ, মুসলমান ধুরন্ধর বাঙ্গলা দেশের সর্বত্রই নামজাদা। এই সকল কথা ১৯০৫ সনের যুগে বাঙ্গালি জাতি বড়ো বেশি জানিত কিনা সন্দেহ। আজকালকার আর্থিক বাঙ্গলায় মুসলমান বেপারি, দোকানদার, কর্মাধ্যক্ষ ইত্যাদির নাম ডাক খুব বড়ো। বুঝিতে হইবে যে, বাঙ্গালি জাতের ভিতর বর্তমানে খুব পাকাপোক্ত ও বলিষ্ঠ অঙ্গ হইতেছে মুসলমানদের বণিক সম্প্রদায়।

অতএব দেখিলাম "ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ" সকল তরফ হইতেই বাঙ্গলার মুসলমান বাঙ্গালি সমাজকে বিগত সিকি শতাব্দীর ভিতর অসংখ্য উপায়ে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। বাড়তির পথে বাঙ্গালি জাতির এই যে অভিযান সেই অভিযানে বাঙ্গলার নরনারী মুসলমানের শক্তিতে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গলা দেশকে বাঙ্গালি মুসলমান বাঙ্গালি হিন্দুর মতনই নিজ ভাবুকতার কর্মক্ষেত্র, নিজ কৃতিত্বের গৌরব কেন্দ্র, নিজ ধন দৌলতের ভোগ ভূমিরূপে গড়িয়া তুলিতেছে। ১৯৩০-৩২ সনের বাঙ্গালি জাতি ১৯০৫ সনের বাঙ্গালি জাতি হইতে যে অনেক দফায়ই স্বতন্ত্র আর এই স্বাতন্ত্র্যে যে মুসলমানদের কৃতিত্ব অনেক বেশি তাহা একালের প্রত্যেক বাঙ্গালি জনসেবক, অর্থশাস্ত্রী এবং সমাজ-গবেষকের নিকট একটা মস্ত বড়ো আবিষ্কার-বিশেষ। মুসলমানদের প্রভাবে বাঙ্গালি জাতির আবহাওয়া বদলাইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো বদলাইয়া যাইবে। বাঙ্গালি জাতি একটা বিপুল সমাজ-বিপ্লবের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। এই তথ্য স্বীকার করিয়া লইয়া এখন হইতে আমাদিগকে নয়া বাঙ্গলার জন্য সকল প্রকার রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও সামাজিক মুসাবিদা কায়েম করিতে হইবে।

## নয়া নয়া হিন্দু পদবির অভ্যুদয়

মুসলমান শক্তি ছাড়া আরো অন্যান্য তরফ হইতেও বাঙ্গালি জাতির রূপান্তর সাধিত হইতেছে। বাঙ্গালি হিন্দু নরনারীর কাজ কর্ম দেখিলেই অবস্থা-পরিবর্তনটা লক্ষ

করিতে পারি। আবার সেই ১৯০৫ সনের সময় সমকাল আলোচনা করা যাউক। তখনকার দিনে বাঙালি হিন্দুর ভিতর যাহারা সার্বজনিক কাজ কর্মে, সাহিত্য সেবায়, জাতীয় জীবনের অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে নামজাদা ছিল, তাহারা কেহ বা ঘোষ, কেহ বা বসু, কেহ বা চট্টোপাধ্যায়, কেহ বা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেহ বা সেন, কেহ বা গুপ্ত ইত্যাদি পদবির লোক ছিল। হিন্দু জাতি ব্যবস্থার তথাকথিত উচ্চ জাতির লোকই সেকালের বাঙালি হিন্দু সমাজে উল্লেখযোগ্য কাজ করিত। ছাব্বিশ সাতাশ বৎসরের ভিতর এদিকে অনেক পরিবর্তন দেখিতে পাইতেছি। আজকাল যে সকল হিন্দু পরিবার দেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করিতেছে তাহাদের পদবিগুলি এখন আর একমাত্র ওইরূপ নয়। যে কোনো খবরের কাগজই দেখি না কেন, কী মফস্‌সলের কী শহরের সকল কাগজেই লোকজনের নামের ভিতর নতুন নতুন পদবির সাক্ষাৎ পাই। হাজার হাজার লোক ১৯২৯-৩০ সনের পরবর্তী যুগে জেলে গিয়াছে। তাহাদের নামগুলি দেখিলেই একথাটি বেশ বুঝিতে পারি তাহাদের পারিবারিক পদবি যে ধরণের সেই ধরণের পদবি আমরা ১৯০৫ হইতে ১৯১০ সনের যুগে বাঙালি সার্বজনিক জীবনের আবহাওয়ায় বড়ো একটা দেখিতাম না। বস্তুত বাঙালি হিন্দু সমাজের ভিতর যে কত বিচিত্র রকমের পদবি আছে তাহা আমরা এই সিকি শতাব্দীর ভিতর ক্রমে ক্রমে অনেকটা বুঝিতে পারিতেছি। হিন্দু পারিবারিক বংশবৈচিত্র্য একালের রাষ্ট্রিক ও অন্যান্য সামাজিক মজলিসে একটা নূতন শক্তিরূপে দেখা যাইতেছে।

এই পদবি-বৈচিত্র্য অর্থাৎ নয়া নয়া পদবির অভ্যুদয় একমাত্র কংগ্রেস কনফারেন্স ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই সংযুক্ত নয়। ইস্কুল কলেজের ছাত্র-তালিকায়ও এইরূপ নয়া নয়া পদবির সাক্ষাৎ পাই। পল্লিগ্রামের পাঠশালায় অথবা কলিকাতার যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করিতেছে তাহাদের পদবিগুলি আজকাল নূতন ঢঙের। বাস্তবিক পক্ষে বিগত পঁচিশ বৎসরের ইস্কুল কলেজের ছাত্র তালিকাগুলি যদি ঐতিহাসিক ভাবে আলোচনা করি তাহা হইলে বাঙালি জাতির রূপান্তর সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইতে পারে। আর এই তালিকাগুলি যদি ১৮৮৫ হইতে ১৯০৫ পর্যন্ত বিশ বৎসরের ছাত্র তালিকার সঙ্গে তুলনা করি তাহা হইলে বাঙালি জাতি যে সত্য সত্যই একটা বিপুল বিপ্লবের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এক কথায় বলা উচিত যে, আজকালকার ইস্কুল কলেজের আবহাওয়ায় কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ইত্যাদি তথাকথিত উচ্চ শ্রেণির একচেটিয়া প্রাধান্য আর নাই।

## অনুচ্চ জাতির কৃতিত্ব

হিন্দু সমাজের বহুসংখ্যক নিম্ন-মধ্য ও নিম্ন শ্রেণির সন্তানসন্ততি শিক্ষাক্ষেত্রের অলিতে গলিতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাহার ফলে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, সংবাদপত্রের লেখক-লেখিকা ইত্যাদির আকার প্রকারও যথেষ্ট বদলাইয়া যাইতেছে। আজকালকার শক্তিশালী কবি, প্রবন্ধলেখক, বক্তা, বিজ্ঞানসেবক ইত্যাদি নরনারীর ভিতর অনেকেই তথাকথিত অনুচ্চ শ্রেণির প্রতিনিধি। আজকালকার দিনে এই সকল অনুচ্চ শ্রেণির দান বাঙালি হিন্দু সমাজের চিন্তাক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে এত বেশি যে, কী কলিকাতায় কী মফস্‌সলে কোথাও আমরা কোনো কৃতী পুরুষ বা মহিলার জাতি সম্বন্ধে প্রশ্ন পর্যন্ত করা আবশ্যক বিবেচনা

করি না। একালে তথাকথিত উচ্চ শ্রেণির হিন্দু অন্যান্য শ্রেণির কৃতিত্বশীল হিন্দুর কাজ কর্মকে সহজে এক কথায় বাঙ্গালির কৃতিত্বরূপেই সমঝিয়া থাকে। এই সকল কথা মুসলমান শক্তি সম্বন্ধে যতটা খাটে হিন্দুজাতির অনুচ্চ শ্রেণি সম্বন্ধেও ঠিক ততটাই খাটে। মুসলমান শক্তির প্রভাবে বাঙ্গালি জাতি যতটা রূপান্তরিত হইতেছে এই সকল অনুচ্চ শ্রেণির হিন্দুর কৃতিত্বেও বাঙ্গালি জাতি ঠিক ততটাই বৈচিত্র্যশীল ও দৌলত্‌মন্দ হইয়া উঠিতেছে। এই সকল বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের জননায়কগণ অথবা সাহিত্যস্রষ্টারা অনেকে হয়ত সজাগ নহেন। এত বড়ো বিপ্লব আমাদের চোখের সম্মুখে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে ঘটিয়া যাইতেছে তাহা সজ্ঞানে বুঝিবার অথবা আলোচনা করিবার চেষ্টা হয়ত আমাদের সমাজে এখনও দেখা দেয় নাই। কিন্তু আমরা সকলেই একটা বিরাট ওলট-পালট এবং সামাজিক পুনর্গঠনের আবহাওয়ায় জীবন ধারণ করিতেছি। এই প্রভাবের কথা যে সকল অর্থশাস্ত্রী অথবা সমাজ-গবেষক অথবা জনসেবক আলোচনা করিতে অগ্রসর হইবে তাহারা একটা মস্ত বড়ো আবিষ্কার সাধনের আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে।

## "আদিম" জাতির ক্রমিক বিকাশ

এইবার আরও কিছু গভীরতর ভাবে বাঙ্গালি জাতির সমাজ-রূপান্তর আলোচনা করিব। মুসলমানেরাও বাঙ্গালি, আর হিন্দু জাতির অনুচ্চ শ্রেণিরাও বাঙ্গালি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তাহাদের প্রভাবে বাঙ্গালি জাতি ফুলিয়া উঠিতেছে ইহা সহজেই অনুমেয় ও বিশ্বাসযোগ্য।

কিন্তু আমাদের বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গালি জাতি কতকগুলি অবাঙ্গালি নরনারীর শক্তিতেও যে, ফুলিয়া উঠিতেছে একথাও একালের, সমাজ সম্বন্ধে একটা বড়ো কথা। আবার বিগত পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের কথাই বলিব। এই সময়ের ভিতর বহু সংখ্যক "আদিম" জাতি বাঙ্গালি সমাজের ভিতর ক্রমে ক্রমে স্থির ঘর করিয়া বসিয়াছে। আদিম শব্দে ঠিক কোনো একটা নির্দিষ্ট হাড়মাসওয়ালা জাতি বুঝিতেছি না। একমাত্র বুঝিতেছি এই যে, তাহারা বাঙ্গালি নামে সাধারণত পরিচিত নয়। তাহার ধর্ম হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়। তাহাদিগকে সহজে পাহাড়ি বুনো অথবা এই ধরনের তথাকথিত সভ্যতার গণ্ডির বহির্ভূত জনপদের অধিবাসী বিবেচনা করা হয়।

বাঙ্গলা দেশের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম প্রত্যেক জনপদে এই ধরনের আদিম জাতির বাস আগেও ছিল এখনও আছে। বিশেষ কথা এই যে, তাহারা স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তী যুগে বাঙ্গলা দেশের জেলায় জেলায় বাঙ্গালির নরনারী ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিয়া পড়িয়াছে। বিশেষভাবে যে সকল জিলা পাহাড়ি জনপদের লাগাও—যথা, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, বীরভূম, বর্ধমান ইত্যাদি—সেই সকল জেলায় এই অ-বাঙ্গালি, অ-হিন্দু, অ-মুসলমান পার্বত্য অথবা বন্য জাতির প্রভাব বিশেষরূপেই লক্ষ করিতে পারি। এই জাতিগুলিকে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে প্রধানত সাঁওতাল জাতীয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে তাহাদিগকে সহজে গারো খাসিয়া ও অন্যান্য আসামের পাহাড়ি জাতি বলা যাইতে পারে। এই সকল জাতীয় নরনারী পূর্বে অনেকটা দূরে দূরে থাকিত। কিন্তু ক্রমশ তাহারা বাঙ্গালি জাতির হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে একত্র অথবা পাশাপাশি চাষ আবাদের কাজে লাগিয়া গিয়াছে।

## “আদিম” ও হিন্দু মুসলমানের আর্থিক লেনদেন

বাঙ্গলা দেশের চাষি বলিলে এখন আর কেবলমাত্র মুসলমান অথবা হিন্দু ও মুসলমান বলা চলিবে না। বাঙ্গালি চাষির ভিতর এই অবাঙ্গালি আদিম পার্বত্য জাতীয় চাষিও অন্যতম। বাঙ্গলাদেশের ধনদৌলত সৃষ্টির কাজে এই সকল আদিম জাতির কৃতিত্ব এই যুগে খুব বড়ো। ইহাদের প্রভাব এখনও প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালি জাতির জননায়কগণের নিকট মালুম হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই সকল আদিম জাতির শক্তি বাঙ্গালি সমাজকে অর্থনৈতিক তরফ হইতে একটু বড়ো গোছের রূপান্তর প্রদান করিবার সূত্রপাত করিয়াছে। এখনও চাষ আবাদই এই সকল আদিম জাতির প্রধান পেশা দেখিতে পাই। কিন্তু হাতের কাজ, কুটির-শিল্পও কিছু কিছু করিয়া তাহাদের তাঁবে আসিতেছে। এই সকল আর্থিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আদিম জাতিগুলি বাঙ্গালি হিন্দু এবং মুসলমানের অলিতে গলিতে আড্ডা গাড়িয়া বসিতেছে। ইহাদের অনেকেই আজকাল বাঙ্গালি হিন্দু সমাজের ধরন-ধারণ আচার-সংস্কার ইত্যাদি কিছু কিছু গ্রহণ করিতেছে, তাহাদের ভিতর কেহ কেহ বোধ হয় মুসলমান-ভাবাপন্নও হইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে চাষ আবাদ চালানো, গরুর গাড়ি হাঁকানো, কর্মকারের কাজ করা, চাটাই বোনা ইত্যাদি আর্থিক কাজে নিযুক্ত থাকার ফলে আদিম জাতির সঙ্গে বাঙ্গালি হিন্দু-মুসলমানের মেলামেশা হামেশা নিবিড়রূপেই সাধিত হইয়া থাকে। এইরূপ আর্থিক আদান-প্রদানের প্রভাবে সমাজ আপনা-আপনিই এমনকি অনেকটা অজ্ঞাতসারেও বদলাইয়া যাইতেছে। আদিম জাতির প্রভাব বাঙ্গালি সমাজে মুসলমান শক্তির অথবা অনুচ্চ হিন্দু শক্তির সমান এখনও নয়। কিন্তু আদিম জাতিগুলি আর্থিক জীবনের নিম্নতম স্তরে শুরু করিয়া বাঙ্গালি জাতির গোড়াটা পাকড়াও করিয়া বসিতেছে।

তাহার ফলে অনতিদূর ভবিষ্যতে যে বাঙ্গালি জাতি দেখিতে পাইব তাহার ভিতর এই সকল আদিম জাতির দান খুব উঁচু স্থানই অধিকার করিবে। এই ধরনের আদিম জাতির নাম নানা জেলায় নানারূপ। তাহাদের প্রত্যেকেরই আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি সম্প্রতি আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তনে যাঁহারা মোতায়েন আছেন তাঁহাদিগকে এই সকল জাতির ঠিকুজি কুষ্ঠি, আচার ব্যবহার, জীবনের গতি ভঙ্গি সবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। তাহারা আমাদের খনিতে মজুরের কাজ করিতেছে, কারখানায় মজুর যোগাইতেছে, চাষ আবাদ শুরু করিয়াছে, গাড়ি হাঁকাইতেছে, নৌকা চালাইতেছে, মাল বহিতেছে। কোনো কোনো স্থানে ছোটোখাটো দোকানদারিতেও তাহারা বহাল আছে। এই সকল অবাঙ্গালি জাতিকে আর কতদিন ধরিয়া আমরা অবাঙ্গালি বলিব তাহা বলা কঠিন। কিন্তু এই ধরনের বহুসংখ্যক আদিম পার্বত্য এবং বন্য জাতি ইতিমধ্যেই অনেকাংশে বাঙ্গালিতে পরিণত হইয়াছে। আর অল্পকালের ভিতরেই এই ধরনের অবাঙ্গালিকে বাঙ্গালিতে রূপান্তরিত করার প্রভাবে নানা কর্মক্ষেত্রেই অনেক কিছু দেখিতে পাইব।

### বৃহত্তর বঙ্গ

আর্থিক কর্মক্ষেত্রে বাঙ্গালি হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে মেলামেশার ফলে এই সকল আদিম জাতি একটু একটু করিয়া বাঙ্গলা ভাষা ইতিমধ্যেই দখল করিয়া বসিয়াছে।

বাঙ্গলাভাষী নরনারীর ভিতর এই ধরনের অবাঙ্গালি পাহাড়ি নরনারীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে, ভবিষ্যতে আরও বাড়িয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি ধরনে কাপড়, শাড়ি পরা, বাঙ্গালির ব্রতানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া, বাঙ্গালির যাত্রাগানে মাতোয়ারা হওয়া, বাঙ্গালির সৌজন্য শিষ্টাচার একটু একটু করিয়া রপ্ত করা এ সবই সাঁওতাল গারো ইত্যাদি অবাঙ্গালি জাতির মগজে এবং ধাতে বসিয়া যাইতেছে। আগেই বলিয়াছি কেহ হিন্দু ভাবাপন্ন হইতেছে, কেহ বা মুসলমান ভাবাপন্ন হইতেছে। এক কথায় বলিব যে, বাঙ্গালি সভ্যতা, বাঙ্গালি উৎকর্ষ, বাঙ্গালি কৃষ্টি সবই নতুন নতুন জাতের ভিতর দিগবিজয় করিতেছে। বহু সংখ্যক আদিম জাতীয় নরনারীকে নিজ আওতার ভিতর পাইয়া বাঙ্গালি সভ্যতা বৃহত্তর হইয়া উঠিতেছে। আমরা বাঙ্গলা দেশের ভৌগোলিক চৌহদ্দির ভিতর ইতিমধ্যেই একটি "বৃহত্তর বঙ্গ" গড়িয়া তুলিয়াছি।

বাঙ্গালি জাতির এই যে সকল রূপান্তরের কথা বলিলাম তাহা ১৯০৫ সনের যুগে অনেকটা দুর্বোধ্য ছিল। ১৮৮৫ সনের যুগে বোধহয় কেহই এ কথা কল্পনা পর্যন্ত করিতে পারিত না। আমরা যে বাঙ্গলা দেশে বসবাস করিতেছি সেই বাঙ্গলা দেশ আমাদের ঠাকুরদাদাদের বাঙ্গলা দেশ হইতে অনেক প্রকারে বিভিন্ন। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি কেবল লোকবল সংক্রান্ত উঠানামা অথবা ওলটপালটের কথাই বলিলাম। বাঙ্গালি জাতির কাঠামো রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালি নরনারীর হাড়মাস একালে যেমন, সেকালে অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর আগে আর পঞ্চাশ বৎসর আগে সেইরূপ ছিল না। যে বাঙ্গলা দেশে আমরা বাস করিতেছি সেই দেশ বাস্তবিকই একটা নতুন দেশ, ইহাতে নতুন রক্ত প্রবেশ করিয়াছে, নতুন নাম দেখিতেছি, নতুন পদবির সাক্ষাৎ পাইতেছি, লোকজনের চেহারায়ও অনেকটা পরিবর্তন দেখা যাইতেছে।

## রক্ত-সংমিশ্রণ

বস্তুত যাঁহারা বিস্তৃততর অথবা বস্তুনিষ্ঠভাবে বাঙ্গালি সমাজের ভিতরকার বিবাহ-প্রথা আলোচনা করিবেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, আমাদের তথাকথিত জাতিভেদ থাকা সত্ত্বেও অনুলোম প্রতিলোম কাণ্ড অনেক ঘটিতেছে। যে সকল নরনারীকে আমরা হিন্দু বলি তাহাদের জনক-জননীর ভিতর সকলেই হিন্দু কিনা এই সম্বন্ধে নৃতত্ত্বসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আবশ্যক হইবে। যাহাদিগকে মুসলমান নরনারীর অন্তর্গত করা হয় তাহাদের ভিতর অমুসলমান হাড়মাস কতটা আছে তাহাও গবেষণা ও বিশ্লেষণের উপযুক্ত বিষয়। আবার তথাকথিত আদিম, অনার্য, বুনো, অহিন্দু, অমুসলমান নরনারীর হাড়মাস আমাদের বাঙ্গালি জাতির আর্য, হিন্দু, মুসলমান এবং তথাকথিত উচ্চশ্রেণির নরনারীর ভিতর কতটা প্রবেশ করিয়াছে তাহাও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার সামগ্রী বিবেচিত হইবার কথা। আর তাহা ছাড়া জেলায় জেলায় যে সব বহুসংখ্যক বহুবিধ তথাকথিত অনুচ্চ জাতির বসবাস তাহাদের ভিতর বিজাতীয় রক্তের ধারা কত বিচিত্র উপায়ে প্রবেশ করিতেছে তাহাও আর গবেষণার বহির্ভূত থাকিতে পারে না।

## বাঙ্গালির আর্থিক উন্নতি কাহাকে বলে?

সমাজবিপ্লবের বিভিন্ন অঙ্গ এবং ধারা সম্বন্ধে আমাদিগকে শীঘ্রই সজাগ ভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আর একথা যাঁহারা বুঝিবেন

তাঁহারাও দেখিবেন যে, বাঙ্গলা দেশ বা বাঙ্গালি জাতি বলিলে আমাদের ঠাকুরদাদারা যে ধরণের ধারণা করিতেন সেই ধরণের ধারণা আজকাল আমরা পুষিলে পদে পদে আমাদিগকে বিব্রত হইতে হইবে। বাঙ্গলার সম্পদ, বাঙ্গালি জাতির দান, বাঙ্গলার সার্বজনিক জীবন, বাঙ্গালির সভ্যতা, বাঙ্গালির আর্থিক উন্নতি, বাঙ্গালির গণতন্ত্র, বাঙ্গলার স্বরাজ ইত্যাদি শব্দে আমরা কী বুঝিব? এই সকল শব্দ এতদিন পর্যন্ত আমরা নেহাৎ শব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছি। এখন আর আমাদিগকে একমাত্র হিন্দুর কথা ভাবিলে চলে না, একমাত্র তথাকথিত উচ্চশ্রেণির কথা ভাবিলে চলে না, একমাত্র মুসলমানের কথা ভাবিলে চলে না। আমাদিগকে একসঙ্গে অসংখ্য অস্পৃশ্যের কথাও ভাবিতে হয়, ডোম, বাগদি, হাড়ি, হাড়িপা ইত্যাদির কথা ভাবিতে হয়, বারুই, পোদ, মাহিষ্য ইত্যাদি অসংখ্য শ্রেণির কথা ভাবিতে হয়, সাঁওতাল, রাজবংশী, গারো, খাসিয়া ইত্যাদি ধরনের আরও অনেক লোকের, অনেক জাতির কথা ভাবিতে হয়। গোটা বাঙ্গলা দেশের কথা ছাড়িয়া শুধু যদি একটা জেলার কথাও ভাবি তাহা হইলেও দেখি যে তাহার পাঁচ কিংবা ছয় কিংবা সাত লাখ নরনারীর ভিতর অসংখ্য বৈচিত্র্য রহিয়াছে। এই অশেষ বৈচিত্র্যের ভিতর কোন্ লক্ষণটাকে বাঙ্গালি বলিব, কোন্ লোকের কীর্তিকে বাঙ্গালির কীর্তি বিবেচনা করিব, কোন চাষিকে বাঙ্গালি চাষি বিবেচনা করিব, কোন মিস্ত্রিকে বাঙ্গালি মিস্ত্রি বিবেচনা করিব, কোন মাঝিকে বাঙ্গালি মাঝি বিবেচনা করিব? বাঙ্গলা দেশের সেবক, বঙ্গীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, বাঙ্গালি স্বরাজের প্রচারক ইত্যাদি রূপে যখন আমাদের স্বদেশসেবকগণ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহারা এই পাঁচ ছয় সাত লক্ষ লোকের ভিতর কোন কোন অংশটাকে বাদ দিয়া কোন কোন অংশের সেবায় প্রবৃত্ত হইবেন?

চোখের সম্মুখে দেখিতেছি অসংখ্য ওলটপালট। অহিন্দু হিন্দু হইতেছে, অমুসলমান মুসলমান হইতেছে, অবাঙ্গালি বাঙ্গালি হইতেছে, অনুচ্চ উচ্চ হইতেছে। আর তাহা ছাড়া বিবাহের ফলে অথবা অন্য কোনো কারণে রক্তের সঙ্গে অন্য রক্ত আসিয়া মিশিতেছে। বাঙ্গালির হাড়মাসের ঠিকুজি কোনো একটা সোজা পথে চলিতেছে না। এই অবস্থায় কোনো বৈঠকখানার মজলিসে বসিয়া বাঙ্গালি জাতির আর্থিক, রাষ্ট্রিক আর সামাজিক পাতি দেওয়া চলিবে না। নয়া বাঙ্গলার জন্য যে ধরণের মুসাবিদা করা আবশ্যক তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে রাজবংশীকে রাজবংশী, সাঁওতালকে সাঁওতাল, মাহিষ্যকে মাহিষ্য, ডোমকে ডোম, মুসলমানকে মুসলমান, এবং হিন্দুকে হিন্দু—এই সকল শ্রেণির নরনারীগুলির নাক গুণিয়া প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগ, প্রত্যেকের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যেকের আত্মকর্তৃত্ব, প্রত্যেকের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সজাগ ভাবে কার্যে নামিতে হইবে।

## স্বদেশ-সেবকের নতুন অভিজ্ঞতা

এই ধরনের কাজেই অনেক বাঙ্গালি নামিয়াছে। তাহারা বাঙ্গলা দেশের জেলায় জেলায় অবাঙ্গালির সঙ্গে মিশিয়াছে, অহিন্দুর সঙ্গে মিশিয়াছে, অমুসলমানের সঙ্গে মিশিয়াছে, অস্পৃশ্য এবং অনুচ্চ শ্রেণির নরনারীর সঙ্গেও আনাগোনা করিয়াছে। এই

ধরনের রাষ্ট্রসেবক, সমাজসেবক, স্বদেশব্রতধারী কর্মীর সংখ্যা যত বেশি হওয়া উচিত বোধহয় এখনও তত বেশি হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের অভিজ্ঞতাগুলি একালের সার্বজনিক জীবনে একটা নতুন সম্পদ। ১৯০৫ সনের যুগে আমরা এই সকল নতুন নতুন শ্রেণির নরনারীর জীবন সম্বন্ধে, কর্ম সম্বন্ধে, আর্থিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সামাজিক লেনদেন ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রায় এক প্রকার কিছুই জানিতাম না। বিগত ছাব্বিশ সাতাশ বৎসরের ভিতর আমাদের স্বদেশসেবকেরা এই সকল নরনারীর সঙ্গে মিশিবার ফলে একটা নয়া বাঙ্গলার সাক্ষাৎ পাইয়াছে।

তাহারা এই সকল নতুন নতুন লোকজনকে সনাতন বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমানের সমকক্ষ অথবা জুড়িদাররূপেও দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাহাদের বিবেচনায় সাঁওতাল, রাজবংশী, ডোম, ইত্যাদি জাতি বাঙ্গালি সমাজে আর নগণ্য নয়। তাহারা দেখিয়াছে যে নমঃশূদ্র, বারুই, পোদ ইত্যাদি জাতীয় নরনারীর ভিতর তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণির নরনারীর সু-কু সবই বিরাজ করিতেছে। তাহারা দেখিয়াছে যে, মুসলমানের কৃতিত্ব বাঙ্গালি সমাজে হিন্দুদের কৃতিত্বেরই অনুরূপ। এই সকল অভিজ্ঞতার মূল্য ঢের। আমি এগুলিকে অন্যান্য আবিষ্কারের মতনই গৌরবজনক আবিষ্কার বিবেচনা করি। এই ধরণের আনাগোনার ফলে বাঙ্গলার বিভিন্ন শ্রেণির চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের অনেক নতুন জ্ঞান জন্মিয়াছে। যাহারা মজুরদের সঙ্গে মজুর-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছে অথবা অন্যান্য উপায়ে মজুর আন্দোলনে সাহায্য করিতেছে তাহাদের অভিজ্ঞতা এই তরফ হইতে বিশেষ মূল্যবান। আমাদের ভিতর যাহারা সমবায় আন্দোলনের পরিদর্শকরূপে বহাল আছে তাহারা আমাদের চাষি সমাজের নাড়ি নক্ষত্র ভালোরূপে জানে। আমাদের ভিতর যাহারা হিন্দু মিশন সংক্রান্ত কাজে মোতায়েন আছে তাহাদের ভিতর অস্পৃশ্য ও অহিন্দু সমাজের অনেক কথাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের সাধারণ গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক অথবা অন্যান্য গ্রন্থকার ইত্যাদি শ্রেণির লোক বাঙ্গলা দেশের যে সকল তথ্য সম্বন্ধে নেহাৎ আনাড়ি সেই সকল তথ্যও এই সকল স্বদেশসেবকদের অভিজ্ঞতার ভিতর জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়িয়াছে।

## অপূর্ব আবিষ্কার

এই সকল অভিজ্ঞতার ভিতর যে সত্যটা খুব বড়ো রূপে পাকড়াও করিতে পারি তাহা এই যে, বাঙ্গালি জাতির উচ্চতর স্তরে যে সকল হিন্দু ও মুসলমান লেখাপড়া শিখিয়াছে, দুই পয়সা রোজগার করিয়া সমাজে গণ্যমান্য হইয়াছে তাহাদের তুলনায় এই সকল নগণ্য নিরক্ষর নিম্নশ্রেণির লক্ষ লক্ষ হিন্দু, মুসলমান ও আদিম নরনারীরা বাস্তবিক পক্ষে নিকৃষ্ট নয়। খাদে যে সকল লোক কাজ করে, রেলওয়ে, স্টিমারের কুলি ও খালাসিরা, চা বাগানের কুলিরা, ফ্যাক্টরি-কারখানার মজুরেরা আর পল্লিগ্রামের কৃষাণ নরনারী, বাঙ্গালি জাতির শতকরা আশি পঁচাশি জন। ইহারা বাঙ্গলা দেশের কোনো কর্মক্ষেত্রেই মাথা খাড়া করিয়া কাজ করে না। তাহারা সোজাসুজি ডুবিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল ডুব-মারা বাঙ্গালি নরনারী পয়সাওয়ালা, নামজাদা, লিখিয়ে-পড়িয়ে উচ্চপদস্থ

হিন্দু মুসলমানের চেয়ে খাটো নয়। এ কথাটা বিগত পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতাগুলির ভিতর অন্যতম বড়ো অভিজ্ঞতা।

## নিরক্ষরকে অশিক্ষিত বলা চলে না

কথাটা খুলিয়া পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। নিরক্ষর নরনারীর কথা বলিতেছি। নিরক্ষর শব্দে বুঝিতে হইবে অতি সোজা কথা। লোকগুলি লিখিতেও পারে না পড়িতেও পারে না। কিন্তু নিরক্ষর বলিলে আমি লোকগুলিকে অশিক্ষিত বলি না। নিরক্ষর লোকেরাও বেশ শিক্ষিত হইতে পারে। বস্তুত আমার বিবেচনায় পৃথিবীতে অশিক্ষিত কোনো লোক আছে কিনা সন্দেহ। যে লোক বেত বুনিয়া টুকরি তৈরি করে তাহার মগজে কিছু না কিছু ঘি আছেই আছে। যে লোক দিনের পর দিন নিয়মিতরূপে হাল চালায়, বলদ সেবা করে, গাড়ি হাঁকায়, নৌকা বহে সে লোক হয়ত লিখিতে পড়িতে পারে না। কিন্তু তাহার মগজও আছে আর সেই মগজের ভিতর চিন্তা করিবার শক্তিও আছে। এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, কাজ করিতে করিতে প্রত্যেক লোকই, সে যত বড়ো নিরক্ষর হউক না কেন, দিনের পর দিন তাহার মগজ চষিয়া যাইতেছে। কাজের সঙ্গে সংস্পর্শে মগজ চষার ফলে তাহার জ্ঞান বাড়িতেছে। প্রতি মুহূর্তে সে সজ্ঞানে সজাগ ভাবে মাথা খেলাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। কাজেই বাঙ্গলা দেশের যে সকল নরনারী এখনও লিখিতে পড়িতে পারে না তাহাদিগকেও আমি শিক্ষিত, জ্ঞানী, চিন্তাশীল ও মস্তিষ্কজীবী নরনারীর ভিতর গণ্য করিতে অভ্যস্ত।

লেখাপড়া জিনিসটা পৃথিবীতে মাত্র সেদিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমি "সার্বজনিক' লেখাপড়ার কথা বলিতেছি। পঁচাত্তর কি শ দেড়শ বৎসর আগে দেশসুদ্ধ লোকের লেখাপড়া পৃথিবীর কোথাও দেখা যাইত না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে-যুগে সার্বজনিক লেখাপড়ার ব্যবস্থা ছিল না সে-যুগের নরনারী কি অশিক্ষিত ছিল? আমার বিবেচনায় চরম নিরক্ষরতার যুগেও হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে বহু সংখ্যক শিক্ষিত সভ্য কৃষ্টিশীল নরনারী জগতে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছে। একথা কী এশিয়ার কী ইয়োরোপের মধ্যযুগ ও প্রাচীনকাল সম্বন্ধে সর্বদাই প্রযোজ্য। মানুষের জ্ঞান, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের সভ্যতা-ভব্যতা নাম সই করিবার ক্ষমতার উপর, খবরের কাগজ পড়িবার উপর পাঠশালায় গিয়া কয়েকটা পাশ করিবার উপর নির্ভর করে না। এখানে একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমাদের বাঙ্গলা দেশের তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত পয়সাওয়ালা সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমানের বাড়িতেও আজ পর্যন্ত বহু নারীই নিরক্ষর একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি আমাদের এম. এ., ডি. এল্. উপাধিওয়ালা সুশিক্ষিত জননায়কের নিরক্ষর মা, বোন অথবা মাসি কিংবা ঠানদিদি জ্ঞানে চিন্তায় বুদ্ধিমত্তায় তাহার নিজের পাশ করা পত্নীর চেয়ে খাটো কী? বাঙ্গলা দেশের কোন যুবা তাহার বৃদ্ধা মাকে অশিক্ষিত,—নিরক্ষরতার দরুণ অশিক্ষিত বলিতে সাহসী? এই সামান্য দৃষ্টান্তেই বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালি সমাজের লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান ও আদিম নরনারী নিরক্ষর বলিয়াই তাহাদিগকে অশিক্ষিত জ্ঞানহীন মূর্খ অথবা নির্বোধ বিবেচনা করা চরম আহাম্মুকি। আমাদের চাষি, আমাদের মিস্ত্রি, আমাদের জোলা, আমাদের তাঁতি, আমাদের কর্মকার,

আমাদের কুমোর আমাদের ঘরামি, আমাদের মাঝি সকলেরই শিল্প-নৈপুণ্য আছে, হস্তপটুত্ব আছে। এই শিল্প-নৈপুণ্য আর এই হস্তপটুত্ব যে কেবলমাত্র স্বভাবজ গুণ তাহা নয়। জীবনব্যাপী ধারাবাহিক সংস্কারের প্রভাবে এই স্বাভাবিক পটুত্ব ও নৈপুণ্য অশেষ উপায়ে পরিপুষ্ট হইয়াছে। ফলত জাপানি চাষি, মিস্ত্রির চেয়ে, ইতালিয়ান চাষি, মিস্ত্রির চেয়ে ফরাসি, জার্মান, ইংরেজ ও মার্কিন চাষি, মিস্ত্রির চেয়ে বাঙ্গালি জাতির নিরক্ষর চাষি, মিস্ত্রিরা কোনো অংশে হীন নয়। দুনিয়ার যে কোনো চাষি, মিস্ত্রির সঙ্গে আমাদের চাষি, মিস্ত্রি সমানে সমানে টক্কর দিয়া চলিতে পারে।

## জ্ঞানকাণ্ডে নিরক্ষর বনাম লিখিয়ে-পড়িয়ে

এইবার আমাদের চাষি ও মিস্ত্রির সঙ্গে অর্থাৎ তথাকথিত নিরক্ষর বাঙ্গালি নরনারীর সঙ্গে তথাকথিত শিক্ষিত ইস্কুলমাস্টার, কেরানি, উকিল, ডাক্তার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাংবাদিক, রাষ্ট্রনায়ক, কংগ্রেসকর্মী ইত্যাদি শ্রেণির তুলনা করিব। আমাদের পল্লিগ্রামের চাষি অথবা রেলওয়ে কুলি কিংবা অন্যান্য নিরক্ষর শ্রেণির জীবনকথা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। তাহারা তাহাদের জীবনের সু-কু সম্বন্ধে, তাহাদের পারিবারিক অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে, তাহাদের পাড়ার উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে কি কিছুই বুঝে না? আমাদের ইস্কুলমাস্টার মহাশয়েরা, আমাদের উকিল বাবুরা, আমাদের স্বদেশী-প্রচারকেরা, আমাদের সরকারি চাকুরেরা নিজ নিজ জীবনের সু-কু সম্বন্ধে, পারিবারিক অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে অথবা পাড়া-প্রতিবেশী সম্বন্ধে এই সকল মামুলি নিরক্ষর চাষি, কুলি, মিস্ত্রির চেয়ে বেশি কী বুঝবেন? আমাদের ভিতর অনেকেই চাষিদের সংস্পর্শে আসিয়াছে। আসল কথা বাঙ্গলা দেশের প্রায় প্রত্যেকেই আমরা অল্প বিস্তর কিছু না কিছু চাষি পরিবারের খবর রাখি। তাহাদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তাহারা কী ভাবে, তাহাদের পাড়া প্রতিবেশী সম্বন্ধে তাহাদের কী ধারণা এই সব আমাদের অজানা নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, উকিল, ডাক্তার, কেরানি, ইস্কুলমাস্টার ইত্যাদি শ্রেণির লোক এই সকল বিষয়ে নিরক্ষর নরনারীর চেয়ে স্বতন্ত্র কোন্ হিসাবে? লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা ইস্কুলে কয়েকখানা ভূগোলের কেতাব অথবা ইতিহাসের কেতাব মুখস্থ করিয়াছে সন্দেহ নাই। লিখিয়ে-পড়িয়েরা খবরের কাগজের মারফত দুই একজন নামজাদা লোকের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে দুই একটি খবর হয়ত রাখিতে পারে ইহাও সত্য। কিন্তু নিত্যনৈমিত্তিক, পারিবারিক কার্যের জন্য সংসার পালনের জন্য, নিজ পল্লির হিতাহিত আলোচনার জন্য তাহারা কোন্ বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন—ইহাই আসল কথা। লেখাপড়া জানার ফলে এমন কোন্ অভিজ্ঞতা জন্মে যাহাতে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানশীল চাষি, মিস্ত্রির চেয়ে পল্লি সংক্রান্ত, শহর সংক্রান্ত কাজকর্মে লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা বিশেষরূপে যোগ্যতর বিবেচিত হইবার উপযুক্ত? অবশ্য একথাটা বলা আবশ্যক যে কেরানি কলম পিষিতে অভ্যস্ত। অতএব কলম পেযায় কাজে সে একজন বিশেষজ্ঞ। চাষি এবং মিস্ত্রি কলম পিষিতে পারে না, অতএব এই হিসাবে নিকৃষ্ট। সেইরূপ ডাক্তারবাবু ওষুধের পাতি দিতে অভ্যস্ত, এঞ্জিনিয়র মশায় রাস্তা মেরামত করিতে, ঘরবাড়ি তৈয়ার করিতে অথবা পুল নির্মাণ করিতে অভ্যস্ত। এই সকল কাজ চাষি বা মিস্ত্রি করিতে পারে না। কিন্তু ডাক্তারবাবু এঞ্জিনিয়রের কাজ করিতে পারে কী? এঞ্জিনিয়র

মহাশয় রাসায়নিকের কাজ করিতে পারে কী? রাসায়নিক মহাশয় যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতে পারে কী? ইস্কুলের মাস্টার মহাশয় বই গিলাইতে সমর্থ সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার হাতে ওষুধের পাতি দেওয়া সম্ভবপর কী? আর যন্ত্রপাতি দেখিবামাত্র সে তো ভিরমি খাইতেই অভ্যস্ত! মোটের উপর বলিতে হইবে যে, লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা বড়োজোর কোনো একটা লাইনে কতকগুলি কাজ করিয়া যাইতে পারে। ব্যস, এই পর্যন্ত তাহাদের দৌড়।

এখন জিজ্ঞাস্য, চাষিরা, মিস্ত্রিরা, তাঁতিরা ও কুমোরেরা যে সকল কাজ করে সেই সকল কাজ কি ছোটো দরের কাজ? চাষির কাজ করিতে পারে না ইস্কুলমাস্টার, ইস্কুলমাস্টার চাষির চেয়ে নিকৃষ্ট। চাষির কাজে ইঞ্জিনিয়ার আনাড়ি। অতএব চাষির চেয়ে সে নিকৃষ্ট। এইরূপে দেখিতে পাই যে, অচাষি মাত্রেই চাষির চেয়ে চাষের কাজে নিকৃষ্ট,—ঠিক যেমন চাষিরা নিকৃষ্ট, চাষ ছাড়া অন্যান্য কাজে, অন্যান্য পেষা-সেবীদের চেয়ে।

কেরানির কলম পেষা যেমন একটা কাজ, ইস্কুলমাস্টারের ছাত্রদিগকে বই গিলানো যেমন একটা কাজ, ওষুধের ব্যবস্থা করা ডাক্তারের যেমন একটা কাজ তেমনি চাষ করা, দুধ দোয়া, নৌকা চালানো, গাড়ি হাঁকানো, ছুরি কাঁচি তৈয়ার করা, সুতা কাটা কাপড় বুনা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রকমের কাজ। চাষ সম্বন্ধে যে লোকটা ওস্তাদ অর্থাৎ নিরক্ষর কৃষাণ তাহার ওস্তাদিও কাজ বা ওস্তাদি হিসাবে সমাজের পূজা পাইবার যোগ্য, ঠিক সেই রকম পূজা পাইবার যোগ্য যে রকম পূজা পায় তাহারা যাহারা রোগীর জন্য ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতে ওস্তাদ। সমাজে ইস্কুলমাস্টারের যে ইজ্জত সে বই মুখস্থ করাইবার পেশায় ওস্তাদ বলিয়া, এঞ্জিনিয়রের যে ইজ্জত সে ঘরবাড়ি, পুল, সাঁকো তৈয়ার করিবার কাজে ওস্তাদ বলিয়া, ঠিক সেই ধরণের ইজ্জতই চাষি, মিস্ত্রি, ছুতোর, মাঝি পাইবার উপযুক্ত। এই সকল বিভিন্ন পেশায় তাহারা নানা ঢঙের ওস্তাদ বলিয়া।

পেশা মাত্রই সম্মানের যোগ্য। যাহারা কোনো না কোনো পেশা চালাইতেছে তাহারা লিখিতে পড়িতে পারে কিনা তাহা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু লিখিতে না পারা সত্ত্বেও পেশা চালাইবার মতো যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা যে সকল লোকের আছে তাহারা লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের মতনই সমাজের মেরুদণ্ড। চাষ চালাইতে কম বুদ্ধির দরকার হয় না, কম বিচক্ষণতার দরকার হয় না, কম মাথা খেলাইবার দরকার হয় না, কম দল-গঠনের দরকার হয় না। উকিলি করিতে চাষের চেয়ে বেশি বিচক্ষণতা, বেশি দল গঠনের ক্ষমতা, বেশি বুদ্ধিমত্তার দরকার হয় একথা স্বীকার করা চলে না। তাঁতি, জেলে, কামার, কুমোর ইত্যাদি সকল শ্রেণির পেশাজীবীই মাথা খাটাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। তাহারাও উকিল, ইস্কুলমাস্টার, ডাক্তার ইত্যাদির মতনই মস্তিষ্কজীবী। বাঙ্গলা দেশের নতুন সমাজ বিপ্লবের কথা যখন ভাবি তখন আমাদিগকে এদিকেও মাথা খেলাইতে হইবে। বুঝিতেছি যে, লিখিয়ে-পড়িয়ে শ্রেণি হইতে নিরক্ষরদিগকে যে তফাত করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা কোনো মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

## চরিত্র হিসাবে নিরক্ষর খাটো নয়

এতক্ষণ পর্যন্ত নিরক্ষরদিগের বুদ্ধিমত্তা, মস্তিষ্কশক্তি, বিচক্ষণতা ইত্যাদির কথাই বলিলাম। এইবার নিরক্ষরদিগের নৈতিক চরিত্র ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির কথা বলিব। নিরক্ষর

নরনারীকে চাষাভূষারূপে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা আমাদের দস্তুর। কিন্তু নিরক্ষর লোকেরা চরিত্র হিসাবে বাস্তবিক খাটো কী? লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা অর্থাৎ ইস্কুলমাস্টার, কেরানি সরকারি চাকুরে, উকিল, ডাক্তার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, কংগ্রেসের জননায়ক ইত্যাদি শ্রেণির নরনারী চরিত্র হিসাবে চাষি, মজুর, মিস্ত্রি, ঘরামি ইত্যাদির চেয়ে উন্নত ধরনের লোক কী? প্রশ্নটা খোলাখুলি আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। সেকালে এই সকল প্রশ্ন পর্যন্ত করা হইত কিনা সন্দেহ। পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরে নানা জাতির উঠা নামার ফলে, নানা জাতির সঙ্গে মিলামিশার ফলে আজ অন্তত বাজারে দাঁড়াইয়া এই প্রশ্নটা করিবার মতো সুযোগ পাওয়া যাইতেছে। কেবলমাত্র সুযোগ পাওয়া যাইতেছে নয়। যাহারাই নিরক্ষর নরনারীর সঙ্গে মিলামিশা করিয়াছে তাহারাই বুঝিয়াছে যে, ইহাদের নৈতিক চরিত্র তথাকথিত শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণির নরনারীর নৈতিক চরিত্রের,—লিখিয়ে-পড়িয়ের চরিত্রের,—চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়।

লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা, পয়সাওয়ালা লোকেরা, নামজাদা লোকেরা, কংগ্রেস-কাউন্সিলের, সভ্যশ্রেণির লোকেরা তাহাদের স্ত্রী-পুত্র, বাবা, দাদার সঙ্গে যে ধরনের ব্যবহার চালাইয়া থাকে এই সকল নিরক্ষর চাষি, মিস্ত্রি, কুলি, মজুর শ্রেণির লোকেরাও ঠিক সেই ধরণেই তাহাদের ব্যবহার চালাইয়া থাকে। মামা হিসাবে চাচা হিসাবে কাকি হিসাবে দিদিমা হিসাবে ননদ হিসাবে ভাজ হিসাবে ভাইপো হিসাবে চাষি মজুরেরা আর ফ্যাক্টরির মজুরেরা ঠিক সেই ধরনেই সুনীতি-কুনীতির পরিচয় দেয়, যে ধরনের পরিচয় দেয় ইস্কুলমাস্টার, উকিল, ডাক্তার, জননায়ক, সরকারি চাকুরে ইত্যাদি শ্রেণির নরনারী। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে লেনদেনে নিরক্ষরেরা লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকজন হইতে স্বতন্ত্র জীবরূপে দেখা দেয় না। পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিরক্ষরেরা কী রকম সম্বন্ধ চালায়? আমাদের লিখিয়ে-পড়িয়ে পয়সাওয়ালা উচ্চশ্রেণির লোকেরা তাহাদের নিজ নিজ পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে কী রকম ব্যবহার চালাইয়া থাকে? তাহার ভিতর এমন কিছু উচ্চ অঙ্গের উৎকর্ষ, উচ্চ শ্রেণির হামদর্দ্দি, উন্নত ধরনের সৌজন্য দেখিতে পাওয়া যায় কী? পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে কোন্দল, ঝগড়া, কুচলি, রেষারেষি আমাদের উকিলবাবুদের ভিতর, ইস্কুলমাস্টারদের ভিতর কংগ্রেস কর্মীদের ভিতর যত বেশি তাহার চেয়ে বেশি কোন্দল, রেষারেষি, ঝগড়াঝাঁটি, আমাদের চাষি সমাজে, মিস্ত্রি-মজুর সমাজে দেখিতে পাই কী? আমাদের ইস্কুলমাস্টার শ্রেণির লোকেরা তাহাদের নিজ পেশার অন্তর্গত লোকজনের ভিতর পরস্পরে যেরূপ হিংসাদ্বেষ, দলাদলি, পরশ্রীকাতরতা, নীচাশয়তা প্রকটিত করিতে অভ্যস্ত তাহার চেয়ে বেশি পরশ্রীকাতরতা, নীচাশয়তা, দ্বেষহিংসা চাষিদের ভিতর, মজুরদের ভিতর, কুলিদের ভিতর দেখা যায় কী?

## "কৃমিনলজির স্ট্যাটিস্টিক্স্"

নৈতিক জীবনের অসংখ্য খুঁটিনাটিও উল্লেখ করা যাইতে পারে। টাকা পয়সার লেনদেন, ব্যবসা সংক্রান্ত আদান প্রদান, চুক্তি রক্ষার কাজ কর্ম আমাদের কন্ট্রাক্টর, এঞ্জিনিয়র, আমদানি-রপ্তানিকারক, ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার ইত্যাদি উচ্চশ্রেণির উচ্চশিক্ষিত লোকজনের

দস্তুর কি সর্বদাই অতি সুনীতি-সঙ্গত? আর যদি তাহাই হয় তাহা হইলে টাকা-পয়সা ঘটিত সুনীতি, চুক্তি-রক্ষা ঘটিত সুনীতি ইত্যাদি সকলপ্রকার ব্যবসা সংক্রান্ত সুনীতি কি চাষি, মজুর মহলে ইহার চেয়ে কম দেখা যায়? লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের নৈতিক চরিত্রে এমন কোন্ কোন্ সদ্গুণ আছে যেগুলি দেখিয়া আমাদের নিরক্ষর চাষি মজুর শ্রেণির লোকেরা উন্নত ধরনে জীবন গঠন করিতে প্রলুব্ধ হইতে পারে? অপর দিকে আমাদের চাষি মজুর ইত্যাদি নিরক্ষর নরনারীর ভিতর এমন কোন দুর্গুণ বা কুনীতি আছে যেগুলি আমাদের উচ্চশিক্ষিত, পয়সাওয়ালা, নামজাদা, সমাজের শীর্ষস্থানীয় নরনারীর ভিতর যখন-তখন যেখানে-সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না? জোচ্চুরি, বাটপাড়ি বদমায়েশিতে নিরক্ষরদের চেয়ে শিক্ষিতেরা খাটো কী? বস্তুত যদি আমরা আদালতের আসামি অথবা সাজাপ্রাপ্ত নরনারীর তালিকা দেখি, তাহা ছাড়া যে সকল নরনারী সমাজে অকথ্য অন্যায় করিয়াও ঘটনাচক্রে সাজা এড়াইতে সমর্থ তাহাদের কোনো কোনো ঘটনা যদি জানা থাকে তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, কী বাংলাদেশে, কী বাংলাদেশের বাহিরে, কী ভারতে কী ভারতের বাহিরে বিশাল দুনিয়ার কোথাও, নিরক্ষর নরনারী অথবা অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষাপ্রাপ্ত নরনারী শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত নরনারীর চেয়ে অধিক মাত্রায় দোষী পাপী সাজাগ্রস্ত অথবা সাজার যোগ্য নরনারী নয়। "ক্রিমিনলজি" অর্থাৎ অপরাধ-বিজ্ঞান বিষয়ক আইনশাস্ত্রে স্ট্যাটিস্টিকস হইতে তথ্য খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করিলে দেখা যাইবে যে, যাহাদিগকে আমাদের দেশে চাষাভূষা বলা হইয়া থাকে এক কথায় যাহারা পৃথিবীর সকল সমাজে নিম্নস্তরের নরনারী তাহারা উচ্চতর শ্রেণির নরনারীর চেয়ে বেশি মাত্রায় দোষী, পাপী, নীতিহীন বা দুশ্চরিত্র এইরূপ বিশ্বাস করা চলে না।

বরং যাহারাই মজুর, চাষি ও অন্যান্য নিরক্ষর নরনারীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে আত্মীয়তা করিবার সুযোগ পাইয়াছে তাহারাই বলিবে যে এই সকল নরনারীর চরিত্রে অনেক সদ্গুণ বিরাজ করিতেছে। তাহাদের ব্যক্তিত্ব অনেক ক্ষেত্রেই গৌরবজনক। নিরক্ষর নরনারীও চরিত্রবান ব্যক্তি হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের জীবনের সদ্গুণগুলিকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিলে লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা এবং সমাজের নামজাদা ও শীর্ষস্থানীয় নরনারীরা নিজ নিজ জীবন উন্নত করিতে সমর্থ হইবে। নৈতিক চরিত্রের তরফ হইতে নিরক্ষরকে আমি কোনোমতেই লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকজন হইতে তফাত করিতে পারি না। অতএব কী মস্তিষ্কের চালনায় ও বিচক্ষণতায়, কী নৈতিক চরিত্রে ও ব্যক্তিগত কর্তব্য জ্ঞানে কোনোদিকেই নিরক্ষরকে সমাজের ফেলিতব্য কিংবা উপেক্ষিতব্য নরনারী বিবেচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

## নিরক্ষরদের অধিকার

ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ও বিংশ শতাব্দীর আজ পর্যন্ত যে একটা মত জগতের বাজারে বাজারে প্রচলিত আছে সেই মতের বিরুদ্ধে আমাকে জোরের সহিত কথা বলিতে হইতেছে। ইয়োরামেরিকায় ও এশিয়ায় আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় লোকের মাথায় একটা ধারণা প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, লেখাপড়া না শিখিলে মানুষ সমাজের কার্যক্ষম অঙ্গ হইতে পারে না। অতএব লেখাপড়া না শিখিলে কোনো মানুষকে রাষ্ট্রিক জীব বিবেচনা করা

উচিত নয়। আমি দেখিতেছি যে, মানুষের মতন কাজ করিতে হইলে যে ধরনের মাথা থাকা দরকার, যে ধরনের কর্তব্যবোধ থাকা দরকার, যে ধরনের চরিত্রবত্তা থাকা দরকার তাহা নিরক্ষর লোকেরও প্রচুর পরিমানেই আছে। সুতরাং সকল কর্মক্ষেত্রেই নিরক্ষরের অধিকার প্রচার করা আমার নিকট সমাজ-শাস্ত্রের প্রথম স্বীকার্য। আমাদের চোখের সম্মুখে বিগত সিকি শতাব্দীর ভিতর যে এক নয়া বাঙ্গলা গড়িয়া উঠিয়াছে সেই নয়া বাঙ্গলার অন্যতম আধ্যাত্মিক ভিত্তিই আমি এই স্বীকার্যের ভিতর আবিষ্কার করিতেছি।

লোকগুলি সাঁওতাল হউক, রাজবংশী হউক, গারো হউক, পাহাড়ি হউক, অস্পৃশ্য হউক, চণ্ডাল হউক, ডোম হউক, হাড়ি হউক, চাষি হউক, মিস্ত্রি হউক, মজুর হউক তাহারা নিরক্ষর বলিয়াই—একমাত্র এই কারণে লিখিয়ে-পড়িয়ে নরনারীর শ্রেণি হইতে কোনো অংশে খাটো নয়। বাঙ্গালি জাতির হাড়মাসে, বাঙ্গালি জাতির ধনদৌলতে, বাঙ্গালি জাতির বাড়তিতে, বাঙ্গালি জাতির শক্তি বিকাশে তাহারা সকলেই লিখিয়ে-পড়িয়ে নরনারীর মতনই কর্মক্ষম এবং গৌরবজনক কৃতিত্বের প্রতিনিধি। এই সকল নিরক্ষরদের বুদ্ধিমত্তা আর কর্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে সজাগ হইয়াই আমাদিগকে বাঙ্গালি জাতির আগামী অধ্যায়ের জন্য নতুন ধাপ গড়িয়া তুলিতে হইবে। স্বদেশসেবার শক্তিযোগে যুবক বাঙ্গলার যে সকল নরনারীরা বহাল আছেন তাঁহারা নিরক্ষরের সকল প্রকার অধিকার সম্বন্ধে টনটনে জ্ঞান হাতের মুঠার ভিতর রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন।

উৎস : নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, ১৯৩২

# যোগাযোগ-ব্যবস্থা : জলপথ

## রাধারমণ মিত্র

পোর্তুগিজ বণিকেরা সপ্তগ্রাম বন্দরে আসে ১৫৩০ থেকে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। সেখান থেকে তারা ১৫৭৮ কিংবা ১৫৮০ সনে হুগলিতে যায়। ইংরেজরা বাংলাদেশে প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে হুগলিতে, ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে। ডাচেরা চুঁচড়ায় তাদের কুঠি স্থাপন করে প্রায় ওই সময়েই। হুগলি শহরে ইংরেজদের কুঠি থাকায় ও হুগলি শহর ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় ইংরেজরা ভাগীরথী বা গঙ্গানদীর নাম রাখে হুগলি নদী।

পোর্তুগিজদের ও ডাচেদের ৬০০ টনের কাঠের তৈরি পালের জাহাজ (Gally or Gallcon or Galleass) সাগরমুখ (Sindhead) থেকে হুগলি নদী দিয়ে প্রথম গার্ডেনরিচ ও বেতর পর্যন্ত চলে আসত, নদীতে অনেক বিপজ্জনক বাঁক ও চড়া থাকা সত্ত্বেও। পরে পোর্তুগিজ জাহাজ হুগলি ও ডাচ জাহাজ চুঁচড়া পর্যন্ত অনায়াসেই পৌঁছাতে পারত। এটা তারা করতে পারত তাদের সুশিক্ষিত পাইলটদের গুণে। কিন্তু ইংরেজদের জাহাজ হুগলি শহর তো দূরের কথা, গার্ডেনরিচ পর্যন্তও আসতে পারত না। টন-প্রতি মালের বেশি ভাড়া দিয়েও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। তখন কোম্পানির ডিরেক্টরগণ বুঝলেন, বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত পাইলটের অভাবেই তাঁদের জাহাজের এই ব্যর্থতা। তাই ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা 'হুগলি পাইলট সার্ভিস' প্রতিষ্ঠা করেন। তার ১০-১১ বছর পরে ১৬৭৮ কিংবা ১৬৭৯ সনে ক্যাপ্টেন স্টাফোর্ড (Captain Stafford)-এর নেতৃত্বে প্রথম ইংরেজ জাহাজ 'ফ্যালকন' (Falcon) কলকাতার পাশ দিয়ে (যদিও তখনও কলকাতায় ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হয়নি) হুগলি পর্যন্ত যায়। গ্যাঞ্জেস পাইলট সার্ভিস (Ganges Pilot Service)-এখনও আছে। ১৯৬৮-তে ওই সার্ভিসের তিন শতাব্দী পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ইংরেজদের স্থায়ীভাবে আগমন ও বসবাসের পর থেকে ইংরেজদের কাঠের তৈরি পালের জাহাজ ক্রমশ বেশি সংখ্যায় কলকাতায় আসতে আরম্ভ করে।

কিন্তু ইউরোপ বা ইংল্যান্ড থেকে এইসব জাহাজ ভারতবর্ষে আসত Cape-পথে, অর্থাৎ আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে। এই ঘুরপথে আসতে অনেক মাস, কখনও-কখনও একবছরেরও বেশি সময় লেগে যেত।

তাছাড়া পথটাও ছিল বিপজ্জনক। মহিলারাও এ-পথে বড়ো-একটা আসতে চাইতেন না। তাই একটা সংক্ষিপ্ত পথের চিন্তা বা কল্পনা মাথায় আসা স্বাভাবিক ছিল। সংক্ষিপ্ত পথের কল্পনাটা ছিল ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে আগাগোড়া জলপথ না হয়ে খানিকটা জল ও খানিকটা স্থলপথ (Overland Route)। অর্থাৎ কলকাতা, মাদ্রাজ বা বোম্বাই থেকে জাহাজে চেপে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে সুয়েজ বন্দরে যাওয়া, সেখান থেকে ইজিপ্টের মরুভূমির উপর দিয়ে উটের পিঠে বা গাড়িতে চেপে কায়রো শহর হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া যাওয়া, সেখান থেকে জাহাজ নিয়ে ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ডে পৌঁছানো। এই পথ দিয়ে যেতে পারলে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে বা ভারত থেকে ইংল্যান্ডে যাতায়াতের সময় অনেক কম লাগে। এই পথটিকে বলা হতো লোহিত সাগর-সুয়েজ পথ (Red Sea-Suez Route)।

কিন্তু এই পথের পরিকল্পনা প্রথম কোন লোকের মাথায় আসে? এ বিষয়ে দুটি মত আছে। প্রথম মতে, এই পথের পরিকল্পনা প্রথম করেন হেনরি জনসন (Captain James Henry Johnson) ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে। ওই বছরে তিনি একটি পুস্তিকা লেখেন। পুস্তিকাটির নাম ছিল 'A Prospectus for establishing by means of Steam Navigation a Communication with Calcutta and the East Indies generally via the Mediterranean, Isthmus of Suez and the Red Sea'। ১৮২৩ সনে এই পুস্তিকাটি Bolt Court, Fleet Street, London-এর Mr. B. Binsley ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকাটি থেকে জানতে পারা যায় যে লোহিত সাগর-সুয়েজ পথের প্রথম নির্দেশক হচ্ছেন ক্যাপ্টেন জেমস হেনরি জনসন—ক্যাপ্টেন টমাস ওয়াগহর্ন নন।

ক্যাপ্টেন জনসন-এর জন্ম হয় ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৮০৫ থেকে ১২ বছর তিনি রাজকীয় সামরিক নৌবিভাগে (Royal Navy) নানারকম চাকুরি করেন। ২০-১০-১৮০৫ তারিখে তিনি লর্ড নেলসনের অধীনে ট্রাফালগারের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ১৮১৭ থেকে তাঁর ভারতীয় জীবন আরম্ভ হয়। 'দি এন্টারপ্রাইজ' (The Enterprise) নামে প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ (steamship) তিনি ১৮২৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। ইংল্যান্ডের Falmouth বন্দর থেকে ছেড়ে ১৪৫ দিন পরে 'দি এন্টারপ্রাইজ' ৯-১২-১৮২৫ তারিখে কলকাতায় পৌঁছায়। ক্যাপ্টেনকে পুরস্কৃত করবার জন্য যে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল তার দু'গুণেরও বেশি সময় কলকাতা পৌঁছাতে লেগেছিল। শান্ত সমুদ্রে ঘণ্টায় ৮ সামুদ্রিক মাইলের (Knot-এর) বেশি জাহাজের গতিবেগ ছিল না। এই ঘটনার পর ক্যাপ্টেন জনসন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নৌবহরের বাষ্পীয় বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তার ফলে নদীপথে বাষ্পীয় জাহাজ পরিচালনা, বাষ্পীয় জাহাজ মেরামতের কারখানা, বাষ্পীয় জাহাজ তৈরির ডক ও এঞ্জিনিয়ারদের স্কুল—সবই তিনি সংগঠিত করেন। ২৬-১২-১৮২৫ তারিখে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট ও লেডি আমহার্স্ট, কুমারী আমহার্স্ট, লর্ড বিশপ হিবার ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী হিবার, হ্যারিংটন দম্পতি, স্যার চার্লস গ্রে, স্যার অ্যান্টনি বাটলার, মিঃ ইলিয়ট এবং আরো কতিপয় সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষ ক্যাপ্টেন জনসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 'দি এন্টারপ্রাইজ' জাহাজ গঙ্গার ভাঁটিতে Melancholy Point পর্যন্ত যায় ও বিকেলে ফিরে আসে। জাহাজটি গভর্নমেন্ট ৪০ হাজার পাউন্ডে কিনে নিয়ে নিজেদের খাস সম্পত্তি করেন। ক্যাপ্টেন

জনসনই তার পরিচালক রইলেন। ক্যাপ্টেন জনসন ৫-৫-১৮৫১ তারিখে ৬৩ বছর বয়সে উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে জাহাজেই মারা যান। খিদিরপুরের সেন্ট স্টিফেন্স চার্চ (St. Stephen's Church)-এর ভেতর দেওয়ালের গায়ে অনেক নাবিকের স্মৃতি-ফলকের সঙ্গে ক্যাপ্টেন জনসন-এরও স্মৃতিফলক আছে। অন্যমতে এঁর নাম জনসন নয়, জনস্টন (Johnston)।

ক্যাপ্টেন জনসন লোহিত সাগর-সুয়েজ পথের আদি পরিকল্পক বা নির্দেশক হতে পারেন, কিন্তু নিজের পরিকল্পনাকে কার্যকর করবার কোনো চেষ্টাই তিনি করেননি, বা করবার সুযোগ পাননি।

দ্বিতীয় মতে, লোহিত সাগর-সুয়েজ পথের পরিকল্পনা করেন টমাস ওয়াঘর্ন (Lieutenant Thomas Waghorn) ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে। ওই সনেই 'হিউ লিন্ডসে' (The Hugh Lindsay) নামে ৪১১ টনের বাষ্পীয় জাহাজ বোম্বাই থেকে সুয়েজ পর্যন্ত পাড়ি দেয়। মাত্র বোম্বাই স্টিম কমিটি ওয়াঘর্নকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য দেয়। এই নগণ্য সাহায্য ছাড়া তিনি প্রায় সম্পূর্ণ নিজের খরচে কায়রো ও সুয়েজের মধ্যে ইজিপ্টের মরুভূমিতে ৮টি বিশ্রামকেন্দ্র ও ৩টি হোটেল নির্মাণ করেন; যাত্রী ও মালবহনের জন্য উটের গাড়ির বন্দোবস্ত করেন এবং নাইল নদীতে ও আলেকজান্দ্রিয়ার খালে ছোটো ছোটো কয়েকটি স্টিমার মজুত রাখেন। তাঁর পরিকল্পনার সার্থকতা তিনি প্রমাণ করেন ১৫ বছর পরে ১৮৪৫ সনে। ওই বছরে ১ অক্টোবর বোম্বাই থেকে ডাক (Mail) নিয়ে রওনা হয়ে তিনি লন্ডনে পৌঁছান ৩১ অক্টোবর, অর্থাৎ ঠিক একমাসের মাথায়। প্রথম প্রথম এই নতুন পথে মাত্র ডাক নিয়ে যাওয়া হত। ক্রমশ দুচার জন করে যাত্রীও যেতে আরম্ভ করল। কিন্তু নিয়মিত যাত্রী যাওয়া আরম্ভ হল ১৮৬৯ সন থেকে যে সনে ফরাসি এঞ্জিনিয়ার ফার্দিনান্দ দে'লেসেপ্স (Ferdinand de Lesseps) সুয়েজ যোজককে কেটে সুয়েজ খাল তৈরির কাজ শেষ করেন। বলা বাহুল্য, এর আগে থাকতেই উত্তমাশা অন্তরীপের পথ ক্রমশ পরিত্যক্ত হতে আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু ১৮৬৯ সনে সুয়েজ খাল খোলার পর থেকে একেবারেই পরিত্যক্ত হয়। ওই বছর থেকে সুয়েজ খাল দিয়েই যাত্রী, ডাক, মাল—সবকিছুই ভারত ও ইউরোপের মধ্যে যাতায়াত করতে থাকে।

১৮৩০ সন থেকে ১৮৪০ সন পর্যন্ত ভারত ও সুয়েজের মধ্যে ডাক বহন করত ভারতীয় নৌ-বিভাগের জাহাজগুলি। ১৮৪০ সনে পেনিনসিউলার অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল স্টিম নেভিগেশন কোং (Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, সংক্ষেপে P and O) ভারত গভর্নমেন্টের সঙ্গে চুক্তি করে এই ডাক বহনের দায়িত্ব নেয়।

১২-১৩নং গার্ডেনরিচে এখন যে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের (বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের) এজেন্টের অতি সুন্দর বাসভবনটি রয়েছে, সেটি তৈরি হয় একজন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট রবিনসন (Mr. C. K. Robinson)-এর নকশা অনুযায়ী। ১৮৪৫ সনে এই অট্টালিকাটি ছিল পেনিনসিউলার অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল কোম্পানির এজেন্টের বাসভবন। আর সামনেই নদীতীরে অদূরেই ওই কোম্পানির অতি সুন্দর বাষ্পীয় পোতগুলি সারি সারি নোঙর করা থাকত। এই গার্ডেনরিচেই তখন ছিল ওই কোম্পানির ভারতস্থ প্রধান কার্যালয়। এখানে তাদের ৮টি বড়ো দোতলা বাড়ি ছিল। তাছাড়া জাহাজ মেরামতের প্রকাণ্ড কারখানা ও গুদামঘরও ছিল। তখন মাসে দুবার ডাক যেত কলকাতা থেকে

বিলেতে। একপক্ষে কলকাতার ডাক (ও যাত্রী) সোজা গার্ডেনরিচ থেকে পি-অ্যান্ড-ও স্টিমারে করে যেত। দ্বিতীয় পক্ষে কলকাতা থেকে স্থলপথে, কোথাও রেলে (তখন পর্যন্ত যেখানে যেখানে রেল হয়েছিল) কোথাও ডাকগাড়িতে, বোম্বাই যেত। সেখান থেকে স্টিমারে চেপে রওনা হত সুয়েজের পথে। সুয়েজ খাল খোলা হবার কিছু আগে ডাক ও যাত্রীরা স্টিমারে করে সুয়েজ যেত, সেখান থেকে ট্রেনে কায়রো হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া গিয়ে সেখান থেকে অন্য স্টিমার ধরত। ঠিক সেইভাবে বিলেত থেকে ডাক ও যাত্রী একপক্ষে বোম্বাইতে আসত, সেখান থেকে স্থলপথে কলকাতা। দ্বিতীয় পক্ষে আসত সুয়েজ থেকে সমুদ্রপথে সোজা গার্ডেনরিচে। সুয়েজ খাল খোলবার পর গার্ডেনরিচ থেকে পি-অ্যান্ড-ও কোম্পানির কিছু জাহাজ বোম্বাইতে চলে যায়। ক্রমশ তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৮২ সন নাগাদ ওই কোম্পানির মাত্র কয়েকটি জাহাজ গার্ডেনরিচে দেখা যায়। কয়েক বছর পর এগুলোও চলে যায় বোম্বাইতে তখন থেকে গার্ডেনরিচের পরিবর্তে বোম্বাই হল পি-এন্ড-ও কোম্পানির প্রধান কার্যালয়। আর, ১৪ দিনের পরিবর্তে সপ্তাহে একবার ওই কোম্পানির জাহাজ বিলেত ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত করতে আরম্ভ করল।

২৩নং গার্ডেনরিচে আর একটি বিখ্যাত জাহাজ কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও জেটি ছিল। সেটি হচ্ছে ফরাসি কোম্পানি—Compagni des Messegeries Maritimes de France। আর দুটি কোম্পানিরও বিদেশগামী জাহাজ ছিল এই গার্ডেনরিচে—একটি Apcar Co. (আর্মেনিয়ান), দ্বিতীয়টি Jardine Skinner Co. (ব্রিটিশ)। এই দুই কোম্পানির জাহাজ শুধু চিনের সঙ্গে কারবার করত।

কিন্তু এসব হল পশ্চিমের সঙ্গে, অর্থাৎ ইউরোপ বা ইংল্যান্ডের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা। ভারতবর্ষের পূর্বের সঙ্গে, অর্থাৎ আসাম, চাঁদপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, খুলনা, ২৪-পরগনা ও সুন্দরবনের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ-ব্যবস্থা রেলপথ হবার আগে কেমন ছিল?

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা ও গৌহাটির মধ্যে প্রথম স্টিমার চালাবার ব্যবস্থা করে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্টের সঙ্গে চুক্তি করে ইন্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোং (India General Steam Navigation Company) কলকাতা ও আসাম উপত্যকার মধ্যে দুখানি স্টিমার চালাতে আরম্ভ করে। ছয় সপ্তাহ অন্তর স্টিমার ছাড়ত। সেই সময় থেকে সরকারি স্টিমার উঠিয়ে নেওয়া হয়। তার দুবছর পরে (১৮৬২ সনে) ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলের শিয়ালদা-কুষ্টিয়া লাইন খোলা হয়।

কিন্তু এ তো হল ১৮৪৮ সনের কথা। ওই বছরের আগে কী ব্যবস্থা ছিল? ওই বছরের আগে কলকাতা ও আসামের মধ্যে একমাত্র নদীপথেই বড়ো বড়ো নৌকাযোগে যাতায়াত করতে হত। তাতে সময় লাগত ৬-৭ সপ্তাহ। শুধু আসাম থেকে নয়, পুর্ববঙ্গের যে কোনো জেলা থেকে আসতে হলেও নদীপথ ও বড়ো বড়ো নৌকো ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। ভারী ভারী মালপত্রও নৌকো বোঝাই করে আনতে হত। নদীপথে গোয়ালন্দে এসে সেখান থেকে আরিয়ল খাঁ, হরিণঘাটা, ভাঙ্গড়, মালঞ্চ, রায়মঙ্গল, হাড়িয়াভাঙ্গা (বা হরিণখোলা), গোয়াসাবা, মাতলা, জামিরা (বা ঠাকুরন) ও সপ্তমুখী নদী হয়ে পশ্চিমে সাগর দ্বীপ ও পূর্বে মূল ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী বড়তলা নদীর (channel creek-এর) মধ্য দিয়ে এসে কলকাতা থেকে ৭০ মাইল দক্ষিণে Mudpoint নামক জায়গায় হুগলি নদীতে

ঢুকে কলকাতায় আসতে হত। এই ঘুরপথে আসতে অনেক সময় লাগত। মালপত্র ও যাত্রী বোঝাই নিয়ে একমাত্র বড়ো বড়ো স্টিমারের পক্ষে এই পথে আসা সম্ভব হত। কিন্তু ভারী মালপত্র ও যাত্রী বোঝাই নৌকোর পক্ষে এই পথে সমুদ্রের গা ঘেঁষে আসা, বিশেষত বর্ষাকালের চারমাস, অত্যন্ত বিপজ্জনক ও প্রায় অসম্ভব ছিল। অথচ অন্তত বরিশাল থেকে চাল ও সুন্দরবন থেকে কাঠ কলকাতার বাজারে না আনলেই নয়। তাই কলকাতা থেকে অন্তত বরিশাল পর্যন্ত একটা সংক্ষিপ্ত ও সহজ পথ আবিষ্কার করা দরকার হয়ে পড়ল।

এই পথ বার করলেন উইলিয়াম টলি বা টালি (Major William Tolly)। তিনি গভর্নমেণ্টকে প্রস্তাব দিলেন যে সম্পূর্ণ মজে যাওয়া আদিগঙ্গার শুকনো খাতকে সম্পূর্ণ নিজের খরচে কাটিয়ে আসাম উপত্যকার ও পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির এবং ২৪-পরগনার ও সুন্দরবনের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উৎপন্ন দ্রব্য তিনি খিদিরপুরে আনবার ব্যবস্থা করবেন। সরকার এই প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং টালি সাহেবকে প্রয়োজনীয় জমির মেয়াদি ইজারা, এই খাল দিয়ে যেসব নৌকো চলাচল করবে তাদের কাছ থেকে টোল (মাশুল) আদায় করবার অধিকার ও এই খালের ধারে একটি গঞ্জ বা বাজার বসাবার অনুমতি দিলেন। টালি সাহেব এই খাল কাটতে আরম্ভ করেন ১৭৭৫ সনে, শেষ করেন ১৭৭৬ সনে, ও নৌকো চলাচলের জন্য খুলে দেন ১৭৭৭ সনে। সাবেক আদিগঙ্গা বর্তমান হেস্টিংসের কাছে গঙ্গা থেকে বেরিয়ে পূর্বমুখে গড়িয়া পর্যন্ত ৮ মাইল গিয়ে বেঁকে দক্ষিণদিকে বহতা ছিল। মেজর টালি গড়িয়া পর্যন্ত ৮ মাইল আদিগঙ্গার খাতকে কেটে খানিকটা গভীর ও চওড়া করলেন। গড়িয়া থেকে দক্ষিণমুখে না গিয়ে সোজা পূর্বমুখে ৯ মাইল লম্বা একটি সম্পূর্ণ নতুন খাল কাটিয়ে শামুকপোতা বা তার্দা বন্দরে নিয়ে গিয়ে সেকালে প্রবল বেগে বহতা বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গে যোগ করে দিলেন। হেস্টিংস থেকে শামুকপোতা বা তার্দা পর্যন্ত ১৭ মাইল লম্বা খালকে বলা হয় টালির নালা। টালির নালা নাম হবার আগে হেস্টিংস থেকে গড়িয়া পর্যন্ত ৮ মাইল লম্বা আদিগঙ্গার খালের নাম ছিল স্যারম্যান সাহেবের নালা (Surman's Nullah) এবং তারও আগে নাম ছিল গোবিন্দপুর নালা বা খাল (Govindpur creek)। শামুকপোতা ও তার্দা বিদ্যাধরী নদীর এপারে এবং ওপারে কলকাতা থেকে ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। সে সময়ে শামুকপোতা থেকে বিদ্যাধরী নদী দক্ষিণ-পূর্ব বাহিনী হয়ে ক্যানিং বা মাতলা নদীতে গিয়ে পড়ত। সেখান থেকে কয়েকটি খাল ও নদী পার হয়ে কালিন্দী নদীতে পড়া যেত এবং কালিন্দী নদী দিয়ে খুলনা জেলার বসন্তপুর পর্যন্ত যাওয়া যেত। বসন্তপুর থেকে আবার নানা খাল ও নদীপথে বরিশাল পর্যন্ত যাওয়া যেত। সোজা গেলে কলকাতা থেকে বরিশাল শহরের দূরত্ব মাত্র ১৮৭ মাইল। কিন্তু কলকাতা থেকে এইসব নদী-খাল দিয়ে যেতে গেলে দূরত্ব পড়ত ১১২৭ মাইল। হাজার মন বা আরো বেশি মাল বোঝাই বড়ো বড়ো দেশি নৌকো বা ছোটো মালবাহী স্টিমারের পক্ষে শামুকপোতা থেকে বরিশাল যাবার এই নদীপথ ছিল একমাত্র পথ। এ পথের নাম ছিল বাইরের নৌকোপথ বা নীচের সুন্দরবন-পথ (Outer Boat Route or Lower Sunderbans Passage)।

শামুকপোতা থেকে বিদ্যাধরী দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে যেমন মাতলা ইত্যাদি স্থানে যাওয়া যেত, তেমনি ওই নদী দিয়েই উত্তর-পশ্চিমে ১৪$\frac{১}{২}$ মাইল দূরে বামনঘাটায় আসা যেত।

ইংরেজরা যখন প্রথম কলকাতায় আসে তখন চাঁদপাল ঘাটের কাছে গঙ্গা থেকে একটা খাল বা নালা বেরিয়ে হেস্টিংস স্ট্রিটের উপর দিয়ে, ধর্মতলা স্ট্রিটের উত্তর দিয়ে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ভেতর দিয়ে সার্কুলার রোড পার হয়ে, এন্টালির উত্তর গা দিয়ে দক্ষিণমুখে গিয়ে বেলেঘাটার দক্ষিণে বাদা বা লবণ হ্রদের ভেতর ধাপায় পড়ত। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ হেস্টিংস স্ট্রিট থেকে সার্কুলার রোড বা এন্টালি রোডের কাছ পর্যন্ত এই খাল হয় ক্রমশ পলি পড়ে পড়ে বুজে গিয়েছিল, নয় রাস্তা, বাড়িঘর ইত্যাদি তৈরি করার জন্যে বুজিয়ে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু সার্কুলার রোড থেকে ধাপা পর্যন্ত ওই খালের নীচের অংশ (যার নাম ছিল এন্টালি বা বেলেঘাটা খাল) তখনও বর্তমান ছিল। এন্টালি রোড থেকে পামার ব্রিজ পাম্পিং স্টেশন পর্যন্ত এই এন্টালি খালের উপর অংশ মাতলা (ক্যানিং) রেল লাইন পাতার ও কলকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর (underground drainage) কাজ আরম্ভ হবার সময়ে ১৮৬০ কি ১৮৬১ সনে বুজিয়ে ফেলা হয়।

পূর্বে ধাপা থেকে বামনঘাটা পর্যন্ত ৫$\frac{১}{২}$ মাইল লম্বা বিদ্যাধরী নদীর একটি শাখা লবণহ্রদের মধ্য দিয়ে বহতা ছিল। এই শাখানদীকে ইংরেজিতে বলা হত Central Lake Channel। বামনঘাটায় গিয়ে এই শাখানদী মূল বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আরও ১৪$\frac{১}{২}$ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে গিয়ে শামুকপোতা বা তার্দায় পৌঁছাত।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ লেক চ্যানেল ও বেলেঘাটা খাল পলি পড়ে প্রায় অকেজো হয়ে যায়। যাতে শামুকপোতা থেকে বিদ্যাধরী নদী দিয়ে বামনঘাটায় এসে লেক চ্যানেল দিয়ে সার্কুলার রোড পর্যন্ত মাল বোঝাই নৌকো পৌঁছাতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট ১৮১০-এ লেক-চ্যানেল ও বেলেঘাটা খালের ভালো রকম সংস্কার করেন।

এরপর টালির নালার উপর থেকে অতিরিক্ত নৌকোর চাপ কমাবার জন্য ১৮২৬ ও ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পশ্চিমে বামনঘাটা ও পূর্বে যমুনা বা ইছামতী নদীতীরস্থ হাসনাবাদের মধ্যে একটা সোজা পূর্বমুখী খালপথ তৈরি করা হয়। উত্তর থেকে দক্ষিণে বহতা কতকগুলি নদীকে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ৬টি ছোটো ছোটো কৃত্রিম খাল কেটে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এই খালপথে ধাপা থেকে বরাবর সোজা পূর্বদিকে গিয়ে হাসনাবাদে পৌঁছানো যেত। (আরো কিছু পরে এই পথের উপর দিয়েই ভাঙড় খাল কাটা হয়। সেকথা পরে বলা হবে।) এই খালপথই হল ভেতরের নৌকো পথ অথবা উপরের সুন্দরবন-পথ (Inner Boat Route or Upper Suderbans Passage)। এই পথে শুধু ছোটো ছোটো হালকা নৌকো ও স্টিমলঞ্চ চলাচল করতে পারত। ভারী মাল বোঝাই বড়ো বড়ো নৌকো পারত না। তাদের জন্য বাইরের নৌকো-পথ বা নীচের সুন্দরবন-পথ ছিল, সেকথা আগেই বলা হয়েছে।

এখন বামনঘাটা থেকে শামুকপোতা বা তারও নীচে পর্যন্ত বিদ্যাধরী নদী একেবারে শুকিয়ে গেছে। কোথাও কোথাও মাত্র একহাত চওড়া একটা শুকনো খাদ পড়ে থাকতে দেখা যায়। হুগলি ও হাওড়া জেলায় সরস্বতী নদীর যে দশা হয়েছে, ২৪-পরগনা জেলার বিদ্যাধরী নদীরও সেই হাল হয়েছে।

বামনঘাটা খালের সম-সময়েই সার্কুলার খাল কাটা হয়। এই খাল কাটার পরিকল্পনা সর্বপ্রথম করেন টেরিটি (Tiretta) সাহেব, যাঁর নামে টেরিটি বাজার। তিনি কলকাতার

পথঘাট ও বাড়িঘরের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। তিনি লর্ড ওয়েলেসলিকে এই খাল কাটার পরামর্শ দেন। কিন্তু তাঁর পরামর্শ তখন গ্রাহ্য হয়নি।

তারপর মেজর সক্ (Major Schalch) ১৮২৪ সনে এই খালের এক নকশা তৈরি করেন। কিন্তু নকশা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হবার আগেই তিনি ১৮২৬ সনে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে মারা যান। সক্ সাহেব কলকাতা শহরের এক মানচিত্রও তৈরি করেছিলেন। একসময়ে এই মানচিত্র কলকাতাবাসীদের ঘরে ঘরে দেখা যেত। সক্ সাহেবের মৃত্যুর পর ১৮২৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর নকশা অনুযায়ী সার্কুলার খাল কাটা আরম্ভ হয় ও শেষ হয় ১৮৩৩ সনের জুন-জুলাই মাসে। ১৮৩৩ সনেই চিৎপুরে প্রথম 'লক্' বা জলকপাট বসানো হয়।

মারহাট্টা খাদের উপর দিয়ে তখন যে চিৎপুরের পোল ছিল, তার ঠিক উত্তরে গঙ্গা থেকে এই খাল আরম্ভ হয়ে টালার ও বেলগেছের রাস্তা পার হয়ে সার্কুলার রোডের সমান্তরালে, সার্কুলার রোড থেকে পূর্বে আধ মাইলেরও কম দূরত্বে, এগিয়ে চলেছে। শেষে বেলেঘাটা রাস্তা পার হয়ে এই খাল দক্ষিণ-পূর্বে সামান্য বাঁক নিয়ে এন্টালি বা বেলেঘাটা খালে পড়েছে। সার্কুলার খাল উপরের দিকে ৮০ হাত চওড়া, তলায় জলের বিস্তার ৮০ ফুট। গভীরতা কোথাও ৬ ফুটের কম নয়, স্থানে স্থানে ১৮ ফুট পর্যন্ত। এই খালের দুদিকে—পূর্বে ও পশ্চিমে—৪০ হাত চওড়া রাস্তা। প্রায় ৩ হাজার শ্রমিক রাজাবাজারের কাছ থেকে এই খাল কাটতে আরম্ভ করে ক্রমশ উত্তর ও দক্ষিণে এগিয়ে যায়। এই খাল যদিও গোল নয়, তবুও এর নাম হয়েছে সার্কুলার খাল, এই কারণে যে এ খাল সার্কুলার রোডের পাশাপাশি চলেছে।

কিন্তু বামনঘাটার খাল ও সার্কুলার খাল কেটেও তেমন সুরাহা হল না। পণ্যবাহী নৌকোর সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলল। খালে আর নৌকো ধরে না। পুরোনো খালের উপর থেকে এই নৌকোর চাপ সরাবার জন্য আর একটা নতুন খাল কাটা হল। কাটার কাজ আরম্ভ হয় ১৮৫৫-৫৬ সনে, শেষ হয় ১৮৫৮-৫৯ সনে। এই খালের নাম হল নতুন-কাটা খাল (New-cut Canal)। এটি বেলগেছিয়া পুলের ৯০০ ফুট দক্ষিণে উল্টোডাঙায় সার্কুলার খাল থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্ব-দক্ষিণে গিয়ে ধাপায় পড়ত। পড়ত বলছি এই জন্য যে এখন আর এ খাল নেই। ১৯৬৩ সনে বাংলা সরকার এক যুগোস্লাভ কোম্পানিকে ঠিকা দিয়ে এই খাল ভরাট করান। কোম্পানি গঙ্গা থেকে পাইপে করে বালি এনে এ খাল বুজিয়ে ফেলেছে। তার ফলে অন্য কতকগুলি সমস্যা দেখা দিয়েছে। মানিকতলা-নারকেলডাঙা অঞ্চলের জল নিকাশ হচ্ছে না। বর্ষার ৪ মাস এই অঞ্চল জলে ভেসে যায়। নানারকম অসুখ-বিসুখও ছড়ায়।

সার্কুলার খাল ও বেলেঘাটা খালেরও দিন ঘনিয়ে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ (Irrigation) বিভাগ এই খাল দুটিকেও বুজিয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু যখন নতুন-কাটা খাল বহতা ছিল তখন সার্কুলার খাল দিয়েও যেমন ধাপা থেকে চিৎপুরে যাওয়া যেত, এ খাল দিয়েও তেমনি যাওয়া যেত।

আগেকার মানিকতলা মিউনিসিপালিটি ছিল একটি দ্বীপের মতো। এর পশ্চিমে আছে সার্কুলার খাল, উত্তরে ও পূর্বে ছিল নতুন-কাটা খাল ও দক্ষিণে আছে বেলেঘাটা খাল। এখনো এই অঞ্চলটিকে দ্বীপ বলা চলে। কেননা, ভারতীয় ভূগোল

অনুসারে কোনো ভূ-ভাগের মাত্র দুইদিকে জল থাকলেই সেটি দ্বীপ। [ দ্বী=দুই (দিকে), প (অপ=জল) ]।

তারপর ১৮৮৩ সনে সার্কুলার খালের দুই প্রান্তে দুটি কপাট (Lock) বসানো হল প্রায় একই সময়ে—একটি চিৎপুরে, আর একটি ধাপায়। চিৎপুর লক্ খোলা হয় ১৪-২-১৮৮৩ তারিখে। অন্যমতে ২১-৭-১৮৮৩ তারিখে। ধাপা-লক্ খোলা হয় ৪-২-১৮৮৩ তারিখে। চিৎপুর-লক্ এখনো আছে। কিন্তু ধাপা-লক্ বালিচাপা পড়ে গেছে, শুধু মাথাটার একটুখানি বেরিয়ে আছে। লক্-এর প্রধান কাজ হচ্ছে নদীতে বা খালে জলের সমতা রক্ষা করা। আর একটা কাজ হচ্ছে লক্-এর ভেতর নৌকোগুলোকে ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে 'টোল' (মাশুল) আদায় করা।

১৮২৬ ও ১৮৩১ সনের মধ্যে কলকাতা ও হাসনাবাদের মধ্যে যে জলপথ তৈরি করা হয়েছিল বলেছি, কালক্রমে সে পথ ক্রমশ পলি পড়ে পড়ে নৌকোর পক্ষে অব্যবহার্য হয়ে উঠেছিল। তাই ১৮৯৫ সনে ওই পথের উপর দিয়ে বামনঘাটা থেকে কুলটি পর্যন্ত এক নতুন খাল কাটা আরম্ভ হল। কাটা শেষ হল ১৮৯৭ সনে। এই খালের নাম হল ভাঙ্গড় কাটাখাল। খালের দুই প্রান্তে দুটি লক্ তৈরি হল—বামনঘাটায় একটি ও কুলটিতে একটি। এ খালটি এখনো আছে। বামনঘাটা ও কুলটি 'লক্' তৈরি হয় ১৮৯৭ সনে ও পরিত্যক্ত হয় ১৯৩৫ সনে।

১৮৯৭ সনের পর থেকে লেক চ্যানেল পলি জমে খুব তাড়াতাড়ি মজে যেতে লাগল। বামনঘাটা থেকে ধাপায় আসবার ওই ছিল একমাত্র পথ। সুতরাং আর একটা খাল না কাটলেই নয়। ১৯০৮-১০ সনে এই খাল কাটা হল। নাম হল কৃষ্টপুর খাল (কৃষ্টপুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে বলে)। এই খাল নতুন-কাটা খাল থেকে আরম্ভ হয়েছে আরাটুন (Aratoon) পাট-কলের কাছ থেকে আর উত্তর লবণ হ্রদের (এই হ্রদও এখন বালি দিয়ে প্রায় ভরাট করে ফেলা হয়েছে) পূর্বদিক দিয়ে বামনঘাটায় ভাঙ্গড় খালে পড়েছে। এখন পূর্বদেশগামী বা পূর্বদেশ থেকে আগত সব নৌকোই এই খাল দিয়েই যাতায়াত করে। এই খাল দিয়ে যাতায়াত করার একটা বড়ো সুবিধে এই যে, পূর্বদেশ থেকে আগত সমস্ত নৌকো একবার কুলটি 'লক্' পার হয়ে ভাঙ্গড় খালে ঢুকে পড়লে তাদের বামনঘাটা লক্ পেরোতে হত না, বামনঘাটা লক্-কে পশ্চিমে রেখে সোজা নতুন-কাটা খালে পৌঁছাতে পারত। সেখান থেকে ইচ্ছে করলে একদিকে নতুন-কাটা খাল নিয়ে ধাপা লক্-এ যেতে পারত, অন্যদিকে সার্কুলার খাল দিয়ে চিৎপুর লক্-এ পৌঁছাতে পারত। এখন শুধু চিৎপুরে যেতে পারে। ধাপা লক্-এ যাবার উপায় নেই। কেন না আগেই বলা হয়েছে, নতুন-কাটা খাল ভরাট করে ফেলা হয়েছে।

কৃষ্টপুর খালের পর কলকাতা থেকে পূর্ববঙ্গে যাবার অন্য কোনো খাল এ পর্যন্ত কাটা হয়নি।

উল্লিখিত সমস্ত নদীর ও খালের সমষ্টিগত নাম ছিল সার্কুলার এবং প্রাচ্য খালমণ্ডল (Circular and Eastern Canals System) অথবা কলকাতার প্রাচ্য খালমণ্ডল (Calcutta and Eastern Canals System)। খাল বলতে শুধু খালকেই ধরলে হবে না, নদীকেও ধরতে হবে। আগেই বলা হয়েছে, এই খাল পরম্পরার দৈর্ঘ্য ছিল মোট ১১২৭ মাইল।

তার মধ্যে মাত্র ৪৭ মাইল কৃত্রিম খনিত খাল। বাকি ১০৮০ মাইল স্বাভাবিক নদীপথ। কলকাতা খালের অন্তর্গত ছিল সার্কুলার খাল, বেলেঘাটা খাল ও নতুন কাটা খাল। কৃষ্টপুর সমেত বাকি সব খাল ও নদী প্রাচ্য খাল।

পূর্বে বাংলা গভর্নমেন্টের একটা স্বতন্ত্র সার্কুলার ও প্রাচ্য খালবিভাগ (Circular and Eastern Canals Division) ছিল একজন Executive Engineer-এর অধীনে। ১৮৫২-৫৩ সনে গুডউইন (Lt. Colonel H. Goodwin) দক্ষিণ-পূর্ব সার্কেলের সুপারিনটেন্ডিং এঞ্জিনিয়ার (Superintending Engineer) ছিলেন। ১৮৭৮ সনে আইজাক (Mr. Isaac) ছিলেন এই সার্কেলের সুপারিনটেন্ডিং এঞ্জিনিয়ার। Major Schalch ১৮১৭-২৫ সনে Superintendent of Canals and Bridges ছিলেন। তাঁর পরে প্রিন্সেপ (Captain Thomas Prinsep) ১৮২৫-৩২ সনে Superintendent of Canals ছিলেন।

গত শতাব্দীর ৮ম-৯ম দশকে Mr. J. C. Vertannes নামে একজন ইংরেজ এই খাল বিভাগের দক্ষিণ-পশ্চিম সার্কেলের সুপারিনটেন্ডিং এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। আর যাঁর নাম এখনো গ্যালিফ স্ট্রিট (Galiff Street) বহন করছে সেই গ্যালিফ ছিলেন সার্কুলার ও প্রাচ্য খালমণ্ডলের সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং খালের টোল (মাশুল)-আদায়কারী (Collector)। ৯নং গ্যালিফ স্ট্রিটে তাঁর অফিস ছিল, বাড়িটির নাম Canal Villa। সে বাড়ি এখনো রয়েছে। Captain Guthrie ছিলেন খালের প্রথম মাশুল-আদায়কারী (Toll Collector)।

স্বাধীনতার পর সার্কুলার ও প্রাচ্য খালবিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ (Irrigation) বিভাগের অধীনে চলে গেছে। এই বিভাগের উপর একজন চিফ্ এঞ্জিনিয়ার আছেন।

কিন্তু যে টালির নালা দিয়ে আমরা কৃত্রিম খাল সৃষ্টি করার কথা আরম্ভ করেছিলাম, তার শেষ এখনো বলা হয়নি। টালি সাহেবের কাটা আদিগঙ্গার খাল তেমন গভীর বা চওড়া ছিল না। মাত্র ছোটো ছোটো হালকা নৌকো এই খাল দিয়ে যেতে-আসতে পারত। টালি সাহেবকে গর্ভনমেন্ট যে নৌকোর ওপর থেকে টোল আদায় করবার ইজারা দিয়েছিলেন, তা ছিল ১০ বছরের জন্য। ১০ বছর পর পর এই ইজারা নতুন করে দেওয়া হবে, এই চুক্তি ছিল। টালি সাহেব মারা যান ১৭৮৪ সনে। ১৭৯০ সনের ক্যালকাটা গেজেট-এ (*Calcutta Gazette*) প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, মেজর টালির বিধবা পত্নী আনা মারিয়া (Anna Maria Tolly), জন উইলকিন্‌স (Mr. John Wilkins) নামে এক সাহেবকে টালির নালা থেকে টোল আদায় করবার ইজারার বাকি মেয়াদ বিক্রি করেছেন। কিন্তু এই খালের পরিচালনা মোটেই সন্তোষজনক না হওয়ায় গভর্নমেন্ট ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে টালির নালা নিজের হাতে নিয়ে নেন। ওই সনের গভর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশিত একটি সরকারি ঘোষণায় বলা হয় যে টালির নালা দিয়ে যাতায়াতকারী নৌকো ও মালের উপর যে শুল্ক স্বর্গীয় টালি সাহেবের মৃত বিধবার জন্য আদায় করা হত, তা এরপর থেকে ২৪-পরগনা জেলার কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে গভর্নমেন্টের জন্য আদায় করা হবে। গভর্নমেন্ট টালির নালা নিজের হাতে নেবার পর থেকে এই নালাকে অনেক চওড়া ও গভীর করেন, যার ফলে নৌকো চলাচল বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তাহলেও এই নালায় অনবরত পলি জমে, বিশেষত টালিগঞ্জের কাছে। তাই এই নালাকে অনবরত পরিষ্কার করতে হয় সচল রাখবার জন্য। এমনকি ভরা বর্ষায় একটা ছোটো বাষ্পীয় লঞ্চ তখনই টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে যেতে পারে, যখন নালা জোয়ারের জলে অর্ধেক বা তারও বেশি ভরে যায়।

এখন টালিগঞ্জ অর্থাৎ টালি সাহেবের বসানো গঞ্জ বা বাজার কোথায় ছিল? যেখানে খিদিরপুর ডক থেকে Boat Canal টালির নালায় পড়েছে, তার ঠিক দক্ষিণে বজবজ রেল লাইন নালার উপর দিয়ে চলে গেছে। আরও কিছুটা দক্ষিণে টালির নালার পূর্ব পাড়ে এই গঞ্জ ছিল। এখন পূর্ব-পশ্চিমে সমস্ত অঞ্চলটার নাম হয়েছে টালিগঞ্জ। কিন্তু যাঁর নামে এই বিস্তৃত অঞ্চলের নাম, সেই টালি সাহেবের গঞ্জ বা বাজার বহুদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, বোধহয় টালি সাহেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর স্ত্রী বিলেতে থাকতেন। খুব সম্ভবত তিনি বাজারের মালিক ছিলেন না। নইলে কারও-না-কারও সঙ্গে এ বাজারেরও বিলি-বন্দোবস্তের বিজ্ঞাপন তাঁর তরফ থেকে আমরা পেতাম।

কলকাতার কয়েক মাইল দক্ষিণে টালির নালা থেকে ২০ মাইল লম্বা একটা খাল বেরিয়ে কাওড়া পুকুরের মধ্য দিয়ে দক্ষিণে মগরাহাট পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। লক্ষ্মীকান্তপুর রেললাইন হবার আগে মগরাহাট থেকে ডোঙা বা শালতি করে আর একটা সরু খাল দিয়ে জয়নগর-মজিলপুর যেতে হত। অন্য কোনো উপায় ছিল না। অথচ রেলপথে কলকাতা থেকে মগরাহাট মাত্র ২৫ মাইল দূর ও জয়নগর-মজিলপুর ৩১ মাইল দূর।

এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হল তা থেকে আমরা কলকাতা থেকে বরিশাল যাবার ৩টি বিকল্প পথ পাচ্ছি। একটি হল ভেতরের নৌকো-পথ বা উপরের সুন্দরবন-পথ। দ্বিতীয়টি হল বাইরের নৌকো-পথ বা নীচের সুন্দরবন-পথ। তৃতীয়টি হল স্টিমার-পথ।

ভেতরের নৌকো-পথ চিৎপুর থেকে সার্কুলার খাল ও লেক চ্যানেল দিয়ে বামনঘাটা পৌঁছাত। বামনঘাটায় গিয়ে ভাঙ্গড় খালে ঢুকত। ভাঙ্গড় খাল দিয়ে বরাবর জলপথে ইছামতী বা যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত হাসনাবাদে এবং সেখান থেকে ওই নদী দিয়ে খুলনা জেলায় বসন্তপুরে পৌঁছাত। মাত্র ছোটো দেশি নৌকো ও লঞ্চ এইপথে যেতে পারত।

ভারী ভারী মাল বোঝাই বড়ো বড়ো নৌকো বা মালবাহী স্টিমার ভেতরের নৌকো-পথ দিয়ে যেতে পারত না। তারা বাইরের নৌকো-পথ ব্যবহার করতে বাধ্য হত। বাইরের নৌকো-পথ শামুকপোতা থেকে আরম্ভ হত। কলকাতা থেকে শামুকপোতা যাবার দুই উপায় ছিল, হয় সার্কুলার খাল দিয়ে, নয় টালির নালা দিয়ে। শামুকপোতা থেকে পূর্ব-দক্ষিণে বিদ্যাধরী নদী দিয়ে ক্যানিং-এ যাওয়া যেত। ক্যানিং থেকে কয়েকটি নদী পার হয়ে কালিন্দী নদীতে পড়া যেত, আর কালিন্দী নদী ধরে বসন্তপুরে পৌঁছাতে পারা যেত।

স্টিমার-পথ ইন্ডিয়া জেনারেল স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানি ও রিভার্স স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানির বড়ো বড়ো স্টিমার ও গাদাবোট ব্যবহার করত। এই স্টিমার-পথে বাষ্পীয় জাহাজ কলকাতা থেকে গঙ্গানদী দিয়ে ৭০ মাইল দক্ষিণে মাড-পয়েন্টে যেত। মাড-পয়েন্ট থেকে মূল ভূখণ্ড ও সাগরদ্বীপের মধ্যবর্তী বড়তলা নদী বা চ্যানেল ক্রিকে ঢুকত। চ্যানেল ক্রিক থেকে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কতকগুলি খাল পার হয়ে সপ্তমুখী নদীতে পড়ত। সপ্তমুখীর পরে জামিরা নদী, জামিরা থেকে পরপর মাতলা, গুয়াসাবা. হাঁড়িয়াভাঙা ও কালিন্দী নদী পার হয়ে খুলনা জেলায় পৌঁছাত। তারপর খুলনা জেলা থেকে ক্রমাগত পূর্বমুখে গিয়ে বরিশালে পৌঁছাত।

নিম্নলিখিত খালগুলি একসময়ে সার্কুলার ও ইস্টার্ন খাল বিভাগের একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অধীনে ছিল :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। সার্কুলার খাল (বেলিয়াঘাটা-সমেত) | — | ৫$\frac{১}{২}$ | মাইল |
| ২। নতুন কাটা খাল | — | ৪ | ” |
| ৩। কৃষ্টপুর খাল (নিউ-কাট থেকে বামনঘাটা) | — | ১০ | ” |
| ৪। লেক চ্যানেল (ধাপা থেকে বামনঘাটা) | — | ৫$\frac{১}{২}$ | ” |
| **ভেতরের নৌকো-পথে ঃ** | | | |
| ৫। বামনঘাটা থেকে কুলটি | — | ১৫ | ” |
| ৬। বামনঘাটা থেকে বসন্তপুর | — | ৪২ | ” |
| **বাইরের নৌকো-পথে ঃ** | | | |
| ৭। বামনঘাটা থেকে শামুকপোতা | — | ১৪$\frac{১}{২}$ | ” |
| ৮। শামুকপোতা থেকে বসন্তপুর | — | ৫৪ | ” |
| ৯। টালির নালা (শামুকপোতা থেকে হেস্টিংস পুল) | — | ১৭ | ” |
| ১০। কাওড়া পুকুর খাল (টালির নালা থেকে মগরাহাট) | — | ২০ | ” |
| ১১। সুন্দরবন স্টিমার-পথে (কলকাতা থেকে বসন্তপুর) | — | ১৭২ | ” |

এ পর্যন্ত যত পথের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি ছিল কলকাতা থেকে দক্ষিণে বা পূর্বে যাবার পথ। কিন্তু রেল হবার আগে উত্তরে বা পশ্চিমে যাবার উপায় কী ছিল? এক উপায় ছিল ডাঙাপথে পালকি বা ডাকগাড়ি চেপে। এ ছিল অনেক খরচ-সাপেক্ষ। দ্বিতীয় উপায় ছিল গঙ্গা দিয়ে নৌকো করে যাওয়া। 'নৌকো' শব্দটি সাধারণ নাম।

ছোটো, বড়ো, যাত্রীবাহী, মালবাহী নানারকমের নৌকো ছিল এবং এখনো আছে। অল্প লোকে কাছাকাছি যেতে হলে 'পান্‌সি' ব্যবহার করত। 'পান্‌সি' নামটি ইংরেজি Pinnace থেকে এসেছে। অল্প মালসহ বহু যাত্রীবাহী বড়ো নৌকোর নাম ছিল 'বজরা'। এ নামটিও ইংরেজি Barge থেকে এসেছে। বড়ো লোকদের আরাম করে যাবার নৌকো ছিল 'ভাউলে'। তাতে খাবার, শোবার ও বসবার জন্য পৃথক পৃথক ঘর থাকত। শুধু মালপত্র বইবার জন্য দু-রকমের বড়ো নৌকো ছিল—কিস্তি ও ভড়।

এইসব নৌকো করে লোকে ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমের শহরে তীর্থ করতে বা শুধু বেড়াবার জন্য যেত। নৌকোর ভাড়া ঠিক হত দাঁড়ের সংখ্যা ও গন্তব্যস্থানের দূরত্ব অনুসারে।

তারপর এল বাষ্প-চালিত জাহাজ (Steamship বা Steamer)। পাল-চালিত জাহাজ, এমনকি যুদ্ধের জাহাজও, হত কাঠের তৈরি। বাষ্প-চালিত জাহাজ কিন্তু লোহার তৈরি।

যাত্রী বা মালবহনের ক্ষমতা ও গতির দিক থেকে সেইলিং শিপ (Sailing Ship) স্টিম শিপ (Steamship) থেকে অনেক নিকৃষ্ট।

হোর মিলার কোম্পানি (Hoare Miller Co)-র প্রকাণ্ড দোতলা প্যাড্‌ল হুইল (Paddle-wheel) স্টিমার জগন্নাথঘাট থেকে ছেড়ে শান্তিপুর-কালনা যেত। এই কোম্পানির জাহাজের গতি ছিল মন্থর। কিন্তু ইন্ডিয়া জেনারেল স্টিম ন্যাভিগেশান কোং (India General Steam Navigation Co.) সংক্ষেপে (I.G.S.N. Co.) এবং রিভার্স স্টিম ন্যাভিগেশন কোং (Rivers Steam Navigation Co.) সংক্ষেপে (R.S.N. Co.)—এই দুই কোম্পানির জাহাজ ছিল অপেক্ষাকৃত হালকা ও বেশি দ্রুতগামী। এই জাহাজগুলি কাশী, প্রয়াগ ইত্যাদি স্থানে যাতায়াত করত। সুতরাং সুদূর পশ্চিমে যেতে হলে এই দুই কোম্পানির জাহাজে চেপে যেতে হত। জলপথে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে যাওয়ার কথা পরে আরো বলা হবে।

তারপর গত শতাব্দী পার করে এই শতাব্দীতে পোর্ট কমিশনাররা চাঁদপাল ঘাট থেকে তাঁদের ফেরি স্টিমার (Ferry Steamer Service) খুললেন। প্রথম স্টিমার চালু হয় ১৯০৭ সনের অক্টোবর মাসে। এই ফেরি সার্ভিস ক্রমশ বিস্তৃত হয় দক্ষিণে রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর, গার্ডেনরিচ, রাজগঞ্জ, সাঁকরাইল পর্যন্ত ও উত্তরে কাশীপুর, বরানগর, দক্ষিণেশ্বর, আড়িয়াদহ, লিলুয়া, বেলুড় ও বালি পর্যন্ত।

উল্লিখিত অঞ্চলগুলির লোকেদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য পোর্ট ট্রাস্ট এই ফেরি সার্ভিস খোলে। কিন্তু অল্পদিন পরে দেখা গেল, এই সার্ভিস থেকে পোর্ট ট্রাস্টের লাভ না হয়ে লোকসান হচ্ছে। ২০ বছর চালিয়ে ১৯২৭ সালে পোর্ট ট্রাস্ট এই ফেরি সার্ভিস তুলে দেয়। শেষপর্যন্ত তাদের ফেরি স্টিমারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৩।

তারপর ফেরি সার্ভিস চালান ক্যালকাটা স্টিম ন্যাভিগেশন কোং (Calcutta Steam Navigation Co. Ltd.)। ৫নং ফেয়ারলি প্লেসে তাঁদের অফিস ছিল। এঁদের মাত্র দুটি সার্ভিস ছিল, দুটিই দৈনিক। একটি চাঁদপাল-রামকৃষ্ণপুর সার্ভিস, দ্বিতীয়টি চাঁদপাল-রাজগঞ্জ সার্ভিস। প্রথমটিতে স্টিমার চাঁদপালঘাট থেকে যেত রামকৃষ্ণপুর, সেখান থেকে তেলকলঘাট; তেলকলঘাট থেকে চাঁদপালঘাটে ফিরে আসত। দ্বিতীয়টিতে স্টিমার চাঁদপালঘাট থেকে যেত শিবপুর, সেখান থেকে তক্তাঘাট, সেখান থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেন, সেখান থেকে মেটিয়াবুরুজ; মেটিয়াবুরুজ থেকে রাজাবাগান, রাজাবাগান থেকে রাজগঞ্জ। রাজগঞ্জ থেকে ঐ পথেই, অর্থাৎ রাজাবাগান, মেটিয়াবুরুজ, বোটানিক্যাল গার্ডেন, তক্তাঘাট, শিবপুর হয়ে চাঁদপালঘাটে ফিরে আসত।

১৯শ শতকের গোড়ায় সেন্ট্রাল লেক চ্যানেল (Central Lake Channel)-কে বলা হত ইস্টার্ন ক্যানাল্‌স (Eastern Canals)। এ নামটা অনেকদিন পর্যন্ত ছিল। সেন্ট্রাল লেক চ্যানেল নাম হবার পরেও এ নামটা কখনো কখনো ব্যবহার হত। তখন একে বলা হত ওল্ড ইস্টার্ন ক্যানাল্‌স (Old Eastern Canals)।

আগেই বলা হয়েছে, মজে যাওয়া সেন্ট্রাল লেক চ্যানেল ও বেলেঘাটা বা এন্টালি খালকে ১৮১০ সনে ভালোভাবে সংস্কার করা হয়। এই খাল সংস্কার করা হয় সুন্দরবন থেকে কলকাতায় জ্বালানি কাঠ, সুন্দরীগাছের খুঁটি, কুঁড়েঘর ছাইবার গোলপাতা ইত্যাদি আনবার জন্য।

বেলেঘাটা খালের ওপর থেকে অত্যধিক নৌকোর ভিড় কমাবার জন্য সার্কুলার খাল কাটা হয়। এই খাল কাটা শেষ হয় ১৮৩৩ সনে। ওই সনেই চিৎপুরে একটি 'লক্' বা জলকপাট বসানো হয়। ৫০ বছর পরে ১৮৮৩ সনে চিৎপুরে আর একটি লক্ বসানো হয়। তখন এই লক্‌টিকে বলা হতে লাগল 'নতুন লক্' ও ১৮৩৩ সনের লকটিকে 'পুরোনো লক্'।

চিৎপুরে প্রথম 'লক্' বসাবার ৩ বছর পরে ১৮৩৬ সনে এক আইন পাশ করা হয়। এই আইনটির নাম হয় ১৮৩৬ সনের ২২ নং আইন। তখন পর্যন্ত যতগুলি খাল ছিল, অর্থাৎ সেন্ট্রাল লেক চ্যানেল, বেলেঘাটা খাল, ভাঙড় কাটাখাল ও সার্কুলার খাল—এই আইনটি তাদের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত। এই আইন বলেই একজন খালের সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনিয়ার, একজন খালের একজিকিউটিভ অফিসার ও একজন মাশুল-আদায়কারীর (Toll Collector) পদ সৃষ্টি হয়।

এই আইনেই বলা হয় যে, প্রত্যেক ১০০ মন মালবাহী নৌকো এইসব খালে মাল বোঝাই ও খালাস করবার জন্য ২ দিন ও ঢোকবার ও বেরোবার জন্য আরও ৩ দিন থাকতে পারবে। এই সময়ের পরেও থাকলে খালে ঢোকবার সময় যে মাশুল তাকে দিতে হয়েছিল তার $\frac{১}{৮}$ ভাগ প্রতিদিনের দেরির জন্য জরিমানা (demurrage) দিতে হবে। খালে ঢোকার 'টোল' বা মাশুল ধার্য হয় প্রত্যেক ১০০ মন মালের জন্য ১ টাকা। ১৮৩৮-৩৯ সনে এই মাশুল এক টাকা থেকে কমিয়ে আট আনা করা হয়। এই নামমাত্র জরিমানাটুকু দিয়ে দিলেই সব ল্যাটা চুকে গেল। যে যতদিন খুশি খালের ভেতর থাকতে পারে। তাকে আইনত কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। এতে করে হল নৌকো-ওয়ালাদের পোয়াবারো এবং মাল খালাস ও বোঝাই করার ব্যাপারে অতিরিক্ত দেরি। এই আইন অনুসারে ১০০ মন মাল বোঝাই একটা নৌকো খালের ভেতর বিনা বাধায় ২০ দিন, আর ঢোকবার ও বেরোবার জন্য আরো ৩ দিন, মোট ২৩ দিন থাকতে পারে। এর ওপর প্রতিদিনের দেরির জন্য ১ টাকা ৪ আনা বা মাত্র ১০ আনা জরিমানা দিলেই যতদিন খুশি সে খালের ভেতর থাকতে পারে—কেউ তাকে আইনত বার করে দিতে পারে না। এই দেরির ফলেই খালের ভেতর জমা নৌকোর সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে যেতে লাগল। সবচেয়ে বেশি ভিড় হত জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে।

পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি থেকে বড়ো ছোটো নানারকম নৌকো বোঝাই করে আনা হত ধান, চাল, ফল, তরি-তরকারি, মাছ ও অন্যান্য স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্য। তাছাড়া আসত কাঠ ও চুন বোঝাই বড়ো বড়ো নৌকো। আসত বাঁশের ভেলা বা মাড়। আর মগের মুল্লুক থেকে প্রতি বছর আসত মগ নৌকো। তারা আনত হরিণ ও মোষের শিং, হাতির দাঁত ও প্রচুর পরিমাণ সেগুন কাঠ। এসব নৌকোর ঠাসাঠাসি গাদাগাদি ভিড়ে সেই সব নৌকো যা গঙ্গা থেকে আসত বা গঙ্গায় বেরিয়ে যেতে চাইত তারা যাবার পথ পেত না। যেসব নৌকো কলকাতার বাজারের জন্য আমদানি মাল নিয়ে আসত, তারা খালের ভেতর মাল খালাস করত। আর যেসব নৌকো রফতানি মাল নিয়ে আসত তারা মাল খালাস করত গঙ্গায়।

তখন বেলেঘাটা খালের প্রায় সমস্ত উত্তর পাড় জুড়ে, সার্কুলার খাল যেখানে বেলেঘাটা খালে পড়েছে সেখান থেকে আরম্ভ করে বেলেঘাটা পুল পর্যন্ত সার্কুলার

খালের দুই পাড়ে এবং ওই (সার্কুলার) খালের টালা ও চিৎপুর পোলের মধ্যবর্তী অংশের দুই পাড়ে, সারবন্দি গুদামঘর ছিল। এইসব গুদামঘরের সামনে আমদানি নৌকোগুলোর অসম্ভব ভিড় লেগে থাকত। তারা নিজেরা দিনের পর দিন এই দুই খালে মাল খালাস করবার জন্য পড়ে তো থাকতই, রফতানি নৌকোগুলোকেও আটকে রেখে দিত।

এই দুই খালের ভেতর নৌকো চলাচলের বাধা দূর করবার জন্য সার্কুলার খালের পশ্চিম দিক দিয়ে একটা নতুন খাল কাটানোর প্রস্তাব হয়। এই খাল মাত্র সেইসব নৌকোই ব্যবহার করতে পারবে যারা পূর্ববঙ্গ থেকে রফতানি মাল নিয়ে সোজা গঙ্গায় বেরিয়ে যাবে, বা গঙ্গা থেকে মাল নিয়ে সোজা পূর্ববঙ্গ যাবে—মাঝপথে মাল খালাস করবে না। যেসব নৌকো কলকাতা বাজারের জন্য মাল আনবে বা খালাস করবে, তাদের জন্য থাকবে মাত্র দুটি খাল—বেলেঘাটা খাল ও সার্কুলার খাল।

তারপর দেখা গেল, সার্কুলার খালের পশ্চিমদিক দিয়ে নতুন খাল কাটা নানা কারণে অসম্ভব। অতএব সেই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হল। ১৮৫২ সনে রবার্ট রোজ (Robert J. Rose) এই খালগুলির একজিকিউটিভ অফিসার ছিলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, সার্কুলার খালের পূর্বদিক দিয়ে ও তার সমান্তরাল এই নতুন খাল কাটা হোক। সে খাল চিৎপুর লক্-এ গিয়ে সার্কুলার খালে পড়বে না, চিৎপুর লক্-এ উত্তরে গঙ্গায় গিয়ে পড়বে। আর যেখানে গঙ্গায় পড়বে সেইমুখে একটা 'লক্' বসবে। এর জন্য জমিও দখল করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনাও পরিত্যক্ত হল। নতুন খালের মোহানা ও লক্-এর জন্য যে জমি নেওয়া হয়েছিল, তা শেষপর্যন্ত ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলকে দিয়ে দেওয়া হল। এই নতুন-কাটা খাল (New-cut Canal) ১৮৫৮-৫৯ সনে বেলগেছিয়া পুলের ৯০০ ফুট দক্ষিণে উল্টোডাঙায় সার্কুলার খাল থেকে বেরিয়ে পূর্ব-দক্ষিণমুখী হয়ে নোনা জলের বিলের কাছে পৌঁছে সোজা দক্ষিণমুখী হয়ে ধাপা টোল-ঘরে সেন্ট্রাল লেক চ্যানেলে পড়ত।

১৮৯৫ সনে আরম্ভ হয়ে ভাঙড় খাল কাটা শেষ হয় ১৮৯৭ সনে। ১৮৯৭ সনের পর থেকেই ধাপা ও বামনঘাটার মধ্যে সেন্ট্রাল লেক চ্যানেল পলি পড়ে খুব তাড়াতাড়ি বুজে যেতে আরম্ভ করে। সেন্ট্রাল লেক চ্যানেল দিয়ে আর নৌকো ইত্যাদির যাওয়া-আসা সম্ভব নয় দেখে হর্ন (Horn) নামে এক সাহেব এঞ্জিনিয়ার ধাপা ও বামনঘাটার মধ্যে একটা নতুন খাল কাটবার পরিকল্পনা দেন। সেন্ট্রাল লেক চ্যানেলের হাজার ফুট উত্তর থেকে এই নতুন খাল কাটা আরম্ভ হয় ১৯০২-৩ সনে। এই খাল কাটার বিরুদ্ধে কলকাতা কর্পোরেশনের তরফ থেকে প্রবল প্রতিবাদ ওঠে। তাঁরা বলেন, এই খাল ওইখান থেকে কাটা শুরু হলে তাঁদের বানতলায় সদ্য তৈরি ময়লা জলের নিকাশি ব্যবস্থা (outfall) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই নতুন খালের প্রবাহপথ নির্ধারণের ভার দেওয়া হয় এক কমিটির ওপর। কমিটিতে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি ছিলেন তার চেয়ারম্যান চার্লস অ্যালেন (Sir Charles Allen)। এখানেও আপত্তি এত প্রবল হয় যে ১৩-৩-১৯০৬ তারিখের কমিটি মিটিং-এ গভর্নমেণ্টের সেচ-বিভাগের প্রধান এঞ্জিনিয়ার ইংগলিস (Mr. Inglis) ঘোষণা করেন যে প্রস্তাবিত খালের গতিপথ আরও উত্তরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই আরও-উত্তরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া খালই হল কৃষ্টপুর খাল, যা কাটা আরম্ভ হয় ১৯০৮ সনে ও শেষ হয় ১৯১০ সনে।

ধাপা টোল-ঘর থেকে বামনঘাটা পর্যন্ত সেন্ট্রাল লেক চ্যানেল ছিল খালের টোল-কালেক্টরের অধীনে। বামনঘাটা থেকে যমুনা বা ইছামতী নদী পর্যন্ত খালপথ ছিল খালের একজিকিউটিভ অফিসার-এর অধীনে।

বামনঘাটার পরেই জলপথ দুই শাখায় বিভক্ত হয়েছিল—একটি শাখা দক্ষিণ-মুখী হয়ে তার্দা কালিন্দী নদীর মধ্য দিয়ে বসন্তপুরে যমুনা নদীতে গিয়ে পড়ত; আর একটি শাখা ভাঙড় কাটাখালের মধ্য দিয়ে পূর্বমুখে গিয়ে বসন্তপুরের ৯ মাইল উত্তরে রাজিপুরে যমুনা নদীতে পড়ত। বামনঘাটা থেকে ভাঙড় কাটাখালের গোড়া পর্যন্ত ছিল প্রায় ৮ মাইল, আর বামনঘাটা থেকে উত্তর খাল-পথে রাজিপুর পর্যন্ত দূরত্ব ছিল ৩৪ মাইল।

বিদ্যাধরী নদীর ভরাযৌবন ছিল ১৮৩০ থেকে ১৮৩৩ সনের মধ্যে। ১৮৩৩ সনে সার্কুলার খাল ও ১৮৫৯ সনে নতুন-কাটা খাল তৈরি হয়। এই দুই খালের জল পেয়ে বিদ্যাধরী ফুলে ফেঁপে ওঠে। ১৮৮৩ সনের পর থেকে তার অবনতি শুরু হয়। অবনতির সূত্রপাত হয় ১৮৮৩ সনে ধাপা-লক্ তৈরির সঙ্গে সঙ্গে। অবনতি বাড়ে ১৮৯৫-৯৭ সনের মধ্যে বামনঘাটা থেকে কুলটি পর্যন্ত ১৫ মাইল লম্বা ভাঙ্গড় কাটাখাল তৈরির ফলে। ১৮৯৭ সালে বামনঘাটায় একটি ও কুলটিতে একটি লক্ বসিয়ে এই খোলা খালকে একটি বন্ধ খালে পরিণত করা হয়। ১৯০৮-১০ সনে কৃষ্টপুর খাল কাটার ফলে বিদ্যাধরীর অবনতি দ্রুততর হয়। ১৯১৭ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে মৃতপ্রায় এই নদীকে ফের বাঁচিয়ে তোলার নানারকম চেষ্টাচরিত্র হয়, কিন্তু কোনো চেষ্টাই সফল হল না। ১৯৩০ সনে ধাপা থেকে পোর্ট ক্যানিং পর্যন্ত ৩৫ মাইল-ব্যাপী বিদ্যাধরী নদী একেবারে মরে গেল। ধাপা-লক্ পরিত্যক্ত হল ১৯২৭ সনে, বামনঘাটা-লক্ ১৯৩৬ সনে।

উৎস : কলিকাতা দর্পণ

# জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি

## আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

"নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনা স্বদেশের ভাষা পুরে কি আশা"?[১]

বঙ্গভাষা আজ আর উপেক্ষিত নহে—বাঙালি বলিয়া যাঁহারা গর্ব করেন, তাঁহাদের নিকট বঙ্গভাষা বরং অপেক্ষিত। যখন বাঙালির ছেলে, বঙ্গভূমির বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা, বা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ অধ্যয়ন করাকে লজ্জাজনক, কতকটা বা প্রত্যবায়জনক মনে করিতেন, সে দুর্দিন কাটিয়া গিয়াছে, সে মোহ ভাঙিগয়াছে।

মহাকবি কৃত্তিবাস হইতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু মনস্বী বঙ্গসন্তান বঙ্গবাণীর স্বর্ণমন্দির-রচনায় সাহায্য করিয়াছেন; রাজা রামমোহন, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, অমর বঙ্কিমচন্দ্র, চিন্তাশীল অক্ষয়কুমার[২] প্রভৃতি বহু প্রতিভাশালী সারস্বতগণ সেই মন্দির-গাত্র নানাবিধ শিল্পসৌন্দর্যে খচিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষা এখন বাঙালির একটা প্রকৃত স্পর্ধার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই, বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতির বড়োই দুর্ভাগ্য।[২(ক)] বাঙালি ভারতের যে প্রাচীন মহাবংশের ভগ্নাংশ,[৩] সেই প্রাচীন আর্য জাতির ভাষা এবং সাহিত্য-ভাণ্ডার অনন্ত ও অমূল্য রত্ন-রাজিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং বাঙালিকে নিজের জাতীয় সাহিত্য-গঠনে সম্পূর্ণ রূপে পরের প্রত্যাশী হইতে হয় নাই। জগতের অপর অপর শিক্ষিত ও সমুন্নত জাতির সমক্ষে, নিজের জাতীয় সাহিত্য লইয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতায় বাঙালি এখন বঞ্চিত নহে—এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বর্তমানে বঙ্গভাষার যতটা শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, ইহাই যে বর্ধিষ্ণু বঙ্গবাসীর পক্ষে পর্যাপ্ত, এ কথা আমি কদাচ স্বীকার করিতে পারি না।

ক্ষেত্র-কর্ষণ পরিশ্রম-সাধ্য কার্য হইলেও, সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ-বপন ও উপযুক্ত সেচনাদির দ্বারা অঙ্কুরিত বীজের রক্ষণ এবং পরিবর্ধন অধিকতর পরিশ্রম-সাধ্য ও বিবেচনা-সাপেক্ষ। অঙ্কুরিত শস্যের আপদ অনেক। সেই সমস্ত আপদ হইতে রক্ষা করিয়া শস্যকে ফলোন্মুখ করিয়া তোলা বড়োই দক্ষতা সাপেক্ষ। যে সময়ে জল সেচনের প্রয়োজন তখন জল, যখন আতপ-নিবারণের প্রয়োজন তখন ছায়ার ব্যবস্থা আবশ্যক। এই সমুদয়ের কোনো একটির অভাবেই কর্ষিত ভূমি শস্যশালিনী হইতে পারে না। বর্তমান সময়ে

আমাদের বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও ওই রীতির অনুসরণ বিধেয়। বহুকাল, বহুশত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে কৃত্তিবাস প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহাদের আরাধ্য বঙ্গভাষার ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্ষিত ভূমির উর্বরতা বর্ধনের নিমিত্ত নানা আয়াস করিয়াছেন। এখন দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের সেই ভূমির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; সকলেই সুফলের আশায় সেই ভূমির দিকে লোলুপনয়নে চাহিতেছেন;—কত উচ্চ আশায় উৎফুল্ল হইয়া নিজের মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি ও আদর-সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন; এমন সময়ে—দেশবাসীর এই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ, উৎকণ্ঠাপূর্ণ সময়ে—ওই কর্ষিত ভূমিতে বীজ বপন করিতে হইবে। সুতরাং তাহাতে যে কত সতর্কতার প্রয়োজন, কত পূর্বাপর বিবেচনার প্রয়োজন, তাহা বঙ্গবাসীমাত্রেরই বিশেষ বিবেচ্য। এত দিনের চেষ্টায় যে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্র পরিপাটিরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের অবিবেচনার ফলে তাহা যেন নষ্ট না হয়,—তাহার উর্বরতা যেন কতগুলি আবর্জনাজনিত ক্ষারদাহে দগ্ধীভূত না হয়, ইহাই আমার অভিলাষ।

"বিশেষ বিবেচ্য" কেন বলিলাম, তাহাই বিবৃত করিতেছি। এতকাল অর্থাৎ প্রায় গত সার্ধ শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গভাষা যে ভাবে, যে গতিতে বঙ্গীয় জনসমাজে প্রসার লাভ করিতেছিল, এখন বঙ্গভাষার সেই গতির ক্ষিপ্রতা ক্রমেই বাড়িতেছে। পূর্বে ছিল, যাঁহারা শিক্ষিত—কী প্রতীচ্য কী প্রাচ্য এই উভয়বিধ শিক্ষার কোনো একটিতে যাঁহারা সম্পন্ন—বঙ্গভাষার কতিপয় কমনীয় গ্রন্থ কেবল তাঁহাদের—সেই অল্প সংখ্যক ব্যক্তিদের—অবসরবিনোদনের উপাদান মাত্র হইত। কার্যান্তরব্যাবৃত্ত চিত্তকে কদাচিৎ প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বঙ্গভাষার গ্রন্থাবলি পাঠ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে যাহাদের লইয়া বঙ্গদেশ, যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালা দেশের প্রায় সমস্তই বাদ পড়ে, সেই বঙ্গের আপামর-সাধারণের মধ্যে বঙ্গভাষার আদর কতটা ছিল? একপ্রকার ছিলই না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৃত্তিবাস-কাশীদাস ব্যতীত অপর কয়জন বঙ্গসাহিত্যরথের নাম বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে সুপরিচিত? শিক্ষিত জনগণের সংখ্যা সাত কোটি[৪] বঙ্গবাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেও অতিরঞ্জিত হয় না। এই মুষ্টিমেয় সমাজে যে বঙ্গভাষা এতদিন আবদ্ধ ছিল, এখন সেই বঙ্গভাষা অতি ক্ষিপ্রগতিতে বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে। সুতরাং এই সময়ে ভাষা যাহাতে সংযত-চরণে চলে, যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয়, সে পক্ষে বঙ্গের জাতীয় জীবনের উদ্বোধন-কর্তাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর সেইসঙ্গেই, আমাদের সুন্দরী মাতৃভাষা কি উপায়ে সুন্দরীতমা হইতে পারে, তাহাও ভাবিতে হইবে। কেবল গীতিকাব্য, মহাকাব্য বা গল্পগুচ্ছে জাতীয় সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্যের বিরাট সৌধের চত্বরে শিল্প, বিজ্ঞান, বার্তাশাস্ত্র, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি,—সর্বপ্রকার রত্নের সমাবেশ আবশ্যক! সর্ববিধ কলার বিলাসে জাতীয় সাহিত্য-মন্দির বিলসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা তাহাকে অসঙ্কোচে "জাতীয় সাহিত্য" বলিতে পারা যায় না। বর্তমান কালে, যখন বঙ্গভাষার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি অল্পবিস্তর নিপতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন বিশেষ বিবেচনাপূর্বক ওই ভাষার গতিকে, বঙ্গবাসীর ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের অনুকূল ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। জাতীয়তা-গঠন করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্য-গঠন সর্বাগ্রে আবশ্যক। সেই জাতীয় সাহিত্য কিরূপ ভাবে গঠিত হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে, কী প্রকারে, কোন দিকে জাতীয় সাহিত্যের

গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে, সেই সম্বন্ধেই আমি দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশে "শিক্ষিত" বলিতে আমরা কী বুঝি? সর্বসাধারণে কোন্ সম্প্রদায়কে "শিক্ষিত" বলিয়া স্বীকার করে? বর্তমান কালে আমাদের দেশে শিক্ষার কেন্দ্র মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, দেশবাসীগণ অসংকোচে তাহাদিগকেই শিক্ষিত আখ্যা এবং শিক্ষিতের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করেন। ভারতবর্ষের নানা বিপ্লবের মধ্যেও যাঁহারা পরম যত্নে বুকে বুকে রাখিয়া আমাদের প্রাচীন শাস্ত্ররাজি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই সংস্কৃত-ব্যবসায়ী অধ্যাপকবর্গের আসন দেশবাসী এখনও অনেক উচ্চে প্রদান করিয়া থাকেন; যদি অধ্যাপকবৃন্দ আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তবে উত্তর-কালেও তাঁহারা সে উচ্চাসনের অধিকারী থাকিবেন সত্য, কিন্তু সংখ্যাগত হিসাব ধরিলে, বঙ্গের প্রায় প্রতি পল্লিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সদ্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। যে স্থানে হয়ত পূর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার আদৌ প্রচার ছিল না, বর্তমানে সে স্থানেও উক্ত শিক্ষার প্রতি লোকের আদর দেখা যাইতেছে। যেরূপ ভাবে গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার ভূয়ঃপ্রচার ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অদূরবর্তী সময়ে যেখানে ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব এমন পল্লি বঙ্গে থাকিবে না। সুতরাং বঙ্গের ভবিষ্যৎ জন-মত পরিচালনের এবং জনসাধারণের মত-গঠনের ভার উক্ত শিক্ষিতগণের হস্তেই ক্রমে ন্যস্ত হইবে।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, যদি অকপট ভাবে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশীদিগের চতুষ্পার্শ্ববর্তী পল্লিসমূহের অনেক শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে পারিবেন। তাঁহাদের পল্লিবাসিগণ তাঁহাদিগের নিকট অনেক আশা করেন। যে যে পল্লিতে তাঁহাদের বাস, সেই সেই পল্লিতে এবং তৎ তৎ সমাজের সর্ববিধ উৎকর্ষাপকর্ষের জন্য তাঁহারাই অনেকটা দায়ী। আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক এবং স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেকটা দায়ী, কেন-না লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাদ দিলে মানুষের আর কিছুই থাকে না—সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণপূর্বক, যদি তাঁহারা বিবেচনাসহকারে লোক-মত পরিচালনা করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের প্রতিবেশীরা অম্লান মনে, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবে। যে যে গুণ থাকিলে মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাজন হওয়া যায়, শিক্ষা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতগণকে সেই সেই গুণে সম্পন্ন হইতে হইবে। দয়া, সমবেদনা, পরদুঃখকাতরতা, সত্যপ্রিয়তা, বিনীতভাব প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে হৃদয়কে সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার ফল ফলিয়াছে, বলা যাইতে পারে। অন্যথা কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্যতাকেই শিক্ষার চরমফল-প্রাপ্তি বলিতে পারি না।

স্বজাতিকে আত্ম-মতের অনুকূল করিতে হইলে সর্বাগ্রে স্বজাতির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ আবশ্যক, এ কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। কেবল সামাজিক, বা কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল-সাধন হয় না। প্রাত্যহিক কার্যের একটা তালিকা অন্তত মনে মনে থাকিলেও কার্যের শৃঙ্খলা হয়,—সময়ের সদ্ব্যবহার হয়, তদ্রূপ জাতীয় সাহিত্য যদি সুগঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়তা গঠনের পক্ষেও বিশেষ সহায়তা ঘটে। এই জাতীয় সাহিত্য-গঠনের প্রকৃত ভার এখন ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হস্তেই ন্যস্ত হইতেছে। অবকাশ মতো কোনো ভাবুক ভাবের স্রোতে

ভাসিয়া দুএকটি কবিতা রচনা করিলেন, বা চিন্তাপূর্ণ দুএকটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহাতে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃত গঠন হইবে না। তপস্যার ন্যায় একগ্রতাপূর্ণ চেষ্টায় ওই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে হইবে। বর্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায়ও বঙ্গভাষার অধ্যাপনা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহারা উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন। বঙ্গভাষায়ও তাঁহারা পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন হইতেছেন। এই ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তে বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতির ভার ন্যস্ত। সুতরাং তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কী কর্তব্য, তদ্বিষয়ে দুএকটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই ইংরাজি-শিক্ষিতগণ যদি একটু আদরের সহিত স্ব স্ব মাতৃভাষার আলোচনা করেন, মাতৃভাষারই হিতকল্পে মাতৃভাষার আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সুফলের আশা অনেক। দেশের যাহারা উচ্চশিক্ষা-বর্জিত, সেই জন-সাধারণকে তাঁহারা অতি অল্প আযাসেই মাতৃভাষার প্রতি অধিকতর আগ্রহসম্পন্ন করিতে পারিবেন। কেন-না, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে সাধারণ মত গঠনের ও সাধারণ সদনুষ্ঠানের প্রধান উদ্‌যোক্তা বা এক হিসাবে কর্তা হইবেন। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে ওই মাতৃভাষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে বরেণ্য করিয়া তোলা ইংরাজি-শিক্ষিতগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য। কেন-না তাঁহারা প্রতীচ্য ভাষায় পারদর্শী হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, লোকসমাজের স্পৃহণীয় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতেছেন;—তাঁহাদের কথায়, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারে, তাঁহাদের আচরিত রীতি-নীতির উপর জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নিহিত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই সাধারণকে স্ব স্ব মতের বশবর্তী করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্তব্য বড়োই গুরুতর। তাঁহাদের সামান্য স্খলনে, সামান্য উপেক্ষায়, একটি মহতী জাতির—উদীয়মান জাতিরও—স্খলন বা অধঃপতন হইতে পারে।

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।"[৫]

এই মহাবাক্য স্মরণপূর্বক তাঁহাদিগকে পদক্ষেপ করিতে হইবে। তরণির কর্ণধারের অনেক সতর্কতা আবশ্যক, অন্যথা নিমজ্জনের আশঙ্কা বলবতী।

যাহারা বঙ্গের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত, তাহারা যে ইংরাজি শিক্ষা করিয়া পরে আবার বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে, এরূপ আশা কদাচ করা যায় না। তাহাদিগকে—সেই mass অর্থাৎ সাধারণ জনসঙ্ঘকে—সৎপথে পরিচালিত করিতে যেমন দেশের শিক্ষিতগণই একমাত্র সমর্থ, সেইরূপ তাহাদিগকে অসৎপথে—উৎসন্নের পথে—অধঃপাতিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদেরই হস্তে। সরল-বিশ্বাস-সম্পন্ন জনসঙ্ঘের চিত্ত শিক্ষিতগণ শিক্ষার চাকচিক্যে বশীভুত করিয়া যে দিকে ইচ্ছা প্রবর্তিত করিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষিতগণের হস্তে দেশের প্রকৃত সম্পদ এবং বিপদ—এই দুই-এরই হেতু নিহিত রহিয়াছে। এক হিসাবে ইহাও এক মহা আতঙ্কের কথা, চিন্তার কথা! যাঁহাদের উপর দেশের সম্পদ বিপদ উভয়ই নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের কর্তব্য যে কত গুরুতর, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দেশের জনসঙ্ঘকে যদি সৎপথেই লইয়া যাইতে হয়—মানুষ করিয়া তুলিতে হয়—বাঙ্গালি জাতিকে একটা মহাজাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের মনের সম্পদ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও

যাহাতে বঙ্গের ইতর সাধারণ, পাশ্চাত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্মল, তাহা শিখিতে পারে এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্যে শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দোষ,—আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জন করিতে পারিলে আমাদের সুন্দর সমাজদেহ ও দেশাত্মবোধ আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয় আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল এদেশীয় নহে, পাশ্চাত্য আয়ুধেও সম্পন্ন হইতে হইবে। দুএকটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমত, ইউরোপের ইতিহাস। ইতিহাস অল্পবিস্তর প্রায় সকল জাতিরই কিছু-না-কিছু আছে। বর্তমান কালে ইউরোপ জগতের অভ্যুদিত দেশসমূহের শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং ইউরোপের ইতিহাস আলোচনাপূর্বক দেখিতে হইবে যে, কেমন করিয়া, কোন শক্তির বলে, বা কোন গূঢ় কারণে ইউরোপের কোন জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে; কোন পথে পরিচালিত হওয়ায় কোন জাতির কি উন্নতি হইয়াছে—সেই উন্নতির কারণ এবং পথ, আমাদের এ দেশীয়গণের পক্ষে প্রযোজ্য কিনা, তাহার প্রয়োগে এ দেশে কতটা মঙ্গলের সম্ভাবনা,—ইত্যাদি বিষয় বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া, যদি সঙ্গত মনে হয়, এ দেশের পক্ষে হানিজনক না হয়, তবে সেই পথে আমাদের জাতিকে ধীরে ধীরে প্রবর্তিত করিতে হইবে। সেই প্রবর্তনের একমাত্র সহজ পথ,—ওই সকল কারণ, ওই সকল উপায়-প্রণালি অতি বিশদরূপে আমাদের মাতৃভাষার দ্বারা সাধারণের মধ্যে প্রচার করা; এই প্রচারের একমাত্র কর্তা যাঁহারা ইংরাজি ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায়ও যাঁহাদের বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে, মাত্র তাঁহারাই,—অন্যে নহে।

দেশের কল্যাণ-কামনায় এবং স্ব-মাতৃভাষার পরিপুষ্টি-বাসনায় যাঁহারা এই মহাব্রতে দীক্ষিত হইবেন, তাঁহাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য—ইউরোপীয় ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা। মনে রাখা কর্তব্য যে, প্রচারকর্তাদের সামান্য ত্রুটিতে আমাদের অভ্যুদয়োন্মুখ জাতির মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং দেশের শিক্ষিতগণের প্রতি পদবিক্ষেপেই বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

যেমন এই অভ্যুদয়ের কথা বলিলাম, তেমনই এই সঙ্গে দেখিতে হইবে, কোন্ পথে যাওয়ায়, কোন্ দুর্নীতির আশ্রয়-বশত ইউরোপীয় জাতির অধঃপাত ঘটিয়াছে, বা ঘটিতেছে—সর্বনাশ হইয়াছে। কোন জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াও কোন্ কর্মের দোষে অধঃপাতের অতলতলে নিপতিত হইয়াছে—পতনের সেই সেই কারণনিচয় অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া সেই সেই সর্বনাশের হেতুগুলি পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতৃভাষার স্বচ্ছ দর্পণে এই ভাবে দোষগুণের প্রতিবিম্বনপূর্বক দোষ-পরিহার ও গুণ-গ্রহণের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য জন্মাইতে হইবে।

ইহকালই জীবনের সর্বস্ব নহে। এই ইহকালকেই একমাত্র সার ভাবিয়া কার্য করার ফলে, ঐহিকবাদী ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ধর্মভাব আদৌ নাই বলিলেই হয়। ধর্মভাবের অত্যন্ত অভাবের ফলেই বর্তমান শোণিত-তরঙ্গিণী রণভূমিতে ইউরোপ বিপর্যস্ত। ইউরোপের ওই অসদ্ভাবের অর্থাৎ ঐহিকবাদিতার প্রতি লক্ষ না করিয়া, বরং যতটা সম্ভব, উহা

হইতে দূরে সরিয়া যাইয়া আমাদিগের জাতীয়তা ও চিরস্পৃহণীয় ধর্মভাবকে জাগ্রত রাখিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি ধর্মভাবের উপর স্থাপিত করিয়া, উহাতে পশ্চিমের গ্রহণযোগ্য বিষয়ের সমাবেশপূর্বক সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। যাহা আছে, মাত্র তাহা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এ দুর্দিনে জাতীয় সম্পদের যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সর্বপ্রকারে তাহা করিতে হইবে।

তারপর ইউরোপের সাধারণ সাহিত্য, অর্থাৎ কাব্যনাটকাদি। আমার বোধ হয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই অংশে বিশেষ মনোনিবেশের প্রয়োজন। দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিত প্রভৃতি জটিল বিষয়সমূহের আলোচনা অপেক্ষা এই সমুদয় আপাতরম্য কাব্যনাটকাদির আলোচনায় ইংরাজি শিক্ষিতগণের অনেকেই কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। বিশেষত তারুণ্যের অরুণ-আভায় এই সকল বিদেশীয় চিত্র প্রথমত বড়োই সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়---হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। আমাদের বিশেষ প্রণিধান-সহকারে দেখা দরকার যে, পাশ্চাত্য সমাজের চিত্র তদীয় জাতীয় কাব্যনাটকাদিতে কী ভাবে প্রতিফলিত। ইউরোপের সামাজিক চিত্রাবলির অঙ্গপ্রতঙ্গ, হাবভাব, বিন্যাস-কৌশল প্রভৃতি আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে গ্রহণযোগ্য কি না,—ওই ওই চিত্রাবলির আদর্শে যদি আমরা স্বকীয় সমাজচিত্রের ছায়াপাত করি, তবে তাহাতে আমাদের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি না, অথবা ওই বিদেশীয় চিত্র আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য কি না,—এই চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখিয়া ইউরোপীয় কাব্যনাটকাদি পাঠ করিয়া, উহার যে সকল অংশ উৎকৃষ্ট, অনুকরণীয় এবং কল্যাণজনক, সেইগুলি আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে সাধারণের গোচর করিতে হইবে; সাধারণের মানস-সম্পদের উৎকর্ষ-বিধান করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলে, আমার মাতৃভাষারও লাবণ্য বর্ধিত হইবে। যাহা সৎ, যাহা সাধু, নির্মল ও নির্দোষ, তাহা যে জাতির বা যে সমাজেরই হউক না কেন, সাগ্রহে গ্রহণ করিতে হইবে।

"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।"[৬]

এই ভাবে জাতীয় সাহিত্য যদি গঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের সাহায্যেই আমাদের নবজাত জাতীয়তা সুগঠিত হইবে এবং জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত আমরা সমকক্ষতা করিতে পারিব,---অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প! ইতিহাস এবং কাব্য-নাটক -উপন্যাসাদি-সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, ইউরোপীয় দর্শন এবং অপরাপর কলা (art) প্রভৃতি সম্বন্ধেও ওই কথাই প্রযোজ্য। যাহা কিছু বিদেশীয় তাহাই উত্তম, সুতরাং আমাদের গ্রাহ্য, বা যাহা কিছু বিদেশীয় তাহাই অস্পৃশ্য, সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য,—এরূপ কথা বলিতে আমি সাহস করি না। বিদেশীয় বা স্বদেশীয় বুঝি না,—যাহা উত্তম, তাহা যে দেশীয়ই হউক না কেন, সর্বথা গ্রাহ্য; আর যাহা সর্বথা দোষমুক্ত নহে, তাহা আত্মপর-জ্ঞান বর্জনপূর্বক পরিত্যাগ করতে হইবে। এই সোজা পথ ছাড়া, ইহার অন্য কোনো সমাধান জাতীয় সাহিত্যের বা সমাজের অনুকূল হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই।

এমন অনেক প্রথা থাকিতে পারে, অথবা আছেও, যাহা ইউরোপীয় সমাজের কতকটা অনুকূল হইলেও আমাদের সমাজের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সেরূপ প্রথার প্রচলনে প্রয়াস করা যে কেবল পণ্ডশ্রম তাহাই নহে, তাহাতে আমাদের স্মরণাতীত কাল হইতে সুসংবদ্ধ সমাজেরও বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা;— যেমন ইউরোপীয় বিবাহ-পদ্ধতি। পাশ্চাত্য

দৃষ্টিতে উহা যতই সুন্দর ও আপাতরম্য মনে হউক না কেন, এ দেশের অস্থিমজ্জার সহিত যে সংস্কার অবিভাজ্যরূপে বিজড়িত, ওই বিবাহ-পদ্ধতি সেই সংস্কারের এবং সেই সংস্কার-পরিচালিত ও পরিবর্ধিত সমাজের পক্ষে কদাচ হিতকরী হইতে পারে না। সুতরাং তাদৃশী পদ্ধতির ঐন্দ্রজালিক চিত্রে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করা অনুচিত। যাহা তোমার সমাজের বা জাতীয়তার পরিপন্থী, তাহাকে আড়ম্বরপূর্ণ সাজ-সজ্জায় সাজাইয়া সৌন্দর্যের প্রলোভনে তোমার স্বজাতির আপামর-সাধারণকে মজাইও না। মনে রাখিও, তুমি যে পথ আজ নির্মিত করিয়া যাইতেছ উত্তর-কালে তোমারই দেশের শত সহস্র যাত্রী সেই পথে গমনাগমন করিবে। সুতরাং আপাত প্রশংসার ও যশের প্রতি উদাসীন থাকিয়া যাহা তোমার স্বজাতির এবং স্বসমাজের হিতকর তাদৃশ চিত্র অঙ্কিত কর, তাদৃশ আদর্শ তোমার সাহিত্যের মন্দিরে স্থাপিত কর—যাহার অনুকরণে তোমার ভবিষ্যৎ জাতি সমুন্নত হইবে। তোমার যে বিবাহ-পদ্ধতি আছে, পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির পদ্ধতি অপেক্ষা উহা নিকৃষ্ট নহে। প্রত্যুত অনেকাংশে উৎকৃষ্ট; সুতরাং ওই উৎকৃষ্ট পদ্ধতির যে যে অংশ অশিক্ষিত, সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ জনসমাজে এখনও সম্পূর্ণরূপে অনুবোধিত হয় নাই, তাহা তোমার বঙ্গসাহিত্যের সাহায্যে ইতর-ভদ্র-নির্বিশেষে সর্বসাধারণে প্রচারিত কর; এবং পার তো তোমার সেই উৎকৃষ্ট চিত্রের সম্মুখে বিদেশীয় চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া তুলিয়া ধর। তুলনায় তোমার স্বজাতিকে বুঝাইয়া দাও যে, কোনটা ভালো, কোনটা তোমার পক্ষে গ্রাহ্য ও তোমার সমাজের অনুকূল। মোহের ঘোরে যাহার মস্তিষ্ক বিকৃত, তাহার যাহাতে মস্তক শীতল হয়, সেইরূপ ভৈষজ্যের বিধান কর। যাহাতে রোগ-বৃদ্ধি হয়, তোমার জাতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থে তাদৃশ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া সমাজকে উৎসন্ন করিও না। তোমার প্রাচীন শাস্ত্র-ভাণ্ডারে যে সকল অমূল্য রত্নরাজি স্তূপীকৃত রহিয়াছে, এখনও যাহাদের আবরণ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় নাই—মাত্র কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত সাধাবণে এখনও যে সমুদয় রত্নের অতুল কান্তি নিরীক্ষণ করে নাই—তোমার জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে সেই সেই রত্নের মালা গাঁথিয়া তোমার স্বজাতির কণ্ঠে পরাইয়া দাও; তাহাদিগকে বুঝিতে দাও, শিখিতে দাও, দেখিতে দাও এবং দেখিয়া তুলনা করিয়া ভালোমন্দ বাছিয়া লইতে দাও; দেখিবে, তাহারা এদেশের অপরাজিতা বা শেফালিকা ফেলিয়া অন্য দেশের ভায়লেট মাথায় করিবে না। নিজেদের কী আছে, কী ছিল, ইহা যাহারা না জানে তাহারাই পরের দ্বারে উপস্থিত হয়। তোমার স্বদেশবাসীদিগকে তোমার প্রাচীন সম্পদের পরিচয় দাও. বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও—তাহাদের মনে আত্মসম্মান উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তোল; তবেই তো তোমার জাতীয়তা গঠিত হইবে। সর্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য গঠন কর, তবে তো জাতির গঠন হইবে—নতুবা সমস্তই আকাশ-কুসুম।

মনে কর, বিলাতের ব্যবস্থাপক-সভা (বা পার্লিয়ামেন্ট); তোমার দেশের পক্ষে বর্তমান সময়ে ওইরূপ সভার উপযোগিতা কতদূর, তাহা বিশেষ বিবেচ্য। কিন্তু বিলাতের লোক-তন্ত্র যেরূপ ভাবে গঠিত, তাহার পক্ষে ওই সভার উপযোগিতা প্রচুর। সে দেশের পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহাই যে এ দেশের পক্ষেও আবশ্যক, ইহা বলা বড়োই দুষ্কর। দেশভেদে, দেশবাসীভেদে, দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থাভেদে এবং দেশের শিক্ষা-দীক্ষা ভেদে, দেশের পরিচালন-সভাসমিতিরও ভেদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তোমার দেশের পক্ষে তোমার

প্রাচীন পদ্ধতিই অনুকূল, না বিদেশীয় পদ্ধতি অনুকূল, তাহা বিশেষ বিচার করিয়া তোমার জাতীয় সাহিত্যের দর্পণে, ওই উভয় ছবিরই দোষগুণের আলোচনা কর এবং দেশবাসীদিগকেও বুঝিয়া লইতে দাও যে, কোনটা তাহাদের গ্রাহ্য। মুক্ত পুরুষের ন্যায়, আর্ষ প্রকৃতির ন্যায় নিরপেক্ষ হইয়া লোকের হিতকামনায় সাহিত্য-গঠন কর—দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে। ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের আদর্শে যদি তোমার স্বদেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে চাও, মনে রাখিও, বর্তমান সময়ে তোমার আশা বিফল হওয়াই সম্ভব। হৈমন্তিক শস্যের জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত তাহাতে আশু ধান্যের বীজ-বপনে মাত্র কৃষকের মনস্তাপের বৃদ্ধি হয়, আর সেই সঙ্গে বীজ-ধ্বংস ও ক্ষেত্রের উর্বরতাও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যে দেশের শাস্ত্রে, শিক্ষায়, দীক্ষায় ও রাজনীতিতে রাজা মানব নহে—পরন্তু দেবতা বলিয়া কীর্তিত, সেই ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য রাজনীতির ছায়াপাতে সেই দেবতাকে আবার মানবের আসনে অধঃপাতিত করিও না। তোমার প্রাচীন রাজনীতির উজ্জ্বল চিত্র উত্তমরূপে নিজে নিরীক্ষণপূর্বক, প্রতিভার সাহায্যে তাহা তোমার মাতৃভাষায় আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য রাজনীতির সহিত তুলনায় সর্বসাধারণকে বুঝিতে দাও যে, তোমার পূর্বপুরুষগণের রাজনৈতিক ধারণা কত উচ্চ ছিল। গুপ্তহত্যা, রাজবিদ্বেষ এবং রাজদ্রোহ, কেবল ঐহিক নহে, পারত্রিক অকল্যাণেরও আকর, এ কথা তোমার ধর্মশাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছে।

যদি এই সকল কঠিন সমস্যা মাতৃভাষার সাহায্যে সমাধান করিতে পার. তবেই প্রকৃতপক্ষে তোমার মাতৃভাষার সেবা সার্থক হইবে, তোমার জ্ঞানার্জন সার্থক হইবে, আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার সেবা করিয়া তোমার জন্মও সার্থক হইবে। অবশ্য এই কঠিন কার্য এক সময়ে, বা একের দ্বারা কদাচ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু এই পথে যদি একবার তোমার জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পার, তবে দেখিবে, আরও কত পথিক তোমার প্রদর্শিত পথে যাত্রা করিবে। পথ যদি উত্তম, সুগম এবং সুশীতল ছায়া-সম্পন্ন হয়, তবে তাহাতে কোনোদিনই যাত্রীর অভাব হয় না। যাহা ভালো, নিষ্পাপ এবং নির্দোষ তাহার সেবা কে-না করিতে চায়? সেই সেবায় সেবিতের লাভালাভ কিছুই নাই, কিন্তু সেবকের আত্মতৃপ্তি অপরিসীম। এই গুরুতর কার্যের প্রথম অনুষ্ঠাতৃগণের মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল অন্ধভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদে বা মাত্র তাহার উজ্জ্বল অংশের প্রদর্শনেই আমাদের ওই মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে না, প্রত্যুত তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিরপেক্ষভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনাপূর্বক তাহার অসদংশের বর্জন করিয়া সদংশ, যাহা এ দেশের অনুকূল এবং যদি তাহাতে কোনোরূপ দোষলেশ না থাকে, তবে তাহাকেই আমাদের মাতৃভাষার কমনীয় আভরণে অলংকৃত করিয়া জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে হইবে। এই ভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যের গ্রহণযোগ্য অংশগুলি যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তবেই ক্রমে আমাদের বঙ্গভাষা আশাতীতভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিবে। ইউরোপীয় ভাষায় অল্পজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ থাকিয়াও এ দেশবাসীরা ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষার উত্তম ফলে বঞ্চিত থাকিবে না, প্রত্যুত ক্রমেই তৎ তৎ ফলে সম্পন্ন হইবে। প্রাচীন জাপান এই উপায়-বলেই অধুনাতন নবীন জাপানে উন্নীত হইতে পারিয়াছে।

কিন্তু এই সমস্ত কার্যের মধ্যেই একটা বিষয়ে সর্বদা আমাদিগকে লক্ষ রাখিতে হইবে। অশ্বের উপরে নর্তনাদি করিয়া যাহারা দর্শকদিগের প্রীতি ও কৌতুক উৎপাদন

করে, তাহারা যেমন প্রধানত সর্বদাই স্মরণ রাখে যে, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে স্খলিত না হই—তদ্রূপ আমাদিগকেও সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা এই কার্য করিতে যাইয়া যেন স্খলিত না হই, অর্থাৎ আমাদের যাহা মজ্জাগত সংস্কার, সেই পবিত্র ধর্মভাব হইতে যেন বিচ্যুত না হই।

আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির কোনোটিই ধর্মভাবশূন্য নহে। ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় এমনই একটা গুণ আছে যে এখানে ধর্মভাব-বর্জিত কোনো বস্তুই স্থায়ী হইতে পারে না—এ পর্যন্ত পারে নাই। যাহাদের আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে সর্বত্রই ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান, তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের কোনও চিত্র যদি ধর্মভাব-ব্যঞ্জক না হয়, তবে তাহা কদাচ বাণীর পাদপদ্মে অর্পণ করা যাইবে না। সে চিত্র গোধুলি-গগনের লোহিত মেঘখণ্ডের মতো অতি অল্পকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী প্রভৃতি যাহাদের জাতীয় সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; রাম, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দধীচি, কর্ণ যাহাদের সাহিত্যের আদর্শ পুরুষ; কবিগুরু রত্নাকর, মহর্ষি দ্বৈপায়ন, কবিকুল-রবি কালিদাস, ভবভূতি[৭] যাহাদের জাতীয় সাহিত্য-সংগীতের গায়ক;—আর সর্বোপরি চতুর্মুখ ব্রহ্মা যাহাদের শ্রৌত-সংগীতরূপ অমৃতের নির্ঝর—তাহাদের নবীন জাতীয় বঙ্গ-সাহিত্যে কোনোরূপ অপবিত্র ভাব বা অনাচার যেন প্রবেশ না করে, তৎপক্ষে সর্বদাই প্রখর দৃষ্টির প্রয়োজন। সকল জাতিরই এক একটা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক—আছেও। লক্ষ্যহীন জাতি কদাচ অভ্যুদয়শালী ও কালজয়ী হইতে পারে না। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে যে জাতি অভ্যুদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেবই একটা-না-একটা স্থির লক্ষ্য ছিল; এবং সেই লক্ষ্য ধরিয়াই তাহারা ক্রমে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে পারিয়াছে। লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে কিছুই অসম্ভব নহে—অতি দুষ্কর এবং দুঃসাধ্য কার্যও সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে।

এই যে ইউরোপ এত অতুল ঐহিক শ্রীবৃদ্ধিতে সম্পন্ন, ইহার কারণ কী? অর্থ বা অর্থকর বাণিজ্য উহার একমাত্র লক্ষ্য। আজ যে জাপান এত উন্নত, ওই অর্থকর বাণিজ্য উহার একমাত্র লক্ষ্য। ওই লক্ষ্যের প্রতি স্থির দৃষ্টি আছে বলিয়াই অন্য কোনো বাধা-বিপত্তিতে উহাদিগকে ব্যাহত করিতে পারে না। লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার জন্য প্রাণকেও উহারা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে। লক্ষ্য স্থির ছিল বলিয়াই ধর্মপ্রাণ অগ্নি-উপাসকগণ অম্লান বদনে ইরান ছাড়িয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছিলেন—পিউরিটানেরা[৮] মাতৃভূমি পরিত্যাগ পূর্বক আমেরিকার গহন বনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যে যে জাতি যে যে বৃহৎ কার্যই করুক না কেন, তাহার মূলে কিন্তু একটা স্থির লক্ষ্য থাকা চাই। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের এই জাতীয় সাহিত্যের মন্দির নির্মাণেও একটা স্থির লক্ষ্য আবশ্যক; অন্যথা আমরা সফলকাম হইতে পারিব না। আমাদের সেই লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? কোন লক্ষ্যে স্থিরচিত্ত থাকিয়া আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারিয়াছিলেন? কোন লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়াই আমরা ক্রমে অধঃপতিত হইতেছি? ইহাই আমাদের সর্বাগ্রে দ্রষ্টব্য ও বিবেচ্য।

ভারতবর্ষ যে এত উন্নত হইয়াছিল, সে একমাত্র ধর্ম লক্ষ্য করিয়া। যদি ভারতকে আবার বড়ো করিতে চাও, যদি আবার তোমাদের লুপ্ত সম্পদের, বিনষ্ট সম্মানের পুনরধিকার

চাও, তবে সেই পিতৃপিতামহের লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির কর। একাগ্রচিত্ত হও, অবাধে তোমার অভিপ্রেত মৎস্যচক্র-ভেদ[৯] করিতে পারিবে। ধর্মভাব হিন্দু জাতির প্রধান লক্ষ্য ছিল, ধর্মভাবকেই তোমার বর্তমান জাতীয়তারও প্রধান লক্ষ্য কর। তোমার সাহিত্য, তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, আচার, ব্যবহার সর্বত্রই সেই ভারতস্পৃহণীয় ধর্মভাবের স্ফুরণ কর। দয়া, সমবেদনা, পরার্থপরতা, সত্য, তিতিক্ষা, প্রেম প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে তোমার সাহিত্যকানন যদি সম্পন্ন করিতে পার, তবেই তোমার জাতীয় অভ্যুদয় হইবে। অন্যথা যাত্রার দলের প্রহ্লাদের[১০] ন্যায় তুমি ভক্তির ভান করিবে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তোমার কোনোই শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। অন্তরের সমস্ত আবেগ, উৎসাহ ও নির্ভর একত্র করিয়া যদি জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে পার, তবেই দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে।

এই ভাবে অন্যের সুচারু ও সদ্ভাবপূর্ণ পদার্থ লইয়া নিজের জাতীয় সাহিত্যের নির্মাণ ও জাতীয় আদর্শের গঠন ইতিপূর্বেও হইয়াছে। বরঞ্চ ইতিপূর্বে অতি প্রবলরূপেই এই কার্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমের নিজের জাতীয় সম্পদ আমাদের প্রাচীন সম্পদের ন্যায় এত অধিক পরিমাণে ছিল না। আমাদের সহিত তুলনা করিলে রোমের প্রাচীন সম্পদ গণনার মধ্যেই পড়ে না। রোমে যখন জাতীয় জীবনের প্রথম উন্মেষ হইল, তদানীন্তন প্রধান জাতির অভ্যুদয়দর্শনে রোমবাসীদের হৃদয়েও যখন জাতীয়তা-গঠনের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল, জগতে বরণীয় হইবার আকাঙ্ক্ষায় রোমবাসীগণের অন্তঃকরণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তখন তাহারা মাত্র নিজের পরিমিত প্রাচীন সম্পদেই আর পরিতুষ্ট থাকিতে পারিল না—পিপাসার্ত হইয়াই যেন চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তখন গ্রিসের চরম উন্নতির সময়। সর্বপ্রকারে ও সর্বাংশে গ্রিস তখন জগতের একটা আদর্শ জাতি। বীরত্বে ধীরত্বে, জ্ঞানে সম্মানে গ্রিস তখন সকলের শ্রেষ্ঠ। গ্রিসের সেই চরম অভ্যুদয়ের সময়ে রোমের লোলুপ দৃষ্টি গ্রিসের প্রতি পতিত হইল। গ্রিসের শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য—গ্রিসের কলাবিদ্যা—গ্রিসের শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি সমস্তই রোম ক্রমে স্বীয় জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইতে লাগিল। গ্রিসের যাহা কিছু ভালো, যাহা কিছু সুন্দর, সে সমস্তই রোম নিজের জাতীয়তা-গঠনের প্রধান উপাদানরূপে গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে রোম গ্রিসের সমকক্ষ, এমন-কি, অনেকাংশে গ্রিস অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। গ্রিসের অনুকরণ করিতে যাইয়া কিন্তু রোম স্বীয় জাতীয়তা বিসর্জন করে নাই। গ্রিসের যাহা কিছু উত্তম পরিচ্ছদ, যাহা কিছু সুন্দর অলঙ্কার তাহা রোমের জাতীয় ছাঁটে ছাঁটিয়া জাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিয়া রোম পরিধান করিল, এবং নবীন সাজে সাজিয়া রোম যখন মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইল, তখন রোমের সেই নানারত্নখচিত কিরীটের প্রভায় প্রাচীন গ্রিস যেন কতকটা হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। প্রাচীন গ্রিসের অঙ্গে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে-সমুদয় জরাজনিত পলিতভাব জন্মিয়াছিল, যাহা কিছু অসুন্দর ছিল, তাহার পরিবর্জন করিয়া রোম গ্রিসকে যেন একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল। রোমের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রিসের মস্তক অবনত হইল।

কিন্তু এই গ্রিস-রোমের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে না। রোমীয়দিগের নিজের প্রাচীন দ্রব্য-সম্ভার তত অধিক ছিল না, তাহাদের গৃহ একপ্রকার

শূন্য ছিল, হয়ত গৃহের কোনো এক কোণে দুএকটি প্রাচীন পদার্থের কঙ্কাল মাত্র পড়িয়া ছিল, তাই রোমীয়গণ দুহাতে যতটা পারিয়াছে গ্রিসের দ্রব্য-সম্ভার সংগ্রহ করিয়া নিজের শূন্যপ্রায় গৃহ পরিপূর্ণ করিয়াছে—তত সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিতে হয় নাই।

আমাদের কথা ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। আমাদের প্রাচীন সম্পদ প্রচুর। তাহার ভাণ্ডার অক্ষয়। সুতরাং আমাদের বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। আমাদের যাহা আছে, তাহার কোনো একটিরও মর্যাদার হানি হইতে পারে, এমন কোনো পরস্ব আমরা কদাচ গ্রহণ করিব না। অথচ আমাদের যাহা নাই—অন্যের প্রচুর আছে, সেইরূপ পদার্থ, যদি আমাদের জাতীয়তার পরিপন্থী না হয়, তবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিব না। রোমের ন্যায় আমাদের গৃহ শূন্য নহে যে, যে ভাবে পারি গৃহ পূর্ণ করিব; আমাদের ঘর পরিপূর্ণ। সেই পরিপূর্ণ গৃহের শোভা-বৃদ্ধির পক্ষে যাহা অনুকূল, সেই পরিপূর্ণ গৃহের অনুরূপ যে সাজ-সরঞ্জাম, তাহা যদি অন্য কোনো জাতির নিকটে পাই, তবে অম্লান হৃদয়ে গ্রহণ করিব। যাহা আমার জাতীয়তার অনুকূল নহে, তাহা কদাচ স্পর্শও করিব না। আমার নিজের জাতীয়তায় কোনোরূপ কলঙ্কস্পর্শ হইতে পারে, এরূপ আবর্জনা কদাচ আমার জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গে জন্মিতে দিব না। এই ভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিবেচনার সহিত পদক্ষেপ করিতে পারি, কিংশুক পরিহার পূর্বক কমল চয়ন করিতে পারি, তবেই আমাদের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় সম্পদ এই দুই-ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে—বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিবে।

আমাদের যাহা নিজস্ব, যাহা লইয়া আমরা গৌরব করি—আমাদের সেই জাতীয় গৌরবের বস্তু—প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-কলা, দর্শন-ইতিহাস প্রভৃতির যাহাতে কোনোরূপে অঙ্গহানি ঘটে, এরূপ কার্য যেন আমরা কদাচ না করি—কদাচ যেন জাতীয়তা বিসর্জন না দিই। অথচ যে ভাবে হউক, যদি ওই সকল বস্তুর কোনোক্রমে কোনোরূপ শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে পারি, তবে তাহাতে যেন বদ্ধপরিকর হই। নিজের যাহা আছে তাহা তো আছেই, কেহই তাহা অপহরণ করিতেছে না; সুতরাং সে পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকিয়া যাহা অন্যের আছে, অন্যে যাহার বলে বলীয়ান, অথচ আমার নাই, তাহা পাইবার জন্য যদি আমার আন্তরিক আগ্রহ না জন্মে, তবে কদাচ আমি ওই বলবানের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিব না। কেবল পূর্ব গৌরব স্মরণ করিয়া, অতীত সম্পদের আলোচনা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে কোনোই ফলোদয় হয় না। নিজের জাতীয় জীবনের শক্তি যাহাতে বর্ধিত হয়, তাহার প্রয়াস স্বতঃ পরতঃ করিতে হইবে—শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে।

আমার এই ছিল, আমি এই ছিলাম—এইরূপ ব্যর্থ ও অলস চিন্তায় কোনো লাভ নাই, বরং ক্ষতিই অধিক। এই ভাবে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যদি আমরা আমাদেব মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে পারি, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট করিতে পারি, তবেই আমাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে—আমরা এই ঘোর দুর্যোগেও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিতে পারিব। অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা কিছু নীচ, যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, যাহা কিছু অসৎ, ধর্মভাব বর্জিত, তাহা উরগ-ক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় পরিহার করিয়া যাহা সুন্দর,

নির্মল, নিষ্পাপ, মনোহর—যাহাতে দানব মানব হয়, মানব দেবতা হয়, তাদৃশ সদ্ভাব-পুষ্প চয়ন করিব এবং সেই সদ্ভাব-কুসুমে আমার জননী অনাদৃতা, উপেক্ষিতা বঙ্গবাণীকে অলঙ্কৃতা করিব—মায়ের সন্তান আমরা, মাতৃপূজা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

যে বায়ু মধুকণা বহন করে না তাহা আমরা আঘ্রাণ করিব না, যে নদী মধুমতী নহে তাহার আমরা সেবা করিব না, যে লতা মধুময় কুসুমে কুসুমিত নহে, তাহার প্রতি আমরা চাহিব না। এই ভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিশ্বব্রহ্মান্ড আমাদের অনুকূল হইবে—সহায় হইবে। নিঃসপত্নভাবে আমরা পর্বোদিত চন্দ্রমার ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইতে পারিব। হিমাচল যে দেশের পর্বত, জাহ্নবী-যমুনা যে দেশের প্রবাহিণী, সাম যে দেশের সংগীত, রামায়ণ-মহাভারত যে দেশের ইতিহাস, আমরা সেই দেশের অধিবাসীর যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব।

আপনারা আজ আমাকে যে উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন—বঙ্গবাণীর চরণ-প্রান্তে বসিবার সুযোগ দান করিয়াছেন—তজ্জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-প্রকাশপূর্বক আমি আবার বলি, আপনাদের ভাষা, আপনাদের ভাব, আপনাদের চিন্তা—এ সমস্তই সুন্দর হউক, অন্যের অনুদ্বেজক হউক; যাহারা আপনাদের সন্নিকর্ষে আসিবে তাহাদিগকেও উন্নতির পথে লইয়া, আপনারা নিজে ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায় অবাধিত গতিতে উন্নতির অমৃতময় পারাবারে মিশিয়া যাউন। নিজের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জগতের বরেণ্য হউন। বিধাতার কৃপায়।

"মধু ক্ষরতু তে বিত্তং মধু ক্ষরতু তে মুখম্।
মধু ক্ষবতু তে শীলং লোকো মধুময়োহস্তু তে।।"[১১]

## উল্লেখপঞ্জী ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১ রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধুবাবুর রচনা। এঁকে বাংলাভাষায় টপ্পা-সংগীতের 'প্রবর্তক' বলে ধরা হয়। শুধু তাই নয়, নিধুবাবুই এ-দেশের প্রথম ইংরেজি-জানা বাঙালি কবি। এবং তিনিই প্রথম স্বাদেশিক সংগীতের রচয়িতা। হুগলি জেলার চাপতা গ্রামে এঁর জন্ম। আলোচ্য ছত্র কয়টি হল .

"নানা দেশের নানান ভাষা;/বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা?/কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর?/ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা?" (দ্র. মোহিতলাল মজুমদারের 'কাব্য-মঞ্জুষা'য় সংকলিত ১১ সংখ্যক কবিতা, ভাদ্র ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ. ১৫)।

২ অক্ষয়কুমার : চিন্তাশীল অক্ষয়কুমার দত্তের প্রসঙ্গই উত্থাপন করেছেন স্যার আশুতোষ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিরবচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের আলোকে যে-সকল মনীষী বাংলা গদ্য-সাহিত্যে স্বীয় প্রতিভার বিশিষ্ট স্বাক্ষর রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন, অক্ষয়কুমার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। জন্ম নবদ্বীপের

কাছে চুপী গ্রামে ১৮২০ ইংগাব্দেব ১৫ জুলাই। পিতা পীতাম্বর, মাতা দয়াময়ী। মাত্র ১৪ বছর বয়সে 'অনঙ্গমোহন' নামে কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রথম সারির লেখক ছিলেন। গুপ্ত-কবির ইচ্ছানুসারেই বিখ্যাত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'য় যোগ দেন অক্ষয়কুমার। ক্রমে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'য় ৮ টাকা বেতনে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি মাতৃভাষায় বর্ণমালা, ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা পড়াতেন। অক্ষয়কুমার রচিত 'চারুপাঠ' সে-যুগে যুগান্তর এনেছিল। এছাড়া, তাঁর 'ভূগোল', 'পদার্থবিদ্যা', 'ধর্মনীতি', 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বস্তুত, বাংলা গদ্য সাহিত্যের পঙ্‌ক্তিতে বিদ্যাসাগরের পরেই অক্ষয়কুমারকে বসানো হয়। (কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অক্ষয় কুমারের পৌত্র)। দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৮৮৬ ইংগাব্দের ২৮ মে অক্ষয়কুমার পরলোকগমন করেন। ইনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন।

২(ক) তুলনীয় 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম খন্ড) গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি : "যে জাতির পূর্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে।....কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।.....ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম।.....বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালি কখনও মানুষ হইবে না।"

৩ বাঙালি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পৌষ ১২৮৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধের শিরোনামও ছিল 'বাঙ্গালির উৎপত্তি'। বঙ্কিমের আলোচনা-অনুসারে বাঙালি জাতির উৎপত্তি হল এই রকম : কোলবংশীয় অনার্য → দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য → আর্য → বাঙালি।

৪ আলোচ্য অভিভাষণটি স্যার আশুতোষ প্রদান করেছিলেন ১৯১৬ ইংগাব্দে। সে সময় বঙ্গবাসীর সংখ্যা কখনোই সাত কোটি ছিল না। কারণ ১৯৩১ ইংগাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী বঙ্গবাসীর সংখ্যা ৫,১০,৮৭,৩৩৮ (দ্র. জাতীয় সাহিত্য/১৯৪৯ ইংগাব্দ সংস্করণ, পৃ ৯১)। ১৯২১ ইংগাব্দের লোকগণনায় বাংলার জনসংখ্যা ছিল ৪,৭৫,৯২,৪৬২। (দ্র. মাসিক বসুমতী, কার্তিক ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৮)। স্যার আশুতোষ 'সাত কোটি বঙ্গবাসী' পদটিকে কথার কথা হিসেবেই উল্লেখ করেছেন সম্ভবত। অবশ্য ১৮৭৬ ইংগাব্দে রচিত 'বন্দেমাতরম্'-এর একটি পংক্তি হল : 'সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ......'।

৫ দ্র. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কর্মযোগ ৩য় অধ্যায়, ২১ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম পংক্তি। 'কোনো সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, সেই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ তাকেই অনুসরণ করে।'

৬ 'উত্তররামচরিতম্'-এর শ্লোক। "গুণ আদরণীয়, গুণী স্ত্রী কি পুরুষ, বয়স কত, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই।" সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ : "শিশুর্বা শিষ্যা বা যদমি মম তত্তিষ্ঠতু তথা/বিশুদ্ধেবুৎ কর্ষস্ত্বযি তু মম ভক্তিং দৃঢ়যতি।/শিশুত্বং স্ত্রৈণং বা ভবতু গনু বন্ধ্যাসি জগতো। গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গংন চ বয়ঃ।।"

৭ চতুর্মুখ ব্রহ্মা : সুন্দ-উপসুন্দ নামে দুই দৈত্যের হাত থেকে দেবতাদের রক্ষার জন্য ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে দিয়ে যে অপরূপ সুন্দরী তিলোত্তমাকে নির্মাণ করিয়েছিলেন, সেই তিলোত্তমা বিদায়কালে যখন দেবতাদের প্রদক্ষিণ করছিলেন, সেই সময় তাকে দেখবার জন্য ব্রহ্মার চারিদিকে চারটি মাথা বের হয়। ব্রহ্মা চতুর্মুখ হন। ব্রহ্মা সকলের সৃষ্টিকর্তারূপে চিহ্নিত। ব্রহ্মার কন্যা দেবসেনা, সন্ধ্যা, শতরূপা এবং বাক্। স্ত্রী সাবিত্রী, গায়ত্রী এবং সরস্বতী। নানা পুরাণে ব্রহ্মাকে নিয়ে নানা কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে।

৮ অভিধানে আছে **Puritan**=A Person who adheres to strict moral or religious principles, esp. one opposed to luxury and sensual enjoyment.

৯ দ্র. 'ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' অভিভাষণের ২২(খ) সংখ্যক টীকা।

১০ প্রহ্লাদ : দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র। মাতা রানি কয়াধু। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড ও অমর্কের হাতে প্রহ্লাদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত হয়। কিন্তু প্রহ্লাদ ক্রমশ ধার্মিক ও বিষ্ণুভক্ত হয়ে ওঠে। অথচ বিষ্ণুর হাতে ভাই হিরণ্যাক্ষ নিহত হওয়ার দরুন হিরণ্যকশিপু আমরণ বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন। পুত্র পিতার অনুগামী না হওয়ায় হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে সর্ব উপায়ে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু প্রহ্লাদের তিলমাত্র অনিষ্ট হয় না। বিষ্ণুর অধিষ্ঠান সর্বত্র—ভক্তের এই বাক্য প্রমাণ করতে স্ফটিক স্তম্ভ হতে নৃসিংহ মূর্তিতে

বিষ্ণু আত্মপ্রকাশ করে হিরণ্যকশিপুকে নখ দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেন। পরে প্রহ্লাদকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হয়ে যান। বিষ্ণু স্পর্শে প্রহ্লাদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে পাতালে দৈত্যদের রাজা হন। কিন্তু অনতিকাল মধ্যেই হিরণ্যাক্ষের পুত্র অন্ধককে রাজ্য সমর্পণ করে বদরিকাশ্রমে কুটির বেঁধে বিষ্ণুর আরাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। প্রহ্লাদের অপর ভাইয়েরা যথাক্রমে সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি ও বাষ্কল। (দ্র. 'ভারতীয সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' অভিভাষণের ২২(ক) সংখ্যক টীকা)।

১১ তোমার চিত্ত হতে মধু ক্ষরিত হোক, তোমার মুখ হতে মধু ক্ষরিত হোক। তোমার শীল বা আচরণ হতে মধু ক্ষরিত হোক, তোমার জগৎ মধুময় হোক।

উৎস : জাতীয় সাহিত্য

# লেখক পরিচিতি

অতুল সুর ॥ জন্ম : ৫-৮-১৯০৪, মৃত্যু : ২-১-১৯৯৯। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ লেখক ও কলকাতা বিশেষজ্ঞ। তাঁর গবেষণাগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অব বেঙগল', 'ভারতের মূলধনের বাহার', 'বাংলার মুদ্রণের দুশো বছর', 'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' ইত্যাদি।

অদ্বৈত মল্লবর্মন ॥ জন্ম : ১-১-১৯১৪, মৃত্যু : ১৬-৪-১৯৫১। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় কর্মজীবন শুরু করেন। পরে দেশ, মাসিক মোহম্মদী, নবযুগ, আজাদ, কৃষক ইত্যাদি পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করেন। পরে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত হন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' তাঁর স্মরণীয় উপন্যাস। তিনি 'মালো' সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন।

অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পণ্ডিত ও আইনবিদ। এম. এ, বি. এল। গ্রন্থ—কাব্যাদর্শ (সংস্কৃত-তিব্বতি) [১৯৩৯], নারায়ণ পরিচ্ছদ (ওই) [১৯৪২]

আবুল ফজল ॥ জন্ম : ১-৭-১৯০৩, মৃত্যু : ৪-৫-১৯৮৩। বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামে জন্ম। অধ্যাপক। পাকিস্তানি আমলে সরকার রেডিও ও টিভি থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে তিনি প্রতিবাদ করেন। সমাজ ও সমকাল সচেতন প্রাবন্ধিক ও কথাশিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'রেখাচিত্র'-র জন্য আদমজী পুরস্কার পান (১৯৬৬)।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ জন্ম : ২৯-৬-১৮৬৪, মৃত্যু : ২৫-৫-১৯২৪। আদি নিবাস বউবাজার, মলঙ্গা লেন, কলকাতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও নির্ভীক সংগ্রামশীল ছিলেন। 'বাংলার বাঘ' নামে অভিহিত করা হয়। 'জাতীয় সাহিত্য' নামে তাঁর প্রবন্ধসংগ্রহ এক বিশিষ্ট অবদান। পালি, ফরাসি ও রুশ ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন।

আহমদ শরীফ ॥ জন্ম : ১৩-২-১৯২১, মৃত্যু : ২৩-২-১৯৯৯। বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, লেখক ও বিবেকবান পণ্ডিত। অধ্যাপনা ছাড়াও সাংবাদিকতা, গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন বিদ্যা বিভাগের কাজে

তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা 'বাংলা ও বাংলা সাহিত্য', 'বিচিত্র চিন্তা', 'বাঙালির চিন্তা চেতনার বিবর্তন ধারা' প্রভৃতি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥ জন্ম : ২৬-৯-১৮২০, মৃত্যু : ২৯-৭-১৮৯১। আদি নিবাস বীরসিংহ, মেদিনীপুর। ১৮৩৯ সনে হিন্দু ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পান। শিক্ষাবিদ, সমাজ-সংস্কারক ও নবজাগরণের অগ্রদূত হিসেবে তিনি স্মরণীয়। তিনি বিধবা বিবাহের প্রচলন করেন এবং স্ত্রী শিক্ষার বৃহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক, 'বোধোদয়', 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা' প্রভৃতি। অন্যান্য রচনা, 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'বিধবা বিবাহ বিষয়ক', 'অতি অল্প হইল', 'ব্যাকরণ কৌমুদী' ইত্যাদি।

কপিল ভট্টাচার্য ॥ জন্ম : ১২-৯-১৯০৪, মৃত্যু : ১৭-১২-১৯৮৯। তেলেনিপাড়া, হুগলিতে জন্ম। খ্যাতনামা নদী-বিশেষজ্ঞ। সরকারি নানা কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, 'পশ্চিমবঙ্গের নদনদী ও পরিকল্পনা', 'স্বাধীন ভারতে নদনদী ও পরিকল্পনা' প্রভৃতি।

কাজী আবদুল ওদুদ ॥ জন্ম : ২৪-৪-১৮৯৪, মৃত্যু : ১৯-৫-১৯৭০। ফরিদপুরে জন্ম। বিশের দশকে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ এবং 'শিখা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সংগঠিত বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনের তিনি প্রধান ছিলেন। পেশায় শিক্ষক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, 'কবিগুরু গ্যেটে', 'শাশ্বতবঙ্গ', 'বাঙলার জাগরণ', 'পথ ও বিপথ' প্রভৃতি।

গোপাল হালদার ॥ জন্ম : ১১-২-১৯০২, মৃত্যু : ৩-১০-১৯৯৩। আদি নিবাস বিদগাঁও, বিক্রমপুর—ঢাকা। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাহিত্যতাত্ত্বিক ও স্বাধীনতাসংগ্রামী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'পঞ্চাশের পথ', 'তেরোশ পঞ্চাশ', 'একদা', 'অন্য দিন', 'আর একদিন', 'সংস্কৃতির রূপান্তর', 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' প্রভৃতি।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জন্ম : ১৮৫৮, মৃত্যু : ১৯১৬। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনীকাররূপে সমধিক খ্যাত হন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'মা ও ছেলে', 'কমলকুমার', 'পাণীর নবজীবনলাভ' প্রভৃতি। ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন।

দীনেশচন্দ্র সরকার ॥ জন্ম : ৮-৬-১৯০৭, মৃত্যু : ৮-১-১৯৮৫। প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয়

ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের কারমাইকেল অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর গবেষকজীবনে বিষয় ছিল, লেখবিদ্যা, লিপিতত্ত্ব, প্রাচীন সমাজ, মুদ্রা, মূর্তিতত্ত্ব ইত্যাদি।

নির্মলকুমার বসু ॥ জন্ম : ২২-১-১৯০১, মৃত্যু : ১৫-১০-১৯৭২। জন্ম কলকাতায়। নৃতত্ত্ববিদ ও গান্ধিবাদী। ১৯৩০ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বশাখার রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করার সময় গান্ধিজির আহ্বানে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর হন। তাঁর গ্রন্থ, 'পরিব্রাজকের ডায়েরি', 'বিদেশের চিঠি', 'নবীন ও প্রাচীন'। 'ভারতকোষ'-এর অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী ॥ জন্ম : ২৩-১১-১৮৯৭, মৃত্যু : ১২-৭-১৯৯৯। কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিংহ বাংলাদেশে জন্ম। বিশিষ্ট প্রবাসী ভারতীয় ও প্রখ্যাত লেখক। ১৯৯৬ সালে বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে সম্মানিত হন। তাঁর গ্রন্থ 'অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান', 'দি স্কলার একস্ট্রাঅর্ডিনারি', 'হিন্দুইজম', 'আত্মঘাতী বাঙালি', 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি।

নীহাররঞ্জন রায় ॥ জন্ম : ১৪-১-১৯০৩, মৃত্যু : ৩০-৮-১৯৮১। জন্ম মৈমনসিংহ। শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, ঐতিহাসিক ও শিল্পবিষয়ক গবেষণা, রাজনীতি ও নানা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। 'জ্ঞানপীঠ সাহিত্য পুরস্কার' কমিটির তিনি সদস্য ও সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বোধহয় 'বাঙালির ইতিহাস : আদিপর্ব' গ্রন্থটি। এই গ্রন্থের জন্য তিনি প্রথম বছর রবীন্দ্র পুরস্কার পান। 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা' নামক রবীন্দ্র সমালোচনা গ্রন্থটিও তাঁর বিশিষ্ট রচনা।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জন্ম : ২০-১২-১৮৬৬, মৃত্যু : ১৫-১১-১৯২৩। আদি নিবাস হালিশহর, চব্বিশ পরগনা। হিন্দি, উর্দু, ফারাসি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বাংলার সামাজিক ইতিহাস গবেষণায় তাঁর মূল্যবান অবদান আছে। তাঁর রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ হল, 'আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'রূপলহরী ও রূপের কথা' প্রভৃতি।

প্রবোধচন্দ্র বাগচি || জন্ম : ১৮-১১-১৮৯৮, মৃত্যু : ১৯-১-১৯৬৫। অধ্যাপক তিনি। অধ্যাপক লেভির আগ্রহে তিনি ১৯২২ খ্রি. নেপালে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়ক পাণ্ডুলিপি নিয়ে কাজ করেন। তাছাড়া তিব্বতি ও চিনা ভাষা এবং বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করেন। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হলে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক এবং স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যক্ষ হন। পরে উপাচার্যও হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থ 'দোঁহাকোষের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ', 'চর্যাপদের মূলপাঠ ও ব্যাখ্যা' প্রভৃতি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় || জন্ম : ২৫-৭-১৮৯২, মৃত্যু : ৮-১১-১৯৮৫। নদিয়ার রানাঘাটে জন্ম। প্রখ্যাত রবীন্দ্রজীবনীকার। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শনের সমগ্র চিনা ভাষ্য। তাঁর গ্রন্থ, 'পৃথিবীর ইতিহাস', 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' তাঁর ৪ খণ্ডে 'রবীন্দ্রজীবনী' এক অনন্য কীর্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় || জন্ম : ২৬-৬-১৮৩৮, মৃত্যু : ৮-৪-১৮৯৪। কাঁঠালপাড়া—চব্বিশ পরগনা। সাহিত্যস্রষ্টা ঔপন্যাসিক, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্‌গাতা এবং বাংলার নবজাগরণ যুগের অন্যতম প্রধানপুরুষ। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, 'দুর্গেশনন্দিনী', 'আনন্দমঠ', 'চন্দ্রশেখর', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'দেবী চৌধুরানী', 'সীতারাম' প্রভৃতি।

বিনয় ঘোষ || জন্ম : ১৪-৬-১৯১৭, মৃত্যু : ২৪/২৫-৭-১৯৮০। কলকাতায় জন্ম। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী, সাহিত্য-সমালোচক এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিশেষত লোকসংস্কৃতির গবেষক। ১৯৫৯ সনে 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ, 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ', 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', 'বাংলার বিদ্বৎসমাজ' প্রভৃতি।

বিনয় সরকার || জন্ম : ২৬-১২-১৮৮৭ (অন্য মতে ২২-১০-১৮৮৭), মৃত্যু : ২৪-১১-১৯৪৯। আদিনিবাস মালদা জেলার মুকদুমপুর গ্রামে। মৃত্যু ওয়াশিংটন ডিসিতে। বহুমুখী প্রতিভাধর দার্শনিক হিসাবে বিনয় সরকার ছিলেন ভাবনায় তারুণ্যের প্রতীক। ইতিহাস, দর্শন, নৃতত্ত্ব, ধনবিজ্ঞান, সমাজশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্য, সুকুমার শিল্পের মতো নানা দিগন্তে তাঁর ভাবনার অবাধ বিচরণ ছিল। রচনাকর্মেও তিনি ছিলেন বহুপ্রজ্ঞ।

বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বহু অবিস্মরণীয় গ্রন্থের তিনি লেখক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল 'হিন্দু সমাজতত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি, 'যুবক এশিয়ার ভবিষ্যনিষ্ঠা' 'শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা', Positive Background of Hindu Sociology, Introduction to Hindu Positivism, Background of Hindu Sociology। অধ্যাপক সরকার ছিলেন বহুভাষাবিদ।

স্বামী বিবেকানন্দ ॥ জন্ম : ১২-১-১৮৬৩, মৃত্যু : ৪-৭-১৯০২। আদি নিবাস সিমুলিয়া—কলকাতা। রামমোহন রায়ের বেদান্তদর্শন বিষয়ে গ্রন্থ পড়ে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। পরে রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পেয়ে গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ক্রমে রামকৃষ্ণের কাছ থেকে মানব-সেবায় দীক্ষা নেন। রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর মঠ স্থাপন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'বিবেকানন্দ' নাম নেন। 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ জন্ম : ৪-৯-১৮৮০, মৃত্যু : ২৫-১২-১৯৬১। আদি নিবাস কলকাতা। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে বিপ্লবী আন্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', 'যুগ সমস্যা', 'তরুণের অভিযান', 'বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব' প্রভৃতি।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ॥ জন্ম : ২০-১০-১৮৫৯, মৃত্যু : ৩০-৭-১৯৫৬। আদি নিবাস দিগড়া—হুগলি। বাঁকুড়ায় জন্ম। কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজে অধ্যাপনা করেন। বাংলা ভাষা চর্চায়, জ্যোতির্বিদ্যাচর্চায়, দেশীয় কলাচর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন তিনি বাংলা বানানে দ্বিত্ব বর্জন রীতির প্রচলনকারী। 'Ancient Indian Life' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান। অন্যান্য গ্রন্থ 'পূজাপার্বণ', 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ'। ৪ খণ্ডে 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' সম্পাদনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ জন্ম : ৭-৫-১৮৬১, মৃত্যু : ৭-৮-১৯৪১। আদি নিবাস, জোড়াসাঁকো—কলকাতা। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী এবং বিশ্ববিখ্যাত কবি। ১৯১৩ সনে প্রথম এশীয় ও ভাবতীয় হিসেবে নোবেল পুরস্কার পান। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান সমস্ত বিভাগে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র—ভারত ও বাংলাদেশে তাঁর লেখা গান জাতীয় সংগীতের সম্মান পেয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা 'গীতাঞ্জলি', 'গোরা', 'চোখের বালি', 'বলাকা', 'চতুরঙ্গ', 'বিসর্জন', 'রক্তকরবী', 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি।

রমেশচন্দ্র মজুমদার ॥ জন্ম : ৪-১২-১৮৮৮, মৃত্যু : ১২-২-১৯৮০। খণ্ডপাড়া—ফরিদপুর। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। সাত বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেন। গবেষণা করেন প্রাচীন ভারত নিয়ে। তাঁর গ্রন্থ 'Outline of Ancient Indian History and Civilisation', 'History and Culture of the Indian People' 'জীবনের স্মৃতিদ্বীপে' উল্লেখ করবার মতো। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও হয়েছিলেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জন্ম : ১২-৪-১৮৮৫, মৃত্যু : ২৩-৫-১৯৩০। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ। মহেঞ্জোদড়োর সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার তাঁর অবিনশ্বর কীর্তি। তাঁর 'প্রাচীনমুদ্রা' গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, 'বাংলার ইতিহাস', 'পাষাণের কথা' 'The Origin of Bengali Script' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

রাজনারায়ণ বসু ॥ জন্ম : ৭-৯-১৮২৬, মৃত্যু : ১৮-৯-১৮৯৯। মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। 'সঞ্জীবনী সভা' নামে গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতির সভাপতি ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হয়েছিলেন। রচিত গ্রন্থ, 'সে কাল আর এ কাল', 'সায়েন্স অফ রিলিজিয়ান' ইত্যাদি।

রাধারমণ মিত্র ॥ জন্ম : ২৩-২-১৮৯৭, মৃত্যু : ৭-২-১৯৯২। মার্কসবাদ লেনিনবাদ প্রচারে একনিষ্ঠ কর্মী। এক সময় গান্ধিজির কাছের মানুষ ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বাংলার তিন মনীষী', 'কলিকাতায় বিদ্যাসাগর', 'কলিকাতা দর্পণ'। শেষতম গ্রন্থটির জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান।

রামমোহন রায় ॥ জন্ম : ১৭৭২, মৃত্যু : ২৭-৯-১৮৩৩ সনে। বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক। একেশ্বরবাদী হিন্দুধর্মের পক্ষে ও সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেন। শিক্ষা প্রসারেও তাঁর অবদান আছে। প্রায় ৩০টি বাংলা গ্রন্থের তিনি রচয়িতা ও অনুবাদক। তাঁর রচিত 'ব্রহ্মসংগীত', 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রভৃতি বিখ্যাত।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ জন্ম : ২০-৮-১৮৬৪, মৃত্যু : ৬-৬-১৯১৯। রিপন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ও শেষে স্থায়ী অধ্যক্ষ হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ছিল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' ইত্যাদি। জ্যোতিষ, ভাষা, বেদ, পুরাণ ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা তাঁর বৈশিষ্ট্য।

| | | |
|---|---|---|
| রেজাউল করীম | ॥ | জন্ম : ১৯০২, মৃত্যু : ৫-১১-১৯৯৩। প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক। তাঁর লেখা 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ' গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া 'নয়া ভারতের ভিত্তি', 'জাতীয়তার পথে', 'তুর্কিবীর কামাল পাশা' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। |
| শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ॥ | জন্ম : ১৫-৯-১৮৭৬, মৃত্যু : ১৬-১-১৯৩৮। আদি নিবাস দেবানন্দপুর—হুগলি। প্রখ্যাত কথাশিল্পী। এখনও তিনি সমান জনপ্রিয়। ভারতীয় অন্যান্য ভাষায়ও তিনি সমান জনপ্রিয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল, 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'দত্তা', 'দেবদাস', 'শেষপ্রশ্ন', 'পথের দাবী' প্রভৃতি। |
| শিবনাথ শাস্ত্রী | ॥ | জন্ম : ৩১-১-১৮৪৭, মৃত্যু : ৩-৯-১৯১৯। আদি নিবাস মজিলপুর—চব্বিশ পরগনা। কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তাঁর গ্রন্থ, 'আত্মরচিত', 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', 'নির্বাসিতের বিলাপ'। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা নেতা। তিনি কেশবচন্দ্র সেনের সহযোগী ছিলেন। |
| সুকুমার সেন | ॥ | জন্ম : ১৬-১-১৯০০, মৃত্যু : ৩-৩-১৯৯২। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ও বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসকার। ভাষাতত্ত্বের বাইরেও গোয়েন্দা গল্প থেকে শুরু করে সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর বিচরণ, তেমনই প্রাচীন সাহিত্য থেকে ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব উদ্ধারেও তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'এ হিস্ট্রি অব ব্রজবুলি লিটারেচার', 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৪ খণ্ড), 'চর্যাগীতি পদাবলী', 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' প্রভৃতি। |
| সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় | ॥ | জন্ম : ২৬-১১-১৮৯০, মৃত্যু : ২৯-৫-১৯৭৭। হাওড়া শিবপুরে জন্ম। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ও জাতীয় অধ্যাপক। তাঁর মহৎ গবেষণাগ্রন্থ, 'Origin and Development of Bengali Language'। এ ছাড়া 'Languages and Literatures of India', 'Kirata-Jana-Krti', ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। ১৯৬৩ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দেয়। তিনি বহু গ্রন্থ ও ৩৮০টির উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখেছেন। |

সুবোধ ঘোষ ॥ জন্ম : ১৯০৯, মৃত্যু : ১০-৩-১৯৮০। শহর—বিক্রমপুর, ঢাকা। হাজারিবাগে জন্ম। প্রখ্যাত সাহিত্যিক। প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, এমনকি সামরিক বিদ্যায়ও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। নানা সাধারণ পেশায় তিনি অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছেন। পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', 'তিলাঞ্জলি', 'ত্রিযামা', 'ভারত প্রেমকথা'।

সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ জন্ম : ১৩-৯-১৯০৪, মৃত্যু : ১১-২-১৯৭৪। করিমগঞ্জ—শ্রীহট্টে জন্ম। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ। শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা শেষ করে কাবুলে শিক্ষাবিভাগে ফরাসি ও ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, 'দেশে বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচাকাহিনী', 'শবনম' ইত্যাদি। তিনি ১৯৪৯ সনে নরসিংহ দাস পুরস্কার পান।

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ ॥ জন্ম : ২৪-৩-১৯১৩, মৃত্যু : ২৪-১-১৯৯১। আদি নিবাস বর্ধমান। বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা ও মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী। তাঁর রচিত গ্রন্থ, 'লেনিনবাদীর চোখে গান্ধীবাদ', 'শিক্ষা ও শ্রেণীসম্পর্ক', 'মাতৃভাষা ও সাহিত্য', 'বিবিধ প্রসঙ্গ' প্রভৃতি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ॥ জন্ম : ৬-১২-১৮৫৩, মৃত্যু : ১৭-১২-১৯৩১। বিশিষ্ট অধ্যাপক। পুরাতন পুথি সংগ্রহের মাধ্যমে চর্যাপদ আবিষ্কার করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনত্বকে প্রমাণিত করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা 'বাল্মীকির জয়', 'মেঘদূত ব্যাখ্যা', 'প্রাচীন বাংলার গৌরব', 'বেনের মেয়ে' ইত্যাদি।

হিতেশরঞ্জন সান্যাল ॥ জন্ম : ১-২-১৯৪০, মৃত্যু : ২৩-১১-১৯৮৮। বাংলাদেশের পাবনায় জন্ম। বিশিষ্ট গবেষক। মধ্যযুগের বাংলার মন্দিরস্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিবর্তন নিয়ে গবেষণা করেন। কলকাতার সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজে ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর রচিত 'বাংলা কীর্তনের ইতিহাস' গ্রন্থের জন্য মরণোত্তর আনন্দ পুরস্কার পান ১৯৯০ সনে। অন্যান্য গ্রন্থ 'মহাত্মা গান্ধী', 'সোশ্যাল মবিলিটি ইন বেঙ্গল' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

# সমাজ-রূপান্তর সন্ধানী তৃতীয় সহস্রাব্দ সমিতি

## আমাদের কাজের কথা ঃ কৃতজ্ঞতা

সহস্রাব্দ নিয়ে দু-তিন বছর আগে থেকেই সারা পৃথিবীতে হুজুগ। মিলেনিয়াম তো একটা কালপর্ব। তাকে চোখে দেখবে কে? অথচ মিলেনিয়াম নিয়ে সারা দুনিয়াতেই নাচ-গান-হল্লার মাতামাতি।

এইরকম একটা সময়ে উনিশশো আটানব্বই এর নভেম্বরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ হাসিম আবদুল হালিমের সঙ্গে যোগাযোগ করে বোঝা গেল হল্লা-মাতামাতির বাইরে মিলেনিয়ামকে ছুঁতে হবে।

সেই আমাদের কাজের শুরু।

একটা কথা আইনস্টাইন বলেছিলেন, আমরা পূর্বপুরুষ থেকে জ্ঞান আহরণ করি। আমাদের প্রজন্মে তাকে সমৃদ্ধ করি। এর পর আমরা তাকে পাঠিয়ে দিই আমাদের সন্তানদের কাছে।

মানব প্রজন্মে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর এই জ্ঞানরাশি এগিয়ে চলে। সভ্যতার আলোয় সমাজ রূপান্তর সন্ধানী মানুষ পূর্ণাঙ্গ মুক্ত মানবজীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। একদিন আসবে যখন মানুষ হবে পূর্ণ পরিণত।—প্রকৃতির রাজ্যে সর্বশক্তিমান মানুষই প্রকৃতিকে জয় করবে।

এই কাজ নিয়েই আমাদের পরিকল্পনা। আমরা মিলেনিয়ামকে ছুঁতে চাই। লক্ষ লক্ষ বছরের মানব-জমিনে পর্যায়ে পর্যায়ে জ্ঞানের যে বিকাশ ঘটেছে তাকে জানার চেষ্টার বিরাম নেই।

সেই পটভূমিতে অবতীর্ণ হওয়ার আগে মানুষকে প্রস্তুত করা চাই। আমরা জেনে নিতে চাই এই বাংলার ভূখণ্ডে আমাদের ইতিহাসটা কী।

লক্ষণীয়, ইংরাজি সালের দু-হাজার বছর যখন পূর্ণ হল আমাদের বাংলা ভাষা ও বাঙালির জাতি-সত্তারও এক হাজার বছর পূর্ণ হল ঠিক তখনই। এ একটা যোগাযোগ মাত্র।

আমাদের মিলেনিয়াম কমিটি তাই বাংলার মাটিকে ছুঁয়ে, তার ভাষা ও জাতি সত্তাকে ছুঁয়ে তার রূপগুলিকে স্পষ্ট করে দেখে নিতে চায়। এই বাংলা বিশাল বিশাল উত্তরণের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছে। জানতে চায় তার আত্মপরিচয়। এখানে পশ্চিমবাংলা আছে, বাংলাদেশ আছে, ত্রিপুরা আছে, অন্যান্য রাজ্যের কিছু কিছু বঙ্গভাষী এলাকা আছে, প্রবাসী বাঙালিরা আছে। এরা সবাই সংখ্যায় প্রায় বাইশ কোটি।

কিন্তু আরও একটা কথা মনে রেখে আমাদের কাজ এগোচ্ছে। আমরা জাতিদাম্ভিকতা থেকে মুক্ত থাকতে চাই। বাঙালিরা নিয়েছে এবং দিয়েছে। এই দিল ও দেমাক বাঙালির অবশ্যই আছে। সেটা গৌরবের।

শত শত বৎসর ধরে বিদেশিরা বাংলায় এসেছে—ভিন প্রদেশের ভিন-ভাষী মানুষরা এসেছে—ভিন্ন ভিন্ন শোণিত প্রবাহ বাংলায় মিশেছে—বাঙালির জাতিসত্তা, তার সমাজ, ভাষা, সংস্কৃতি ক্রমাগত বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়েছে।

আমাদের সংগঠন বিধানসভার সৈয়দ নৌসের আলি সভাগৃহে উনিশশো নিরানব্বইয়ের সাতাশে জুলাই জন্মগ্রহণ করে। বক্তারা বলেছিলেন, এত বৃহৎ বিদ্বজ্জন সমাবেশ ইদানীংকালের কলকাতায় হয়নি।

সভাপতির ভাষণে হাসিম আবদুল হালিম জানালেন, আমাদের কাজ বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষীদের নিয়ে। আমাদের ইতিহাস-চর্চায় থাকবে সত্যনিষ্ঠা। যদি তা কঠোর হয় তবে তাও বলতে হবে। আমরা জানব, আমরা কী ছিলাম, কোথায় এলাম, কোথায় যাব। জানব আমাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। সভা সোৎসাহে তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেছিল।

সম্পাদকমণ্ডলীর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল উচ্চশিক্ষা সংসদের সভাগৃহে। প্রকল্প রচনার সময় আমাদের সভাপতি প্রস্তাব করেছিলেন, টাইম-ক্যাপসুল হবে না কেন! সেটাও হোক। এটা তাঁরই মস্তিষ্কজাত সন্তান।

এই কাজও এগিয়ে চলেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অশোকনাথ বসুকে চেয়ারম্যান ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ডিন শ্যামলকান্তি সান্যালকে আহ্বায়ক করে কুড়িজন বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিবিদকে নিয়ে গঠিত টাইম-ক্যাপসুল কমিটি ব্যাপকভাবে কাজ করে চলেছেন। বাজোর অনেক ভূতাত্ত্বিক ও প্রযুক্তিবিদ তাঁদের সহযোগিতা করছেন।

পৃথিবীতে অনেক টাইম-ক্যাপসুল হয়েছিল। চিনের তিব্বতে হয়েছিল শত শত। ধর্মীয় উপকরণ তাতে রক্ষা করা হয়েছিল। তাতে অজস্র চিত্রমালা-ম্যুরাল ছিল। চিনের অন্যত্র রাজন্যবর্গের সম্পদ গর্ভে নিয়েও টাইম-ক্যাপসুল হয়েছিল। তার সামান্য কিছু আবিষ্কার করা গেছে। আমেরিকাতেও আধুনিক কালে টাইম-ক্যাপসুল হয়েছে।

কিন্তু আমাদের টাইম-ক্যাপসুল হবে একেবারে আলাদা। তা হবে অতীত ও বর্তমান সমাজ জীবনের স্পষ্ট আলেখ্য। সমাজ-ইতিহাস-শিল্প-সংস্কৃতি-ভাষা-জীবনযাপনপ্রণালি-সামাজিক বিন্যাস-সামাজিক বৈষম্য, আন্দোলন ইত্যাদির প্রতিফলন।

হাজার বছরের যাবতীয় ঐতিহাসিক বিবরণ আমরা রচনা করছি এই জন্য যে, আগামী প্রজন্মকে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার দিয়ে যাব বলে। টাইম-ক্যাপসুলেও আমরা তেমনই হাজার বছরের পরের প্রজন্মের জন্য রেখে যাব বাংলার বর্তমান জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সভ্যতার নিশানা। জ্ঞানচর্চায় আমরা যা না-পেয়েছি তারা তা পাবে। তারা

জানবে বিবর্তনের বৃত্তান্ত। টাইম-ক্যাপসুলে যে উপকরণ ও নিদর্শন রাখা হবে একটি মূল সমিতি তা নির্বাচন করবেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মূল সমিতির আহ্বায়ক।

২

আমাদের কাজ যখন শুরু হয় তখন নিজেদের পয়সা এনেই সংগঠন গড়ে তোলা হতে থাকে। ফেডারেশন অফ ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল সীতারাম শর্মা এবং দিলীপ গুপ্ত, জ্যোতি রায়, মহেন্দ্র ভুতোরিয়া, পঙ্কজ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অর্থ দেন। প্রথম থেকেই আমাদের আশা ছিল ভালো কাজে ভালো সাড়া পাবই। পেতে থাকি। মন্ত্রী কিরণময় নন্দ, সত্যসাধন চক্রবর্তী, প্রবোধচন্দ্র সিংহ কয়েকদিনের মধ্যেই আশ্বাস দেন—আরও কিছু দিনের মধ্যে তাঁদের কাছ থেকে আসে অনুদান। ক্ষিতি গোস্বামী, পার্থ দে, আনিসুর রহমান, আবদুর রেজ্জাক মোল্লা, শ্রীমতী অঞ্জু কর, শান্তি ঘটক, যোগেশ বর্মন, বীরেন মৈত্র অর্থ মঞ্জুর করেন।

এঁরা ছাড়াও অনেক মন্ত্রী আমাদের সভা ও সমিতিকক্ষে একাধিকবার এসেছেন। এসেছেন সূর্যকান্ত মিশ্র, মহম্মদ আমিন, নিমাই মাল, কলিমুদ্দীন শামস, উপেন কিস্কু, সত্যরঞ্জন মাহাতো, মহেশ্বর মুর্মু, শ্রীমতী নন্দরানী ডল, ধীরেন সেন, কমলেন্দু স্যান্যাল, নন্দগোপাল ভট্টাচার্য, প্রলয় তালুকদার, ভক্তিভূষণ মণ্ডল, মিনতি ঘোষ, কংগ্রেস দলনেতা অতীশ সিংহ ও সকল জেলার সভাধিপতিবৃন্দ। এঁদের সোৎসাহ সমর্থন ছাড়া আমরা কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে বাস্তবিকই ভরসা পেতাম না।

আমাদের কাজ এখন আর সমিতিকক্ষে আবদ্ধ নয়। বিভিন্ন কেন্দ্রে কাজ ছড়িয়ে পড়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রাজ্য কমিটির অফিসেও দফায় দফায় বিশেষজ্ঞরা কাজ করছেন। এইগুলি আমাদের কাজের ব্যাপকতা বৃদ্ধির নিদর্শন।

ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও ভারতের ছাত্র ফেডারেশন আমাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত হবেন বলে জানিয়েছেন।

টাইম-ক্যাপসুলের সার্ভে কাজের ক্ষেত্রে পুরুলিয়ার সভাধিপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাঁকুড়ার সভাধিপতি তরুবালা বিশ্বাস যে সহযোগিতা করেছেন তা তুলনারহিত। বাঁকুড়ার জেলা শাসক দিলীপ চৌধুরী আই. এ. এস-ও তাঁদের সহযোগী। এঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে ছোটো করা যায় না। সার্ভে কাজে বাঁকুড়ার সমাজকর্মী গৌতম দে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

মন্ত্রী-দপ্তরগুলিতে সচিব যুগ্মসচিব থেকে শুরু করে সকল সরকারি আধিকারিক ও কর্মীবন্ধুরা যে-সহযোগিতা করেছেন তা আমরা ভুলতে পারব না। বারবার আমরা তাঁদের কাছে যাব।

বিধানসভার সকল কর্মীই সরকারি কাজের বাইরে আমাদের যেভাবে সাহায্য করেছেন তা বরাবর মনে থাকবে।

অফিসের কাজে, ছাপার কাজে সহ-সম্পাদক কুমুদ দাস, অফিস সম্পাদক মানসী কীর্তনীয়া, কর্মী রানা চন্দ ও অসীম চক্রবর্তী, সম্পাদনা সহায়িকা অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিল্পী প্রণবেশ মাইতির কঠোর পরিশ্রম উল্লেখ না করলে দুঃখবোধ থেকে যাবে।

আমাদের কাজের অগ্রগতিতে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সক্রিয় কাজ ও পরামর্শ দিয়ে অজস্রভাবে আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন, তার জন্য আমরা সর্ব অর্থে গৌরবান্বিত।

বাংলাদেশের সমন্বয়কারী শামীমুল হক শামীম ওদেশের বিদ্বানদের সঙ্গে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমাদের খুবই সাহায্য করেছেন। যার ফলে বাংলাদেশে আমাদের কাজ সম্পর্কে প্রচুর উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে।

এত সহযোগিতা, এত শুভেচ্ছা, এত উৎসাহ আমরা সকলের কাছে পেয়েছি তাতে এইটা আমরা বুঝেছি আমাদের আর পেছনে তাকাতে হবে না।

ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক

সমাজ-রূপান্তর সন্ধানী তৃতীয় সহস্রাব্দ সমিতি
থার্ড মিলেনিয়াম কমিটি ফর সোশ্যাল ট্রানজিশন

# আমাদের সমিতি

: কেন্দ্রীয় মূল সমিতি :

হাসিম আবদুল হালিম, সূর্যকান্ত মিশ্র, সত্যসাধন চক্রবর্তী, ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়,
দিলীপ গুপ্ত, সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবিন দেব, পদ্মনিধি ধর, বিশ্বজীবন মজুমদার,
ভবতোষ রায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদ দাস,
দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানসী কীর্তনীয়া।

আন্তর্জাতিক সমন্বয়কারী : অমলেন্দু গুহ
বাংলাদেশের সমন্বয়কারী : শামীমুল হক শামীম

: কালাধার সমিতি :

অধ্যক্ষ : অশোকনাথ বসু,
আহ্বায়ক-সম্পাদক : শ্যামলকান্তি সান্যাল

: সদস্য :

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপককুমার ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, বিমল চৌধুরী,
মনোজ মিত্র, স্বপন সরখেল, সমীর সাহা, সুভাষচন্দ্র দাস, সোমনাথ ঘোষ,
সিদ্ধার্থ দত্ত, ‿পনকুমার পাল, পরিমল চট্টোপাধ্যায়, সমীরণ চৌধুরী, সুব্রত পাল,
মোহিতকুমার রায়, সলিল সান্যাল, বিশ্বজিৎ ঘোষ, রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোক গুহ,
গৌরকৃষ্ণ পট্টনায়ক, শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

: উপকরণ মূল সমিতি :

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি সান্যাল, মনোজ মিত্র, পল্লব সেনগুপ্ত,
সত্যবতী গিরি, শংকর দাশগুপ্ত, শংকর চক্রবর্তী, গৌতম দে